ভারতের অর্থনীতির পরিচয়

Written according to the syllabuses
of three-year and two-year Arts and Commerce Degree Courses
of Calcutta, Burdwan and other Universities of West Bengal.

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড



অনিলকুমার বসাক, এম. এ.
'সিনিয়র' অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ,
চারুচন্দ্র কলেজ [সান্ধ্য], কলিকাতা

অমৃতরঞ্জন চক্রবর্তী, এম. এ.
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, হেরম্বচন্দ্র
[সিটি সাউথ] কলেজ, কলিকাতা

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ।। কলিকাতা ৯

দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
১৯৫৫

প্রচ্ছদ
সুধীন ভট্টাচার্য

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোগে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে, নবতব চিন্তাব আলোকে লিখিত ভাবতেব অর্থনীতিব যে আলোচনা-পুস্তকখানি আমরা ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত কবিযাছিলাম, তাহা যে সমাদৃত হইয়াছে, এই দ্বিতীয় সংস্করণেব প্রকাশ তাহাবই প্রমাণ। স্বভাবতই সর্বাধুনিক তথ্যাদি এই সংস্কবণে যেমন সংযোজিত-হইয়াছে, তেমনি সংযোজিত হইযাছে সর্বাধুনিক তন বিষয়বস্তুব আলোচনা। এই সংস্কবণেব প্রকাশে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়েব যে সকল অধ্যাপক বন্ধুগণ পবামর্শাদি দিযা বাধিত কবিয়াছেন, তাহাদেব মধ্যে সুবেন্দ্রনাথ কলেজেব অধ্যাপক ও আমাদেব স্নেহ-ভাজন শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যাযেব নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেব সর্বশেষ পবীক্ষাপত্রগুলি হইতে, প্রতিখণ্ডেব শেষে প্রশ্নপত্র ও উত্তব নির্দেশ সংকলিত হওযায, বাহুল্যবোধে আব পৃথক করিয়া বিগত বৎসবেব প্রশ্নগুলি মুদ্রিত হইল না। আশা কবি পূর্ব সংস্কবণেব ন্যায় বর্তমান সংস্কবণটিও সকলেব নিকট সমাদব লাভে ধন্য হইবে।

প্রকাশকগণেব পক্ষ হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায বর্তমান সংস্কবণটি প্রকাশে যে যত্ন লইযাছেন এবং প্রকাশন বিভাগেব কর্মী শ্রীবিমল সেনগুপ্ত এজন্য যে কষ্ট স্বীকাব কবিয়াছেন, তজ্জন্য গ্রন্থকাবদ্বয় তাহাদেব নিকট ঋণী বহিলেন।

বিভিন্ন মহাবিদ্যালযেব সহযোগী শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলীব নিকট হইতে, পববর্তী সংস্কবণেব জন্য যে কোন পরামর্শ ও মতামত সাদবে গৃহীত হইবে।

ইতি
গ্রন্থকারদ্বয়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সমকালীন ভারতের অর্থনীতিক জীবন দীর্ঘকালের জড়তা হইতে জাগিয়া উঠিয়া দ্রুতলয়ে গভীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। ইহার গতি প্রকৃতি ও ছন্দ বর্তমান ও উত্তরকালের জনজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি কবিতেছে। দেশের এই অর্থনীতিক পরিবর্তনেব এবং পবিবর্তন প্রচেষ্টার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেব, সাফল্য ও ত্রুটির ফলাফলের ব্যাপকতা ও গভীরতার উপলব্ধিতে এই পুস্তকখানি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গেব বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্নাতক শ্রেণীর শিক্ষার্থিগণ বিশেষ-ভাবে উপকৃত হইবে বলিয়া গ্রন্থকারদ্বয় আশা করেন।

আলোচিত বিষয় ও বক্তব্যগুলির জন্য গ্রন্থকারদ্বয় কোন স্বকীযতাব দাবি করেন না। তবে রচনা ও মুদ্রণের ত্রুটির জন্য তাঁহারা মার্জনা ভিক্ষা কবিতেছেন।

গ্রন্থ রচনায যাঁহারা অকুণ্ঠ সাহায্যদানে গ্রন্থকাবদ্বয়কে ঋণী কবিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমাব মিত্র, অধ্যাপক শ্রীনক্ষত্রকুমাব বায়চৌধুবী এবং বন্ধুবব শ্রীশঙ্কব বসুঠাকুর এবং প্রকাশনা কার্যে বিদ্যোদয় লাইব্রেবী প্রাইভেট লিমিটেড-এর শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনরেশচন্দ্র গোস্বামীব নাম বিশেষরূপে উল্লেখনীয়।

গ্রন্থখানির ত্রুটিমুক্তি সম্পর্কে সহযোগী অধ্যাপকগণ, শিক্ষার্থিগণ ও পাঠকবর্গের নিকট হইতে যে কোন পরামর্শ সাদবে গৃহীত হইবে।

নিবেদক
গ্রন্থকারদ্বয়

বিষয়-সূচী

পঞ্চম খণ্ড : ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের [illegible]

প্রথম খণ্ড

ভারতের অর্থনীতির মৌল সমস্যা

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।........................"

রবীন্দ্রনাথ

১

ভারতের অর্থনীতির গঠন
The Structure of Indian Economy

অর্থনীতির গঠন বলিতে কি বুঝায় ?
WHAT IS MEANT BY 'THE STRUCTURE OF ECONOMY' ?

কোনও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, উহার সমস্যা ও সম্ভাবনা জানিতে হইলে উহার জাতীয় অর্থনীতির গঠন ও বৈশিষ্ট্যের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

জাতীয় অর্থনীতি বলিতে দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সমষ্টিকে বুঝায়। ঐ সকল কার্যাবলীর প্রত্যেকটি জাতীয় অর্থনীতির এক একটি অঙ্গ। জাতীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে বিভিন্ন অঙ্গ বা অংশে বিভক্ত করা যায়। যেমন, বিনিয়োগ (investment) ও ভোগ (consumption) সংক্রান্ত কার্যাবলী, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ, সেবামূলক কর্ম ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকটিই জাতীয় অর্থনীতির এক একটি অঙ্গ। জাতীয় অর্থনীতির এই সকল বিভিন্ন অঙ্গ বা অংশের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাহাকেই এক কথায় জাতীয় অর্থনীতির গঠন বলা হয়।

জাতীয় অর্থনীতির গঠনের অর্থাৎ উহার বিভিন্ন অঙ্গের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা হইতে জাতীয় অর্থনীতির অন্তর্নিহিত রূপ ও বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে কোন দেশের জাতীয় অর্থনীতি ও উহার গঠন স্থায়ী হইতে পারে না। অতএব জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন অঙ্গ ও উহাদের পারস্পরিক সম্পর্কেরও সর্বদা পরিবর্তন ঘটিতেছে। জাতীয় অর্থনীতির গঠনে এই পরিবর্তন, লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হইয়া সহসা একদিন সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আজ আমরা দেশে যে মৌলিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা আজ বা গতকাল আরম্ভ হয় নাই। ইংরেজ আগমনের পর, বিশেষত বিগত শতকের মধ্যভাগ হইতে যে প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছিল, আজ তাহা পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক, পরস্পরবিচ্ছিন্ন, গ্রাম-কেন্দ্রিক, আত্মনির্ভরশীল এক প্রপদী সমাজব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ হইতে আজ যন্ত্রভিত্তিক, শহরমুখী ও পারস্পরিক নির্ভরশীল, এক নূতন ভারতের আবির্ভাব ঘটিতেছে।

বর্তমান ভারতের জাতীয় অর্থনীতির গঠন বুঝিতে হইলে উহার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা প্রয়োজন।

১. জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা ঃ ভারতের মোট জাতীয় এবং মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয়ের মান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি অল্প। ইহা দেশের অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত অবস্থার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ। ১৯৬০-৬১ সালের হিসাবে, চলতি মূল্যস্তরে জাতীয় আয় ১৪,৫০০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু আয় ৩৩০ টাকা। তুলনায় ১৯৫৭ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আয় ছিল ১৯৯,৪৪৭ কোটি টাকা ও মাথাপিছু ছিল ৯,৬৮০ টাকা। ঐ বৎসর ইংলণ্ডের মাথাপিছু আয় ছিল ৪,৫২০ টাকা।

তবে লক্ষণীয় যে, পরিকল্পনার গত দশ বৎসরে ভারতের জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়, ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা জাতীয় অর্থনীতির স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতার পরিচায়ক। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্বারা জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিই ভারতের অর্থনীতির মূল সমস্যা।

২. জাতীয় আয়ের বিভিন্ন উৎসের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব: জাতীয় আয় যে সকল কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় ঐগুলিকে সাধারণত তিনটি ক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়। কৃষি, বনভূমি ও মৎস্য চাষ প্রভৃতিকে একত্রে প্রাথমিক অর্থনীতিক ক্ষেত্র (Primary Sector) বলে। যাবতীয় যন্ত্রশিল্প ও খনি শিল্পকে একত্রে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্র (Secondary Sector), আর ব্যবসায়-বাণিজ্য, পরিবহণ, ব্যাঙ্কিং, বীমা, সরকারী ও অন্যান্য চাকরি, চিকিৎসা, শিক্ষাদানকার্য প্রভৃতি অপবাপর যাবতীয় কার্যাবলীকে তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্র (Tertiary Sector) বলে। সাধাবণত অনুন্নত দেশে অপব দুইটি ক্ষেত্রের তুলনায়, প্রাথমিক ক্ষেত্রেই জাতীয় আয়েব প্রধান অংশ উৎপন্ন হয়। পবে অর্থনীতিক উন্নয়নের ফলে ক্রমে কৃষিব মোট উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও, জাতীয় আয়ে ইহার অনুপাত হ্রাস পায় এবং তুলনায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের উৎপন্নের অনুপাত বৃদ্ধি পায়। ভাবতেও আমবা ইহা লক্ষ্য কবিতেছি।

অর্থনীতিব একক অঙ্গ হিসাবে কৃষি, অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যাযেব অর্থনীতিক কার্যাবলীর গুরুত্ব ভারতে সর্বাধিক। ১৯৬১-৬২ সালে জাতীয় আয়েব ৪৬.৮ শতাংশ কৃষি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তুলনায় দ্বিতীয় পর্যায়েব ক্ষেত্র হইতে ১৯.১ শতাংশ ও ব্যাঙ্কিং, পরিবহণ এবং যাবতীয় সেবামূলক কার্যের দ্বাবা অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্র হইতে মোট ৩৪.৫ শতাংশ উৎপন্ন হয়।[১] ইহা দেশেব অর্থনীতিক ভারসাম্যের অভাবের পবিচয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্রের তুলনায়, তৃতীয় পর্যায়েব অর্থনীতিক ক্ষেত্রেব অতিবিক্ত প্রাধান্য ভারতের স্বল্পোন্নত অর্থনীতিক গঠনেব একটি প্রধান লক্ষণ। তবে, পরিকল্পনার গত দশকেব পবিবর্তন বিচাবে দেখা যায় যে, ধীরে ধীরে প্রাথমিক উৎপাদনের অনুপাত হ্রাস পাইয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রসমূহের উৎপাদনের অনুপাত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু এই বৃদ্ধিব হার আশানুরূপ নহে।

৩. বিভিন্ন জীবিকায় শ্রমশক্তির বণ্টনে প্রবল বৈষম্য: ভারতে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। শ্রমশক্তির ৭২ শতাংশ প্রাথমিক অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, ১২ শতাংশ দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, বাকি ১৬ শতাংশ তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক কর্মে নিযুক্ত। ইহাতে ভারতের জীবিকার ক্ষেত্রে কৃষির অত্যধিক নির্ভবতা প্রমাণিত হয়। ১৮৮১ সালে প্রথম লোকগণনায় প্রাথমিক কর্মে নিযুক্ত শ্রমশক্তির অনুপাত ছিল ৫০.৭ শতাংশ। সুতবাং গত ৮০ বৎসবেরও দীর্ঘকাল ধবিয়া কৃষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তির যোগান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অথচ কর্মনিয়োগের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি বিশেষ প্রসারিত হয় নাই। এজন্য ভাবতেব কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম বিশেষরূপে কার্যকর হইযাছে। এমতাবস্থায় কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা, মাথাপিছু ও জাতীয় আয় স্বল্প হওয়াই স্বাভাবিক।

৪. মাথাপিছু উৎপাদনশক্তির স্বল্পতা: ভারতে বিবিধ ক্ষেত্রে মাথাপিছু বাৎসরিক উৎপাদনের গড়, ৬৭০ টাকা। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা অনেক অল্প। শুধু তাহাই নহে, বিবিধ ক্ষেত্রে অর্জিত মাথাপিছু আয়েরও যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে।

India, 1963,

কৃষির নীট মাথাপিছু বাৎসরিক উৎপাদন মাত্র ৫০০ টাকার তুলনায় খনি ও কারখানায় (অর্থাৎ বৃহদায়তন শিল্পে) মাথাপিছু উৎপাদন ১৭০০ টাকা ও রেলপথ এবং সংসরণে ১৬০০ টাকা। ব্যাঙ্কিং, বীমা ও পরিবহণে ১৫০০ টাকা। ইহা দ্বারা কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের যথার্থতা প্রমাণিত হয় এবং তুলনায় যন্ত্রশিল্পে জাতীয় অর্থনীতির সম্প্রসারণের সুযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৫. অল্পসংখ্যক উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর অধিকসংখ্যক উপার্জনহীন ব্যক্তির নির্ভরতা : মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪০ শতাংশ উপার্জনে নিযুক্ত। কিন্তু ইহারা সকলে উপার্জনে আত্মনির্ভর নহে। ইহাদের মধ্যে ২৯ জন মাত্র উপার্জনে আত্মনির্ভর, আর ১১ শতাংশ স্বল্প উপার্জন হেতু আংশিক পরনির্ভর। জনসমষ্টির বাকি ৬০ শতাংশ উপার্জনহীন সম্পূর্ণ পরনির্ভর।[১] সুতরাং প্রকৃত পক্ষে মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৯ শতাংশ ব্যক্তিকে বাকি ৭১ শতাংশ ব্যক্তির সম্পূর্ণ ও আংশিক ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করিতে হইতেছে। একে স্বল্প আয় ও উৎপাদন, তাহার উপর অনুপার্জনশীল ব্যক্তিগণের এই বিপুল ভার জনসাধারণের সঞ্চয় ক্ষমতার অভাবের মুখ্য কারণ। সঞ্চয়ের অভাবে পুঁজিগঠন ব্যাহত হইতেছে এবং ইহার ফলে আয় ও উৎপাদনের মান স্থায়ীরূপে অবনত রহিয়াছে।

৬. কোনমতে অস্তিত্ব বজায়ের স্তরে জীবনযাত্রা : দেশবাসিগণের আয় এবং প্রধানত কোন্ কোন্ দ্রব্যের জন্য তাহারা ব্যয় করিয়া থাকে তাহা বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের জীবনযাত্রার মান বুঝা যায়। গ্রামাঞ্চলের মোট পরিবারের ৬৩ শতাংশ ও শহরাঞ্চলের মোট পরিবারের ৫৪ শতাংশের মাসিক আয় মাত্র ১০০ টাকার মধ্যে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দর তথ্য অনুসারে ভারতের দরিদ্রতম ১০ শতাংশ ব্যক্তি দৈনিক মাথা-পিছু মাত্র ২৮ পয়সা এবং গড়ে ভারতবাসিগণ দৈনিক মাথা পিছু মাত্র ৭৫ পয়সা ব্যয় করিয়া থাকে। ইহা হইতে অধিকাংশ ভারতীয় পরিবারের দারিদ্র্যের এবং উপযুক্ত ক্রয়ক্ষমতার অভাবের চিত্র স্পষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং ক্রয়ক্ষমতার স্বল্পতার দরুন দেশে পণ্যদ্রব্যাদির মোট চাহিদা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিতেছে।

গড়ে গ্রামীণ পরিবারে প্রতি ১০০ টাকা ব্যয়ের ৬৭ শতাংশ খাদ্যদ্রব্যের জন্য, প্রায় ১০ শতাংশ বেশভূষার জন্য এবং প্রায় ২৩ শতাংশ জ্বালানি, যাতায়াত, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ ও চিকিৎসার জন্য ব্যয়িত হয়। এমন কি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতেও খাদ্য পানীয়ের ব্যয় প্রায় ৪৫ শতাংশ। ইহা হইতে দেখা যায় যে দেশের অর্ধেকের অধিক পরিবারে নেহাত অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ছাড়া অপরাপর দ্রব্যাদির কোন চাহিদা বিশেষ নাই। অধিকাংশ দেশবাসী যে মাত্র ন্যূনতম জীবনধারণের স্তরে (subsistence level) কোনক্রমে বাঁচিয়া আছে, ইহা তাহারই পরিচায়ক। ভারতের স্বল্পোন্নত অবস্থার ইহা আর একটি লক্ষণ। ন্যূনতম জীবনধারণের স্তর হইতে জীবনযাত্রার মানকে উন্নীত না করিতে পারিলে, দেশে যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যাদির চাহিদার সীমাবদ্ধতা দূর ও নূতন কর্ম সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না।

৭. সঞ্চয়ের স্বল্পতা : এখানে সঞ্চয় কথাটি আর্থিক সঞ্চয় (money savings) না বুঝাইয়া প্রকৃত সঞ্চয় (real savings) বুঝাইতেছে। আয়ের যে অংশ ভোগের জন্য ব্যয়িত না হইয়া আয় বৃদ্ধির জন্য পুনরায় ব্যবহৃত অর্থাৎ বিনিয়োজিত হয়, তাহাই সঞ্চয়। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে, স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা, স্বল্প আয় ও ভোগব্যয়ের আধিক্যের জন্য

১. Census, 1951.

সঞ্চয় অল্প হইতে বাধ্য। ১৯৫০-৫১ সালে সঞ্চয়ের হার ছিল জাতীয় আয়ের ৫.৬ শতাংশ। ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বাড়িয়া ৮.১ শতাংশে পৌঁছায়। ১৯৬০-৬১ সালে সঞ্চয় হার হইয়াছে জাতীয় আয়ের ৮.৪ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন সঞ্চয়ের যে লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হয় নাই। অথচ ভারতের আত্মনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয়ের অন্তত ১৫।২০ শতাংশ প্রতি বৎসর সঞ্চয় আবশ্যক। সঞ্চয়ের এই স্বল্পতা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রবল প্রতিবন্ধক।

৮. **বিনিয়োজিত পুঁজির স্বল্পতা:** স্বল্প আয় ও সঞ্চয়ের দরুন ভারতে উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ অতি অল্প। এ কারণে সর্বত্রই মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। সম্প্রতি পরিকল্পনা কালে ভারতে পুঁজিগঠনের হার বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু ইহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে।

৯. **ব্যাপক কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি:** স্বল্পোন্নত অর্থনীতির অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে উহা উৎপাদন-উপকরণগুলি যথাযথ ব্যবহার করিতে পারে না। সেজন্য তথায় একদিকে যেমন অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় মানবশক্তির যথাযথ ব্যবহারের অভাব। ইহার ফলে ব্যাপক কর্মহীনতা দেখা দেয়। ভারতেও এই অবস্থা বর্তমান। ভারতের কর্মহীনতার প্রধান বৈশিষ্ট্য চারিটি।

প্রথমত, এখানে ব্যাপক দীর্ঘকালীন (Secular) কর্মহীনতা রহিয়াছে। জনসাধারণের আয় ও উৎপাদনক্ষমতা স্বল্প, ফলে সমাজে সামগ্রিক (aggregate) চাহিদা বৃদ্ধি ঘটিতেছে না। এজন্য শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিতেছে না। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সমহারে কর্মসৃষ্টি ঘটিতেছে না।

দ্বিতীয়ত, দেশের প্রধান জীবিকা কৃষি মৌসুমীনির্ভর বলিয়া, বৎসরে ৩ হইতে ৯ মাস পর্যন্ত স্থানবিশেষে ঋতুগত কর্মহীনতা দেখা দেয়। পার্শ্ব-জীবিকার অভাব ইহার তীব্রতা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়াছে।

তৃতীয়ত, দেশে কৃষিসহ অন্যান্য সকল কর্মে ব্যাপক প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা (disguised unemployment)[১] বা স্বল্পনিযুক্তি (underemployment) বর্তমান, যাহারা কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছে তাহাদের অধিকাংশের কর্মশক্তিই পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে না। অর্থাৎ শ্রমের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন দেখা যাইতেছে।

চতুর্থত, দেশের দীর্ঘকালীন কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তির মূল কারণ এই যে, বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত অন্যান্য পেশা ও জীবিকা হইতে বিচ্যুত হইয়া এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন দেশবাসিগণ কৃষির উপরে নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছে। পুঁজি ও উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞানের অভাবে শিল্পের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ ঘটিতেছে না। এইজন্য চরিত্র বিচারে ভারতের কর্মহীনতাকে মূলত কারিগরী বা প্রযুক্তি বিদ্যাজনিত (Structural or Technological) কর্মহীনতা বলা যায়। দেশে পুঁজিগঠন অর্থাৎ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শিল্প সম্প্রসারণ ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।

✓ ১০. **সম্পদ ও আয়ের বণ্টনে সুগভীর বৈষম্য:** ভারতের মত অনেক অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত সকল দেশেরই অর্থনীতির গঠনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল

---

১. কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের একাংশের অপসারণ সত্ত্বেও মোট উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকিলে, তথায় প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা রহিয়াছে বলা হয়।

জাতীয় আয়ের বণ্টনে প্রভূত বৈষম্য। এই সকল দেশের মুষ্টিমেয় ভূস্বামী ও ধনিক-বণিকের হস্তে দেশের মোট সম্পদ ও আয়ের অধিকাংশ কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। অপর পক্ষে বেশীর ভাগ দেশবাসীর আয় স্বল্প। গ্রামের শতকরা ২০ ভাগ পরিবারের নিজস্ব কোন জমি নাই আর শতকরা ২৫ ভাগের জমির পরিমাণ ১ একরেরও কম। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৪৫ ভাগ পরিবারের হয় কোন জমি নাই, বা থাকিলেও উহা ১ একরেরও কম। অপর পক্ষে, শতকরা ১ ভাগ পরিবারের হস্তে মোট কৃষি জমির ২০ ভাগ কেন্দ্রীভূত। ইহা হইতে গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে সম্পদ ও আয় বণ্টনে প্রচণ্ড বৈষম্যের কথা সহজেই অনুমান করা চলে। অর্থনীতির অ-কৃষি অংশেও এই অবস্থা বর্তমান। আয় ও সম্পদের বণ্টনে এইরূপ বিরাট বৈষম্য দেশের উৎপাদন ও দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির পথে একটি প্রবল বাধা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, যে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী অংশের বিপুল সঞ্চয়, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা বিনিয়োগের জন্য পাওয়া সম্ভব হইতে পারে এবং তাহাতে দেশে পুঁজির অভাব অন্তত আংশিক পরিমাণে দূর করা সম্ভব।

১১. উৎপাদনের বৈচিত্র্যহীনতা : ভারতের কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান, গম, ভুট্টা, পাট, চা, ইক্ষু, তুলা, ছোলা, চীনাবাদাম ও যোয়ার ইত্যাদি অল্প কয়েকটি দ্রব্যই প্রধান। যন্ত্রশিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পাটজাত দ্রব্য, সুতা ও সুতীবস্ত্র, চিনি, লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি মুষ্টিমেয় দ্রব্যই উল্লেখযোগ্য।

কৃষি এবং শিল্পের উৎপন্নের উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, অন্যান্য দ্রব্যাদি উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রধানত মুষ্টিমেয় কয়েকটি দ্রব্যের উৎপাদনের উপরেই কৃষি ও শিল্প এবং রপ্তানি ব্যবসায় নির্ভর করিতেছে। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনের এই বৈচিত্র্যহীনতা দেশের উৎপাদন কাঠামোর একটি প্রধান দুর্বলতা। বিবিধ প্রকার ফসল ও দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা দ্বারা কৃষি ও শিল্পের বৈচিত্র্যকরণ (Diversification) ঘটিলে তাহার দ্বারা অন্যান্য শিল্প ও পার্শ্বজীবিকা সৃষ্টি সম্ভব হয়। দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়।

১২. প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষির ব্যাপকতা : ভারতের অর্থনীতির প্রধান অঙ্গ কৃষির অন্যতম ত্রুটি এই যে, কৃষকগণ প্রধানত নিজেদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারের জন্যই চাষ করে। সাধারণভাবে বাজারে বিক্রয় করা তাহাদের উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য নহে। ফলে কৃষকদের নিকট বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসল বিশেষ থাকে না। এই প্রকার কৃষিকে প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষি (subsistence farming) বলে। বাজারে প্রেরিত কৃষিজ উদ্বৃত্তের (agricultural surplus) পরিমাণ অতি অল্প বলিয়া শিল্পে কাঁচামালের যোগানও অল্প। ইহা দেশে শিল্প সম্প্রসারণের বিশেষ অসুবিধা ঘটাইতেছে। এইরূপ প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষি ভারতীয় কৃষির পশ্চাৎপদ অবস্থার পরিচয় দিতেছে। অপর দিকে বাজারে প্রেরিত উদ্বৃত্তের পরিমাণ স্বল্প বলিয়া কৃষকগণের আর্থিক আয় স্বল্প থাকিয়া যাইতেছে। তাহার ফলে দেশে শিল্পজাত বিবিধ পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা সৃষ্টি হইতেছে না। এই প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষির পরিবর্তে বাজারনির্ভর কৃষির প্রচলন (commercialisation of agriculture) আবশ্যক।

১৩. দেশের অর্থনীতিক লেনদেনের একটি অংশে এখনও টাকার ব্যবহার হয় না : পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জমিদার ও সামন্ত নরপতিদের অধীনে গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রেই নগদ টাকার ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। ফসল দিয়া ও পরিশ্রম দিয়া কৃষকগণ খাজনা, সুদ, জিনিসপত্রের দাম ইত্যাদি প্রদান করিত। ইহার ফলে অর্থনীতিক

লেনদেনের সকল ক্ষেত্রে টাকার প্রচলন ছিল না। বর্তমানে জমিদারি প্রথা ও সামন্তরাজ্যগুলির অবসানে, পথঘাটের উন্নতি ও প্রসারের ফলে টাকার ব্যবহার বাড়িতেছে বটে, তথাপি সর্বত্র ইহা প্রসারিত হয় নাই। ইহার দরুন কৃষকদের হাতে নগদ ক্রয়ক্ষমতা অল্প এবং নগদ অর্থে সকল বেচা কেনা না হওয়ায় তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে আর্থিক প্রণোদনা পায় না।

১৪. বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত: বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি, আমদানি-রপ্তানির পণ্যাদি, এবং বাণিজ্যের শর্ত ইত্যাদির বিশ্লেষণে স্বল্পোন্নত দেশের অবস্থা বুঝা যায়।

ভারতের রপ্তানি পণ্যসংখ্যা খুবই অল্প। পাট ও তুলাজাত দ্রব্য এবং চা—এই তিনটিই দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান ভিত্তি। কৃষি ও শিল্পের বৈচিত্র্যকরণের অভাব দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যেও প্রতিফলিত হইতেছে। অপরপক্ষে দেশের কৃষিব্যবস্থা প্রত্যক্ষ ভোগ-নির্ভর হওয়ায় অন্যান্য রপ্তানিযোগ্য ফসলের উদ্বৃত্তও অল্প। তাহা ছাড়া শিল্পের প্রসারের অভাবে, কৃষিজাত দ্রব্যাদি কাঁচামাল হিসাবে রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহাই ভারতসহ সকল স্বল্পোন্নত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামাল রপ্তানিকারী অনুন্নত দেশগুলির সীমাবদ্ধ রপ্তানির জন্য, রপ্তানি বাণিজ্যে একদিকে যেমন আয় অল্প হয় তেমনি, উন্নত দেশগুলি হইতে বিবিধ প্রয়োজনীয় যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য আমদানির পরিমাণ তুলনায় অধিক হয়। তাহা ছাড়া ইহাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের শর্তও (terms of trade) প্রতিকূল হইতে দেখা যায়। কারণ, আন্তর্জাতিক বাজারে স্বল্পোন্নত দেশগুলির রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য অল্প, উহাদের চাহিদা সীমাবদ্ধ এবং প্রতিযোগিতাও তীব্র। এ জন্য ইহারা রপ্তানি দ্রব্যের সুবিধাজনক দর পায় না। অপরদিকে আমদানি দ্রব্যের চাহিদা, বৈচিত্র্য ও পরিমাণ অধিক। এবং ঐ সকল যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য একচেটিয়া মালিকদের দ্বারা অধিকাংশ স্থলেই নিয়ন্ত্রিত। সেজন্য আমদানি দ্রব্যের দর বেশি পড়ে। সুতরাং একদিকে অল্প দরে রপ্তানি ও অপরদিকে অধিক দরে আমদানি করায় স্বল্পোন্নত দেশগুলির অধিকাংশেরই বাণিজ্য ও লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা যায়।

শুধুমাত্র ভারত নহে, পৃথিবীর অন্যান্য বহু অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার এই প্রকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেশগুলিকেই অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত (undeveloped or underdeveloped) দেশ বলিয়া গণ্য করা হয়। তবে ইহাদের মধ্যে ভারতের ন্যায় যে সকল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কর্মপ্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে ও তাহার ফলে উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু হইয়াছে সে সকল দেশকে অনেকে বিকাশমান দেশ (Developing Countries) নামকরণের পক্ষপাতী।

২

জাতীয় আয়
National Income

জাতীয় আয় কাহাকে বলে ?
WHAT IS NATIONAL INCOME ?

অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য হইল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনও বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের (এবং ইহার সহিত মাথাপিছু আয়েরও) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর এবং শোচনীয় জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধনের জন্য জাতীয় আয়, তথা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ছাড়া গত্যন্তর নাই।

কোন দেশের শ্রমশক্তি ও পুঁজি ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করিয়া প্রতি বৎসর বিভিন্ন প্রকারের যে সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কাজের সৃষ্টি করে উহাদের অর্থমূল্যই হইল মোট জাতীয় আয় (Gross National Income)। মোট জাতীয় আয় হইতে মূলধনের অপচয়-পূর্তির খরচ (depreciation) বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় (Net National Income) পাওয়া যায়।

সাধারণত দুই ভাবে জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়। ১. দেশের অধিবাসীরা কোন বিশেষ সময়ে (ধরা যাক এক বৎসরে) যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবামূলক কাজ উৎপাদন করে উহাদের আর্থিকমূল্য সমষ্টিই হইল জাতীয় আয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় চূড়ান্ত উৎপন্নের সমষ্টি (Final-Products Total)। ২. কোন বিশেষ সময়ে উৎপাদনের বিভিন্ন উপায়-সমূহ (যথা ভূমি, শ্রম, পুঁজি এবং সংগঠন) যে আর্থিক আয় উপার্জন করে তাহার যোগফল হইল জাতীয় আয়। এই পদ্ধতিকে বলা হয় উপাদান পারিশ্রমিকের সমষ্টি (Factor-Payments Total) বা আয় সমষ্টি পদ্ধতি (Income-total Method)। এই পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সমষ্টি গ্রহণ করিতে হয়—ক. সকল প্রকার মজুরি। খ. সকল প্রকার নীট খাজনা। গ. সকল প্রকার সুদ। ঘ. সকল প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও স্বনিযুক্ত (Self-employed) ব্যক্তিবর্গের আয় (যেমন—উকীল, ডাক্তার ইত্যাদি)।

ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপে অনুসৃত পদ্ধতি
THE METHOD OF MEASURING NATIONAL INCOME IN INDIA

ভারতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য উপরোক্ত পদ্ধতির কোনটিই সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা সম্ভব নহে। সেজন্য একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। কৃষি, শিল্প প্রভৃতির যতগুলি ক্ষেত্রে সম্ভব চূড়ান্ত উৎপন্নের সমষ্টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে আয় সমষ্টি বা উপাদান পারিশ্রমিক সমষ্টির পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জাতীয় আয়ের হিসাবের গুরুত্ব
IMPORTANCE OF NATIONAL INCOME ESTIMATES

নিম্নলিখিত কারণে আধুনিক কালে সর্বদেশেই জাতীয় আয়ের হিসাব প্রণয়ন ও বিশ্লেষণের উপযোগিতা বা গুরুত্ব অপরিসীম।

১. **কোন দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি** হইতেছে কিনা অথবা উহা কাম্য পথে চলিতেছে কিনা, **অগ্রগতির হার** প্রয়োজনমত কিনা—এ সকল **জানিতে হইলে জাতীয় আয়ের হিসাব ও বিশ্লেষণের সাহায্য লইতে হয়।** ভারতের ক্ষেত্রে এই বিষয়ের তথ্যাদি এই কারণেই প্রয়োজনীয়। ভারতের জাতীয় আয় ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সালে শতকরা ৪২ ভাগ হারে বাড়িয়াছে।

২. দেশে **জীবনযাত্রার মান** কি স্তরে রহিয়াছে, অন্যান্য দেশের তুলনায় তাহা কিরূপ—ইহা **জানিতে হইলে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ অপরিহার্য।** ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যস্তরে, ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে মাথাপিছু আয় ২৪৬ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬০-৬১ সালে প্রায় ২৯৪ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

আমেরিকান ডলারে, ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের মাথাপিছু জাতীয় আয় (GNP Per head of populatian) ছিল ৬১ ডলার। তুলনায় ১৯৫৯ সালে ফ্রান্সে মাথাপিছু আয় ছিল ১২১৪ ডলার, পশ্চিমজার্মেনীতে ৯৮৩ ডলার ও ইংলণ্ডে ১৩৬০ ডলারের সমান।

ইহা হইতে ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় কতটা অনগ্রসর তাহা বুঝা যায়।

৩. **জাতীয় আয় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া কোন্ কোন্ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি পরিমাণ সম্পদ সৃষ্ট হইতেছে,** জাতীয় অর্থনীতিতে **উহাদের তুলনামূলক গুরুত্ব** কিরূপ ও **জাতীয় অর্থনীতির সামগ্রিক চরিত্র** কি—তাহা **পরিস্ফুট হয়।** ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের নীট জাতীয় আয় (চল্‌তি মূল্য অনুসারে) ১৪,১৬০কোটি টাকার মধ্যে কেবল কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্র হইতে ৬,৯০০ কোটি টাকার সম্পদ উৎপন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধাংশ (৪৮·৭ শতাংশ) কৃষি হইতে উৎপন্ন হয়। এই কারণে বলা হয় ভারতীয় অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক।

৪. জাতীয় আয়ের হিসাব ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে **সমাজের কল্যাণের পরিমাপ** করা যায়। কিন্তু এই পরিমাপ সকল সময়ে সঠিক ও বাস্তবানুগ না হইতেও পারে। কারণ সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধির সহিত যুক্ত নহে এমন সব কাজে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইলে তাহাও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ঘটাইবে। অথচ ঐ ব্যয় দ্বারা যথার্থ কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে না।

৫. **জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ জাতির অর্থনৈতিক সমস্যাকে বুঝিতে এবং উহার সমাধানের পথ বাহির করিতে সাহায্য করে।** জাতির সঞ্চয়ের পরিমাণ কত, কোন্ শ্রেণীর লোকের হাতে জাতীয় আয়ের কত অংশ যাইতেছে, জাতীয় আয় বণ্টনের ধাঁচে বিভিন্ন সময়ে কোন পরিবর্তন হইতেছে কিনা, কোন্ শ্রেণীর উপরে কি পরিমাণ কর ধার্য করিতে হইবে, বিভিন্ন শ্রেণীর দেয় ক্ষমতার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যাহাতে সেই করভারকে সুষমভাবে আরোপ করা যায়—ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য। ভারতে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই অল্প। পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহের জন্য এই সঞ্চয়ের হার অপর্যাপ্ত। সুতরাং বিদেশী পুঁজি ভারতে আনয়ন করিতে হইবে কিনা,—

আনিতে হইলে কি পরিমাণ প্রয়োজন—এই সকল বিষয়ে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ ব্যতীত কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছান সম্ভব নয়।

৬. ভারতের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশে বিভিন্ন রাজ্যের জাতীয় আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি আরো একটি বিশেষ কারণে প্রয়োজনীয়। এই **তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যকে কি পরিমাণ সাহায্যস্বরূপ অনুদান (Grants-in-Aid) মঞ্জুর করিবে তাহা ঠিক করিতে পারে।**

৭. ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে **বাণিজ্যচক্রজনিত** মন্দা বিভিন্ন সময়ে জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। ঐ সকল দেশের সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য তখন ঐ মন্দার **ব্যাপকতা পরিমাপ করা** এবং উহার তীব্রতা নিরসন করিয়া সংকট দূর করা। জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ দ্বারা মন্দার তীব্রতা ও ব্যাপকতা সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং মন্দার অবস্থা বুঝিতে সরকারের সুবিধা হয়।

ভারতের জাতীয় আয় হিসাবের অসুবিধা

LIMITATIONS OF ESTIMATES OF NATIONAL INCOME OF INDIA

ক. নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা দুরূহ: ভারতের মত দেশে জাতীয় আয়ের নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং সংকলন করা একটি দুরূহ কার্য। বলা হয় যে, ভারতীয় পরিসংখ্যান বহু ক্ষেত্রেই শাসনবিভাগের প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করা হয়। বাউলী ও রবার্টসনের কথায় বলা যায় ভারতীয় পরিসংখ্যান অসংবদ্ধ, অসম্পূর্ণ, বিক্ষিপ্ত, কোথাও কোথাও বিভ্রান্তিকর এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান নাই বলিলেই চলে। যেমন গ্রামাঞ্চলের মূল্যস্তরের পরিসংখ্যান বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত। জন্মহার ও মৃত্যুহার সংক্রান্ত তথ্য অসম্পূর্ণ এবং মজুরী-হার সংক্রান্ত কোন খবর সাধারণত পাওয়া যায় না।

খ. ভারতে কৃষি-পরিসংখ্যান অসম্পূর্ণ: ভারতের মত দেশে কৃষি-সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ দেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান—অতীতে ত বটেই—বর্তমানেও অসম্পূর্ণ।

গ. অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্রে উৎপাদনের হিসাব করা কঠিন: জাতীয় আয় কমিটির মতে, উৎপাদনের বড় একটি অংশ, উৎপাদকেরা নিজেরা ভোগ করে অথবা অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী কিংবা সেবামূলক কাজের সহিত প্রত্যক্ষ বিনিময় করে। ফলে উৎপাদনের ঐ অংশটি অর্থের বিনিময়ে বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনীত হয় না। অর্থাৎ উহা অর্থবহির্ভূত ক্ষেত্রে (non-monetary sector) থাকিয়া যায়। জাতীয় আয়ের হিসাবে উহাকে অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আর্থিক (monetary) এবং অর্থ-বহির্ভূত—এই দুই ক্ষেত্রেরই হিসাব লইবার কথা জাতীয় আয় কমিটি বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে অর্থবহির্ভূত ক্ষেত্রের উৎপাদনের সঠিক হিসাব করা খুবই কঠিন।

ঘ. শিল্পক্ষেত্রের হিসাব অসম্পূর্ণ: শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদনের হিসাবও ভারতে অসম্পূর্ণ। কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যার হিসাব পুরাতন ও নির্ভরযোগ্য নহে। শিল্পের এবং কৃষির উৎপাদন ব্যয়ের কাঠামো সম্পর্কেও সংবাদাদি অপর্যাপ্ত। জমির সহিত সম্পর্কযুক্ত জনসাধারণের ভোগ সংক্রান্ত ব্যয়ের এবং সঞ্চয়ের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা কঠিন। সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থায় শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের অসংগঠিত অবস্থাই ইহার কারণ।

এই সকল কারণে ভারতে জাতীয় আয়ের হিসাবে বিভিন্ন পণ্ডিত একমত হইতে পারেন নাই। একের হিসাবের সহিত অপরের হিসাবের অনেকক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়।

ভারতে জাতীয় আয়ের হিসাব
ESTIMATES OF NATIONAL INCOME IN INDIA

১৯৪৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক জাতীয় আয়ের তথ্যাদি সংকলন এবং হিসাব প্রণয়নের জন্য জাতীয় কমিটি নিযুক্ত হয়। ইহার পূর্বে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে জাতীয় আয়ের নির্ভরযোগ্য হিসাবের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্‌গণ জাতীয় আয়ের হিসাব প্রণয়নের যে সকল চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হইতে বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতে জাতীয় আয়ের অনুমান করা সম্ভব। নিম্নে উক্ত হিসাবসমূহ প্রদর্শিত হইল।

সংকলয়িতার নাম	যে বৎসরের জন্য হিসাব করা হইয়াছে	বার্ষিক মাথাপিছু আয় (টাকায়)
দাদাভাই নওরোজী	১৮৬৮	২০
উইলিয়ম ডিগবী	১৮৯৯	১৮
ওয়াদিয়া এবং যোশী	১৯১৩-১৪	৪৪.৩
ফিণ্ডলে শিরা	১৯২২	১১৬
ভি কে আর. ভি. রাও	১৯৩১-৩২	৬৫
জাতীয় আয় কমিটি (চূড়ান্ত রিপোর্ট)	১৯৪৮-৪৯	২৪৭

উপরে প্রদর্শিত হিসাবে ব্যাপক পার্থক্যের কারণ হইল নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব। মাথাপিছু আয়ের উক্ত হিসাবকে (জাতীয় আয় কমিটির রিপোর্ট ছাড়া) নিখুঁত ও নির্ভুল মনে করা যায় না। তবে ইহা হইতে মাথাপিছু আয়ের গতি এবং দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থার তৎকালীন চিত্র মোটামুটি ভাবে বুঝা যায়।

স্বাধীনতালাভের পর ধারাবাহিকভাবে জাতীয় আয়ের হিসাব প্রণয়নের জন্য ভারত সরকার একটি জাতীয় আয় সংস্থা (National Income Unit) ১৯৪৯ সালে স্থাপন করেন। ইহাকে নির্দেশদানের জন্য অধ্যাপক মহলানবিশ, ডঃ গ্যাডগিল এবং ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও প্রমুখকে লইয়া গঠিত জাতীয় আয় কমিটি (National Income Committee) নিয়োগ করেন। মার্কিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক কুজনেটস-এর সহায়তায় ১৯৫১ সালে জাতীয় আয় কমিটি উহার প্রথম ও ১৯৫৪ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট হইতে ১৯৪৮-৪৯, ৪৯-৫০, এবং ৫০-৫১ সালের জাতীয় আয়ের হিসাব পাওয়া যায়। তৎপরবর্তীকাল হইতে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন (Central Statistical Organisation) ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব প্রকাশ করিতেছেন।

ভারতের জাতীয় আয়ের বৈশিষ্ট্য
FEATURES OF INDIA'S NATIONAL INCOME

ভারতে জাতীয় আয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করিলে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাহা সংক্ষেপে নিম্নে আলোচিত হইল।

১. ভারতে মোট জাতীয় আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটিতেছে। প্রথম পরিকল্পনায়

ষ্টান, রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে, পুঁজিদ্রব্য আমদানির অনুমতি দানের ক্ষেত্রে, বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতায় এদেশে নূতন শিল্প স্থাপন বা পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উৎসাহ ও অনুমতি দানের বিষয়ে, কাঁচামাল বণ্টনে ইত্যাদি নানাবিধ ক্ষেত্রে বাছিয়া বাছিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্প গোষ্ঠীকে অধিকতর সুবিধাদান করা হয়।

৬. যেখানে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেখানেও এরূপভাবে মূল্য নির্ধারিত হয় যাহাতে শিল্পের যথেষ্ট মুনাফা থাকে। সবকারের রাজস্ব ও আর্থিক নীতিও এরূপভাবেই রূপায়িত হয়।

৭. অতীতে ভারতে আধুনিক শিল্পের যে উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা প্রধানত সংরক্ষণ নীতির জন্যই সম্ভব হইয়াছে এবং সেজন্য ভারতীয় করদাতা ও ভোগকারিগণ যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। বর্তমানের পবিকল্পিত শিল্পোন্নয়নেও সংরক্ষণ নীতি অব্যাহত রহিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের উপর ব্যয়ভার অর্পণ করিয়া এরূপে যে সকল শিল্পের বর্তমান সমৃদ্ধি ঘটিতেছে, উহাদের মুনাফার সবই বেসরকাবী মালিকগণের পকেটস্থ হইতে দেওয়া হইতেছে। ইহাদের সরকারী নিয়ন্ত্রণে কিংবা মালিকানায় আনয়নেব কোন নীতি বা সেরূপ ইচ্ছা সবকারের আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে মনে হইতে পাবে যেন বিশেষ বিশেষ বেসরকাবী উদ্যোগকে মুনাফার সঞ্চয় এবং দ্রুতবেগে বিপুল আর্থিক ক্ষমতা করায়ত্ত কবিতে দেওয়াই সরকারী নীতি।

৮. বর্তমান শিল্পায়ন নীতিব অপব দিক হইতেছে পুঁজি গঠনে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রের উপর নির্ভরতা। কার্যত ইহার ফল দাঁড়াইযাছে যে সরকাব নির্দিষ্ট সঞ্চয় সম্ভব করিবার জন্য ইহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া ইহাদের এরূপভাবে সংরক্ষণ করা যেন ইহারা যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করিতে পারে। এরূপ বিভিন্ন শিল্প গোষ্ঠী সরকারী নীতির পক্ষপুটে আশ্রয় পাইয়া অত্যধিক মুনাফা উপার্জন ও সঞ্চয় দ্বারা প্রচণ্ড আর্থিক শক্তির অধিকারী হইয়া দেশের ধনবৈষম্য বৃদ্ধির কাবণ ঘটাইতেছে। দেশের শেয়াব বাজারের চড়তির অবস্থা ইহারই ইঙ্গিত দেয।

৯. উপরোক্ত নীতির ফলে, স্বভাবতই উৎপাদনের উপব অত্যধিক গুরুত্ব পড়িয়াছে ও বণ্টনের দিকটি অবহেলিত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, বেসরকারী উদ্যোগনির্ভর শিল্পায়ন ঘটাইতে গিয়া শিল্পোন্নতির সামাজিক খরচের (Social Cost) দিকে লক্ষ্য দেওয়া হইতেছে না। শহরাঞ্চলে বস্তির দুরবস্থা, ফুটপাতে আশ্রয় গ্রহণকারী জনতার ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ইহাবই ফল।

১০. ইহার উপর রহিযাছে ভারতের পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী ও মালিকগণের জনস্বার্থবিরোধী অন্যায় ও অসংযত লোভ। করফাঁকি, ব্যাপক ভেজাল, গোপন মজুদদারী, দুর্নীতি প্রভৃতি ইহার ফল এবং ইহাও ধনবৈষম্য বৃদ্ধিতে কম সাহায্য করে নাই।

১১. রাজনৈতিক দলগুলির তরফ হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট নির্বাচনকালীন চাঁদা-আদায়ের প্রথা এবং অবসর গ্রহণকারী পদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ কর্তৃক বেসরকারী উদ্যোগের শিল্পে উচ্চবেতনে কর্ম গ্রহণের যে অশুভ প্রবণতা দেখা দিয়াছে, তাহাতে বেসরকারী উদ্যোগের কার্যকর নিয়ন্ত্রণেও বাধার সৃষ্টি হইয়াছে।

১২. সর্বোপরি ভারতের বর্তমান মূল্য স্ফীতি ও প্রতিক্রিয়াশীল কর ব্যবস্থার প্রভাবও ইহাতে অল্প নহে। মূল্য স্ফীতি দেশে ধনবৈষম্য বৃদ্ধি করে। [illegible] রাজস্বের অধিকাংশই পরোক্ষকর। উহার

শুল্ক হইতে আদায় হয়। তুলনায় আয়কর হইতে আদায় হয় মাত্র ২২ শতাংশ। সুতরাং দেশের ধনবৈষম্য হ্রাসে কর ব্যবস্থার অবদান সামান্য বলিলেই চলে।

বৈষম্য হ্রাস করিবার উপায়ঃ আয় ও সম্পদের বৈষম্য বৃদ্ধি কোন দেশের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে, ভারতের মত উন্নয়নকামী দেশের পক্ষে তো নহেই। কারণ ইহা গরিষ্ঠ সংখ্যক দেশবাসীর মধ্যে যে দুর্দশা ও হতাশার সঞ্চার করে তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা কিছুতেই বেগবতী হইতে পারে না। উপরন্তু আয় ও সম্পদবৈষম্যের অত্যধিক বৃদ্ধি দেশে বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। একারণেই ভারতের সংবিধান রচয়িতাগণ দেশে জনকল্যাণ রাষ্ট্র স্থাপনের নির্দেশ দিয়াছেন এবং পরিকল্পনা কমিশন আর্থিক ক্ষমতার অধিকতর সমবণ্টনের লক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রের তরফ হইতেও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু গৃহীত নীতির সহিত কর্মপন্থা ও পদ্ধতির অসংগতি রহিয়া গিয়াছে। এ কারণে, গৃহীত নীতিগুলির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়া উহাদের সহিত সংগতিপূর্ণ কর্মপন্থা গ্রহণের উপরই জোর দেওয়া আবশ্যক। এজন্য—

১. কর ব্যবস্থাকে আরও প্রগতিশীল করিয়া পরোক্ষকর হ্রাস ও প্রত্যক্ষকর বৃদ্ধি করিতে হইবে।
২. মূল্যস্তর বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।
৩. বিভিন্ন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য সংক্রান্ত সরকারী মূল্য নীতির রদবদল করিতে হইবে।
৪. কৃষির ন্যায় শিল্পে ও অন্যান্য আয়ের ক্ষেত্রে আয়ের উপর সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করিতে হইবে।
৫. উচ্চশ্রেণীর অপচয়মূলক, বিলাসব্যয় কঠোরভাবে সঙ্কুচিত করিয়া তদ্দ্বারা তাহাদের অধিক সঞ্চয়ে বাধ্য করিতে হইবে।
৬. সরকারী প্রতিষ্ঠান মারফত সমাজের সঞ্চয়কে আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে হইবে।
৭. বর্তমান প্রশাসনিক যন্ত্রের আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে।
৮. রাজনৈতিক দলগুলিকে বিশেষত শাসকদলকে অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে আচরণে সংযম ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে হইবে।
৯. প্রশাসনিক যন্ত্রকে কার্যকর ও দক্ষতাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে।
১০. কল্যাণমূলক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যগুলি যথাযথরূপে সম্পাদন করিতে হইবে।
১১. দেশে একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠীর উৎসাদন করিতে হইবে।
১২. সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র যথোচিত বেগে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

সর্বোপরি প্রয়োজন দেশে আজ প্রত্যেকের মধ্যে সকলের জন্য দরদ, দায়িত্ব ও আত্ম-সংযম ও শৃঙ্খলা বোধের জাগরণ। আর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন আজ সমবায়ী উদ্যোগের উপর, উৎপাদনের প্রচেষ্টা ও উহার ফলভোগে সকলের সমবেত অংশ গ্রহণের উপর। মুখে আদর্শের প্রতি যে আনুগত্য ঘোষিত হয়, কর্মে তাহার বাস্তব ও একনিষ্ঠ প্রতিফলনের প্রয়োজন। ইহার জন্য অগ্রণী হইতে হইবে তাহাদেরই যাহারা আজ অপর সকলের তুলনায় সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদপুষ্ট হইয়া বিত্ত ও ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করিয়াছেন। ইহার উপর ভারতের ভবিষ্যৎ গতিপথ বিশেষ রূপেই নির্ভর করিতেছে।

৩

কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি
Unemployment and Underemployment

কর্মহীনতা কাহাকে বলে ?
WHAT IS UNEMPLOYMENT ?

দেশের মজুরি ও বেতনের প্রচলিত হারে কাজ করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম ব্যক্তিগণ যখন কাজ খুঁজিয়া পায় না একপ অবস্থাকে অর্থবিদ্যায় কর্মহীনতা বা 'Unemployment' বলা হয়। এইরূপ কর্মহীনতাকে অনিচ্ছাবশত কর্মহীনতা (Involuntary Unemployment) বলে।

কর্মহীনতার সমস্যা বর্তমান যুগের বিরাট অভিশাপ। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী আবিষ্কার, প্রয়োগ বিস্তার যুগান্তকারী উন্নতি, শিল্পদক্ষতার উৎকর্ষ, এ সকলকিছুই মানুষের মনে এই আশারই সঞ্চার করিয়াছিল যে তাহার ন্যূনতম অভাব-অভিযোগের সহজেই সমাধান করা যাইবে—মানুষের জীবনকে অভাবের তাড়না হইতে মুক্ত করিয়া সুখী সুন্দর এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন উচ্চতর জীবনধারায় অভিষিক্ত করিবে। বর্তমান পৃথিবীতে এই সম্ভাবনা আজ আর অলস কল্পনা নহে, বাস্তবে রূপায়ণযোগ্য এই বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু একদিকে যখন পণ্যসামগ্রীর অফুরন্ত চাহিদা এবং উহার উৎপাদনের ক্ষমতা মানুষের আয়ত্তাধীন, তখন অপরদিকে অবিশ্বাস্য হইলেও ইহা সত্য যে, অসংখ্য মানুষ উৎপাদন কর্মে যোগদান করিতে ব্যগ্র হইলেও সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিবিধ অসংগতির জন্য দিনের পর দিন কর্মহীনতার অভিশাপ মাথায় বহন করিতেছে।

কর্মহীনতার কুফল
EVILS OF UNEMPLOYMENT

কর্মহীনতার ফলে সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েই নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজের দিক হইতে কর্মহীনতার অর্থ হইল সামাজিক সম্পদের, বিশেষ করিয়া সর্বাধিক মূল্যবান মানসিক সম্পদের অপচয় এবং ইহার সহিত আনুষঙ্গিকভাবেই অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অব্যবহার। ব্যক্তির দিক হইতে বিচারে দেখা যায় কর্মহীনতা শুধুমাত্র আর্থিক দারিদ্র্যকেই তীব্রতর করিয়া দৈহিক যন্ত্রণাকে অসহ্য করিয়া তোলে তাহা নহে, ব্যক্তির নৈতিক জীবনের উপরেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। গভীর হতাশা ও গ্লানি, চারিত্রিক বিকার, ব্যক্তির নিজের উপর তথা সমগ্র সমাজের উপরে তীব্রতম অনাস্থা ও ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যমে, মানবিক জীবন বলিতে যাহা বুঝায় কর্মহীনতা তাহার সকলই ধ্বংস করিবার বীভৎস মানসিকতা সৃষ্ট করে। তাই কর্মহীনতার প্রতিক্রিয়া যত না দৈহিক, ততোধিক মানসিক ও নৈতিক।[১]

ভারতে কর্মহীনতার সমস্যা
THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN INDIA

নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে ভারতের কর্মহীন ব্যক্তির মোট সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে সরকারী ও অন্যান্য সূত্রে সংগৃহীত তথ্যাদি অসম্পূর্ণ। তবে কোন কোন বেসরকারী বিশেষজ্ঞ মহলের মতে ভারতে বিবিধ শ্রেণীর কর্মহীন ব্যক্তির সংখ্যা ৫—৭ কোটির কম নহে।[২]

হিসাব করা হইয়াছিল যে প্রথম পরিকল্পনার শেষে ৫৩ লক্ষ ব্যক্তি কর্মহীন থাকিয়া

---

১. Beveridge : Full Employment in a Free Society.

২. হিসাব অবস্থ ১৯৫৩-৫৪ সালের। c.f. P. N. Banerjee—Indian Economics. p.523

যাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের পাঁচ বৎসরে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইয়ে [illegible] অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ নূতন কর্ম-সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। পরিকল্পনাকালে আশা করা হইয়াছিল যে কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে ৮০ লক্ষ নূতন কর্ম সৃষ্টি করা যাইবে। কিন্তু বস্তুত প্রায় ৬৫ লক্ষ নূতন কর্ম সৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে কর্মহীন ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৯০ লক্ষ। ইহার উপরে তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াইবে প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষের মত। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে এই পাঁচ বৎসরে কৃষিক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ এবং কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে ১ কোটি ৫ লক্ষ—অর্থাৎ মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ নূতন কর্ম সৃষ্ট হইবে। সুতরাং ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে তিনটি পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তরোত্তর অর্থনীতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণ সত্ত্বেও ১৯৬৫-৬৬ সালে চতুর্থ পরিকল্পনার প্রারম্ভে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ব্যক্তি কর্মহীন থাকিয়া যাইবে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহার কারণ হইল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অর্থনীতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার স্বল্প।

উপরের হিসাবে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ কর্মহীন ব্যক্তিগণকে ধরা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের কর্মহীনতার নানারূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। এখানে পূর্ণ কর্মহীন (totally unemployed) হইতে আরম্ভ করিয়া কর্মে পূর্ণনিযুক্ত (fully employed)-এ দুই সীমার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মহীন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।[১]

ভারত সরকারের হিসাবে আংশিক কর্মহীন ব্যক্তির সংখ্যা বর্তমানে ১ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৮০ লক্ষের মধ্যে।[২]

ভারতে কর্মহীনতার বিভিন্ন রূপ
TYPES OF UNEMPLOYMENT

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের কর্মহীনতার সমস্যার প্রকৃতি ও বিবিধ রূপ বুঝিতে হইলে তত্ত্বগতভাবে কর্মহীনতা কত প্রকার হইতে পারে তাহা মনে রাখা প্রয়োজন। অর্থবিদ্যায় পাঁচ প্রকারের কর্মহীনতার উল্লেখ করা হয়। যথা,

১. **ঋতুগত কর্মহীনতা** (Seasonal Unemployment): ইহা বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা ও যোগানের তারতম্যের জন্য দেখা দেয়।

২. **সংঘাতজনিত কর্মহীনতা** (Frictional Unemployment): একস্থানে কর্মত্যাগ করিয়া অন্যত্র কর্মে যোগ দিতে যে বিলম্ব হয় তাহার দরুন এই প্রকার কর্মহীনতা দেখা দেয়। শ্রমের সচলতার অভাবই ইহার কারণ।

৩. **সাংগঠনিক বা প্রযুক্তি বিদ্যার পরিবর্তনজনিত কর্মহীনতা** (Structural or Technological Unemployment): শিল্পসংগঠনের অথবা উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে এইরূপ কর্মহীনতা দেখা দেয়।

৪. **প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বল্পনিযুক্তি** (Disguised Unemployment or

---

১. সম্প্রতি জাতীয় নমুনা জরীপের সপ্তম সমীক্ষায় কৃষি শ্রমিকগণের লাভজনক কর্মসংস্থানের তথ্য হইতে দেখা যায় যে পুরুষ কৃষি-শ্রমিকগণের মধ্যে ৪ শতাংশ সম্পূর্ণ কর্মহীন, ৫ শতাংশের কর্মের পরিমাণ পূর্ণ কর্মের এক-চতুর্থাংশেরও কম (less than quarter), ৬ শতাংশের কর্মের পরিমাণ পূর্ণ কর্মের এক-চতুর্থাংশ, ১৭ শতাংশের কর্মের পরিমাণ পূর্ণ কর্মের অর্ধাংশ, ১২·৫ শতাংশের কর্মের পরিমাণ পূর্ণ কর্মের তিন-চতুর্থাংশ এবং ৫৪ শতাংশ পূর্ণ কর্মে নিযুক্ত। Seventh Round of the National Sample Survey.

২. Third Five Year Plan. p. 156.

Underemployment) : কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের কর্মশক্তির পূর্ণ ব্যবহার না হইলে তাহাকে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বল্প-নিযুক্তি বলে।

৫. **কারবারীচক্রজনিত কর্মহীনতা** (Cyclical Unemployment) : অর্থনীতিক দিক হইতে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উৎপাদনের চক্রাকার পরিবর্তনের দরুন এই প্রকার কর্মহীনতা দেখা দেয়।

এই সকল নানাবিধ কর্মহীনতা ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশেও কমবেশি মাত্রায় দেখা যায়। অবশ্য প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতাই এই সকল দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারতের কর্মহীনতার সমস্যাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

১. **কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের কর্মহীনতা** (Unemployment in the Agricultural & Rural Sector)।

২. **শিল্প ও শহর অঞ্চলের কর্মহীনতা** (Unemployment in the Industrial & Urban Sector)।

অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত জনশক্তি ও অর্থনীতিক উন্নয়ন
UNUTILISED & UNDERUTILISED MANPOWER AND ECONOMIC GROWTH

বিনিয়োগযোগ্য উপকরণের স্বল্পতাই ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়। বিনিয়োগযোগ্য উপকরণের পরিচিত রূপ হইতেছে নগদ তহবিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার দ্বারা চলতি বাজার দরে যে প্রকৃত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয় করা সম্ভব উহাই প্রকৃত বিনিয়োগযোগ্য উপকরণ (real investible resources)। অর্থাৎ সমাজে যে সকল দ্রব্য, সেবা প্রভৃতি উপকরণ বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষমাণ, সুতরাং অ-নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাই বিনিয়োগযোগ্য উপকরণ বলিয়া গণ্য করা যায়। এই অর্থে কর্ষণযোগ্য পতিত জমি, অলস যন্ত্রপাতি, কর্মহীন ও স্বল্পনিযুক্ত শ্রম প্রভৃতি বিনিয়োগযোগ্য উপকরণ।

ভারতে জমি স্বল্প বটে, কিন্তু এখনও কর্ষণযোগ্য পতিত জমি আছে এবং কর্ষণাধীন জমির আরও উন্নয়নের সুযোগ এবং প্রয়োজনও আছে। অব্যবহৃত অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদও বর্তমান। আর রহিয়াছে প্রচুর পরিমাণে অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত জনশক্তি। অভাব আছে যন্ত্রপাতি, কারিগরি জ্ঞান ও সংগঠনের।

অব্যবহৃত ও স্বল্পব্যবহৃত জনশক্তি ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি অত্যন্ত মূল্যবান বিনিয়োগযোগ্য উপকরণ। উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য যতই ইহা ব্যবহার করা সম্ভব হইবে ততই উহার সাথে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে। ইহার পথে বাধা তিনটি— পুঁজি দ্রব্য ও কারিগরি জ্ঞান, সংগঠন আর কর্মনিযুক্ত থাকাকালে ইহারা যাহা ভোগ করিবে সেই মজুরি-দ্রব্যের (wage-goods)। যথাসম্ভব সহজ ও সাধারণ যন্ত্রপাতি ও কারিগরি জ্ঞান, ন্যূনতম মজুরি-দ্রব্যের সংস্থান করিতে পারিলেই দুইটি প্রধান বাধা অপসারণ করা যায়। ইহার ফলে কর্মসংস্থান ও উৎপাদন উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে। অর্থ বা ঋণের যোগান এই সমাধান আরও সহজসাধ্য করিতে পারে। জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারিলে সমাধান সহজতর হইবে। কর্মহীন ও স্বল্পনিযুক্ত ব্যক্তিরা বর্তমানেই তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের মজুরি-দ্রব্যে ভাগ বসাইতেছে। অথচ উহা সত্ত্বেও ঐ সময়ে তাহারা উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত না থাকায় একদিকে উৎপাদন বাড়িতেছে না, অন্যদিকে সঞ্চয় কমিতেছে। প্রত্যেক অঞ্চলে স্থানীয় কর্মহীন জনশক্তিকে স্থানীয় উন্নয়নকার্যে ব্যবহার ও বিনিয়োগ করিতে

পারিলে নিজপরিবারের সহিত থাকিয়াই তাহারা কাজ করিতে পারে। [illegible] সংস্থানের সমস্যার সমাধান সম্ভব।

কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার সমস্যা
AGRICULTURAL AND RURAL UNEMPLOYMENT

ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মহীনতার মধ্যে তীব্রতা, ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিক দিয়া কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার সমস্যাই সর্বপ্রধান। কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা, কৃষিক্ষেত্র, বাগিচা শিল্প, কুটির এবং গ্রাম্য শিল্প।

কৃষিগত কর্মহীনতা : ১. গ্রামের মোট অধিবাসিগণের ২৯.৪ শতাংশ উপার্জনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১১.৯ শতাংশ উপার্জনকারী হইয়াও পরনির্ভরশীল (earning dependents) এবং বাকি ৫৯ শতাংশ উপার্জনহীন পরনির্ভরশীল (Non-earning dependents)। অর্থাৎ গ্রাম্য জনসাধারণের প্রতি একশত জন ব্যক্তির মধ্যে ৭১ জন আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মহীন।[১] এই প্রকার একটানা ক্রমবর্ধমান গ্রাম্য কর্মহীনতাকে **দীর্ঘমেয়াদী কর্মহীনতা** (Secular Unemployment) বলা যায়।

২. কৃষিগত কর্মহীনতার অপর দিক হইতেছে **মরশুমী কর্মহীনতা** (Seasonal Unemployment)। বিভিন্ন হিসাবে দেখা গিয়াছে যে কৃষকগণ, গড়ে বৎসরে ১৫০ হইতে ২৭০ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ৫ হইতে ৯ মাস পর্যন্ত কর্মহীন অবস্থায় থাকে। কৃষিগত কর্মহীনতার সমস্যা আবার ক্ষুদ্র খামারের মালিক-চাষী ও কৃষি-মজুরগণের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা তীব্র। একটি হিসাবে দেখা যায় যে গড়ে বৎসরে ৪ মাসের জন্য কৃষকগণের ৩৩ শতাংশ ও ৬ মাসের জন্য কৃষি-মজুরগণের ৫০ শতাংশ কর্মহীন থাকিতে বাধ্য হয়।

৩. কৃষিগত কর্মহীনতার তৃতীয় দিক হইল **প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা** (Disguised Unemployment)। সারা বৎসর ধরিয়া কিংবা বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য, যে প্রকার কর্মসংস্থানই কৃষিক্ষেত্রে হউক না কেন, সর্বত্রই দেখা যায় যে, নিযুক্ত কার্যে কৃষকগণের বা কৃষি-মজুরগণের পূর্ণকর্মশক্তি ব্যবহৃত হয় না। এই সমস্যাও ক্ষুদ্রচাষী এবং কৃষি-মজুরগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তীব্র। যেমন, জাতীয় নমুনা জরীপের ৭ম হিসাবে জানা গিয়াছে যে, ক্ষুদ্র চাষিগণের প্রায় ১৮ শতাংশ পূর্ণকর্মে নিযুক্ত নহে। কৃষি-মজুরগণের মধ্যে অস্বল্পভাবে নিযুক্ত পুরুষের অনুপাত ৪১ শতাংশ এবং নারীর অনুপাত ৫৫ শতাংশ।

অন্যান্য কর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া কৃষিনির্ভরশীল ব্যক্তির, বিশেষত কৃষি-মজুরের সংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে যে, কেহ কেহ মনে করেন, এরূপ চলিতে থাকিলে আর কিছু দিনের মধ্যেই কৃষিক্ষেত্রেও শহরাঞ্চলের মত ভয়াবহ প্রকাশ্য কর্মহীনতা (Open unemployment) দেখা দিবে। পশ্চিমী দেশগুলিতে ধনতন্ত্র বিকাশের প্রথম যুগে যে কর্মহীন কৃষকবাহিনী সৃষ্টি হইয়াছিল, ভারতে তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে।

গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে কর্মহীনতা : গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে নিযুক্ত কারিগর ও শিল্পিগণের মধ্যেও কর্মহীনতার সমস্যা কম তীব্র নহে। দেশের মোট ৭০ লক্ষ গ্রাম্য কারিগর ও শিল্পীর মধ্যে কর্মহীনের সংখ্যা ২৩ লক্ষের মত। ঋতুগত এবং প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা, উভয়ই এই শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়।

১. এ কথা মনে রাখিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনের সংখ্যা ২৮ লক্ষ বলিয়া যে সরকারী হিসাব করা হইয়াছে তাহা সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

বাগিচা শিল্পে কর্মহীনতা : ইহাদের তুলনায়, চা-বাগিচা, রবার বাগিচা ও কফি বাগিচাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে কর্মহীনতা তত তীব্র নহে। একটি হিসাবে দেখা যায় বাগিচা শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের তুলনায় কর্মহীনের অনুপাত ৫·৭ শতাংশ মাত্র।

· **মূল কারণ ও সামগ্রিক প্রকৃতি (Main Reasons and Nature) :** ঋতু-নির্ভর কৃষি, উপযুক্ত পার্শ্বজীবিকার অভাব, শিক্ষা ও পুঁজির অভাবে কৃষিকার্যের কারিগরি ও সাংগঠনিক পশ্চাদপদ অবস্থা, যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় পরাস্ত গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের অবনতি এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা—এই পাঁচটিকেই কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা যায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তেজী-মন্দীর ফলে যে ভারতের কৃষিক্ষেত্রে বাণিজ্য-চক্রজনিত কর্মহীনতা একেবারেই সৃষ্টি হয় না তাহা নহে। কিন্তু তাহার প্রতিক্রিয়া তুলনায় অল্প ও সাময়িক। সামগ্রিক বিচারে, কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের দীর্ঘস্থায়ী, একটানা, ঋতুগত এবং প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার মূল কারণ পুঁজির অভাব। ফলে কৃষি ও গ্রাম্য অর্থনীতিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দ্বারা যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম সৃষ্টি কবা যাইতেছে না।

কুটির ও অন্যান্য শিল্পের এবং জীবিকার ধ্বংসের ফলে এবং শিল্প, ব্যবসায় ও অন্যান্য কর্মের সম্প্রসারণের অভাবে গ্রাম্য জনসাধারণ ক্রমেই অধিক পরিমাণে একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হইয়া পড়িতেছে। ডঃ পার্থসারথির মতে ১৯০১ সালে কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যা ৭ কোটি ৩০ লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫১ সালে ৯ কোটি ৮০ লক্ষ এবং ১৯৬১ সালে ১২ কোটি ৫০ লক্ষে পরিণত হইয়াছে।[১] পুঁজি, কারিগরী জ্ঞান ও সাংগঠনিক পরিবর্তনের অভাবে কৃষিক্ষেত্রে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা অল্পলোকেব কাজ করান হইতেছে। ইহাই প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতার প্রধান কারণ। ইহার ফলে কৃষিতে নিয়োগ বাড়িতেছে কিন্তু মোট উৎপাদন আনুপাতিকভাবে বাড়িতেছে না। অতএব এক কথায় বলা যায় যে, কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের কর্মহীনতার মূলসমস্যা হইল কারিগরী বা কাঠামোজনিত কর্মহীনতা এবং স্বল্পনিযুক্তির সমস্যা।[২]

প্রতিকার (Remedies) : কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের কর্মহীনতা মূলগতভাবে ভারতের কৃষিপ্রধান অর্থনীতিক কাঠামোব পুঁজি, কারিগরী ও সাংগঠনিক বিষয় সংক্রান্ত দুর্বলতা হইতে উদ্ভূত। একথা মনে রাখিলে, ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, দেশের কৃষি ও গ্রাম্য অর্থনীতি সহ, অর্থনীতিক কাঠামোর সামগ্রিক রূপান্তর ও ব্যাপক শিল্পায়ন ছাড়া, এই সমস্যার স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব নহে। তবে উহার সহিত অন্যান্য কার্যক্রমও গ্রহণ করা যাইতে পারে। নিম্নে এইগুলি নির্দেশ করা হইল :

১. **সাময়িক কর্ম-সংস্থানের বন্দোবস্ত :** গ্রামাঞ্চলে পতিত জমির পুনরুদ্ধার, খাল খনন, স্থানীয় বাঁধ নির্মাণ, জলনিষ্কাশন, বনরচনা, পথঘাট নির্মাণ ইত্যাদি বিবিধ কর্মে স্থানীয় ভাবে কিছু পরিমাণ কর্ম সৃষ্টি করা যায়।

২. **গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানকেন্দ্র (Employment Exchange) স্থাপন :** শহরের মত গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কর্মহীনদের তালিকা প্রণয়ন ও কোথায়

---

১. Man-power Utilisation Within Agriculture—Dr. G. Parthasarathy. AICC Eco. Review, Jan. 4, 1961.

২. Employment And Underemployment In India—Sunil Guha, AICC Eco. Review, Oct. 15, 1958.

লোকের প্রয়োজন আছে তাহার তথ্য সংগ্রহ করিয়া অন্য কতৃক —
শিল্পাঞ্চলেও কর্মের সংস্থান করা যাইতে পারে।

৩. জনস্থানান্তর (Transference of Population): গ্রামাঞ্চলের স্থান হইতে সংগঠিতভাবে অরণ্য-অধ্যুষিত ও খনি-সন্নিহিত জনবিরল অঞ্চলে কিংবা নবস্থাপিত শিল্প নগরীগুলিতে অধিবাসিগণের বহির্গমন ঘটিলে গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতার সমস্যা দূর হয় ও নূতন স্থানে কর্মহীন ব্যক্তিগণের নিয়োগ ঘটিতে পারে।

৪. প্রগাঢ় কৃষি (Intensive Cultivation): কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ ভারতে সীমাবদ্ধ হওয়ায় এখানে প্রগাঢ় কৃষির গুরুত্ব অধিক। প্রগাঢ় কৃষিতেও অধিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইহার দ্বারা প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বা স্বল্পনিযুক্তির সমস্যা অনেকাংশে দূর হইতে পারে।

৫. ভূমি সেনা (Land Army): সারা দেশে কৃষি-মজুরগণের দ্বারা একটি 'ভূমি সেনা বাহিনী' গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। ইহার ফলে কৃষি-মজুরগণের স্থায়ী কর্মসংস্থান ঘটিবে এবং ইহাদের দ্বারা পরিকল্পিতভাবে বিবিধ কৃষিসংক্রান্ত, সেচসংক্রান্ত ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করা যাইতে পারে।

৬. কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের সম্প্রসারণ (Expansion of Agro-industries): কৃষির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ও সংশ্লিষ্ট বিবিধ ক্ষুদ্রশিল্প যথা, ঢেঁকি, গমভাঙা কল, ঘানি, হাঁসমুরগী পালন, মৎস্যচাষ, পশুপালন, আচার-মোরব্বা ও চাটনি তৈয়ার, ফল টিনে ভর্তিকরণ (fruit canning), মৌমাছি পালন প্রভৃতি কর্মের বিস্তার দ্বারা প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা দূর ও নূতন কর্মসৃষ্টি করা সম্ভব।

৭. গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন: ইহা গ্রাম্যশিল্পী ও কারিগরগণের প্রচ্ছন্ন কর্মসংস্থান দূর করিতে ও ক্রমবর্ধমান গ্রাম্য অধিবাসিগণের জন্য নূতন কর্ম সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

৮. গ্রামীণ ঋণদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, গুদাম নির্মাণ, পথঘাটের সম্প্রসারণ, কৃষি ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয়পদ্ধতির উন্নতি, পরিবহণের উন্নতি, সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা, কৃষিকার্য, কুটির ও গ্রামীণ শিল্পসমূহের যেমন উন্নতির সহায়ক হইবে তেমনি নূতন কর্ম সৃষ্টিও করিতে পারিবে।

কিন্তু যে দুইটি বিষয়ের উপর এই সমস্যার মূল সমাধান নির্ভর করে তাহা হইল—

৯. কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠন (Reconstruction of Agriculture: ক্ষুদ্রাকার জোতের সমস্যা সমাধানের জন্য সমবায় খামার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহার দ্বারা পথঘাট, পরিবহণ ও সেচের উন্নতির সর্বাধিক সুবিধা আদায় করা যাইবে। কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাইবে এবং কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমশক্তির সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভব হইবে। এইরূপে মৌলিক সাংগঠনিক অন্যান্য পরিবর্তন ঘটাইয়া কৃষিতে স্বল্প নিযুক্তির স্থায়ী সমাধান সম্ভব। এবং,

১০. যন্ত্রশিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ (Rapid Industrialisation): দেশে যতই যন্ত্রশিল্প উন্নতি লাভ করিবে ততই কৃষি ও গ্রামাঞ্চল হইতে অধিকতর সংখ্যায় কর্মপ্রার্থী আকৃষ্ট হইয়া শিল্পে নিযুক্ত হইবে। এইরূপে প্রাথমিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র হইতে অপসারিত, উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ঘটিবে। ভারতে প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু শিল্পোন্নতির হার পরিকল্পনার বিগত দশকে যথেষ্ট হওয়ায় কৃষিগত কর্মহীনতার তীব্রতা প্রশমিত হয় নাই।

শিল্প ও শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার সমস্যা
THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN THE INDUSTRIAL-CUM-URBAN SECTOR

শিল্প ও শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে কর্মহীনতার সমস্যা ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে নূতন। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে শিল্পায়ন প্রচেষ্টার সহিত ইহার সূত্রপাত ঘটিয়াছে। কিন্তু শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিল্পায়নের মন্দগতির জন্য এই সমস্যার বিশেষ তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় নাই। যদিও বিশেষ বিশেষ শিল্পে আন্তর্জাতিক বাজারের তেজী-মন্দীর প্রভাবে কর্মহীনতার সমস্যা যে দেখা দেয় নাই তাহা নহে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা, কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন, কৃষি-মজুর শ্রেণীর দ্রুত বৃদ্ধি, জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছাড়িয়া জনসাধারণের শহরের দিকে যাত্রা ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে, শিল্প ও শহরাঞ্চলে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে। কিন্তু শহরাঞ্চলের শিল্পসমূহে যথেষ্ট পরিমাণে নূতন কর্মসৃষ্টি না হওয়ায় বর্তমানে শিল্প ও শহরাঞ্চলের কর্মহীনতার সমস্যা দিনের পর দিন তীব্র হইয়া দেখা দিতেছে। সংক্ষেপে ইহাই শিল্প ও শহরাঞ্চলের কর্মহীনতার আধুনিক সমস্যার কাহিনী।

কৃষি ও গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শিল্প ও শহরাঞ্চলের কর্মহীন ব্যক্তিগণের তথ্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।[১] কারণ শহর ও শিল্পাঞ্চলের অনেক স্থানে সরকারী কর্মসংস্থান কেন্দ্র (Employment Exchange) রহিয়াছে। ১৯৬৩ সালে ভারতে এরূপ কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৩৫২। এই সকল কেন্দ্রে প্রতি বৎসর কর্মপ্রার্থিগণের নাম ও অন্যান্য বিবরণ তালিকাভুক্ত করা হয়। ইহা ছাড়া জাতীয় নমুনা জরীপ (National Sample Survey) কর্তৃক দেশের কর্মহীনতার সমস্যা সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা শিল্প ও শহরাঞ্চলের কর্মহীনতার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারি :

বৈশিষ্ট্য (Features) : ১. দেশে কর্মহীন ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে : কর্মসংস্থান কেন্দ্রে, কর্মের সংস্থান করা যায় নাই এরূপ তালিকাভুক্ত ব্যক্তির মোট সংখ্যা (Persons on the Live Register) ১৯৫৬ সালে ছিল ৭.৫৮ লক্ষ। ১৯৬৩ সালে উহা ২৬ লক্ষে পরিণত হয়। এই তালিকা অসম্পূর্ণ।

২. ইহা আসলে কাঠামোগত বা প্রযুক্তি বিভাগত কর্মহীনতা : তালিকাভুক্ত কর্মহীনদের প্রায় ৭০ শতাংশ (৬৯.৭%) ব্যক্তির শিল্পকার্যে কোন শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা নাই। অর্থাৎ ইহাদের অধিকাংশই গ্রাম হইতে আগত কৃষি-মজুর ও গ্রাম্য কারিগর। উৎপাদন পদ্ধতি ও সংগঠনের পরিবর্তনের ফলে ইহারা চিরাচরিত জীবিকা হইতে বিতাড়িত কিন্তু নূতন শিল্পে উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে ইহারা কর্মহীন।

তালিকাভুক্ত অভিজ্ঞ শ্রমিকগণের অনুপাত মোট ১৮ শতাংশ (১৮.১৪%) এবং পরিচালনা ও উচ্চতর পর্যায়ের কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুপাত মাত্র ৪ শতাংশ (৪.৪%)।

৩. ব্যাপকভাবে অল্পনিযুক্তির (Underemployment) অস্তিত্ব : জাতীয় নমুনা জরীপের কর্মহীনতার সমস্যা সম্বন্ধে প্রাথমিক রিপোর্টে (১৯৫৭) দেখা যায়—৫০ হাজার ও তদূর্ধ্ব সংখ্যক ব্যক্তি বাস করে, ভারতের এরূপ শহরগুলিতে মোট অধিবাসিগণের ¾ অংশ উপার্জনহীন পরনির্ভরশীল, বাকী ¼ অংশ মাত্র উপার্জনকারী। এই উপার্জনকারীদের মধ্যে লাভজনক কার্যে (gainfully employed) নিযুক্ত মাত্র ১৩ শতাংশ (১২.৮৩%) ব্যক্তি।

৪. শিক্ষিত কর্মহীনের ক্রমাগত বৃদ্ধি : ১৯৫৫-৫৬ সালে জাতীয় [illegible] প্রাথমিক হিসাবে শিক্ষিত কর্মহীনের মোট সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৫০ হাজার। উক্ত হিসাবে বলা হইয়াছিল যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নূতন শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর আনুমানিক সংখ্যা হইবে ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট ১২ লক্ষ শিক্ষিত কর্মহীনের জন্য নূতন কর্ম সৃষ্ট হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। সেই লক্ষ্য পূর্ণ হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে ১৯৬০-৬১ সালে পুরাতন কর্মহীনদের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৬০ হাজার রহিবে।[১] তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্টে শিক্ষিত কর্মহীনের সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।[২]

কর্মহীনতা ছাড়াও শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যাপক স্বল্পনিযুক্তির অস্তিত্ব বর্তমান। ইহাদের মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, কেরল, বোম্বাই ও দিল্লীতে গ্র্যাজুয়েট কর্মহীনদের ব্যাপকতা অধিক।[৩] শিক্ষিত বেকারগণের মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়ই বর্তমান।

কারণসমূহ (CAUSES) : ১. গ্রামাঞ্চলে জমিহীন কৃষি-মজুরের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জীবিকার অভাবে ইহারা ক্রমাগত শিল্পাঞ্চলে ভিড় করিতেছে।

২. দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কাল হইতে শিল্পায়নের দ্রুত প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইলেও যে হারে শিল্পে কর্মপ্রার্থীর ভিড় বাড়িতেছে উহার তুলনায় শিল্পায়নের হার যথেষ্ট নহে।

৩. গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সুষমভাবে শিল্প সম্প্রসারণ ঘটে নাই। কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি অল্প কয়েকটি স্থানেই অত্যধিক পরিমাণে শিল্পের কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে দেশের সুবিস্তৃত অংশে কোন শিল্পেরই বিকাশ ঘটে নাই। এইরূপ চিন্তাবিহীন শৃঙ্খলাহীন ভাবে শিল্পপ্রসার দেশের কর্মহীনতার সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

৪. ভারতীয় শিল্পগুলির উৎপাদন ব্যয় অধিক। ইহার কারণ পুরাতন যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতির ব্যবহার এবং শ্রমিকগণের দক্ষতার অভাব। উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ায়, বাজারের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা শিল্পগুলির অল্প। এজন্য যখনি মন্দা দেখা দেয় তখন উৎপাদন হ্রাস ও শ্রমিক ছাঁটাই করা ব্যতীত অন্য উপায় থাকে না।

৫. প্রধানত উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ার জন্যই ভারতের রপ্তানি শিল্পগুলিও বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় সুবিধা করিতে পারে না। তাহার ফলে রপ্তানি শিল্পে সংকোচন ঘটে ও উহাতে নিযুক্ত শ্রমিকগণের কর্মসংস্থান হ্রাস পায়। ইহাতে অন্যান্য দেশী শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যায় ও ঐ সকল শিল্পেও উৎপাদন হ্রাস ও শ্রমিক ছাঁটাই ঘটে। এইরূপে দেশের মধ্যে মোট কর্মসংস্থান হ্রাস পায়।

৬. বর্তমানে দেশে সূতী বস্ত্র ও পাট প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পে যে শিল্প সংস্কারের (Rationalisation) প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাও দেশে কর্মহীনতার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দায়ী। কারণ, শিল্প সংস্কার ব্যবস্থায় পূর্বাপেক্ষা কম শ্রমিক লাগে।

৭. দেশে বর্তমানে যে মুদ্রাস্ফীতি চলিতেছে তাহার দরুন সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও প্রকৃত আয় হ্রাস পাইতেছে। ইহার ফলে দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া শিল্পে

১. Second Five-Year Plan p. 121

২. Thir Five-Year Plan Summary p. 52

৩. Report of the Man-power Division of the Directorate of Employment Exchanges, May, 1957.

মজুত পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার দরুন উৎপাদন সংকোচন ও শ্রমিকগণের কর্মচ্যুতি ঘটিতেছে।

৮. সর্বোপরি কৃষিতে নিযুক্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির আয় ও ক্রয়-ক্ষমতা এখনও অত্যন্ত নিম্ন বলিয়া যন্ত্র শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। ফলে শিল্পের উৎপাদন ও তজ্জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব হইতেছে না।

প্রতিকার (Remedies) : ভারতে কর্মহীনতার যে দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ কর্মের অভাব এবং স্বল্পনিযুক্তি (Lack of employment opportunity and under-employment), তাহা শিল্প ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণভাবে বর্তমান। এবং ইহার মূল চরিত্র হইতেছে কাঠামোগত বা প্রযুক্তিবিদ্যাগত কর্মহীনতা। অর্থাৎ উপযুক্ত পুঁজিদ্রব্য এবং কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবই এই কর্মহীনতার মূল কারণ। অবশ্য, কোন কোন সময়ে বাজারের তেজী-মন্দীর চক্রাকার গতির জন্যও বিদেশী বাজারের উপর নির্ভরশীল শিল্পসমূহে কর্মহীনতার সমস্যা সৃষ্টি হয়। তবে ইহার প্রকোপ তুলনায় অল্প। নিম্নে সংক্ষেপে ইহাদের সমাধানগুলি আলোচনা করা হইল।

১. বিশেষ বিশেষ শিল্পে **সাময়িক মন্দার দরুন যখন কর্মহীনতার সমস্যা প্রবল হইয়া উঠে তখন সরকারী উদ্যোগে বিবিধ সাময়িক কর্মসূচী**, যথা—গৃহাদি নির্মাণ, রাজপথ তৈয়ার, বাঁধ ও সেচকার্য প্রভৃতি দ্বারা সাময়িকভাবে কর্মহীন ব্যক্তিগণের কর্মসংস্থান করা যাইতে পারে।

২. **দ্রুতহারে শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা** এবং ব্যাপকভাবে শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করাই হইল দেশে স্থায়িভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথ। তৃতীয় পরিকল্পনাকে আত্মনির্ভর শিল্পসম্প্রসারণের যাত্রারম্ভের পর্যায় (Take off stage) বলা হইয়াছে। ইহাতে সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই আরও অধিক পরিমাণে বিনিয়োগের বরাদ্দ করা হইয়াছে।

৩. শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য **পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উন্নতি, ব্যবস্থাপনা-কাঠামোর পরিবর্তন** (change of management structure), **শ্রমিকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি** প্রভৃতির দ্বারা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও উৎপন্নের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা উচিত। ইহা দ্বারা শিল্পগুলির প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে দেশে ও বিদেশে বাজারের সম্প্রসারণের সাহায্যে অধিক কর্মসংস্থান সম্ভব হইবে।

৪. শ্রমিক ও শিক্ষার্থিগণের জন্য **কারিগরী শিক্ষা ও শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারের দ্বারা** কর্মপ্রার্থিগণের শিল্পে কর্মলাভের যোগ্যতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহাতে উপযুক্ত ব্যক্তিগণের কর্মসংস্থান সহজ হইবে।

৫. **বৃহৎ শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের** মধ্যে উৎপাদনের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট ভাবে বিভক্ত করিয়া পরস্পরের **মধ্যে উৎপাদন কার্যক্রমের সংযোগ প্রতিষ্ঠা** করা উচিত। ইহাতে স্বল্পব্যয়ে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রাংশও ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। ইহার ফলে সকল প্রকার শিল্পের সুষম প্রসারের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে।

৬. দেশের **যে সকল অঞ্চলে জনবসতি ও যথেষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার সম্পদ বর্তমান, অথচ কোনরূপ শিল্পের বিকাশ ঘটে নাই, তথায় আঞ্চলিকতা সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা** আঞ্চলিক কর্মহীনতার সমস্যা করা যায়। শুধু তাহাই নহে, ইহার ফলে আঞ্চলিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটিলে আঞ্চলিক

ব্যবসায়েরও উন্নতি ঘটিবে। তাহাতে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হইবে।

শিক্ষিত কর্মহীনের সমস্যা
THE PROBLEM OF THE EDUCATED UNEMPLOYED

ভারতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে কর্মহীনতা লক্ষ্য করা যায় তাহা একান্তভাবেই শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্তশ্রেণীর সমস্যা। ইদানীংকালে এ সমস্যার প্রবলতা বৃদ্ধি পাইলেও অতীতে, বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় এবং চতুর্থ দশকেও ইহা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নানাভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার তীব্রতা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এবং বিশেষত দেশ-বিভাগের পরবর্তীকালে পুনরায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত কর্মহীনদের সমস্যা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ইহা ক্রমশই ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে।

কারণ (Causes): ১. দেশে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের ফলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে।

২. এই সকল শিক্ষিত কর্মপ্রার্থিগণ যে ধরনের শিক্ষালাভ করিতেছে তাহা কর্মক্ষেত্রে তাহাদের উপযোগী নহে। বর্তমানে শিক্ষাদানব্যবস্থা সম্পূর্ণ পুঁথিগত হওয়ায় শিক্ষার্থিগণ শুধু চাকরির উপযোগী শিক্ষা লাভ করে। বাস্তব কর্মজগতে তাহারা আত্মনির্ভরশীল হইবার শিক্ষা পায় না। সুতরাং অধিকাংশই পরীক্ষা পাসের পর চাকরি অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়।

৩. দেশে যে হারে চাকরিপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, অনুরূপভাবে চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না।

প্রতিকার (Remedies): ১. বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগী পরিবর্তন অর্থাৎ নিছক তত্ত্বগত শিক্ষার পরিবর্তে **বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার প্রসার চাই।** এরূপ শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চাকরির পরিবর্তে অন্যান্য জীবিকা গ্রহণ করিয়া উপার্জনক্ষম হইবে।

এই প্রস্তাবটির মধ্যে সারবত্তা থাকিলেও, এই প্রশ্ন উঠিবে যে, যদি শিক্ষার ত্রুটির জন্যই আমাদের দেশে শিক্ষিতের কর্মহীনতা সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ঐ ত্রুটি দূর করিয়া বিবিধ বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিলেই যদি কর্মহীনতা দূর হয়, তবে দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মহীনতার অস্তিত্বকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে? একথা সত্য যে, শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মপ্রার্থীর যোগান যদি উহার চাহিদাকে ছাড়াইয়া যায় তবে কর্মহীনতার সমস্যা দেখা দিবেই। তাহা না হইলে আমাদের দেশেই বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশাতে কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি কি করিয়া দেখা দেয়? এবং ইয়োরোপে ও আমেরিকায়ই বা শ্রমিক কর্মিগণের মধ্যে কর্মহীনতা দেখা যায় কেন? আজ যদি সাধারণ শিক্ষার পরিবর্তে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অধিক ব্যবস্থা হয় তবে আগামীকাল সাধারণ শিক্ষিত কর্মহীনের সমস্যার পরিবর্তে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর ও র কর্মহীনতার সমস্যাই প্রধান হইয়া উঠিবে। সুতরাং শুধুমাত্র বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট নহে।

২. **ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে শিক্ষিত কর্মহীনগণের অন্যতম সমাধান।** বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের

[illegible] ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায় তাহাদের আত্মনিয়োগ, তাহাদের দ্বারা নানাপ্রকারের যন্ত্রপাতি তৈয়ার ও মেরামতি কারখানা স্থাপন, শহর ও গ্রামাঞ্চলে [illegible]ভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্মহীন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ, জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে যতবেশি সম্ভব শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিয়োগ, পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষিত কর্মহীনতার সমস্যা অনেকখানি দূর করা যায়। দেশের মধ্যে ব্যাঙ্কিং ও বীমা ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ হইলে যথেষ্ট নূতন কর্ম সংস্থান হইতে পারে। এক কথায় তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক কার্যাবলী (Tertiary sector) দেশে যতই বিস্তার লাভ করিবে ততই শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কর্মহীনতা হ্রাস পাইবে।

৩. **দ্রুতহারে শিল্পায়ন ও অর্থনীতিক উন্নয়ন** দেশের শিক্ষিত কর্মহীনতার সমাধানের প্রধান উপায়। ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা অল্প। এই অবস্থাতেই যখন শিক্ষিত কর্মহীনতার সমস্যা দেখা দিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে অর্থনীতিক কাঠামোর ত্রুটিই তজ্জন্য দায়ী, শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা নহে। প্রকৃত পক্ষে দেশে আরও অধিক শিক্ষিত ব্যক্তি প্রয়োজন এবং শিক্ষাব প্রসার অর্থনীতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। অতএব মূলত ব্যাপকভাবে দেশের সর্বস্তরেব অর্থনীতিক কার্যাবলীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ দ্বারা ক্রমবর্ধমান সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির নানাক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সম্ভব হইবে। এই অর্থনীতিক উন্নতির মূলভিত্তি হইতেছে শিল্পোন্নয়ন।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান
FIVE YEAR PLANS AND EMPLOYMENT

প্রথম পরিকল্পনা : পরিকল্পনা কমিশনের মতে অর্থনীতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য যদি প্রধানত শ্রমনিবিড় (labour inten-ive) উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভর করা হয় তবে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে কর্মহীনতার সমস্যা সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে হইলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। অল্পসময়ের মধ্যেই দেশে কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তির অবসান ঘটাইয়া পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে।

প্রথম পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য হিসাবে প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ক. যথাসম্ভব পরিমাণে কর্মহীন ব্যক্তিগণকে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের কার্যে আকৃষ্ট করা। খ. শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ইহার সহিত পরিকল্পনা কমিশন আরও যে সকল নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা হইল পুঁজিগঠনের হার ও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, শিল্পগুলিতে পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তন করিতে গিয়া দেখিতে হইবে যেন উহাতে কর্মহীনতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি না পায়। অর্থনীতিক সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য নূতন নূতন উৎপাদন ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করিতে হইবে।

কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় সাধারণ উন্নয়নের কার্যক্রম ছাড়া কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য পৃথক কোন কার্যক্রম গৃহীত ও তজ্জন্য পৃথক কোন ব্যয় বরাদ্দ হয় নাই। পরে দেশে কর্মহীনতার পরিমাণ অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহার প্রশমনের জন্য ১৭০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ও একটি এগারো দফা কর্মসূচী গৃহীত হয়। অল্প আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণ, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প, পথনির্মাণ, অরণ্য রচনা, ভূমি সংরক্ষণ, নূতন জমিতে সমবায় ও উপনিবেশ স্থাপন, ক্ষুদ্রশিল্প ও ব্যবসায়ে সাহায্য প্রদান, বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা শিক্ষক নিয়োগ বৃদ্ধি, পথ

পরিবহণের সম্প্রসারণ, শরণার্থীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সুযোগ-সুবিধা [illegible] কার্যক্রম গ্রহণ করিয়া কর্মহীনতার চাপ লাঘবের চেষ্টা করা হয়। সামগ্রিকভাবে প্রথম পরিকল্পনাকালে সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট ৪৫ লক্ষ নূতন কর্ম সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ব্যবসায় ও বাণিজ্যে সৃষ্ট কর্ম ধরা হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা : কিন্তু এ সকল চেষ্টা সত্ত্বেও প্রথম পরিকল্পনাকালে কর্মপ্রার্থিগণের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে শহরাঞ্চলের কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা ছিল অন্তত ২৫ লক্ষ। সে সময় গ্রামাঞ্চলের কর্মহীনদের সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ। অতএব দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মোট পুরাতন কর্মহীনদের সংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ। পরিকল্পনা কমিশনের ধারণা ছিল ইহার সহিত শহরাঞ্চলে ৩৮ লক্ষ ও গ্রামাঞ্চলে ৬২ লক্ষ নূতন কর্মপ্রার্থী যোগ দিবে। সুতরাং নূতন কর্মপ্রার্থিগণের সংখ্যা হইবে ১ কোটি। অতএব দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নূতন ও পুবাতন, সর্বমোট কর্মপ্রার্থীব সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ। এই হিসাবে অবশ্য স্বল্পনিযুক্ত (underemployed) ব্যক্তিগণকে ধরা হয় নাই।

অধিক পরিমাণে কর্ম সৃষ্টি করা দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান চারিটি লক্ষ্যের অন্যতম বলিয়া গৃহীত হয়। ইহার অনুসরণে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশন, বিবিধ নির্মাণকার্য, পরিবহণ ও সংসরণ, শিল্প ও খনি, কুটিব ও ক্ষুদ্রশিল্প, জাতীয় সম্প্রসারণ, সেবাকার্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অন্যান্য সেবামূলক কর্ম ও সরকাবী চাকরিতে মোট ৫১ লক্ষ ৯৯ হাজার ও ব্যবসায় এবং বাণিজ্যে ২৭ লক্ষ ৩৪ হাজার, অর্থাৎ মোট প্রায় ৭৯.৮০ লক্ষ নূতন কর্ম সৃষ্টির লক্ষ্য গ্রহণ কবেন। ইহা ছাড়া তাঁহারা আশা কবিয়াছিলেন যে গ্রামাঞ্চলে শারীরিক শ্রমে পতিত জমির পুনরুদ্ধার, কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর সংস্থার বিবিধ কার্যক্রম, ফলের ও ফুলের চাষ, বাগিচা উন্নয়ন প্রভৃতির দ্বারা ১৬ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থান ঘটিবে। আর, সেচের সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতির দ্বারা স্বল্প-নিযুক্তি অনেকাংশে দূর হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির কৌশল নির্বাচন (Choice of technique) : পবিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্বাধিক পরিমাণে কর্মসৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নূতন কর্মসৃষ্টির কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলিয়াছিলেন। দেশে তুলনামূলক ভাবে শ্রমের প্রাচুর্য থাকায় উৎপাদনকর্মে কমিশন শ্রমনিবিড় পদ্ধতি (labour intensive techniques) অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন। তবে তাঁহারা ইহাও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও উৎপাদন পদ্ধতি নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে। এবং কতক ক্ষেত্রে, যেমন ভারী শিল্পের বেলায়, পুঁজি নিবিড় (Capital intensive) উৎপাদন পদ্ধতি ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু কৃষি, গৃহাদি নির্মাণ ও পূর্ত কার্যের অনেক ক্ষেত্রে এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে শ্রমনিবিড় পদ্ধতি বিস্তারের সুযোগ রহিয়াছে। দেশীয় বিবিধ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পেব দক্ষতা বৃদ্ধির দ্বারা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব। ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য এই জাতীয় শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। ভারতের মত অনুন্নত দেশে কর্মহীন ব্যক্তিগণকে পাশ্চাত্যের মত বেকারভাতা প্রদান করা সম্ভব নয়। এজন্য শ্রমনিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির অসুবিধা সত্ত্বেও উহা যথাসম্ভব ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্টে আঞ্চলিক ভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার উপরও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। দেশের সর্বত্র কর্মসংস্থানের অবস্থা একরূপ নহে। কোন কোন অঞ্চলে, পূর্ণ ও আংশিক কর্মহীনতার চাপ অধিক। এই সকল সংকটাপন্ন অঞ্চলে

areas) কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য এই কার্যে প্রচেষ্টার সাফল্য স্থানীয় জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। পরিকল্পনা কমিশন পরামর্শ দিয়াছিলেন যে এজন্য—

১. সংকটাপন্ন অঞ্চলসমূহে যথাসম্ভব সরকারী উদ্যোগে বিবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপন; ২. স্থানীয় কারবারী ও শিল্পপতিগণকে সুবিধাজনক শর্তে ঋণদান; ৩. স্থানীয় ব্যক্তিগণের জন্য সরকারী কার্যের ঠিকাদারীর একাংশ সংরক্ষণ; এবং ৪. স্থানীয় অঞ্চলে পুঁজি আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা (fiscal measures) গ্রহণ করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া অবশ্য জনস্থানান্তরের (migration) বিষয়টিও বিবেচনার মধ্যে রাখা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসংস্থান : দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতির বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহাতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত, কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে মোট প্রায় ৬৫ লক্ষের মত নূতন কর্ম সৃষ্টি করা গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য ছিল ৮০ লক্ষ। সুতরাং লক্ষ্যানুযায়ী ফল লাভ করা যায় নাই।

তৃতীয় পরিকল্পনা : দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী হিসাবে পুরাতন ও নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় ৬৫ লক্ষ ব্যক্তির কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ঘটায়, পরিকল্পনার শেষে অবশিষ্ট কর্মহীনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৯০ লক্ষের (৮৮ লক্ষ) মত। তদুপরি তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা হইবে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ। ইহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ ৫৬ লক্ষেরও অধিক) শহরাঞ্চলের ও ১ কোটি ১৪ লক্ষ গ্রামাঞ্চলের কর্মহীন। ইহা ছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে স্বল্পনিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যাও আনুমানিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৮০ লক্ষের মত। অতএব দেশে মোট প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষের মত সম্পূর্ণ কর্মহীন ও আংশিকরূপে নিযুক্ত ব্যক্তির গুরুভার লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কর্মহীনের সংখ্যা	৯০ লক্ষ
তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা	১ কোটি ৭০ ,,
আংশিকরূপে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা	১ কোটি ৮০ ,,
	মোট ৪ কোটি ৪০ লক্ষ

তৃতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের লক্ষ্য : পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে ১ কোটি ৫ লক্ষ এবং কৃষিক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ নূতন কর্ম সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে বলিয়া হিসাব করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষেও পুরাতন সম্পূর্ণ কর্মহীন ও আংশিকরূপে নিযুক্ত ৩ কোটি ব্যক্তি থাকিয়া যাইবে। অতএব কর্মসংস্থান বিষয়ে তৃতীয় পরিকল্পনা আমাদের সম্মুখে কোনরূপ আশার আলোকবর্তিকা তুলিয়া ধরিতেছে না।

তৃতীয় পরিকল্পনায় নূতন কর্মসৃষ্টির পদ্ধতি :[১] পরিকল্পনা কমিশন কর্মহীনতার সমস্যাটিকে নিম্নরূপে সমাধানের প্রস্তাব করিয়াছেন।

১. পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমগুলিতে যাহাতে পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও সুষমরূপে কর্মসংস্থান ঘটে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

১ Third Five-Year Plan—Summary pp 50-53

২. গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রসার, গ্রামীণ শিল্প উপনিবেশের (rural estates) উন্নয়ন, গ্রাম্য শিল্পসমূহের উৎসাহ দান এবং মানবশক্তির নূতন (redeployment of man-power) প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

৩. ২৫ লক্ষ অথবা ততোধিক ব্যক্তির জন্য যাহাতে বৎসরে গড়ে ১০০ দিন কার্যের সংস্থান হয় সেজন্য নানা প্রকার গ্রামীণ কার্যক্রম (rural work programme) গ্রহণ করিতে হইবে।

৪. প্রতি রাজ্যের কর্মহীনতার সমস্যাকে জেলা ব্লক এবং গ্রাম ভিত্তিতে বিভক্ত করিয়া স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত যথাসম্ভব মিলাইয়া কর্মস্থান বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে।

৫. সম্ভবমত রাস্তা নির্মাণ ও পূর্ত কার্যাদিতে শ্রমনিবিড় পদ্ধতিই গ্রহণ করিতে হইবে।

৬. গ্রামীণ শিল্পায়ন ও গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ—এই দুইটি পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত। এবং ইহারা উভয়ে মিলিয়া যথেষ্ট পরিমাণে স্থায়ী গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিতে সমর্থ। ইদানীংকালে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পসমূহের উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হইলেও পরিকল্পনা কমিশনের মতে ইহাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাব্য ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা যায় নাই। এজন্য ইহাদের যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচামাল, সস্তায় ঋণের বন্দোবস্ত, বিক্রয় ব্যবস্থার সংগঠন ও প্রসার এবং কাঁচা উৎপন্নকে তৈয়ারী পণ্যে প্রস্তুতের জন্য বিবিধ প্রক্রিয়ার (Processing) প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মফঃস্বলের এক একটি অঞ্চলের ছোট ছোট শহরে কেন্দ্রীয়ভাবে অবস্থিত গ্রামগুলিতে শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করিয়া পরিবহণের উন্নতির দ্বারা উহাদের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৭. স্বল্পনিযুক্তির (underemployment) সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সর্বত্র বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থা এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈচিত্র্যকরণ ও শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে। এজন্য গ্রামীণ শিল্পসমূহের অধিকতর উন্নয়ন, বিবিধ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত শিল্পের (Processing industries) প্রসার ও গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্প আকর্ষণ করিতে হইবে। ইহার সহিত যে সকল অঞ্চল জনাধিক্য ও কর্মহীনতা এবং স্বল্পনিযুক্তির অত্যধিক চাপে সংকটাপন্ন তথায় সামগ্রিক লোক-নিয়োগ কার্যক্রম (comprehensive works programme) গ্রহণ করিতে হইবে। ব্লক ও গ্রাম ভিত্তিতে নানাবিধ কার্যে অলস-কৃষিঋতুতে কর্মসংস্থান করাই ইহার লক্ষ্য হইবে। ইহার জন্য আনুমানিক ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

৮. পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন ইদানীং শিক্ষিত কর্মহীনদের মধ্যে শারীরিক শ্রম সম্পর্কে পূর্বের বিরোধী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান পরিবর্তনের ফলে দ্রুত শিল্পায়নের সহিত নানাক্ষেত্রে ইহাদের জন্য কর্মসংস্থানের প্রসার সম্ভব হইবে। সমবায় সমিতির প্রসার, বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রচলন ও পঞ্চায়েত প্রভৃতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠার দ্বারা গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত কর্মহীনগণের জন্য কর্মসৃষ্টি ঘটিবে।

৯. যে সকল প্রকল্পের কাজ শেষ হইয়া আসিতেছে তথা হইতে দক্ষকারিগরগণকে নূতন প্রকল্পে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে অ-কৃষি ক্ষেত্রে ৩২ লক্ষ ব্যক্তির কর্মসংস্থান ঘটিয়াছে।

8

প্রাকৃতিক সম্পদ
Natural Resources

অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণে অভাবপূরণের নিমিত্ত সম্পদ উৎপাদনের যে দুইটি মৌলিক উপাদানের নির্দেশ করা হয় তাহার একটি প্রাকৃতিক সম্পদ ও অপরটি মানুষের শ্রম। সংক্ষেপে প্রথমটিকে ভূমি (Land) ও দ্বিতীয়টিকে শ্রম (Labour) বলা হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন
NATURAL RESOURCES AND ECONOMIC DEVELOPMENT

ভারতের বা যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমস্যাবলীর পর্যালোচনা করিবার পূর্বে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের অনুসন্ধান লওয়া এজন্যই প্রয়োজন যে উহার পরিমাণ, প্রকৃতি ও অবস্থা, জাতীয় আয় ও দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পরিমাণ ও ধরনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। জাতীয় আয় বৃদ্ধি, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পসমূহসহ অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বৈচিত্র্যকরণ,—এক কথায় দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগ-সম্ভাবনা অনেকাংশে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। এই কারণে, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিবিধ সমস্যার আলোচনার পূর্বে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত থাকা আবশ্যক।

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা আলোচনায় কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, উহার প্রাকৃতিক সম্পদগুলির মোট পরিমাণ ও গুণাগুণ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও শেষ কথা নহে। উহা দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সীমা নির্দিষ্ট হয় না। ঐ সকল সম্পদ কাজে লাগাইবার জন্য দেশে প্রযুক্তি বিদ্যা (Technology) বা কারিগরী জ্ঞান কোন্ স্তরে রহিয়াছে, উৎপাদনের সংগঠন কি প্রকারের, সরকারী নীতি ও দক্ষতা কিরূপ, এবং সাধারণ ভাবে ঐ দেশের সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি কি,—এই সকল বিষয় প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। ইহাদের তারতম্যের দরুন এক পরিমাণ ও গুণাগুণবিশিষ্ট সম্পদের পূর্ণতর অথবা স্বল্পতর ব্যবহার ঘটিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, কেবল প্রাকৃতিক সম্পদগুলির পৃথক পৃথক পরিমাণ দ্বারা জাতীয় সমৃদ্ধিতে উহাদের সম্ভাব্য অবদান অনুমান করা যায় না। কারণ একের উৎপাদন ও ব্যবহার, অপরাপর প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদন ও ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ঐ সকল প্রাকৃতিক সম্পদগুলির নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান। অতএব বিবিধ প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও ব্যবহারের দ্বারাই উহাদের প্রত্যেকটি হইতে পূর্ণতর ফল লাভ করা যায়।

দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের কতটা পরিমাণ ব্যবহার সম্ভব তাহা নির্ভর করে প্রধানত দুইটি বিষয়ের উপর। প্রথমত, দেশের কারিগরী জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অবস্থা অনুযায়ী সম্পদের ব্যবহার নির্ভর করে। ইহাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের পক্ষে পূর্ণতর ও অধিকতর পরিমাণে সম্পদের ব্যবহারের ক্ষমতা জন্মায়। দ্বিতীয়ত, উন্নত কারিগরী জ্ঞান সম্পদ ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া বাস্তবে কত দূর পর্যন্ত উহার ব্যবহার বৃদ্ধি করা যাইবে তাহা নির্ভর করে দেশে পুঁজিগঠন হারের উপর। যত অধিক পরিমাণে পুঁজিগঠন ঘটিবে ততই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বাড়িবে।

পরিশেষে আর একটি কথা এই যে, আধুনিক যুগে আর প্রাকৃতিক সম্পদকে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ বলিয়া মনে করা হয় না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা (Technology)-র যে উন্নতি ঘটিয়েছে তাহাতে মানুষের প্রকৃতিজয়ের ক্ষমতা অকল্পনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কৃত্রিম বরণা রচনার দ্বারা জলবায়ু শাসন, উষর মরু শস্যভূমিতে রূপান্তর, পরমাণু ও জলশক্তি হইতে প্রচুর বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবহণ ও সংসরণের অভাবিত

[illegible] বর্তমানে বাস্তব ঘটনা। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অগ্রগতি ও [illegible] সকল দেশেই কমবেশি পরিমাণে পুরাতন প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিয়া সম্পদের [illegible] [illegible] আজ আর আকাশকুসুম নহে।

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে আমরা সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। যথা,—ক. ভূমি ও কৃষি সম্পদ। খ. অরণ্য সম্পদ। গ. প্রাণীজ সম্পদ। ঘ. খনিজ সম্পদ। ঙ. শক্তির উৎস।

ক. ভূমি সম্পদ

LAND RESOURCES

ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তনের পরিমাণ ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ একর। ইহার ৯০.১ শতাংশ অর্থাৎ ৭৩ কোটি ৮৮ লক্ষ একর সম্পর্কে সরকারী তথ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। সরকারী বিবরণ অনুযায়ী ৩২ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমিতে বীজ বপন করা হয়, অর্থাৎ ঐ পরিমাণ জমি কৃষির অধীন। উহা ব্যতীত বনভূমির পরিমাণ ১৩ কোটি ৮৫ লক্ষ একর, পতিত জমির পরিমাণ ৫ কোটি ৬৩ লক্ষ একর কৃষিকার্যের জন্য প্রাপ্তব্য নহে এরূপ জমির পরিমাণ ১২ কোটি ৪৭ একর এবং অকর্ষিত অন্যান্য জমির পরিমাণ ৯ কোটি ৬০ লক্ষ একর। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায়, ১৯৫৮-৫৯-এর হিসাবে কর্ষিত জমির আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে ৩ কোটি ৪৬ লক্ষ একর।

ভারতে মৃত্তিকার সমস্যা (**The problem of soil**): ভূমির ক্ষয় (erosion) ভারতের মৃত্তিকার সর্বপ্রধান সমস্যা। প্রবল বারিপাত অথবা বায়ুপ্রবাহে মৃত্তিকার উপরিভাগের জৈব পদার্থসমৃদ্ধ অংশ অপসারিত হওয়াকেই ভূমিক্ষয় বলে। ইহাতে মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি বিনষ্ট হয়। অত্যধিক বৃষ্টিপাতে, ভূমি অধিক ঢালু, এবং হালকা ও অল্প বাঁধুনীযুক্ত হইলে অধিক ভূমিক্ষয় ঘটিয়া থাকে।

বনভূমির উৎসাদন, চারণভূমির ধ্বংসসাধন, আবাদ জমির ক্রমাগত পরিবর্তন (shifting cultivation), ত্রুটিযুক্ত কর্ষণপদ্ধতি প্রভৃতি মৃত্তিকার ক্ষয়ের প্রধান কারণ।

হিমালয়ের পাদদেশের অন্তর্গত সমগ্র উত্তর ভারতের ঢালু অঞ্চলে, মাদ্রাজের অংশবিশেষে, দাক্ষিণাত্যে, মধ্যপ্রদেশ ও ছোটনাগপুরে ভূমিক্ষয়ের সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। ভারতের কৃষি গবেষণা পরিষদের একটি অনুসন্ধানে প্রকাশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে একর-পিছু বাৎসরিক ১ হইতে ১১৫ টন মৃত্তিকা অপসারিত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর মৃত্তিকার উপরিভাগের উর্বরাংশের $\frac{1}{10}$ ইঞ্চি পরিমাণ স্তর বৃষ্টিপাতে ধৌত হইয়া অপসারিত হয়।

ভূমির ক্ষয়ের ফলাফল (**Effects of soil erosion**): ১. ভূমিক্ষয় জমির উর্বরতা ও কৃষিযোগ্য ভূমির আয়তন হ্রাস করিয়া কৃষির অবনতি ঘটায়। ২. ভূমিক্ষয়ের দরুন বিপুল পরিমাণ মৃত্তিকা, ধূলিকণা ও ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বৃষ্টির জলের সহিত অপসারিত হইয়া নিম্নাঞ্চলে নদীগর্ভে সঞ্চিত হয়। ইহাতে নদীর গভীরতা হ্রাস পাইয়া দুই তীরে বন্যা ঘটায়। ৩. নদীগর্ভের উচ্চতা বৃদ্ধির দরুন নদীপথের নাব্যতা কমিয়া গিয়া নৌ-পরিবহণে বাধার সৃষ্টি করে। ৪. ভূমিক্ষয়ের দরুন বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিম্নভূমিতে পরিণত হইয়া জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়। ইহাতে কৃষিকার্য পরিত্যক্ত হয়। ৫. জল গড়াইয়া চলিয়া যায় বলিয়া মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ জলসঞ্চয় হ্রাস পায়। ইহাতে ঐ অঞ্চলের শুষ্কতা বৃদ্ধি পায় ও গভীর নলকূপের সাহায্যে জলসেচ কঠিন হয়। ৬. নদীগর্ভের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সেচব্যবস্থা [illegible]

[illegible] (Remedies) : ১. **বন ও তৃণভূমি সৃষ্টি :** বৃষ্টিপাতের যে জল ভূমিতে পতিত হয় তাহার সমগ্র অংশই জমিতে ধরিয়া রাখিলে ভূমিক্ষয় ঘটিতে পারে না। এজন্য উন্মুক্ত জমিতে নূতন বনভূমি ও তৃণভূমি সৃষ্টি করিতে হয়।

২. **পশুচারণের নিয়ন্ত্রণ :** তৃণভূমি যাহাতে অতি-চারণের (overgrazing) দ্বারা বিনষ্ট না হয় এজন্য পশুচারণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।

৩. **বন্যা (flood control) নিয়ন্ত্রণ :** ঢালু অঞ্চলে নদীতীরে বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলস্রোত রুদ্ধ করিলে আর উহার সহিত মৃত্তিকা চলিয়া যাইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ করিয়া অতিরিক্ত জল সঞ্চয় করা যাইতে পারে। তাহাতে সমতলভূমিতে বন্যা ঘটিবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়।

৪. অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে কৃষি-আবাদ রচনা **(Bench terracing) :** ইহা দ্বারা পাহাড়ের গাত্র হইতে জল গড়াইয়া পড়িতে না দিয়া আবাদ জমিতে আবদ্ধ করিয়া ভূমিক্ষয় রুদ্ধ করা হয়।

ভারতের ৮০ কোটি একর জমির মধ্যে ২০ কোটি একর জমিই ভূমিক্ষয়ের মুখে। মোট কর্ষিত জমির এক-তৃতীয়াংশ ঢালু ও ক্ষয়ের সম্ভাবনাযুক্ত। এই পরিস্থিতির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

সরকারী-নীতি (Govt. Policy) : পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে জমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ বোর্ড (Land Utilisation and Soil Conservation Board) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বোর্ড এ সম্পর্কে গবেষণা, প্রচার ও শিক্ষাদান করে। রাজ্য বোর্ডগুলি অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

প্রথম পরিকল্পনায় মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল প্রথম পরিকল্পনার শেষে নানাবিধ প্রচেষ্টার দ্বারা ৩ লক্ষ একর জমিতে ভূমিসংরক্ষণ কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য ২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃত্রিম বনভূমি রচনা, বাঁধ নির্মাণ, জলাধার নির্মাণ ও পর্বতগাত্রে ধাপে ধাপে কৃষিক্ষেত্র রচনা ইত্যাদি কার্য পরিচালিত হইয়াছে এবং আনুমানিক প্রায় ২০ লক্ষ একরে মৃত্তিকা সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** ১ কোটি ৩০ লক্ষ একর জমিতে মৃত্তিকা সংরক্ষণকার্য পরিচালনা করা হইবে ও ৪ কোটি একর জমিতে শুষ্ক কৃষি (Dry farming) সম্প্রসারিত হইবে। এই সময়ে ভূমি সংরক্ষণের প্রয়োজনে রাজ্য সরকারগুলিকে প্রয়োজনীয় আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়ার সুপারিশও করা হইয়াছে।

খ. বনসম্পদ
FOREST RESOURCES

১. **আয়তন (area) :** ভারতের বনভূমির আয়তন ১৩ কোটি ১ লক্ষ একর। ইহা দেশের মোট আয়তনের ২২ শতাংশ।

বনভূমির উপযোগিতা (Utility of forests) : ক. পরোক্ষ প্রভাব ও উপযোগিতা : ১. বনভূমি ছায়া বিস্তার করিয়া রৌদ্রের প্রখরতাকে হ্রাস করে, বায়ুমণ্ডল শীতল করিয়া বাতাসের জলকণাকে আকর্ষণ করে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে। ইহার ফলে আবহাওয়া চরম হইতে পারে না।

২. বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে বলিয়া বনভূমি অধিকতর বৃষ্টিপাত ঘটায় ও কৃষিকার্যের সুবিধা হয়।

৩. বনাঞ্চলের বৃক্ষলতাদি হইতে পতিত শুষ্ক পত্র ও শাখা-প্রশাখাদি মাটিতে পড়িয়া পচিয়া উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

৪. নানারূপ বৃক্ষলতাদির শিকড়ে মৃত্তিকার বন্ধন ঘটে বলিয়া ভূমিক্ষয় (soil erosion) ঘটিতে পারে না।

৫. মৃত্তিকার অবক্ষয় নিবারণ ও বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে বলিয়া বনভূমির অবস্থান মরুপ্রসারে কার্যকর বাধা প্রদান করে।

৬. সর্বশেষে বনভূমি বিবিধ প্রকার উদ্ভিদের জন্মস্থান ও নানাবিধ বন্য প্রাণীর বাসস্থল বলিয়া উহা সকল দেশেই বিশেষরূপে আদৃত হয়।

ভারত ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইহার জলবায়ুর অধিকতর সমতার জন্য দেশের বনভূমির পরোক্ষ অবদান কম নহে। যে সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বনভূমির ধ্বংস সাধিত হইয়াছে তথায় মৃত্তিকার ক্ষয়ের দরুন, ভূমির উর্বরতা বিনষ্ট হইয়া পতিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য পুনরায় বনরোপণে সরকারকে যত্নশীল হইতে হইয়াছে। রাজপুতানার মরুভূমির বিস্তার রোধের জন্যও ইদানীংকালে কৃত্রিম অরণ্য বলয় রচিত হইতেছে। এ ছাড়া ভারতের বনভূমি দেশ রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়কও বটে।

খ. প্রত্যক্ষ প্রভাব ও উপযোগিতা : ১. বনভূমিজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদি শিল্পের মূল্যবান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ২. অগভীর বনভূমি ও উহার সন্নিহিত লতাগুল্মাবৃত অঞ্চল গোচারণের বিশেষ উপযুক্ত ক্ষেত্র। ৩. বনভূমির বিবিধ দ্রব্যাদি আহরণের জন্য বহু ব্যক্তির জীবিকা ও কর্মসংস্থান ঘটে।

ভারতের বনভূমি হইতে যে সকল প্রধান দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা হইল বিবিধ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন শ্রেণীর কাঠ (timber), কাষ্ঠমণ্ডের উপযুক্ত কাঠ (pulp wood), দিয়াশলাইয়ের কাঠ (match wood), জ্বালানি কাঠ (fire and charcoal wood) প্রভৃতি। এই সকল মূল্যবান কাঁচামালের মোট পরিমাণ, ১৯৫৮-৫৯ সালে ছিল ৫৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬৪ হাজার কিউবিক ফিট। উহার মূল্য ছিল ৪১ কোটি ২১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। এই সকল দ্রব্যাদি কাগজ কল, দিয়াশলাই, ভেনেস্তাকাঠ, আসবাবপত্র, রেলের স্লিপার তৈয়ারী প্রভৃতি শিল্পের অপরিহার্য কাঁচামাল। এসকল ছাড়া অন্যান্য যে অপ্রধান বনজাত দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার মধ্যে বাঁশ ও বেত, রজন, বিভিন্ন প্রকারের আঁশ, গঁদের আঁঠা, ঔষধি, চামড়া পাকা করিবার রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৮-৫৯ সালের হিসাবে ইহাদের মোট মূল্য ছিল ৮ কোটি ৪০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। ভারতের দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রচেষ্টার ফলে গৃহনির্মাণ শিল্প, পরিবহণ শিল্প, চর্মদ্রব্য শিল্প, ঔষধ শিল্প, কাগজ শিল্প প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আরও বনজাত সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে। সুতরাং ইহাদের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির গুরুত্ব উত্তরোত্তর বাড়িবে। ১৯৫৮-৫৯ সালে বনভূমি হইতে সরকারের আয় হইয়াছিল ৪৬ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। সরকারী বনভূমির চারণ ক্ষেত্র হইতে বাৎসরিক ৯৫ লক্ষ টাকা আয় হয়। প্রায় ২০ কোটি পশু এই সকল বনভূমিতে চরিয়া থাকে। ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ব্যক্তি অরণ্য হইতে জীবিকা উপার্জন করে। ভারতের বনভূমি ১৯ লক্ষ আদিবাসীর বাসস্থান। এবং বনভূমিতে যে ২৫০০ প্রকারের কাষ্ঠ উৎপাদনকারী বৃক্ষ পাওয়া যায় তন্মধ্যে ৫৭০ প্রকার কাষ্ঠ বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন।

ভারতের বনভূমি সংক্রান্ত সমস্যা (The Problems of Indian Forests) :

১. বনভূমির স্বল্পায়তন : সাধারণত, ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে লোকবসতি ও কৃষিক্ষেত্র সম্প্রসারণের ফলে ভারতীয় বনভূমির আয়তন ক্রমেই সংকুচিত হইতেছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও একটি যে বিশেষ কারণ ইহার জন্য দায়ী, তাহা হইল বনভূমির প্রতি মানুষ ও বিদেশী শাসকগণের শোচনীয় অবহেলা। ইহার ফলে বনভূমি হ্রাস পাইয়া দেশের আয়তনের ২২ শতাংশে পরিণত হইয়াছে। জনসাধারণের মাথাপিছু হিসাবে বনভূমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ০.২ হেক্টর বা প্রায় অর্ধ একর মাত্র। বলা বাহুল্য পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু দেশ অপেক্ষা ইহা অল্প। সুতরাং বনভূমির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ আবশ্যক।

২. বনভূমির অসম বণ্টন : ভারতের বনভূমির অপর সমস্যা হইল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহার বৈষম্য। শুধু বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যেই যে বনভূমির বণ্টন অসমান তাহা নহে। এমন কি রাজ্যের অভ্যন্তরেও ঐ বনভূমি সর্বত্র সমরূপে পরিব্যাপ্ত নহে।

৩. বনভূমির স্বল্প উৎপাদন-ক্ষমতা : ভারতের বনভূমির স্বল্প উৎপাদন-ক্ষমতার পরিচয় স্বরূপ বলা যায় যে, এদেশে যেখানে বনভূমির প্রতি একর হইতে বৎসরে ২.৫ কিউবিক ফুট কাঠ পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে জাপানে ৩৭.৩ কিউবিক ফুট, ফরাসী দেশে ৫৬.৮ কিউবিক ফুট এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮.১ কিউবিক ফুট কাঠ পাওয়া যায়।

৪. ভারতীয় বনভূমির অপর একটি সমস্যা হইল যে, **উহার একাংশ** (শতকরা ১৬ ভাগ অঞ্চল) **দুর্গম**। তথায় যাতায়াতের উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, উহার শতকরা ৪৫ ভাগ অঞ্চল হইতে কাঠ ও অন্যান্য সম্পদ আহরণ করা যাইত।

সরকারী বন নীতি (Forests Policy of the Government) : ১৮৯৪ সালে তদানীন্তন সরকার প্রথম বনভূমি সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু উহাতে বনভূমিকে ৪টি শ্রেণীতে বিভক্তকরণ, এবং বনভূমি সংক্রান্ত একটি দপ্তর স্থাপনের অতিরিক্ত আর বিশেষ কোন উদ্যম হয় নাই। ইহার পর অবশ্য একটি বনভূমি সংক্রান্ত বিদ্যালয় ও গবেষণাগার স্থাপিত হয়। তদবধি ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সরকারের বনভূমি নীতির দুইটি মূল ভিত্তি ছিল। প্রথমত, বনভূমি হইতে রাজস্ব আদায়। দ্বিতীয়ত, বনভূমি সংরক্ষণ।

স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকার পুরাতন সংকীর্ণ নীতি পরিহার করিয়া বৃহত্তর ও দূর-প্রসারী দৃষ্টিকোণ হইতে একটি সামগ্রিক নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৫২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে ভারত যে জাতীয় বনভূমি নীতি (National Forest Policy) গ্রহণ করিয়াছে তাহা নিম্নরূপ—

১. বনভূমির আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দেশের মোট আয়তনের ৩৩.৩ শতাংশে পরিণত করিতে হইবে। ২. পার্বত্য অঞ্চল, নদী উপত্যকা ও উপকূলবর্তী অঞ্চল মৃত্তিকা সংরক্ষণের জন্য তথায় বনভূমি রক্ষা ও নূতন বনভূমি সৃষ্টি করিতে হইবে। ৩. কৃত্রিম অরণ্যবলয় রচনা দ্বারা মরুপ্রসার রোধ করিতে হইবে। ৪. জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য অরণ্যের উৎপাদন-ক্ষমতার সুষ্ঠু জাতীয় ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন করিতে হইবে। ৫. গ্রাম্য বনভূমির নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন ও ব্যবহার সুনিশ্চিত করিতে হইবে। ৬. বেসরকারী বনভূমির পরিচালনা সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের অধীনে আনিতে হইবে। ৭. বন্য প্রাণীসমূহ সংরক্ষণ করিতে হইবে।

জাতীয় বনভূমি নীতির মূল লক্ষ্য হইল : ক. বনসম্পদের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ; খ. কাঠ আহরণের উন্নততর কৌশল প্রয়োগের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি ; এবং গ. কাঠ

সংরক্ষণ ও পরিপক্কতার (preservative and seasoning) প্রাক্রমসমূহের [illegible] প্রয়োগ।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বনভূমি (Five year Plans & Forests) : প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বনভূমির উন্নয়নের জন্য ৯'৮৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। উহাতে বিবিধ প্রচেষ্টার দ্বারা ৭৫ হাজার একর উষর ভূমি নব বনভূমিতে পরিণত, ৩ হাজার একর দিয়াশলাই কাঠের বনভূমি এলাকা বৃদ্ধি, ২০ লক্ষ একর বনভূমি সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনয়ন ও প্রায় ৩ হাজার বনসড়ক নির্মাণ করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বনভূমির উন্নয়নের জন্য ২০'৭৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। ইহার ফলে ৪ লক্ষ একর বিনষ্ট বনভূমি পুনরুদ্ধার, ২ লক্ষ একর পরিমাণ জমিতে মূল্যবান কাঠের ও ৫০ হাজার একর জমিতে দিয়াশলাই কাঠের বনভূমি সৃষ্টি করা হয়। ইহা ছাড়া প্রায় ৫ হাজার মাইল নূতন বনসড়কও নির্মিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ২০ লক্ষ একরে জ্বালানি কাঠেব গ্রাম্য বনভূমি, ৫০ হাজার একবে শাল ও পত্রমোচী বৃক্ষের অরণ্য, ২ লক্ষ একরে সেগুন বনভূমি এবং ৪ লক্ষ ৫০ হাজার একরে বিবিধ বৃক্ষের অরণ্য সৃষ্টির কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ১৫ হাজার মাইল বনসড়কও নির্মাণ করা হইবে।

সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ না কবিলে আগামী ১৫ বৎসরে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে ভারতে কাঠেব যোগানে ঘাট্‌তি দেখা দিবে। এজন্য ভারতের বনভূমিব বৃদ্ধি ও কাঠেব বিজ্ঞানসম্মত আহরণ, সংবক্ষণ ও পরিপক্ককরণের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি
।

প্রাণীজ সম্পদ

ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERIES

১. পশুপালন (Animal husbandry) : ভাবতে পৃথিবীর মোট গো-সম্পদের ১৯ শতাংশ, মহিষেব প্রায় ৫০ শতাংশ এবং ছাগ সংখ্যাব ১৮ শতাংশ বর্তমান। কিন্তু পরিমাণের দিক হইতে ইহা উল্লেখযোগ্য হইলেও ইহাদেব দ্বাবা উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্যের মোট মূল্য সে তুলনায় অধিক নহে। ১৯৫০-৫১ সালে এই সকল প্রাণী হইতে উৎপন্ন আয় ছিল কৃষির মোট আয়ের ১৬ শতাংশ মাত্র।

ভারতের গৃহপালিত প্রাণীসমূহ হইতে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায় তাহার মধ্যে মাংস, দুগ্ধ, ডিম, পশম ও চামড়া প্রধান।

গো, মেষ, ছাগল ও শূকর হইতে প্রতি বংসরে মোট ৪ লক্ষ ৬ হাজার টন মাংস পাওয়া যায়। ইহার মূল্য ৭৬ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া প্রতি বংসর নানাবিধ প্রাণী রপ্তানি দ্বারাও অর্থোপার্জন করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় পশুপালনের উন্নয়নেব জন্য ৫৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

২. মৎস্য চাষ (Fisheries) : ভাবতের মৎস্য-শিকার শিল্প প্রায় ১০ লক্ষ ব্যক্তির জীবিকার সংস্থান ও জাতীয় আয়ে ৬০ কোটি টাকার অধিক প্রদান করিয়া থাকে। এই কার্যে আনুমানিক ৭৩ হাজার ৪ শত মৎস্য-শিকারের বিবিধ জলযান নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় বৎসর শেষে মোট-মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ টন। ১৯৬২ সালে [illegible] ২'৫ লক্ষ টনে পরিণত হয়। ইহার ৭০ ভাগ সাগর ও মোহনা হইতে

এবং বাকী ৬১ ভাগ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র হইতে ধৃত হয়। ধীবরপিছু বৎসরে ধৃত মৎস্যের পরিমাণ ২ হাজার ৫ শত পাউণ্ড।

ভারতের জনসাধারণ প্রতি বৎসর মাথাপিছু মাত্র ৩'৪ পাউণ্ড মৎস্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে। অথচ সিংহলে ইহার পরিমাণ ১৬ পাউণ্ড, ব্রহ্মদেশে ৭০ পাউণ্ড ও জাপানে ৯০ পাউণ্ড। ভারতের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার টন মৎস্য প্রয়োজন। ইহা হইতেই শিল্পটির সম্প্রসারণের সুযোগ অনুমান করা যায়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে একমাত্র বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরের সমৃদ্ধ মৎস্যক্ষেত্রগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলেই দেশের ন্যূনতম প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিকতর উৎপাদন ঘটিবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় মৎস্য চাষের উন্নতির জন্য ২৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার ফলে মৎস্য উৎপাদন ৪ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে ও মৎস্য রপ্তানি দ্বিগুণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ঘ. খনিজ সম্পদ
MINERAL RESOURCES

ভারতে বিবিধ প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থের অনুসন্ধানকার্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া মোট খনিজ পদার্থের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন প্রকার সামগ্রিক চিত্র উপস্থিত করা সম্ভব নহে। তবে, বিবিধ খনিজের ভাণ্ডার যে যথেষ্ট পরিমাণেই রহিয়াছে সে সম্বন্ধে অনুমান করা চলে। দেশের প্রধান প্রধান খনিজ সম্পদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া গেল :

লৌহ : বিশ্বের মোট মজুদ লৌহের এক-চতুর্থাংশ ভারতে অবস্থিত। প্রমাণিত ও নির্দেশিত মজুদ লৌহের মোট পরিমাণ প্রায় ৬ শত ৬৯ কোটি টন। পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহ-আকরিকের অবস্থিতি ভারতে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের বিপুল অগ্রগতির সূচনা করে। **ম্যাঙ্গানিজ :** ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের মজুদের ক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয়। আনুমানিক মোট মজুদের পরিমাণ ১১'২ কোটি টন। লৌহ-ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প এবং ড্রাই ব্যাটারি নির্মাণ শিল্পে ইহা অপরিহার্য। **ক্রোমাইট :** ক্রোমাইটের মোট মজুদের পরিমাণ প্রায় ১৩'২ লক্ষ টন। **স্বর্ণ :** ভারতে মোট মজুদের পরিমাণ ১২'৬ লক্ষ টন। **তাম্র :** বিহার রাজ্যের সিংভূম ও বারগণ্ডা অঞ্চলের ৮০ মাইল ব্যাপী স্থানে তাম্র আকরিকের প্রধান মজুদ অবস্থিত। ভারতের বর্তমান তাম্র উৎপাদনের পরিমাণ ৩'৫ লক্ষ টন। রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক শিল্পে তাম্র একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। **বক্সাইট :** একটি সাম্প্রতিক হিসাবে ভারতের উচ্চশ্রেণীর বক্সাইটের মজুদ পরিমাণ ২ কোটি ৮০ লক্ষ টন বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বক্সাইট এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের কাঁচামাল। বিভিন্ন যানবাহনের 'বডি' নির্মাণে, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শিল্পে, গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুতে এ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। **অভ্র :** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভ্র বিহার উৎপাদন করে। বৈদ্যুতিক শিল্পে প্রধানত অভ্রের ব্যবহার ঘটিয়া থাকে। **ইলমেনাইট :** ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলভাগের সমুদ্র তটভূমির বালুকারাশিতে যথেষ্ট পরিমাণে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। বালুকারাশিতে বর্তমান ইলমেনাইটের আনুমানিক মজুদ ৩৫ কোটি টন। **সীসক :** ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সীসকের অবস্থিতি জানা গিয়াছে। সীসকের সঙ্গে দস্তাও পাওয়া যায়। **এণ্টিমনি :** পাঞ্জাবের কাংগ্রা জেলার লাহুল হিমবাহতে (Glacier) এণ্টিমনি পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া মহারাষ্ট্রের নাগপুরেও এণ্টিমনির খনি রহিয়াছে। **দস্তা :** উদয়পুর ও কাশ্মীরে (রিয়াসিন জেলা) দস্তা পাওয়া যায়। **টিন :** বিহারের হাজারিবাগ অঞ্চলে টিন আকরিকের খনি রহিয়াছে। **জিপসাম :** ভারতে জিপসাম মজুদের আনুমানিক পরিমাণ ৮৫ কোটি টন। সিমেণ্ট ও রাসায়নিক সার উৎপাদনে জিপসাম একটি অপরিহার্য কাঁচামাল। **তাপসহ খনিজ :** (Refractories) : ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই ম্যাগনেসাইট, অগ্নিসহ মৃত্তিকা (Fire clay), কিয়ানাইট, সিলিম্যানাইট ও কোরানডাম প্রভৃতি শক্ত ও তাপসহ খনিজ পাওয়া যায়।

কয়লা ও খনিজ তৈল : এই দুইটি খনিজ আলাদি ও-শক্তির উৎস হিসাবে পরিচিত। পরবর্তী অংশে শক্তির উৎস হিসাবে ইহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

ভারতের খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, জিপসাম এবং চুনাপাথর [illegible] পরিমাণে উত্তোলিত হইয়া থাকে। নিম্নে উহাদের খনিসমূহের সংখ্যা দেওয়া গেল।

কয়লা	মোট খনিসংখ্যা	৮৫৪টি।
অভ্র	"	৬০০টি।
ম্যাঙ্গানিজ	"	৫৬৬টি।
লৌহ	"	২০৫টি।
চুনাপাথর	"	১৩৪টি।
জিপসাম	"	৩২টি।

এই সকল খনিসমূহে সারা ভারতে, ১৯৫৯ সালের হিসাবে, প্রায় ৬ লক্ষ ১৮ হাজার ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, মহীশূর ও অন্ধ্র রাজ্যসমূহই ভারতের প্রধান খনি অঞ্চল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিদেশী মুদ্রা উপার্জনে খনিজ রপ্তানির গুরুত্ব আছে। ১৯৫৮ সালে ৪৬ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা খনিজ রপ্তানির দ্বারা উপার্জন করা হইয়াছিল। অবশ্য ঐ বৎসর প্রয়োজনীয় খনিজ ও ধাতু আমদানির জন্য ভারত ১৪০.৯ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিল।

খনিজ পদার্থের গুরুত্ব (Importance of Minerals) : বর্তমান যন্ত্রশিল্পযুগে বিবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হিসাবে খনিজ পদার্থ একটি অপরিহার্য উপাদান। কোন দেশে বিবিধ খনিজ কাঁচামালের অবস্থিতি ও উহার পরিমাণ, ঐ দেশের শিল্পের প্রকৃতি, উন্নতির সম্ভাবনা ও শিল্পস্থানিকতা নির্ধারণ করিয়া থাকে।

লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বিবিধ লৌহ জাতীয় ধাতু এবং তাম্র, বক্সাইট, দস্তা, সীসক, ইলমেনাইট প্রভৃতি অ-লৌহ জাতীয় ধাতু, ভারী ও মূল শিল্প এবং বৈদ্যুতিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পসমূহের ভিত্তি। এই সকল শিল্প উন্নত না হইলে কোন দেশই শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে না। এবং এই প্রকার শিল্পের জন্য দেশে যথেষ্ট পরিমাণ লৌহ ও অ-লৌহ জাতীয় ধাতুর অবস্থিতি প্রয়োজন। ভারত সেদিক হইতে মন্দভাগ্য নহে।

কোন দেশে, জনসাধারণের মাথাপিছু কি পরিমাণ লৌহ উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয় তাহা উহার অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য স্বীয় লৌহ-আকরিকের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার ছাড়া কোন দেশের পক্ষেই ক্রমাগত লৌহ উৎপাদনের ও ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও উহা বজায় রাখা সম্ভব নহে। তেমনি লৌহের উৎপাদনে কয়লা ও চুনাপাথর প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। সুতরাং নানাবিধ খনিজ পদার্থের অবস্থিতি ও উহার যথাযথ ব্যবহার ছাড়া শিল্পোন্নয়ন, জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও দেশবাসীর জীবনযাত্রার উন্নতি কঠিন হইয়া পড়ে।

সরকারী খনিজ নীতি (Mineral Policy of the Government) : প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে খনিজ সম্পর্কে সরকারের নীতি সহানুভূতিশীল ছিল না। খনিগুলিকে মালিকগণের দয়ার উপর পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। ফলে খনিগুলি দিনের পর দিন রিক্ত হইয়াছে। খনিজ অধিকাংশ তখন কাঁচামাল হিসাবে বিদেশে রপ্তানি হইত।

স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এই নীতির পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালেই খনিসমূহ ও খনিজ পদার্থ সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে খনি সম্পর্কিত একটি আইন [Mines and Minerals (Regu'ation and Development Act 1948)] পাস হয়। ১৯৪৯ সালের ২৫শে অক্টোবর ইহা কার্যকর হইয়াছে। ১৯৫২ সালে ভারত সরকার একটি সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট খনিজ নীতি গ্রহণ করেন। জাতীয় খনিজ নীতির মূলকথা তিনটি।

...পদার্থের জন্য বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণাকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। খনিজদ্রব্য উত্তোলন পদ্ধতির আধুনিকী ও যন্ত্রীকরণ করিতে হইবে। ৩. খনিজ সম্পদগুলির উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ব্যাপক নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রথম নীতি অনুযায়ী, অনুসন্ধানকার্যের ফলে বহু নূতন তৈল, তাম্র, জিপসাম ও কয়লা খনির অস্তিত্ব জানা গিয়াছে।

১৯৪৮ সালের খনি আইনে খনিজ পদার্থ উত্তোলন পদ্ধতির যন্ত্রীকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালের জাতীয় খনিজ নীতি গ্রহণের পর হইতে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে খনি উন্নয়নের জন্য ক্রমেই খনিসমূহের অধিকতর যন্ত্রীকরণ করা হইতেছে।

খনিজ সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গৃহীত হয় ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে। ইহাতে ভারতের শিল্পায়নে কতকগুলি প্রধান খনিজ পদার্থের প্রভূত গুরুত্বের জন্য উহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয়। ইহাদের মধ্যে কয়লা, লৌহ-আকরিক, খনিজ তৈল, জিপসাম, টিন, সীসক, দস্তা, তাম্র, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে পরিপূরক প্রচেষ্টা হিসাবে বেসরকারী মালিকানাকে অনুমতি দিতে পারে। ভারত সরকার অবশ্য খনিজ শিল্পে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র বজায় রাখিবার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। কয়লা শিল্পকে জাতীয়করণ করা হইয়াছে। সরকারী কয়লা খনির পরিচালনার জন্য জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশন (National Coal Development Corporation) স্থাপিত হইয়াছে।

ভারত সরকারের বর্তমান খনিজ উন্নয়ন নীতিতে সামগ্রিক উন্নয়নের সহিত বিভিন্ন খনি অঞ্চলের সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের উপরও গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। দুইটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তর যথা—খনিজ ও তৈল মন্ত্রীদপ্তর (Ministry of Mines and Oil) এবং ইস্পাত, খনিজ ও জ্বালানি মন্ত্রীদপ্তর (Ministry of Steel, Mines and Fuel), ভারতের যাবতীয় খনিজের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত মন্ত্রীদপ্তর জাতীয় খনিজ নীতি কার্যকরী করিবার ভারপ্রাপ্ত।

১৯৫৮ সালে খনিজ সম্পর্কে গৃহীত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হইল জাতীয় খনিজ উন্নয়ন কর্পোরেশন (National Mineral Development Corporation) প্রতিষ্ঠা। ১৫ কোটি টাকা পুঁজি লইয়া প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান, তৈল প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খনিজ উত্তোলনের ভারপ্রাপ্ত। খনিজ আকরিকের রপ্তানি, ধাতু আমদানি ও খনিজ পদার্থের বিবিধ বিদেশী বাজার সংগঠিত করিবার ভার দিয়া ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের খনি ও ধাতু ব্যবসায় করপোরেশন (Minerals and Metal Trading Corporation of India Ltd.) নামে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী রূপে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে।

পরিকল্পনা ও খনিজ

প্রথম পরিকল্পনায় খনিজ উন্নয়নের জন্য ১·০৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭৩ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৪০৫ কোটি টাকা।

৬. শক্তির উৎস
POWER RESOURCES

আধুনিক শিল্পে যন্ত্রাদি প্রধানত বিদ্যুৎশক্তি দ্বারাই চালিত হইয়া থাকে। সেজন্য বর্তমানকালে শক্তি (Power) বলিতে সাধারণত বিদ্যুৎশক্তিই বুঝায়।

বিদ্যুৎশক্তি যাহাদের দ্বারা উৎপাদন করা যায়, উহাদের মধ্যে কয়লা, তৈল, জলশক্তি, পরমাণুশক্তি এবং প্রাকৃতিক ও পরিশোধনাগারের গ্যাস (natural and refinery gas) উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত অবশ্য জোয়ার-ভাঁটার শক্তি (tidal power), বায়ুশক্তি (wind power), সূর্যতাপের বিকিরণ (solar radiaton) ইত্যাদির সাহায্যেও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু ভারতে এই সকল শক্তি উৎপাদনের উৎসের এখনও গুরুত্ব দেখা দেয় নাই।

আমরা নীচে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ৪টি উৎস, অর্থাৎ যথাক্রমে, কয়লা, জলশক্তি, তৈল ও পরমাণুশক্তির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

১. কয়লা (Coal) : ভারতে মৃত্তিকার উপরিভাগে ১ ফুট গভীর স্তর হইতে ১০০০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত কয়লা পাওয়া যায়। এদেশে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ ৬ হাজার কোটি টন বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার মজুদ পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্যে অবস্থিত। এই অঞ্চলের রানীগঞ্জ ও বোকারো কয়লা খনিগুলি ভারতে মোট কয়লা উৎপাদনের ৮০ শতাংশ সরবরাহ করে।

ধাতু নিষ্কাশক কয়লা সংরক্ষণ কমিটির (Metallurgical Coal Conservation Committee) হিসাবে, ভারতে বিশেষ শ্রেণীর (Select grade) কোক কয়লার মজুদ পরিমাণ ৩২ কোটি ৯৬ লক্ষ টন ; প্রথম শ্রেণীর (grade I) কোক কয়লার পরিমাণ ৩৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টন ; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর (grade II) কোক কয়লার পরিমাণ ৪ কোটি ৯১ লক্ষ টন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্য ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টনের স্থলে, উৎপাদন হইয়াছে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টন। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন ও শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে কয়লা উৎপাদন লক্ষ্য ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন স্থির করা হইয়াছে।

২. খনিজ তৈল (Mineral Oil) : অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ভারতের খনিজ তৈল ও উহার উপজাত দ্রব্যের চাহিদা ও মাথাপিছু ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু প্রতি বৎসর খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণ ৯৬৪ ইম্পিরিয়াল গ্যালন, সুইডেনে ৩৪৩, অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৭, আর্জেন্টিনায় ১৫১, ইংলণ্ডে ১৫৮, জাপানে ৪০, সিংহলে ১৩, ও ভারতে ৩·৮ গ্যালন (১৯৫৮ সালের হিসাব)।

ভারতে পূর্বে খনিজ তৈলের মজুদ অতি অল্প বলিয়াই মনে করা হইত। কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক অনুসন্ধানের দ্বারা মোট ৪ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী অঞ্চলে খনিজ তৈল উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে।

বর্তমানে খনিজ তৈল উৎপাদনের একমাত্র কেন্দ্র আসামের ডিগবয় অঞ্চল। ইহার মোট উৎপাদন বাৎসরিক ৪ লক্ষ টন ক্রুড অয়েল (crude oil) বা অপরিশ্রুত তৈল। ইহা দেশের মোট চাহিদার ৬ শতাংশ মাত্র। বাকি চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টন অপরিশ্রুত তৈল আমদানি করিতে হয়।

১৯৬০ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত আসামের নাহারকাটিয়া ও মোরান অঞ্চলে নূতন তৈল খনির অবস্থিতি জানা গিয়াছে। আসামের মোট মজুদ তৈলভাণ্ডারের পরিমাণ আনুমানিক ৪ কোটি ২৫ লক্ষ টন। নূতন কূপগুলির দ্বারা বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টন অপরিশ্রুত তৈলের উৎপাদন সম্ভব হইলে ভারতের তৈল চাহিদার ৪০ শতাংশ দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র হইতে মিটান যাইবে।

তৈল খনি জাতীয়করণের নীতি অনুযায়ী, উহাদের পরিচালনার জন্য ভারত সরকার ও বর্মা অয়েল কোম্পানীর অংশীদারীর ভিত্তিতে অয়েল ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহার এক-তৃতীয়াংশ পুঁজি ভারত সরকার ও দুই-তৃতীয়াংশ বার্মা অয়েল কোম্পানী প্রদান করিয়াছেন।

খনিজ তৈল পরিশোধনের জন্য এতদিন পর্যন্ত আসাম অয়েল কোম্পানীর একটি মাত্র তৈল পরিশোধনাগার (Refinery) ভারতে ছিল (আসামের ডিগবয়ে অবস্থিত)। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বোম্বাইয়ে-

ডিগবয় হাবে দুইটি নূতন বেসরকারী তৈল পরিশোধনাগার বসান হয়। (একটি স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানীর, ও একটি বার্মা শেল কোম্পানীর)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশাখাপত্তনমে ক্যালটেক্স কোম্পানী ৮ লক্ষ টন ক্ষমতাবিশিষ্ট আর একটি পরিশোধনাগার স্থাপন করে এবং বোম্বাইয়ের পরিশোধনাগার দুইটির ক্ষমতা ১০ লক্ষ টন বৃদ্ধি করা হয়। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে দুইটি পরিশোধনাগার স্থাপনের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। একটি আসামের নুনমাটিতে—উহার ক্ষমতা ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন। অপরটি বিহারের বারাউনীতে—উহার ক্ষমতা হইবে প্রায় ২০ লক্ষ টন। অয়েল ইণ্ডিয়ার যাবতীয় তৈল এই দুইটি পরিশোধনাগারে পরিস্রুত হইবে। নুনমাটিতে ১৯৬১ সালের শেষে তৈল পরিশোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং উহার উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে।

১৯৫৮ সালের শেষে ভারতে খনিজ তৈল শিল্পে মোট ২৪৪ কোটি টাকা বিনিয়োজিত ছিল। উহার মধ্যে বিদেশী পুঁজি ছিল ২১৪ কোটি টাকা।

এই দুইটি সরকারী পরিশোধনাগারের উৎপাদন আরম্ভ হইলে ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র মোট চাহিদার ৩৪ শতাংশ মিটান যাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় খনিজ তৈলের অনুসন্ধান, পরিচালনা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

১৯৫৮ সালে ৩০ কোটি টাকা পুঁজি লইয়া ভারতীয় পরিশোধনাগার লিঃ (Indian Refineries Ltd.) নামে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রুমানিয়ার সরকারের সহযোগিতায় স্থাপিত হয়। ইহা ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কার্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহা আসামের নুনমাটিতে পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের জন্য পরিশোধনাগার স্থাপন করিয়াছে। উহার মোট ব্যয় পড়িয়াছে ১৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং পরিশোধন ক্ষমতা ৭·৫ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া বিহারের বারাউনিতে এই প্রতিষ্ঠানটি সোভিয়েত সরকারের সহযোগিতায় বৎসরে ২০ লক্ষ টন তৈল পরিশোধনে সক্ষম আরেকটি পরিশোধনাগার স্থাপন করিয়াছে।

ইহা ছাড়া ১২ কোটি টাকা পুঁজি লইয়া ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতসরকার ভারতীয় তৈল কোম্পানী (Indian Oil Company Ltd.) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ভারতে রাষ্ট্রায়ত্ত পরিশোধনাগারগুলির উৎপাদিত খনিজ তৈল ও তৈলজাত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাই ইহার উদ্দেশ্য।

জলশক্তি (Water power): জলশক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক অফুরন্ত উৎস। জলশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয়ও সর্বাপেক্ষা অল্প। প্রতি একক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে কয়লার ক্ষেত্রে ব্যয় হয় ৩ পয়সা, ডিজেল তৈলে ২৫ প, পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে ৩৫ প.। আর জলশক্তির ক্ষেত্রে মাত্র ১·২ প.।

ভারতের সর্বত্র কয়লা পাওয়া যায় না, বা খনিজ তৈলের ভাণ্ডারও পর্যাপ্ত নহে। অথচ দেশের সর্বত্র নদনদীর অভাব নাই। জলশক্তি পরিচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রপাতি প্রভৃতির জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায়, কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতির জন্য ২/৩ গুণ বেশী বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। ভারতে জলশক্তিরদ্বারা মোট ৪ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা বর্তমান। ইহার মধ্যে প্রকৃত উৎপাদন ঘটিয়াছে—

১৯৫১ সালে	৫ লক্ষ	৬০ হাজার	কিলোওয়াট	
১৯৫৬ ”	৯ ”	৪০ ”	”	এবং
১৯৫৯-৬০ ”	১৫ ”	৩০ ”	”	

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন লক্ষ্য ছিল ২১ লক্ষ কিলোওয়াট। তৃতীয় পরিকল্পনায় জলশক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে ৪৭ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট। উহাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উন্নয়নের জন্য যে মোট ৯২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৫৮০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে জলশক্তি, কয়লা এবং তৈল সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য।

পরমাণুশক্তি (Atomic power): শান্তিপূর্ণ ক্ষেত্রে মানবসমাজের বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য পরমাণুশক্তি এক অভাবিত সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে ইহা এক অফুরন্ত উৎস। পৃথিবীর তৈল ও কয়লার ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে। উহা ক্রমেই নিঃশেষিত হইতেছে। সেজন্য উত্তরোত্তর সকল

দেশকেই জলশক্তি ও পরমাণুশক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। পরমাণুশক্তির সাহায্যে [illegible] ব্যয় একক প্রতি ৩'৫ হইতে ৪ পয়সা পড়ে। সেদিক হইতে জলশক্তির তুলনায় ইহার ব্যয় অধিক [illegible] কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়ের ইহা সমকক্ষ। বিশেষত যেখানে তৈল বা কয়লা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না এবং জলশক্তিরও অভাব বর্তমান বা উহার লাভজনক রূপে ব্যবহার সম্ভব নহে, সে সকল স্থানই পরমাণু-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযুক্ত। সে দিক হইতে ভারতে ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। তাহা ছাড়া পরমাণুশক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ইউরেনিয়ামের সর্বাধিক ভাণ্ডার ভারতে বর্তমান। এজন্য ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিপুল। তবে ইহার প্রাথমিক ব্যয় অত্যন্ত বেশী বলিয়া, পরমাণুশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব করিবার জন্য ভারতকে আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

পরমাণুশক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক কার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার জন্য ২৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬৬ সালে পরমাণুশক্তির সাহায্যে ৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

৫

মানবিক উপাদান
The Human Factor

জনসমষ্টি বা মানবিক উপাদানের গুরুত্ব
IMPORTANCE OF POPULATION

দেশের জাতীয় আয় উৎপাদনের চারিটি উপাদানের মধ্যে মৌলিক উপাদান দুইটি—ভূমি এবং শ্রম। ভূমি (Land) বলিতে যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ বুঝায়। ইহাকে প্রাকৃতিক উপাদানও (natural factor) বলে। শ্রম বলিতে মানুষের মানসিক ও কায়িক শক্তির ব্যবহার বুঝায়। যে কোন দেশে শ্রমের যোগান উহার জনসমষ্টির (Population) পরিমাণ ও গুণাগুণ (quantity and quality) দ্বারা নির্ধারিত হয়। এজন্য ব্যাপক অর্থে জনসমষ্টিকে উৎপাদনের মানবিক উপাদান (human factor) বলিয়া গণ্য করা হয়।

অর্থবিদ্যার তত্ত্বগত ক্ষেত্রে বা যে কোন দেশের বিবিধ অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায় জনসমষ্টির পর্যালোচনা অপরিহার্য, ইহার প্রধান কারণ তিনটি : ১. জনসমষ্টির পরিমাণ ও গুণাগুণের দ্বারা জাতীয় আয়ের অর্থাৎ সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ নির্দিষ্ট হয়। ২. জনসমষ্টি অর্থাৎ দেশবাসীর অভাবতৃপ্তির জন্যই জাতীয় আয় উৎপাদন ও বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুতরাং জনসমষ্টি যেমন উৎপাদনের উপাদান, তেমনি উৎপাদনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যও বটে। ৩. আধুনিক প্রগতিশীল দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে জনসমষ্টির আলোচনার গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ, জনসমষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ নির্দিষ্ট হয়। উহার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখিয়া পরিকল্পনা কার্যকর করিবার উপযুক্ত পন্থা নির্বাচিত হয়।

ভারতের জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য
FEATURES OF POPULATION IN INDIA

১. পরিমাণ (Size) : ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবে ভারতের মোট জনসমষ্টি ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। জনসমষ্টির আয়তনে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয়। চীন প্রথম।

২. বসতির ঘনত্ব (Density) : ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবে ভারতে প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা ৩৭০ জন লোক বাস করে।

৩. বসতির আঞ্চলিক বণ্টন (Territorial distribution of population) : ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যে জনবসতির বণ্টনে কিন্তু যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, দিল্লী, লাক্ষাদ্বীপ-মিনিকয় আমিনদিবি দ্বীপপুঞ্জ, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে জনবসতির ঘনত্ব যেখানে যথাক্রমে ৪৬৪০, ২১৯২, ১১২৭ ও ১০৩২ তাহার পাশাপাশি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, নাগাল্যাণ্ড, হিমাচলপ্রদেশ, রাজস্থান ও আসামে বসতির ঘনত্ব হইল যথাক্রমে ২০, ৫৮, ১২৪, ১৫৩ ও ১৫৫।

৪. স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত (Sex Ratio) : ভারতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বর্তমানে ৯৪১। ১৯৫১ সালের লোকগণনার হিসাবে উহা ছিল হাজার পুরুষ

১৪৬।
এই হ্রাস অবশ্য গত ১৯০১ সাল হইতেই লক্ষ্য করা যায়। পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাল্পতা ভারতের জনসংখ্যার অন্যতম সমস্যা। বর্তমানে মোট ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ জনসমষ্টির মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ২২ কোটি ৬০ লক্ষ ও ২১ কোটি ৩০ লক্ষ অর্থাৎ জনসমষ্টির ৫১'৪ শতাংশ পুরুষ ও ৪৮'৬ শতাংশ নারী।

৫. বয়স হিসাবে জনসমষ্টির গঠন (**Age Composition**): ভারতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত শিশু ও বালক-বালিকার অনুপাত ৩৮'৩, ১৫ হইতে ৫৪ বৎসরের কর্মক্ষম কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী এবং প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়ার অনুপাত ৫৩'৪ ও তদূর্ধ্ব বয়সের নরনারীর অনুপাত ৮'৩। কর্মক্ষম বয়সের অর্থাৎ ৫৩'৪ শতাংশের প্রায় অর্ধেক নারী। এদেশে এখন পর্যন্ত নারীগণ গৃহকর্মে আবদ্ধ থাকে বলিয়া মোট জনসংখ্যার তুলনায় কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির অর্থাৎ শ্রমের যোগান যথেষ্ট নহে।

৬. জন্ম ও মৃত্যুহার (**Birth & Death Rates**): ভারতে হাজার প্রতি জন্ম ও মৃত্যু হার যথাক্রমে ৪০ ও ১৬ হইতে ১৮। উন্নত দেশগুলির তুলনায় ইহা অধিক।

৭. জনসমষ্টি বৃদ্ধির হার (**Rate of Growth**): ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৬১ সালের মধ্যে ভারতে মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিমাণ ৭ কোটি ৬৯ লক্ষ। অর্থাৎ গত দশকে বৃদ্ধির হার ২১'৪৯ শতাংশ। ইহাতে দেখা যায় প্রতি বৎসর জনসংখ্যা ২'১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের বর্তমান উন্নয়নমুখী অর্থনীতিতে এই অভূতপূর্ব উচ্চহারে দ্রুত বৃদ্ধিশীল জনসংখ্যা দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। ইহাতে আমাদের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় প্রচণ্ড জটিলতা দেখা দিয়াছে।

৮. গড় আয়ু (**Expectation of life**): ১৯৬১ সালের লোকগণনায় ভারতবাসীর গড় আয়ু ৪৫ বৎসর। ধীরে ধীরে এদেশে মানুষের গড়পড়তা আয়ু বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু অন্যান্য অগ্রসর দেশের তুলনায় ইহা এখনও অনেক অল্প।

৯. গ্রাম ও শহরে জনসমষ্টির বণ্টন (**Rural and Urban population**): কোন দেশের গ্রামে ও শহরে জনসমষ্টির কত শতাংশ বাস করে তাহা দ্বারা উহার অর্থনীতির প্রকৃতি ধরা পড়ে। ভারতে এতদিন যাবৎ মোট জনসমষ্টির অধিকাংশই গ্রামে বাস করিত কিন্তু যদিও এখনও বৃহত্তর জনসমষ্টি গ্রামেই বাস করে, তথাপি গ্রামের তুলনায় শহরবাসীর অনুপাত দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা দেশের ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের ইঙ্গিত দেয়। ১৯৩১ সাল হইতে এই সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা যাইতেছে। বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টায় ইহা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৩১ সালে গ্রামে জনসংখ্যার ৮৭'৯ শতাংশ ও শহরে ১২'১ শতাংশ বাস করিত। ১৯৬১ সালের লোকগণনায় উহা হইয়াছে ৮২'১৬ ও ১৭'৮৪ শতাংশ। ১৯৬১ সালে ভারতে ১ লক্ষের অধিক অধিবাসীসম্পন্ন শহরের সংখ্যা ছিল মাত্র ১০৭ ও ২০ হাজারের অধিক অধিবাসী সম্পন্ন নগরের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫১৫। গ্রামবাসীর বিপুল আধিক্য এবং শহরের সংখ্যার নগণ্যতা এদেশের গ্রাম ও কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির সুস্পষ্ট পরিচায়ক।

১০. জীবিকা অনুযায়ী জনসমষ্টির বণ্টন (**Occupational Distribution of Population**): ১৯৬১ সালের লোকগণনার হিসাবে ভারতে প্রতি ১০০ জন কর্মনিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ৬৯ জন কৃষিতে, ২ জন বন, বাগিচা ও খনিতে, ১১ জন শিল্পে

... শ্রমশিল্প ও পূর্ত কার্যে, ৪ জন ব্যবসায় ও বাণিজ্যে, ২ জন পরিবহণ, গুদামজাতকরণ ও সংসরণে এবং ১০ জন অন্যান্য সেবা কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছে।

১১. **জনসমষ্টির অর্থনীতিক অবস্থা** (**Economic Status**): ভারতে আত্মনির্ভরশীল উপার্জনকারীর (self-supporting) অনুপাত ২৯.৩ শতাংশ, উপার্জনহীন-নির্ভরশীল (non-earning dependents) ছিল ৬০.১ শতাংশ ও উপার্জনকারী নির্ভরশীল (earning dependents) ব্যক্তির অনুপাত ছিল ১০.৬ শতাংশ। ইহা হইতে এদেশে কিরূপ জনসমষ্টির স্বল্পাংশকে জনসমষ্টির অধিকাংশের ভরণপোষণের বিপুল ভার বহন করিতে হয় তাহা দেখা যাইতেছে।

১২. **অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির** (**Literacy**) **অনুপাত:** ১৯৬১ সালের লোক-গণনায় দেখা যায়, গত দশকে এদেশে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অনুপাত ৭.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ সালে মোট অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অনুপাত ১৬.১ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬১ সালে ২৩.৭ শতাংশ হইয়াছে। সাক্ষর পুরুষের অনুপাত হইয়াছে ৩৩.৯ ও নারী ১২.৮। ১৯৫১ সালে উহা যথাক্রমে ২৪.৯ শতাংশ ও ৭.৯ শতাংশ ছিল। দেশের অর্থনীতিক পরিবর্তনের যথাযথ সহায়তার জন্য শিক্ষা প্রসারের এই হার মোটেই সন্তোষজনক নহে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও অর্থনীতিক উন্নয়ন
POPULATION GROWTH AND ECONOMIC DEVELOPMENT

যে কোন দেশের জনসমষ্টি এবং উহার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত ঐ দেশের অর্থনীতিক অবস্থা, উৎপাদন, জাতীয় আয় এবং জীবনযাত্রার মানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

সাধারণত, দেশের জনসমষ্টি ক্রমবর্ধমান হইলে, সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। উহাতে যাবতীয় অর্থনীতিক কার্যকলাপের সম্প্রসারণের সুযোগ দেখা দেয়। ইহার ফলে বিনিযোগ বৃদ্ধি পায়। বিনিযোগের ক্রমাগত বৃদ্ধি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে। চাহিদা ও বিনিযোগের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে ব্যাপকরূপে দ্রুত কারিগরী অগ্রগতির সহায়তা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। নিত্য নূতন যন্ত্রপাতি, প্রযোগ কৌশল, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত হয়। অধিকতর পরিমাণে বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ ঘটে। দেশের উৎপাদন ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। জনসমষ্টি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলে উহার ফলে দেশের সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজনমত অতিরিক্ত শ্রমের যোগান দেওয়া যায়।

উপরে জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুন যে সকল সুবিধার কথা বলা হইয়াছে, তাহার সকলই নির্ভর করে জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপর। অর্থাৎ অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উন্নত ও অগ্রসর দেশগুলির ক্ষেত্রেই ইহা সম্ভব। কিন্তু ভারতের মত, এশিয়া ও আফ্রিকার যে সকল দেশ অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত তাহাদের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অর্থনীতিক উন্নতির প্রচেষ্টা ও অগ্রগতিতে সবিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করে। এই জটিলতার প্রকৃতি সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য আমরা প্রথমে অর্থনীতিক উন্নতির উপর জনসমষ্টির বৃদ্ধির ফলাফলের আলোচনা করিব। তাহার পর আলোচনা করিব জনসংখ্যার উপর অর্থনীতিক উন্নতির প্রতিক্রিয়া।

ক. স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল (Effects of population growth on economic development of underdeveloped countries): স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নতির প্রচেষ্টা ও অগ্রগতিতে দেশের ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টি যে কিরূপ জটিলতা সৃষ্টি করিতে পারে তাহা ভারতের

দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়। অনেকের মতে জনসমষ্টির দ্রুত বৃদ্ধি উন্নতির পথে প্রবল অন্তরায়।

সাধারণত জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেশের অর্থনীতিক উন্নতির পথ সুগম করিয়া থাকে। কারণ, একদিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে দেশে সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। অপর দিকে জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এইরূপে দেশের মোট উৎপাদন অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধির, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই অনুকূল পরিবেশের সুযোগ কতখানি গ্রহণ করা যাইবে তাহা নির্ভর করে দেশের কারিগরী জ্ঞানের স্তর, কৃষি ও শিল্পের অবস্থা, অন্যান্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের সম্ভাবনা ও পুঁজিগঠন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষমতার উপর এবং সর্বোপরি অর্থনীতিক কাঠামোর উপর।

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। কৃষির কাঠামো এখনও পশ্চাদ্‌পদ এবং দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপযুক্ত। শিল্পক্ষেত্রে এখনও ভোগ্যপণ্য শিল্পের প্রাধান্য রহিয়াছে। মূল ও বুনিয়াদী শিল্পের ভিত্তি কেবলমাত্র রচিত হইতেছে। দেশে নানারূপ প্রাকৃতিক সম্পদের অব্যবহৃত ভাণ্ডার থাকিলেও, উহা ব্যবহারের জন্য যে হারে পুঁজিগঠন প্রয়োজন তাহা আয়ের স্বল্পতার জন্য সম্ভব হইতেছে না। সর্বোপরি, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্য গৃহীত হইলেও ভারতে এখনও ধনতান্ত্রিক কাঠামো বর্তমান। ইহা দেশের সর্বাত্মক উন্নতির প্রধান অন্তরায়।

এই পটভূমিকায় ভারতের বর্তমান অর্থনীতিক উন্নতির প্রচেষ্টার উপর জনসমষ্টির বৃদ্ধির ফলাফল বা প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিতে হইবে।

ভারতের জনসমষ্টি আয়তনের দিক হইতে পৃথিবীতে দ্বিতীয় বৃহত্তম। ১৯৪১-৫১ সালের দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১·৪ শতাংশ। গত প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে, দেশে রোগ, মহামারী প্রভৃতির প্রকোপ হ্রাস ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতির দরুন মৃত্যুহার হ্রাস পাইয়াছে। ইহার দরুন গত দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২·৪ শতাংশে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু নিছক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্বারা প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না বা ইহা যে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ তাহাও নহে। জনসমষ্টি বৃদ্ধির হার অপেক্ষা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হইল বৃদ্ধির পরিমাণ। সে হিসাবে আমরা দেখিতে পাই ভারতে ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ কোটি ৪১ লক্ষ এবং ১৯৫১ হইতে ১৯৬১ সালের মধ্যে বৃদ্ধির পরিমাণ ৭ কোটি ৬৯ লক্ষ। একমাত্র গত দশকেই ভারতের জনসমষ্টি যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বৃটেনের মোট জনসমষ্টিরও অধিক।

পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের দরুন জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার আরও কিছুকাল নিশ্চিত রূপেই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। কারণ সকল দেশেই দেখা গিয়াছে যে, অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

এই ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টি অর্থনীতিক উন্নতির গতিবেগ বিশেষ ভাবেই কমাইয়া দিতেছে। তাহার কারণ,—

১. এই ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির অধিকাংশই অপ্রাপ্ত বয়স্ক। ইহারা শ্রমের যোগান বাড়াইতেছে না, কিন্তু দেশে ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করিতেছে। সুতরাং দেশের আয়ের যে অংশ সঞ্চিত হইয়া পুঁজিগঠনে লাগিত, উৎপাদন বৃদ্ধি করিত, তাহা সরাসরি ইহাদের অভাব পূরণের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। ফলে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পাইতেছে না।

শ্রমিকেরা প্রায় ৭০ ভাগই কৃষক। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসমষ্টিই বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে কৃষি জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বাড়িতেছে। ইহাতে একদিকে কৃষিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম চলিতেছে, অপর দিকে কৃষিজীবিদের মধ্যে প্রচ্ছন্নকর্মহীনতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

৩. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য অধিকতর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইতেছে বলিয়া সম্প্রসারণশীল শিল্পসমূহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচামাল উৎপাদন করা যাইতেছে না।

৪. উৎপন্ন খাদ্যশস্যের অধিকাংশই উৎপাদনকারী ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতেছে। এজন্য বাজারে শস্যের যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে না। ফলে সমগ্রভাবে দেশের খাদ্যাভাব দূর করিবার জন্য দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া বিদেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইতেছে। ইহাতে শিল্পোন্নতির জন্য যথেষ্ট পুঁজিদ্রব্য আনা যাইতেছে না।

৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দেশের মধ্যে বিবিধ দ্রব্যসম্ভারের মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার কথা। কিন্তু ভারতের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত অল্প বলিয়া ক্রয়ক্ষমতার অভাবে, কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই আলোচনায় দেশের বর্তমান অর্থনীতিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ থাকিবে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। যদি তাহা না হয়, অর্থাৎ ইতিমধ্যে যদি অর্থনীতিক কাঠামোর রূপান্তর ঘটে, সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ অর্থনীতিক পরিকল্পনার সাহায্যে ক্রমবর্ধমান জনশক্তির যথাযথ ব্যবহার সম্ভবপর হইবে। অর্থনীতিক অগ্রগতির পথে উহা আর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

খ. জনসংখ্যার উপর অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া (Effects of Economic Growth on population) : দেশের জনসংখ্যা ও অর্থনীতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক সম্পর্ক রহিয়াছে। জনসংখ্যার আয়তন ও বৃদ্ধির হার যেমন দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে, তেমনি অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাও জনসংখ্যাকে বিভিন্নরূপে প্রভাবিত করে।

১. অনুন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নতির অন্যতম ফল উহার জনসমষ্টির বৃদ্ধি। তবে এই বৃদ্ধির হার উন্নতির সর্বাবস্থায় একরূপ নহে। অর্থনীতিক উন্নতির প্রথম অবস্থায় অনুন্নত দেশগুলিতে যখন বহু প্রতীক্ষিত স্বাস্থ্যোন্নতি ও রোগপ্রতিষেধক ব্যবস্থা গৃহীত হইতে থাকে, উহার দরুন মৃত্যুহার কমিতে থাকে। ফলে জনসংখ্যা সেই সময় দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহার পর যখন জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হয়, জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বাড়ে, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির সামগ্রিক উন্নতি ঘটে তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পায়। কি কি কারণে জন্মহার হ্রাস পায় সে বিষয়ে এখনও কোন সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পণ্ডিতেরা দিতে পারেন নাই, কিন্তু এ প্রবণতা সুনিশ্চিতভাবে সর্বত্রই দেখা যায়। পরে এমনও দেখা যায় যে জনসমষ্টি স্থিতিশীল হইয়া পড়িয়াছে অথবা হ্রাস পাইতেছে। অত্যন্ত অগ্রসর এবং জীবনযাত্রার উন্নতমানবিশিষ্ট ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে এইরূপ জনসমষ্টি হ্রাসের সংকট উহাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-বিশেষ। এই যুক্তির অনুসরণে ইহা বলা যায় যে, ভারতে এখনও আগামী বেশ কিছু-কাল পর্যন্ত দ্রুত হারে জনসমষ্টি বৃদ্ধি ঘটিবে। পরে অবশ্য পরিপূর্ণ জাতীয় অর্থনীতিক বিকাশ ঘটিলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিতে পারে কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে উহার কোন সম্ভাবনা নাই।

২. অর্থনীতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় ফল হইতেছে জীবিকানির্বাহের [illegible] জন-সমষ্টির পুনর্বণ্টন। জীবিকানির্বাহের যাবতীয় উপায়গুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যথা,

ক. জীবিকানির্বাহের প্রাথমিক উপায় (Primary occupations), যেমন কৃষি ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলী। খ. জীবিকানির্বাহের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপায় (Secondary occupations), যেমন বিভিন্ন শিল্প প্রভৃতি। গ. জীবিকানির্বাহের তৃতীয় পর্যায়ের উপায়সমূহ, (Tertiary occupations) যথা শিক্ষা, পরিবহণ, ব্যবসায়, বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং বীমা ইত্যাদি।

অনুন্নত দেশগুলির জনসাধারণের অধিকাংশই প্রাথমিক পর্যায়ের জীবিকার উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে। অর্থনীতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের জীবিকাসমূহের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ঐগুলিতে জনসমষ্টির ক্রমবর্ধমান অংশ নিযুক্ত হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কৃষি ও আনুষঙ্গিক কার্যাবলীতে নিযুক্ত জনসমষ্টির অনুপাত হ্রাস পায়। যন্ত্রপাতির সাহায্যে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অধিক পরিমাণ কৃষি সম্পদ উৎপাদনে সক্ষম হয়। কৃষি হইতে উৎসাদিত কৃষক ও দেশের ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টি ক্রমেই অধিক পরিমাণে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের জীবিকাগুলিতে নিযুক্ত হয়। এইরূপে অর্থনীতিক উন্নয়নের দরুন দেশের বিভিন্ন জীবিকানির্বাহের উপায়গুলির মধ্যে জনসাধারণের পুনর্বণ্টন ঘটে।

৩. অর্থনীতিক উন্নয়নের দরুন জাতীয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের জীবন-যাত্রার মান ক্রমাগত উন্নত হইয়া থাকে। জীবনযাত্রার মানোন্নতির ফলে, উৎকৃষ্টতর খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও শিক্ষা-দীক্ষার অধিকতর সুব্যবস্থার দরুন জনসমষ্টির গুণগত উন্নতি (qualitative improvement) ঘটে।

৪. অর্থনীতিক উন্নয়নের ফলে দেশে যতই বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিবহণ ও অন্যান্য কার্যাবলীর প্রসার ঘটিতে থাকে, ততই গ্রাম হইতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় জনসমষ্টি শহরাঞ্চলের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। পুরাতন শহরের লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, নূতন শহর সৃষ্ট হয়। উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের তুলনায় শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ে। এইরূপে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মধ্যে লোকসংখ্যার পুনর্বণ্টন ঘটে। শুধু তাহাই নহে, পরিকল্পিতভাবে দেশের জন-বিরল অঞ্চলে শিল্পস্থাপন করিয়া, জনবহুল অঞ্চল হইতে তথায় জনসমষ্টি আকৃষ্ট করিয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনসমষ্টির সুষম বণ্টন-এর চেষ্টা করা যায়।

৫. অর্থনীতিক উন্নতির ফলে দেশে সকলপ্রকার পরিবহণ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি ঘটে। ইহার সহিত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির দরুন ও শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের ফলে মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে, এক অঞ্চল হইতে অপরাপর অঞ্চলে মানুষের যাতায়াত বাড়ে। ইহাতে দেশের মধ্যে শ্রমের সচলতা (mobility of labour) বৃদ্ধি পায়। ইহা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির বিশেষ সহায়ক।

ভারতে কি জনাধিক্য ঘটিয়াছে ?
IS INDIA OVER-POPULATED ?

ভারতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই "জনাধিক্য" বা Over-population কথাটির সুস্পষ্ট অর্থ জানা প্রয়োজন। জনাধিক্য কাহাকে বলে তাহা বুঝিবার দুইটি মাপকাঠি আছে। প্রথমত, ম্যালথাস মতাবলম্বিগণ মনে করেন দেশের খাদ্য-

জনসমষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিতে অক্ষম, প্রকৃত জনসমষ্টি উহার অধিক হইলে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং জনাধিক্যতার প্রধান লক্ষ্য হইল দেশে খাদ্য ঘাটতি। ইহা ছাড়াও অত্যধিক জন্ম ও মৃত্যু হার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী, অনাহার, তীব্র দারিদ্র প্রভৃতি উহার অন্যান্য লক্ষণ। দ্বিতীয়ত, কাম্য জনসংখ্যার মতবাদের সমর্থকগণ জাতীয় ও মাথাপিছু আয় দ্বারা জনসমষ্টি বিচার করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে জাতীয় এবং মাথাপিছু আয় বাড়িতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত জনসংখ্যা বাড়িলেও, দেশে জনাধিক্য ঘটে নাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু জনসমষ্টি বৃদ্ধির সহিত মাথাপিছু আয় হ্রাস পাইলেই জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ম্যালথাসের মতে জনাধিক্য একটি চূড়ান্ত অবস্থা। ইহা দ্বারা চূড়ান্তভাবেই দেশ উহার বর্তমান জনসমষ্টি ধারণে অক্ষম বুঝায়। কিন্তু কাম্য জনসংখ্যা মতবাদ অনুযায়ী জনাধিক্য কোন চূড়ান্ত অবস্থা নহে। আজ যে জনসংখ্যা অধিক বলিয়া মনে হইতেছে আগামীকাল নূতন প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কারে, নূতন যন্ত্রপাতি, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে ও শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে, ঐ জনসংখ্যার দ্বারাই আরও অধিক পরিমাণে জাতীয় আয় উৎপাদন করা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে উহা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যাকে শুধুমাত্র খাদ্যোৎপাদন দ্বারা বিচার না করিয়া দেশের সর্বপ্রকার সম্পদ উৎপাদনের মোট সমষ্টি (অর্থাৎ জাতীয় আয়) দ্বারা বিচার করা হয়।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে কোন দেশে জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা তাহা দেশের আয়তন কিংবা শুধু মাত্র খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। যদি তাহাই হইত তবে ইংলণ্ড কিংবা হল্যাণ্ড বহু পূর্বেই জনাধিক্যের সমস্যায় প্রপীড়িত বলিয়া গণ্য হইত।

জনাধিক্য ঘটিয়াছে কিনা তাহা বিচার করিবার যে মানদণ্ড আধুনিককালের পণ্ডিতগণ মানিয়া লইয়াছেন তাহা হইল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইতেছে কিনা।

এই আলোচনার পটভূমিকায় ভারতের জনাধিক্য সংক্রান্ত সমস্যার বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

ক. **ম্যালথাস মতাবলম্বীদের** ভারতীয় অনুগামীরা এদেশে চূড়ান্তভাবে জনাধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করেন। এবং ইহার **সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তি ও তথ্য** উল্লেখ করেন।

১. **উচ্চ জন্মহার ও মৃত্যুহার ঃ** ভারতে বর্তমানে জন্ম ও মৃত্যুহার বৎসরে প্রতি হাজারে ৪০ ও ১৬-১৮ এবং শিশুমৃত্যু হার ১২৫-১৪০। এই হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি।

২. **জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঃ** ১৯২১ সালের পর হইতে প্রতি দশকে উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান হারে জনসমষ্টি বাড়িতেছে। গত দশকে (১৯৫১-৬১) বৃদ্ধির হার হইয়াছে ২১.৫ শতাংশ বা বাৎসরিক ২.১ শতাংশ। শুধু যে জনসমষ্টি বৃদ্ধির হার অধিক তাহাই নহে, তদপেক্ষা বৎসরে বৃদ্ধির মোট পরিমাণই অধিকতর দুশ্চিন্তার কারণ। গত দশ বৎসরেই ভারতে যে পরিমাণ লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে তাহা গ্রেটবৃটেনের মোট জনসমষ্টি অপেক্ষা অধিক।

৩. **দেশে খাদ্য ঘাটতি ঃ** খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেশের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ ভাগে খাদ্য উৎপাদনের কিছুটা উন্নতি ঘটিলেও ১৯৫৬ সালে পুনরায় অবস্থার অবনতি ঘটে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে মোট প্রায় ২ কোটি টন খাদ্য আমদানি করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে দেশে পুনরায় সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে।

৪. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায়সমূহের প্রাদুর্ভাব ঃ** ম্যালথাস

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে সকল প্রাকৃতিক উপায়ের কথা বলিয়াছিলেন সেই সমস্তই ভারতে আছে। অনাহার, মহামারী, আত্মহত্যা, শিশুমৃত্যু ইত্যাদি ভারতের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

৫. **তীব্র দারিদ্র্য ঃ খাদ্যে পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাব, স্বল্পায়ু ইত্যাদি ঃ** দুইটি পরিকল্পনার পরেও দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ মানুষের মাসে গড়ে ১৪ টাকা ৬ পয়সা করিয়া খরচ করিবার মত সামর্থ্য নাই (অধ্যাপক মহলানবীশের বক্তৃতা)। ভারত সরকারের মতে বর্তমানে দেশবাসীর দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ২২০০ হইতে ২৪০০ ক্যালরি। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে ন্যূনতম ক্যালরির পরিমাণ হওয়া উচিত ৩০০০।

৬. **জনশক্তির অপচয় ঃ** ডঃ জ্ঞানচাঁদ দেখাইয়াছেন ভারতে যত লোক জন্মায় তাহার একতৃতীয়াংশ ২৫ বৎসর বয়সের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৭. **ব্যাপক কর্মহীনতা ঃ** প্রথম পরিকল্পনার শেষে কর্মহীনের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৩ লক্ষ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭০ লক্ষে পরিণত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা অন্তত ২ কোটি ২০ লক্ষ বলিয়া অনুমান করা যায়। পরিকল্পনাকালে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থানের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এ লক্ষ্য পূর্ণ হইলেও ৮০ লক্ষ লোক তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকার থাকিয়া যাইবে। ইহা ছাড়া আছে ব্যাপক স্বল্পনিযুক্তি।

খ. অপর পক্ষে, **কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের** অনুগামীরা মনে করেন যে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই। তাঁহারা এই **বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তি ও তথ্যসমূহ** উপস্থাপিত করেন।

১. **ভারতে জনবসতির ঘনত্ব পৃথিবীর অনেক দেশ অপেক্ষা কম ঃ** জনবসতির ঘনত্ব ভারতে গড়ে প্রতি মাইলে ৩৭০। তুলনায় ইংলণ্ডে ৫৩৬, বেলজিয়ামে ৬৫৪ জাপানে ৫৭৯ এবং ইতালীতে ৩৯৪।

২. **দেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঃ** ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যস্তরে হিসাব করিলে দেখা যায় ১৯৪৮-৪৯ সালের মাথাপিছু আয় ২৪৬ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে ২৭৩ টাকা এবং ১৯৬১-৬২ সালে ২৯৩.৪ টাকা হইয়াছে।

৩. **অব্যবহৃত সম্পদের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার ঃ** ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার প্রায় অফুরন্ত বলিলেই চলে। অল্প কয়েকটি সম্পদ ব্যতীত আর অন্যান্য সকল সম্পদই পর্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে। জরীপ কার্যের দ্বারা দেশের বিবিধ অঞ্চলে বহু প্রকারের খনিজ সম্পদের অবস্থিতির কথা জানা যাইতেছে। অদ্যাবধি অজস্র সম্পদ অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে সমস্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হইলে মাথাপিছু আয় বাড়িবে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এবং আরও বহু সংখ্যক লোককে এই দেশ ধারণ করিতে পারিবে।

৪. **দারিদ্র্য, অপুষ্টি, জীবনযাত্রার নিম্নমান ইত্যাদির জন্য দেশের জনসংখ্যার পরিমাণকে দায়ী করা চলে না।** কৃষি ও শিল্পের পশ্চাৎপদ অবস্থাই প্রধানত দায়ী। শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতিতে আধুনিকতম কলাকৌশলের প্রয়োগ, দক্ষতা সহকারে ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা—এই সকল বিষয়েও পৃথিবীর বহুদেশ হইতে ভারত অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। কৃষি ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থা দেখা যায়। ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পে যে সাফল্য অর্জিত হইয়াছে তাহা মোটামুটিভাবে এই মতকেই সমর্থন করে।

সম্পদের (অর্থাৎ জাতীয় আয়ের) সুসম বণ্টন ব্যবস্থার অভাবও জনসাধারণের দারিদ্রকে যথেষ্ট তীব্র করিয়াছে। প্ল্যানিং কমিশনও স্বীকার করিয়াছেন যে পরিকল্পনাকালে যে অতিরিক্ত আয়বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার অধিকাংশ দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকের হস্তগত হইয়াছে। এই বর্ধিত আয়ের যদি সুষম বণ্টন করা যাইত তবে দারিদ্র অবশ্যই হ্রাস পাইত এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান আরও বৃদ্ধি পাইত।

এই সকল যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা কাম্য জনসংখ্যা মতবাদের সমর্থকগণ ভারতে জনাধিক্যের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া থাকেন।

পরস্পরবিরোধী এই দুই দলের বক্তব্য পর্যালোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ম্যালথ্যাস বর্ণিত অর্থে ভারতে চূড়ান্তভাবে জনাধিক্য ঘটিয়াছে এই সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

অপর পক্ষে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই—কাম্য জনসংখ্যাবাদীদের এই মতও অনেকে স্বীকার করেন না। কারণ জনাধিক্যের চাপ ও উহার বিবিধ লক্ষণসমূহ ভারতে খুবই প্রকট। এ প্রসঙ্গে আপেক্ষিক (relative) চূড়ান্ত (absolute) জনাধিক্যের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। ভারতে চূড়ান্ত জনাধিক্য ঘটে নাই বটে তবে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিক জনাধিক্য রহিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

জনাধিক্যের সমস্যার বিচারে অনেকে জনাধিক্যের অবস্থা (state of over-population) এবং জনাধিক্যের প্রবণতা (tendency to over-population) এই দুইটি বিষয়ের পার্থক্যের উপরে জোর দেন। ইঁহাদের মতে ভারত এখনও চূড়ান্ত জনাধিক্যের অবস্থায় পৌঁছায় নাই। কিন্তু জনাধিক্যের প্রবণতা সুস্পষ্ট ভাবেই বর্তমান। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির আধুনিক ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হইলে ও বিপুল পরিমাণে অব্যবহৃত সম্পদ আহরণ করিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধির সুবন্দোবস্ত করিতে না পারিলে অল্পকালের মধ্যেই এই জনাধিক্যের প্রবণতা ভারতে জনাধিক্যের অবস্থা সৃষ্টি করিবে।

উপসংহার: সাম্প্রতিককালে ডাঃ জ্ঞানচাঁদ প্রমুখ কতিপয় মনীষী জনসংখ্যার সমস্যাকে এক সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়াছেন। ইঁহারা মনে করেন যে জনসংখ্যা ও উহার বৃদ্ধিকে শুধুমাত্র দেশের সম্পদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা দ্বারা বিচার করিলেই চলিবে না। এ পর্যন্ত জনসংখ্যা সমস্যার যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও উৎপাদন সম্পর্ক (Economic Structure and Production Relations) অর্থাৎ এককথায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা) অপরিবর্তিত থাকিবে এবং ঐ কাঠামোর মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ জ্ঞানচাঁদ প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে, এইরূপ মনোভাবের কোন যৌক্তিকতা নাই। তাঁহারা বলেন যে বর্তমান অর্থনীতিক কাঠামো বর্তমান জনসংখ্যার দারিদ্র দূর করিতেই অক্ষম। সুতরাং এই ব্যবস্থা বর্তমান থাকিলে ভবিষ্যতে বর্ধিত জনসমষ্টির অর্থনীতিক উন্নয়নের আশা করা বৃথা।

প্রকৃতপক্ষে দেশের অর্থনীতিক সম্পদ, অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উৎপাদন সম্পর্কের পটভূমিকায় জনসংখ্যা ও উহার বৃদ্ধিকে বিচার করা উচিত। এই বিচারে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যেই সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির বর্তমান বাধাগুলি দূর করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ ও বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সম্ভব। এবং একমাত্র তখনই সমাজের বিভিন্ন অব্যবহৃত সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার ও জনাধিক্যের সমস্যার সমাধান সুনিশ্চিত করা যায়।

ভারতে যাহারা জনাধিক্যের দুঃস্বপ্নে আতঙ্কিত হইয়া পরিবার পরিকল্পনার দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করিতে চাহেন তাঁহাদের একথা মনে রাখা উচিত যে একমাত্র সুদীর্ঘকালেই ঐ ব্যবস্থা কার্যকর হইতে পারে। সুতরাং স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে ইহার বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই। দেশের বর্তমান সমস্যা হইতেছে অনতিবিলম্বে দ্রুতগতিতে অর্থনীতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা। উহার চাবিকাঠি রহিয়াছে অর্থনীতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিবর্তনের মধ্যে।

জনসংখ্যা-পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা সম্পর্কিত সরকারী নীতি
POPULATION PLANNING AND GOVERNMENTAL POLICY

. পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন ভারতবর্ষে জনসংখ্যার তুলনায় জমি এবং পুঁজি দ্রব্যের অপ্রাচুর্যের জন্য জনসাধারণের আয়ের এবং জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি, একমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে হ্রাস করিবার কার্যকর ব্যবস্থাব উপর নির্ভব কবে।

সুতরাং, পরিকল্পনাকালে জন্মহার হ্রাসের ব্যবস্থা করা পরিকল্পনার একটি অন্যতম শর্ত হইয়া দাঁড়ায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই ভারত সরকার জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের (Population Planning & Control) গুরুত্ব শুধুমাত্র স্বীকার করিয়াছেন তাহাই নহে, ইহাকে কার্যকর করার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জন্মহার হ্রাসের জন্য পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিরও প্রচলন করিয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশন পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থার সুপারিশ করিয়াছেন। যথা, এই বিষয়ে জনশিক্ষার ব্যাপক প্রসাবের মধ্য দিয়া পরিবার পরিকল্পনাকে সর্বজনগ্রাহ্য কবিবার জন্য জনমত গঠন, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করিবার জন্য সুপরিকল্পিত প্রচারব্যবস্থা, পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ ও উপদেশ দানের জন্য বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রস্থাপন, জন্মনিযন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সুলভে বিক্রয় অথবা বিনামূল্যে বিতরণ এবং স্ত্রীলোকেব বিবাহের বয়স বাড়াইয়া দেওয়া এবং নির্ভরযোগ্য জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থার আবিষ্কারের জন্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনাব জন্য ৬৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি টাকা এবং ইহার মধ্যে ৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। শহর ও গ্রামাঞ্চলে মোট ২৫০০ পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অপূর্ণ থাকে। ঐ সময়ে মোট ১৮০০ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হয় নাই।

তৃতীয় পরিকল্পনায় এই কার্যক্রমের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ফলে ঐ উদ্দেশ্যে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনার যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্বেও যখন ১৯৬১ সালের লোকগণনায় জনসংখ্যার অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধি দেখা গেল তখন অনেকে আতঙ্কিত হইয়া কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন; যেমন তিনটির অধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতার উপর কর বসান, পিতার মজুরি হ্রাসের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

ভারত সরকার যে অর্থে পরিবার পরিকল্পনাকে গ্রহণ করিয়া কার্যে রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছেন (অর্থাৎ শুধুমাত্র জন্মনিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিবারের আয়তনকে সীমাবদ্ধ করা) তাহা দ্বারা সমস্যাকে সমাধান করা যাইবে না বলিয়াই ডাঃ জ্ঞানচাঁদ মনে করেন। ডাঃ জ্ঞানচাঁদ পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার মূল বক্তব্য হইল সামাজিক এবং অর্থনীতিক কাঠামোর পরিবর্তনের উপরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। ভারতের জনাধিক্য সমস্যার জন্য পরিবার পরিকল্পনাকেই একমাত্র সমাধান মনে করিয়া সামাজিক ও

অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা জ্ঞানবুদ্ধিপ্রসূত নীতির পরিচায়ক নহে।

জন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান

SUGGESTED REMEDIES TO THE POPULATION PROBLEM

ভারতে জনসমষ্টির সমস্যা বা 'জনাধিক্যের' সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা কমিশন পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জন্মশাসনের পরামর্শ দিয়াছেন। লোকগণনার রিপোর্টে কৃষির ফলন বৃদ্ধি ও অবিবেচনাপ্রসূত মাতৃত্ব হ্রাসের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ জ্ঞানচাঁদের মত কেহ কেহ সমাজ কাঠামোর রূপান্তরের মধ্যে, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্য দিয়া বণ্টনব্যবস্থার উন্নতি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দ্বারা ইহার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়াছেন। আরও অনেকে শিক্ষার প্রসার এবং জনসমষ্টির উৎকর্ষ বৃদ্ধির বা গুণগত নিয়ন্ত্রণের কথা বলিয়াছেন। এই সকল পরামর্শগুলির যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

১. **জনসমষ্টির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ (Quantitative Control of population):** ভারতে গত কয়েকদশক ধরিয়া যে ক্রমবর্ধমান হারে জনসমষ্টি বাড়িতেছে এবং বর্তমানে প্রতি দশ বৎসরে যে সংখ্যায় জনসমষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে অনেকেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। স্বভাবতই ইহার ফলে জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য, আশ্রয় ও পরিধেয়, আয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইতেছে। ইহাতে অর্থনীতিক উন্নয়নের গতিবেগ ব্যাহত হইতেছে। একারণে ভারতসরকার পরিকল্পনা কমিশন এবং দেশী ও বিদেশী একাধিক বিশেষজ্ঞগণ অবিলম্বে জনসমষ্টির বৃদ্ধির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন। এজন্য পরিবার পরিকল্পনার দ্বারা অবিবেচনাপ্রসূত মাতৃত্ব রোধ করিয়া, জনসমষ্টির পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা তীব্রতর করা হইতেছে। পর পর পরিকল্পনাগুলিতে এজন্য ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ব্যয় বরাদ্দ করিয়া পরিবার পরিকল্পনা জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহার ফলে অবিবেচনাপ্রসূত মাতৃত্ব হ্রাস পাইলে যেমন প্রসূতির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিবে তেমনি জন্মহারের বৃদ্ধির প্রবণতাও দূর হওয়া সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটি অসুবিধার কথা মনে রাখিতে হইবে। প্রথমত, ভারতের মত বিপুল জনসমষ্টির দেশে যেখানে অধিকাংশ লোকই গ্রামে বাস করে, যেখানে অধিকাংশ দেশবাসীই অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং দরিদ্র, তথায় ইহার দ্বারা শীঘ্র ফল পাইবার আশা করা কঠিন। দ্বিতীয়ত, শুধু জনসমষ্টির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার উপর গুরুত্ব আরোপ করা সঠিক নহে। কারণ, বর্তমান অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ জনসমষ্টি থাকিলেই যে উহা দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সহায়ক হইত একথা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। জনসমষ্টির শুধু পরিমাণগত সমস্যাই নহে, উহার আরও অন্যান্য সমস্যার দিকও রহিয়াছে। অতএব একমাত্র পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণই ভারতের জনসমস্যার ঐন্দ্রজালিক সমাধান ঘটাইবে না।

২. **দ্রুতগতিতে অর্থনীতিক উন্নয়ন (Rapid economic growth):** জনসমস্যার সমাধানের আরেকটি মৌলিক পদক্ষেপ হইবে দ্রুতগতিতে ও উচ্চহারে অর্থনীতিক উন্নয়ন। ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বেশী হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নের হার উহা অপেক্ষা অধিক এবং ইহা আরও যথেষ্ট বৃদ্ধি সম্ভব। ইয়োরোপ আমেরিকার সকল দেশেই অর্থনীতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি দ্বারা জনসমষ্টির দারিদ্র্যের সমাধান করা হইয়াছে। কোথাও কেহ প্রথমে জনসমষ্টির বৃদ্ধির হার হ্রাস করিবার জন্য অপেক্ষা করে নাই। তাহা ছাড়া সে সকল দেশের অভিজ্ঞতা এই যে, অর্থনীতিক উন্নয়ন হার বৃদ্ধির দ্বারা জীবনযাত্রার মনের উন্নতির ফলে কার্যকর ভাবে জন্মহার হ্রা

পায়। অতএব ভারতে আমাদের আরও। উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক; করিতে হইবে।

৩. জাতীয় আয়ের অধিকতর সুষমবণ্টন (More even distribution of National Income) : সেলিগম্যান অনেক পূর্বেই বলিয়াছেন জনসমস্যার প্রশ্নের সহিত শুধু উৎপাদন নহে বণ্টনের বিষয়ও যথেষ্ট জড়িত রহিয়াছে। দেশের উন্নয়ন হার যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি সম্ভব করিবার জন্য, উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক ও শ্রমিকগণের মধ্যে আকর্ষণ ও উৎসাহ সৃষ্টির জন্য, জাতীয় আয়ে তাহাদের বর্ধিত অংশ প্রদানের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে না। ইহাতে একদিকে যেমন তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিজের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তেমনি অপরদিকে, তাহাদের আয় বৃদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইয়া জন্মহার হ্রাসের প্রবণতাও দেখা দিবে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অপরিহার্যতা এই কারণেই।

৪. বিভিন্ন অঞ্চলে জনসমষ্টির পুনর্বণ্টন (Re-distribution of population) : ভারতের অল্প কয়েকটি অঞ্চল ও শহরে জনবসতির অত্যধিক ঘনত্ব, তথায় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বস্তীর বিস্তার ও কর্মহীন জনতার প্রাবল্য দেশের জনসমস্যার আরেকটি দিক প্রকাশ করিয়াছে। ইহার সমাধানের জন্য আবশ্যক অপেক্ষাকৃত স্বল্প বসতির অঞ্চলে জনস্থানান্তর। কিন্তু ইহা নির্ভর করে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, সড়ক, রেল ও অন্যান্য পরিবহণের ও বিদ্যুৎশক্তির উৎপাদন ও যোগানের সম্প্রসারণ প্রভৃতির উপর। বিষয়টি আবার শিল্পায়ন পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হার বৃদ্ধির কর্মপন্থার সহিতও জড়িত। শ্রম-নির্ভর শিল্পের সম্প্রসারণ, শিল্পগুলির বিকেন্দ্রীকরণের জন্য নূতন অঞ্চলে শিল্প স্থাপন ইত্যাদির দ্বারা আবার জাতীয় আয়ের অধিকতর সমবণ্টন সম্ভব।

৫. জনসমষ্টির গুণগত নিয়ন্ত্রণ (Qualitative Control of population) : জনসমষ্টির গুণগত নিয়ন্ত্রণ বলিতে জনশক্তি বা মানবিক শক্তির উৎকর্ষ বৃদ্ধি বুঝায়। শিক্ষার বিস্তার, কারিগরি দক্ষতার উন্নতি, স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তির বৃদ্ধি, শৃঙ্খলাজ্ঞানের উন্নতি প্রভৃতির দ্বারা জনসমষ্টির উৎকর্ষবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ এক কথায় জনসাধারণের কায়িক ও মানসিক শক্তির ও গুণাবলীর বিকাশই জনসমষ্টির গুণগত নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য। ইহা বাদ দিয়া শুধু সংখ্যানিয়ন্ত্রণ করিলে বা জন্মহার বৃদ্ধি রোধ করিলেই জনসমস্যা দূর হয় না। সুতরাং জনসমষ্টির গুণগত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা উহার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহাতে দেশের উৎপাদনশক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে।

৬. জনসমষ্টি সম্পর্কিত সামগ্রিক নীতি (Population Policy) : ভারতে জনসমস্যার কার্যকর সমাধানের জন্য সর্বোপরি প্রয়োজন জনসমস্যার উপরোক্ত বিভিন্ন দিকগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া একটি ভারসাম্যবিশিষ্ট সামগ্রিক সরকারী নীতি। জনসমষ্টির সমস্যার কোনও একটি মাত্র দিকের উপর আঘাত হানিলেই চলিবে না। প্রয়োজন হইতেছে সকল দিক হইতেই সমস্যাটিকে সমাধানের চেষ্টা এবং সেজন্য সকল দিকের প্রতি যথোপযুক্ত লক্ষ্য রাখিয়া গৃহীত এমন একটি স্বল্পকালীন-দীর্ঘকালীন নীতি যাহা কার্যকর ভাবেই সমস্যাটির মূলোচ্ছেদে সক্ষম।

৬

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্যা

The problem of economic development of underdeveloped countries like India

স্বল্পোন্নয়ন কাহাকে বলে ?
WHAT IS UNDERDEVELOPMENT ?

সাম্প্রতিককালের অর্থনীতিক সাহিত্যে উন্নয়ন (development) এবং স্বল্পোন্নয়ন (under-development) এই কথা দুইটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। অর্থনীতিবিদদের নিকট পৃথিবী আজ দুইটি পৃথক জগতে বিভক্ত। একটি উন্নত দেশসমূহের জগৎ, অপরটি অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জগৎ। এই দুইটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত বর্তমান পৃথিবী আজ শুধু আর অর্থনীতিবিদগণের আলোচনার প্রধান বিষয় নহে, বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিরও ইহা একটি প্রধান ভিত্তি।

বর্তমান দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের শত সহস্র বৈচিত্র্য ও পার্থক্য সত্ত্বেও অর্থনীতিবিদগণের দৃষ্টিতে একটি প্রধান বিষয়ের পার্থক্য উহাদের দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহা হইতেছে যন্ত্রশিল্প (manufacturing industries)। যে দেশ যন্ত্রশিল্পে যত উন্নত উহার জাতীয় এবং মাথাপিছু আয় তত বেশি। এই জন্য সাধারণত দেশের উন্নতি ও স্বল্পোন্নতির বিচারে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়কে ব্যবহার করা হয়। ইহাদের পার্থক্যই বর্তমান পৃথিবীকে উন্নত ও স্বল্পোন্নত জগতে বিভক্ত করিয়াছে।

১৯৪৯ সালে পৃথিবীর মোট আয় ও জনসংখ্যার তুলনায় বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার অনুপাত এবং মাথাপিছু আয় দেখান হইল।

পৃথিবীর মোট আয়ের বণ্টন (১৯৪৯ সালে)[১]

	পৃথিবীর মোট আয়ের শতাংশ	পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতাংশ	মাথাপিছু আয়
অত্যধিক আয়ের দেশসমূহ	৬৭	১৮	৯১৫ ডলার
মাঝারি " "	১৮	১৫	৩১০ "
স্বল্প " "	১৫	৬৭	৫৪ "

উপরোক্ত তালিকার অত্যধিক ও মাঝারি আয়ের দেশসমূহকে উন্নত ও স্বল্পআয়ের দেশসমূহকে স্বল্পোন্নত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। সুতরাং মাথা পিছু স্বল্পআয়ের দেশগুলি স্বল্পোন্নত ও মাথাপিছু অধিক আয়ের দেশগুলি উন্নত বলিয়া গণ্য করা যায়।

শিল্পায়নের অভাবই স্বল্প মাথাপিছু আয়ের অর্থাৎ অনুন্নতির কারণ। শিল্পসমূহ শক্তির

১। The Political Economy of Growth : P. Baran, p. 151.

(Power) সাহায্যে চালিত হয়। যে দেশ যত উন্নত উহার শক্তি [illegible] তত বেশি।

অতএব এক কথায় অর্থনীতিক স্বল্পোন্নয়ন বলিতে শিল্পায়নের অভাব ও মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতাকে বুঝায়।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ, আফ্রিকার নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি এবং ভারতসহ নিকট-প্রাচ্য হইতে আরম্ভ করিয়া দূরপ্রাচ্যের অন্তর্গত এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি স্বল্পোন্নত দুনিয়ার অংশ। স্বল্প আয়বিশিষ্ট, দারিদ্রের পঙ্কে নিমজ্জিত, কৃষিনির্ভর, কর্মহীনতা ও অনাহারে ক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ, পরিবর্তনহীন অর্থনীতিক স্তরে আবদ্ধ এই সকল দেশের অভিশপ্ত জনজীবনের দুর্ভাগ্যের সহিত আমরা জন্মাবধি এতই পরিচিত যে উহা আব বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা বাখে না। গত একশত বা দেডশত বৎসবে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে যে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে, এই সকল দেশেব জনজীবনে তাহাব সামান্যই প্রতিফলিত হইয়াছে। বর্তমানে এই সকল দেশগুলি অর্থনীতিক উন্নয়নেব চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের বিকাশমান দেশ (Development countries) বলা হয়।

স্বল্পোন্নতির কারণ

CAUSES OF UNDERDEVELOPMENT

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পাবে ভাবতসহ এই সকল দেশগুলিব স্বল্পোন্নতির কারণ কি? পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিব উন্নতি ও ভারতসহ অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলিব অনুন্নতি বা স্বল্পোন্নতিব কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মধ্যযুগেব অবসানে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (feudalism) ভাঙিয়া গিয়া বর্তমান ধনতান্ত্রিক উন্নয়নেব তিনটি উপাদান সৃষ্টি হইযাছিল। যথা—১. জমি হইতে উৎসাদিত, শিল্পে নিয়োগেব উপযুক্ত বিরাট কৃষকমজুব শ্রেণী। ২. ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় নগর সৃষ্টি ও বণিক এবং কারিগব শ্রেণীর উদ্ভব এবং সুদূবপ্রসারী সম্ভাবনাময় শ্রমবিভাগের প্রচলন। ৩. নূতন একশ্রেণীর বণিক ও বিত্তশালী কৃষকের হস্তে অবিশ্বাস্য পবিমাণে পুঁজির সংগ্রহ। কিন্তু যে পথে ইয়োরোপের দেশসমূহে ধনতান্ত্রিক উন্নয়নেব বিকাশ ঘটিল, ভাবতসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহাব জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দায়ী।

ক. রাজনীতিক কারণ (Political factors): যন্ত্রশিল্পেব দ্রুতপ্রসাবের জন্য দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন। একটি কাঁচামালেব সুনিশ্চিত যোগান এবং অপবটি বাজাবের সম্ভাবনা। শিল্পভিত্তিক পশ্চিমী দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার সুবিস্তৃত অঞ্চলে এই দুইটির সীমাহীন সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়া ইহাদের বিভিন্ন অংশে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার কবে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া ভাবত ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশসমূহের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। শাসকদেশের অর্থনীতিক-রাজনীতিক প্রয়োজন পরাধীন দেশের সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিকৃতি ঘটায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসিত দেশের শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ভারতে পুরাতন উন্নতিশীল কুটির শিল্পসমূহের ধ্বংস ও কৃষিকে বিদেশী শিল্পের প্রয়োজনীয় [illegible] লের উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত করার পশ্চাতে ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্ত প্রসারিত ছিল।

খ. অর্থনীতিক কারণ (Economic factors): প্রথমত, ইয়োরোপে সামন্ততান্ত্রিক [illegible] স্বাভাবিক পরিণতি ঘটিয়াছিল, ভারত ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হওয়ার [illegible] সম্ভব হইল না। উপরন্তু বিদেশী শাসন এই সকল স্থানে নিজেদের

সমাজব্যবস্থার অবস্থায় নূতন সামন্তশ্রেণী সৃষ্টি করিল। ভারতে লর্ড কর্নওয়ালিশের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা তাহার দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত, শিল্পসমৃদ্ধির প্রাথমিক প্রয়োজন পুঁজি। অর্থনৈতিক কার্যাবলীর দ্বারা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া, উহা সঞ্চয়ের দ্বারা পুঁজি গঠিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতের কৃষকগণ যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিত তাহা জমিদার ও সামন্ত প্রভুগণ শোষণ করিয়া নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যয় করিত। ফলে কৃষিকার্য দেশের প্রধান অর্থনৈতিক কর্ম থাকিয়া গেল বটে, কিন্তু দেশে পুঁজি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত (Surplus) সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইল না। দেশীয় যন্ত্রশিল্প বিকশিত না হইবার ইহাই প্রধান কারণ।

তৃতীয়ত, জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে দেশে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষকগণের মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাস পাইতে লাগিল এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণে দারিদ্র ও ঋণের জন্য ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়িল। কৃষিকর্ম ও পুরাতন কুটিরশিল্প হইতে বিচ্যুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দ্বারা শিল্পেব উপযোগী শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি হইল বটে, তবে শিল্প বিকাশের অভাবে ইহারা পুনরায় কৃষিতে আশ্রয় লইল। ফলে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি দেখা দিল। কৃষির মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার স্তর অত্যন্ত অবনত থাকিয়া দেশে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদাকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিল। পণ্যসামগ্রীর মোট চাহিদা সীমাবদ্ধ থাকায় আভ্যন্তরীণ বাজারের গণ্ডী সংকীর্ণ থাকিয়া গেল। ইহার ফলে দেশে যথেষ্ট পরিমাণে কলকারখানা স্থাপনে উৎসাহ সৃষ্টি ও দেশীয় শিল্প-উদ্যোক্তার উৎপত্তি হইল না।

চতুর্থত, এ সকল দেশে দেশীয় শিল্প প্রচেষ্টা গড়িয়া উঠিল না, কিন্তু শাসক-দেশের প্রয়োজনে প্রধানত খনি শিল্প ও বাগিচাশিল্প বিস্তার লাভ করিল। কাঁচামাল সংগ্রহ ও নিজেদের দেশজাত আমদানি পণ্য বিক্রয়ের জন্য পরাধীন দেশে ইহারা রেলপথ প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি করিল। কিন্তু বিদেশী পুঁজির দ্বারা যে অল্প পরিমাণ শিল্পবিস্তার ঘটিল তাহাতে দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইল না। কারণ উহার মুনাফা, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পূর্ণই বিদেশে চলিয়া যাইত। এইরূপে ঔপনিবেশিক দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তির দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত শাসক দেশের পুঁজিগঠন বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহাই ঔপনিবেশিক শাসনের মূল চরিত্র।

পঞ্চমত, দেশে আধুনিক শিল্পপ্রসারের পথ রুদ্ধ হওয়ায়, উহার সহিত আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজাবের বিকাশ পঙ্গু হইয়া রহিল।

গ. সামাজিক কারণ (Social Factors) : ভারতের পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভগ্নাবশেষস্বরূপ একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, বর্ণভেদ প্রথা, ধর্মপ্রভাবের আতিশয্য, সম্পত্তি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রাচীন নিয়ম, ব্যাপকভাবে সমাজে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীদের অবস্থান প্রভৃতি দেশের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সঞ্চয় বৃদ্ধিতে বাধা দিয়াছে। একান্নবর্তী পরিবার, বর্ণভেদ প্রথা দেশে শ্রমের সচলতা ও শ্রমবিভাগের প্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ধর্মের প্রভাব বৈষয়িক কার্যাবলীকে হীন মনে করিতে শিক্ষা দিয়াছে। বর্ণভেদ প্রথা শ্রমের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় নাই। সংকীর্ণ ধর্মপ্রভাবে সমুদ্রযাত্রাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিবার ফলে দেশের বাণিজ্যের পথ সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। কমবেশি পরিমাণে এই জাতীয় পুরাতন সমাজ সংগঠন, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী স্বল্পোন্নতদেশের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির জন্য দায়ী।

বর্তমানে একের পর এক ঔপনিবেশিক দেশে পরশাসনের অবসানে যখন জাতিসত্তার উদ্ভব ঘটিতেছে, তখন স্বভাবতই এই সকল নবীন অথচ তথাকথিত স্বল্পোন্নত জাতিগুলির জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলি

(Power) সাহায্যে চালিত হয়। যে দেশ যত উন্নত উহার শক্তি ব্যবহারের পরিমাণ ততই বেশি।

অতএব এক কথায় অর্থনীতিক স্বল্পোন্নয়ন বলিতে শিল্পায়নের অভাব ও মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতাকে বুঝায়।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহ, আফ্রিকার নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি এবং ভারতসহ নিকট-প্রাচ্য হইতে আরম্ভ করিয়া দূরপ্রাচ্যের অন্তর্গত এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি স্বল্পোন্নত দুনিয়ার অংশ। স্বল্প আয়বিশিষ্ট, দারিদ্রের পঙ্কে নিমজ্জিত, কৃষিনির্ভর, কর্মহীনতা ও অনাহারে ক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ, পরিবর্তনহীন অর্থনীতিক স্তরে আবদ্ধ এই সকল দেশের অভিশপ্ত জনজীবনের দুর্ভাগ্যের সহিত আমরা জন্মাবধি এতই পরিচিত যে উহা আর বিস্তৃত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। গত একশত বা দেড়শত বৎসরে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহে যে অবিশ্বাস্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে, এই সকল দেশের জনজীবনে তাহার সামান্যই প্রতিফলিত হইয়াছে। বর্তমানে এই সকল দেশগুলি অর্থনীতিক উন্নয়নের চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া ইহাদের বিকাশমান দেশ (Development countries) বলা হয়।

স্বল্পোন্নতির কারণ
CAUSES OF UNDERDEVELOPMENT

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পারে ভারতসহ এই সকল দেশগুলির স্বল্পোন্নতির কারণ কি? পশ্চিমের উন্নত দেশগুলির উন্নতি ও ভারতসহ অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির অনুন্নতি বা স্বল্পোন্নতির কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মধ্যযুগের অবসানে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা (feudalism) ভাঙিয়া গিয়া বর্তমান ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের তিনটি উপাদান সৃষ্টি হইয়াছিল। যথা—১. জমি হইতে উৎসাদিত, শিল্পে নিয়োগের উপযুক্ত বিরাট কৃষকমজুর শ্রেণী। ২. ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় নগর সৃষ্টি ও বণিক এবং কারিগর শ্রেণীর উদ্ভব এবং সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনাময় শ্রমবিভাগের প্রচলন। ৩. নূতন একশ্রেণীর বণিক ও বিত্তশালী কৃষকের হস্তে অবিশ্বাস্য পরিমাণে পুঁজির সংগ্রহ। কিন্তু যে পথে ইয়োরোপের দেশসমূহে ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের বিকাশ ঘটিল, ভারতসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইহার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দায়ী।

ক. রাজনীতিক কারণ (Political factors): যন্ত্রশিল্পের দ্রুতপ্রসারের জন্য দুইটি বিষয়ের প্রয়োজন। একটি কাঁচামালের সুনিশ্চিত যোগান এবং অপরটি বাজারের সম্ভাবনা। শিল্পভিত্তিক পশ্চিমী দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার সুবিস্তৃত অঞ্চলে এই দুইটির সীমাহীন সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়া ইহাদের বিভিন্ন অংশে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়া ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশসমূহের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। শাসকদেশের অর্থনীতিক-রাজনীতিক প্রয়োজন পরাধীন দেশের সমগ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থার বিকৃতি ঘটায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসিত দেশের শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ভারতে পুরাতন উন্নতিশীল কুটির শিল্পসমূহের ধ্বংস ও কৃষিকে বিদেশী শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত করার পশ্চাতে ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হস্ত প্রসারিত ছিল।

খ. অর্থনীতিক কারণ (Economic factors): প্রথমত, ইয়োরোপে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে স্বাভাবিক পরিণতি ঘটিয়াছিল, ভারত ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাহা সম্ভব হইল না। উপরন্তু বিদেশী শাসন এই সকল স্থানে নিজেদের

গোষ্ঠীর আশায় নূতন সামন্তশ্রেণী সৃষ্টি করিল। ভারতে লর্ড কর্নওয়ালিশের প্রবর্তিত চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা তাহার দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়ত, শিল্পসমৃদ্ধির প্রাথমিক প্রয়োজন পুঁজি। অর্থনৈতিক কার্যাবলীর দ্বারা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিয়া, উহা সঞ্চয়ের দ্বারা পুঁজি গঠিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতের কৃষকগণ যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিত তাহা জমিদার ও সামন্ত প্রভুগণ শোষণ করিয়া নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যয় করিত। ফলে কৃষিকার্য দেশের প্রধান অর্থনৈতিক কর্ম থাকিয়া গেল বটে, কিন্তু দেশে পুঁজি গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত (Surplus) সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইল না। দেশীয় যন্ত্রশিল্প বিকশিত না হইবার ইহাই প্রধান কারণ।

তৃতীয়ত, জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে দেশে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষকগণের মাথাপিছু জমির পরিমাণ হ্রাস পাইতে লাগিল এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণে দারিদ্র ও ঋণের জন্য ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়িল। কৃষিকর্ম ও পুরাতন কুটিরশিল্প হইতে বিচ্যুত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দ্বারা শিল্পের উপযোগী শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি হইল বটে, তবে শিল্প বিকাশের অভাবে ইহারা পুনরায় কৃষিতে আশ্রয় লইল। ফলে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি দেখা দিল। কৃষির মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার স্তর অত্যন্ত অবনত থাকিয়া দেশে শিল্পজাত পণ্যের চাহিদাকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিল। পণ্যসামগ্রীর মোট চাহিদা সীমাবদ্ধ থাকায় আভ্যন্তরীণ বাজারের গণ্ডী সংকীর্ণ থাকিয়া গেল। ইহার ফলে দেশে যথেষ্ট পরিমাণে কলকারখানা স্থাপনে উৎসাহ সৃষ্টি ও দেশীয় শিল্প-উদ্যোক্তার উৎপত্তি হইল না।

চতুর্থত, এ সকল দেশে দেশীয় শিল্প প্রচেষ্টা গড়িয়া উঠিল না, কিন্তু শাসক-দেশের প্রয়োজনে প্রধানত খনি শিল্প ও বাগিচাশিল্প বিস্তার লাভ করিল। কাঁচামাল সংগ্রহ ও নিজেদের দেশজাত আমদানি পণ্য বিক্রয়ের জন্য পরাধীন দেশে ইহারা রেলপথ প্রভৃতি স্থাপনের দ্বারা যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি করিল। কিন্তু বিদেশী পুঁজির দ্বারা যে অল্প পরিমাণ শিল্পবিস্তার ঘটিল তাহাতে দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইল না। কারণ উহার মুনাফা, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত সম্পূর্ণই বিদেশে চলিয়া যাইত। এইরূপে ঔপনিবেশিক দেশের সম্পদ ও শ্রমশক্তির দ্বারা উৎপন্ন উদ্বৃত্ত শাসক দেশের পুঁজিগঠন বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহাই ঔপনিবেশিক শাসনের মূল চরিত্র।

পঞ্চমত, দেশে আধুনিক শিল্পপ্রসারের পথ রুদ্ধ হওয়ায়, উহার সহিত আধুনিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ও টাকার বাজারের বিকাশ পঙ্গু হইয়া রহিল।

গ. সামাজিক কারণ (Social Factors) : ভারতের পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভগ্নাবশেষস্বরূপ একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, বর্ণভেদ প্রথা, ধর্মপ্রভাবের আতিশয্য, সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রাচীন নিয়ম, ব্যাপকভাবে সমাজে বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীদের অবস্থান প্রভৃতি দেশের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সঞ্চয় বৃদ্ধিতে বাধা দিয়াছে। একান্নবর্তী পরিবার ; বর্ণভেদ প্রথা দেশে শ্রমের সচলতা ও শ্রমবিভাগের প্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ধর্মের প্রভাব বৈষয়িক কার্যাবলীকে হীন মনে করিতে শিক্ষা দিয়াছে। বর্ণভেদ প্রথা শ্রমের মর্যাদার স্বীকৃতি দেয় নাই। সংকীর্ণ ধর্মপ্রভাবে সমুদ্রযাত্রাকে বিরূপ দৃষ্টিতে দেখিবার ফলে দেশের বাণিজ্যের পথ সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। কমবেশি পরিমাণে এই জাতীয় পুরাতন সমাজ সংগঠন, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী স্বল্পোন্নতদেশের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টির জন্য দায়ী।

বর্তমানে একের পর এক ঔপনিবেশিক দেশে পরশাসনের অবসানে যখন জাতিসত্তার মুক্তি ঘটিতেছে, তখন স্বভাবতই এই সকল নবীন অথচ তথাকথিত স্বল্পোন্নত জাতিগুলির নিকট জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলির

উন্নয়নের পথে এক হইতে দেড় শতাব্দী ভ্রমণ করিয়া বর্তমান উচ্চ-
লাভ করিয়াছে, তাহা অত্যল্পকালের মধ্যে কি করিয়া অতিক্রম করা যায়, তাহাই স্বল্পোন্নত দেশগুলির সম্মুখে জলন্ত সমস্যাবিশেষ। আধুনিক অর্থনীতিক সাহিত্যে উন্নয়ন ও স্বল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে বহুল আলোচনার ইহাই কারণ।

স্বল্পোন্নতির মূল সমস্যা
THE FUNDAMENTAL PROBLEM OF UNDERDEVELOPMENT

স্বল্পোন্নত দেশের সর্বপ্রধান সমস্যা তীব্র ও ব্যাপক দারিদ্র। দারিদ্রের কারণ হইতেছে স্বল্প আয় অর্থাৎ স্বল্প উৎপাদনক্ষমতা। উৎপাদিত সম্পদ বা অর্জিত আয় এতই অল্প যে, তাহার প্রায় সমস্তই বর্তমান অভাব দূর করিতে নিঃশেষ হইয়া যায়। উদ্বৃত্ত প্রায় কিছুই থাকে না। সুতরাং স্বল্প আয়ের দরুন দেশের সামগ্রিক সঞ্চয়ের ক্ষমতা ও হার অত্যন্ত অল্প। সঞ্চয় সামান্য বলিয়া পুঁজিগঠনের হারও নগণ্য। অর্থাৎ স্বল্প আয়ের ফলে সঞ্চয় স্বল্প, এবং সঞ্চয় স্বল্প হইবার ফলে পুঁজিগঠন নগণ্য।

পুঁজিগঠন নগণ্য হইলে উৎপাদনে ব্যবহার করিবার জন্য উপযুক্ত পুঁজিদ্রব্যের অভাব হয় সুতরাং নগণ্য পুঁজিদ্রব্যের দ্বারাই উৎপাদনকার্য পরিচালিত হয়। ভারতের কৃষিকার্যে ব্যবহৃত প্রাচীন যন্ত্রপাতি ইহার দৃষ্টান্ত। স্বল্প পরিমাণ পুঁজির দ্বারা উৎপাদনকার্য পরিচালনা করিলে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণও স্বল্প হয়। সুতরাং পুঁজিগঠন নগণ্য বলিয়া ভারতবাসিগণের আয়ও স্বল্প। অতএব, আয়ের স্বল্পতার দরুন সঞ্চয়ের অভাব, সঞ্চয়ের অভাবের দরুন পুঁজিগঠনের অভাব ও পুঁজিগঠনের অভাবে স্বল্প আয়—এইরূপে ভারতের জনজীবনের চিরন্তন দারিদ্র আপনাকে আপনি বজায় রাখিতেছে। ইহাই দারিদ্রের পাপচক্র। এই পাপচক্রের কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে পুঁজিগঠনের অভাব। ইহাই দেশের স্বল্পোন্নতি বা অনুন্নতির মূল কারণ।

অনেকের মনে হইতে পারে যে, উন্নত দেশগুলির তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব ও জনসংখ্যার আধিক্যই স্বল্পোন্নতির মূল কারণ। কিন্তু এই ধারণা চূড়ান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ প্রকৃতি ইচ্ছাপূর্বক কতকগুলি দেশকে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও অপর কতকগুলি দেশকে রিক্ত করিয়াছে, ইহা কষ্টকল্পনামাত্র। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশেই প্রাকৃতিক সম্পদের কোন চিরনির্দিষ্ট ভাণ্ডার নাই। মানুষের সম্মুখে প্রকৃতির অফুরন্ত সম্ভাবনাময় সম্পদের ভাণ্ডার পড়িয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে উহা জয় করিয়া, ঐ সম্ভাব্য সম্পদকে বাস্তব সম্পদে পরিণত করিতে হয়। সুতরাং কোন্ দেশ কখন কতটা পরিমাণে প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে সম্পদ আহরণ করিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে উহার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির উপর। স্বল্পোন্নত দেশ পুঁজিগঠনের অভাবে উহার প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদকে হয় মোটেই ব্যবহার করিতে পারে না, নয়তো উহার অপব্যবহার কিংবা ভ্রান্ত ব্যবহার করে।

সুতরাং পুঁজিগঠনের স্বল্পতা ও অক্ষমতার দরুন প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের অব্যবহার, স্বল্পব্যবহার, বা অপব্যবহারই ভারতের স্বল্পোন্নতির বা দারিদ্রের মূল সমস্যা।

উন্নয়ন কাহাকে বলে?
WHAT IS DEVELOPMENT?

সর্বব্যাপী দারিদ্রের নিষ্পেষণ হইতে মুক্তি এবং উন্নতি ভারতসহ সকল ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত দেশেরই আজ প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু, অর্থনীতিক উন্নয়ন বলিতে কি বুঝায়, তাহ

। সহজভাবে বলা যায় যে, 'যে প্রক্রিয়ায় দীর্ঘকাল ধরিয়া একটি অর্থনীতির (অর্থাৎ দেশের) প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাহাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন'।[১] সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে একটি বিশেষ প্রক্রিয়া বুঝায়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃত জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধি ঘটে। এই 'প্রক্রিয়া' কথাটির দ্বারা কতকগুলি শক্তির (forces) ক্রিয়া বুঝায়। এইসকল শক্তিগুলি একটি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রিয়াশীল থাকে এবং উহার ফলে কতকগুলি অর্থনৈতিক কার্যে ও ক্ষেত্রে, অর্থনীতির গঠনে, বিবিধ পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এই সকল বিবিধ পরিবর্তনের সামগ্রিক শেষ ফল হইতেছে প্রকৃত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকৃত জাতীয় আয়বৃদ্ধির একটি দীর্ঘকালপ্রসারী প্রক্রিয়া।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলে—১. উপাদান যোগানের ক্ষেত্রসমূহে এবং, ২. উৎপন্ন পণ্যের চাহিদার গঠনে পরিবর্তন ঘটে।

১. **উপাদান যোগানের ক্ষেত্রে:** **ক.** নূতন নূতন সম্পদের আবিষ্কার ঘটে। **খ.** পুঁজিগঠনের হার বৃদ্ধি পায়। **গ.** জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। **ঘ.** নূতন ও উন্নততর উৎপাদন কৌশল প্রচলিত হয়। **ঙ.** কারিগরীদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এবং, **চ.** নানাবিধ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগত পরিবর্তন সাধিত হয়।

২. **উৎপন্ন-পণ্যের চাহিদার গঠনে:** **ক.** পণ্যের চাহিদাকারী যাহারা, সেই জনসংখ্যার মোট পরিমাণ ও উহাতে বিভিন্ন বয়সের জনসমষ্টির অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে। ইহাতে বিভিন্ন পণ্যের চাহিদার প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটে। **খ.** আয়ের স্তর ও বণ্টনে পরিবর্তন ঘটে। ইহাতে ক্রয়-ক্ষমতা ও কার্যকর চাহিদার পরিবর্তন দেখা দেয়। **গ.** ক্রেতাগণের রুচির পরিবর্তন ঘটে। এবং **ঘ.** বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগত পরিবর্তন দেখা দেয়।

এই সকল ক্ষেত্রের প্রত্যেকটিতে গভীর পরিবর্তনের সামগ্রিক ফল হিসাবে চাহিদার প্রসার, বাজারের সম্প্রসারণ ও উপাদানসমূহের অধিকতর ব্যবহার দ্বারা মোট জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উত্তরোত্তর দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব

THE THEORY OF ECONOMIC DEVELOPMENT

অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশের স্বল্প পুঁজি, স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা, স্বল্প আয়, স্বল্প ক্রয়ক্ষমতা ও স্বল্প সঞ্চয়ের অর্থনৈতিক পাপচক্র ভগ্ন করিতে না পারিলে উহাদের উন্নয়ন সম্ভব নহে। পুঁজির স্বল্পতার জন্য বিনিয়োগ কম বলিয়া এসকল দেশে মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ঘটিতেছে না। বিনিয়োগের অভাবে কর্মহীনতা প্রবল। যাহাদের কর্মসংস্থান আছে উপযুক্ত পুঁজির অভাবে তাহাদেরও উৎপাদনশীলতা এবং আয় কম। আয় কম হওয়ায় ক্রয়শক্তি অল্প। ক্রয়শক্তি অল্প হওয়ায় কার্যকর চাহিদা কম। সুতরাং দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের বাজার সংকীর্ণ। পণ্যের বাজার সংকীর্ণ বলিয়া উৎপাদনের বাজার এবং ব্যবহারও গণ্ডীবদ্ধ। এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার হইল পুঁজিগঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি। বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারাই একমাত্র অর্থনৈতিক পাপচক্র ভেদ করা সম্ভব।

১। 'Economic development is a process whereby an economy's real income increases over a long period of time.'—Meir and Baldwin, Economic Development, p. 2.

কিন্তু ইতস্ততভাবে দুই একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা করা যাইবে না। দুই একটি শিল্প প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণের দ্বারা পাপচক্র লোপ করা সম্ভব নহে। কারণ এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে বিনিয়োগ প্রচেষ্টা অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে না। চারিদিকে বাজার সংকীর্ণ বলিয়া নূতন ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ সম্ভব নহে। একটি বা দুইটি ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করিলে উহাতে যে পরিমাণ পণ্যাদি উৎপন্ন হইবে তাহা ক্রয়ের জন্য উপযুক্ত ক্রেতা পাওয়া যাইবে না। কারণ প্রায় সকল লোকেরই আয় অতি অল্প। অতএব ঐ নূতন শিল্প অবশেষে পুনরায় সংকুচিত হইতে বাধ্য। সুতরাং পাপচক্র ভগ্ন করিবার একমাত্র পথ হইতেছে একসঙ্গে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পথে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ পরিকল্পিতরূপে বিনিয়োগ করা। উন্নয়নমূলক অর্থনীতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এইরূপ অর্থনীতিক পরিকল্পনার মূলকথা হইল, দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্ধারিত হারে ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। সকল অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পন্থায়, একই সঙ্গে বিনিয়োগ ঘটিতে থাকিলে, সর্বত্রই যেমন উৎপাদনের মানবিক ও প্রাকৃতিক উপাদান-গুলি নিয়োজিত ও ব্যবহৃত হইতে থাকিবে, তেমনি সর্বত্রই নিযুক্ত জনশক্তির আয় ও ক্রয়শক্তি বৃদ্ধির ফলে পণ্যের মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে পণ্যের সংকীর্ণ বাজার ক্রমে প্রসারিত হইতে থাকিবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপাদানগুলির চাহিদা, নিয়োগ ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। উৎপাদনশীলতা ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। পাপচক্র ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইবে এবং দেশ অবশেষে স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতিক উন্নয়নের স্তরে উন্নীত হইবে। অতএব দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে দুইটি বিষয় প্রয়োজন—১. ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি; এবং ২. অর্থনীতিক পরিকল্পনা।

বিনিয়োগ ও সঞ্চয়
INVESTMENT AND SAVINGS

বিনিয়োগ কথাটি নানা অর্থে নানান ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলেও, ইহার মূল অর্থ হইল, সম্পদকে বর্তমান কালে সরাসরি ভোগের পরিবর্তে আরও সম্পদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা। ইহাতে ভবিষ্যতে ভোগের জন্য বেশি সম্পদ সৃষ্টি হইতে পারে। বর্তমানকালে যে সম্পদ উৎপন্ন হইয়েছে, তাহার সমস্তই বর্তমানে ভোগ করিয়া নিঃশেষিত করিলে, ভবিষ্যতে আর উৎপাদনের উপকরণ থাকিবে না। সেজন্য, বর্তমান উৎপাদন হইতে একটি অংশ সঞ্চয় করিতে হইবে। উহা ভবিষ্যতে আরও সম্পদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইবে।

এবৎসরে উৎপন্ন সম্পদের যে অংশটুকু সঞ্চিত হইল তাহার বিনিয়োগ ভবিষ্যতে উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য। যে সকল যন্ত্রপাতি, কলকবজা প্রভৃতি উৎপাদনের উপায় উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে, ধীরে ধীরে উহাদের কর্মক্ষমতা কমিতেছে। পুরাতন যন্ত্রপাতি বা পুঁজি দ্রব্যের এই ক্ষতিপূরণের জন্য প্রতি বৎসরই সমপরিমাণ নূতন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। এইরূপ বিনিয়োগের দরুন দেশের মোট পুঁজির বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র ততটুকু বিনিয়োগ দেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে, অনুন্নত দেশের উন্নয়নের দিক হইতে তো নহেই। এ সকল দেশে যাহাতে দিনের পর দিন, বৎসরের পর উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেজন্য অতি উচ্চহারে প্রতি বৎসর বিনিয়োগ আবশ্যক। তবেই বৎসরের পর বৎসর দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ ও মোট উৎপাদন উত্তরোত্তরভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে। দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার যত বেশি হইবে অর্থনীতিক উন্নয়নের গতি ততই দ্রুততর হইবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদানসমূহ
REQUISITES OF ECONOMIC DEVELOPMENT

যে কোন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ের অবস্থিতি প্রয়োজন।

১. **দেশজ শক্তিসমূহ (Indigenous Forces) :** বৈষয়িক সমৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌল ইচ্ছা এবং উদ্যোগ দেশের জনসাধারণের মধ্য হইতেই উদ্ভূত হওয়া প্রয়োজন। কারণ দেশের জনসাধারণের মধ্যে উন্নতির জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা, উহার জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও শ্রমে স্বীকৃতি, এবং পরিবর্তন গ্রহণে আগ্রহ না দেখা দিলে, শুধুমাত্র বাহির হইতে চেষ্টা দ্বারা অথবা উপর হইতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চাপাইয়া দিলে তাহা কখনই ফলদায়ী হইতে পারে না।

২. **বাজারের অসম্পূর্ণতার অপসারণ (Removal of Market Imperfections) :** স্বল্পোন্নত দেশে পণ্য ও উপাদানের চাহিদা, যোগান, ব্যবহার ও বণ্টনে এরূপ কতকগুলি অসংগতি ও অসম্পূর্ণতা দেখা যায়, যাহা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ইহাদের অপসারণ না করিলে উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না। এই কারণে বাজারসংক্রান্ত সংবাদাদি সংগ্রহ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উৎপাদন ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব হ্রাস, পুঁজির বাজারের সম্প্রসারণ, কৃষি, ব্যবসায-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজনীয় সরবরাহ ইত্যাদির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়।

উপরোক্ত উপায়গুলির দ্বারা বাজারের অসংগতি যতই অপসারিত হইবে ততই দেশের সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হইবে।

৩. **পুঁজিগঠন (Capital Formation) :** স্বল্পোন্নতির পাপচক্র ভাঙিবার পথ একমাত্র পুঁজিগঠনের মধ্যেই নিহিত। পুঁজিগঠনের তিনটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে প্রয়োজন যথেষ্ট সঞ্চয়ের সৃষ্টি। দ্বিতীয় স্তরে প্রয়োজন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঐ সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া উহা ব্যবহারের জন্য বিনিয়োগকারিগণের নিকট উপস্থিত করান। তৃতীয় স্তরে প্রয়োজন হইল বিনিয়োগকারিগণ কর্তৃক ঐ সঞ্চিত ও সংগৃহীত অর্থ ঋণগ্রহণ দ্বারা দ্রব্য-পুঁজিতে রূপান্তরিত করণ, অর্থাৎ (বিনিয়োগ)।

৪. **প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পকৌশলের উন্নতি (Technological and Technical Developments) :** স্বল্পোন্নত দেশে শুধু আর্থিক পুঁজি সৃষ্টি হইলেই যে উন্নয়ন ঘটিবে এমন কোন কথা নাই। কারণ, এই সকল দেশে কতকগুলি বাধার দরুন সঞ্চিত আর্থিক পুঁজি ফলপ্রদভাবে বিনিয়োগ করার অসুবিধা দেখা দেয়। এই বাধাগুলি হইতেছে, প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব, কারিগরী দক্ষতার অভাব, শ্রমের ভৌগোলিক সচলতার অভাব, ব্যবস্থাপনা ও তদারক-সংক্রান্ত জ্ঞান এবং শিল্পকৌশলের অভাব। এইগুলি বিনিয়োগের সহায়ক উপাদান বলিয়া পুঁজি গঠনের ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের উন্নতির ব্যবস্থাও গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫. **দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন (Values and Institutional Changes) :** শুধু অর্থনৈতিক কারণই নহে, জনসাধারণের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় মনোভাব দ্বারাও দেশে পুঁজির বিনিয়োগ ও উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি বিশেষরূপে প্রভাবিত হইয়া থাকে। দেশের মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রেষণা (motivation) অর্থনৈতিক উপাদানের মতই উন্নয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন যেমন প্রয়োজন

তেমনি বর্ণভেদ প্রথা, একান্নবর্তী পরিবার প্রথা, পুরাতন শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত সামাজিক কাঠামো ও মনোভাবের পরিবর্তনও উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য।

৬. **উদ্যোগ (Enterprise) :** স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন কার্যে উদ্যোগের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। পশ্চিমী অগ্রসর দেশসমূহে উন্নয়নের প্রাথমিক যুগে ব্যক্তিগত উদ্যোগই উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করিয়াছে। কিন্তু স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশে বর্তমানকালে নানাবিধ ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিক কারণে ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। সংখ্যায় ও সামর্থ্যে অর্থাৎ, পরিমাণ ও গুণগত দিক দিয়া দেশীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগ এই সকল দেশে দুর্বল। উন্নয়নের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সামাজিক পুঁজি, যথা যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, পরিবহণের উন্নত ব্যবস্থা, শক্তি উৎপাদন ও সরবরাহ, বন্দর ও পোতাশ্রয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য বিপুল অর্থ বিনিয়োগ, স্বল্পোন্নত দেশের ব্যক্তিগত উদ্যোগের আয়ত্তের বাহিরে। এইজন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকেই এই সকল ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয়। ইহা ছাড়া, ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিরাট পরিমাণ পুঁজির চাহিদা মিটানো ব্যক্তিগত উদ্যোগের পক্ষে কঠিন। এই কারণেই স্বল্পোন্নত দেশে উন্নয়নমূলক কার্যে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়, উভয় প্রকার উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

অর্থনীতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকসমূহ
OBSTACLES TO ECONOMIC DEVELOPMENT

অর্থনীতিক উন্নয়নের পথে স্বল্পোন্নত দেশকে যে সকল দুস্তর বাধার সম্মুখীন হইতে হয় উহাদের আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি :

১. বাজারের অসংগতি বা অসম্পূর্ণতা (market imperfections)।
২. অর্থনীতির পাপচক্রসমূহ (vicious circles)।
৩. আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ (external forces)।

১. **বাজারের অসংগতি (Market Imperfections) :** বাজারের অসংগতি বলিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে বুঝায় :

ক. উপাদানসমূহের সচলতার অভাব (factor immobility)।
খ. মূল্যসমূহের নমনীয়তার অভাব (price rigidity)।
গ. বাজার সম্বন্ধে অজ্ঞতা (ignorance of market conditions)।
ঘ. সামাজিক কাঠামোর অনমনীয়তা (rigid social structure)।
ঙ. বিশেষায়ণের অভাব (lack of specialisation)।

উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা উন্নয়নের হার দ্রুততর করিবার জন্য উপাদানসমূহের সচলতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে পরিবহণ ও সংসরণের বাধা, ভাষাগত ও ধর্মগত পার্থক্য প্রভৃতি এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে ও এক অঞ্চল হইতে অন্যত্র উপাদানের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

মূল্যসমূহের নমনীয়তার অভাবে যোগান ও চাহিদার বাঞ্ছিত সামঞ্জস্য সাধন ঘটে না।

উপাদান ও উৎপন্ন পণ্য, ইহাদের উভয়ের বাজার সম্বন্ধেই যোগানদারেরা সঠিকরূপে অবহিত থাকে না বলিয়া উপাদানগুলির যেমন যথাযথ ব্যবহার ঘটে না তেমনি, উপযুক্তরূপে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধিও ঘটে না।

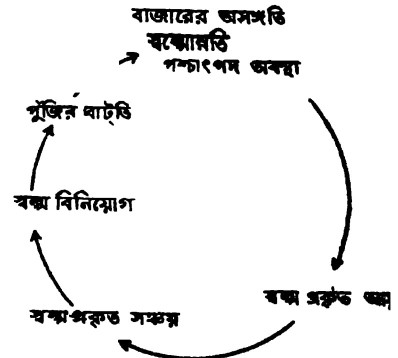
অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক রীতি-নীতি ও প্রথা,

সামাজিক কাঠামো, শ্রেণী বা বর্ণভেদ প্রথা, পারিবারিক ব্যবস্থা ও বিভিন্ন শ্রেণীগুলির মধ্যে সম্পর্ক প্রচলিত রহিয়াছে তাহা মানুষের মনে পরিবর্তনের প্রতিকূল এক রক্ষণশীল মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে শ্রমের গতিশীলতা, প্রতিভার বিকাশ প্রভৃতি ব্যাহত হইতেছে। এইরূপে পুরাতন সামাজিক কাঠামো ও দৃষ্টিভঙ্গী, দেশের উন্নয়ন ও প্রগতির বিরোধিতা করিতেছে।

স্বল্পোন্নত দেশে যে ধরনের বিশেষায়ণ প্রচলিত তাহা আধুনিকযুগের উপযোগী নহে। বিশেষায়ণের পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য উপাদানসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার ঘটিতেছে না। ফলে উৎপাদন প্রয়োজনমত বাড়িতেছে না।

২. দারিদ্রের পাপচক্রসমূহ (Vicious circles of poverty): বাজারসংক্রান্ত অসংগতি ছাড়াও আরও কয়েকটি আভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকের জন্য স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের কঠিন সমস্যা দেখা দেয়। এই প্রতিবন্ধকগুলি চক্রাকারে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্বল্পোন্নত দেশের এই প্রতিবন্ধকসমূহের অনেকগুলি একই সঙ্গে উহাদের দারিদ্রের ফল ও কারণ। এই চক্রাকারে ক্রিয়াশীল প্রতিবন্ধকসমূহকে দারিদ্রের পাপচক্র (vicious circles of poverty) বলা হয়। অর্থাৎ অনুন্নত দেশগুলির দারিদ্রই উহাদের দারিদ্রের কারণ।

এই চিত্রে চক্রের গতি অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, বাজারের অসংগতি, স্বল্পোন্নতি এবং পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য মোট উৎপাদন স্বল্প হইয়া থাকে। এই স্বল্প প্রকৃতআয় হইতে উদ্ভূত সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বভাবতই স্বল্প এবং স্বল্প সঞ্চয়ের ফলে বিনিয়োগের পরিমাণ স্বল্প। বিনিয়োগ স্বল্প হওয়ায়, পুঁজির ঘাটতি দেখা দেয়। পুঁজির ঘাটতি আছে বলিয়াই অনগ্রসরতা ও স্বল্পোন্নতি চিরস্থায়ী হইতেছে।



পার্শ্বের চক্রকে বিশ্লেষণ করিলে আরো কয়েকটি ক্ষুদ্রতর চক্রের সন্ধান পাওয়া যায়। উহারা উপরের এই বৃহৎ ও প্রধান চক্রের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্বল্প প্রকৃত আয়, একই সঙ্গে চাহিদার স্বল্পতার কারণ ও ফল। এবং চাহিদার এই স্বল্পতার ফলে বিনিয়োগের স্বল্পতা দেখা দেয়। ইহা হইতে দেখা যায় যে, প্রকৃত আয়ের এই স্বল্পতাই সঞ্চয়ের স্বল্পতা এবং বিনিয়োগ-প্রেরণার অভাবের কারণ। ইহাই অন্যতম ক্ষুদ্রতর চক্র।

আর একটি চক্র অনুন্নত জনসমাজ ও উহার অনাহৃত ও অব্যবহৃত সম্পদকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার, ঐ দেশের মানবিক সম্পদের চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। দেশের জনসাধারণ যত অনগ্রসর, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারও ততবেশি অসম্পূর্ণ থাকে। নিরক্ষরতা, দক্ষতার অভাব, অসম্পূর্ণজ্ঞান এবং উপাদানের অ-সচলতা—এইগুলির ফলে প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কখনও অব্যবহৃত, কখনও বা স্বল্প অথবা ত্রুটিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশের অনাহৃত ও অব্যবহৃত সম্পদ একই সঙ্গে সে দেশের জনসাধারণের অনগ্রসরতার কারণ ও ফল।

৩. আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ (International Forces): কৃষি ও বাগিচা-শিল্পজাত দ্রব্য এবং খনিজ দ্রব্যের কাঁচামাল হিসাবে রপ্তানি অনুন্নত দেশের অর্থনীতিতে একটি

গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সাধারণত এরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা দেশের রপ্তানিযোগ্য কৃষি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষি ও শিল্পের বিকাশ ঘটে। রপ্তানি-নির্ভর শিল্পের প্রসার ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশীয় শিল্পের সম্প্রসারণে ও সামগ্রিক জাতীয় অর্থনীতিক সমৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থনীতিক উন্নয়নের সহায়তার পরিবর্তে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে।

সাধারণত এই সকল দেশের রপ্তানিশিল্প বিদেশী মালিকানা ও পরিচালনার অন্তর্গত। ফলে এই সকল শিল্পের আয়ের অধিকাংশই বৈদেশিক পুঁজির মুনাফা ও সুদ ইত্যাদির আকারে বিদেশে চলিয়া যায়। উপরন্তু এই সকল বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রেই কাঁচামাল ও শ্রমের বাজারে একচেটিয়া ক্রেতা হিসাবে কৃষকগণকে স্বল্প মূল্যে কাঁচামাল বিক্রয়ে ও দেশীয় শ্রমিকগণকে স্বল্প মজুরি গ্রহণে বাধ্য করে। অতএব রপ্তানি শিল্পের সমৃদ্ধি কৃষক ও শ্রমিকদের স্পর্শ করে না। অপরদিকে এই সকল দেশ বিদেশী শিল্পজাত যে সমস্ত দ্রব্য আমদানি করে, তাহা অনেক ক্ষেত্রে একচেটিয়া উৎপাদনকারিগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেজন্য উহা অধিকমূল্যে ক্রয় করিতে হয়। আর বিদেশী পুঁজির আগমনের দরুন যেটুকু শিল্প সম্প্রসারণ ঘটে তাহার যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জাও বিদেশ হইতে আনীত হয়। সুতরাং বিদেশী পুঁজির অস্তিত্বের দরুন রপ্তানির বৃদ্ধি এবং রপ্তানিনির্ভর শিল্পের উন্নতি, দেশীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত আয় বৃদ্ধি ঘটায় না।

তাহা ছাড়া, রপ্তানিনির্ভর শিল্পগুলির ভাগ্য আন্তর্জাতিক বাজারের তেজীমন্দীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলিয়া আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামার ফলে দেশীয় অর্থনীতিতেও তেজী-মন্দীর গুরুতর প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারের তেজী ও মন্দার চক্রাকার পরিবর্তনে দেশীয় অর্থনীতি অসহায় খেলার পুতুলে পরিণত হয়।

এইরূপে বিদেশী পুঁজি, শিল্পসমূহের বিদেশী নিয়ন্ত্রণ, বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ও প্রভাবিত রপ্তানিনির্ভর অর্থনীতিক কার্যকলাপ এবং আন্তর্জাতিক বাজারের তেজীমন্দীর কবলিত রপ্তানিনির্ভর কৃষি ও বিবিধ শিল্প অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ও বাণিজ্যের স্বাভাবিক সুফললাভে বঞ্চিত করিয়া উহাদের অনগ্রসরতা চিরস্থায়ী করে।

ভারতে অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্যাসমূহ

THE PROBLEMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN INDIA

ভারতের অনুন্নতি, সর্বব্যাপ্ত দারিদ্র, জনসাধারণের মধ্যে আয়, সম্পদ ও সুযোগের গভীর বৈষম্য দূর করিবার জন্য প্রয়োজন অর্থনীতিক উন্নয়ন। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দুইটি লক্ষ্য—উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনীতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস। এই দুইদিকেই দৃষ্টি রাখিয়া ভারতের উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করিবার উপর পরিকল্পনা কমিশন গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। উন্নয়ন প্রচেষ্টার সকল ক্ষেত্রে সুষম, সুশৃঙ্খল ও দ্রুত হারে উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে এই প্রকার উন্নয়নপ্রচেষ্টার সম্মুখে যে সকল সমস্যা রহিয়াছে যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

১. উন্নয়ন একটি দীর্ঘমেয়াদী অর্থনীতিক সমস্যা : দেশের সর্বব্যাপ্ত অর্থনীতিক উন্নয়নপ্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হইতে স্বভাবতই দীর্ঘ সময় লাগিবে। ভারতের মত বিপুল জনসমষ্টি-

পূর্ণ বিরাট দেশের পক্ষে তো বটেই। অতএব এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার সফল সমাপ্তির জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া জাতিকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে।

২. **জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন সংগ্রহের সমস্যা:** দীর্ঘকালীন ও সর্বব্যাপক অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত, স্বেচ্ছামূলক ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা। ইহার জন্য জনসাধারণের মধ্যে নূতন ভাবধারা গ্রহণে আগ্রহ ও সমাজচেতনাবোধ জাগ্রত করা আবশ্যক। উন্নয়নের অনুকূল এই সমাজমানস সৃষ্টি সমাজের অভ্যন্তর হইতে উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে অফুরন্ত শক্তি যোগাইতে সমর্থ। ইহা উন্নয়নের সাফল্যের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত। এই প্রগতিশীল সমাজচেতনাসৃষ্টি উন্নয়নের একটি প্রধান সমস্যা, সন্দেহ নাই। উন্নয়ন প্রচেষ্টাকালে যে সকল বাধা-বিপত্তি উপস্থিত হয়, পুরাতন সমাজব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত নবীনকালের যে সংঘাত বাধে, তাহা জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ছাড়া জয় করা যায় না।

৩. **প্রতিষ্ঠানগত ও সংগঠনগত পরিবর্তন সাধনের সমস্যা:** প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগত পরিবর্তন সাধন (institutional changes), উন্নয়নের আর একটি সমস্যা। সমাজব্যবস্থার গতিপ্রকৃতির নিয়মই এই যে, মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে সমাজে বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। তদনুযায়ী সামাজিক সম্বন্ধ ও সামাজিক সংগঠন গড়িয়া উঠে। ধীরে ধীরে ঐ সামাজিক সম্বন্ধ ও সামাজিক সংগঠনগুলি সমাজের অধিবাসিগণের মজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে সমাজের প্রয়োজন যখন পরিবর্তিত হয়, তখন নূতন প্রয়োজন অনুযায়ী নূতন সামাজিক সম্বন্ধ ও সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হয়। ভারতে উন্নয়নের পটভূমিকায় আজ অতীতের পুরাতন সমাজসম্বন্ধ ভাঙিয়া মানুষে মানুষে নূতন সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রতিভার বিকাশ ও শ্রমের সচলতা বৃদ্ধির পথরোধকারী পুরাতন বর্ণভেদ প্রথা ও একান্নবর্তী পরিবার প্রথার পরিবর্তে নূতন সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জোতের সংকীর্ণ কৃষি সংগঠন ভাঙিয়া বৃহত্তর ভিত্তিতে সমবায় ক্ষেতের সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই প্রকার নূতন সমাজসম্বন্ধ ও সামাজিক সংগঠন ছাড়া উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সহায়ক আধুনিক যন্ত্রকৌশল, প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরীজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ সম্ভব নহে।

৪. **আধুনিক কারিগরী কলাকৌশল প্রয়োগের সমস্যা:** মানুষের নূতন মর্যাদাবোধ সৃষ্টি ও অভাবের অবসানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত অগ্রগতি আজ অপরিমেয় নূতন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগে, কারিগরী কৌশলের ব্যবহারে, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ অনুচিত হইবে। কারণ এক দেশের সামাজিক অর্থনীতিক পরিবেশে যাহা উপযুক্ত অন্য দেশের ভিন্নতর সামাজিক অর্থনীতিক পরিবেশে তাহার যান্ত্রিক প্রয়োগ ক্ষতিকর হইতে পারে। এজন্য আমাদের দেশের বিশেষ সামাজিক অর্থনীতিক পরিস্থিতি ও উন্নয়নের স্তর অনুযায়ী ঐ সকল কলা-কৌশল, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

৫. **দ্রুত হারে পুঁজি গঠনের সমস্যা:** আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হইতেছে পুঁজি গঠনের হার বৃদ্ধি। যে কোন দেশের উৎপাদনশীলতা নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

১. মাথাপিছু জমির পরিমাণ বা জমি ও মানুষের অনুপাত (Land-man ratio) ২. দেশে

যন্ত্রপাতি, দালান-কোঠা, কারখানা বাড়ি, কলকারখানা, সংসরণ ও সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি উৎপাদনের উপায়সমূহ অর্থাৎ পুঁজি দ্রব্যাদির পরিমাণ। ৩. কারিগরী দক্ষতা। ৪. শ্রমিকগণের মনোভাব।

অবশ্য নিছক মাথাপিছু জমির পরিমাণ দ্বারা উৎপাদন ক্ষমতার শেষ সীমা নির্দিষ্ট হয় না। কারণ পুঁজিদ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করিয়া ও আধুনিক কৌশল প্রয়োগে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে পুঁজিদ্রব্যের পরিমাণই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিগঠন বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরী জ্ঞানের উন্নয়নও অপরিহার্য।

জাতীয় আয়ের যত বেশি অংশ পুঁজিগঠনে নিয়োগ করা যাইবে ততই দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হইবে। ভারতে আবার জনসংখ্যাও অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং বিরাট জনসংখ্যাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলভাগী করিতে হইলে এদেশে উচ্চতর হারে পুঁজি গঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে।

মোটামুটিভাবে দেখা গিয়াছে যে, জনসংখ্যা প্রতি বৎসর ১.২৫ শতাংশ করিয়া বৃদ্ধি পাইলে, দেশের মাথাপিছু আয়কে স্থির রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর জাতীয় আয়ের ৪.৫ শতাংশ বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। ভারতেও প্রথম পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় আনুমানিক এইরূপ হারেই বিনিয়োগ ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডে ১৮৭০-১৯১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয় আয়ের ১০ হইতে ১৫ শতাংশ হারে পুঁজি গঠন ঘটিয়াছিল এবং তাহাতে ঐ সময়ের মধ্যে জাতীয় আয় ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬৯-১৯১৩ সালের মধ্যে উহা অপেক্ষা আরও কিছু অধিক হারে পুঁজি গঠনের দ্বারা জাতীয় আয় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়ায় ১৯২৮-১৯৪০ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশের কিছু অধিক হারে পুঁজি গঠনের দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল প্রায় ১৩০ শতাংশ। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় অন্তত দ্বিগুণ করা অর্থাৎ, এক কথায় দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রতিবৎসর জাতীয় আয়ের ১২-১৫ শতাংশ বিনিয়োগ করা অবশ্য প্রয়োজন। এরূপ উচ্চ হারে বিনিয়োগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। আসল প্রশ্ন এবং সমস্যা হইতেছে কিরূপে এবং কোন্ অবস্থায়, আমরা ইহা সম্ভব করিতে পারি।

৬. **সঞ্চয় বৃদ্ধির সমস্যা :** যে কোন দেশে কোন নির্দিষ্ট সময়কালে কতটা পরিমাণে বিনিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে তাহা দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একটি হইল সমাজের সঞ্চয়ের হার। অপরটি হইল প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের জন্য লভ্য অব্যবহৃত মানবশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ। ভারতে দ্বিতীয়টি যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। সেদিক হইতে বিচার করিলে কর্মহীন শ্রমশক্তি ও প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুকূল বিষয়। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা, কারিগরী দক্ষতা, পথঘাট ও যানবাহনের উন্নতি, শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি, সেচের সম্প্রসারণ ইত্যাদির অভাবে অব্যবহৃত সম্পদ অবিলম্বে বিনিয়োগকার্যে ব্যবহার করার অসুবিধা রহিয়াছে। সেজন্য, প্রাথমিক অবস্থায় সঞ্চয়বৃদ্ধির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া উপায় নাই। বর্তমান আয় হইতে সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির দ্বারা বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো আমাদের আশু কর্তব্য ও সমস্যা।

৭. **রাষ্ট্রের যথোপযুক্ত ভূমিকাপালনের সমস্যা :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলিতে, স্বল্পোন্নত দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক গঠনে যে গভীর পরিবর্তন বুঝায়, তাহার সাফল্যের অন্যতম

অপরিহার্য শর্ত হইতেছে রাষ্ট্রের উপযুক্ত ভূমিকাগ্রহণ। দ্রুত পুঁজিগঠন, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি, কারিগরী শিক্ষার প্রসার, নূতন উৎপাদন কৌশলের প্রচলন, জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি, সামাজিক শক্তিসমূহ ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং নেতৃত্ব অবশ্য প্রয়োজন। এজন্য শিল্পক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রসার দরকার তেমনি প্রয়োজন নানাক্ষেত্রে উন্নয়নের সহায়ক নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, সরকারী আয়-ব্যয় নীতিরও উপযুক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। রাষ্ট্রকর্তৃক যথোপযুক্ত ভূমিকাপালনের সমস্যা অন্যান্য সমস্যা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

৮. **প্রশাসনিক সমস্যা :** স্বল্পোন্নত দেশের প্রশাসনিক যন্ত্র (admininstrative machinery) সাধারণত পুরাতন ঔপনিবেশিক শাসনের সৃষ্ট একটি অচলায়তন বিশেষ। এইরূপ প্রশাসনিক যন্ত্র বিদেশী শাসকগণের প্রয়োজনের উপযোগী ছিল, ইহা স্বাধীন দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের সহায়ক নহে। সুতরাং ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও উদ্যোগের সাফল্যের জন্য প্রশাসনিক যন্ত্রের গভীর সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন। সকল স্তরের সরকারী কর্মচারিগণের পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সংযোগ স্থাপন ও সকল স্তরের সরকারী কর্মচারিগণের অধিকতর দায়িত্ব সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন প্রয়োজন। দ্রুত কর্তব্য সমাপনে সক্ষম, দুর্নীতিমুক্ত, জনসাধারণের আস্থাভাজন ও সহযোগিতা লাভে সক্ষম সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্র সৃষ্টি, উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য।

৯. **বিদেশী পুঁজি, ঋণ ও সাহায্য :** স্বল্পোন্নত দেশের পুঁজির অভাব রহিয়াছে। এজন্য বিদেশী পুঁজির প্রশ্ন ওঠে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাস হইতে আমরা যেমন বিদেশী পুঁজির সাহায্য দ্বারা অর্থনীতিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, তেমনি বিদেশী পুঁজির সাহায্য ছাড়া অর্থনীতিক উন্নয়নের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। প্রথমটির দৃষ্টান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা। আর দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত জাপান ও সোভিয়েট রাশিয়া। জাপান ও সোভিয়েট রাশিয়া নিজ পুঁজির উপর নির্ভর করিয়াই, অর্থনীতিক উন্নতিলাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহাতে দেশবাসিগণকে প্রভূত কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। বিদেশী পুঁজির সহযোগিতায় সে কষ্ট অনেক পরিমাণে লাঘব করা যায়। তবে সম্পূর্ণ শর্তবিহীন না হইলে বিদেশী পুঁজি গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ তাহাতে আভ্যন্তরীণ না হউক অন্তত পররাষ্ট্রনীতির স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকে। আর অত্যধিক পরিমাণে বিদেশী পুঁজির ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিবার বিপদ এই যে, ঋণদাতা দেশের রাজনীতিক প্রভাব ঋণগ্রহণকারী দেশের রাজনীতি-অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এবং কোন আন্তর্জাতিক অবাঞ্ছনীয় অবস্থার উদ্ভবে ঋণ যদি অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যায় তবে গ্রহণকারী দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। সুতরাং ভারতে বিদেশী পুঁজি ও সাহায্য গ্রহণ করিতে গিয়া এই কথাগুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

১০. **কর্মসৃষ্টির সমস্যা :** অর্থনীতিক উন্নয়নের সমস্যা আসলে কর্মসৃষ্টির সমস্যা। কারণ মানবশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ কর্মে নিয়োগ করিবার অক্ষমতার ফলেই অনুন্নতি দেখা দেয়। কিন্তু উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে কর্মসৃষ্টি সংক্রান্ত কোন্ নীতি গ্রহণ করা হইবে তাহার সমস্যা দেখা দেয়। এই স্তরে দুইটি প্রয়োজনই বর্তমান। প্রথমত, উন্নয়নকার্যে কর্মহীন মানবশক্তির সর্বাধিক ব্যবহারের প্রয়োজন রহিয়াছে। তাহাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে।

ইহার জন্য ব্যয় যথাসম্ভব নিম্নস্তরেই আবদ্ধ রাখিতে হইবে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় অধিক মজুরিতে নিয়োগ বৃদ্ধির প্রশ্ন ওঠে না। দ্বিতীয় প্রয়োজন হইতেছে, শ্রমিকগণের প্রকৃত আয় যাহাতে বাড়ে সে জন্য দক্ষতা বাড়াইবার ব্যবস্থা করা। ইহা অবশ্য নির্ভর করে সামগ্রিকভাবে দেশে পুঁজিগঠনের হার ও প্রয়োগবিদ্যার উন্নতির উপর। এবং সেকারণে ইহা সময়সাপেক্ষ।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে হইলে অধিক পরিমাণে পুঁজি ব্যবহার করিতে হয়। আবার অধিক পরিমাণে পুঁজি ব্যবহার করিলে, অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমিকের দ্বারাই উৎপাদন করা চলে। সেজন্য পুঁজিঘন (capital-intensive) পদ্ধতি ব্যবহারে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কর্ম সৃষ্টি হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহার দ্বারাই সর্বক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া দেশের কর্মসংস্থানের স্তর ক্রমশঃ উন্নত হয় ও দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটে। অথচ প্রথমাবস্থায় অধিক পরিমাণে কর্মসৃষ্টি করিতে হইলে উৎপাদনের এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক যাহাতে অল্প পুঁজি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অল্প পুঁজি ব্যবহার করা হইলে শ্রমের দক্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায় না। সুতরাং যদিও আমাদের লক্ষ্য—অধিক কর্মসংস্থান এবং অধিক দক্ষতা, তথাপি উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে এই দুইটি লক্ষ্যের মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহা বুঝিতে হইবে এবং ইহার সন্তোষজনক সমাধান বাহির করিতে হইবে।

জাতীয় আয়ের উৎস বিচার : ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যস্তরে (কোটি টাকায়)

উৎস	'৪৮-'৪৯	'৪৯-'৫০	'৫০-'৫১	'৫১-'৫২	'৫২-'৫৩	'৫৩-'৫৪	'৫৪-'৫৫	'৫৫-'৫৬	'৫৬-'৫৭	'৫৭-'৫৮	'৫৮-'৫৯	'৫৯-'৬০	'৬০-'৬১	'৬১-'৬২	[illegible]
১. কৃষি, বন, মৎস্য-চাষ …	৪,২৫০	৪,৩৬০	৪,৩৪০	৪,৪৪০	৪,৬০০	৪,৯৮০	৫,০৩০	৫,০২০	৫,২৫০	৫,০১০	৫,৫৬০	৫,৫১০	৫,৯০০	৫,৯১০	[illegible]
২. খনি, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প …	১,৪৮০	১,৪৬০	১,৪৮০	১,৫২০	১,৫৮০	১,৬৫০	১,৭০০	১,৭৬০	১,৮৪০	১,৮৬০	১,৮৮০	১,৯৭০	২,১১০	২,২১০	২,৩[illegible]
৩. বাণিজ্য, পরিবহণ ও সংসরণ	১,৬০০	১,৬৪০	১,৬৬০	১,৭৩০	১,৭৯০	১,৮৩০	১,৯১০	১,৯৭০	২,০৮০	২,১১০	২,১৯০	২,২৭০	২,৪৬০	২,৫৪০	২,৬[illegible]
৪. অন্যান্য (সরকারী ও অন্যান্য) চাকুরী, স্বাধীন পেশা ইত্যাদি …	১,৩৪০	১,৩৮০	১,৩৯০	১,৪৩০	১,৫০০	১,৫৭০	১,৬৪০	১,৭৩০	১,৮২০	১,৯২০	২,০৪০	২,১৪০	২,৩১০	২,৪৭০	
৫. উপাদান খরচে নীট আভ্যন্তরীণ উৎপন্ন …	৮,৬৭০	৮,৮৪০	৮,৮৭০	৯,১২০	৯,৪৭০	১০,০৩০	১০,২৮০	১০,৪৮০	১০,৯৯০	১০,৯০০	১১,৬৭০	১১,৮৯০	১২,৭৮০	১৩,১৩০	১৩,৪[illegible]
নীট বিদেশাগত আয়	−২০	−২০	−২০	−২০	−১০	−০	−০	−০	+১০	−১০	−২০	−৩০	−৫০	−৭০	−৮[illegible]
উপাদান খরচে নীট জাতীয় উৎপন্ন =জাতীয় আয়…	৮,৬৫০	৮,৮২০	৮,৮৫০	৯,১০০	৯,৪৬০	১০,০৩০	১০,২৮০	১০,৪৮০	১১,০০০	১০,৮৯০	১১.৬৫০	১১,৮৬০	১২,৭৩০	১৩.০৬০	১৩,৩[illegible]

প্রশ্নপত্র ও উত্তর-সংকেত

১ঃ ভারতের অর্থনীতির গঠন

1. Give an outline of the structure of Indian Economy.

—*Ans.* পৃঃ ৩-৮ (সংক্ষিপ্ত আলোচনা)।

2. Discuss the main features of underdevelopment to be witnessed in India's economy today. [C. U.. B. A. 1962].

Ans. ভারতের অনুন্নতির সকল লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতে হইবে। —*Ans* পৃঃ ৩-৮।

২ঃ জাতীয় আয়

1. Discuss the salient features of the Indian economy as revealed by the analysis of the national income of India.

—*Ans.* পৃঃ ১২-১৪।

2. Discuss the difficulties of measuring the national income of India.

—*Ans.* পৃঃ ১১।

3 Give an account of the growth of national income during the Plan period.

—*Ans.* পৃঃ ১৪-১৫।

4 Discuss the importance of national income estimation in India and consider the difficulties involved. [B. U. B. A. (MOD) 1963] —*Ans* পৃঃ ১০-১১

5. What measures would you recommend for lessening the concentration of wealth and economic power in India ? [B. U. B. Com. (Mod, 1964]

-*Ans* পৃ° ১৫-১৮

৩ঃ কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি

1. Analyse the causes of growing unemployment in India. Suggest remedies to tackle the problem. [C. U. B.Com 1954]

Ans. প্রথমে কৃষি, শিল্প ও শহরাঞ্চলের এবং শিক্ষিত কর্মহীনতার বৃদ্ধির কারণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া উপসংহারে বলিতে হইবে যে অর্থনৈতিক উৎপাদনের হার যথোপযুক্ত নহে বলিয়াই সমস্যাটির তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার পর উহাদের প্রতিকারের পন্থাগুলিও সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইবে।

2. What are the main types of unemployment to be witnessed in India today ? What measures would you suggest for the solution of unemployment problem in India ? [C. U., B. A. 1956]

Ans পৃঃ ২০-২৯

3. Briefly examine the employment programme of the Govt. of India as adopted and implemented during the Plan period. —*Ans.* পৃঃ ২৯-৩২।

4. Examine the main causes of unemployment in India. What measures are being adopted to solve the problem under the Third Plan ?

[B U. B. A. (old-pass) 1962] —Ans. পৃঃ ২০-২২, ৩১-৩২

5. Examine the nature of the unemployment problem in India (a) in the urban sector and (b) in the rural sector. Discuss in this connection, the impact of the Plans on employment. [N. B. U., B A. (old) 1963]. —Ans. পৃঃ ২২-২৭, ২৯-৩২

6. Indicate the nature and causes of unemployment in India in both (a) the agricultural Sector and (b) the industrial Sector. [B. U., B. A. (Mod) 1963]

—**Ans.** পৃঃ ২২-২৭

7. Account for the persistence of the problem of unemployment in Indian economy. [B. U. B. A. (Part II) 1963] —Ans
—Ans. পৃ: ১৯-২১

8. Explain the nature of the unemployment problem in India. Give your own views on the solution of the problem. [B. U., B. Com. (New) 1964]

9. Discuss the nature of unemployment problem in India. How far would the Third Five Year Plan of India provide a solution for this problem.
[C. U., B. A. (Part II) 1964] —Ans. পৃ: ১৯-৩০

৪ : প্রাকৃতিক সম্পদ

1. Describe the influence of forests on the economic life of India.
[C U., B Com. 1946]—Ans. পৃ: ৩৫-৩৬

2. Give a brief account of the mineral resources of India.
[C. U., B. Com. 1947]—Ans. পৃ: ৩৯-৪০

3. Dicuss the importance of mining industry to the Indian economy. How well is India equipped with mineral resources ?
[C.U., B. A. 1948] —Ans. পৃ: ৩৯-৪০

4. Give an account of the forest policy of the Government of India. Discuss the importance of forests in the economic life of Ir c' [C. U . B. Com. 1948]
—Ans. পৃ: ৩৫-৩৮

5. Explain the economic importance of forests, and suggest measures for improving the forest resources of India. [C. U., B.A. 1950]
—Ans. পৃ: ৩৫-৩৮

6. Write short notes on India's power resources. [C. U. B.Com (old) 1962]
Ans. পৃ: ৪২-৪৪

৫ : মানবিক উপাদান

A. "A rapidly growing population is the most fundamental obstacle to economic progress in India" Discuss. [B. U., B. Com. (Mod) 1963, C. U., B, Com. 1950]
—Ans. পৃ:৪৭-৪৯

What do you understand by the term "Overpopulation ?" Is India Over-populated ? Give reasons for your answer.
[C. U , B.,Com. 1955] —Ans. পৃ: ৫০-৫৪

3. Dicuss fully the effects of economic development on the growth of population in the present Indian context.
[B. U., B. Com (old) 1962, C. U. B. Com 1958] —Ans. পৃ: ৪৯-৫০

4. Critically discuss the problem of India's growing population in the context of her planned economic development. [C. U. B. Com. (old) 1962]
—Ans. পৃ: ৪৭-৪৯

5. Discuss the effect of population growth on economic development in India.
[B. U., B. A. (Mod) 1962] —Ans. পৃ: ৪৭-৪৯

6. "This ancient land of ours is awfully overcrowded." Comment.
[B. U., B. Com. (Part I) 1963] —Ans, পৃ: ৫০-৫৪

7. Write a critical note on the population problem in India.
[C. U., B. Com. (old) 1964] —Ans. পৃ: ৪৭-৫০

8. Discuss the problem of population growth in the context of planning.
[B. U., B. A. (Mod) 1964] —Ans. পৃ: ৪৭-৫০

9. Discuss fully the effects of economic development on the growth of population in the present Indian context. [B. U., B. Com. (old) 1962] —Ans. পৃ: ৪৭-৪৯

৬ : ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা

1. What do you mean by underdevelopment ? How do you distinguish between developed and underdeveloped countries ? —*Ans*. পৃ: ৫৭-৫৮

2. Discuss the socio-economic factors responsible for the existence of under developed countries like India.
- *Ans* পৃ: ৫৮-৬০

3. Explain the fundamental problem of underdevelopment.
—*Ans*. পৃ: ৬০

4. Write a short note on the causes of underdevelopment of underdeveloped areas. —*Ans*. পৃ: ৫৮-৬০

5. What do you mean by economic development ? Point out the requisites of economic development. —*Ans* পৃ: ৬০-৬১, ৬৩-৬৪

6. State and explain the obstacles to economic development of an underdeveloped conntry. —*Ans*. পৃ: ৬৪-৬৬

7. Discuss the problems of economic development in India
—*Ans*. পৃ: ৬৬-৭০

8. Examine the Socio economic factors impeding economic growth in India.
[C. U., B. Com. 1960, B. U., B Com. (old) 1962]
—*Ans*, পৃ: ৫৮-৬০

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাথমিক অর্থনীতিক ক্ষেত্র

* কৃষি *

"দেশের মঙ্গল? দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ—দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী।……যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র

১

কৃষি-অর্থনীতির গঠন, সমস্যা ও বিকাশ

Structure, Problems & growth of the Agrarian Economy

কৃষির গুরুত্ব

IMPORTANCE OF AGRICULTURE

সকল স্বল্পোন্নত দেশের মত ভারতেও জাতীয় অর্থনীতির প্রধান অবলম্বন কৃষিকার্য। কৃষিকার্য প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থনীতিক কার্য (Primary activity)। ইহার প্রাধান্য ভারতের স্বল্পোন্নত অর্থনীতিক গঠনের একটি প্রধান লক্ষণ। জাতীয় অর্থনীতিক জীবনে কৃষির এই গুরুত্ব নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

১. দেশের মোট অধিবাসিগণের তিন-চতুর্থাংশেরও অধিক জীবন ধারণের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল।

২. দেশের উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত মোট ১৪ কোটি ব্যক্তির মধ্যে ১০ কোটি (৭১ শতাংশের অধিক) ব্যক্তি কৃষিকার্যে নিযুক্ত। অর্থাৎ কৃষিই এখন পর্যন্ত দেশে কর্ম সংস্থানের সর্বপ্রধান ক্ষেত্র।

৩. জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক কৃষিক্ষেত্র হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৪. ক্রমবর্ধমান জনশক্তির প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রধানত কৃষির উপরেই দেশকে নির্ভর করিতে হয়।

৫. ভারতের পাঁচটি প্রধান শিল্পের মধ্যে তিনটি, যথা, কাপড়ের কল, চটকল ও চিনির কারখানা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যথা তুলা, পাট ও ইক্ষু প্রভৃতির জন্য কৃষির উপরেই নির্ভর করে। এইসকল কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদা কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই মিটাইতে হইবে।

৬. কৃষিকার্যই এখন পর্যন্ত দেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য যথা, পাট, তৈলবীজ, চা, তামাক ইত্যাদি উৎপাদন ও সরবরাহ করিয়া মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করিয়া থাকে।

৭. কৃষিজাত বিবিধ খাদ্যশস্য ও কাঁচামালই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রধান বস্তু।

৮. কৃষিকার্যের সাফল্য ও বিপত্তির উপর এখন পর্যন্ত দেশের সরকারী বাজেটের আয় এবং ব্যয়ের উদ্বৃত্ত বা ভারসাম্য নির্ভর করে। অনাবৃষ্টি বা বন্যার দরুন কৃষিতে বিপত্তি ঘটিলে সরকারী আয় হ্রাস ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিয়া বাজেটের সংকট সৃষ্টি করে।

৯. কৃষিজ বা খনিজ কাঁচামালের উৎপাদন অনুন্নত দেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নেও কৃষি প্রভৃতি প্রাথমিক উৎপাদনের ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ, কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদন কতটা পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়, তাহার উপর জনসংখ্যার কত ভাগ শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্যে, অর্থাৎ অর্থনীতির দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে তাহা নির্ভর করে। ভারতে দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক

ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকুচিত এবং তুলনায় প্রাথমিক ও দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পর্যায় অত্যন্ত বিস্তৃত। ইহার অবসানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা কৃষিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই জাতীয় অর্থনৈতিক বিকাশের প্রাথমিক প্রয়োজন। এজন্য ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষির গুরুত্ব সমধিক।

কৃষি-অর্থনীতির গঠনবৈশিষ্ট্য

THE STRUCTURAL FEATURES OF THE AGRARIAN ECONOMY

ভারতের কৃষি-অর্থনীতির অন্তর্নিহিত পরিচয় পাইতে হইলে, উহার মূল সমস্যা ও বিবিধ দুর্বলতাগুলি জানিতে হইলে, দেশের কৃষি কাঠামোর গঠন ও উহার বিবিধ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

১. **জমির ব্যবহার (Land Utilisation):** দেশের মোট ভৌগোলিক আয়তনের অর্ধেকেরও কম অংশ (৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ একরের মধ্যে ৩৭ কোটি·২৮ লক্ষ একর) চাষের অধীন। ইহার মধ্যে ১৩ শতাংশ জমিতে বৎসরে একাধিকবার চাষ হয়। কর্ষিত ভূমির মাত্র ১৬ শতাংশে সেচের ব্যবস্থা আছে, গড়ে কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার মাথাপিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ ১ একরের কিছু বেশি মাত্র। কর্ষণযোগ্য পতিতজমির পরিমাণ কর্ষণাধীন জমির ১৩ শতাংশ (৫ কোটি একর)।

২. **উৎপন্ন ফসলের ধাঁচ (Crop Pattern):** কর্ষিত জমির প্রায় ৮২ শতাংশে খাদ্যশস্য ও ১৮ শতাংশে অন্যান্য ফসলের চাষ হইয়া থাকে।

উৎপাদনের পরিমাণ ও কর্ষিত ভূমির আয়তনের দিক হইতে চাউল ভারতের প্রধান খাদ্য-শস্য। মোট কর্ষিত ভূমির এক-পঞ্চমাংশেরও অধিক জমিতে চাউল এবং এক-দশমাংশের কিছু অল্প জমিতে গমের চাষ হয়। তুলা, ইক্ষু ও পাট মুখ্য বাণিজ্যিক ফসল। ইহারা ভারতের তিনটি প্রধান শিল্প বস্ত্রকল, চিনিকল ও চটকলের ভিত্তি। চীনাবাদাম ও অন্যান্য তৈলবীজ বনস্পতি তৈল শিল্পের ভিত্তি।

৩. **জোতের গড় আয়তন (Average size of Land Holding):** অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে কৃষিজোতের গড় আয়তন অত্যন্ত অল্প। খামার জমির গড় আয়তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৫ একর, ডেনমার্কে ৪০ একর, ইংলণ্ডে ২০ একর, আর ভারতে মাত্র ৫·৭ একর। তবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যে ইহার তারতম্য দেখা যায়। ভারতে জোতের গড় আয়তন ৭·৫ একর হইলেও উহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর, এমনকি এক বিঘারও কম আয়তনের জোতের পরিমাণ নগণ্য নহে। এজন্য ভারতকে ক্ষুদ্র চাষীর দেশ বলা যায়।

৪. **জোতজমির মালিকানার ধাঁচ (Pattern of Land Holding)** শতকরা ৭১টি কৃষক পরিবারের অধীনস্থ জোতজমির আয়তন ০·০১ একর হইতে ১০ একরের মধ্যে। ইহারা মোট কর্ষিত জমির ৩৬·৪ শতাংশের মালিক। শতকরা ১০টি কৃষক পরিবারের জোত-জমির আয়তন ১০ একর হইতে ২৫ একরের মধ্যে। ইহারা মোট কর্ষিত ভূমির ৩০·৩ শতাংশের মালিক। শতকরা ৪টি কৃষক পরিবার ২৫ একর ও তদূর্ধ্ব আয়তনের খামারের মালিক। ইহারা মোট কর্ষিত ভূমির ৩৩ শতাংশের মালিক। বাকী ৬৩ শতাংশ কৃষক পরিবারের কোন জমি নাই। ভারতে অধিকাংশ কৃষকের জমির পরিমাণ নগণ্য এবং অধিকাংশ কৃষিজমি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত।

৫. **জোতের উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণ** (**Subdivision and Fragmentation of Land Holdings**): ভারতীয় কৃষক পরিবারের জোতের গড় আয়তন ৭·৫ একর, অথচ বৃটিশ শাসনের প্রথম যুগেও জোতের গড় আয়তন ছিল ৯।১০ একরেরও অধিক। সুতরাং যতই দিন যাইতেছে, ততই ভারতে কৃষি-জোতের গড় আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছে। শুধু তাহাই নহে, কৃষকদের অধিকাংশের জমিই বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকে। প্রধানত উত্তরাধিকার আইনের জন্যই জোতজমিগুলি এরূপভাবে ক্রমশ বিভক্ত এবং বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহা ভারতীয় কৃষির একটি বৈশিষ্ট্য এবং প্রবল সমস্যা।

৬. **ভূমিব্যবস্থা** (**Land Tenure System**): জমির ভোগদখল ও প্রজাস্বত্বের শর্তাদি লইয়া ভূমিব্যবস্থা গঠিত। এই শর্তগুলি কৃষকের যত অনুকূল হইবে, ততই কৃষিকার্যে তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইবে। কৃষির উৎপাদন বাড়িবে। আর, ভূমিব্যবস্থা কৃষকের প্রতিকূল হইলে, কৃষিকার্যে তাহারা নিরুৎসাহ হয়। সুতরাং দেশের কৃষি-অর্থনীতিতে ভূমিব্যবস্থার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বৃটিশশাসনে জমির মালিকানা হইতে কৃষককে বঞ্চিত করিয়া যে ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহাতে কৃষির ক্রমাগত অবনতি ও কৃষকের দারিদ্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে। স্বাধীনতালাভের পর কৃষির উন্নতির জন্য ভূমিব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য হইয়া পড়ে। প্রথম পরিকল্পনায় এজন্য জমিদারী প্রথার অবসান করিয়া কৃষকগণকে জমির মালিকানা অর্পণের নীতি গৃহীত হয়। বর্তমানে জমিদারী প্রথার অবসান ঘটিলেও ভূমিব্যবস্থার সংস্কার এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

৭. **প্রত্যক্ষভোগনির্ভর কৃষি** (**Subsistence Farming**): ভারতের কৃষি-কাঠামোর আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে প্রত্যক্ষভোগনির্ভর কৃষিকার্য (Subsistence Farming) প্রচলিত। দেশে উৎপন্ন মোট ফসলের শতকরা ৩৫ ভাগ মাত্র ব্যবসায়ী ও দালালগণের নিকট বিক্রয় হয়; শতকরা ১৫ ভাগ ফসল খাজনা ও মজুরি হিসাবে প্রদত্ত হয় ও শতকরা ৮ ভাগ বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকী শতকরা ৪২ ভাগ ফসল কৃষকগণ নিজেরা ব্যবহার করে। ইহাতে কৃষকগণের বিক্রয়যোগ্য ফসল কম বলিয়া আর্থিক আয় অল্প হয়। সুতরাং গ্রামীণ জনসাধারণের আর্থিক সঞ্চয়ও কম। আর্থিক আয় স্বল্প বলিয়া কৃষকগণের হাতে ব্যয় করিবার মত নগদ অর্থ কম। ইহাতে গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত বিবিধ দ্রব্যের বাজার সংকীর্ণ থাকিয়া যাইতেছে।

৮. **কৃষিশ্রমিক** (**Agricultural Labour**): ক্রমবর্ধমান বিপুলসংখ্যক কৃষি-শ্রমিকের অস্তিত্ব ভারতের কৃষিকাঠামোর অপর সংকটপূর্ণ দিক। বর্তমানে আনুমানিক ৩ কোটি ৩০ লক্ষ কৃষিশ্রমিক রহিয়াছে। তাহাদের অনেকেরই নিজস্ব কোন জোতজমি নাই। ইহারা জমি হইতে দেনার দায়ে উৎসাদিত কৃষক। অপরের জমিতে দৈনিক মজুরিতে ইহারা কাজ করিয়া জীবনধারণ করে। কাজের অভাবে ইহারা বৎসরের মধ্যে অনেকদিন কর্মহীন থাকে। এই সকল কৃষিশ্রমিকের আয়ও খুব অল্প। কর্মহীনতা ও স্বল্প আয়ে ক্লিষ্ট এই কৃষিশ্রমিক বাহিনীর অস্তিত্ব ভারতে মানবশক্তির অপচয়ের আর একটি পরিচয়। জমির সহিত সম্পর্কশূন্য ইহাদের উপর নির্ভরশীল কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির আশা করা যেমন যায় না তেমনি, গ্রামীণ জনসমষ্টির এই অংশের চরম দারিদ্র গ্রামাঞ্চলে যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের বাজারের সীমাবদ্ধতার অপর একটি কারণ।

৯. **ব্যাপক কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তির অস্তিত্ব** (**Existence of widespread Unemployment & Underemployment**): ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি

অন্যান্য জীবিকার অভাব, গ্রাম্য কুটির শিল্পের অবনতি, পুঁজি ও কারিগরী জ্ঞানের উন্নতির অভাব প্রভৃতির দরুন, ক্রমেই কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে কৃষিতে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনও পর্যন্ত ইহা প্রকাশ্য কর্মহীনতার রূপ লয় নাই, কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকার না হইলে অচিরেই উহার আশঙ্কা রহিয়াছে।

১০. **পুঁজির স্বল্পতা** (Lack of Capital): ভারতের কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ অতি নগণ্য। কৃষিক্ষেত্রে স্বল্পপুঁজি ও কৃষকের স্বল্প উৎপাদন এবং স্বল্প আয়ের পাপচক্রই, ভারতের অর্থনীতির মৌল সমস্যা। পুঁজির স্বল্পতার জন্যই আজ পর্যন্ত কৃষকগণ উন্নত সার, বীজ, যন্ত্রপাতি ও সেচের সুবিধা গ্রহণে অক্ষম।

১১. **ত্রুটিপূর্ণ কৃষি সংগঠন** (Defective Agricultural Organisation): কৃষি সংগঠনকে উৎপাদন সংগঠন ও বিক্রয় ব্যবস্থার সংগঠন—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। উৎপাদন সংগঠনের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় ভারতে পারিবারিক ভিত্তিতে কৃষিকার্য পরিচালিত হয়। অর্থাৎ আধুনিক অর্থনীতির পরিভাষায় ইহা ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত। অধিকাংশ কৃষক পরিবারের দারিদ্র্য ও স্বল্প আয়ের দরুন কৃষির বর্তমান ভিত্তি অর্থাৎ পারিবারিক কৃষি সংগঠন, কৃষির উন্নয়নের পক্ষে অনুপযুক্ত। জোতের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র, পুঁজির পরিমাণ সামান্য। এমতাবস্থায় শুধু পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের সাহায্য লইয়া চাষের দ্বারা ফসল যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করা অসম্ভব। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র জোতগুলিতে চাষের খরচ পর্যন্ত ওঠে না। এজন্য ভারতের কৃষিজোতকে অ-লাভজনক (uneconomic) বলা হইয়াছে। কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের সংগঠনও ত্রুটিপূর্ণ। কৃষকগণ তাহাদের ফসল কাটার পূর্বেই উহা মহাজনের নিকট দেনার দায়ে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। গুদামের অভাব, ও ঋণ পরিশোধের তাগিদও তাহাদের অবিলম্বে ফসল বিক্রয়ে বাধ্য করে। এ সকলের ফলে, কৃষকগণ ফসলের ন্যায্য দর পায় না।

১২. **জমির উপর ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির চাপ** (Increasing Pressure of Population on land): গত ৬০ বৎসর ধরিয়া দেখা যাইতেছে একদিকে জমির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত বাড়িতেছে এবং অপর দিকে শিল্পের উপর নির্ভরশীল জনসমষ্টির অনুপাত কমিতেছে। ১৯০১ সালে কৃষিনির্ভর জনসমষ্টি ছিল মোট জনসমষ্টির ৬৭.৪ শতাংশ; ১৯৬১ সালে উহা হয় ৭০ শতাংশ। তুলনায় ১৯১১ সালে শিল্পনির্ভর জনসমষ্টি ছিল ১৭.৫ শতাংশ। ১৯৬১ সালে উহা হইয়াছে ১০.৬ শতাংশ।

১৩. **কৃষিতে মুদ্রা-ব্যবহারহীন ক্ষেত্রের অস্তিত্ব** (Existence of non-monetised sector in agriculture): ভারতের গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত কৃষকগণের ভোগব্যয়ের ৩৯ শতাংশ টাকার লেনদেন ছাড়াই ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ এই পরিমাণে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে টাকার ব্যবহার ঘটে না। ইহার ফলে কৃষকগণের মধ্যে পুরাপুরি আর্থিক প্রণোদনা (monetary incentive) সৃষ্টি হইতে পারিতেছে না এবং কৃষির এই অংশের সহিত বাজারের যোগসূত্র স্থাপিত হইতেছে না।

কৃষির সমস্যাসমূহ
THE PROBLEMS OF AGRICULTURE

ভারতের কৃষি অর্থনীতির গঠনবৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটি কৃষির উন্নতি ও ফসলের উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধির প্রতিকূল। সেচের স্বল্পবিস্তার, গড়পড়তা জোতের ক্ষুদ্রায়তন, জোতের উপবিভাজন

ও বিক্ষিপ্ত অবস্থান, কৃষির উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীল জনসংখ্যা, পুঁজির স্বল্পতা ইত্যাদি মিলিয়া ভারতের কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মটির প্রাবল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ভূমি ব্যবস্থার সন্তোষজনক কার্যকর সংস্কারের অভাব, ক্রমবর্ধমান কৃষিমজুর বাহিনী, ব্যাপক কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি এবং ত্রুটিপূর্ণ কৃষি সংগঠন উৎপাদন বৃদ্ধিতে এখনও কৃষককে উপযুক্ত প্রণোদনা (incentive) যোগাইতে অক্ষম। প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষি ও কৃষির একাংশে মুদ্রা ব্যবহারহীন ক্ষেত্রের অস্তিত্ব কৃষকের সহিত বহির্জগতের বাজারের যোগসাধনে বাধা দিতেছে। এই সকল গঠনগত ও প্রতিষ্ঠানিক বাধাগুলি এখনও বর্তমান রহিয়াছে বলিয়াই গত দশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া পরিকল্পনাগুলির অন্তর্গত নানারূপ চেষ্টা সত্ত্বেও কৃষির অগ্রগতি ও উৎপন্ন ফসলের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটিতেছে না। কৃষির উন্নয়নহার এখনও অনিশ্চিত এবং কৃষিজাত কাঁচামালের অভাব ও খাদ্যসমস্যা এখনও প্রবল রহিয়াছে।

ভারতের কৃষির পশ্চাৎপদ অবস্থা, খাদ্য ও কাঁচামালের অভাব, কৃষকের দারিদ্র, মোট উৎপাদনের স্বল্পতা ইত্যাদি সকল কিছুরই মূলগত কারণ হইতেছে কৃষির একর পিছু জমির স্বল্প উৎপাদনশীলতা (low productivity)। অন্যান্য দেশের তুলনায় যে ভারতের প্রধান প্রধান ফসলের একরপিছু উৎপাদনশীলতা অল্প শুধু তাহাই নহে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও ইহার যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। স্বল্প উৎপাদনশীলতাই ভারতের কৃষির মূলগত সমস্যা। যে কৃষির উপর জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধাংশ নির্ভর করে, যাহা হইতে দেশের জনসমষ্টির প্রায় ৭০ শতাংশ জীবনধারণ করে, স্বভাবতঃই উহার স্বল্প উৎপাদনশীলতা দেশের সর্বব্যাপক অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূলগত কারণরূপে গণ্য করিতে হইবে।

কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার কারণগুলি (Causes of low productivity) বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় এজন্য দায়ী হইতেছে,—১. সুদীর্ঘকাল চাষের দরুন মৃত্তিকার উর্বরা শক্তির হ্রাস; ২. কর্ষণযোগ্য উর্বর মৃত্তিকার অভাব; ৩. ভূমিক্ষয়; ৪. কৃষির মৌসুমী-নির্ভরতা; ৫. সেচের যথেষ্ট প্রসারের অভাব; ৬. সারের অভাব; ৭. ত্রুটিপূর্ণ কৃষি-পদ্ধতি; ৯. উৎকৃষ্ট বীজের অভাব; ১০. কীটপতঙ্গের অত্যাচার ও গাছের রোগ; ১১. ত্রুটিপূর্ণ কৃষিসংগঠন; ১২. কৃষিঋণের অভাব ও দেনার ভার; ১৩. পুঁজির স্বল্পতা; ১৪. ত্রুটিপূর্ণ ভূমিব্যবস্থা; ১৫. কৃষিকার্যের প্রত্যক্ষ ভোগ নির্ভরতা, ১৬. জমির উপবিভাজন বিক্ষিপ্ত অবস্থান, ক্ষুদ্রায়তন প্রভৃতি গঠন বৈশিষ্ট্যগুলি। উপরোক্ত কারণগুলির প্রত্যেকটিই কৃষির আংশিক বা খণ্ড সমস্যা। আর এই সকল খণ্ড সমস্যাগুলি একত্রে কৃষির মূল সমস্যা—স্বল্প উৎপাদনশীলতার জন্য দায়ী।

কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার ফলাফল (Effects of low productivity):

১. কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতার প্রত্যক্ষ ফল মোট উৎপন্ন ফসলের স্বল্পতা। ২. খাদ্য-শস্যের মোট উৎপাদন স্বল্প বলিয়া একদিকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে অনাহার ও স্বল্পাহারের দরুন দেশবাসীর জীবনীশক্তি হ্রাস পাইয়াছে ও রোগ ও মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপর দিকে খাদ্য-ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হইতেছে। ইহাতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হইতেছে। ৩. কৃষকগণের মাথাপিছু উৎপাদন ও আয় স্বল্প হইয়া পড়িয়াছে। ৪. স্বল্প উৎপাদনশীলতার জন্য তুলা, পাট, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি বাণিজ্যিক বা অর্থকরী (cash crops) ফসলের উৎপাদনও অল্প। ইহাতে কৃষকগণের আর্থিক আয় বা ক্রয়-শক্তিও কম। ৫. কৃষকের ক্রয়শক্তি কম বলিয়া তাহাদের নিকট শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত

সীমাবদ্ধ। ইহা শিল্প প্রসারে বাধা দিতেছে। ৬. শিল্পপ্রসার ব্যাহত হইতেছে বলিয়া দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথে বিঘ্ন ঘটিতেছে। ৭. একদিকে স্বল্প উৎপাদনশীলতার জন্য কৃষকের আয় কমিতেছে। কিন্তু অপরদিকে দিনের পর দিন খাজনা, কর ও সুদের হার বাড়িতেছে বলিয়া তাহার দেনা বাড়িতেছে। ৮. দেনার দায়ে অবশেষে অপারগ হইয়া কৃষকগণ মহাজনদের নিকট জমি-বিক্রয় করিয়া দিতেছে। এইরূপে একদিকে জমি হইতে কৃষক উচ্ছেদ ও অপরদিকে মুষ্টিমেয় গ্রাম্য ধনী মহাজনদের হাতে অধিকপরিমাণে জমি কেন্দ্রীভূত হইতেছে।

কৃষি-উন্নয়নের গুরুত্ব (Importance of Agricultural Development) : ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতির প্রধান ভিত্তিই কৃষিকার্য। এজন্য ইহার উন্নয়ন ছাড়া এসকল দেশের অর্থনীতিক শ্রীবৃদ্ধি অসম্ভব। কৃষিকার্যের উৎপাদনশীলতা বর্তমান শোচনীয় স্তর হইতে উন্নীত না করিতে পারিলে যেমন কৃষির উন্নতি সম্ভব নহে, তেমনি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়নের আশাও দুরাশা মাত্র। নিম্নলিখিত কারণে ভারতে সর্বাগ্রে কৃষির স্বল্প উৎপাদনশীলতা দূর করিয়া কৃষির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতেই ভারতে খাদ্যঘাটতি চলিতেছে। খাদ্যের চাহিদা ভবিষ্যতে আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ একদিকে জনসংখ্যা বৎসরে ২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অপরদিকে অর্থনীতিক উন্নতির বর্তমান চেষ্টার ফলে যতই আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িবে ততই দেশের অত্যন্ত দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে অর্ধাহার ও অনাহার কমিবে। যাহারা একবেলা খাইত তাহারা দুইবেলা খাইবে। ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত অবনত বলিয়া এই অবস্থায় আয় বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে। ইহাছাড়া কৃষিকার্য ছাড়িয়া যতই অধিকলোক শিল্পে যোগদান করিবে, ততই তাহাদের খাদ্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য কৃষকদের আরও বেশি খাদ্য-উৎপাদন করিতে হইবে। সুতরাং দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার জন্য অত্যন্ত দ্রুতগতিতে খাদ্যের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে।

২. বিকাশমান শিল্পগুলির ক্রমবর্ধমান কাঁচামালের চাহিদা কৃষিক্ষেত্রকে মিটাইতে হইবে। এজন্য কৃষিজাত কাঁচামালের উৎপাদনের পরিমাণ যেমন যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে, তেমনি বহু প্রকারের কাঁচামাল উৎপাদন করিতে হইবে।

৩. বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানির জন্য মূল্যবান বিদেশীমুদ্রা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে চাহিদা আছে এরূপ কাঁচামালের রপ্তানি বাড়াইতে হইবে। এজন্য ঐ সকল কাঁচামালের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়াইতে হইবে।

এককথায়, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান ও কৃষিজাত কাঁচামালের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কৃষির মোট উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি, উৎপন্নের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যসাধন করিতে হইবে। ইহার জন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। তবেই কৃষক পরিবারগুলির উৎপাদন এত বৃদ্ধি পাইবে যে, নিজেদের ভোগের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকিবে। কৃষির এই উদ্বৃত্তই অকৃষিকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের খাদ্যের চাহিদা, শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা ও রপ্তানির চাহিদা মিটাইতে পারিবে। এই উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে সক্ষম হইলেই, বর্তমান প্রত্যক্ষভোগনির্ভর কৃষির রূপান্তর ঘটিবে। বাজারনির্ভর কৃষি প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশের অর্থনীতিক উন্নয়ন স্থায়ী কৃষি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবেই দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্র উহার যথার্থ ভূমিকা পালনে সক্ষম হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও কৃষির পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ছাড়া শিল্পবিপ্লব সাফল্য লাভ করে নাই। এই জন্যই ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে কৃষির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

প্রতিকার: কৃষিকাঠামোর পুনর্গঠন (Remedy: Agricultural Reorganization): ভারতীয় কৃষির স্বল্প-উৎপাদনশীলতা ও পশ্চাদ্‌পদ অবস্থা যেমন নানাবিধ ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার ফল, বিবিধ খণ্ড সমস্যার কেন্দ্রীভূত ফল, তেমনি ইহার প্রতিকারের জন্য ঐ সকল খণ্ড সমস্যাকে একযোগে আক্রমণের প্রয়োজন রহিয়াছে। চতুর্দিক দিয়া সকলপ্রকার ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সামগ্রিকভাবে বর্তমান কৃষি কাঠামোর পুনর্গঠন প্রয়োজন। তবেই একমাত্র কৃষির উন্নয়নের বিঘ্নগুলি দূর করিয়া কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এজন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বনীয়।

১. কৃষকেরা যাহাতে প্রাণপণ পরিশ্রম করে সে জন্য সর্বাগ্রে তাহাদের উপযুক্ত প্রণোদনার (incentive) ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার জন্য ভূমিব্যবস্থার সংস্কার, খাজনা হ্রাস, পুরাতন দেনার ভার লাঘব, জমিতে কৃষকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাতে পরিপূর্ণরূপে জমি ব্যবহারের বাধা অপসারিত হইবে।

২. **জোতের আয়তন বৃদ্ধি** করিতে হইবে। বর্তমান ক্ষুদ্র জোতের পরিবর্তে বৃহদাকার জোতের প্রবর্তন না হইলে জমিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাইবে না। এজন্য সমবায় জোতের প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়। ইহার ফলে জমির উপযুক্ত ব্যবহার সম্ভব হইবে।

৩. **কর্ষণযোগ্য পতিত জমি উদ্ধার** করিয়া কর্ষিত ভূমির আয়তন বাড়াইতে হইবে। ইহার জন্য মরু ও ঊষর অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ দ্বারা ভূমিক্ষয় নিবারণ, উপযুক্ত পরিমাণে সেচের ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রয়োজন।

৪. **প্রগাঢ় কৃষির প্রবর্তন** করিতে হইবে। জৈব ও কৃত্রিম সারব্যবহার বৃদ্ধি, ভূমি সংরক্ষণ, শুষ্ক কৃষি, মিশ্র কৃষি, উন্নত বীজ ব্যবহার, আধুনিক কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তন, আবর্তন কৃষি ইত্যাদির দ্বারা কৃষি জমির সর্বাধিক ব্যবহার ও উহা হইতে সর্বাধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব।

৫. ইহার সহিত প্রয়োজন কৃষিজাত **ফসল বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি, ঋণের পর্যাপ্ত যোগান।**

৬. অপর প্রয়োজনীয় বিষয় হইল কৃষকের পক্ষে **সন্তোষজনক অথচ যুক্তিসঙ্গত, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যস্তর** প্রতিষ্ঠা ও উহার স্থিতি। কৃষিজাত দ্রব্যের দর অতি অল্প হইলে যেমন কৃষকের সর্বনাশ, তেমনি অত্যধিক হইলে উহার ব্যবহারকারিগণের ক্ষতি। আবার কৃষিজাত দ্রব্যের দর যদি ঘন ঘন ওঠানামা করে, তাহাতেও কৃষিকার্যে লাভের অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সেজন্য কৃষিজাত দ্রব্যের যুক্তিসঙ্গত ও স্থিতিশীল দর কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

৭. ভারতে কৃষির স্বল্প উৎপাদশীলতার অপর একটি কারণ কৃষিতে নির্ভরশীল জনসংখ্যার আধিক্য। এজন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়াইতে হইলে **গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের কৃষিনির্ভর শিল্প** (agro-industries) **ও অন্যান্য গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারের দ্বারা** কৃষি হইতে **অতিরিক্ত জনসংখ্যার শিল্পে অপসারণ** প্রয়োজন। ইহার সহিত সংগতি রাখিয়া দেশের সাধারণ শিল্পায়নের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৮. সর্বোপরি প্রয়োজন, উপরোক্ত কার্যক্রমগুলি সফল করিবার জন্য **সুনির্দিষ্ট কৃষি পরিকল্পনা** ও উহা কার্যকর করিবার জন্য রাষ্ট্রের উদ্যোগ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা। বলা বাহুল্য ভারত বিগত দশ বৎসর ধরিয়া এই পথেই অগ্রসর হইতেছে এবং ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভে সক্ষম হইয়াছে

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির দ্বারা কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পথে কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বর্তমান বাধাগুলি অপসারিত এবং নূতন ও অনুকূল গঠনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ সৃষ্টি হইবে। এবং কৃষির ভিত্তির আমূল পরিবর্তন ও পুনর্গঠন ঘটিবে। তাহাতে কৃষির উৎপাদনশীলতার যে সবিশেষ বৃদ্ধি ঘটিবে উহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী নির্ভরযোগ্য ও সুনিশ্চিত উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে সক্ষম হইবে। সংক্ষেপে ইহাই কৃষির স্বল্প উৎপাদন ও পশ্চাদ্‌পদ অবস্থা দূরীকরণের জন্য কৃষির পুনর্গঠনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।

কৃষির উন্নয়নে রাষ্ট্রকর্তৃক গৃহীত নীতি ও ব্যবস্থাসমূহ

POLICIES & MEASURES ADOPTED BY THE STATE FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

আজ পর্যন্ত কৃষির উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রকর্তৃক গৃহীত নীতি ও ব্যবস্থাগুলিকে কালানুযায়ী দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা, স্বাধীনতার পূর্বযুগ ও স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ।

১ স্বাধীনতার পূর্বযুগ : ইংরেজশাসনের যুগে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কৃষির প্রতি তৎকালীন সরকারের নীতিকে এককথায় অবহেলার নীতি (drift and apathy) বলা যায়। সরকারের ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয় দর্শকের। বারংবার দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বিধ্বস্ত সে যুগের কৃষি ও কৃষকের খাজনামকুব, দুর্ভিক্ষ ত্রাণ, তাকাভি ঋণ প্রভৃতি কয়েকটি সাময়িক ব্যবস্থার অধিক কিছু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেন নাই। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এই নীতির আংশিক পরিবর্তন ঘটে। নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করিয়া সরকার আংশিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই নীতি ইংরেজশাসনের শেষকাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। কিন্তু এই নূতন নীতি কখনও কৃষির মূল সমস্যা সমাধানের সামগ্রিক চেষ্টার রূপ লয় নাই। তৎকালীন সরকারী ব্যবস্থা সর্বদাই কৃষির ৩ও সমস্যাগুলির সমাধানের পৃথক পৃথক প্রচেষ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯০৪ সালে সমবায় আইন পাস করিয়া সমবায় ঋণদান সমিতির গঠনে উৎসাহ দান করা হয়। ১৯০৫ সালে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কৃষিদপ্তর স্থাপিত হয়। ১৯০৬ সালে সর্বভারত কৃষি কৃত্যক (All-India Agricultural Service) প্রতিষ্ঠিত হয়। পুসায় একটি কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগার, কৃষি খামার ও কৃষিকলেজ স্থাপিত হয়। বিভিন্ন প্রদেশেও প্রাদেশিক কৃষি গবেষণাগার ও কৃষি খামার স্থাপিত হয়। ১৯১৯ সালে কৃষির উন্নয়নের ভার প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ন্যস্ত হইবার পর হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ শুধু প্রাদেশিক সরকারগুলির কৃষি সংক্রান্ত কার্যাবলীর তদারক ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার পর ১৯২৬ সালে কৃষি সম্পর্কে একটি রাজকীয় কমিশন বসে ও ১৯২৭ সালে উহা একটি বিশদ রিপোর্ট পেশ করে। কিন্তু ইহার অধিকাংশ সুপারিশসমূহ গৃহীত হইলেও কার্যকর হয় নাই। ইহার পর বিভিন্ন প্রদেশে কোথাও জমির সংবদ্ধকরণের (consolidation of land) জন্য আইন, কোথাও কৃষক-প্রজার স্বার্থে কিছু কিছু ভূমিস্বত্ব আইনের সংশোধন, আর কোথাও পুরাতন দেনার বোঝা হ্রাসের জন্য মহাজনী আইন প্রভৃতি পাস ও সংশোধিত হয়। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় উহার একটি কৃষি ঋণ বিভাগ খোলা হয়। ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ২য় মহাযুদ্ধের সময় খাদ্যসংকট দেখা দিলে সরকার 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলন আরম্ভ করে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইলেও, এই আন্দোলন প্রধানত বক্তৃতা ও কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ থাকায় বিশেষ ফলদান করে নাই।

২. স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ : স্বাধীনতার পরবর্তী যুগকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা প্রাক্‌-পরিকল্পনা যুগ ও পরিকল্পনার যুগ।

ক. প্রাক্‌-পরিকল্পনা যুগ : স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরবর্তী যুগে দেশবিভাগের ফলে খাদ্য ও কাঁচামালের ঘাটতি বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে সরকার অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন এবং খাদ্য ও কাঁচামাল আমদানি নীতি গ্রহণ করেন। অপরদিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সরকার স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ দানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৯ সালে সামগ্রিক ভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য সরকারী অভিযান আরম্ভ

। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হয়। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ শুরু হয়।

খ. পরিকল্পনার যুগ ঃ কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের প্রকৃত সরকারী প্রচেষ্টা এই সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। পরিকল্পনার যুগকে আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য আবার তিনভাগে ভাগ করিতে পারি। যথা, প্রথম পরিকল্পনা, দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও তৃতীয় পরিকল্পনাকাল।

প্রথম পরিকল্পনাকালে কৃষির অগ্রগতি
THE PROGRAMME AND PROGRESS OF AGRICULTURE IN THE FIRST PLAN

কার্যক্রম (Programme) : প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কারণ ইহা ছাড়া অধিকাংশ দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানের উন্নতি, খাদ্য ও কাঁচামালের ঘাটতি ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ দূর করা সম্ভব ছিল না। ইহাতে যে সকল প্রকল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল তাহা হইল সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা, মাঝারি ও বড় সেচকার্য, বন্যানিয়ন্ত্রণ, পতিত জমি উদ্ধার, উৎকৃষ্ট সার ও বীজ ব্যবহার, কৃষিতে আধুনিক পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির প্রচলন, সমবায় ভিত্তিতে কৃষিকার্যে উৎসাহ, গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, কৃষি পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি, গ্রামাঞ্চলে পরিবহণের উন্নতি এবং ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার। অর্থাৎ কৃষিকার্যের প্রযুক্তিবিদ্যাগত উন্নতি (technological improvement), নূতন প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সৃজন, ভূমিসংস্কার ও কৃষি সংগঠনের পুনর্গঠনমূলক এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা কৃষির সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য ও নীতি ছিল।

অগ্রগতি (Progress) : প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং মাঝারি ও বড় সেচকার্যের জন্য সরকারের মোট ৬০১ কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। ইহা প্রথম পরিকল্পনার মোট সরকারী খরচের (১৯৬০ কোটি টাকা) ৩১ শতাংশ। ইহার ফলে প্রথম পরিকল্পনার শেষে কৃষির মোট উৎপাদন বা কৃষিজাত আয় ১৭ শতাংশ ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১ কোটি ১০ লক্ষ টন ও একর প্রতি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। (যেমন চাউলের একর প্রতি উৎপাদন ৬৯৪ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ৭২৭ পাউণ্ড হয়।) ইহা ছাড়া তুলা ও পাটের ন্যায় বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদনও বাড়ে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষির কার্যক্রম ও অগ্রগতি
THE PROGRAMME & PROGRESS OF AGRICULTURE IN THE SECOND PLAN

কার্যক্রম (Programme) : দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হইলেও কৃষির উন্নয়নকে অবহেলা করা হয় নাই। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্ম আরও প্রসারিত করা হয়। বড় বড় সেচ প্রকল্পগুলির আরব্ধ কর্ম সমাধা ও ছোট এবং মাঝারি সেচকার্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহার সহিত কৃষিকার্যে, কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়ে ও কৃষিনির্ভর শিল্প প্রসারে (agro-industry) সমবায়ক্ষেত্র (co-operative sector) গঠন ও প্রসারিত করার নীতি গৃহীত হয়। মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বিলোপ সাধিত হয় এবং জোত-জমির সর্বোচ্চ সীমা (ceiling on land holdings) নির্দিষ্ট করিবার নীতি গ্রহণ করা ও সমবায় কৃষিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। ইহার সহিত গ্রাম্য ঋণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ও পরিবহণের প্রসার চলিতে থাকে।

অগ্রগতি (Progress) : দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও সেচকার্যের জন্য মোট ৯৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ইহা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী মোট ব্যয়ের (৪৬০০ কোটি টাকা) ২০ শতাংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ১৬ শতাংশ, খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৫ শতাংশ, ও একর প্রতি উৎপাদনশীলতা আরও বৃদ্ধি পায় (যেমন চাউলের একর প্রতি গড় উৎপাদন ৮০১ পাউণ্ড হয়)। তবে, সামগ্রিকভাবে কৃষির অগ্রগতি এই সময়ে সন্তোষজনক হয় নাই। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই। এবং এই সময় হইতেই পুনরায় খাদ্যসমস্যা দেখা দেয়। সমবায় খামারের অগ্রগতিও সন্তোষজনক হয় নাই। ভূমিসংস্কার কার্যও বাস্তবে পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই।

পরিকল্পনার এক দশকে কৃষির অগ্রগতি
AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN A DECADE OF PLANNING

সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে (১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৬০-৬১ সাল), কৃষির মোট উৎপাদন বা কৃষিজাত আয় ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়াছে ৪৬ শতাংশ। নাইট্রোজেন জাতীয় সারের ব্যবহার বাড়িয়াছে ৩১৮ শতাংশ। সেচের অধীনে নীট জমির পরিমাণ বাড়িয়াছে ৩৬ শতাংশ। সমবায় মাধ্যমে কৃষিঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে ৭৭৩ শতাংশ। প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহা ভারতের কৃষিক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচায়ক। কৃষিক্ষেত্রের সম্প্রসারণের দ্বারা কৃষির স্বল্পোন্নতির পাপচক্র ভাঙিয়া যাইতেছে। স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হইতেছে।

কৃষি অর্থনীতির বিকাশের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হিসাবে, সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের অঙ্গ হিসাবে সারা দেশব্যাপী সম্প্রসারণ সেবাকর্মের বিস্তৃতির কথা স্মরণযোগ্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতের ৩ লক্ষ ৭০ হাজার গ্রামে দেশের গ্রামীণ জনসাধারণের অর্ধেক সমষ্টি উন্নয়ন কার্যের ফলভোগ করিয়াছে। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যের মূল দায়িত্ব আজ ক্রমেই অধিক পরিমাণে গ্রাম পঞ্চায়েত ও গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলির উপর ন্যস্ত হইতেছে। সমবায় কৃষির গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা চলিতেছে এবং একার্যে সহায়তার জন্য জাতীয় সমবায় কৃষি পরামর্শদাতা পরিষদ (National Cooperative Farming Advisory Board) স্থাপিত হইয়াছে। নূতন সচল গ্রামীণ সমাজের কাঠামো রচিত হইতেছে।

তৃতীয় পরিকল্পনা ও কৃষির উন্নয়ন
THIRD PLAN AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তনকাল হইতেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্বের কথা পরিকল্পনা কমিশন উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এজন্যই প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার শেষে কৃষির সন্তোষজনক অগ্রগতি দেখা গেলে ও উহার ফলে খাদ্যসমস্যা একরূপ দূর হইলে, পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনায় শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দিয়া কৃষির উন্নয়নকে দ্বিতীয় স্থান দেন। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থা প্রমাণ করিয়া দেয় যে কৃষির উন্নতি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে অবিলম্বে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উৎপাদন লক্ষ্য রদবদল করা হয়। কিন্তু তাহাতেও শেষ রক্ষা হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতে এই অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে যে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি শেষ পর্যন্ত কৃষির উন্নয়ন হারের উপর বিশেষভাবেই নির্ভরশীল। এই শিক্ষা লাভ

করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নকে পুনরায় অগ্রাধিকার দিয়া শিল্পোন্নতির সমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভুলের এইভাবে সংশোধন করা হইয়াছে।

কার্যক্রম (Programme) : তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় হইবে মোট সরকারী ব্যয়ের ২৩ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা তুলনায় ২য় পরিকল্পনার কৃষিব প্রকৃত ব্যয়ের প্রায় দ্বিগুণ এবং প্রথম পরিকল্পনার মোট সরকারী ব্যয়ের প্রায় নিকটবর্তী। এই বিপুল ব্যয়ের দ্বারা কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় দ্বিগুণ করা হইবে। ইহাতে আগামী পাঁচ বৎসরে খাদ্যের উৎপাদন ৩০ শতাংশ ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন ৩১ শতাংশ ও যাবতীয় ফসলের মোট উৎপাদন ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। নিম্নলিখিত ছয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা এই লক্ষ্য সাধিত হইবে।

১ বড়, মাঝারি ও ছোট সকল প্রকার সেচকার্যের সমন্বয়ে এক ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা অতিরিক্ত ২ কোটি একর জমিতে সেচ প্রবর্তিত হইবে। ২. ২ কোটি ২০ লক্ষ একরে শুষ্ক কৃষি (dry farming) ও ১ কোটি ১০ লক্ষ একরে ভূমি সংরক্ষণ কার্য প্রবর্তিত হইবে। ৩ নাইট্রোজেন জাতীয় সারের ব্যবহার প্রায় ৫ গুণ ও ফসফেট জাতীয় সারের ব্যবহার ৬ গুণ বাড়ানো হইবে। ৪. উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রবর্তন করিয়া গ্রামাঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রচলনের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হইবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, কারিগরী পরামর্শদান ও যন্ত্রপাতি নির্মাণে সহায়তার জন্য একটি করিয়া দপ্তর খোলা হইবে। ৫. ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে ভারতের প্রত্যেকটি গ্রামে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্য বিস্তৃত হইবে। প্রত্যেকটি গ্রামে পঞ্চায়েত ও সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেবা-ভিত্তিক সমবায়গুলির (service cooperatives) সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ হইবে। ৫৩০ কোটি টাকার স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদের ঋণ ও ১৫০ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করা হইবে। কৃষিজাত পণ্যের বাজারগুলিতে ৯৮০টি বড় গুদাম নির্মিত হইবে। ইহা ছাড়া সমবায় ভিত্তিতে গ্রামাঞ্চলে আরও ৯২০০টি ক্ষুদ্রাকার গুদাম নির্মিত হইবে। সারা দেশে পরীক্ষামূলকভাবে ৩২০০ সমবায় খামার প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৬. যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ঘটে ও উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা আছে এরূপ কয়েকটি জেলা বাছাই করিয়া তথায় কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রগাঢ় কৃষিব (intensive cultivation) প্রবর্তন করা হইবে। ইতিমধ্যেই প্রত্যেক রাজ্যে এজন্য একটি করিয়া জেলা বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।

এই সকল বিবিধ ব্যবস্থা সার্থকরূপে কার্যকর হইলে আশা করা যায় যে খাদ্যের উৎপাদন বর্তমানের ৭ কোটি টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১০ কোটি টনে পরিণত হইবে। তৈলবীজের উৎপাদন ৩৮ শতাংশ বাড়িবে (৭০ লক্ষ টন হইতে ৯৮ লক্ষ টন)। ইক্ষুর উৎপাদন ২৫ শতাংশ বাড়িবে (৮০ লক্ষ টন হইতে ১ কোটি টন)। তুলার উৎপাদন ৩৭ শতাংশ বাড়িবে (৫১ লক্ষ গাঁইট হইতে ৭০ লক্ষ গাঁইট)। পাটের উৎপাদন ৫৫ শতাংশ বাড়িবে (৪০ লক্ষ গাঁইট হইতে ৬২ লক্ষ গাঁইট হইবে)। সর্বোপরি জমির ফলন একর প্রতি ৮০৭ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ১০৩০ পাউণ্ড হইবে।

এই সকল লক্ষ্য পূর্ণ হইলে, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশবাসিগণ মাথাপিছু ভোগের জন্য বর্তমানে প্রতিদিন ১৬ আউন্স খাদ্যের পরিবর্তে ১৭.৫ আউন্স খাদ্য পাইবে। কাপড়ের ব্যবহার মাথাপিছু ১৫.৫ গজ হইতে বাড়িয়া ১৭.২ গজ হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির অগ্রগতি (Progress) : তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির ফলাফল এপর্যন্ত সকলকে অত্যন্ত নিরাশ করিয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে

মোট উৎপাদন বৃদ্ধির পরিবর্তে বরং সামান্য কমিয়াছে। ইহার জন্য প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থাকে অংশত দায়ী করা হইয়াছে। ১৯৬১-৬২ সালে কৃষির ফল ১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬২-৬৩ সালে ৩ শতাংশ কমিয়া যায়। চাউলের উৎপাদন ৮ শতাংশ, গমের উৎপাদন ৭·৫ শতাংশ ও চিনির উৎপাদন ২০ শতাংশ কমিয়া যায়। অথচ তৃতীয় পরিকল্পনার বাৎসরিক কৃষির ফলন বৃদ্ধির হার নির্ধারিত হইয়াছিল ৬ শতাংশ। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে নির্ধারিত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য পূর্ণ হইবে কিনা সে সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়াছে। ইহার জন্য প্রধানত দায়ী—কৃষির বিবিধ উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে অগ্রাধিকার সংক্রান্ত বিভ্রান্তি, প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক অব্যবস্থা (bottlenecks), বিভিন্ন স্তরে কার্যক্রমগুলি সম্পাদনের সুস্পষ্ট দায়িত্ব নির্দেশের অভাব, গ্রামীণ উন্নয়নের বিবিধ দপ্তরগুলির মধ্যে যথাযোগ্য সংযোগ সাধনের অভাব প্রভৃতি পুরাতন ভুল ত্রুটিগুলির পুনরাবৃত্তি। দুঃখের বিষয় যে পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উহার কার্যক্রম (Plans and Programmes) এবং ঐগুলি সম্পাদনের (performance) মধ্যে এই ব্যবধান এখনও পর্যন্ত দূর করিয়া উঠা সম্ভব হইতেছে না, অথচ ইহাই বর্তমানে পরিকল্পনার সাফল্যের পক্ষে অপরিহার্য।

২

কৃষি সংস্কার
Agrarion Reform

ভূমিকা ঃ কৃষি সংস্কার বলিতে তুইটি বিষয় বুঝায়। একটি হইতেছে ভূমির ভোগদখল বা অধিকাবের শর্তাবলীর (Land Tenure) সংস্কাব। অপরটি হইল প্রজাস্বত্ব (Tenancy) সম্পর্কে শর্তাবলীর সংস্কাব। প্রথমটির দ্বারা জমিব মালিকানা ও ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধকদানের অধিকাব নিয়ন্ত্রিত হয। দ্বিতীয়টির দ্বারা কৃষকগণ যে জমি চাষ করে উহার উপর এবং উহার উৎপন্নের অংশের উপর তাহাদের অধিকার সাব্যস্ত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভূমি-ব্যবস্থার গুরুত্ব ঃ ভূমির ভোগ-দখলের শর্তবলী ও প্রজাস্বত্বের শর্তাবলী, অর্থাৎ এককথায় ভূমি-ব্যবস্থা, দেশের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণজীবন তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক ও সমাজজীবনের উপব প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। জাতিসংঘের ভূমিসংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, দেশেব কৃষিজমিব ভোগদখল সম্বন্ধীয় রীতিনীতি ও প্রথা এবং আইন কৃষকের উপর অতিরিক্ত রাজস্বের বোঝা আবোপ করিয়া তাহার জীবনযাত্রার মানকে অবনত কবিতে পারে। তাহার উদ্যম বিনষ্ট করিতে পাবে, উন্নতির পথ রোধ করিতে পারে এবং জমির মালিকানাব নিরাপত্তার অভাবে তাহাকে জমিতে পুঁজি বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করিতে পারে। এজন্য কোন দেশের কৃষি কাঠামোর গঠনের আলোচনায় ভূমি-ব্যবস্থার প্রসঙ্গ অপরিহার্য।

ভারতের পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থাসমূহ
OLD SYSTEMS OF LAND TENURE IN INDIA

ভারতে সুদূর অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত রাজশক্তি ভূমিতে কৃষকের মালিকানা স্বীকার করিযা লইয়াছিল। শুধু উৎপন্নের একাংশ রাজশক্তির প্রাপ্য রাজস্ব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল।

কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে ভারতের ভূমি-ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। ইংরেজগণ যে নূতন ভূমি বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিল তাহাতে তাহারা ধরিয়া লইল যে রাজশক্তিই (অর্থাৎ ইংরেজ সরকার) দেশের সমগ্র-ভূমির প্রকৃত সর্বোচ্চ মালিক। তাহারা কৃষি জোতের গুণাগুণ বিচার না করিয়া, অজন্মা বা চাষের লাভ ক্ষতি বিচার না করিয়া সকল জমি নির্বিশেষে খাজনার পরিমাণ ধার্য করিয়া নগদ টাকায় উহা প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন করিল। ইহার পশ্চাতে তাহাদের প্রধান অর্থনীতিক উদ্দেশ্য ছিল ভূমি হইতে সর্বাধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা। আর রাজনীতিক উদ্দেশ্য ছিল দেশের মধ্যে নিজেদের শাসনের সমর্থক একদল নূতন সামন্তশ্রেণী সৃষ্টি করা। ইংরেজশাসনে চারিপ্রকারের ভূমি-বন্দোবস্ত প্রচলিত হইয়াছিল।

১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী প্রথা
PERMANENT SETTLEMENT

বঙ্গ, বিহার, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় ইহা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাবে দেশের ২৫ শতাংশ ভাগে ইহা প্রচলিত ছিল। ইহা ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক ইংলণ্ডের অনুকরণে এদেশে প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা আদায় করিয়া রাজসরকারে জমা দিবে এই শর্তে জমিদারগণকে ইংরেজসরকার হইতে জমির মালিকানা প্রদান করা হইল। ফলে কৃষকগণ জমির এতদিনের মালিকানা হইতে

বিচ্যুত হইয়া, কৃষক প্রজায়, রায়তে পরিণত হইল। এইরূপে রাষ্ট্র ও কৃষক এই দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী এক তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব ঘটিল। ইহার উপর আবার আয়েশী জমিদারগণ খাজনা আদায়ের অধিকার তালুকদার ও অন্যান্য উপস্বত্বভোগীর হস্তে অর্পণ করিল। এইরূপে সরকার ও চাষীর মধ্যে মধ্য ও উপস্বত্বভোগী-রূপ পরগাছা শ্রেণী সৃষ্টি হইয়া, কৃষির উদ্বৃত্ত সম্পদ শোষণ করিতে লাগিল। কৃষকের জীবনে চিরন্তন শোষণের, দারিদ্র্যের ও বঞ্চনার অভিশাপ নামিয়া আসিল।

অর্থনৈতিক ফলাফল (economic effects) : **সুফল :** ইহার সমর্থকগণের মতে, ক. ইহার দ্বারা সরকারের রাজস্ব সুনির্দিষ্ট ও আদায় সুনিশ্চিত করা হইয়াছিল। খ. রাজনৈতিকভাবে সরকারের অনুগত ও সমর্থক এক বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়ায় দেশে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব আসিয়াছিল। গ. সামাজিকভাবে জমিদারগণ দেশের তৎকালীন সমাজের মুখপাত্র হিসাবে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করিয়াছে। দেশে সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার এবং জনকল্যাণমূলক কর্মে ইহারা অগ্রগণ্য ছিল। ঘ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা কৃষির সমৃদ্ধিতে সাহায্য ও দৈবদুর্বিপাকের হাত হইতে কৃষকগণকে রক্ষা করিয়াছে। ঙ. ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষত যে সকল অস্থায়ী বন্দোবস্তে ঘন ঘন রাজস্বের পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং তজ্জন্য সে সকল অঞ্চলের কৃষকগণ যেরূপ তাহাতে দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, সে দুর্ভাগ্য হইতে ইহা কৃষকসমাজকে রক্ষা করিয়াছে।

কুফল : কিন্তু এই সকল তথাকথিত সুবিধার তুলনায় যে জমিদারী প্রথার কুফল অধিক মারাত্মক ফলদায়ী হইয়াছিল, ইহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে সহজেই তাহা বুঝা যায়। এবং সেজন্যই ইহার অবসান ঘটে। ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিত অবিভক্ত বাংলার ভূমিরাজস্ব কমিশনের মতে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার নিম্নলিখিত কুফল দেখা দিয়াছিল।

ক. ভূমিরাজস্বের পরিমাণ সরকার চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া, পরবর্তীকালে খাজনা বৃদ্ধির সমস্তটুকু জমিদারগণকে অর্পণ করিয়া নিজে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। জমিদারগণ চাষীর খাজনা নানাভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে কিন্তু তাহা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করে নাই। খ. কৃষির যতটুকু সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার সবটুকুই জমিদারগণ নিজেরা শোষণ করিয়া সমগ্র সমাজকে বঞ্চিত করিয়াছে। জমিদারগণের সমৃদ্ধি দেশের সমৃদ্ধি ঘটায় নাই। গ. দেশের খনিজ ও জলসম্পদ যথাযথব্যবহারে সরকার ও অপরাপরদের বাধা দিয়াছে। ঘ. সরকার ও কৃষকের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করিয়া কৃষকদের ও কৃষির প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহে সরকারের অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার দ্বারা কৃষকগণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বনে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। ঙ. উত্তরোত্তর খাজনা ও অবৈধ আদায় বৃদ্ধি করিয়া, বেগার খাটাইয়া কৃষকগণকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে। খেয়ালখুশিমত কৃষকগণকে জমি হইতে উচ্ছেদ করিয়াছে। চ. কৃষকগণের উপরে অসংখ্য মধ্য ও উপস্বত্বভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া ভূমিব্যবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। ছ. জমিদারী কাছারিতে ইচ্ছামত কৃষকগণের স্বত্বস্বামিত্বের দলিল ও নথিপত্রের পরিবর্তন করিয়া অসংখ্য কৃষকের প্রতিকারহীন সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। জ. কৃষির সারবস্তুটুকু নিজেরা গ্রহণ করিয়াছে অথচ কৃষির উন্নতির জন্য কোন যত্ন লয় নাই। ঝ. কৃষকগণের দেয় খাজনা নির্ধারণে কোন যুক্তি বা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে নাই।

এককথায় কমিশনের মতে, জমিদারগণ কৃষির উন্নতির সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে। এজন্য তাহারা ইহার অবসানের সুপারিশ করিয়াছিলেন। ভারত স্বাধীনতালাভের পর, প্রথম পরিকল্পনাকালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আইন পাস হয় এবং উহার দ্বারা এই অভিশপ্ত ব্যবস্থার অবসান ঘটে। কিন্তু জমিদারী প্রথা থাকাকালীনও, কৃষকগণের স্বার্থরক্ষার্থে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশে প্রজাস্বত্ব আইন পাস করিতে হয়।

২. মহালওয়ারী বন্দোবস্ত
MAHALWARI SYSTEM

মধ্যপ্রদেশ ও পঞ্জাবে এই প্রথা প্রচলিত হয়। ইহা একপ্রকারের যুক্ত-গ্রাম-রায়তী প্রথা (joint village tenure)। ইহাতে গ্রাম্য জনসমাজকে (village communities) গ্রামের সমুদয় জমির যুক্ত মালিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। এবং উহার অধিবাসীদিগকে যুক্ত অথবা পৃথকভাবে খাজনা প্রদানের জন্য দায়ী করা হয়। সাধারণত এই ব্যবস্থায় একশ্রেণীর অধীনস্থ রায়তগণ চাষ করিয়া থাকে। তবে পঞ্জাবে জমির মালিকগণ নিজেরাই চাষ করে।

অর্থনৈতিক ফলাফল (economic effects) : ক. ইহাতে যৌথভিত্তিতে চাষের সুযোগ আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। ফলে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে চাষের দরুণ জোতের আয়তন

ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হইয়াছে। খ. অধিকাংশ অঞ্চলেই মালিকগণ নিজেরা না চষিয়া, প্রজা বসাইয়া চাষ করায়। তাহাতে এই ব্যবস্থায়ও কৃষকপ্রজার সমস্যা দেখা দিয়াছে

৩. অস্থায়ী বন্দোবস্ত
TEMPORARY SETTLEMENT

আগ্রার জমিদারী প্রথা, অযোধ্যার তালুকদারী প্রথা ও মধ্যপ্রদেশের মালগুজারী প্রথা ইহার অন্তর্গত। অন্যত্র চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথায় কৃষকদের ক্ষতি লক্ষ্য করিয়া আগ্রা ও অযোধ্যায় অস্থায়ী ভিত্তিতে জমিদারী ও তালুকদারী প্রথা প্রবর্তিত হয়। ইহাতে কৃষকগণের স্বার্থরক্ষার প্রতি অধিকতর যত্ন লওয়া হইয়াছিল।

অর্থনৈতিক ফলাফল (**economic effects**): কিন্তু তাহাতেও অযোধ্যার তালুকদারগণ কর্তৃক কৃষক উচ্ছেদ, খাজনা বৃদ্ধি প্রভৃতি কুফল বন্ধ করা যায় নাই। আগ্রার জমিদারী প্রথাতে কৃষকগণের উপর খাজনার চাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মালগুজারী প্রথাতে মধ্যপ্রদেশে পুরাতন মারাঠা শাসনকালে নিযুক্ত খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের (মালগুজার নামে পরিচিত) ইংরেজ সরকার ভূমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। ইহাতে কৃষকগণের জমির অধিকার বিনষ্ট হয়। তবে মালগুজারদের অধীনস্থ কৃষক-প্রজাগণের অন্যান্য স্বত্ব রক্ষার প্রতি যত্ন লওয়া হইয়াছিল।

৪. রায়তওয়ারী ব্যবস্থা
RAYATWARI SETTLEMENT

ইহাতে সরাসরি ভাবে কৃষকগণকে সরকার হইতে ভূমি-বন্দোবস্ত দেওয়া হইল এবং কৃষকগণ তাহাদের নিজ নিজ জমির খাজনার জন্য সরকারের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হইল। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও আসামে ইহা প্রচলিত হয়। ইহাতে জমির মালিকানা সরকারের বজায় থাকিল কিন্তু চাষিগণ খাজনা প্রদানের শর্তে জমি ভোগদখলের অধিকার পাইল।

অর্থনৈতিক ফলাফল (**economic effects**): কিছুদিন পর পর নূতন করিয়া জরীপ করিবার সময় খাজনার হার বৃদ্ধি করার দরুন কৃষকগণ অত্যধিক খাজনার ভারে উৎপীড়িত হইয়াছে।

সরকারের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া কৃষকগণ তাহাতে প্রজা বসাইয়া চাষ করিয়াছে। ফলে ইহাতে মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সরাসরি সরকারের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ করিবার সুযোগ থাকায় উদ্যমশীল কৃষকগণ ইহাতে উপকৃত হইয়াছে।

মন্তব্য: ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতে যে ভূমি-ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিল তাহার প্রকৃতি বিচার করিলে দেখা যায়—

১. দেশের সর্বত্র একরূপ ভূমি-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় নাই। একই অঞ্চল, প্রদেশ এমন কি জেলাতেও বিভিন্ন প্রকারের ভূমি বন্দোবস্ত প্রচলিত হওয়ায় অত্যন্ত জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছিল।

২. দেশের শতকরা ৪০ ভাগেরও অধিক অঞ্চলে, প্রকৃত কৃষকগণের উপরে নানারূপ জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারা পরগাছা হিসাবে কৃষকের আয়ে ভাগ বসাইয়া কৃষি অর্থনীতির প্রাণরসকে প্রবলভাবে শোষণ করিত। নানারূপ কর, খাজনা, আবওয়াব নজরানা ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারের দেয়র (dues) ভারে প্রপীড়িত কৃষকগণকে কায়ক্লেশে দিনযাপন করিতে হইত।

৩. কৃষকের স্বত্বামিত্বের নিরাপত্তা ছিল না। বিশেষত জমিদারী প্রথার অন্তর্গত এলাকাতে যখন তখন খেয়ালখুশিমত কৃষকপ্রজাদের জমি হইতে উচ্ছেদ ঘটিত।

৪. কৃষকগণের উপর ধার্য খাজনাও অত্যধিক ছিল। খাজনা ধার্য করিবার কোন সুচিন্তিত যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিছু ছিল না। ফলে কৃষিকার্যের লাভ-ক্ষতি বিচার করিয়া খাজনা ধার্য হইত না।

৫. ইহা ছাড়া ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যগুলিতে কৃষকের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়। ঐ সকল অঞ্চলে কৃষকগণ প্রকৃতপক্ষে ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, জটিলতাপূর্ণ ভূমি-ব্যবস্থা, অত্যধিক খাজনার হার, নিরাপত্তার অভাব, মধ্যস্বত্ব ও উপস্বত্ব-ভোগীদের শোষণ ও ভূমিদাসত্ব—এই সকল অবস্থা মিলিয়া কৃষিকার্যে কৃষকের সমস্ত আগ্রহ, প্রেরণা, উৎসাহ ও উদ্যম বিনষ্ট করিয়া ভারতের কৃষকগণকে দারিদ্র্য, হতাশা, নিপীড়ন ও বুভুক্ষায় জীবনে যেন চিরতরে নির্বাসন দিয়াছিল। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার এই স্বাভাবিক ফল, সুস্পষ্টই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবল অন্তরায়।

কৃষি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা
THE NEED FOR AGRARIAN REFORM

সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থা পৃথিবীর সর্বদেশেই কৃষককে এক শোষণমূলক, নিরাপত্তাহীন, প্রতিকারহীন অন্যায় উৎপীড়নের জীবন যাপনে বাধ্য করে বলিয়া, ইহা কখনও কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন মিটাইতে পারে না। শিল্পোন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় কৃষিজাত উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে পারে না। এজন্য পাশ্চাত্যেও আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বশর্ত হিসাবে ভূমি-সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভারতেও এই পুরাতন অকার্যকর ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থনীতিক অগ্রগতির পথরোধ করিয়া রহিয়াছে। এজন্য বহুদিন হইতেই ইহার সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়েছিল। অবশেষে বিদেশী শাসনের অবসানে ইহার শেষ বাধা অপসারিত হওয়ায়, ভূমি সংস্কার দেশের কৃষির উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে গৃহীত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এজন্য সুস্পষ্ট ভূমি সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা হয়।

ভারত যে পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের পথ গ্রহণ করিতেছে, তাহাতে উৎপাদন সবিশেষ বৃদ্ধি, কৃষির বৈচিত্র্যসাধন ও একটি প্রগতিশীল কৃষি কাঠামো গঠনের জন্য ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য।

ভারত সরকারের ভূমিসংস্কার নীতির লক্ষ্য (Objectives of the Land Reform Policy of the Government): পরিকল্পনা কমিশন ভূমিসংস্কারের দুইটি লক্ষ্য নির্দেশ করিয়াছেন—

১. কৃষির উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা উল্লেখনীয়রূপে বৃদ্ধি।

২. কৃষিব্যবস্থায় সকলপ্রকার শোষণ ও সামাজিক অন্যায়ের অবসান। কৃষকের নিরাপত্তা বিধান। গ্রামীণ জনসাধারণের সকল অংশের মধ্যে পদমর্যাদার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা (Measures adopted by the Government): পরিকল্পনাকমিশন ভূমিসংস্কার নীতি কার্যকর করিবার জন্য নিম্নলিখিত তিনটি মুখ্য ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন:

১. **মধ্যস্বত্বভোগী,** অর্থাৎ খাজনাভোগী **শ্রেণীর বিলোপ।**

২. **প্রজাস্বত্বের সংস্কার সাধন।** প্রজাস্বত্বের সংস্কার সাধনের জন্য আবার নিম্নলিখিত তিনটি ব্যবস্থা গ্রহণীয়। ক. খাজনা নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস। খ. প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা। গ. কৃষক-প্রজার উপর জমির মালিকানা আরোপ।

৩. **জোতজমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ।**

জমিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর বিলোপ ও কৃষকপ্রজার স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষার দ্বারা কৃষিব্যবস্থায় কৃষকের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। খাজনা নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের দ্বারা এবং পুরাতন অন্যান্য অন্যায়মূলক আদায়ের অবসানের দ্বারা কৃষিকর্মে কৃষক প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও প্রণোদনা (incentive) লাভ করিবে। মধ্যস্বত্ব-ভোগিগণের অবসানে কৃষকপ্রজাগণের উপর জমির মালিকানা স্বত্ব আরোপ করিয়া রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হইলে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি দৃঢ় হইবে। ভারতে জমির মালিকানায় প্রচণ্ড বৈষম্য রহিয়াছে। প্রগতিশীল গ্রাম্য অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে জমির বণ্টনে, অর্থাৎ মালিকানায় বৈষম্য দূর করিতে হইবে। ইহার জন্য জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমানির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহাতে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাইবে তাহা ভূমিহীন কৃষক এবং স্বল্পজমির কৃষক-মালিকগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া

জোতের আয়তন বৃহত্তর করা প্রয়োজন। ইহাতে গ্রাম্য জনসমাজের সর্বাপেক্ষা অবনত অংশের মধ্যে সামাজিক পদমর্যাদা বাড়িবে ও তাহারা অধিকতর সুযোগ লাভ করিবে। সমবায়-মূলক গ্রামীণ অর্থনীতিক কাঠামো গঠন করিতে হইবে। এই কাঠামোর ভিত্তি হইবে জমিতে কৃষকের মালিকানা কিন্তু রূপ হইবে সমবায়। ভারতের ভূমিসংস্কার নীতির ইহাই মূল কথা।

ভূমিসংস্কার কার্যের অগ্রগতি

PROGRESS OF LAND REFORM

১. **মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর বিলোপ সাধন** (**Abolition of Intermediaries**): কোন কোন রাজ্যে ১৯৫১ সালের পূর্বেই জমিদারী প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর বিলোপের ও সরকার কর্তৃক উহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলের আইন পাস হইলেও অধিকাংশ রাজ্যেই প্রথম পরিকল্পনাকালে ইহাতে হাত দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল শেষ হওয়ার বহু পূর্বেই মধ্যস্বত্বভোগীশ্রেণীর একরূপ পূর্ণ বিলোপ ঘটে। ইহা দ্বারা রাষ্ট্রের সহিত ২ কোটি কৃষকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহাদের সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, জমিদার প্রভৃতিগণের বিরাট পরিমাণ পতিত জমি ও বেসরকারী বনভূমি রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার অধীনে আসিয়াছে। পতিত জমি পুনরুদ্ধারের সুবিধা হইয়াছে এবং বনভূমির উন্নয়নের সুযোগ বাড়িয়াছে। সংক্ষেপে, জমিদারী প্রথার বিলোপে দেশ এই সকল প্রত্যক্ষ সুবিধা লাভ করিয়াছে।

কিন্তু ইহাতে সরকারের উপর প্রচণ্ড প্রশাসনিক ও আর্থিক চাপ পড়িয়াছে। জমির রেকর্ড প্রস্তুত ও খাজনা আদায়ের জন্য ভূমিরাজস্ব দপ্তরের উপযুক্ত সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। অন্যদিকে ক্ষতিপূরণ ও উহার সুদ হিসাবে ৬৭০ কোটি টাকা (৫২০ কোটি+১৫০ কোটি) মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রাপ্য শোধ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে ২৩০ কোটি টাকা প্রদান করা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই সরকারী বণ্ড দ্বারা দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদ আইনের বৈশিষ্ট্য (Main features of the Estate Acquisition Act of West Bengal): পশ্চিমবঙ্গে যে জমিদারী উচ্ছেদ আইন প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা শহর, চা বাগিচা ও মেছোঘেরীগুলি এই আইনের এক্তিয়ার হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ক্রমহ্রসমান হারে (অর্থাৎ যে জমিদারীর আয় যত বেশী পর্যায়ক্রমে উহার ক্ষতিপূরণ হার তত কম) ক্ষতিপূরণ দিয়া জমিদারীগুলি সরকার কিনিয়া লইবেন। তৃতীয়ত, প্রথম ৫০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ নগদে ও বকেয়া ক্ষতিপূরণ অংশত নগদে ও অংশত ২০টি বাৎসরিক সমান কিস্তিতে পরিশোধ্য, ২০ বৎসরের মেয়াদী ঋণপত্র দ্বারা দেওয়া হইবে। চতুর্থত, জমিদারগণ সর্বাধিক ২০ একর কৃষিজমি ও ২৫ একর অকৃষিজমি নিজ ভোগদখলের জন্য রাখিতে পারিবেন। পঞ্চমত, সরকার কর্তৃক জমিদারী দখলের পরে কৃষকগণ সরাসরি সরকারের নিকট খাজনা জমা দিবে। ও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারে জমা দিলে কৃষক নিজেই জমির মালিকানা লাভ করিতে পারিবেন।

২. **প্রজাস্বত্বের সংস্কার সাধন** (**Reform of the tenancy system**): মধ্যস্বত্ব ভোগিগণের উচ্ছেদের পরেও এখন পর্যন্ত বহুজমি কৃষকপ্রজা, উপ-কৃষকপ্রজা এবং ভাগচাষী দ্বারা চাষ করান হইতেছে। গ্রামীণ পরিবারগুলির মালিকানাধীন জমির প্রায় এক-চতুর্থাংশ এখন পর্যন্ত রায়তী বন্দোবস্ত দ্বারা তাহাদের আয়ত্তাধীন রহিয়াছে। এই প্রকার কৃষকপ্রজাগণের প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা, খাজনা হ্রাস ও এই সকল জমির উপর কৃষকপ্রজাগণের মালিকানাস্বত্বের প্রবর্তনই বর্তমান প্রজাস্বত্ব আইনের উদ্দেশ্য।

ক. খাজনা হ্রাস : বার বৎসর আগে পর্যন্ত ভারতে কৃষকপ্রজার নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক বা তাহারও বেশী খাজনা হিসাবে আদায় করা হইত। ইহা ছাড়া অন্যান্য দেয় তো ছিলই। প্রথম পরিকল্পনায় বিশেষ কারণ ব্যতীত উৎপন্ন ফসলের এক-পঞ্চমাংশ বা এক-চতুর্থাংশের বেশী খাজনা হিসাবে ধার্য করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিভিন্ন রাজ্যে এজন্য জমির মালিকচাষীর প্রাপ্য খাজনার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের জন্য আইন পাস করা হইয়াছে। তবে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে খাজনা হ্রাস করা হইলেও অন্ধ্র, মাদ্রাজ ও পঞ্জাবে এবং পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষিগণের ক্ষেত্রে খাজনা এখন পর্যন্ত বেশী, উহা ফসলের এক-তৃতীয়াংশ হইতে অর্ধাংশের মধ্যে রহিয়াছে।

খ. প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা : অন্ধ্র, বিহার, মাদ্রাজে এবং পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষিগণের ক্ষেত্রে ব্যতীত ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তার জন্য আইন পাস করা হইয়াছে। অবশ্য এই সকল রাজ্যেও সাময়িক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। মহীশূর ও উড়িষ্যায় আইন পাস হইয়াছে কিন্তু প্রয়োগ করা হয় নাই। কৃষকপ্রজার স্বত্বস্বামিত্বের নিরাপত্তার জন্য আইনের তিনটি লক্ষ্য। প্রথমত, জমি হইতে বেআইনি উচ্ছেদ বন্ধ করা। দ্বিতীয়ত, জমির মালিক চাষী যদি নিজে চাষ করিতে চায় শুধু তবেই তাহার নিকট জমির স্বত্ব প্রত্যর্পণ করা। তৃতীয়ত, এরূপ ক্ষেত্রে কৃষকপ্রজাকে এক ন্যূনতম পরিমাণ জমি রাখিবার নিশ্চয়তা দান করা। এই ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, প্রজাস্বত্ব আইন পাস করিবার পূর্বেই অনেক জমি হইতে অনেক কৃষকপ্রজার উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। তাহা ছাড়া নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে চাষ করিবে এই অজুহাতেও মালিকগণ অনেক জমির দখল লইয়াছে ও লইতেছে। ফলে আইনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইতেছে না।

গ. কৃষকপ্রজার উপর জমির মালিকানা আরোপ : কতকগুলি রাজ্যে কৃষকপ্রজার উপর জমির মালিকানাস্বত্ব অর্পণের জন্য আইন পাস হইয়াছে। অন্ধ্র, আসাম, বিহার, জম্মু ও কাশ্মীর এবং মাদ্রাজে এখনও এরূপ আইন পাস করা হয় নাই। পঞ্জাবে ইহা ঐচ্ছিক করা হইয়াছে এবং অন্তত ছয় বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে যে সকল কৃষকপ্রজা জমি ভোগ দখল করিতেছে শুধু তাহারাই ইচ্ছা করিলে মালিকানা স্বত্বের জন্য আবেদন করিতে পারে। পশ্চিম বঙ্গে উপ-প্রজা বা কোর্ফাপ্রজাগণকে এই সুবিধা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু বর্গাদারগণকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। যে সকল রাজ্যে আইন পাস হইয়াছে উহাদের সর্বত্র আইনটি এখনও প্রয়োগ করা হয় নাই। যে সকল রাজ্যে ইহা প্রয়োগ করা হইয়াছে তথায়ও ইহার প্রয়োগ সম্পূর্ণ হয় নাই।

সমালোচনা : উন্নয়নমুখী, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠনের পূর্বশর্ত হইতেছে দেশে অতীতের সামন্ততান্ত্রিক অন্যায্য, শোষণ ও পীড়নমূলক কৃষি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ও প্রকৃত কৃষকগণের মধ্যে জমির বন্টন দ্বারা এরূপ ভূমিব্যবস্থা সৃষ্টি করা যাহাতে কৃষকগণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রকৃতই উৎসাহিত হয় ও তাহাদের পরিশ্রমের ফলভোগ করিতে পারে। কৃষি সংস্কার বলিতে এই ধরনের ব্যবস্থাই বুঝায়। কিন্তু ভারতে এ পর্যন্ত এ ক্ষেত্রে যে সকল বাস্তব ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে আইনগত ও আনুষ্ঠানিক ভাবে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঘটিলেও, তাহাদ্বারা প্রকৃত কৃষি সংস্কার ঘটে নাই। জমির মালিকানা গরিষ্ঠসংখ্যক কৃষকের হস্তে আসিবার পরিবর্তে বরং ইদানীংকালে উহা অল্পতর সংখ্যক ধনীকৃষক মালিকের হস্তেই কেন্দ্রীভূত হইতেছে ; ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এমতাবস্থায় ভারতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাই ব্যর্থকাম হইতেছে তাহাতে আশ্চর্য হইবার বিশেষ

কিছু নাই। সম্প্রতি মার্কিন সরকার প্রেরিত একটি বিশেষজ্ঞদল ভারতের পাঁচটি উৎকৃষ্ট 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম' অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে ভূমিসংস্কার আইনের ত্রুটি কৃষিব্যবস্থার শোচনীয়তার জন্য সবিশেষ দায়ী।

৩. জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা (Ceiling on Land Holdings): ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনস্থ জোত-জমির সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া উচিত—প্রথম পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা কমিশন এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধারণভাবে ভারত সরকার কৃষি সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে এই নীতি কার্যকর করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় সকল রাজ্যেই ভূমিব্যবস্থা ও প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের সঙ্গে সঙ্গে জোতজমির সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

ক. উদ্দেশ্য: যে সকল **সুফল** লাভের উদ্দেশ্যে জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়ার নীতি গৃহীত হইয়াছে তাহা এই:

১. গ্রামীণ ক্ষেত্রে জোতজমির মালিকানায় দেশে প্রচণ্ড বৈষম্য বর্তমান। কৃষিজমির অধিকাংশ মুষ্টিমেয়র কুক্ষিগত রহিয়াছে। ইহাতে গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবল ধন ও আয় বৈষম্য, সুযোগের বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে। **সম্পদ, আয় ও সুযোগের বৈষম্য হ্রাস করাই** ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য। জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণকার্য এই পথে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

২. অতীতে দেখা গিয়াছে যে, রায়তওয়ারী অঞ্চলেও কৃষকের হাতে জমির পরিমাণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে তাহারা জমিতে কোর্ফাপ্রজা দ্বারা চাষ করায়। ইহাতে অনবরত নূতন নূতন শ্রেণীর ভাড়াটিয়া চাষীর উদ্ভব হয়। এ-সকল চাষীর সহিত সরকারের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং জোতজমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দিলে, এইরূপ **নূতন মধ্যস্বত্ব-ভোগীর উদ্ভব হইবে না।**

৩. জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিলে যে **উদ্বৃত্ত জমি** পাওয়া যাইবে, তাহা স্বল্পজমির মালিকক্বষক ও ভূমিহীন কৃষি-মজুরগণের মধ্যে **বণ্টন** করা সম্ভব হইবে। গ্রামের সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ দরিদ্র কৃষকগণের মনে ইহার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ঘটিবে। জমি লাভ করিয়া ইহারা গ্রামসমাজে পদমর্যাদায় উন্নত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিবে। সামগ্রিক গ্রামসমাজের মানসিকতায় এক বিরাট প্রগতিশীল পরিবর্তনের সূত্রপাত হইবে।

৪. জমি লাভ করিয়া এই সকল কৃষকগণ যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত চাষ করিবে, তাহাতে পূর্ণতররূপে জমি ব্যবহৃত হওয়ায় **ফলন বাড়িবে।**

৫. গ্রামবাসিগণের মধ্যে জমির মালিকানার মোটামুটি সমতা প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রামসমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভেদ-বিভেদ দূর হইয়া অবস্থার সাম্যের ফলে **সমস্বার্থবোধ** জাগিবে। ইহাতে গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের আরো অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হইবে। সমবায় গ্রাম পরিচালন ব্যবস্থা, সমবায় কৃষি প্রভৃতির অগ্রগতি দ্রুততর হইবে।

৬. দরিদ্র **কৃষকগণের আয় ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি** ঘটিবে।

সামগ্রিক বিচারে ইহাদ্বারা কৃষিকাঠামো ও গ্রামীণ সমাজের প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটিবে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হইবে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির বাধা বিশেষভাবে অপসারিত হইবে।

বিরুদ্ধে যুক্তি: কিন্তু এই ব্যবস্থার বিরোধিগণ, জোতের মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের বিরুদ্ধে এই যুক্তি দেখান যে, শহরাঞ্চলের ব্যক্তিগত ধনসম্পদের মালিকানার উপর

যদি সীমা নির্ধারিত না হইয়া থাকে, তবে জোতজমির মালিকানার উপরও সীমা নির্দিষ্ট করা অন্যায়। ইহারা ভুলিয়া যান যে জমি প্রকৃতির দান, এবং ইহার যোগান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ইহা অন্যান্য সম্পদের সমতুল্য নহে। তাহা ছাড়া ইহাতে জমি হইতে লব্ধ আয়ের সীমা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। শুধু জমির মালিকানার উপর সীমা আরোপ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহাতে উদ্যমী কৃষকগণ নিরুৎসাহিত হইবে, কারণ তাহারা চাষের জমি বাড়াইতে পারিবে না। এই যুক্তিও দুর্বল। কারণ, যে দেশে কৃষকগণের অনেকেরই জমি নাই কিংবা সামান্য, তথায় কোন কোন কৃষককে অতিরিক্ত জমির মালিক হইতে দেওয়া অন্যায়। বর্তমানেই বরং অনেকের জমি খুব সামান্য ও অল্পসংখ্যক ব্যক্তির জমির পরিমাণ অধিক হওয়ায় ফলন বৃদ্ধির পথে বিঘ্ন দেখা দিয়াছে। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করিলে জোতের সর্বোচ্চ সীমানির্ধারণকে একটি স্বাগত পদক্ষেপ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

খ. জোতের সর্বোচ্চ সীমা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (Some Aspects of Ceiling on land holdings): জোতের সর্বোচ্চ সীমানির্ধারণের দুইটি দিক (aspects) আছে। প্রথমত, বর্তমান জোতের সীমানির্ধারণ। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে কতটা পরিমাণ জমি ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকিবে তাহার সীমানির্ধারণ। এ সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে ব্যক্তিবিশেষের মালিকানাভুক্ত জোতের (holdings of individuals) সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া কিংবা পারিবারিক মালিকানার অধীন জোতের (holdings of families) সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। আর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে সর্বোচ্চ সীমা কত হইবে বা কিসের ভিত্তিতে স্থির হইবে।

সরকারী নীতি: কয়েকটি রাজ্যে ভবিষ্যৎ জোতের সর্বোচ্চ সীমা বাঁধিয়া আইন পাস করা হইলেও, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সকল রাজ্যকেই বর্তমান জোতের সীমা বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য আইন পাসের সুপারিশ করা হইয়াছিল। বর্তমানে সর্বত্রই জোতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আয়তনের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া আইন পাস করা হইয়াছে।

গ. অগ্রগতি (Progress): দ্বিতীয় পরিকল্পনায়, পরিকল্পনা কমিশন পরিবার ভিত্তিতে জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ ভারতে, কৃষিকার্য পারিবারিক ভিত্তিতেই চালিত হয়। তবে, তাহা সত্ত্বেও, বিভিন্ন রাজ্যে কোথাও বা পারিবারিক ভিত্তিতে, কোথাও বা ব্যক্তিগত ভিত্তিতে জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া আইন পাস হইয়াছে। ইহাতে অংশত জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইয়াছে। কেননা, যেখানে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে, তথায় পরিবারের সকলের অর্জনে মোট জমির পরিমাণ অনেক বেশি রাখা সম্ভব। অন্ধ্র, জম্মু ও কাশ্মীর, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে জোতের সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। আসাম, গুজরাট, কেরল ও রাজস্থানে পারিবারিক ভিত্তিতে জোতের সীমানির্দিষ্ট হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে ব্যক্তিগত ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হইলেও একান্নভুক্ত হিন্দু পরিবারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অব্যাহতি: চা, রবার ও কফি-বাগিচা; ফলের বাগান; পশুপালন খামার; চিনির কলের অধীনস্থ ইক্ষুক্ষেত্র, এবং যে সকল বড় আয়তনের কৃষি-খামারে যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজি নিয়োগ করিয়া সুদক্ষ ভাবে উৎপাদন করা হইতেছে—এ সকল ক্ষেত্র, জোতের সর্বোচ্চ সীমাসংক্রান্ত আইনের কবল হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ রহিয়াছে। কারণ, এ সকল ক্ষেত্রে, সর্বোচ্চ সীমার আইন প্রয়োগের দ্বারা জমিগুলি খণ্ড খণ্ড হইলে, উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

উদ্বৃত্ত জমিতে কৃষকগণের পুনর্বসতি (Resettlement) : জোত-জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের পশ্চাতে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইহা দ্বারা যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাইবে তাহা ভূমিহীন কৃষকগণের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। তাহাতে ভূমিহীন কৃষকগণের পুনর্বসতির জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন আরও বলিয়াছেন যে এজন্য উদ্ধারকৃত পতিত জমি ও ভূদানের দ্বারা প্রাপ্ত জমিও একত্রিত করিতে হইবে। আর যাহাতে পুনর্বসতি প্রাপ্ত কৃষকগণ উচ্চমানের উৎপাদন ঘটাইতে পারে সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কৃষিঋণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ পর্যন্ত ৭৮ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি কৃষকগণের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে। কিন্তু বৃহৎ জমির মালিকগণ জমির বেনামী হস্তান্তর দেখাইয়া বিপুল পরিমাণ জমি ফাঁকি দিয়া এই আইনটিকে ব্যর্থ করিবার যোগাড় করিয়াছে। এই সকল হস্তান্তর সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিবার প্রয়োজনের কথা তৃতীয় পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

সরকারী ভূমিনীতির সমালোচনা (Criticism) : উদ্দেশ্যের দিক হইতে সরকারী ভূমিনীতিকে অনেকে বৈপ্লবিক বলিয়া অভিহিত করিলেও, প্রয়োজনীয় আইন পাসে বিলম্ব, মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ, চাষকে জমির মালিকানা প্রদানের ব্যবস্থা জমির সর্বোচ্চ সীমানির্ধারণ প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক ভাবে আইন প্রণয়ন, জমিদারগণ কর্তৃক মধ্যস্বত্বভোগী বিলোপ আইনের প্রয়োগে অযথা বাধা প্রদান, অধিক জমির মালিকগণ কর্তৃক জমির সর্বোচ্চ সীমা প্রবর্তনের আইনসমূহের বিবিধ ত্রুটির সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্বনামে ও বেনামে জমি দখলে রাখা ও ব্যাপকভাবে জমি হইতে কৃষক প্রজা উচ্ছেদকরণ প্রভৃতি কারণে, ভূমি সংস্কার আইনের উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায়।

কৃষি-শ্রমিক সমস্যা
THE PROBLEM OF AGRICULTURAL LABOUR

ভারতে উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত জনসমষ্টির মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত, নিপীড়িত ও অবহেলিত যদি কেহ থাকে তবে তাহারা হইতেছে ভারতের কৃষি-শ্রমিক শ্রেণী। ইহাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, কাজের শর্তগুলি অত্যন্ত কঠোর ও অবাঞ্ছনীয়, কাজের অনিশ্চয়তা অত্যধিক এবং স্বল্পনিযুক্তি ও কর্মহীনতা প্রবল, মজুরির হার অত্যন্ত স্বল্প এবং জীবনধারণের মান নিম্নতম। গ্রামীণসমাজেও ইহাদের স্থান অত্যন্ত নীচে। অতি সাম্প্রতিক কালে ইহাদের দুরবস্থা দূরীকরণের প্রয়োজনের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে; সরকারের পক্ষ হইতে ইহাদের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত ও ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে। চূড়ান্ত বিচার বিশ্লেষণে ভারতের কৃষি শ্রমিক সমস্যা একদিকে দেশের কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তির বৃহত্তর সমস্যার অংশ, অপরদিকে ইহার সহিত জড়িত রহিয়াছে গ্রামীণ সমাজে সামাজিক ন্যায় বিচার সুযোগের সমতা ও দেশে আদিবাসী সমস্যা।

১. কৃষিশ্রমিক সম্পর্কে অনুসন্ধান দ্বারা সংগৃহীত তথ্যাদি (Findings of the Agricultural Labour Enquiries) : পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রবর্তনের সময় হইতেই কৃষি-শ্রমিক সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার ইহাদের সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এজন্য প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে ১৯৫০-৫১ সালে, প্রথম কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান কার্য (The First Agricultural Labour Enquiry) ও পরে পুনরায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১৯৫৬-৫৭ সালে দ্বিতীয় কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান কার্য (The Second

Agricultural Labour Enquiry) চালনা করা হয়। প্রথম অনুসন্ধানের বিবরণ ১৯৫৪-৫৫ সালে ও দ্বিতীয় অনুসন্ধানের বিবরণ ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম অনুসন্ধান কার্যটি চালিত হয় ৮০০ গ্রামের ১১ হাজার কৃষি শ্রমিক পরিবারের মধ্যে। দ্বিতীয় অনুসন্ধান কার্য চালিত হয় ৩৬০০ গ্রামের ২৮,৫৬০টি কৃষি-শ্রমিক পরিবারের মধ্যে। দুইটিই নমুনা অনুসন্ধান। পর পর এই দুইটি অনুসন্ধানের দ্বারা দেশের কৃষি-শ্রমিকগণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান তথ্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এই তথ্যগুলির দ্বারা ভারতের কৃষি-শ্রমিক সমস্যার একটি বেদনাময় ও শোচনীয় চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

ক সমস্যার পরিমাণগত দিক (The Magnitude of the Problem): ১৯৫৬-৫৭ সালে দেশে কৃষি-শ্রমিক পরিবারগুলির (households) সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১·৬৩ কোটি এবং মোট কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৩·৩ কোটি। এই কৃষি-শ্রমিক পরিবারগুলি মোট গ্রামীণ পরিবারগুলির ২৪ শতাংশ। তুলনায় ১৯৫০-৫১ সালে কৃষি-শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ছিল ১·৭৯ কোটি ও কৃষি শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৩·৫০ কোটি। ইহা হইতে কৃষি-শ্রমিক পরিবার ও কৃষি-শ্রমিক সংখ্যা কমিয়াছে মনে করা ঠিক হইবে না। কারণ দুইটি অনুসন্ধানে কৃষি-শ্রমিক পরিবার বলিতে কি বুঝাইবে, তাহার দুইটি ভিন্ন সংজ্ঞা ব্যবহার করা হইয়াছিল। ১৯৫১ সালের লোকগণনাতে দেশে কৃষি-শ্রমিক সংখ্যা মোট ৪·৯ কোটি, অর্থাৎ কৃষিতে নিযুক্ত জনসমষ্টির ২০ শতাংশ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছিল।

খ আয়ের উৎস (Source of income): এই কৃষি-শ্রমিক পরিবারগুলির ৫৭ শতাংশই ভূমিহীন। তুলনায় ১৯৫০-৫১ সালে উহা ছিল ৫০ শতাংশ। সুতরাং নিঃসন্দেহে কৃষি-শ্রমিকগণের মধ্যে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বাকি কৃষি-শ্রমিক পরিবারগুলির জমির পরিমাণ এত অল্প যে তাহার দ্বারা তাহাদের অন্নসংস্থান হয় না। সুতরাং ১·৬৩ কোটি কৃষি-শ্রমিক পরিবারের ৮৩ শতাংশই সাময়িক কাজে অন্যের জমিতে দিন-মজুরির দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। বাকি ১৭ শতাংশ কৃষি শ্রমিক পরিবার স্থায়ী কর্মের মজুরিতে সংসার চালায়। সুতরাং এককথায় অপরের জমিতে সাময়িক ও স্থায়ীভাবে দিনমজুরিই ইহাদের আয়ের একমাত্র উপায়। ইহাদের গড় আয়ের ৮১ শতাংশই দিনমজুরির দ্বারা উপার্জিত হয়।

গ. কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তি (Unemployment and underemployment): কৃষি-শ্রমিকগণের মধ্যে সাধারণভাবে কর্মহীনতা বাড়িয়াছে। ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে পুরুষ কৃষি শ্রমিকগণ ২০০ দিনের স্থলে ১৯৭ দিন দিনমজুরিতে কর্মে নিযুক্ত এবং ৯০ দিনের স্থলে ১২৮ দিন কর্মহীন ছিল আর ৭৫ দিনের স্থলে ৪০ দিন স্ব-কর্মে (অর্থাৎ নিজ জমিতে বা গৃহে) নিযুক্ত ছিল। ইহাদের পরিবারস্থ শিশুগণের পরিশ্রম বাড়িয়াছে। ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে ইহারা ১৬৫ দিনের স্থলে ২০৪ দিন কর্মে নিযুক্ত ছিল। নারীশ্রমিকগণ বৎসরে ১৪১ দিনের বেশী কাজ পায় না।

ঘ. স্বল্প মজুরি ও আয় (Low wages and income): পুরুষ, নারী ও শিশু কৃষি-শ্রমিকের দৈনিক মজুরির হার ১৯৫১ সালের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে। যেখানে পুরুষ কৃষি-শ্রমিকগণ পূর্বে মজুরি পাইত দৈনিক ১·০৯ পয়সা হারে, সেখানে উহা ১৯৫৬ সালে কমিয়া ৯৬ পয়সা হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে তাহাদের আয় ১১ শতাংশ কমিয়া গিয়াছে। কৃষি-শ্রমিকগণের মাথাপিছু বাৎসরিক আয় হইয়াছে মাত্র ২৯·৫ টাকা, ইহা জাতীয় মাথা পিছু আয়ের মাত্র ৩৪ শতাংশ। তাহাদের পরিবার পিছু (এক পরিবারে ৪·৪ জন

ধরা হইয়াছে) আয দাঁড়াইয়াছে বৎসরে ৪৩৭ টাকা। সারা ভারতে কৃষি শ্রমিকগণের মোট মজুরির পরিমাণ হইয়াছে আনুমানিক ৫২০ কোটি টাকা। এই সামান্য মজুরিও তাহারা সম্পূর্ণ নগদে পায় না। তাহাদের মজুরির ৪০ শতাংশ জিনিসপত্রে দেওয়া হয়। ১৯৫০-৫১ সালে প্রাপ্য মজুরির ৩১ শতাংশ জিনিসপত্রে দেওয়া হইত। সুতরাং কি কর্মসংস্থানের দিক দিয়া, কি মজুরির হারের দিক দিয়া ভারতের কৃষি শ্রমিকগণের অবস্থার আরও শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে।

ঙ ক্রমবর্ধমান খরচ ও দেনা (Increasing expenditure and debt): গড়ে বৎসরে একটি কৃষি-শ্রমিক পরিবারের আয় যেখানে ৪৩৭ টাকা, সেখানে সংসার খরচ পড়ে ৬১৭ টাকা। সংসার খরচের ঘাটতি এই ১৮০, টাকা অতীত সঞ্চয় হইতে, গৃহস্থালির দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় ও দেনা করিয়া মিটাইতে হয়। ফলত দেনার ভাগটাই বেশী ও ক্রমবর্ধমান। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে, ৪৫ শতাংশ কৃষি-শ্রমিক পরিবারের স্থলে ৬৪ শতাংশ পরিবার দেনাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরিবার পিছু গড় দেনার পরিমাণ ৪৭ টাকা হইতে বাড়িয়া ৮৮ টাকা হইয়াছে। সারাভারতে ইহাদের মোট দেনার পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ১৪৩ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। এই দেনার ৩৪ শতাংশ মহাজন, ৪৪ শতাংশ আত্মীয় বন্ধু, ১৫ শতাংশ নিয়োগকর্তা, ৫ শতাংশ দোকানদার ও মাত্র ১ শতাংশ সমবায় ঋণদান সমিতির নিকট হইতে যোগাড় হইয়াছে।

চ. সামাজিক দিক (Social aspect): এইসকল কৃষি-শ্রমিকগণের অধিকাংশই গ্রামের অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহা ছাড়া ভারতের কোনও কোনও অংশে ইহাদের মধ্যে আদিবাসী সমাজও রহিয়াছে। স্বভাবতই ইহারা সুদীর্ঘকাল সামাজিক অন্যায় অবিচারের ও তীব্র শোষণের শিকারে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং ভারতে কৃষি-শ্রমিক সমস্যা একদিকে যেমন কর্মহীনতা ও স্বল্পনিযুক্তির অর্থনীতিক সমস্যার অন্তর্গত, তেমনি ইহার একটি জটিল সামাজিক ও আদিবাসী সম্পর্কিত দিকও আছে। ইহাদের মধ্যে ভারতের কোন কোন অংশে এরূপ ভূমিদাসের (agrarian serfs) সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহারা জীবনে কোন দিনই নগদ অর্থে পারিশ্রমিক পায় নাই এবং যাহাদের অবস্থা ক্রীতদাস অপেক্ষা কোনক্রমে ভাল নহে।

২. ইহার সমাধানের উপায় (Remedies): কৃষি-শ্রমিকগণের এই শোচনীয় অর্থনীতিক সামাজিক অবস্থা আর কোনমতেই যে চলিতে দেওয়া যায় না এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক এসম্পর্কে দ্বিমত নাই। ১৯৪৯ সালের কংগ্রেস কৃষি সংস্কার কমিটি (Congress Agrarian Reforms Committee) বলিয়াছেন, "কৃষির সংস্কারের যে কোন কার্যক্রম হইতে কৃষি-শ্রমিকগণের সমস্যা বাদ দেওয়ার অর্থ হইবে দেশের কৃষিব্যবস্থার একটি গভীর ক্ষত অবহেলা করা"। সুতরাং জাতীয় অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচনা করিয়া এই সমস্যার সমাধানের সর্বাত্মক চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার জন্য তিন প্রকারের কর্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজন:

ক. কৃষি-শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারণ: এই রক্ষামূলক ব্যবস্থার দ্বারা তাহাদের মজুরির হার বৃদ্ধি করা যায়। ভারতে ১৯৪৮ সালে যে নিম্নতম মজুরি আইন পাস হইয়াছে তাহা গত বার বৎসরে প্রায় সকল রাজ্যেই কৃষি-শ্রমিকগণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তবে এই আইনটি বলবৎ করিবার পথে কতকগুলি বাধা রহিয়াছে। ১. জমির উপর অত্যধিক ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের দরুন সরকার যে মজুরি নির্ধারণ করিয়া দিবে

কৃষি-শ্রমিকগণ অনেকস্থানে উহা হইতে কম মজুরিতে কাজ করিতে বাধ্য হইতে পারে। তাহা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রের কাজ মৌসুমী নির্ভর, সাময়িক। একারণে বসিয়া থাকার পরিবর্তে তাহারা অল্প মজুরিতেও কাজ গ্রহণ করিবে। ২. কৃষি-শ্রমিকগণ অশিক্ষিত ও বিক্ষিপ্ত বলিয়া নিজেরা সংগঠিত হইয়া মালিকের সহিত দরকষাকষিতে অক্ষম। ৩. ইহারা অধিকাংশই গ্রামের অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত। সাধারণত গ্রামের উচ্চবর্ণের জমির মালিকগণের সহিত দরকষাকষির সাহস ইহাদের অনেকেরই নাই। চিরাচরিত গ্রাম্য রেওয়াজ অনুযায়ী নিম্নতর মজুরির হার ইহারা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। ৪. জমিদার মহাজনের নিকট ইহাদের ঘটিবাটি বাড়ীঘর বাঁধা থাকে। অনেকস্থলে তাহাদের জমিতেই ইহারা ঘর তুলিয়া বাস করে। এরূপে মহাজন জমিদারের নাগপাশে আবদ্ধ থাকায় ইহারা সরকারী নিম্নতম মজুরি দাবি করিবার সাহসও করিতে পারে না, আবার ঐ বন্ধন ছিন্নও করিতে পারে না। ৫. গ্রামাঞ্চলে পথঘাটের বিস্তারের অভাবে ও সামাজিক আচার, ভাষার পার্থক্য প্রভৃতির দরুন ইহাদের শ্রমের সচলতা নাই। অন্যত্র বেশী মজুরি পাইবে জানিলেও বাসস্থান ত্যাগ করিয়া তথায় যাইতে পারে না। ৬. সর্বোপরি সরকারী নিম্নতম মজুরি বলবৎ করিবার ও উহা তদারকির জন্য উপযুক্ত কোনো সরকারী ব্যবস্থা নাই এবং ইহা গড়িয়া তোলাও কঠিন। এ সকল বিষয়ের দরুন সমস্যাটির জটিলতা বাড়িয়াছে।

খ. কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠন : ভারতে কৃষি শ্রমিক সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে দেশের মানবিক শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহারের সমস্যা, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের সমস্যা। ইহার জন্য প্রয়োজন ভূমিসংস্কারের, জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমানির্ধারণ করিয়া উদ্বৃত্ত জমির পুনর্বণ্টন, সেচ, সার, বীজ ও ঋণের সুবিধার প্রসারের দ্বারা কৃষিপদ্ধতির উন্নতি করিয়া উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সমবায় খামার প্রতিষ্ঠা, বিবিধ গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে শ্রমনির্ভর পদ্ধতি প্রয়োগ, কৃষি-শ্রমিকের সচলতা বৃদ্ধির জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষি-শ্রমিক কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন, ও কৃষি-নির্ভর নানাবিধ গ্রাম্য ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উহাদের বিকেন্দ্রীকরণ। এ সকল ব্যবস্থার ফলে কৃষি-শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইলে মজুরির হার বাড়িবে ও কর্মসংস্থানের নানারূপ সুযোগ সৃষ্টি হইবে। প্রথম পরিকল্পনা কাল হইতে এই পথে সরকারী ব্যবস্থাদি গৃহীত হইতেছে।

প্রথম পরিকল্পনায় কর্ষণ বর্জন জমিতে কৃষি-শ্রমিকগণের স্থায়ী বন্দোবস্ত ও উচ্ছেদের হাত হইতে তাহাদের রক্ষার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং এজন্য ১·৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** কৃষি সেচ ও সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ছাড়াও কৃষি শ্রমিকগণের কথা মনে রাখিয়া গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। বিভিন্নরাজ্যে ইহাদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, প্রায় ৫ কোটি টাকার মত ব্যয়ে ১ লক্ষ একর জমিতে ২০ হাজার কৃষি-শ্রমিক পরিবারের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইহাদের শিক্ষাগত উন্নতির জন্যও ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** কৃষি, সেচ, ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য যে বিপুল ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে তাহার দ্বারা কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কৃষি-শ্রমিকগণের কর্মের আরও অধিক সুযোগ সৃষ্টি হইবে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি মোট ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ইহাদের ভূমির বন্দোবস্ত করিবেন এবং ৫০ লক্ষ একরে ৭ লক্ষ ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকের পুনর্বসতি সম্ভব হইবে। তাহা ছাড়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বছর নাগাদ ২৫ লক্ষ কৃষি-শ্রমিকের জন্য বৎসরে অতিরিক্ত ১০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা সম্ভব হইবে।

গ. দাসত্ব হইতে কৃষি-শ্রমিকগণের মুক্তি : বহু শতাব্দী ধরিয়া গ্রামীণ সমাজে অন্ত্যজ শ্রেণী বলিয়া বিবেচিত এই সকল কৃষি-শ্রমিকগণ কার্যত জমিদার, মালিক, মহাজনে ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছে। ভারতের সংবিধানে দেশে সকল প্রকারের দাসত্বকে দণ্ডনী অপরাধ বলিয়া ঘোষিত হইলেও শহরের সভ্যতার ও আইনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাগণের নিক হইতে বহুদূরে গ্রামের একপ্রান্তে নির্বাসিত দরিদ্র হতভাগ্য ও তথাকথিত অন্ত্যজ বলি পরিগণিত এই সকল কৃষি-শ্রমিকগণকে তাহাদের অলিখিত দাসত্ব হইতে উদ্ধার করা খুবই কঠি কার্য। এজন্য ধারাবাহিক ও সক্রিয় প্রবল প্রচেষ্টা আবশ্যক।

ভূদান আন্দোলন
THE BHOODAN MOVEMENT

ভারতে ভূমিসংস্কার প্রচেষ্টায় ভূদান আন্দোলনের যথেষ্ট তাৎপর্য রহিয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয় ভারতের কৃষকগণের উপর শোষণ ও উৎপীড়নমূলক যে ভূমিব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে, দারিদ্র্য ঋণের যে চাপ রহিয়াছে তাহার ফলে ক্রমেই কৃষিজমি কৃষকগণের হস্তচ্যুত হইয়া মুষ্টিমেয় গ্রাম মহাজন, ব্যবসায়ী ও ধনী-কৃষকের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। ভূমিহীন কৃষি-মজুরের সংখ্য বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সংকট বৃদ্ধি পাইয়া কিছুদিন পূর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্ফোর ঘটে। যে সকল অঞ্চলের কৃষকগণের ব্যাপক গোলযোগ ঘটে, তাহার মধ্যে হায়দরাবাদে তেলেঙ্গানা জেলা অন্যতম। ১৯৫১ সালে ঐ অঞ্চলে পর্যটনের সময় আচার্য বিনোবা ভাবে কৃষকগণের মধ্যে জমির তীব্র ক্ষুধা উপলব্ধি করিয়া, উহার সমাধানের জন্য গান্ধীজীর সত্যাগ্র পদ্ধতির ভিত্তিতে, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্বেচ্ছায় ভূমিদান আন্দোলনের প্রবর্ত করেন। ইহাই 'ভূদান আন্দোলন' নামে পরিচিত।

উদ্দেশ্য (Objectives): এই আন্দোলনের মূলকথা হইল একটি ন্যায়পরায়ণ ও সাম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় জমির অধিকার থাকিবে সর্বসাধারণের। এজন্য ভূদান আন্দোল ভূমিদান চাহে না। জমিতে দরিদ্র কৃষকগণের ন্যায়ত যে অধিকার আছে, তাহার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা চাহে। অধিক জমির মালিক তাহার উদ্বৃত্ত জমি প্রত্যর্পণ ও দরিদ্র কৃষক তাহা শ্রম দান করিলে উভয়ের সহযোগিতার ভিত্তিতে সংঘর্ষহীন পথে, একটি ন্যায়পরায়ণ নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে।

রূপ (Form): প্রথমে কৃষিক্ষেত্রে এই আন্দোলন প্রবর্তিত হইলেও বর্তমানে অ-কৃষি ক্ষেত্রেও ইহা প্রসারিত হইয়াছে। কৃষিক্ষেত্রে ইহার বক্তব্য হইতেছে যে যাহাদের জমি আছে এরূপ প্রত্যেক কৃষককে নিজ জমির এক-ষষ্ঠাংশ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য দান করিতে হইবে। অ-কৃষি ক্ষেত্রে ইহা 'বুদ্ধিদান', 'সম্পত্তি দান', 'জীবন দান', 'সাধনদান' ও 'গৃহদান আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

অগ্রগতি (Progress): জমি বণ্টনের দ্বারা ভারতের প্রতি কৃষক পরিবারের যাহাতে কিছু-না-কিছু জমি থাকে সেজন্য সারা ভারতে মোট ৫ কোটি একর জমি সংগ্রহ করিবা উদ্দেশ্য লইয়া ১৯৫১ সালের ১৮ই এপ্রিল ভূদান আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বর্তমানে ইহ প্রসারিত হইয়া 'গ্রামদান' আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহার তাৎপর্য হইতেছে গ্রামের সকল জমি সামগ্রিকভাবে গ্রাম-সমাজের (গ্রামের সকল অধিবাসিগণের) অধিকারে থাকা উচিত। গ্রামের সকল জমিতে গ্রাম সমাজের অধিকার প্রবর্তিত হইলে, সমবায় ভিত্তিতে গ্রামোন্নয়ন কার্যে সুবিধা হইবে বলিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় 'গ্রামদান' আন্দোলনের

ীকৃত হইয়াছিল। এজন্য সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও গ্রামদান আন্দোলনের মধ্যে পারস্পরিক হযোগিতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। 'গ্রামদান' আন্দোলনের অন্তর্গত গ্রামগুলিতে মষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করিবার অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

১৯৬০ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত মোট ৪৪ লক্ষ একরের অধিক জমি ংগৃহীত ও ৮ লক্ষ ৭২ হাজার একরের অধিক জমি বণ্টন করা হইয়াছে। ৪,৬৪৩টি গ্রাম ান হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে। 'ভূদানে'র জমিদান ও বণ্টনের সুবিধার জন্য বিভিন্নরাজ্যে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন াজ্য সরকার, উভয়পক্ষই ১৯৫৫-৫৬ সাল হইতে অর্থসাহায্য করিতেছেন।

সুফল (Merits): ভূদান আন্দোলনের নিম্নলিখিত সুফল দাবি করা হইয়াছে। ১. ইহা দ্বারা ৬ কোটি ভূমিহীন কৃষি-মজুরের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া তাহাদের জমির সমস্যা মেটান যাইবে। ২. জমি ও অন্যান্য সম্পত্তি দান হিসাবে সংগ্রহ ও দরিদ্র কৃষকগণের মধ্যে উহার বণ্টনের দ্বারা গ্রামবাসীদের মধ্যে আয় ও সম্পত্তির বণ্টনে বৈষম্য দূর হইবে। ৩. অ-ব্যবহৃত ও অকর্ষিত জমি সংগ্রহ ও বণ্টনের দ্বারা কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাড়িলে, কৃষির মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। ৪. ইহা দ্বারা মধ্যস্বত্বভোগীশ্রেণীর বিলোপের সুবিধ হইবে। ৫. সরকারের ভূমি সংস্কার নীতির পথ ইহাতে সুগম হইবে।

ত্রুটি (Defects): কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি দেখা যাইতেছে এবং ইহার ফলে উহার উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতেছে। ১. দান হিসাবে প্রাপ্ত অধিকাংশ জমিই পতিত ও আপাতত চাষের অযোগ্য। এই প্রকার জমি ভূমিহীন কৃষকগণের মধ্যে বণ্টন দ্বার তাহারা সবিশেষ উপকৃত হইতেছে না। ২. ভূমিদান পাইবার যোগ্য ব্যক্তি বিচারের উপযুক্ত মাপকাঠি স্থির করা হয় নাই। ৩. ভূমিপ্রাপ্ত কৃষকগণের মধ্যে চাষের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও পুঁজি সরবরাহের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে না। ৪. অনেক স্থলে জমি বণ্টনে অধিক বিলম্ব ঘটায় দান হিসাবে প্রাপ্ত জমিতে চাষ হইতেছে না বলিয়া উৎপাদ বাড়িতেছে না। ৫. জমি সংগ্রহের নির্ধারিত লক্ষ্যের তুলনায় অতি অল্পজমিই আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাতে আদৌ ঐ লক্ষ্যপূরণ হইবে কিনা সে সন্দেহ দেখা দিয়াছে।

ভূদান আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এই সকল ত্রুটির অবসান বাঞ্ছনীয়। ভারতে ভূমি সংস্কার প্রচেষ্টায় ভূদান আন্দোলনের তাৎপর্য রহিয়াছে। সরকার আইনগতভাবে যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহেন, বেসরকারী প্রচেষ্টা হিসাবে 'ভূদান' আন্দোলন উহার উপযোগী মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুতে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে, শুধুমাত্র ভূদান দ্বারা তাহাদের সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

৩

কৃষিগত প্রযুক্তিবিদ্যা
Agricultural Technology

ভূমিকা : কৃষির উৎপাদনশীলতা ও কৃষিকার্যের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যেরূপ কৃষকের স্বত্ব-স্বামিত্বের নিরাপত্তা, আর্থিক সামাজিক ও আইনগত পদমর্যাদার উন্নতি আবশ্যক, তেমনি প্রয়োজন কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন ও প্রসার। যদি আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার যথেষ্ট পরিমাণ ব্যবহার না ঘটে তবে ভূমিসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য—কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি—ব্যর্থ হইবে। আবার ভূমিসংস্কার বাদ দিয়া প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির চেষ্টাও বিফল হইবে। সুতরাং ইহারা পরস্পরের পরিপূরক।

কৃষিকার্যে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন ও প্রসার বলিতে প্রত্যক্ষভাবে, কৃষিজমির ব্যবহার পদ্ধতি অর্থাৎ কৃষিকার্যের পদ্ধতির বিবিধ পরিবর্তন বুঝায়। উন্নত ধরনের সেচকার্য, ভূমি সংরক্ষণ, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস, আধুনিক পদ্ধতিতে ভূমিকর্ষণ, আবর্তনকৃষির প্রবর্তন ও প্রসার, শুষ্ক কৃষি ও মিশ্র কৃষির প্রবর্তন, চাষে পশুশক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার (অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন) ইত্যাদি বহুবিধ ব্যবস্থাই ইহার অন্তর্গত। এই সকল বিষয়ের সাহায্যে জমির যথাযথ ব্যবহার বৃদ্ধি পাইলে, অল্পব্যয়ে অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদন সম্ভব হইবে। কৃষিতে প্রয়োজনীয় মানবিক শ্রমের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। কৃষির উদ্বৃত্ত উৎপাদন বাড়িবে। কৃষকের মাথাপিছু আয় বাড়িবে। কৃষি হইতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা শিল্পে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হইবে। ক্রমহ্রাসমান কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার দ্বারা শিল্প ও অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য কাঁচামালের চাহিদা মিটান সম্ভব হইবে।

কৃষিকার্যে প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত পরিবর্তন ঘটাইতে হইলে সর্বাগ্রে দুইটি বিষয় প্রয়োজন। প্রথমত, কৃষকগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাধারণ ও বিশেষরূপে আধুনিক কারিগরী শিক্ষার প্রসার চাই। দ্বিতীয়ত, কৃষিকার্যে অধিক পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগ চাই। যেহেতু আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালিত হইবে সেহেতু তাহাতে বেশি পরিমাণে পুঁজির প্রয়োজন হইবে। পুরাতন লাঙল ও কৃষির অন্যান্য যন্ত্রপাতির তুলনায় আধুনিক কলের লাঙলের মূল্য অধিক। আধুনিক সেচ, উৎকৃষ্ট বীজ ও সারের জন্যও ব্যয় বাড়িবে।

সেচকার্য
IRRIGATION

প্রয়োজনীয়তা (Need) : কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু বৃষ্টিপাতের উপর এই নির্ভরশীলতা তাহার পশ্চাদপদ অবস্থার পরিচায়ক। আধুনিককালে বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ কৃষির জন্য জল সরবরাহের যে ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে সেচব্যবস্থা তাহারই ফল। ভারতে তিনটি কারণে সেচের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

১. ভারতে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫ ইঞ্চি হইলেও, সর্বত্র বৃষ্টিপাতের পরিমাণ একরূপ নহে। স্থানবিশেষে ৪৬০ ইঞ্চি হইতে ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত ইহার তারতম্য ঘটে। তাহা ছাড়া বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত ও অনিয়মিত। এইরূপ অবস্থার উপর নির্ভরশীল কৃষিকার্যের দ্বারা ফসলের উৎপাদন সুনিশ্চিত করা যায় না।

২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এক-ফসলী জমি দো-ফসলী জমিতে পরিণত করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কিন্তু শীতকালে বৃষ্টিপাত অল্প হওয়ায় এইরূপ প্রগাঢ় কৃষির অসুবিধা

ঘটিতেছে। তাহা ছাড়া অনেক ফসলের জন্য অধিক পরিমাণ জলের প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতের দ্বারা তাহা পাওয়া যায় না।

৩. অনেক সময় বর্ষাঋতু শীঘ্র শেষ হইয়া যায়। তাহাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ব্যাপক অজন্মা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

কৃষি বিজ্ঞানিগণের মতে শুধুমাত্র উপযুক্ত সেচের দ্বারা বর্তমান কৃষিজমির ফলন দ্বিগুণ এবং উৎপন্ন ফসলের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বিভিন্ন প্রকার সেচকার্য (Types of Irrigation) : ভারতে প্রধানত তিনপ্রকারের সেচকার্য প্রচলিত। যথা—১. কূপ। ২. জলাশয়। ৩. খাল। ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত যে বিশদ তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে, মোটামুটিভাবে মোট জলসিঞ্চিত ভূমির ৩০ শতাংশ কূপের দ্বারা, ১৫ শতাংশ জলাশয়ের দ্বারা ও ৪২ শতাংশ খালের দ্বারা সিঞ্চিত হয়। বাকী ১৩ শতাংশে অন্যান্য ব্যবস্থার দ্বারা সিঞ্চন ঘটে। এই জলসিঞ্চিত ভূমির ৪১ শতাংশে ধানের, ১৫ শতাংশে গমের, ২৪ শতাংশে ডাইল ও অন্যান্য দানা-জাতীয় শস্যের, ৬ শতাংশে ইক্ষুর, ২ শতাংশে তুলার ও বাকী অংশে অন্যান্য ফসলের চাষ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট জলসিঞ্চিত ভূমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭ কোটি একর।

১. কূপ (Wells) : ভারতে সেচকার্যে ব্যবহৃত কূপগুলি দুই প্রকার। ক. অগভীর সাধারণ কূপ (Surface wells) বা পাতকুয়া। মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবেই ইহা অধিক। খননের ব্যয় অল্প বলিয়া দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে ইহা সুবিধাজনক। খ. নলকূপ। বিশেষজ্ঞগণের মতে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহার নলকূপের দ্বারা চাষের পক্ষে প্রশস্ত। এই প্রকার কূপ খনন ব্যয়সাধ্য বলিয়া ইহাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সরকারী অর্থসাহায্য প্রয়োজন।

২. জলাশয় (Tanks) : ভারতে সকল রাজ্যের মধ্যে মাদ্রাজেই জলাশয়ের সংখ্যা সর্বাধিক। তথায় ৩৫ হাজার জলাশয় রহিয়াছে। এই সকল জলাশয় কমবেশি অন্যান্য রাজ্যেও আছে। ইহাদের অধিকাংশই বর্তমানে জরাজীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। এই সকল পুরাতন জলাশয়ের সংস্কার আশু প্রয়োজন অধিকাংশ বৃহৎ জলাশয়ই সরকারী সম্পত্তি।

৩. খাল (Canals) : ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার সেচকার্যের মধ্যে বর্তমানে খালের গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ ইহাতে যেমন সস্তায়, সহজে ও সুনিশ্চিতরূপে জলসেচ সম্ভব তেমন আর অন্য কোন প্রকারে সম্ভব নহে। জলসেচের খালগুলি তিন প্রকারের : ক. প্লাবন-খাল (inundation canals)। খ. চিরবহ খাল (perennial canals)। গ. জলাধার খাল (storage canals)। প্লাবনখাল দ্বারা, নদীতে যখন বন্যা হয় শুধু সেই সময়ই জল বাহিত হইয়া কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ ঘটে। আবার নদীতে মাঝামাঝি স্থানে বাঁধ নির্মাণ করিয়া উহার পার্শ্ববর্তী তীরভূমিতে খাল কাটিয়া কৃষিক্ষেত্রে সারাবৎসর জলসেচ সুনিশ্চিত করা যায়। এই জাতীয় খালকে চিরবহ খাল বলে। আর বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য ঢালু অঞ্চলে বাঁধ দিয়া জলাধার নির্মাণ করিয়া, উহা হইতে যে খাল দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে জলসেচ করা হয়, তাহা জলাধার খাল নামে পরিচিত। উত্তর ভারতের অধিকাংশ সেচখালগুলি চিরবহ জাতীয়। দাক্ষিণাত্যে ও মধ্যপ্রদেশে জলাধার খাল দেখা যায়।

মন্তব্য : কৃষির উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির স্বার্থে, স্থানীয়ভাবে কৃষকগণকে ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য অগভীর কূপখননে উৎসাহ দেওয়া উচিত হইলেও, ইহাদ্বারা সেচের পরিমাণ বা ফলনের পরিমাণ উল্লেখনীয় পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। সুতরাং আঞ্চলিক ও এলাকাগতভাবে ব্যাপক সেচ বৃদ্ধির জন্য গভীর নলকূপ ও সেচ খাল খননের প্রয়োজনীয়তা তুলনায় অধিক। এবং এ কার্যে ব্যয় অধিক হওয়ায় প্রধানত সরকারী প্রচেষ্টায় ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেচকরের উচ্চহার বর্তমানে সেচের জল ব্যবহারের পথে কৃষকগণের নিকট একটি প্রবল বাধা।

ভারতের সেচ সম্ভাবনা (India's irrigation potential) : বিজ্ঞানিগণের হিসাবে প্রতিবৎসর এদেশে বৃষ্টিপাতলব্ধ জলের পরিমাণ ১৭৫ কোটি একরফিট (acre feet)। ইহার ৫১ শতাংশ (বা ১৫০ কোটি একরফিট জল) শুকাইয়া বায়ুতে মিশিয়া ও শোষিত হইয়া মৃত্তিকার নীচে চলিয়া যায়। মাটির নীচে যে জল সঞ্চিত হয় তাহার পরিমাণ মোট বৃষ্টিপাতের জলরাশির ৩০ শতাংশের কম নহে। ইহার ২ শতাংশেরও অল্প পরিমাণ কূপখননের

দ্বারা সেচকার্যে ব্যবহৃত হয়। বাকী ৪৯ শতাংশ বা ১৩৫ কোটি একরফিট জল দেশের নদীনালা দিয়া প্রবাহিত হয় (surface run off)। সুতরাং ভারত যে জলরাশির সরবরাহে সৌভাগ্যবান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কতটা পরিমাণে এই সম্ভাব্য জলরাশির দ্বারা সেচকার্য চালনা করা যায় তাহার যথার্থ হিসাব করা না গেলেও আনুমানিক এদেশে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ একরে সহজেই জলসেচ সম্ভব।

সরকারী নীতি, পরিকল্পনা ও সেচকার্যের অগ্রগতি (Govt's Policy, planning and progress of irrigation): সুদূর অতীতে ভারতে সেচকার্যের জন্য বহু জলাশয়, খাল ও কূপ খনিত হইয়াছিল। ইংরেজ আমলের শাসকশক্তির অবহেলায় উহাদের অধিকাংশই মজিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ইংরেজশাসনের শেষ দিকে অবশ্য পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য সেচকার্য ঘটে।

স্বাধীনতালাভের পর হইতে সরকারী সেচকার্যগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল সেচকার্যে ৫ কোটি টাকার অধিক ব্যয় হয় উহাদের বৃহৎসেচকার্য (major works), যে সকল সেচকার্যে ৫ কোটি হইতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় উহাদের মাঝারি সেচকার্য (medium works) ও যে সকল সেচকার্যে ১০ লক্ষ টাকার কম ব্যয় হয় উহাদের ক্ষুদ্র সেচকার্য (minor works) বলিয়া গণ্য করা হয়। সকল প্রকার সেচের উদ্দেশ্যই উৎপাদন বৃদ্ধি।

পরিকল্পনা কমিশনের মতে বাস্তবভাবে ৪৫ কোটি একরফিট জল সেচকার্যের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রায় ১২ কোটি একরফিট জল সেচকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে অতিরিক্ত আরও ৪ কোটি একরফিট জল ব্যবহার করা যাইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ ও মাঝারি সেচকার্যে মোট ১৪ শত কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা মোট ৩ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমি জল সিঞ্চিত হইবে। প্রথম পরিকল্পনার শেষে সকলপ্রকার সেচকার্যের দ্বারা মোট ৫ কোটি ৬২ লক্ষ একর জমি (১৯৫০-৫১ সালে জল সিঞ্চিত ভূমির পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর) ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট ৭ কোটি একর জমি জল সিঞ্চিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সেচকার্যে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে—ক. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে সকল সেচকার্যে হাত দেওয়া হইয়াছিল, কৃষিক্ষেত্র পর্যন্ত খাল খনন করিয়া ঐগুলি সম্পূর্ণ করা। খ. জল নিষ্কাশন ও জমিতে যাহাতে জল না আটকাইয়া যায় তজ্জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। গ. মাঝারি সেচকার্য সম্প্রসারিত করা। তৃতীয় পরিকল্পনায় সেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য ৬৬১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৯৭টি মাঝারি সেচকার্য ধরা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে নীট জল সিঞ্চিত জমির পরিমাণ ৯ কোটি একরে পরিণত হইবে। অর্থাৎ অতিরিক্ত আরও ২ কোটি একর জমিতে সেচ প্রবর্তিত হইবে।

কয়েকটি বহুউদ্দেশ্যবিশিষ্ট নদীপ্রকল্প
SOME RIVER VALLEY PROJECTS

নদীবাহিত বিপুল জলরাশি যেমন সেচকার্যের জন্য ব্যবহার করার সুযোগ ভারতে যথেষ্ট রহিয়াছে, তেমনি নদীনালাগুলি অন্যবিধ বহু উদ্দেশ্যেও দেশের সেবা করিতে সক্ষম। নদীশাসন ও খালখনন দ্বারা নিম্নলিখিত বহু উপকার একযোগে সাধিত হইতে পারে—১. সেচকার্য।

২. বন্যানিয়ন্ত্রণ। ৩. বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন। ৪. নৌপরিবহণ। ৫. কৃত্রিম জলাধারগুলিতে মৎস্যচাষ। এইগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি প্রত্যক্ষভাবে কৃষির সহায়ক। তৃতীয়টি শিল্পায়নের, চতুর্থটি আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের ও পঞ্চমটি দেশে মৎস্য চাহিদার পূরণের সহায়ক। একযোগে এতগুলি লক্ষ্য সাধিত হয় বলিয়া বৃহৎ নদীপ্রকল্পগুলিকে বহুউদ্দেশ্যবিশিষ্ট প্রকল্প বলা হয়। বলা বাহুল্য, এইগুলিতে যেমন অধিক পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন ও সমাপনে অধিক সময় লাগে, তেমনি নানাবিধ সুবিধা দ্বারা নানা দিকে ইহারা দেশের কৃষি ও শিল্পকে অগ্রসর করিয়া দেয়। কৃষি ও শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রবর্তনে ইহারা উপযোগী পরিবেশ রচনা করে। ভারতে আগামী ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে সেচের অধীনে জমির পরিমাণ দ্বিগুণ করাই পরিকল্পনাকমিশনের লক্ষ্য। এই জন্য প্রধানত বৃহৎ নদী প্রকল্পগুলির উপর নির্ভর করা হইয়াছে। সিঞ্চিত ভূমির পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে, শুধু যে বর্তমান খাদ্য ঘাটতি মিটিবে, তাহাই নহে, অধিকন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদাও মিটিয়া যাইবে।

অদ্যাবধি যে সকল বৃহৎ নদীপ্রকল্পের কার্য গৃহীত ও পরিচালিত হইয়াছে উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির আলোচনা করা যাইতেছে।

১ ভাকরা নাঙ্গাল প্রকল্প : ইহা ভারতের যাবতীয় নদী প্রকল্পগুলির মধ্যে বৃহত্তম। একটি ৭৪০ ফুট উচ্চ জলাধার মোট ৬৫২ মাইল দীর্ঘ খালসমূহ এবং ২৫ শত মাইলের অধিক শাখাখাল-সমন্বিত এই প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ১৭০ কোটি টাকা।

১৯৪৬ সালে ইহার কার্য আরম্ভ হয়। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে ইহার কাজ সমাধা হইয়াছে। প্রতি-বৎসর এই প্রকল্পের দ্বারা ৩৬ লক্ষ একরে জলসেচ ঘটিবে। ১১ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমিতে জল সেচের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ভাকরা জলাধারের দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও নাঙ্গালের দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে মোট ৬ লক্ষ ৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে।

২. হীরাকুদ প্রকল্প : ইহাতে মহানদীর জলরাশি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উড়িষ্যার সম্বলপুর ও বোলানগির জেলায় মোট ৫'৭ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ঘটিবে। মূল জলাধারে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে উহার উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ ২৩ হাজার কিলোওয়াট। হীরাকুদের মূল বাঁধটি মৃত্তিকা নির্মিত এবং পৃথিবীতে বৃহত্তম। ইহাদের দৈর্ঘ্য ১৫,৭৪৮ ফুট। প্রকল্পটির সংশোধিত ব্যয়ের পরিমাণ ৭০.৭৮ কোটি টাকা। বর্তমানে হীরাকুদের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে হীরাকুদের এলুমিনিয়াম কারখানায়, রাজগাঙ্গপুরের সিমেন্ট কারখানায়, রুরকেল্লার ইস্পাত কারখানায় জোড়ার ফেরো ম্যাঙ্গানিজ কারখানায়, বৃজরাজনগরের কাগজের কলে ও চৌদ্বারের বস্ত্রকল ও অন্যান্য শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। ইহা ছাড়া, কটক পুরী, সুন্দরগড়, সম্বলপুর ও বড়গড় প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে বিদ্যুৎ যোগান দেওয়া হইতেছে।

৩ রাজস্থান খাল প্রকল্প : রাজস্থানের উষর মরু অঞ্চল শস্যশ্যামল রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ১৯৫৭ সালের জুন মাসে ৬৬.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজস্থান খাল প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়। ইহা দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত।

ক রাজস্থান সরবরাহ খাল : ইহা ১৩৪ মাইল দীর্ঘ হইবে ও উহার মধ্যে ১১০ মাইল পড়িবে পাঞ্জাবের মধ্যে।

খ. রাজস্থান খাল : ইহা ২৯১ মাইল দীর্ঘ হইবে ও সম্পূর্ণ রাজস্থানের মধ্যে পড়িবে।

ইহাতে বিকানীর, জয়সলমীর ও শ্রীগঙ্গানগর জেলাগুলির মোট ১৬.৮৪ লক্ষ একর জমি জল সিঞ্চিত হইবে। তাহার ফলে ১৫.৬ কোটি টাকা মূল্যের ৫.৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের উৎপাদন ঘটিবে। বর্তমান পরিকল্পনাটির সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় যে ইহাতে মোট ৩৬'২৯ লক্ষ একরে প্রতি বৎসর জলসেচ সম্ভব হইবে।

৪ দামোদর উপত্যকা প্রকল্প : ইহাতে তিলাইয়া কোনার মাইথন ও পাঞ্চেত পাহাড় এই চারিটি স্থানে একটি করিয়া জলাধার বাঁধের ব্যবস্থা আছে। কোনার ব্যতীত অপর তিন স্থানেই একটি করিয়া তিনটি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। উহাদের মোট উৎপাদন হইবে ১ লক্ষ ৪ হাজার কিলোওয়াট। বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরাতে একটি করিয়া তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থাকিবে। উহাদের মোট উৎপাদন

হইবে ৬ লক্ষ ২৫ হাজার কিলোওয়াট। ইহা ছাড়া দুর্গাপুরে একটি সেচবাঁধ ও তৎসহ খাল ও শাখা-খাল থাকিবে। সংক্ষেপে ইহাই দামোদর প্রকল্পের মূল রূপরেখা। ইহার মধ্যে ১৯৫৩ সালে তিলাইয়া বাঁধ, ১৯৫৫ সালে কোনার বাঁধ এবং ১৯৫৭ সালে মাইথন বাঁধ সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫৯ সালে পাঞ্চেত পাহাড় বাঁধ সম্পূর্ণ হয়। বোকারো ও দুর্গাপুরের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পূর্ণ হইয়া উহাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে। চন্দ্রপুরাতে তৃতীয় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের কার্য আরম্ভ হইয়াছে। মাইথন ও পাঞ্চেতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন চলিতেছে। দুর্গাপুর বাঁধ হইতে প্রায় ১০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচন সম্ভব হইবে। উহার বাম তীরের ৮৫ মাইল দীর্ঘ খাল দ্বারা কলিকাতা হইতে রানীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে পরিবহণের বিকল্প ব্যবস্থা উন্মুক্ত হইয়াছে।

সার

MANURES & FERTILISERS

প্রয়োজনীয়তা (Need) : মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কতকগুলি খনিজ, জৈব ও রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্বের উপর জমির উর্বরতা নির্ভর করে। কৃষিকার্যের দ্বারা ফসলের উৎপাদনে মৃত্তিকার মধ্যে এই সকল পদার্থগুলির পরিমাণ কমিতে থাকে। ফলে জমির উর্বরতাও ধীরে ধীরে হ্রাস পায় (soil exhaustion)। এ কারণে কৃষিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে জমির উর্বরতা বজায় ও বৃদ্ধির জন্য জমিতে সার প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন ঘটে। আধুনিককালে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির দ্বারা কৃষির উৎপাদন বাড়াইবার জন্য সর্বদেশেই নানারূপ সার ব্যবহারের গুরুত্ব বর্ধিত হইয়াছে।

ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে কৃষিকর্ম প্রচলিত। অথচ তদনুপাতে জমির উর্বরতা বজায় রাখিবার জন্য উপযুক্ত সার ব্যবহারের অভাবে মৃত্তিকার উর্বরতা প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে। ইহা একর প্রতি ফলন হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতের জমি ফসফরাস, নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থে বিশেষ দরিদ্র। ভারতে বর্তমান খাদ্য ও কাঁচামাল ঘাটতির জন্য প্রগাঢ় কৃষির প্রবর্তন ও নূতন, পতিত জমিতে কৃষির প্রবর্তনের জন্য, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দ্বারা মোট কৃষিজ উৎপাদন ও কৃষকের আয় বৃদ্ধির জন্য সারের ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিভিন্ন প্রকারের সার (Different types of manures and fertilisers) : কৃষিকার্যের যে সকল প্রকারের সার ব্যবহারের প্রয়োজন তাহা হইল—১. খামার-গোহালের সার (farm yard manure বা পশুর মলমূত্রাদি। ২. মিশ্র সার বা আবর্জনা ও সবজির পচান সার। ৩. মনুষ্যবিষ্ঠা (night soil)। ৪. সবুজ সার বা লতাপাতার সার। ৫. খইল। ৬. রাসায়নিক সার। এবং ৭. প্রাণিজ সার।

১ খামার গোহালের সার : ইহার মধ্যে ভূমির প্রয়োজনীয় সকল খাদ্যই বর্তমান। ভারতে এই জাতীয় সারের ৪০ শতাংশ মাত্র ভূমিতে ব্যবহৃত হয়, ৪০ শতাংশ জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয় ও বাকী ২০ শতাংশ অপচিত হয়। গ্রামাঞ্চলে অন্যপ্রকার জ্বালানির অভাব গোবর সারের উপযুক্ত ব্যবহারের পথে প্রধান বাধা।

২. মিশ্র সার : আবর্জনা ও সবজি পচাইয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। উপযুক্ত পদ্ধতি শিক্ষা দিলে, ভারতে কৃষকগণ বাৎসরিক ৫ কোটি টন মিশ্র সার তৈয়ার করিতে পারে। ইদানীংকালে বিভিন্ন রাজ্যে ইহার প্রবর্তন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৩. মনুষ্যবিষ্ঠা : জমির উর্বরতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপায়। চীন ও জাপানে ইহার ব্যবহার সর্বাধিক। কিন্তু ভারতে ইহার বিরুদ্ধে প্রবল সংস্কার থাকায় ইহা ব্যবহৃত হয় না। অবশ্য ইহাকে সারে পরিণত করিতে হইলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন। ৮৩০টি বড় শহরে এই জাতীয় সার ব্যবহারের কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে।

৪. সবুজ সার : জমিতে জলীয় ও তৈল অংশ যোগাইতে সক্ষম। যেমন, মূল জাতীয় ফসল (root crops) প্রভৃতি জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। চীনাবাদাম, বীনসীম প্রভৃতি চাষ করিলে, ফসল তুলিবার পর উহাদের লতাপাতা, শিকড় জমিতে চষিয়া দিলেও উর্বরতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। এই জাতীয় সার ব্যবহার বৃদ্ধি ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য সরকার ইহাদের বীজ বণ্টন করিতেছেন।

৫. খইলের মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরিক এসিড ও পটাশ থাকায় সার হিসাবে ইহা উৎকৃষ্ট। ভারত তৈলবীজ রপ্তানি না করিয়া উহার তৈল নিষ্কাশন করিয়া রপ্তানি করিলে দেশে খইলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ফলে জমিতে ব্যবহারের জন্য সারের যোগান বৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারে।

৬. রাসায়নিক সার : উপরোক্ত বিবিধ প্রকার সার ব্যবহারে নানাকার অসুবিধা থাকায় ভারতে রাসায়নিক সারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাসায়নিক সার ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রাসায়নিক সার ব্যবহারে কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, জৈব সারের ন্যায় রাসায়নিক সার ফসলের সর্বপ্রকার পুষ্টিসাধন করে না। দ্বিতীয়ত, যথেষ্ট পরিমাণে জলসেচ না করিয়া শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহারে চারাগাছগুলি শুকাইয়া যায়। তৃতীয়ত, রাসায়নিক সার ব্যবহার করিতে হইলে, কোন্ জমিতে কোন্ ধরনের সারের প্রয়োজন, তাহা কি পরিমাণে প্রয়োগের প্রয়োজন এবং কোন্ সময়ে তাহা ব্যবহার ও কিভাবে তাহা ব্যবহার করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কৃষকগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে এসকল বিষয়ে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন রহিয়াছে। পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য দেশে রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এজন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাসায়নিক সার উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সারের প্রথম কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় বিহারের সিন্দ্রিতে। ১৯৫১ সালে ইহার উৎপাদন আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নাঙ্গাল, রুরকেলা ও নাইভেলীতে আরও তিনটি নূতন সারপ্রস্তুত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সারের কারখানাগুলির পরিচালনার জন্য ৭৫ কোটি টাকা পুঁজি লইয়া ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে The Fertiliser Corporation of India Ltd., নামে একটি সরকারী প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। পরিকল্পনার গত একদশকে নাইট্রোজেন জাতীয় সারের ব্যবহার ৩১৮ শতাংশ ও ফসফেট জাতীয় সারের ব্যবহার ৯০০ শতাংশ বাড়িয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আগামী পাঁচ বৎসরে উহাদের ব্যবহার ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় যথাক্রমে ৩৩৩ শতাংশ ও ৪৭১ শতাংশ বাড়িবে। রাসায়নিক সারের মূল্য বর্তমানে অধিক বলিয়া কৃষকগণ ইহা অধিক ব্যবহার করিতে পারিতেছে না।

৭ প্রাণীজ সার : পশুরক্তচূর্ণ, হাড়ের গুঁড়া ও দেহের অন্যান্য পচা অংশ সার হিসাবে উৎকৃষ্ট। ভারতে বৎসরে গড়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন হাড় সংগৃহীত হয়। ইহা বাৎসরিক মৃতপশুর হাড়ের এক-চতুর্থাংশ মাত্র।

নানারূপ সার ব্যবহার ছাড়াও, জমিতে ফসলের আবর্তন (crop rotation), কিছুদিন পর পর পরিকল্পিত ভাবে জমি ফেলিয়া রাখা প্রভৃতি উপায়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

বীজ

SEEDS

জমির ফলন বৃদ্ধি ও উৎকৃষ্ট ফসলের জন্য যেমন সেচ ও উপযুক্ত সার ব্যবহার করা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন উৎকৃষ্ট বীজের। ভারতে উৎপন্ন ফসল গুণে নিকৃষ্ট ও অধিকাংশক্ষেত্রেই উহাদের কোন নির্দিষ্ট মান নাই। ইহার ফলে ফসলের পরিমাণ যেমন কম হয়, তেমনি উহাদের জন্য উপযুক্ত দাম পাওয়া যায় না। সুনির্দিষ্ট মানের কৃষিজাত কাঁচামাল উৎপন্ন হয় না বলিয়া শিল্পের অসুবিধা হয়। বিশেষত রপ্তানি শিল্পের তৈয়ারী দ্রব্যগুলি বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় সুবিধা করিতে পারে না। এজন্য উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি কৃষির উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য। অনেকের মতে কেবলমাত্র উৎকৃষ্টতর বীজের ব্যবহারে ভারতের কৃষিজ উৎপাদন ১০ হইতে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা যায়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি এক্ষেত্রে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছে। সকল রাজ্যেই উৎকৃষ্ট বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে সমগ্র দেশে ৪ হাজার উৎকৃষ্ট বীজ উৎপাদক সরকারী খামার কার্যরত ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এরূপ খামারের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪৮০০।

কৃষিপদ্ধতি
AGRICULTURAL METHODS

অন্যান্য দেশে যে সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্যের দ্বারা বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে, ভারতেও ঐগুলি স্থানীয় উপযোগী সামঞ্জস্য বিধান করিয়া প্রবর্তনের প্রয়োজন রহিয়াছে। এসম্পর্কে বিশেষরূপে **জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষের** কথা উল্লেখ করা যায়। ভারতের স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যেখানে একর প্রতি মাত্র ১০৩ মন ধান উৎপন্ন হয়, সেক্ষেত্রে জাপানী পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয় ১২৯ মন। সুতরাং চাউল-নির্ভর ভারতবাসীর পক্ষে জাপানী পদ্ধতি গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রায় ২৩.৭৪ লক্ষ একর জমিতে জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষ প্রবর্তিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শেষে ৮০ লক্ষ একর জমিতে ইহা প্রবর্তনের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। ১৯৬১-৬২ সালে আত্যন্তিক কৃষি জেলা কার্যক্রম (Intensive Agricultural District Programme) নামে একটি নূতন কার্যক্রম প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল যে সকল অঞ্চলে সর্বাধিক সেচের সুবিধা ও কৃষির অসুবিধা সর্বাপেক্ষা কম, তথায় উৎপাদনের সুবিধাগুলির সর্বাধিক ব্যবহার করা। এজন্য মার্কিন ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আর্থিক সাহায্য করিতেছে। ইহা Package Deal নামেও পরিচিত। ইহাতে কৃষকগণকে দিয়া আধুনিক কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করাইবার জন্য ঋণ, বীজ, সার, কীটনাশকদ্রব্য ও কৃষিযন্ত্রাদি সরবরাহ করা হইতেছে। পাঁচবৎসর ধরিয়া এই কার্যক্রম চলিবে ও প্রথমে ৭টি ও পরে আরও ৫টি বাছাইকরা জেলাতে ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে।

ফসলের রোগ ও কীটপতঙ্গজনিত ক্ষতি
CROP DISEASES AND INSECTS

ভারতে বৎসরে মোট উৎপন্ন ফসলের আনুমানিক ১০ শতাংশ রোগ ও কীটপতঙ্গের আক্রমণে বিনষ্ট হয়। ইক্ষু, গম ও তুলার ক্ষেত্রে ইহা একটি প্রধান সমস্যা। এজন্য ব্যাপক গবেষণা কার্য পরিচালনা ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ফসল রক্ষার কার্যের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় ঐ কার্য চালাইয়া যাওয়া হইতেছে।

কৃষির যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রীকরণ
AGRICULTURAL EQUIPMENT AND MECHANISATION OF FARMING

কৃষির পুঁজির মধ্যে কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় সার, সেচ ও বীজ প্রভৃতিকে যদি আবর্তন পুঁজি (circulating capital) ধরা যায়, তবে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি স্থির পুঁজির (fixed capital) দৃষ্টান্ত। ভারতে কৃষকের পুঁজির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প।

যতই সেচ, বীজ ও সারের উন্নতি করা হউক, ইহার সহিত কৃষিযন্ত্রপাতির উন্নতি না ঘটাইলে এবং কৃষির যন্ত্রীকরণ না করিলে, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা ফলবতী হইবে না। সুতরাং ভারতের কৃষিযন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে আজ দুইটি বিষয়ে পরিবর্তন প্রয়োজন।

১. পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে স্থানোপযোগী উন্নত, আধুনিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও প্রবর্তন।

২ কৃষির যন্ত্রীকরণ। অর্থাৎ মনুষ্য ও পশুশ্রমনির্ভর বর্তমান কৃষির পরিবর্তে যন্ত্র বা শক্তিনির্ভর কৃষি প্রবর্তন।

১. **আধুনিক যন্ত্রপাতি (Modern equipment) :** কৃষিতে আধুনিক নানা প্রকার ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের যথেষ্ট সুযোগ-সম্ভাবনা বর্তমান। ইহা দ্বারা ভারতের পারিবারিক ভিত্তিতে পরিচালিত ক্ষুদ্র জোতগুলির ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিদপ্তর এজন্য নূতন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও গবেষণা কার্য চালাইতেছেন। পরিকল্পনা কমিশনও ইহাতে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সারা ভারত কৃষিমেলার মাধ্যমে উহাদের জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইতিমধ্যে নূতন ধরনের ইস্পাতের লাঙল, ইক্ষু পেষণের কল, জল তুলিবার জন্য ক্ষুদ্রাকার পাম্প, ছোট ঠেলাগাড়ি (barrows), নিড়ানি ইত্যাদি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

২. **কৃষির যন্ত্রীকরণ (Mechanisation of agriculture) :** মনুষ্য ও পশুশক্তির পরিবর্তে বা সহায়ক হিসাবে যন্ত্রশক্তির ব্যবহারকেই যন্ত্রীকরণ বলা যায়। সুতরাং কৃষির যন্ত্রীকরণ বলিলে, কৃষিকার্যে মনুষ্য ও পশুশক্তির পরিবর্তে বা সহায়ক হিসাবে যন্ত্রশক্তির প্রবর্তন বুঝায়। কৃষির যন্ত্রীকরণ দ্বারা পুঁজিনির্ভর কৃষিকার্য প্রচলিত হয়। যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত যেমন শিল্পক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন অসম্ভব, তেমনি কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও কৃষির যন্ত্রীকরণ আবশ্যক।

যন্ত্রীকরণের প্রকারভেদ (Types of mechanisation) : কৃষির যন্ত্রীকরণ দুই প্রকার। পূর্ণযন্ত্রীকরণ ও আংশিক যন্ত্রীকরণ। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমের স্বল্পতার দরুন কৃষিতে পূর্ণ যন্ত্রীকরণ ঘটিয়াছে। সোভিয়েত দেশেও পূর্ণ যন্ত্রীকরণ প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারত সহ অন্যান্য সকল দেশেই কমবেশি পরিমাণে কৃষির আংশিক যন্ত্রীকরণ বর্তমান। তবে, যে দেশ যত অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত তথায় কৃষিকার্যে তত বেশি মনুষ্য ও পশুশক্তির উপর নির্ভরশীলতা এবং তত অল্প যন্ত্রীকরণ দেখা যায়। কৃষির পূর্ণ যন্ত্রীকরণের দ্বারা শুধুমাত্র ভূমিকর্ষণ, ফসল কাটা ও সংগ্রহ, ফসলের ঝাড়াই মাড়াই কার্য সম্পাদন করা বুঝায় না। অন্যান্য যাবতীয় কার্যেও যন্ত্রের ব্যবহার বুঝায়।

যন্ত্রীকরণের সুফল (Advantages) : যন্ত্রীকরণের সুফল ও প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল।

১. কৃষির যন্ত্রীকরণ কৃষিশ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ফলে কৃষকগণের মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষির মোট উৎপাদন বাড়ে। ২. কৃষিকার্যে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য, কৃষির বিভিন্ন কার্য দ্রুত সম্পাদন করা সম্ভব হয়। ৩. কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক কৃষকের প্রয়োজন হয়। ৪. কৃষির যন্ত্রীকরণের দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে ভূমি কর্ষিত হয় বলিয়া জমির একর প্রতি ফলন বাড়ে। ৫. শ্রমিকের দক্ষতা ও জমির ফলন বৃদ্ধির দরুন উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। ৬. সামগ্রিকভাবে কৃষির অপচয় হ্রাস ও উন্নতি ঘটে। ইহাতে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। ৭. কৃষির যন্ত্রীকরণের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় বলিয়া কৃষকের নিজ ভোগের অতিরিক্ত বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসল থাকে। এইরূপে প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষির পরিবর্তে বাজারনির্ভর কৃষির উদ্ভব ঘটে। কৃষির বাণিজ্যিকরণ (commercialisation of agriculture) ঘটে। ফলে বাজারে কৃষিজাত দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পায়। ৮. কৃষকের আয় বাড়ে এবং শহর ও শিল্পাঞ্চলের আয়ের সহিত গ্রামাঞ্চলের আয়ের সামঞ্জস্য ঘটে। সারা দেশে উৎপাদনের দুইটি প্রধান ক্ষেত্রে শিল্প ও কৃষির মধ্যে মাথাপিছু আয় ও মোট আয় বণ্টনে অধিকতর সমতা দেখা যায়। ৯. শিল্পের মত কৃষিকার্যেও বিশেষায়ণ বৃদ্ধি পায়। তাহাতে গ্রামাঞ্চলে কৃষি-যন্ত্রপাতি চালনা প্রভৃতিকে নির্ভর করিয়া নূতন জীবিকার সৃষ্টি হয়। ১০. যন্ত্রপাতি পরিচালনা

[illegible] কৃষক [illegible] করে। [illegible]

[illegible] চাপ হ্রাস পায়। ১১. সর্বোপরি ইহাতে গ্রামীণ [illegible]। কৃষির যন্ত্রীকরণ কৃষকের উপর হইতে কায়িক শ্রমের কঠোর বোঝা কমাইয়া [illegible] বাড়াইয়া দেয়। আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া তাহাকে নূতন সামাজিক [illegible] মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। গ্রামীণ সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ়তর হয়।

কৃষির যন্ত্রীকরণের সাফল্যের শর্ত (conditions for its success): ১. [illegible] যন্ত্রপাতিগুলি চালনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খনিজ তৈলের (ডিজেল তৈল) ও বিদ্যুতের সরবরাহ প্রয়োজন। ২. সেচকার্যের ব্যাপক সম্প্রসারণ আবশ্যক। ৩. কৃষিজোতের আয়তন বৃহত্তর হওয়া প্রয়োজন। ৪. কৃষকগণের মধ্যে আধুনিক কৃষিযন্ত্রপাতি চালনার উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার অর্থাৎ, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি আবশ্যক। ৫. কৃষির প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির চাহিদাপূরণে সমর্থ কৃষিযন্ত্র-উৎপাদনশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

কৃষির যন্ত্রীকরণের অসুবিধা (difficulties): উপরোক্ত বিষয়গুলির অভাবে কৃষির যন্ত্রীকরণের অসুবিধা বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু উপরোক্ত অনুকূল অবস্থা বর্তমান থাকিলেও ইহার প্রবর্তনে যে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয় তাহা হইল কর্মহীনতা। কৃষিকার্যে যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে শিল্পের মত এক্ষেত্রেও উৎপাদন পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার (rationalisation) ঘটে। এইরূপ সংস্কারের ফলে উৎপাদনক্ষেত্রে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। সুতরাং কৃষির যন্ত্রীকরণ দ্বারা বহুসংখ্যক কৃষক কর্মচ্যুত হইবে। কৃষির যন্ত্রীকরণের ফলে যে হারে কৃষকগণ কর্মচ্যুত হইবে, সে হারে অন্যত্র তাহাদের কর্মসংস্থান করিতে না পারিলে, নূতন জটিলতার সৃষ্টি হইবে।

ভারতে কৃষির যন্ত্রীকরণের বাঞ্ছনীয়তা (desirability of mechanisation of agriculture in India): ভারতে কৃষির যন্ত্রীকরণ বাঞ্ছনীয় কি না এ প্রশ্ন গত দুই দশক ধরিয়া আলোচিত হইতেছে। কৃষির যন্ত্রীকরণের ফলে যে সুবিধাগুলি লভ্য তাহা নিঃসন্দেহে ভারতের পক্ষে শুধু কাম্য নহে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য। বিশেষত, ইহার ফলে—১. নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের দ্বারা কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতির সুযোগ ঘটিবে। ২. উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা বর্তমান খাদ্যঘাটতি পূরণ করা যাইবে। ৩. পুঁজির স্বল্পতা ভারতে কৃষিতে পাপচক্র সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙিবার জন্য কৃষিতে পুঁজির ব্যবহার বাড়াইতে হইবে। কৃষির যন্ত্রীকরণের দ্বারাই কৃষিকার্যে পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব। সুতরাং কৃষির যন্ত্রীকরণ ভারতের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হিসাবে নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু আশু ইহার পথে কতকগুলি বিঘ্ন বর্তমান। ১. ইহার সাফল্যের জন্য যে সকল অনুকূল অবস্থা প্রয়োজন, যেমন দেশের অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি ও খনিজ তৈলের সরবরাহ, প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও ব্যাপক সেচকার্য, ইত্যাদি বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে নাই। ইহাদের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। ২. দেশের মধ্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্প এখনও উপযুক্ত পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় অত্যধিক ব্যয়ে কৃষিযন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইলে যে বিদেশী মুদ্রা প্রয়োজন, তাহা ভারতের আয়ত্তের বাহিরে। ৩. ভারতের কৃষিজোতের আয়তন বর্তমানে এত ক্ষুদ্র যে তাহাতে কৃষির যন্ত্রীকরণ সফল হইবে না। ব্যক্তিগত[illegible] উহাদের মূল্য সাধারণ কৃষকের ক্ষমতার বাহিরে। ৪. প্রত্যক্ষভোগনির্ভর কৃষি এখনও [illegible] যন্ত্রীকরণের অন্তরায়। ৫. গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে [illegible] যথেষ্ট [illegible]

[illegible]র যন্ত্রীকরণের দ্বারা ইহার ব্যাপকতা আরও বাড়িবে। অনেকের [illegible]
[illegible]যন্ত্রীকরণের দ্বারা ৬০ শতাংশ কৃষিনির্ভর জনসাধারণ কর্মহীন হইয়া পড়িবে।
শিল্পপ্রসারণের গতি যথেষ্ট দ্রুত নহে বলিয়া অবিলম্বে ইহাদের কর্মসংস্থানের
করা যাইবে না। সুতরাং অবিলম্বে দ্রুত কৃষির যন্ত্রীকরণ বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু যাহাতে
দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে ইহা কার্যকর করা যায় এজন্য ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে
হইবে। বর্তমানে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির দ্বারা দেশে সেচ, সার, বীজ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন
বৃদ্ধি, যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্প প্রতিষ্ঠা, কৃষিতে ছোটখাটো আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তন, অন্যান্য
শিল্পের প্রসার, কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ও জমির সংবদ্ধকরণ এবং সমবায় কৃষির প্রবর্তনের
মাধ্যমে ভবিষ্যতে কৃষির যন্ত্রীকরণের উপযোগী পরিবেশ ধীরে ধীরে রচিত হইতেছে।

রাজস্থানের সুরতগড়ে সোভিয়েত যন্ত্রপাতির সাহায্যে সরকারী খামারে কৃষির সম্পূর্ণ
যন্ত্রীকরণের পরীক্ষা চলিতেছে। ইহার সাফল্য দেখিয়া সোভিয়েত কৃষিবিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন,
ভারতে ১০০টি সুরতগড়ের ন্যায় খামার প্রতিষ্ঠা দ্বারা খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব।

৪

কৃষিকার্যের সংগঠন
Organisation of Agriculture

ভারতের কৃষি উন্নয়নের পটভূমিকায় কৃষিসংস্কার দ্বারা কৃষিকার্যে কৃষকের উৎসাহবৃদ্ধি এবং কৃষিতে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও পুঁজি বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তনের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন কৃষিকার্য পরিচালনার সাংগঠনিক পরিবর্তনের। প্রথমটির দ্বারা কৃষিকার্যে অকুণ্ঠ মানবিক শ্রমের উৎস উন্মুক্ত হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকের দ্বিধাহীন সহযোগিতা সুনিশ্চিত হইবে। দ্বিতীয়টির দ্বারা জমি, অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, বিজ্ঞান ও মানবিক শ্রমের অধিকতর ব্যবহার সম্ভব হইবে। কিন্তু তৃতীয় ব্যতীত প্রথম ও দ্বিতীয়টির পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব নহে।

ভারতের কৃষিকার্য পারিবারিক ভিত্তিতে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। কৃষকপরিবারগুলির পারিবারিক শ্রম ও আর্থিক সামর্থ্যদ্বারা কৃষিকার্যে শ্রম ও পুঁজির যোগান সাধারণত সীমাবদ্ধ। পারিবারিক ক্ষেত্রের মধ্যেই এই কৃষিকার্যপ্রচেষ্টা গণ্ডীবদ্ধ। এই জাতীয় সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল ও কৃষির উন্নয়নের একান্ত অনুপযোগী।

কৃষি সংস্কার দ্বারা জমিতে কৃষকপ্রজার মালিকানা প্রবর্তন এবং কৃষিযন্ত্রপাতির উন্নতি ও অধিকতর সেচ, উৎকৃষ্ট সার ও বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করিলেও, কৃষির যন্ত্রীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত সত্ত্বেও জোতের আয়তন যদি পরিবর্তিত না হয়, কৃষিকার্য পরিচালনার সংগঠনে যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে তবে ক্ষুদ্র জোতের দ্বারা সেচ, সার, বীজ ও যন্ত্রপাতিজনিত উন্নতির সুযোগ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যাইবে না। কৃষি সংগঠনের পুনর্গঠন বলিতে জোতের এবং কৃষিকার্য পরিচালনা সংগঠনের পুনর্গঠন বুঝায়। ইহা ভারতের কৃষি-অর্থনীতির উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য শর্ত।

কৃষিজোতের আয়তন ও অবস্থান
SIZE AND LOCATION OF HOLDINGS

ভারত ক্ষুদ্রচাষীর দেশ। কৃষিমজুর তদন্ত কমিটির রিপোর্ট (১৯৫০) অনুযায়ী ভারতের কৃষিজোতের গড় আয়তন ৭.৫ একর। তুলনায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪৫ একর, জার্মেনীতে ২১ একর, ইংলণ্ডে ২০ একর। এখানে কৃষিজোতের গড় আয়তন ৭.৫ একর হইলেও অনেক অঞ্চল ও রাজ্যে জোতের গড় আয়তন ইহা অপেক্ষা অনেক অল্প (ত্রিবাঙ্কুর কোচিনে উহা মাত্র ২.৪ একর, জম্মু ও কাশ্মীরে ৩.৮ একর, বিহারে ৪.১ একর, পশ্চিমবঙ্গে ৪.৭ একর, মাদ্রাজে ৪.৫ একর ও আসামে ৫.৩ একর। শুধু বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ পঞ্জাবের পেপসু (PEPSU) অঞ্চল, রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্রের জোতের গড় আয়তন সারা ভারতের গড় অপেক্ষা অধিক। ইহার মধ্যে সৌরাষ্ট্রে জোতের গড় আয়তনই সর্বাধিক, ২৯.৬ একর)। সারা ভারতের সামগ্রিক চিত্র এই যে, দেশের প্রায় অর্ধেক কৃষক পরিবারের জোতের আয়তন ২.৫ একর অপেক্ষা অল্প। শুধু তাহাই নহে, প্রতি কৃষক-পরিবারের সমগ্র জোত গ্রামের একস্থানে একত্রে অবস্থিত নহে। উহা খণ্ডে খণ্ডে, বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তরূপে অবস্থিত। কৃষকপরিবারের জোতজমি উত্তরাধিকার আইন ও অন্যান্য কারণে দীর্ঘকাল ধরিয়া বাটোয়ারার ফলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। জোতের এই উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণের ফলে কৃষিজোতের আয়তনের ক্রম-অবনতি ভারতের কৃষির একটি গঠনবৈশিষ্ট্য এবং উহার উন্নয়নের [illegible]।

[illegible]জোতের উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণ
[illegible] AND FRAGMENTATION OF HOLDINGS

জোতের উপবিভাজন বলিতে উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে জোতজমির ক্রমান্বয় বণ্টন ও বিভক্তিকরণ বুঝায়। আর বিক্ষিপ্তকরণ বলিতে একই কৃষকের মালিকানাভুক্ত জমির বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিতি বুঝায়।

কারণ (Causes): ১. গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ফলে জমির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি অর্থাৎ জমির উপর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ ইহার প্রধান কারণ। ২. উত্তরাধিকারের প্রচলিত আইন ইহার অন্যতম কারণ। যেমন, কোন কৃষকের মৃত্যুর পর তিনটি পৃথক স্থানে অবস্থিত তাহার তিন খণ্ড জমি তাহার তিন পুত্রের মধ্যে সরাসরি বিভক্ত না হইয়া, অর্থাৎ প্রত্যেকে এক এক খণ্ডের মালিকানা না লইয়া, প্রত্যেক খণ্ডকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া লয়। ইহাতে ঐ তিনখণ্ড নয়খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। স্বভাবতই তাহাতে তিন উত্তরাধিকারীর প্রত্যেকের জমি তিনটি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র জোতে পরিণত হইয়া তিনটি পৃথক অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ বাঁটোয়ারার ফলে কৃষিজমির আয়তন ক্রমেই ক্ষুদ্রতর ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ৩. গ্রামাঞ্চলে অন্যান্য জীবিকার অভাব জমির উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণকে তীব্রতর করিয়াছে। অন্য কোনরূপে জীবনধারণে অক্ষম হওয়ায়, জোত যত ক্ষুদ্রই হউক এবং যত বিক্ষিপ্তরূপেই তাহা বর্তমান থাকুক না কেন, কৃষকগণ কখনই জমি বাঁটোয়ারার দাবি ছাড়িতে পারে না। ৪. গ্রাম্য মহাজনদের প্রবল গ্রাস উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণের সমস্যা বৃদ্ধি করিয়াছে। কৃষকগণ ঋণশোধে অক্ষম হইয়া মহাজনদের নিকট জোতজমি হস্তান্তর করিয়া দেয়। ফলে তাহাদের অধীনস্থ জোতজমির পরিমাণ ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। এজন্য পরিবারের কর্তার মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানসন্ততির মধ্যে অবশিষ্ট সামান্য জোতজমি ক্রমেই ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ৫. একান্নবর্তী পরিবারগুলির ভাঙনের ফলে এজমালি সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার দরুন জমির উপবিভাজন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কুফল (Evils): ইহার ফলে জোতের আয়তন এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছে যে তাহা আর লাভজনক ভাবে চাষ করা যায় না (uneconomic holdings)। ফলে কৃষকগণের আয় হ্রাস ও দেনা বৃদ্ধি পাইতেছে। দেনার ফলে জমি মহাজনের নিকট হস্তান্তর করিতে বাধ্য হইয়া কৃষকগণ ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন হইয়া পড়িতেছে। খণ্ড খণ্ড জমির মধ্যে বেড়া দেওয়ার জন্য আলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক জোত এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িতেছে যে আর চাষ করা চলে না বলিয়া উহা পতিত থাকিয়া যাইতেছে। ইহাতে জমির অপচয় বাড়িতেছে। ক্ষুদ্র জোতের দরুন আয় অল্প হওয়ায় যেমন কৃষকগণ আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে অক্ষম, তেমনি জোতগুলি ছোট বলিয়া ঐ সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহারেরও যথেষ্ট অসুবিধা হয়। বিভিন্ন কৃষকের জমি পাশাপাশি এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বলিয়া কাহারো পক্ষেই নিজ নিজ জমি হইতে জল নিকাশনের কিংবা সেচের নহর কাটার সুবিধা নাই। ফলে জমির অবনতি ঘটে। এই সকল অসুবিধার দরুন সামগ্রিকভাবে কৃষিকার্যে ভারতীয় কৃষকগণের দক্ষতা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার উপরে আবার এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির বিক্ষিপ্ত অবস্থান, গ্রামাঞ্চলে [illegible] ঘন ঘন মামলা-মোকদ্দমার একটি প্রধান কারণ [illegible]।

[illegible] উপখণ্ডীকরণ ও বিক্ষিপ্তকরণ জমির অপচয় বৃদ্ধি, জলসেচের ও চাষের নিয়ন্ত্রকতা, জমিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে অর্থাৎ অধিক পুঁজি বিনিয়োগে অন্তরায়, সেচের উন্নতিতে বাধা ও কৃষির দক্ষতা হ্রাস, গ্রাম্যজনসাধারণের মধ্যে ঋণ, দারিদ্র্য, মামলাবাজি এবং কলহ বৃদ্ধি করিয়া ভারতের কৃষিকার্যকে এক অনড়, অচলায়তনের দুর্গে পরিণত করিয়াছে।

অর্থনীতিক জোত

ICONOMIC HOLDING

ভারতের কৃষিজোতের স্বল্পায়তনের দরুন স্বভাবতই কৃষকের ব্যয়ের সংকুলান হয় না। অন্যান্য জীবিকার অভাব ও প্রত্যক্ষভোগের উদ্দেশ্যে কৃষিকার্য চলিতেছে বলিয়াই এরূপ লাভহীন কৃষিজোত ও কৃষিকার্য বজায় রহিয়াছে। কিন্তু কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে ইহার পরিবর্তে অর্থনীতিক জোত প্রবর্তিত হওয়া আবশ্যক।

সংজ্ঞা (Definition) : মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, যে আয়তনের জোত হইলে তাহাতে কৃষকপরিবারের উপযুক্ত ধারাবাহিক কর্মসংস্থান ঘটিতে পারে, এবং যাহা হইতে কৃষক পরিবারের যুক্তিসঙ্গত আয় লাভ দ্বারা জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটিতে পারে, তাহাই 'অর্থনীতিক জোত'। কিন্তু স্থানকাল অনুসারে ইহার আয়তন স্বভাবতই বিভিন্নরূপ হইবে। কৃষকপরিবারের অর্থনীতিক জোতের আয়তন কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

১. **মৃত্তিকার উর্বরতা :** অধিক উর্বর মৃত্তিকায় জোতের আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অপেক্ষাকৃত অল্প উর্বর মৃত্তিকায় জোতের আয়তন বৃহৎ হইবে।

২. **উৎপন্ন ফসলের প্রকৃতি :** খাদ্যশস্য অথবা বাণিজ্য-ফসলের উৎপাদনে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর জোত প্রয়োজন। শাকসবজির চাষের জন্য ক্ষুদ্রাকার জোত আবশ্যক।

৩. **কৃষিপদ্ধতি :** পুরাতন পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র কৃষিযন্ত্রপাতির দ্বারা চাষে অপেক্ষাকৃত স্বল্পাকার জোতে কৃষিকার্য চলিতে পারে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা, অর্থাৎ কৃষির যন্ত্রীকরণ ঘটিলে অর্থনীতিক জোতের আয়তন বৃহৎ হওয়া আবশ্যক।

৪. **কৃষকপরিবারের আয়তন :** কৃষকপরিবারের লোকসংখ্যা, এবং উহার আর্থিক সামর্থ্য অর্থাৎ পুঁজির উপরও পারিবারিক অর্থনীতিক জোতের আয়তন নির্ভর করে।

৫. **কৃষিকার্যের সংগঠন :** ব্যক্তিগত উদ্যোগে, পারিবারিক ভিত্তিতে কৃষিকার্য চালিত হইলে, কৃষিজোতের অর্থনীতিক আয়তন স্বল্প হইলে চলে। কিন্তু আধুনিক পুঁজিবাদী প্রথায় বা সমবায় কিংবা যৌথ ব্যবস্থায় কৃষিকার্য পরিচালিত হইলে, অর্থাৎ কৃষি সংগঠন অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হইলে, অর্থনীতিক জোতের আয়তনও বৃহত্তর হইবে।

সুতরাং অর্থনীতিক জোত বলিতে কোন নির্দিষ্ট আয়তনের জোত বুঝায় না। মৃত্তিকা, জলবায়ু, ফসলের প্রকৃতি, কৃষির পদ্ধতি, কৃষকপরিবারের লোকসংখ্যা ও সামর্থ্য, কৃষি পরিচালনার সংগঠন ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের উপর উহার আয়তন নির্ভর করে। ভারতের ক্ষেত্রেও ইহার প্রবর্তন করিতে হইলে, বিভিন্ন রাজ্যে ও রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনীতিক জোতের আয়তন বিভিন্ন প্রকার হইবে। এবং ইহা করিতে হইলে জোতের আয়তন বাড়াইতে হইবে, বৃহত্তর জোতের প্রবর্তন করিতে হইবে। জোতের অর্থনীতিক আয়তন [illegible] করিয়া, প্রতি কৃষকপরিবারের জন্য অর্থনীতিক জোতের ব্যবস্থা করা যাইবে না। [illegible] তুলনায় কৃষকের সংখ্যা অধিক। [illegible]

[illegible] ভিত্তিতে অর্থনৈতিক জোতের প্রবর্তন ও উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণ দূর হইবে।

উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণ সমস্যার প্রতিকার
REMEDIES

কৃষিজোতের উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রধানত দুই প্রকার ব্যবস্থাগ্রহণ আবশ্যক। প্রথমত, বহুখণ্ডে বিভক্ত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জোতগুলির একত্রীকরণ বা সংবদ্ধকরণ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, একত্রীভূত জোতগুলি যাহাতে পুনরায় বিভক্ত না হইতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ আবশ্যক।

১. **জোতের সংবদ্ধকরণ (Consolidation of holdings):** ইহাতে প্রত্যেক কৃষকের জোতজমির এক স্থানে একখণ্ডে পরিণতকরণ বুঝায়। ইহার জন্য পরস্পরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত জোতের বিনিময় করিবার প্রয়োজন ঘটে। ১৯২১ সাল হইতে পাঞ্জাবে এই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। তৎপর বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে ইহা অনুসরণ করা হয়। সেই সময় বিভিন্ন প্রদেশে এইজন্য প্রয়োজনীয় আইন পাস করা হয়। জমির প্রথমে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে সংবদ্ধকরণের ব্যবস্থা করা হয়। সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে সংবদ্ধকরণের উৎসাহ দেওয়া হয়। ইহা ফলপ্রদ না হওয়ায় পরবর্তীকালে আইনে আংশিক বাধ্যতামূলকভাবে সংবদ্ধকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু পাঞ্জাব ছাড়া ভারতের আর কোথাও জোতের সংবদ্ধকরণের উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায় নাই।

সম্পূর্ণ বা আংশিক স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে জোতের সংবদ্ধকরণের চেষ্টা ভারতে সন্তোষজনক হয় নাই বলিয়া আরও শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মত জমির জাতীয়করণ দ্বারা যৌথ খামার (Collective Farming) প্রবর্তন করা যাইতে পারে। তবে অনেকে মনে করেন জমির প্রতি কৃষকদের প্রবল আকর্ষণ রহিয়াছে বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। সে কারণে জমিতে কৃষকের মালিকানা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সমবায় খামার (Cooperative Farming) কিংবা কৃষিকার্যে যৌথ ব্যবস্থাপনার নীতি (Principle of joint management) গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাই ভারত সরকারের নীতি।

২. **সংবদ্ধ বা একত্রীভূত জোতের সংরক্ষণ (Preservation of consolidation):** ভবিষ্যতে যাহাতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বাটোয়ারা দ্বারা সংবদ্ধ জোত পুনরায় বিভক্ত হইতে না পারে সেজন্য উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহার পথে বিস্তর অসুবিধা রহিয়াছে। শিল্প সম্প্রসারণ দ্বারা অন্যক্ষেত্রে জীবিকার সংস্থান করিতে না পারিলে জমির জন্য ভাগীদারদের দাবির প্রবলতা কমিবে না।

তবে, এ ক্ষেত্রে সমবায় কৃষি কিংবা গ্রামের সমস্ত জোতজমির যৌথ ব্যবস্থাপনাই স্থায়ী প্রতিবিধান বলিয়া মনে হয়। কারণ উহাতে মালিকানার অংশীদার বৃদ্ধি পাইলেও জোতজমির বিভাজন চলিবে না। ফলে ভবিষ্যতে পুনরায় এই সমস্যার আবির্ভাবের আশঙ্কা থাকে না। ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতে সরকার নীতিগতভাবে এজন্য সমবায় কৃষি এবং জোতের যৌথ ব্যবস্থাপনার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ একর জমি সংবদ্ধ করা হইয়াছে, তৃতীয় [illegible] আরও জমি সংবদ্ধ করার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে।

শিল্পক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে পুঁজি বিনিয়োগে, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতির দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন-বৃদ্ধি ঘটে, উৎপাদনের ব্যয় কমে, শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বাড়ে। সেজন্য ভারতসহ সকল অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশে কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং কৃষিকার্যের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য, ক্ষুদ্র কৃষিজোতের পরিবর্তে বৃহদায়তন কৃষি প্রবর্তন করা একান্ত আবশ্যক। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত এই সকল দেশে জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। কৃষির ফলন বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং বৈচিত্র্যসাধনের দ্বারা ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে এই সকল দেশে ক্ষুদ্রায়তন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপারগ। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত যেসকল পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা এসকল দেশে চলিতেছে যথা, সেচকার্যের প্রসার, উৎকৃষ্ট বীজ ও সার সরবরাহ, উন্নত ধরনের কৃষিযন্ত্রপাতি ব্যবহার ও কৃষির যন্ত্রীকরণ ইত্যাদি, তাহা ক্ষুদ্র পারিবারিক জোতের ভিত্তিতে পরিচালিত কৃষিতে বিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে না। পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে উহার সহিত সংগতি রাখিয়া জোতের আয়তন বৃদ্ধি এবং কৃষিকার্যের সংগঠনের উপযুক্ত সম্প্রসারণ চাই। এক কথায় কৃষিতে স্বল্পায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে বৃহদায়তন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা চাই এবং পুরাতন পারিবারিক সংগঠনের পরিবর্তে নূতন বৃহত্তর সংগঠন চাই। এই ব্যবস্থার দ্বারা একদিকে যেমন জমির উপবিভাজন ও বিক্ষিপ্তকরণ সমস্যার স্থায়ী সমাধান ঘটিবে, তেমনি জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ (ceiling on land holdings) ও কৃষিসংস্কার দ্বারা কৃষকপ্রজাদের জমির মালিকানা প্রদানের ফলে নূতন করিয়া ক্ষুদ্রায়তন কৃষির বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা আছে তাহাও দূর হইবে।

বৃহদায়তন কৃষির প্রকারভেদ (Types of large scale farming) : বৃহদায়তন কৃষি সংগঠন চারি প্রকারের হইতে পারে যথা—

১. কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন পুঁজিবাদী কৃষিকার্য (capitalistic farming)।

২. সোভিয়েত দেশের মত যৌথ খামার (collective farming)।

৩. সমবায় কৃষি বা খামার (cooperative farming)।

৪. সমবায় গ্রাম ব্যবস্থাপনা (cooperative village management)।

১. ব্যক্তিগত মালিকানায় পুঁজিবাদী কৃষিকার্য (Capitalistic farming) : শিল্পের মত কৃষিকার্যেও ব্যক্তিগত মালিকানা, পরিচালনা ও উদ্যোগে, এক-সঙ্গে অধিক পরিমাণ জমি লইয়া ব্যক্তিগত পুঁজি ও ঋণের সাহায্যে ধনী কৃষকগণ বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা চালাইতে পারে। তবে সাধারণত যে সকল দেশে লোকসংখ্যা অল্প ও জমির পরিমাণ অধিক এবং ক্ষুদ্র চাষীর সমস্যা নাই তথায় ইহার সুবিধা রহিয়াছে। কিন্তু শিল্পে যেমন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মারাত্মক কুফল দেখা যায় কৃষিক্ষেত্রেও ইহা প্রবর্তিত হইলে সেরূপ বিষময় ফল ফলিতে পারে। ইহাতে গ্রামাঞ্চলে ধন ও আয়বৈষম্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। [illegible] [illegible] দেশে অসংখ্য কৃষক জমি হইতে বিতাড়িত হইবে। গ্রাম্য কর্মহীনতা [illegible] [illegible] উঠিবে। সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত্তি দুর্বল হইবে। অতএব ইহা [illegible]

তান্ত্রিক সমাজগঠনের লক্ষ্যের বিরোধী এবং দেশের পক্ষে অকল্যাণকর। [illegible] ইহা গ্রহণযোগ্য নহে।

২. **যৌথ খামার (Collective Farming):** সোভিয়েত দেশে বিপ্লবের পর তথাকার জোতের ক্ষুদ্রায়তন, কৃষকের দারিদ্র, কৃষিযন্ত্রপাতির স্বল্পতা, জমির উপবিভাজন ইত্যাদি সমস্যা দূর করিয়া কৃষির সমৃদ্ধির জন্য যৌথ খামার প্রবর্তিত হয়। ইহার দ্বারা তথায় ক্ষুদ্রায়তন কৃষির স্থলে বৃহদায়তন কৃষির প্রতিষ্ঠা হয়। যৌথ খামার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইতেছে, কৃষকগণের জমি ও যন্ত্রপাতি একত্রিত করিয়া একীভূত বিশাল জোতে কৃষিকার্য করা হয়। ইহাতে যোগদান করিলে কৃষকেরা আর ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না এবং জমি ফিরিয়া পায় না। চিরতরে তাহাদের জমি একত্রিত হইয়া যায়। ভারতের কৃষকগণের মধ্যে জমির ক্ষুধা প্রবল এবং জমির ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ এত গভীর যে বর্তমান মুহূর্তে এই জাতীয় ব্যবস্থার প্রস্তাব তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে বলিয়া অনেকে মনে করেন না।

৩. **সমবায় খামার (Cooperative Farming):** সমবায় খামার বলিতে এমন একটি কৃষি পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা সংগঠন বুঝায় যাহাতে একত্রিত জমিতে সকলে মিলিয়া চাষ করিলেও জমির উপর সভ্যগণের ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকে। কৃষিকার্যের দ্বারা লব্ধ মোট আয় হইতে খরচ বাদে যে মুনাফা বা নীট আয় হয় তাহা সকল সভ্যগণের মধ্যে তাহাদের জমির অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

বৈশিষ্ট্য (Features) সমবায় কৃষি নানা প্রকারের হইতে পারে। মোটামুটিভাবে এই প্রকার কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে,—১. কৃষকগণের সকলের জমি একত্রিত করিয়া একটি বৃহৎ জোতে পরিণত করা হয়। ২. কৃষকগণের জমির মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকে। ৩. একত্রিত জমিতে কৃষিকার্যের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা (management) যৌথ বা যুক্তভাবে করা হয়। ৪. সভ্যগণ তাহাদের পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিক পায়। ৫. মোট আয় হইতে কৃষিকার্যের খরচ ও সঞ্চয় তহবিলের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ কাটিয়া লইয়া নীট আয় সভ্যগণের মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ জমির অনুপাতে বণ্টন করা হয়।

সোভিয়েত দেশে, পূর্ব ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ও ইস্রায়েলে সমবায় কৃষি বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে।

বিভিন্ন প্রকারের সমবায় কৃষি
DIFFERENT KINDS OF COOPERATIVE FARMING

চার প্রকার সমবায় কৃষি সমিতি দেখা যায়। যথা, সমবায় উন্নততর খামার সমিতি, সমবায় যুক্ত খামার সমিতি, সমবায় কৃষকপ্রজা খামার সমিতি ও সমবায় যৌথ খামার সমিতি।

১. সমবায় উন্নততর খামার সমিতি
COOPERATIVE BETTER FARMING SOCIETY

ইহাতে যোগদানকারী কৃষকগণের জমি একত্রিত করিয়া যুক্তভাবে চাষ করা হয় না। সভ্যগণের জোত পৃথক থাকে ও প্রত্যেক সভ্য নিজের জোত নিজে চাষ করে। কৃষিকার্যে উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবহারে উৎসাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ, সেচকার্য, ফসল কাটিবার সময় পরস্পরকে সাহায্য দান, একসঙ্গে কৃষিপণ্য বিক্রয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এই প্রকার সমবায় সমিতি গঠিত হয়। ইহাকে সঠিক অর্থে

সমবায় কৃষি সমিতি বলা চলে না। তবে অনুন্নত দেশে এই প্রকার সমিতি স্থাপনের দ্বারা প্রকৃত সমবায় কৃষি প্রবর্তনের পথ প্রস্তুত করা যায়।

২. সমবায় যুক্ত খামার সমিতি
COOPERATIVE JOINT FARMING SOCIETY

কৃষিকার্যের জন্য জমি ক্রয় ও লীজ গ্রহণ; উহাতে বাসগৃহ, গোশালা ও গুদাম নির্মাণ; কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিক্রয় ও কৃষিপণ্যকে অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যে পরিণত করা; জমি, ফসল ও অন্যান্য সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া কৃষির উন্নতির জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ এবং সভ্যগণকে কৃষিকার্যে ঋণ প্রদান; গো-পালন, ননী মাখন প্রস্তুতকরণ এবং ফল ও শাকসবজির চাষ; সভ্যগণের মধ্যে কৃষিকার্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পরামর্শ প্রদান ও কৃষি শিক্ষার বিস্তার; কৃষির উন্নয়নের জন্য এবং সভ্যদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা মিতব্যয়িতা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একাগ্র প্রচেষ্টা—এই সকল নানাবিধ উদ্দেশ্যে সমবায় যুক্ত খামার সমিতি গঠিত হয়।

ইহাতে জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকে অথচ একত্রীভূত বৃহত্তর জোতে কৃষিকার্য করা যায়। কৃষকেরা সকলেই কৃষিকার্যে যোগদান করে এবং কাজের জন্য সমিতি হইতে মজুরি পায়। খরচ বাদে নীট আয় বা ফসলের অংশ সভ্যদের মধ্যে তাহাদের জমির অনুপাতে বণ্টন করা হয়। ভারতে এই প্রকার সমবায় খামার প্রতিষ্ঠার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

৩. সমবায় কৃষকপ্রজা খামার সমিতি
COOPERATIVE TENANT FARMING SOCIETY

ইহা একটি নিম্নতর পর্যায়ের কৃষি সমবায়সমিতি। এই প্রকার সমিতি, নিষ্কর অথবা খাজনার শর্তে জমির বন্দোবস্ত লইয়া, সভ্যগণের মধ্যে উহা ছোট ছোট জোতে ভাগ করিয়া দেয়। প্রত্যেক সভ্যই সমিতির অধীনস্থ প্রজা হিসাবে চাষ করিয়া থাকে। অবশ্য তাহারা সমিতি নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী চাষ করে, জমির জন্য নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেয় এবং সমিতির নিয়মানুযায়ী জমির উন্নতি সাধনের জন্য অথবা পতিত জমি উদ্ধারের কার্যে শ্রমদান দ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে সহায়তা করে। সমিতির তরফ হইতে সভ্যগণের প্রয়োজনীয় ঋণ, বীজ, সার প্রভৃতি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

সাধারণত পতিত জমি উদ্ধার করিয়া উহাতে কৃষিকার্য প্রবর্তন করিবার জন্য এই জাতীয় সমিতি বিশেষ উপযোগী। উত্তর প্রদেশে ও মাদ্রাজে এই প্রকার সমিতির দ্বারা সুফল পাওয়া গিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ সমবায় কৃষি না হইলেও ইহাতে সমবায় কৃষির মত কেন্দ্রীয় পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা থাকায় এবং অপরদিকে কৃষকদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে কৃষিকার্য পরিচালিত হওয়ায় ধীরে ধীরে সমবায় কৃষির বিরুদ্ধে কৃষকদের সন্দেহ ও ভয় কমিতে থাকে। ফলে পরবর্তীকালে ইহার দ্বারা প্রকৃত সমবায় কৃষি (যথা, সমবায় যুক্ত খামার সমিতি) প্রতিষ্ঠা সহজ হয়।

৪. সমবায় যৌথ খামার সমিতি
COOPERATIVE COLLECTIVE FARMING SOCIETY

এই প্রকার সমিতিতে কৃষকগণের জমির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। জমির মালিকানা সমবায় সমিতির উপর অর্পিত হয়। কৃষকগণ যে পরিমাণে তাহাদের শ্রম

ও অন্যান্য বিষয় দিয়া সমিতির কার্যকলাপে সাহায্য করে অথবা সমিতির আয়ের অংশ পাইয়া থাকে। সোভিয়েত দেশে প্রচলিত এই কৃষিকে যৌথ খামার ব্যবস্থা বলা হয়। এই প্রকার কৃষি যাবতীয় সমবায় কৃষির সর্বোচ্চ স্তরের। ইহার সাফল্যের জন্য কৃষকগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা উচ্চ স্তরের হওয়া আবশ্যক।

সমবায় খামারের সুবিধা (Case for Cooperative Farming) নিম্নলিখিত কারণে, ভারতের দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়ন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজপ্রতিষ্ঠার পটভূমিকায় সমবায় খামার ব্যবস্থাকে ভারতের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ইহার সুবিধাগুলি এই যে১—. ইহাতে জমিতে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কৃষিজোতের একত্রীকরণ দ্বারা বৃহদায়তন চাষের প্রবর্তন করা সম্ভব। ইহা ভারতের কৃষকগণের মানসিক পরিবেশের উপযোগী। ২. ইহার দ্বারা বৃহদায়তন কৃষির প্রবর্তন করিয়া কৃষির যন্ত্রীকরণের অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ৩. সমবায় কৃষির ভিত্তিতে কৃষিজোতের আয়তন বড় হইলে জোতগুলি অর্থনীতিকজোতে পরিণত হইতে পারিবে। ফলে কৃষির ব্যয় নির্বাহ করিয়াও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপাদন হইবে। ৪. জোতের আয়তন বৃহৎ হওয়ায় অধিকতর পরিমাণে ঋণ ও পুঁজির সুবিধা, উন্নত যন্ত্রপাতির সুবিধা, গভীরভাবে ভূমি কর্ষণের সুবিধা, উৎকৃষ্ট বীজ ও সারের সুবিধা, সেচকার্যের উপযুক্ত ব্যবহারের সুবিধা প্রভৃতি বৃহদায়তন উৎপাদনের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা পরিপূর্ণভাবে লাভ করা যাইবে। ৫. ইহার দ্বারা যন্ত্রের ভিত্তিতে বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে মানবশক্তিতেও ব্যয়-সংকোচ ঘটিবে অর্থাৎ বর্তমান অপেক্ষা স্বল্পতরসংখ্যক কৃষকের সাহায্যে অধিকতর উৎপাদন হইবে। কৃষকদের শ্রমের পূর্ণতর নিয়োগ ঘটিবে এবং কৃষিতে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা লোপ পাইবে। ৬. কৃষিসংস্কার, কৃষিতে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ও কৃষির যন্ত্রীকরণের যাবতীয় সুফল একমাত্র সমবায় কৃষি সমিতির দ্বারাই সর্বাধিক পরিমাণে সম্ভব। ইহাতে কৃষির উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। ৭. আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদে সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় সমবায় কৃষি সমিতিগুলি সভ্যগণের জন্য নানাবিধ কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া অলস ঋতুতে তাহাদের কর্মসংস্থান করিতে পারিবে। ৮. কৃষকগণের উৎপাদন-শীলতা ও আয় বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। গ্রামাঞ্চলে আয় ও সম্পত্তির বৈষম্য যথেষ্ট লোপ পাইবে। ৯. কৃষকগণের অর্থনীতিক উন্নতির ফলে তাহাদের সাংস্কৃতিক উন্নতির সুযোগ-সুবিধা বাড়িবে। ১০. কৃষির সামগ্রিক উন্নতির দ্বারা কৃষি ও শিল্প সমরূপে শক্তিশালী হইয়া জাতীয় অর্থনীতিকে আত্মনির্ভরশীল করিতে পারিবে। সমবায় কৃষি দেশের খাদ্য ও কাঁচামালের ঘাটতি পূরণ করিয়া শিল্প সম্প্রসারণে সাহায্য করিবে। অন্যদিকে কৃষকের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করিয়া গ্রামাঞ্চলে শিল্পপণ্যের বাজার প্রসারিত করিবে। ১১. সর্বোপরি অর্থনীতিক সমতা ও সুযোগের সমতার ভিত্তিতে গ্রামসমাজের ঐক্য দৃঢ় হইবে। এইরূপে সমবায় কৃষি এক সমৃদ্ধিশালী, ঐক্যবদ্ধ, নূতন সামাজিক ব্যবস্থাসম্পন্ন, শক্তিশালী গ্রাম-ভারতের জন্মদান করিবে।

সমবায় খামারের বিরুদ্ধে যুক্তি (Case against Coop. Farming): ১. অনেকের মতে ইহার ফলে কৃষকগণের উদ্যোগ ও উৎসাহ থাকিবে না ; 'বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' হইবে। কেহই আগ্রহ লইয়া চাষ না করিলে ফলন কমিবে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে বর্তমানের কৃষি শ্রমিকগণের অবস্থা ভূমিদাসের অপেক্ষা ভাল নহে। রায়তগণ জমিদার মহাজন কবলিত। ক্ষুদ্রচাষীরা মহাজনের শোষণে রিক্ত, ইহাদের জমি দিয়া যদি তাহাদে

সমবায় খামার প্রবর্তিত [illegible] তবেই বরং তাহারা আমদার মহাজনের কবলমুক্ত হইয়া কৃষিকার্যে উদ্যোগী ও উৎসাহী হইবে। কৃষির ফলন বাড়িবে।

২. বিরোধিগণের মতে ভারতে জমির প্রতি কৃষকের গভীর আকর্ষণ রহিয়াছে। সমবায় খামার প্রবর্তিত হইলে, ব্যক্তিগত মালিকানা নষ্ট হইবে ও তাহারা ইহার বিরোধিতা করিবে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে সমবায় খামার স্থাপিত হইলে, এবং সমবায় খামারের উপকারিতা বুঝিতে পারিলে, চাষীরা বিনাদ্বিধায় নূতন কালের প্রয়োজনের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইবে।

৩. সমবায় খামারের একটি প্রকৃত অসুবিধা আছে যে, উহাতে কৃষির যন্ত্রীকরণ ঘটিবে এবং তাহার ফলে কৃষিতে কর্মহীনতা বৃদ্ধি পাইবে। আশু এই প্রতিকূল ফল দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত কৃষির ফলন, কৃষকের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বাড়িলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও বাজার বিস্তৃত হইবে। এ সকলের দরুন কর্মচ্যুত কৃষকগণেরও কর্মের সংস্থান হইবে।

৪. অনেকে বলেন যে, খামারগুলি পরিচালনার যোগ্য লোক এদেশে নাই বলিয়া সমবায় খামার গঠন অনুচিত হইবে। কিন্তু ইঁহারা ভুলিয়া যান যে সমবায় খামার গঠিত না হইলে উহার পরিচালনার কার্য শিখিবার কোনও সুযোগই এদেশে কেহ কোনও দিন পাইবে না। খামারগুলি গঠিত হইলে, তবেই উহাতে হাতে-কলমে শিক্ষা পাইয়া সুশিক্ষিত সমবায় খামার কর্মিদল গড়িয়া উঠিবে।

৫. আবার কেহ কেহ বলেন যে ক্ষুদ্রায়তন খামারগুলির ফলন বৃহদায়তন খামার অপেক্ষা বেশি হয়। সুতরাং ঐগুলিকে রক্ষা করিতে হইবে। বাস্তবে এই বক্তব্যের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। কারণ ভারতে জমির ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। ইহাদের চাষের খরচ উঠিতে চায় না।

মন্তব্য ঃ ভারতে **সমবায় কৃষির পথে কতকগুলি বিঘ্ন** রহিয়াছে। ১. অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও আজীবন বঞ্চনার অভিজ্ঞতা হইতে কৃষকগণের মধ্যে নূতন সকল কিছুর প্রতিই প্রবল সন্দেহ, অবিশ্বাস ও আগ্রহের অভাব রহিয়াছে। ২. পুরাতন একান্নবর্তী পরিবার ও প্রাচীন গ্রাম্য পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহাদের মধ্যে যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার ঐতিহ্য আর নাই। গ্রাম-সমাজের এইরূপ মানসিক ও বাস্তব পরিবেশ সমবায়মূলক কৃষি প্রচেষ্টার প্রতিকূল। ৩. সমবায় কৃষিতে জমির ব্যক্তিগত মালিকানার উপর যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয় তাহা প্রথমাবস্থায় কৃষকগণের নিকট অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। ইহাতে তাহাদের সম্পত্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ হইল বলিয়া মনে করিতে পারে। যে সকল দেশে সমবায় খামার প্রবর্তিত হইয়াছে তথায় প্রথম দিকে এইরূপ বিরোধিতা দেখা গিয়াছে। ৪. সমবায় খামারের সাফল্যের জন্য প্রচুর কৃষিঋণ, কৃষির যন্ত্রীকরণ, বৃহৎ কৃষিসংগঠন পরিচালনার অভিজ্ঞতা, উৎকৃষ্ট সার, বীজ ও বিস্তৃত সেচের প্রবর্তন প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় প্রয়োজন। এই সকল বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে উপযুক্ত সংযোগ সাধন দরকার। ৫. ইহাতে কৃষিক্ষেত্রে অনেক কৃষক অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে। ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতা বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু এসকল বিঘ্নের কোনটিই অজেয় নহে। ধৈর্যের সহিত, কৃষকগণের মধ্যে ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার, কৃষকগণের শিক্ষার ও চেতনার মান উন্নয়ন, সমবায় আন্দোলনের প্রসার, প্রভৃতির দ্বারা মানসিক প্রতিকূলতা দূর করা সম্ভব। আইনগত ব্যবস্থা ও ভারতের স্থানীয় জনমানস অনুযায়ী সমবায় কৃষির উপযুক্ত সামঞ্জস্যবিধান (যেমন বর্তমানে সমবায়

কৃষিখামার সমিতিগুলির মাধ্যমে করা হইতেছে), উপযুক্ত ঋণ, সেচ, সার, বীজ ও কৃষির যন্ত্রীকরণের জন্য পরিকল্পিত সরকারি ব্যবস্থা, সমবায় খামার পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষাদান ইত্যাদির দ্বারা অপর বাধাগুলি দূর করা যাইতে পারে। পরিশেষে, দেশের সামগ্রিক শিল্পায়ন পরিকল্পনার সহিত সংগতি রাখিয়া সমবায় কৃষির বিস্তারের কার্যক্রম গৃহীত হইলে, গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতা বাড়িতে পারিবে না।

সরকারী নীতি (Government Policy) : ১৯৪৯ সালের কংগ্রেস কৃষিসংস্কার কমিটি, পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিসংস্কার পরামর্শদাতা পরিষদ (Panel on Land Reforms), চীনদেশে ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধিদল প্রভৃতি, সকলেই সমবায় কৃষি প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে সমবায় কৃষির বাঞ্ছনীয়তার কথা বলা হইয়াছিল। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** ইহার প্রসারের প্রয়োজনীয়তার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়। দেশে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের (Private & Public Sectors) পাশাপাশি সমবায় ক্ষেত্র (Cooperative Sector) প্রতিষ্ঠা ও উহার সম্প্রসারণের আবশ্যকতার কথা বলা হয়। উহার অঙ্গ হিসাবে, সমবায় কৃষি ও খামারের বিস্তৃতির সুপারিশ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত সমবায় খামারনীতির মূল বক্তব্য ছিল যে—

১ পথদেশক প্রকল্প হিসাবে (Pilot Projects) সারাদেশে সমবায় খামার প্রতিষ্ঠা করিতে ও এই সকল খামারকেন্দ্রে সমবায় কর্মীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে হইবে। ২. জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিলে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাইবে তাহাতে ভূমিহীন কৃষকগণের পুনর্বসতি দিয়া তাহাদের সমবায় ভিত্তিতে কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। ৩. বর্তমান সমবায় খামারগুলিতে সকল প্রকার সরকারী সহায়তা দিয়া উহাদের সফল করিয়া সাধারণ কৃষকগণকে ঐ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ৪. বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত জোতের সংবদ্ধকরণ দ্বারা ঐ সকল জমিতে সমবায় খামার প্রবর্তনে উৎসাহ দিতে হইবে। ৫. সমবায় খামার প্রতিষ্ঠার পূর্বে সেবাসমবায় (Service-Cooperatives) অর্থাৎ, যুক্ত সেচ, সার ও বীজ ক্রয়, কৃষিপণ্যের বিক্রয় ইত্যাদি অন্যান্য কৃষি-সংক্রান্ত কার্যে সমবায় সমিতির প্রচলন করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে কৃষকগণের আস্থা সৃষ্টি করিতে পারিলে, অবশেষে তাহাদের মধ্যে সমবায় খামার প্রতিষ্ঠার কার্য সহজ হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সুনির্বাচিত সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে, প্রতিটি জেলায় একটি করিয়া সারা ভারতে ৩২০টি সযত্ন রচিত পথদেশক সমবায় খামার প্রকল্প প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরূপ প্রতিটি প্রকল্পে ১০টি করিয়া সমবায় খামার সমিতি স্থাপিত হইবে এবং ইহারা আদর্শ হিসাবে কৃষকগণকে আরও ৪০০০টি খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করিবে এই আশা করা হইয়াছে।

স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে গঠিত সমবায় খামার কার্যক্রমের সুপরিকল্পনা ও উৎসাহ দানের জন্য কেন্দ্রে জাতীয় সমবায় খামার পর্ষৎ (National Cooperative Farming Board) গঠিত হইয়াছে। ইহা সমবায় খামারগুলির কার্যকর তত্ত্বাবধান, নেতৃত্বদান ও মাঝে মাঝে নিয়মিত ভাবে উহাদের কার্যাবলীর সমীক্ষা করিবে। প্রতিরাজ্যেও ইহার অনুকরণে [illegible] রাজ্য সমবায় খামার পর্ষৎ গঠিত হইয়াছে।

সমবায় খামারের অগ্রগতি (Progress of Cooperative Farming) : ১৯৬৩ সালের শেষ পর্যন্ত দেশে সমবায় খামার প্রকল্পের অধীনে ৯৫৫টি খামার স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাদের অধীনস্থ জমির পরিমাণ ১ লক্ষ একরের বেশী ও সদস্য সংখ্যা ১৭,০০০ এর বেশী ছিল। ইহা [illegible] কৃষকগণ নিজেদের উদ্যোগে আরও ৮৭২টি সমবায় খামার সমিতি গঠন করিয়াছিল। [illegible] অধীনস্থ জমির পরিমাণ ১১ লক্ষ একরের ও সদস্য সংখ্যা ১৮,০০০ এর বেশী ছিল। এবিষয়ে উত্তর প্রদেশে সর্বাধিক অগ্রগতি ঘটিয়াছে। তথায় ২৬,০০০ এক[illegible] জমি ও ৫০০০ সদস্য লইয়া ২৮৪টি সমিতি গঠিত হয়। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মহারাষ্ট্র। তথায় ১৫০০০ একর জমি লইয়া ১৩৬টি পথপ্রদর্শক সমবায় খামার সমিতি গঠিত হয়।

এই প্রসঙ্গে ১৯৬০ সালে প্রকাশিত নিজালিঙ্গাপ্পা কমিটির রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য। সমবায় খামার সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত এই কমিটি দেখিতে পান যে এপর্যন্ত ভারতে সমবায় খামার আন্দোলনের যে অগ্রগতি ঘটিয়াছে তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ। কৃষকগণ, সরকারী কর্মচারিগণ প্রভৃতি কেহই ইহার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কৃষকগণের দ্বিধা ও কুণ্ঠিত সরকারী সাহায্য ইহার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ সরকার হইতে জমি আদায় করিবার জন্য এইরূপ খামার গঠন করিয়াছে। অনুপস্থিত জমির মালিকগণও অনেক স্থলে সমবায় খামার স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ কৃষিশ্রমিকগণের দ্বারা গঠিত খামারে তাহাদের অধিকাংশই কৃষি কার্যে যোগ দিয়াছে তথায় সমবায় খামার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সফল হইয়াছে।

সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাপনা
COOPERATIVE VILLAGE MANAGEMENT

প্রথম পরিকল্পনায় ভারতের ভূমি সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হিসাবে সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাপনার কথা বলা হইয়াছিল। শ্রীতার্লোক সিং এই ধারণার প্রবক্তা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন ইহাকে ভূমিনীতির লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করেন।

বৈশিষ্ট্য (Features) : সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাপনার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে নীচে দেওয়া গেল।

১. গ্রামবাসিগণের সকল জমি একত্র করিয়া একটি জোত বলিয়া গণ্য করা হয়। ২. ইহাতে গ্রামবাসিগণের জমি চিরকালের জন্য একত্র সংবদ্ধ হয় (কিন্তু সমবায় কৃষিতে তাহা হয় না। কৃষকগণ ইচ্ছা করিলে সমবায় সমিতি হইতে পরিত্যাগ করিয়া জমি ফেরত পাইতে পারে)। ৩. সাধারণত জমির মালিকগণের দুই-তৃতীয়াংশ অথবা গ্রামের মোট কর্ষিত জমির অন্তত অর্ধাংশের চাষী, স্থায়ী কৃষকপ্রজাগণের (permanent tenants) সম্মতি থাকিলে, তবেই এই প্রকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। ৪. এইরূপে একত্রিত জমিতে কৃষিকার্য ও অন্যান্য কার্য পরিচালনা, তদারক ও ব্যবস্থাপনার ভার, পঞ্চায়েত ও গ্রামসভার (Gaon Sabha) উপর থাকিবে। ৫. পঞ্চায়েত বা গ্রামসভা কৃষিকার্যের প্রয়োজনবোধে সমগ্র জমিকে একাধিক খণ্ডে (block) বিভক্ত করিয়া লইতে পারিবে। ৬. গ্রামবাসিগণের সর্বাধিক মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রামসভা কৃষিকার্য সংগঠিত ও পরিচালিত করিবে। উহাতে গ্রামবাসিগণের সর্বাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির চেষ্টা করিবে। ৭. গ্রামে পতিত জমি উদ্ধার, জলাশয়, মৎস্যচাষকেন্দ্র, বনভূমি, ও ক্ষুদ্র সেচকার্যের ভারও সমিতির উপরই থাকিবে। ৮. জমির মালিকগণের মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু তাহা একত্রীভূত জমির কোন নির্দিষ্ট খণ্ডের মালিকানা হিসাবে নহে (অর্থাৎ তাহার যে জমি খণ্ডটি ছিল, উহার মালিকানা নহে) মোট একত্রীভূত জমিতে শুধু তাহার অংশ আছে, সে কথা স্বীকৃত হইবে। এই ব্যবস্থা লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ারের মত। লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণের যেমন কোম্পানীর মালিকানায় অংশ থাকে, কিন্তু সে মালিকানা কোম্পানীর কোন বিশেষ সম্পত্তির উপর প্রযোজ্য নহে, তেমনি। ৯. জমির মালিককৃষকগণ, ভূমিহীনকৃষক ও কৃষক-

[illegible], সকলেই একত্রীভূত জমিতে পরিশ্রম করিবে। [illegible] জমির মালিকানা থাকিলে তদুপরি নিজ অংশের অনুপাতে লভ্যাংশ পাইবে।

এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা গ্রামবাসীদের সমগ্র জীবনযাত্রা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই জন্য ইহা সমবায় কৃষির মত আংশিক ব্যবস্থা নহে। একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা। সুতরাং ইহা অবিলম্বে কার্যে পরিণত করার কথা পরিকল্পনা কমিশন বলেন নাই। ধীরে ধীরে গ্রামের ব্যক্তিগত উদ্যোগের (Individual or Private Sector) ক্ষেত্র সংকুচিত এবং সমবায়ের ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া, শেষে গ্রামবাসীদের সমগ্র অর্থনীতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে উহা পরিব্যাপ্ত করিয়া সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থাপনায় প্রবর্তন করা সম্ভব। সমবায়ের উপর গ্রামবাসিগণের আস্থা যত দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে ততই ইহা শীঘ্র কার্যকর হইবে।

এইরূপ ব্যবস্থাকে ভারতের স্থানীয় অবস্থার অধিকতর উপযোগী বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন। ইহা কার্যকর করিবার জন্য প্রাথমিক ভাবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

১. জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্মের প্রসার। ২. গ্রামপঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা। ৩. সমবায়ভিত্তিতে ঋণদান, কৃষিপণ্য বিক্রয়, গুদাম নির্মাণকার্যের প্রসার। ৪. সমবায়ভিত্তিতে গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার। ৫. স্বেচ্ছামূলক সমবায়কৃষির বিস্তার।

৫

কৃষিকার্যের অর্থসংস্থান
Agricultural Finance

উৎপাদনে সহায়তা করিবার জন্য শিল্পের মত কৃষিক্ষেত্রেও অর্থ অপরিহার্য্য। বীজ, সার ও সেচকার্য, কৃষিশ্রমিকের মজুরি, কৃষিকার্য আরম্ভ হইতে ফসল বিক্রয় পর্যন্ত কৃষকের সংসারব্যয় নির্বাহ, উপযুক্ত দর না পাওয়া পর্যন্ত ফসল ধরিয়া রাখা, কৃষিযন্ত্রপাতি ক্রয়, চাষের পশু ক্রয় ইত্যাদি বহুবিধ কারণে কৃষিকার্যে অর্থ প্রয়োজন। জমির উন্নতি, উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদন, উন্নত পদ্ধতি-গ্রহণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন হয়।

ব্যক্তিগত, সমবায়, অথবা যৌথ কৃষি, যে প্রকার পদ্ধতিতেই উৎপাদন হউক না কেন, কৃষির প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য উৎস দুইটি: কৃষিকার্যের আয় হইতে সৃষ্ট সঞ্চয় এবং ঋণ। কৃষিকার্যের উন্নয়নের দ্বারা সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। উন্নত দেশে কৃষিকার্যের অতীত ও চলতি সঞ্চয় হইতে কৃষির প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান সম্ভব। কিন্তু অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশের কৃষিউন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থসংস্থানের জন্য ঋণের উপরই প্রধানত নির্ভর করিতে হয়।

কৃষিঋণের প্রকারভেদ
TYPES OF AGRICULTURAL CREDIT

সময় ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিন শ্রেণীর কৃষিঋণ প্রয়োজন হয়। যথা—স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।

১. **স্বল্পমেয়াদী ঋণ (Short term Credit):** প্রতি বৎসর ফসল উৎপাদন ও বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত উহা ধরিয়া রাখিতে যে অর্থের প্রয়োজন তাহাকে কৃষির 'চলতি পুঁজি' (working capital) বলা যায়। ইহার জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রয়োজন। ফসল বিক্রয় হইয়া গেলে এই প্রকার ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব।

২. **মাঝারিমেয়াদী ঋণ (Medium term Credit):** কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় পশু, যন্ত্রপাতি, কৃষি-পদ্ধতির পরিবর্তন ও জমির ছোটখাটো উন্নতির জন্য যে ঋণের প্রয়োজন তাহা কৃষির মাঝারিমেয়াদী ঋণ। এই প্রকার ঋণ ১৫ মাসের অধিককালের জন্য প্রয়োজন এবং অনধিক ৫ বৎসরের মধ্যেই পরিশোধ করা সম্ভব।

৩. **দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (Long term Credit):** জমির স্থায়ী উন্নতি, নূতন জমি ক্রয়, পতিত জমি উদ্ধার, সেচকার্য প্রবর্তন, মূল্যবান কৃষিযন্ত্রপাতি ক্রয়, বাঁধ নির্মাণ, খামারবাড়ি নির্মাণ পুরাতন ঋণ পরিশোধ ইত্যাদির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন। এই প্রকার ঋণ ১৫।২০ বৎসরের পূর্বে পরিশোধ করা সম্ভব নহে।

ভারতে কৃষিঋণের সমস্যা
THE PROBLEM OF AGRICULTURAL CREDIT IN INDIA

ভারতে দীর্ঘকাল ধরিয়াই কৃষিঋণের তীব্র সমস্যা রহিয়াছে। ৬৫ বৎসরেরও পূর্বে নিকলসন সাহেব ভারতে কৃষকগণের ঋণের অপরিহার্য প্রয়োজনের কথা বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতের কৃষিজোতের ক্ষুদ্র আকার, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জোতে কৃষিকার্যের অত্যধিক ব্যয়, ফলনের স্বল্পতা ও অনিশ্চয়তা, ফসলবিক্রয় ব্যবস্থার অভাব, ঋণের জামিন হিসাবে জমির অনুপযুক্ততা, ভূমিকর্ষণ ও বীজবপন কাল হইতে ফসলবিক্রয় পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষার প্রয়োজনীয়তা, কৃষকের দারিদ্র্য ও অস্থাবর সম্পত্তির অভাব প্রভৃতি কারণে কৃষিঋণের সংকট প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে।

আয় অল্প বলিয়া ভারতীয় কৃষকগণকে যেমন কৃষিকার্যের জন্য ঋণ করিতে হয়, তেমনি সংসারখরচ, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, অসুস্থতা প্রভৃতি, বিভিন্ন কারণেও সর্বদাই ঋণ

করিতে হয়। প্রথম কারণে ঋণ উৎপাদনশীল কিন্তু দ্বিতীয় কারণে ঋণ অনুৎপাদনশীল। ভারতের কৃষিঋণের অধিকাংশই অনুৎপাদনশীল। এজন্য ঋণের দ্বারা কৃষির উন্নতি ও কৃষকের আয়বৃদ্ধি ঘটে নাই।

অতএব চরিত্র বিচারে ভারতের কৃষিঋণের দুই প্রকার সমস্যা দেখা যায়।

১. পুরাতন ঋণভার এবং অনুৎপাদনশীল নূতন ঋণ হ্রাস করার সমস্যা।

২. নূতন উৎপাদনশীল কৃষিঋণ সরবরাহের সমস্যা।

কৃষিঋণ যখন দুর্লভ হয় তখন উহা যেমন সমস্যা, তেমনি উহা যখন এরূপভাবে পাওয়া যায় যাহা কৃষি ও কৃষকের মঙ্গলের পরিবর্তে আরও অমঙ্গল ঘটায়, তখন উহা আরও গভীর সমস্যায় পরিণত হয়। ভারতে তাহাই হইয়াছে। ভারতের দ্রুত অর্থনীতিক উন্নয়নের স্বার্থে যেমন কৃষি সংস্কার, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন এবং সমবায় কৃষির প্রচলন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণের সরবরাহ।

কৃষকের পুরাতন ঋণভারের সমস্যা
THE PROBLEM OF RURAL INDEBTEDNESS

কৃষকের ঋণভারের হিসাব (Estimated Debt): ১৮৭৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি নানা সময়ে কৃষিঋণের বিভিন্ন হিসাব প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৯১১ সালে স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগান-এর হিসাবে বৃটিশ ভারতের কৃষিঋণের পরিমাণ ছিল ৩০০ কোটি টাকা। ১৯২৯ সালে ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী উহা ৯০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগের হিসাবে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮০০ কোটি টাকায় পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের কৃষিজাত আয় ছিল ৯৫৩ কোটি টাকা।

পরবর্তীকালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যুগে ও তাহার পরে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যস্তর অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, সে সময় কৃষকগণের আয়বৃদ্ধির ফলে পুরাতন ঋণ অনেকাংশে পরিশোধ করা হয় ও সে কারণে উহার বোঝা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু ১৯৪৫ সালের দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সকল সুবিধা ধনীকৃষকগণই ভোগ করিয়াছে, ক্ষুদ্র ও দরিদ্র কৃষকগণ পায় নাই। আরও পরবর্তীকালে জাতীয় আয় কমিটির প্রথম রিপোর্টে পুরাতন ঋণের পরিমাণ ৯১৩ কোটি টাকা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঋণের ৮৩ শতাংশ অনুৎপাদনশীল।

কৃষিঋণভারের কারণ (Causes of Rural Indebtedness): পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত পৈতৃক ঋণ, গ্রাম্য মহাজন কর্তৃক কৃষকের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতার সুযোগ লইয়া প্রতারণা, কৃষকগণের বেহিসাবী ব্যয়ের স্বভাব, তাহাদের মামলা-মোকদ্দমার উপর ঝোঁক ও তজ্জন্য ঋণ গ্রহণ, যখন তখন মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ পাইবার সুবিধা, সুদের চড়াহার প্রভৃতি, কৃষিঋণ বৃদ্ধির জন্য দায়ী। এছাড়া অন্যান্য কারণও রহিয়াছে। আয় অত্যন্ত অল্প হওয়ায় মহাজনদের কাছ হইতে ঋণ না করিলে কৃষকদের জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়ে। গরুর অভাবে যখনই নূতন লাঙলগরু কিনিতে হয় তখনই মহাজনের কাছে হাত পাতিতে হয়। ইহার উপর ফসলের অনিশ্চয়তা এবং উপযুক্ত ফসল বিক্রয় ব্যবস্থার অভাবও তাহাদের ঋণের উপর নির্ভরশীলতা বাড়াইয়াছে। ইংরেজ রাজত্বে প্রবর্তিত উচ্চহারে খাজনা ও সেচ প্রভৃতি কর তাহাদের আয় কাড়িয়া লইয়া মহাজনদের কবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। পরিশেষে, জমির

[illegible] ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ায় কৃষক, জমিদার মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা হইয়াছে।

কৃষিঋণভারের ফলাফল (Effects of Rural Indebtedness): উৎপাদনশীল কার্যে ঋণ করিলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পায়। উহা হইতে সহজেই ঋণ পরিশোধ করিয়া ঋণগ্রহণকারী তাহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু ভারতের কৃষিঋণের অধিকাংশই অনুৎপাদনশীল বলিয়া উহার কুফল ছাড়া সুফল ঘটে নাই।

১. **অর্থনৈতিক কুফল:** ক. কৃষকগণের স্বল্প আয়ের অধিকাংশই ঋণ শোধ করিতে নিঃশেষিত হয়। ইহার ফলে জমির উন্নতি ও ফসল বৃদ্ধির জন্য সঞ্চয় ও পুঁজি বৃদ্ধি করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং তাহাদের জীবনযাত্রার মান ক্রমেই অবনত হইতে থাকে। খ. মহাজনের তাগিদে ফসল ঘরে তুলিবার পূর্বেই যে কোন দরে বিক্রয় করিয়া দিতে হয় বলিয়া কৃষক কোন দিনই সুবিধাজনক দরে ফসল বেচিবার সুযোগ পায় না। গ. দেনার দায়ে মহাজনরা জমি দখল করিয়া লয়। ভারতে ভূমিহীন কৃষকসংখ্যা বৃদ্ধির ইহা প্রধান কারণ। এইরূপ অবস্থায় কৃষিকর্মে কৃষকের আর কোন উৎসাহ থাকে না। সেজন্য কৃষির ফলন কমে।

২. **সামাজিক কুফল:** ক. দেনার দায়ে সর্বস্বান্ত কৃষক মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। এমনকি দেনা শোধ না হওয়া পর্যন্ত অন্যত্র কর্মের সন্ধানে তাহার যাইবারও উপায় থাকে না। খ. স্বাধীন কৃষকের পর্যায় হইতে মহাজনের দাসে পরিণত কৃষকের কোন সামাজিক মর্যাদা থাকে না। সমাজের অন্য সকলের চক্ষে সে তখন অসহায়, তাচ্ছিল্য ও কৃপার পাত্র হইয়া পড়ে।

৩. **নৈতিক কুফল:** চিরন্তন ও ক্রমবর্ধমান ঋণভার ভারতের কৃষকসমাজকে স্বাধীন জীবিকা ও জীবনধারণের সুস্থ ও স্বাভাবিক উপায় হইতে বিচ্যুত করিয়াছে; মহাজনের ভূমিহীন ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া তাহাদের মনে ঋণের নাগপাশ হইতে মুক্তি সম্পর্কে সকল আশা-ভরসা চিরতরে মুছিয়া দিয়াছে। বৈষয়িকভাবে দেউলিয়া কৃষককে নৈতিক দেউলিয়ায় পরিণত করিয়াছে। সর্বস্ববঞ্চিত কৃষক স্বভাবত আত্মরক্ষার তাগিদে ঋণ পরিশোধে যেমন ফাঁকি দিতে দ্বিধা করে না, তেমনি কায়িকশ্রমেও ফাঁকি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যে সমাজ তাহাকে বঞ্চিত করিল, সে সমাজকে সেও প্রত্যুত্তরে বঞ্চনা ও ঘৃণা দ্বারাই জবাব দেওয়ার চেষ্টা করে।

প্রচণ্ড ঋণভারের চাপে জর্জরিত, হতাশ, কর্মোদ্যমহীন, মহাজনের কবলিত কৃষকসমাজ ও কৃষির উদ্ধার ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। ঋণের এই নাগপাশ হইতে কৃষকের উদ্ধার ছাড়া কৃষির উন্নয়ন ও দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি অসম্ভব।

প্রতিকারের উপায় ও গৃহীত ব্যবস্থা (Remedial Measures and Steps Adopted): তিনটি উপায়ে কৃষিঋণভার সমস্যার প্রতিকার সম্ভব। প্রথমত, পুরাতন ঋণ হ্রাস করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, নূতন ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। তৃতীয়ত, কৃষকগণকে কৃষিকার্যের জন্য সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ করিতে হইবে।

১. **পুরাতন ঋণভার হ্রাস:** ইহার ব্যবস্থা গ্রহণ সর্বাগ্রে আবশ্যক। এজন্য বিভিন্ন রাজ্যে নানারূপ আইন পাস হইয়াছে। ক. তাহাতে কোথাও বিশেষ অবস্থায় ঋণশোধের সঙ্গতিহীন কৃষকগণকে দেউলিয়া ঘোষণা করিয়া ঋণভার হইতে তাহাদের সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। খ. কোথাও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ. আবার কোথাও ঋণসালিশীবোর্ড গঠন করিয়া স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে মহাজন ও খাতকের মধ্যে আপসে ঋণরফার ও সুবিধাজনক কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা করা

কোথাও বা সুদের হার হ্রাস, বকেয়া সুদের পরিমাণ হ্রাস ও অন্যান্য উপায়ে পুরাতন ঋণ মকুব করার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

২. নূতন ঋণ নিয়ন্ত্রণ: ইহার উদ্দেশ্য হইল যেন ভবিষ্যতে আর ঋণভার অযথা বৃদ্ধি না পায় এবং কৃষকগণ যাহাতে অনুৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ঋণগ্রহণ না করে। ইহার জন্য একদিকে যেমন প্রবল প্রচারকার্য দরকার, তেমনি প্রয়োজন আইনগত কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের। সরকার এক্ষেত্রে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই: ক. ঋণদাতার উপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। ঋণদাতাগণ যাহাতে চড়া হারে সুদ না লয় ও হিসাবের কারচুপি না করিতে পারে, দেনাদার-কৃষককে সর্বস্বান্ত না করিতে পারে তাহার জন্য অতীতে কেন্দ্রীয়ভাবে ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রদেশে ও রাজ্যে বিভিন্ন আইন পাস করা হইয়াছে। সংক্ষেপে এই সকল আইনের পরিচয় দেওয়া হইল।

১. মহাজনী ব্যবসায়ের নিবন্ধন ও অনুমতি পত্র দান ব্যবস্থা (Registration and licensing of money lending): মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, বিহার, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, ও বাংলা দেশে (অবিভক্ত) এই জাতীয় আইন ১৯৩৬ হইতে ১৯৩৮ সালের মধ্যে পাস হয়। এই সকল আইনে মহাজনদের নাম রেজেস্ট্রি করা ও লাইসেন্স লওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়।

২. হিসাবরক্ষণ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ (Regulation of accounts): মহাজনরা যাহাতে হিসাবের কারচুপি না করিতে পারে সেজন্য আইন করিয়া তাহাদের সরকার নির্ধারিত ফরমে খাতকের হিসাব রক্ষা, খাতকের নিকট নিয়মিত ভাবে দেনার হিসাব পেশ ও টাকা জমার জন্য খাতককে নিয়মিত রসিদ দিতে বাধ্য করা হইয়াছে। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বোম্বাইতে এজাতীয় আইন পাস করা হয়।

সুদের হারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ (Fixation of maximum interest rates): সকল রাজ্যেই সুদের হারের সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করিয়া আইন পাস করা হইয়াছে। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ আদায় বেআইনী ঘোষণা করা হইয়াছে। জামিনসহ ঋণের উপর সুদের হার বিভিন্ন অঞ্চলে শতকরা ৫ টাকা হইতে ১২ টাকার মধ্যে ধার্য হইয়াছে। জামিনবিহীন ঋণের উপর সুদের হার শতকরা ৫½ টাকা হইতে ২৪ টাকার মধ্যে ধার্য হইয়াছে।

ইহাছাড়া মহাজন যাহাতে খাতকগণের সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক না করিতে এবং খাতকের উপর অত্যাচার ও ভীতি প্রদর্শন না করিতে পারে সেজন্যও বিভিন্ন রাজ্যে আইন পাস হইয়াছে।

ঋণগ্রহণকারিগণের উপর বিধিনিষেধও অনেক প্রদেশে আইন দ্বারা আরোপিত হয়। এই সকল আইন দ্বারা ঋণের দায়ে জমির হস্তান্তরকরণের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হইয়াছে।

৩. সহজ শর্তে ঋণ সরবরাহ: ইহার ব্যবস্থা করা কৃষিঋণ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথ। আইনগত ব্যবস্থাদ্বারা পুরাতন ঋণভার হ্রাস শুধু পুরাতন অন্যায়ের অবসান করিতে পারে। নূতন ঋণ নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কৃষকগণের উপর মহাজনের শোষণ ও অত্যাচার বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য সহজশর্তে ঋণ সরবরাহের সন্তোষজনক বন্দোবস্ত না হইলে, কৃষকদের উপর মহাজনদের গ্রাস শিথিল হইবে না।

কৃষিঋণভার সংক্রান্ত আইনের সমালোচনা (Criticism of Debt Legislation): কৃষিঋণভার সংক্রান্ত আইনগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, এগুলি আইনের উদ্দেশ্য দুই প্রকারের। প্রথমত, পুরাতন ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা। দ্বিতীয়

[illegible] জন্য মহাজনী কারবারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। এই সকল বিভিন্ন আইনের প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে,—

১. পুরাতন ঋণ হ্রাস পাইয়া থাকিলেও উহার পরিমাণ যথেষ্ট নহে। পুরাতন ঋণভার আরও মকুব করা আবশ্যক।

২. ঋণসালিসী বোর্ডগুলির কার্যাবলী সন্তোষজনক হয় নাই। উহাদের মধ্যে দুর্নীতি দেখা দিয়াছিল।

৩. কৃষকগণের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া মহাজনরা অনেক স্থলেই প্রকৃত ঋণ অপেক্ষা অনেক বেশি ঋণের খত সহি করাইয়া লয় এবং প্রকৃত যে সুদ আদায় করে, তাহার পরিবর্তে আইন দ্বারা নির্ধারিত অপেক্ষাকৃত অল্পহার দলিলে লিখিয়া দেয়। এইরূপে মহাজনী আইন ফাঁকি দেওয়া হয়।

৪. বর্তমানে মহাজনী আইনের কঠোরতার জন্য মহাজনরা কৃষকগণকে সহজে ঋণ দিতে চাহে না। অথচ আর কোথাও ঋণের উপযুক্ত সুবিধা না থাকায় কৃষকগণকে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। ইহার ফলে কৃষকগণের খুবই অসুবিধা হইতেছে। অবশ্য অনেকের মতে ইহাতে কৃষকের অবাঞ্ছিত ঋণের পরিমাণ কমিতেছে।

মোটের উপর বলা যায় যে, এই সকল আইনগত ব্যবস্থায় কৃষকের আংশিক ত্রাণ ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহারা মূলসমস্যা স্পর্শ করে নাই। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলীর দ্বারা পরিকল্পিত পথে কৃষির উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের মাথাপিছু আয়ের ক্রমাগত ও স্থায়ী বৃদ্ধির মধ্যেই এই সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান রহিয়াছে।

প্রয়োজনীয় কৃষিঋণের আনুমানিক হিসাব ও উৎস

RURAL CREDIT : REQUIREMENT & EXISTING AGENCIES

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির মতে বর্তমানে দেশে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণের বাবদ মোট বাৎসরিক ৭৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই ঋণ বর্তমানে নিম্নরূপ ভাবে, বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী উৎস হইতে পাওয়া যাইতেছে।

উৎস	মোট ঋণের শতাংশ
সরকার ·······	৩.৩
সমবায় সমিতি ··········	৩·১
বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ·· ·····	০·৯
মোট প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional) ঋণ···	৭.৩
আত্মীয়বর্গ ·········	১৪.৩
জমিদার······ ··	১·৫
ধনীকৃষক মহাজন · ·······	২৪.৯
সাধারণ মহাজন··········	৪৪.৮
ব্যবসায়ী ও দালাল ···· ···	৫.৫
অন্যান্য·········	১·৭
মোট বেসরকারী ঋণ ·········	৯২.৭
সর্বমোট·········	১০০·০

উপরোক্ত তথ্য হইতে দেখা যায়, মোট কৃষিঋণের প্রায় ৯৩ শতাংশই বেসরকারী উৎস হইতে সংগৃহীত হয়। ইহার মধ্যে আবার কৃষকমহাজন ও সাধারণ মহাজনগণ যথাক্রমে প্রায় ২৫ শতাংশ ও ৪৫ শতাংশ অর্থাৎ মোট ৭০ শতাংশ ঋণ দিয়া থাকে। তুলনায়, আধুনিক প্রতিষ্ঠানগত উৎস, অর্থাৎ সরকার ও সমবায় সমিতি যথাক্রমে ৩·৩ শতাংশ ও ৩·১ শতাংশ, মোট ৬·৪ শতাংশ যোগান দেয়। এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ১ শতাংশেরও কম

[illegible] সরবরাহ করে। কৃষিঋণ সংস্থানের ক্ষেত্রে [illegible] উৎসের নগণ্যতা, কৃষিঋণ সংগঠনের শোচনীয় দুর্বলতার পরিচয়।

বর্তমানের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে, দেশের কৃষিব্যবস্থাকে যখন [illegible] প্রসারিত ও দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করা প্রয়োজন, সে সময়ে দেশে কৃষিঋণ সংস্থানের উপযুক্ত উৎসের অভাব, কৃষি ও সমগ্রিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। প্রতিষ্ঠানগত উৎসের তুচ্ছতা ও পুরাতন মহাজনী ব্যবস্থার উপর কৃষিঋণের নির্ভরতা সুস্পষ্টরূপে সরকারী কৃষিঋণদান ব্যবস্থা, সমবায় ঋণদান সমিতির কার্যাবলী ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে উপহাস করিতেছে। এই ঘটনাই প্রমাণ করিতেছে যে, মহাজনী আইন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত মহাজনদের অশুভ কবল হইতে কৃষকদের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভ ঘটে নাই। পরিকল্পনার সাফল্য ও দেশের ঘোষিত নীতির স্বার্থে, কৃষিঋণ ব্যবস্থার গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। আজিকার মত অধিক কৃষিঋণের প্রয়োজন আর কখনও হয় নাই। অথচ ভূমিসংস্কারের দ্বারা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে ও মহাজনী আইনের দ্বারা মহাজনদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের ফলে, বেসরকারী উৎস হইতে অদ্যকার মত আর কখনও ঋণের যোগান হ্রাস পায় নাই। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিঋণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

কৃষিঋণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বাঞ্ছনীয় পদক্ষেপ (Measures Suggested for the Improvement of Agricultural Credit): ১. কৃষিঋণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে সরকারকেই পথপ্রদর্শকের প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে সরকারকে আরও অধিক পরিমাণে স্বল্পমেয়াদি ঋণের যোগান দিতে হইবে। ২. কিন্তু পরিকল্পনার লক্ষ্যপূরণ ও বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য, কৃষকগণের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি ও বৈষয়িক সাম্য স্থাপনের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ বলিয়া, সমবায়ের ভিত্তিতেই গ্রাম্য ঋণব্যবস্থা গঠন করিতে হইবে। গ্রাম্য ঋণদান সমিতিগুলিকে গ্রাম্য মহাজনের স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। ৩. কৃষকের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহদান ও উহা সংগ্রহের জন্য গ্রামাঞ্চলে আরও পোস্ট অফিস, সেভিংস ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের শাখা খুলিতে হইবে। ৪. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে আরও অধিক পরিমাণে কৃষিঋণদানে অগ্রসর হইতে হইবে। ৫ গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজারগুলিতে অবিক্রীত ফসল মজুদ রাখিবার জন্য গুদাম নির্মাণ করিতে হইবে। ঐ সকল গুদামে রক্ষিত ফসলের রসিদের জামিনে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক হইতে কৃষকগণকে ঋণদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ৬ সমবায় ঋণদান সমিতির সঙ্গে সমবায় কৃষি, ও সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলির ঘনিষ্ঠতর সংযোগস্থাপন করিতে হইবে। তাহা হইলে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির পক্ষে প্রদত্ত ঋণের ব্যবহারের তদারক ও পরিশোধের নিশ্চয়তা ঘটিবে। ৭ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণদানের শর্তাদির কঠোরতা আরও শিথিল এবং ঋণের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। ৮ গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটির মতে কৃষিঋণদানের জন্য কৃষিঋণ করপোরেশন গঠন কৃষিঋণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন।

এ সম্পর্কে উল্লেখনীয় যে ইতোমধ্যেই স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপন দ্বারা এবং সারা ভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটির পরামর্শ অনুসারে গ্রামীণঋণ পুনর্গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সরকার এ ক্ষেত্রে [illegible] অগ্রসর হইয়াছেন এবং উপরে প্রদত্ত অনেক ব্যবস্থাই তাঁহারা কার্যকর করিয়াছেন।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পটভূমিকায় কৃষির দ্রুত পুনর্গঠনে সাহায্য করিবার জন্য গ্রামীণঋণ ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহ দূর করা অত্যাবশ্যক। এই কারণে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর যখন সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়, সে সময় ১৯৫১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গ্রামীণঋণ সম্পর্কে বিশদ অনুসন্ধান, ত্রুটি নির্দেশ ও প্রতিকারের উপায় বাহির করিবার জন্য একটি সমীক্ষা কমিটি নিয়োগ করেন। ইহা সারা ভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটি (All India Rural Credit Survey Committee) নামে পরিচিত। ১৯৫৪ সালে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করেন।

কমিটি দেখিতে পান যে, গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষকগণ অপেক্ষা কৃষকগণ অধিক পরিমাণে ঋণগ্রস্ত; তাহাদের মোট ঋণের ৪১ শতাংশ মাত্র কৃষিকর্ম সংক্রান্ত। কৃষকগণের মোট ঋণের মাত্র ৩.৩ শতাংশ সরকার ৭ ৩.১ শতাংশ মাত্র সমবায় সমিতিগুলি সরবরাহ করিয়েছে। ৭০ শতাংশ ঋণ এখনও মহাজন সরবরাহ করিতেছে। ইহা হইতে কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ পর্যন্ত সমবায় আন্দোলন কৃষকগণকে ঋণের যোগান দিতে ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু কমিটি মনে করেন যে, সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতা সত্ত্বেও, ভারতের বর্তমান অবস্থায় ইহাকেই ভিত্তি করিয়া নূতন ভাবে গ্রামীণ ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠন আবশ্যক।

সারা ভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ (Recommendations of the A I R C S C): তিনটি মূলনীতি: কমিটি মনে করেন যে গ্রামীণঋণ পুনর্গঠনের জন্য সমবায় সমিতিকেই মূল প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার জন্য কমিটি যে তিনটি মূলনীতি গ্রহণের সুপারিশ করেন তাহা হইল:

ক. সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারকে অংশ লইতে হইবে। খ. ঋণদানকারী ও অন্যান্য সমবায় সমিতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। গ. সমবায় আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের জন্য কর্মীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ছয়টি প্রধান ব্যবস্থা: উপরোক্ত তিনটি মূলনীতির অনুসরণে কমিটি ছয়টি প্রধান ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

১. প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে বৃহত্তর আকারে সংগঠিত করিতে হইবে। অন্যান্য প্রকার কৃষিসমবায় সমিতিগুলির সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। রাজ্যস্তরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ও প্রাথমিক সমিতিগুলিতে সীমাবদ্ধকালের জন্য সরকারকে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

২. গ্রামবাসীদের অন্যান্য যাবতীয় জীবিকা কার্য (যথা, ভূমিকর্ষণ, সেচ, বীজ ও সার সংগ্রহ, পশুপালন, মৎস্যচাষ, পরিবহণ, কুটির শিল্প, কৃষিপণ্য সংরক্ষণের মজুদ গৃহ ও গুদামনির্মাণ, কৃষিপণ্য বিক্রয়, কৃষিপণ্যকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অর্ধপ্রস্তুত পণ্যে পরিণতকরণ প্রভৃতি) সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করিতে হইবে। ইহাদের ক্ষেত্রেও সরকারের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

৩. সমবায়ের উন্নয়ন ও সমবায় ভিত্তিতে দেশে ব্যাপকভাবে গুদাম নির্মাণ প্রকল্প পরিচালনার জন্য, সমবায় ভিত্তিতে কৃষিপণ্য বিক্রয় সংগঠিত করার জন্য, কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারী উদ্যোগে গঠিত একটি সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম পরিষদ (Cooperative Development and Warehousing Board) থাকিবে। একটি কেন্দ্রীয় গুদাম করপোরেশন ও একটি করিয়া রাজ্যগুদাম করপোরেশন থাকিবে।

পাঁচটি বিভিন্ন তহবিল (funds) সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে থাকিবে দুইটি। একটি দীর্ঘমেয়াদী ও একটি মাঝারিমেয়াদী ঋণের জন্য। একটি তহবিল থাকিবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্যদপ্তরের অধীনে। ইহা হইতে সমবায় সমিতিগুলিকে প্রদত্ত অনাদায়ী ঋণ মকুবের জন্য অর্থ দেওয়া হইবে। অপর দুইটি তহবিল থাকিবে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম পরিষদের অধীনে। একটি হইতে গুদাম নির্মাণে ও কৃষিপণ্য বিক্রয় করিবার সহায়তার জন্য ঋণ ও সাহায্য দেওয়া হইবে। অপরটি গুদাম সংক্রান্ত সুবিধা সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হইবে।

৫ গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ব্যাঙ্কিং সুবিধা সৃষ্টির জন্য সরকারের অংশীদারীতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রসার ঘটাইতে হইবে। এইজন্য ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দ্বারা একটি নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।

৬. সমবায়ের সাফল্যের জন্য বিস্তর কর্মীকে শিক্ষাদান করিতে হইবে। এজন্য সমবায় শিক্ষাদান পরিচালনার কেন্দ্রীয় কমিটিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও সরকার কর্তৃক নানাবিধ সাহায্য দিতে হইবে।

সুপারিশগুলির কার্যে পরিণতি (Implementation): গ্রামীণঋণ কাঠামোর পুনর্গঠনের জন্য সাধারণভাবে গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সকল প্রধান সুপারিশই সরকার গ্রহণ করেন ও অবিলম্বে কার্যে পরিণত করেন।

১ বৃহদাকারে কৃষি ও অ-কৃষি ঋণদান সমিতি গঠন ও উহাতে সরকারের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণনীতি কার্যকর হইয়াছে।

২. কৃষির যাবতীয় কার্যাবলী সর্বাধিকসম্ভব পরিমাণে সমবায় ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়াছে।

৩. ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ দ্বারা স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬০ সালের মধ্যে ইহা গ্রামাঞ্চলে ৪০০টির অধিক নূতন শাখা খুলিয়াছে।

৪ সমবায় সমিতিগুলির কার্যে সরকার যাহাতে অধিক পরিমাণে অংশগ্রহণ করিতে পারে, সেজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধিত হইয়াছে। এই সংশোধনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে দুইটি তহবিল খোলা হইয়াছে। প্রথমটির নাম জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী) তহবিল। ইহা ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এককালীন দান ৫ কোটি ও বাৎসরিক অনুদান ৫ কোটি, এই দশ কোটি টাকা লইয়া গঠিত হইয়াছে। রাজ্যসরকারগুলি কর্তৃক সমবায় ঋণদান প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়ের জন্য, কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির দীর্ঘমেয়াদী ঋণের চাহিদা পূরণের জন্য, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে এই তহবিল হইতে ঋণ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় তহবিলটির নাম জাতীয় কৃষিঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল। ১৯৫৬ সালের জুন মাসে এককালীন দান ১ কোটি ও বাৎসরিক অনুদান ১ কোটি, এই দুই কোটি টাকা লইয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝারি মেয়াদের ঋণদানের জন্য ও স্বল্পমেয়াদী ঋণকে মাঝারিমেয়াদী ঋণে পরিবর্তনের জন্য এই তহবিল হইতে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেওয়া হইবে।

৫. ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম পরিষদ স্থাপিত হয় ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় গুদামনির্মাণ করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন তহবিল ও জাতীয় গুদাম উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টি করা হইয়াছে।

৬. ১৯৫৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যুক্তভাবে সমবায় শিক্ষাদান পরিচালনার কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। ইহা পুণাতে সমবায়ের পদস্থ কর্মচারীদের জন্য একটি সমবায়

[illegible] অনুযায়ী, গ্রামাঞ্চলের ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়নে, সমবায়ের নিয়োগকৃত কর্মীদের শিক্ষার জন্য পাঁচটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে।

৭. জম্মু এবং কাশ্মীর ও কেরল ব্যতীত আর সকল রাজ্যেই রাজ্য গুদাম করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে।

মন্তব্য (comments) : এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা সরকার গ্রামীণঋণ কাঠামোর পুনর্গঠনের সবিশেষ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। অবশ্য অনেকের মতে সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার সুপারিশে দুইটি ত্রুটি আছে। ১. তাঁহারা মনে করেন সমবায় সমিতিগুলি অত্যন্ত বৃহদাকারে গঠন করা উচিত নহে। ২ উহাদের কার্যে সক্রিয় সরকারী অংশগ্রহণে সমবায় আন্দোলনে সরকারের আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ বাড়িবে। ইহা সমবায় আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে। যাহাই হউক এই দুইটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিলে, গ্রামীণঋণ কাঠামোর পুনর্গঠনের চেষ্টা অনেকখানি সুফল দান করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কৃষিঋণ ব্যবস্থার উন্নয়নে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা

RESERVE BANK AND RURAL CREDIT

১. ভারতে কৃষিঋণ সরবরাহে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি উল্লেখনীয় ভূমিকা রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী উহার প্রতিষ্ঠাকালেই কৃষিঋণের জন্য উহার একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয়। ইহার দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথমত, কৃষি সংক্রান্ত সকল প্রশ্ন বিবেচনা করা। দ্বিতীয়ত, উহার নিজের কৃষিঋণদান কার্যাবলীর এবং প্রাদেশিক (বর্তমানে রাজ্য) সমবায় ব্যাঙ্কগুলির এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও প্রতিষ্ঠানের কৃষিঋণদান কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

২. কৃষিঋণ বিভাগের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কৃষিঋণ দেয় তাহা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক মারফত সমবায় কৃষিঋণদান সমিতির হস্ত দিয়া কৃষকগণের নিকট পৌঁছায়। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের ও সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় সমিতির হুণ্ডি, সরকারী ঋণপত্র, অনুমোদিত জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের ঋণপত্র প্রভৃতির জামিনে এই ঋণ দেওয়া হয়। [সাধারণত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের 17 (2). (b), 17 (4) (a), 17 (4) (c) ও 17 (4AA), ধারার অধীনে এই কৃষিঋণ প্রদত্ত হয়।]

৩. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের [17 (2) (b) ধারার] সংশোধন দ্বারা কৃষিঋণের মেয়াদ ৯ মাস হইতে বর্ধিত করিয়া ১৫ মাস করা হইয়াছে। তবে সাধারণত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ১২ মাসের অধিক মেয়াদে ঋণ দান করা হয় না। [এই সংশোধনের দ্বারা দুই অথবা ততোধিক স্বাক্ষর সংযুক্ত (উহার মধ্যে একটি কোন তপশীলভুক্ত অথবা রাজ্যসমবায়ব্যাঙ্কের সহি হওয়া চাই) এবং মরশুমী কৃষিকার্য পরিচালনা অথবা কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ১৫ মাসের অনধিক মেয়াদের বিল (বাণিজ্যিক হুণ্ডি) ক্রয়, বিক্রয় ও পুনর্বাট্টার অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে।]

৪. পূর্বে [17 (2) (a) ধারায়] শুধু মাত্র বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ পাইত। সংশোধনদ্বারা বর্তমানে (এই ধারাতে) সমবায় ব্যাঙ্কগুলিও ঋণ পাইতেছে।

৫. ১৯৫১ ও ১৯৫৩ সনের সংশোধন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে মাঝারিমেয়াদী ঋণ দানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। রাজ্য সরকার গ্যারান্টি দিলে ৫ বৎসরের জন্য এরূপ ঋণ রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলি পাইতে পারে।

৬. সমবায় ব্যাঙ্কগুলির বাণিজ্যিক ঋণপত্র (Commercial papers) এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বাট্টাযোগ্য করা হইয়াছে।

*অনুমোদিত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতি

রাজ্য ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ প্রদান করিতেছে।

৮. কৃষিঋণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় ব্যাঙ্কগুলির নিকট ব্যাঙ্কবাট্টাহার (Bank Rate) অপেক্ষা ১½ টাকা কম হারে সুদ আদায় করে।

৯. ১৯৪৯ সাল হইতে রাজ্যসরকার কর্তৃক গ্যারান্টিপ্রাপ্ত জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ঋণপত্র (debentures) কিনিয়া, পরোক্ষ ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষককে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতেছে।

১০. ১৯৫৬ সালে কৃষিঋণদানের জন্য আরও নূতন দুইটি তহবিল [জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী) তহবিল এবং জাতীয় কৃষিঋণ (স্থিরীকরণ) তহবিল] খোলা হইয়াছে। ইহাদের মারফত দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী ঋণের সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে।

১১. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় ব্যাঙ্কগুলির টাকা স্থানান্তরিত করিবার শর্ত সহজ করিয়াছে এবং ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইহার কমিশন অনেক হ্রাস করিয়াছে।

১২. সমবায় ব্যাঙ্কগুলির ঋণ পরিশোধের সময়সংক্রান্ত কঠোরতা হ্রাস করিয়া, কৃষিকার্য ছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ঋণদান করিয়া এবং উহাদের প্রাপ্তব্য ঋণের সীমানির্ধারণের কঠোরতা শিথিল করিয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উদার হস্তে ঋণ দিতেছে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহের ফলে ১৯৫১ সাল হইতে বাজ্যসমবায় সমিতিগুলি কর্তৃক প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫১-৫২ সালে উহার পরিমাণ ১১·২৯ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৩-৬৪ সালে ঋণের পরিমাণ ৩০২ কোটি টাকা হইয়াছে। তবে ইহা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, কৃষির প্রয়োজনীয় ঋণের তুলনায় ইহা নগণ্য।

কৃষিঋণের ক্ষেত্রে স্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকা
STATE BANK AND RURAL CREDIT

সারাভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে স্টেট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ভারতে সুসংবদ্ধ গ্রামীণঋণ কাঠামো গঠনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহা সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনের প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য রাখিয়া উহাদের মাধ্যমে গ্রামীণ, বিশেষত কৃষিঋণের সম্প্রসারণে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে।

ইহার গ্রামীণঋণ সংক্রান্ত কার্যাবলীকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. কৃষিঋণের উন্নয়নের জন্য সাধারণ সহায়তা: এজন্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অর্থ স্থানান্তরের সুবিধা ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ ও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ঋণপত্র ক্রয় করিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান। ২. সমবায় পণ্যবিক্রয় সমিতি ও কৃষিজাত দ্রব্যের বিবিধ প্রক্রিয়াজাতকরণ (Processing) সমবায় সমিতিগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান। ৩. গুদাম নির্মাণকার্যে সহায়তা দান। ৪। সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সহিত নিজ কার্যাবলীর সংযোগ সাধন।

১. কৃষিঋণের উন্নয়নের জন্য সাধারণ সহায়তা: ক গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্রে টাকাপয়সা স্থানান্তরের সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে স্টেট ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক উহাদের অন্তর্ভুক্ত সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে অধিকতর সুবিধা দিতেছে। পূর্বে সপ্তাহে একবার মাত্র স্থানান্তরের সুবিধা দানের পরিবর্তে বর্তমানে সপ্তাহে তিনবার বিনা খরচে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত স্থানান্তরের সুবিধা দেওয়া হইতেছে।

[illegible] স্টেট ব্যাংক ১৯৬০ সালের মধ্যে নূতন ৪০০টি শাখাই গ্রামাঞ্চলে স্থাপন [illegible] ইহাদের দ্বারা গ্রামাঞ্চলে একদিকে যেমন স্থানীয় [illegible] সংগ্রহ গ্রহণ করা হইয়াছে, তেমনি গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিগণের টাকাপয়সার স্থানান্তরের সুবিধাও যথেষ্ট বাড়িয়াছে।

গ. **স্বল্পমেয়াদী ঋণের সম্প্রসারণের** জন্য স্টেট ব্যাংক সমবায় ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে—১ সরকারী ঋণপত্রের জামিনে ঋণ দিতেছে। ইহার উপর ব্যাংক সাধারণ ঋণের সুদের হার অপেক্ষা ½% শতাংশ কম হারে সুদ আদায় করে। ২. স্বল্পতর সুদে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে পণ্যের পুনর্বন্ধক (re-pledge) রাখিয়া ঋণ দেয়। ৩. কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলি যাহাতে উহাদের অন্তর্ভুক্ত সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দিতে পারে সেজন্য সরকার গ্যারান্টি দিলে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংককে ঋণ দেয়। ৪ অল্প খরচে সমবায় ব্যাংকের চেকের টাকা দেয় বা সামান্য কমিশনে স্টেট ব্যাংক নিজেই ক্রয় করে। ৫. স্বল্প কমিশনে সমবায় ব্যাংকগুলি আদায় করিয়া প্রাপ্য বাণিজ্যিক হুণ্ডি বা বিলের টাকা আদায় করিয়া দেয়।

ঘ **দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা :** ১. স্টেট ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলির (Apex Coop Land Mortgage Bank) ঋণপত্র কিনিয়া তাহাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণের যোগান দেয়। ২. ঐ সকল ঋণপত্রের জামিনে ঋণ দিয়া টাকার বাজারে (money market) উহাদের জনপ্রিয়তা বাড়ায়। ৩. সরকারের গ্যারান্টি থাকিলে, অল্প সময়ের জন্য স্টেট ব্যাংক কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাংকগুলিকে ঋণও দিয়া থাকে।

২. **কৃষিপণ্যের বিক্রয় ও কৃষিদ্রব্যের বিবিধ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ঋণদান :** পণ্যবিক্রয় সমিতিগুলি, চিনি ও গুড় উৎপাদক, তুলার বীজ ঝাড়াই, প্রভৃতি বিবিধ প্রক্রিয়াজাতকরণ সমিতিগুলি, পণ্য বন্ধক রাখিয়া ও সমিতির ডিরেক্টরদের জামিনে প্রভৃতি নানাবিধভাবে স্টেট ব্যাংক হইতে ঋণ পাইয়া থাকে।

৩. **গুদামজাতকরণে সহায়তা :** কৃষিপণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সারাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রের কৃষিজাত দ্রব্যের গুদাম নির্মাণ প্রকল্প গৃহীত হইয়াছে। স্টেট ব্যাংক ইহার সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতেছে। জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদাম পরিষদ, কেন্দ্রীয় গুদাম কর্পোরেশন ও রাজ্য গুদাম কর্পোরেশনগুলির পরিচালক সমিতিতে স্টেট ব্যাংকের প্রতিনিধি গৃহীত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গুদাম কর্পোরেশনের পুঁজিতে স্টেট ব্যাংকের অংশ আছে। বিভিন্ন গুদামের পরিচালনায় স্টেট ব্যাংক কর্মচারীদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। সর্বোপরি এই সকল গুদামে রক্ষিত কৃষিজাত দ্রব্যের রসিদের জামিনে স্টেট ব্যাংক ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

৪. **সমবায় ব্যাংকের কার্যাবলীর সহিত সমন্বয়সাধন :** স্টেট ব্যাংক উহার নীতি এমনভাবে নির্ধারণ করে যেন তাহাতে সমবায় ব্যাংকগুলি শক্তিশালী হয়। যেখানেই সমবায় অর্থ সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল, তথায় উহাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে। সাধারণভাবে সমবায় আন্দোলনেও ইহা বর্তমানে শরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং গ্রামীণঋণ সম্প্রসারণের ও পুনর্গঠনের জাতীয় নীতির সহিত সংগতি রাখিয়া স্টেট ব্যাংক এক্ষেত্রে উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে

ঋণদানের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা
THE GOVERNMENT AND RURAL CREDIT

১. সরকারের প্রত্যক্ষভাবে কৃষিঋণদানের প্রচেষ্টা বিগত শতাব্দীতে ১৮৮৩ সাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৮৩ সালে জমি উন্নয়ন ঋণ আইন ও ১৮৮৪ সালে কৃষিঋণ আইন পাস হয়। এই দুইটি আইনে প্রদত্ত ঋণ তাকাভি ঋণ (Taccavi Loans) নামে পরিচিত। প্রথম আইনটির দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী ও দ্বিতীয় আইনটির দ্বারা স্বল্পমেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ ইহাদের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য ও ঋণের শর্তগুলি কঠোর থাকায় উহাতে কৃষকের সামান্যই উপকার হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই সকল ঋণের অধিকাংশই ধনী কৃষকগণ পায়। দরিদ্র কৃষকের বিশেষ উপকার হয় না। সুদের চড়া হারও ইহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে।

২. ইহা ছাড়া ইদানীংকালে অনুদান ও অন্যান্য ঋণ হিসাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি কৃষকদের নানাপ্রকার আর্থিক সহায়তা দিতেছেন।

কিন্তু এযাবৎ মোট প্রত্যক্ষ সরকারী ঋণের পরিমাণ মোট কৃষিঋণের ৩ শতাংশের অধিক হয় নাই। সেজন্য প্রথম পরিকল্পনাকালে সরকার সারাভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশক্রমে গ্রামীণঋণ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যে পরিণত করিয়াছেন।

৩. ১৯৫৫ সালে সরকার গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা প্রসার ও সমবায় ঋণদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন।

৪. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে দুইটি কৃষিঋণ তহবিল, কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের অধীনে একটি এবং সমবায় ও গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে দুইটি মোট পাঁচটি তহবিল স্থাপন করিয়াছেন।

৫. কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে গুদাম নির্মাণ প্রকল্প ও উহা কার্যে পরিণত করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গুদাম নির্মাণ করপোরেশনসমূহ গঠন করিয়াছেন।

৬. জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে অধিক দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৭. জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে স্টেট ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পায় সেজন্য তাহাদের ঋণের গ্যারান্টি দিতেছেন।

৮. কৃষি ঋণের সমবায় ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষাদান সমিতির মাধ্যমে সমবায় শিক্ষাদান কার্যের সম্প্রসারণ করিতেছেন।

৯. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ও ঋণদান সমিতিগুলির কার্যের সংযোগসাধন করিতেছেন।

১০. পরিকল্পনা দ্বারা উপরোক্ত ঋণদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণের চেষ্টা করিতেছেন।

১১. ১৯৬৪ সনে কৃষির দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য ভারত সরকার কৃষিপুনঃঅর্থসংস্থান করপোরেশন স্থাপন করিয়াছেন।

গ্রামীণ ঋণদানের ক্ষেত্রে সমবায় ঋণদানসমিতির ভূমিকা
COOPERATIVE CREDIT SOCIETIES AND RURAL CREDIT

১৯০৪ সালে প্রথম সমবায় আইন পাসের পর ভারতের সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তনকাল হইতে এদেশে সমবায় আন্দোলনের প্রধান রূপই ছিল ঋণদানমূলক। সমবায় ঋণদান সমিতির সংখ্যাই ছিল প্রথমাবধি সর্বাধিক। কিন্তু সারাভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষার বিবরণে প্রকাশ, সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি দ্বারা প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কৃষকগণের দ্বারা গৃহীত ঋণের ৩ শতাংশ

।। এজন্য সারাভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটি ভারতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

ঋণদানক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ: সমবায় ঋণদান সমিতির অগ্রগতি ও সাফল্যের অভাবের কারণ বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখা যায়:

১. সমিতিগুলির আর্থিক সাচ্ছল্যের অভাব। উহাদের পুঁজি খুব কম, আমানত জমার (deposit) পরিমাণও নগণ্য। ২. সমিতিগুলি ব্যাঙ্কিং-এর মূলনীতিগুলি অনুসরণ করিয়া চলে না। ঋণের সহিত উহাদের পুঁজি ও দেনার (liability) সামঞ্জস্য থাকে না। ৩. ঋণদানের ব্যাপারে তাহারা বিচক্ষণতার পরিচয় দেয় না। অত্যধিক ঋণদান, অনুৎপাদনশীল ঋণদান প্রভৃতির দৃষ্টান্ত কম নহে। ৪. সমিতিগুলি নিজেরা অল্প সময়ে ঋণ ও আমানত জমা পায় কিন্তু অধিকাংশ সময়েই প্রদত্ত ঋণ ঠিকমত আদায় করিতে সক্ষম হয় না। উহাতে কার্যত প্রদত্ত ঋণের অধিকাংশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণে পরিণত হয়। ইহাতে সমিতির আর্থিক সামর্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। ৫. সমিতিগুলি চড়া হারে সুদ আদায় করে। সাধারণত ইহার হার শতকরা ১২ হইতে ২৪ টাকার মধ্যে। ইহাতে যাহারা ঋণ লয় তাহাদের যেমন বিশেষ উপকার হয় না, তেমনি ঋণের পরিমাণও অল্প হয়। ৬. সমিতিগুলি গ্রাম্য সঞ্চয় আকর্ষণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। উহারা গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয়কারীদের আকৃষ্ট করিতে পারিলে, উহাদের আমানত জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত। ইহাতে সমিতিগুলির শক্তি বাড়িত। ৭. অধিকাংশ সমিতিরই পাওনা টাকা অনাদায়ী রহিয়া যায়। ফলে এই ক্ষতির পরিমাণ বহন করিতে না পারিয়া অল্পকালের মধ্যে উহারা উঠিয়া যায়। ৮. এতদিন যাবৎ সমবায় ঋণদানকার্য কৃষির অন্যান্য সমস্যা হইতে বিচ্ছিন্ন বিষয় বলিয়া সরকার মনে করিতেন। ফলে, সমবায় ঋণদানকার্যের উন্নয়নের আংশিক ও বিচ্ছিন্ন চেষ্টা সফল হয় নাই।

বস্তুতপক্ষে, সমবায় সম্পর্কে ধারণার ত্রুটির জন্যই অতীতে সমবায় আন্দোলন মূলত ব্যর্থ হইয়াছে। ঐ ব্যর্থতা সমবায় পদ্ধতির জন্য নহে। উপযুক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিলে ইহা ভারতের কৃষকগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন সাধনে সক্ষম—একথা উপলব্ধি করিয়াই, সারাভারত গ্রামীণ-ঋণ সমীক্ষা কমিটি ইহাকে ঋণকাঠামোর ভিত্তরূপে ব্যবহারের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। বর্তমানে এই অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ২৭০.৪ কোটি টাকা। ইহার তিন-চতুর্থাংশই কৃষির জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল।

দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ

LONG TERM AGRICULTURAL CREDIT

প্রয়োজনীয়তা: কৃষিকার্যে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী ঋণের ন্যায় দীর্ঘমেয়াদী ঋণও অপরিহার্য। ইহা ছাড়া কৃষিজমির স্থায়ী উন্নতিবিধান, বৃহৎ সেচকার্য পরিচালনা, পতিতজমি উদ্ধার, পুরাতন ঋণ পরিশোধ, জমি ক্রয় প্রভৃতি কার্য সম্পাদন কঠিন। ভারতে স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণের সমস্যাই অতি তীব্র। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের তো কথাই নাই।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও মহাজনী আইনসমূহের কঠোরতার দরুন গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সংগ্রহের পুরাতন বেসরকারী উৎসগুলি লুপ্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায় কৃষিকার্যের স্থায়ী উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহের জন্য নূতন উৎস সৃষ্টি ও উহার সম্প্রসারণ

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ... দীর্ঘমেয়াদী ... বাড়িয়াছে।

প্রতিষ্ঠান : পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে কৃষিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জন্য এক বিশেষ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহা হইল জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক। ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানীতে ইহা বিস্তার লাভ করে।

ভারতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক : ভারতের কৃষি কমিশন (১৯২৬) ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি (১৯২৯) ভারতে সমবায় ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপন ও প্রসারের জন্য সুপারিশ করেন।

ভারতের জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, উহারা—১. সমবায় ভিত্তিতে গঠিত। ২. আকারে বড় নহে। ৩. সাধারণত চারিটি উদ্দেশ্যে ঋণ দেয়—কৃষকের জমি ও গৃহসম্পত্তির দায় মোচন, জমির উন্নতিসাধন, পুরাতন ঋণ পরিশোধ ও জমি ক্রয়। ৪. সাধারণত বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যের অর্ধেকের বেশি ঋণ দেয় না। ৫. সাধারণত ২০ বৎসরের অধিক মেয়াদে ঋণ দেয় না। ৬. ঋণগ্রহণকারীর পরিশোধ ক্ষমতা ও ঋণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ স্থির করে। ৭. প্রথম অবস্থায় সরকার হইতে আর্থিক সাহায্য পায় এবং স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে।

ভারতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রসারের ইতিহাসকে চারিভাগে ভাগ করা যায় :

১. প্রথম যুগ (১৯২০-২৯ সাল) : এই যুগে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন প্রদেশে সমবায় ভিত্তিতে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

২. দ্বিতীয় যুগ (১৯৩০-৩৯ সাল) : এই যুগে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি অত্যন্ত পরীক্ষা ও সংকটের সম্মুখীন হয়। ১৯৩৯ সালে সারা ভারতে ২২৬টি জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল।

৩. তৃতীয় যুগ (১৯৪০-৫০ সাল) : যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী এই যুগে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি অপেক্ষাকৃত স্থিতিলাভ করে। উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৮৪-তে পরিণত হয়।

৪. চতুর্থ যুগ (১৯৫১-) : পরিকল্পনার যুগ। এই সময়ে ইহাদের সুপরিকল্পিত অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। ১৯৫৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৩। বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা হয় ১৫। উহাদের সদস্য সংখ্যা হয় ১,৫০,৯৪৪।

ইদানীংকালে অগ্রগতি : ১৯৫১-৫২ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সালে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির সংখ্যা ৬ হইতে বাড়িয়া ১৮-তে পরিণত হয়। ১৯৬০-৬১ সালে প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৪৬৩। ১৯৫১-৫২ হইতে ১৯৬০-৬১ সালে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির পুঁজির পরিমাণ ৪৪ লক্ষ টাকা হইতে বাড়িয়া ৪ কোটি ৩৩ টাকায় পরিণত হয়। ঐ সময়ে চলতি মূলধন ১০.১৭ কোটি হইতে বাড়িয়া ৪৭.৬ কোটি টাকা হয়। প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির চলতি মূলধন ঐ সময়ে ৭.৬ কোটি হইতে ২৬.৯৯ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯৬০-৬১ সালে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি ও প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি যথাক্রমে ১১.৬২ কোটি টাকা ও ৭.১৭ কোটি টাকা ঋণ দিয়াছে। সামগ্রিক অবস্থা বিচারে এই অগ্রগতি সন্তোষজনক মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অকিঞ্চিৎকর।

সাম্প্রতিককালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানাভাবে ইহাদের সম্প্রসারণের ও পুঁজি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রস্তাব করেন যে, একটি বিশেষ শর্তে তাঁহারা যুক্তভাবে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ঋণপত্রের ৪০ শতাংশ অথবা

[illegible] অবিক্রীত ঋণপত্রের [illegible]—এই দুইয়ের মধ্যে [illegible] তাহা, কিনিয়া লইবেন।" কিন্তু কয়েকটি কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক ছাড়া আর সকলে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া, সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষা কমিটির পরামর্শ অনুসারে ১৯৫৭-৫৮ সালে গ্রাম্য সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক দ্বারা "গ্রামীণ ঋণপত্র" (Rural Debentures) বাজারে বিক্রয়ের পরিকল্পনা করেন। এইগুলির মেয়াদ ৬/৭ বৎসরের। ফসল বিক্রয়ের সময় এইগুলি গ্রামাঞ্চলে বিক্রয় করা হইবে। জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী) তহবিল হইতে টাকা লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই জাতীয় ঋণপত্রের ½ অংশ কিনিতে রাজী হয়। বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যে এই প্রকার 'গ্রামীণ ঋণপত্র' সাফল্যের সহিত কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি বিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিতেছে।

ত্রুটি : সাম্প্রতিককালে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের উন্নতি দেখা গেলেও ইহাদের কয়েকটি ত্রুটি দেখা যাইতেছে।

১. ভারতের সর্বত্র ইহারা সমভাবে উন্নতিলাভ করিতেছে না। ২. পরিচালকগণের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব রহিয়াছে। ৩. ইহাদের আয় কম, ব্যয় বেশি। ৪. ঋণ মঞ্জুর করিতে বড় বেশি দেরি হয়। ঋণের শর্তগুলিও কঠোর। ৫. নূতন ঋণের অধিকাংশই পুরাতন ঋণ শোধে ব্যয় করা হয়। ৬. কৃষকের আয়ক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ঋণ আদায়ের কিস্তি স্থির করা হয় না। তাহাতে কৃষকের অসুবিধা হয়। ৭. কিস্তিগুলি নির্ধারিত সময়ে সকল ক্ষেত্রে আদায় করা হয় না। ৮. অন্যান্য কৃষি সমবায় সমিতিগুলির সহিত ইহাদের সংযোগ অতি অল্প।

এই ত্রুটিগুলি দূর হইলে ভারতে দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ ব্যবস্থার আরও উন্নতি ঘটিবে।

কৃষি পুনঃঅর্থসংস্থান করপোরেশন

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION

প্রয়োজনীয়তা (The need) : ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই কৃষি পুনঃঅর্থসংস্থান করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা বাণিজ্যের পুনঃঅর্থসংস্থান করপোরেশনের মতই কৃষককের অর্থসংস্থান ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগত সংযোজন ঘটিয়াছে। কৃষির উন্নয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের ফলে কৃষি ঋণদান ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি অপসারিত হইল। কাহারও কাহারও মতে চা, কফি ও রবার বাগিচাগুলি সহ ভারতের কৃষিক্ষেত্রে বর্তমানে স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বাবদ বৎসরে প্রায় ১,৩০০-১,৪০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ভারতের টাকার বাজারের সহিত কৃষকদের স্থায়ী সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। কৃষি পুনঃঅর্থসংস্থান প্রতিষ্ঠানের মত উন্নয়ন ব্যাঙ্করূপে কাজ করিতে সক্ষম একটি স্বায়ত্তশাসিত বিধিবদ্ধ করপোরেশন প্রতিষ্ঠার দ্বারা সে প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে।

ইহা গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং কৃষিগত সমবায় ঋণের সমস্যা বিবেচনা করিবার জন্য ১৯৬০ সালে নিযুক্ত সমবায় ঋণ কমিটির সুপারিশের ফল। কমিটি দেখিতে পাইয়াছেন যে, কৃষি ঋণের পরিমাণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকিলেও ছোটখাটো চাষীরা এবং বিশেষতঃ রায়তি কৃষকেরা ইহা হইতে সমস্ত উপকার পাইয়াছে। কমিটি আরও মনে করেন যে, কৃষি উন্নয়নের জন্য মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের যে যোগান বর্তমানে রহিয়াছে তাহা যথেষ্ট [illegible] কমিটির মতে জমির উন্নয়নের কার্যক্রমের এবং কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি ঋণের পরিমাণ [illegible]

সুসম্প্রসারিত হইবে। এবং এজন্যও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে কৃষিঋণ দিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্ককে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির ঋণপত্রে আরও বেশি পরিমাণে লগ্নী করিতে হইবে। ইহা ছাড়াও এজন্য আরও কিছু করা প্রয়োজন।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষি ঋণের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। কিন্তু উহার পক্ষে কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্করূপে কাজ করা সম্ভব নহে। প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণের পরিমাণ অথবা উহার মেয়াদ অত্যন্ত বেশি এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক বা জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি কৃষির উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহে অক্ষম। এজন্য এইরূপ একটি স্বতন্ত্র কৃষি ঋণ সংস্থার প্রয়োজন তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষি পুনঃঅর্থসংস্থান কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই প্রয়োজন সাধিত হইবে।

গঠন (Organization): কৃষি পুনঃঅর্থসংস্থান কর্পোরেশন একটি স্বয়ংচালিত সংস্থা (autonomous body) রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাইতে ইহার প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি লইয়া ইহা ভারতের অন্যান্য স্থানে কার্যালয় স্থাপন করিতে পারে।

নয় জন ডিরেক্টার লইয়া গঠিত একটি ডিরেক্টর বোর্ডের উপর ইহার পরিচালনভার ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান, একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তিনজন কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত ও একজন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মনোনীত সাধারণ ডিরেক্টার এবং বাকি তিন জন ডিরেক্টরের একজন রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা, একজন কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা এবং একজন জীবনবীমা কর্পোরেশন, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য শেয়ার হোল্ডারগণ দ্বারা নির্বাচিত হইবে। ইহার শেয়ার পুঁজির অর্ধাংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একজন ডেপুটি গভর্নর ইহার সভাপতি হইবেন এবং ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও একজন সাধারণ ডিরেক্টার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক মনোনীত হইবেন। তাহা ছাড়া, কর্পোরেশন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারও ইহাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা তিনজন ডিরেক্টর মনোনীত করিবেন এবং শেয়ার পুঁজি ও উহার উপর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান সম্পর্কে গ্যারান্টি দিবেন। কর্পোরেশন কোন ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিলে কেন্দ্রীয় সরকার উহারও গ্যারান্টি দিবেন। কর্পোরেশনের হিসাব পত্র ও বিবরণাদি সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে অডিটর জেনারেলকে দিয়া ইহার হিসাব-পত্র পরীক্ষা করাইতে পারিবেন।

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি, জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং বীমা ও ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিগুলি এই কর্পোরেশনের শেয়ার কিনিতে পারিবে। ইহারা সকলে মিলিয়া একজন ডিরেক্টর নির্বাচন করিতে পারিবে। ইহা ছাড়া, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এবং কেন্দ্রীয় জমি-বন্ধক ব্যাঙ্কগুলিও এই কর্পোরেশনের শেয়ার কিনিতে পারে এবং মোট দুইজন ডিরেক্টর নির্বাচন করিতে পারে।

পুঁজি ও সম্বল (Capital and resources): ১. পুঁজি : প্রতিটি ১০,০০০ টাকার ২৫,০০০ পূর্ণ আদায়ীকৃত মূল্যের শেয়ার দ্বারা গঠিত ২৫ কোটি টাকা অনুমোদিত পুঁজি লইয়া এই কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। ইহার আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ৫ কোটি টাকা অর্থাৎ বর্তমানে মোট ৫০০০ শেয়ার বিক্রি হইয়াছে। ইহার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ২৫০০ শেয়ার, রাজ্য সমবায় ও কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে ১৫০০ শেয়ার এবং জীবন বীমা কর্পোরেশন,

...ভূক্ত ব্যাংকসমূহ, ... ও ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিগুলিকে ১০০০ শেয়ার দেওয়া হইয়াছে। যদি ইহার মধ্যে কোন শেয়ার বিক্রয় না হয় তবে তাহাও বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিনিয়া রাখিবে ও পরে সুবিধামত, উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করিয়া দিবে। কোন একক প্রতিষ্ঠানই উহা যে শ্রেণীর শেয়ার হোল্ডার, সে শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট শেয়ারের দশ শতাংশের বেশি শেয়ার কিনিতে পারিবে না।

২. ঋণ : কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেশনকে আরও পাঁচ কোটি টাকা বিনাসুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণস্বরূপ দিবেন। ইহা ১৫ বৎসর পর ১৫টি বাৎসরিক কিস্তিতে শোধ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, প্রয়োজন হইলে কর্পোরেশন বণ্ড ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ১৮ মাসের মেয়াদে ঋণ লইয়া, কেন্দ্রীয় সরকার অথবা তাহাদের অনুমোদিত কোন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ঋণ লইয়া এবং সরকার, অথবা স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ অথবা কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক হইতে কমপক্ষে এক বৎসরের মেয়াদী আমানত গ্রহণ করিয়া অর্থের সংস্থান করিতে পারে। এইরূপ ঋণের মোট পরিমাণ, শেয়ার পুঁজি ও রিজার্ভ তহবিলের সমষ্টির ২০ গুণের অধিক হইতে পারিবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে কর্পোরেশনকে অনধিক ১৮ মাসের জন্য ঋণ দিতে পারে সেজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার শেয়ারের উপর প্রাপ্তব্য লভ্যাংশ ১৫ বৎসরের জন্য বিনাসুদে এই কর্পোরেশনের নিকট জমা রাখিবে।

ইহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি লইয়া ভারতস্থ অথবা অন্যত্র অবস্থিত কোন ব্যাঙ্ক বা অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কর্পোরেশন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে, উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ভারতীয় মুদ্রায় ঋণ দেওয়ার জন্য বিদেশী মুদ্রায় ঋণ লইতে পারে। এই ব্যবস্থার ফলে কর্পোরেশনের মধ্য দিয়া কৃষির উন্নয়ন ও জমির উন্নতির জন্য বৈদেশিক ঋণ আনয়ন করা সম্ভব হইবে।

উদ্দেশ্য (Objects) : এই প্রতিষ্ঠানটি সরাসরি কৃষিঋণদানের প্রতিষ্ঠান নহে। কর্পোরেশনের প্রধান উদ্দেশ্য কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। কৃষির উন্নয়নের বিশিষ্ট কর্মসূচীগুলির জন্য সমবায় এবং অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে পারে, সে উদ্দেশ্যে উহাদের অর্থসংস্থান বৃদ্ধি করাই এই কর্পোরেশনের লক্ষ্য। বর্তমান কৃষিঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যে সকল কৃষিপ্রকল্পে ঋণদানে সাধারণতঃ অসমর্থ, উহাদের জন্যই কর্পোরেশন সাহায্য প্রদান করিবে। পশুপালন, গোপালন, মৎস্যচাষ, হাঁসমুরগী পালন ও পশু প্রজনন প্রভৃতি কাজের উন্নয়ন কর্পোরেশনের কর্মাবলীর অন্তর্গত।

কার্য (Functions) : প্রথমতঃ, ইহা কৃষিকার্যে পুনঃঅর্থসংস্থানকারক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্য করিবে। অর্থাৎ কৃষিঋণদান কার্যে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি উহারা কৃষকগণকে যে ঋণ দিয়াছে তাহা পূরণ করিবার জন্য (relending) কৃষির উন্নয়ন কার্যে উহাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিবে। দ্বিতীয়তঃ, উহারা কৃষকদিগকে প্রদত্ত ঋণের পুনঃসংস্থানের (relending) উদ্দেশ্য ছাড়াও, এই কর্পোরেশন কৃষিঋণ প্রদানকারী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহ, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এবং সদস্য তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত সমবায় সমিতিগুলিকে অনধিক ২৫ বৎসরের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিবে। যে কোন একটি লেনদেনের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারে।

কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় অধিবক্তা ব্যাঙ্ক, ... ব্যাঙ্কের অনধিক ২৫ বৎসরের মেয়াদী ডিবেঞ্চার কিনিতে পারে। তবে এই ডিবেঞ্চার ... কর্তৃক গ্যারান্টিযুক্ত হওয়া চাই।

সমালোচনা (Criticism) : টাকার ও পুঁজির বাজারের সহিত কৃষিকার্যের যোগাযোগ স্থাপনকারী হিসাবে কৃষি পুনঃঅর্থসংস্থান কর্পোরেশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিবে এবং কৃষিঋণ কাঠামোকে নবরূপ দান করিতে সমর্থ হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এসম্পর্কে কয়েকটি সমালোচনা আছে।

প্রথমত, ইহার অন্যতম সদস্য ভারতের জীবনবীমা কর্পোরেশন একটি বিপুল অর্থ সম্পদশালী প্রতিষ্ঠান হইলেও, ইহা কর্পোরেশনের মাত্র ১০০টি শেয়ার কিনিয়া ১০ লক্ষ টাকামাত্র কর্পোরেশনের পুঁজি ভাণ্ডারে দান করিবে। সঙ্গতির তুলনায় জীবনবীমা করপোরেশনের অবদান এক্ষেত্রে অত্যন্ত অল্প হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে কৃষিঋণ সংগঠনের মধ্যে আনিয়া একটি দীর্ঘদিনের প্রয়োজন পূরণ করা হইয়াছে। কিন্তু তপশীল বহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলিকে কেন বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহার যুক্তি বোধগম্য নহে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি অপেক্ষা তপশীল বহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলি অধিক পরিমাণে কৃষিঋণ দিয়া থাকে। উহাদেরও এই পরিকল্পনায় গ্রহণ করা

তৃতীয়ত, স্টেট ব্যাঙ্কও বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে কৃষিঋণ দান করে অংশ গ্রহণ করিতেছে। অথচ, যদিও ইহা অন্যান্য তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের ন্যায় কর্পোরেশনের শেয়ার খরিদ করিতে পারে, তথাপি কোথাও ইহার অংশ গ্রহণের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। স্পষ্টতঃই, স্টেট ব্যাঙ্ককে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল।

চতুর্থত, কৃষি বর্তমানে রাজ্যসরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। সুতরাং রাজ্যসরকারগুলি যদি অগ্রণী হইয়া স্থানীয় কৃষি উন্নয়নকল্পে কর্মসূচী প্রণয়ন না করেন, তবে উপযুক্ত উন্নয়ন কর্মসূচীর অভাবে কৃষি পুনঃঅর্থসংস্থানের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাফল্য লাভে সমর্থ হইবে না।

৬

কৃষিপণ্য বিক্রয় সংগঠন
Organisation of Agricultural Marketing

সমস্যা
THE PROBLEM

ভারতের কৃষিপণ্য বিক্রয়ের প্রথম সমস্যা উপযুক্ত বিক্রয় সংগঠনেব অভাব। দ্বিতীয় এই যে, কৃষকেরা প্রধানত নিজ ভোগের জন্য কৃষিকার্য করে বলিয়া বাজারে বিক্রয়যোগ্য ফসলের পরিমাণ অল্প। তৃতীয় সমস্যা কৃষিপণ্যের মূল্যের। সকল প্রকার পণ্যমূল্যের মধ্যে ইহার ওঠানামা সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাতে কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কৃষিপণ্যের উপযুক্ত বিক্রয় সংগঠনের অভাব ভারতের কৃষি অর্থনীতির অন্যতম গুরুতর সমস্যা। ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন দ্বারা কৃষক যে পরিশ্রম শুরু করে, বাজারে ফসল বিক্রয়ের দ্বারা তাহা পরিণতি লাভ করে। সুতরাং তাহার নিকট ফসল উৎপাদনের মত ফসল বিক্রয় কার্যও সমগুরুত্বসম্পন্ন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতীয় কৃষকের ফসল যেমন অনিশ্চিত, তেমনি ঐ ফসল বিক্রয় দ্বারা তাহার আর্থিক আয়েরও কোন নিশ্চয়তা নাই। এদেশের কৃষকেরা, উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট উপযুক্ত দরে ফসল বিক্রয়ে অসমর্থ। ফলে ফসলের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ন্যায্য আয় লাভে তাহারা বঞ্চিত। কৃষকের স্বল্পের আয়ের ইহা অন্যতম কারণ।

উপযুক্ত বিক্রয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা : কৃষির উন্নয়নের যে-কোন সুষ্ঠু ও সামগ্রিক পরিকল্পনায় শুধু কৃষিগত প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, কৃষিকার্যের সংগঠনের উন্নয়ন ও কৃষিঋণের সংস্থানই যথেষ্ট নহে। ইহাদের সহিত কৃষিপণ্য বিক্রয় সংগঠনের উন্নতি সাধিত না হইলে, ঐ সকল ব্যবস্থার দ্বারা বর্ধিত উৎপাদনের ফললাভ হইতে কৃষক বঞ্চিত হইবে। সুতরাং কৃষিপণ্যের উপযুক্ত বিক্রয় সংগঠন, যে কোন সুষ্ঠু কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে কৃষকের উদ্যোগ, আয় ও বাজারে কৃষিপণ্যের যোগান বাড়িবে।

ভারতের কৃষিপণ্য বিক্রয়ের বিভিন্ন প্রকার বাজার
DIFFERENT TYPES OF AGRICULTURAL MARKETS IN INDIA

ভারতের কৃষিপণ্যের বাজারগুলিকে নিম্নোক্ত পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

১. প্রাথমিক বাজার (Primary Markets) : ভারতের গ্রামে গ্রামে সপ্তাহে একবার বা দুইবার করিয়া যে 'হাট' বসে উহাই কৃষিপণ্যের প্রাথমিক বাজার। সারাভারতে আনুমানিক ২২,০০০ এরূপ হাট রহিয়াছে। এই বাজারে পাইকারী ও খুচরা উভয় প্রকার বেচাকেনা ঘটে।

২. মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় পর্যায়ের বাজার (Secondary Market) : এইগুলি কৃষিপণ্যের বৃহৎ পাইকারী দৈনন্দিন বাজার। ইহারা সাধারণত 'মণ্ডী' নামে পরিচিত। এই সকল বাজারে গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা, আধুনিক ব্যাঙ্কিং ও বীমা ব্যবস্থা রহিয়াছে। মীরাট, হাপুর, গাজীয়াবাদ, হাথরাস খুর্জা, অমৃতসর, আগ্রা প্রভৃতি স্থানের মণ্ডীগুলি যথেষ্ট উন্নত বলিয়া অন্যান্য দেশের কৃষিজাত ফসলের আধুনিক পাইকারী বাজারের (Produce exchanges) সহিত তুলনীয়। ভারতে প্রায় ১,৭০০ মণ্ডী আছে।

৩. মেলা (Fairs) : বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সর্বত্র বাৎসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ মেলার সংখ্যা ১৭,০০০-এরও বেশি। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ মেলায় কৃষিপণ্য বিক্রয় হয়। মেলাগুলি সাধারণত শীত ও বসন্ত কালে অনুষ্ঠিত হয়।

৪. প্রান্তীয় বাজার (Terminal Markets) : দেশের বিভিন্ন রপ্তানিকেন্দ্রে, আমদানী কৃষিপণ্যের [illegible] করিয়া রপ্তানির জন্য এবং আমদানিকেন্দ্রে সংগৃহীত বা আমদানিকৃত কৃষিপণ্য দেশে

[illegible] অঞ্চলে বণ্টনের জন্য যে বাজার থাকে তাহাই প্রান্তীয় বাজার। এগুলিতে অত্যাধুনিক [illegible] ব্যবস্থা, তৎসহ আধুনিক বীমা ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সকল সুবিধা থাকে। ইহা ছাড়া, এসকল [illegible] আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হয়। ভারতে এরূপ বাজারের সংখ্যা অধিক [illegible] পশ্চিমে এই জাতীয় বাজারই কৃষিপণ্যের সংগঠিত বাজার (Produce Markets or Produce Exchanges) নামে পরিচিত।

৫. খুচরা বাজার (Retail Market) : দেশের সর্বত্র বড় বড় গ্রামে, নগরে ও শহরে, দৈনন্দিন বাজারে বিবিধ কৃষিপণ্য, শাকসবজি, মাছ, তরকারি বিক্রয় হয় এবং যেখান হইতে ভোগকারিগণ তাহাদের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অল্প অল্প পরিমাণে খরিদ করে, তাহাই খুচরা বাজার।

অর্থনীতিক উন্নয়নে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের গুরুত্ব
IMPORTANCE OF MARKETABLE SURPLUS IN ECONOMIC GROWTH

সকল বিকাশমান দেশেই অর্থনীতিক উন্নয়নে কৃষির বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের গুরুত্ব রহিয়াছে। কৃষিপ্রধান স্বল্পোন্নত দেশগুলির কৃষিজাত বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত রপ্তানি করিয়া তদ্দ্বারা পুঁজিদ্রব্য আমদানি দ্বারা দেশে পুঁজিগঠনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা সম্ভব। এবং এসকল দেশে যেহেতু কৃষি হইতেই জাতীয় আয়ের সর্বাধিক উৎপন্ন হয়, সেহেতু এই পদ্ধতিতে যে পরিমাণ পুঁজিগঠন সম্ভব তাহা আর অন্য উপায়ে সম্ভব নহে। দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে কৃষিজাত বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত নিম্নোক্ত চারি প্রকারে সহায়তা করে :

১. উন্নয়নকালে দেশে দ্রুত লোকসংখ্যা যেমন বাড়ে তেমনি প্রাথমিক ক্ষেত্র হইতে অর্থনীতির মাধ্যমিক ও উত্তরক্ষেত্রে জনসংখ্যা স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং গ্রাম হইতে শহরে বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের যোগান বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। স্বল্পোন্নত দেশের জনসমষ্টির অধিকাংশই স্বল্পাহারে থাকে বলিয়া সকল ক্ষেত্রেই আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে। সেজন্য বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের যোগান বাড়াইবার প্রয়োজন হয়।

২. শিল্পপ্রসারের ফলে কাঁচামালের চাহিদা বাড়ে, সেজন্য কাঁচামালের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বাড়াইবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

৩. এসকল দেশে গ্রামীণ বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা খুবই বেশি। কৃষিজাত বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পাইলে তাহাতে কৃষকের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়িবে। উহার ফলে গ্রামীণ বাজারের সম্প্রসারণ ঘটিয়া ইহাতে সম্প্রসারণশীল শিল্পগুলি আভ্যন্তরীণ বাজারের প্রসারের দ্বারা উৎসাহিত হইবে।

৪. বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ক্রমবর্ধমান পরিমাণে রপ্তানি দ্বারাই এসকল দেশ বিদেশী পুঁজিদ্রব্য ও কারিগরি জ্ঞান আমদানির মূল্য শোধ করিতে পারে। সুতরাং ভারতের ন্যায় বিকাশমান দেশগুলির অর্থনীতিক সম্প্রসারণে শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য সর্বশক্তিদ্বারা বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে।

কৃষিপণ্য বিক্রয় সংগঠনের ত্রুটি
DEFECTS OF AGRICULTURAL MARKETING

১. কৃষকগণ পৃথক ভাবে নিজ নিজ ফসল বিক্রয় করে। ফলে, শক্তিশালী ব্যবসায়িগণের সহিত দরকষাকষিতে সুবিধা করিতে পারে না।

২. অভাবের তাড়নায়, মহাজনের চাপে, খাজনা ও কর প্রদানের তাগিদে তাহারা গ্রামের মধ্যেই, এমন কি ফসল ক্ষেতে থাকিতেই অল্প দরে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের অভাবও তাহাদের দূরবর্তী বাজারে ফসল বিক্রয় করিতে দেয় না।

উৎপন্ন স্থানেই ফসল বিক্রয় করায়, কৃষক ও ভোগকারিগণের মধ্যে যে ব্যবধান থাকে তা ভারতে এক বিরাট সংখ্যক মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ কর্তৃক পূর্ণ হয়। পাইকার, ফড়িয়া, আড়ৎদার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণ কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকায়, কৃষিপণ্যের মূল্য বাড়ে। অথচ যে দরে সাধারণ খরিদ্দারগণ কৃষিপণ্য খরিদ করে তাহার অল্পই কৃষক পায়।

৪. কৃষককে কৃষিপণ্যের বিক্রয়ের অত্যধিক ব্যয় বহন করিতে হয়। দালালের দালালী, ওজনকারীর পাওনা, ওজনের ঢলতা, পণ্যে বাজে জিনিস মিশাল থাকার অজুহাতে গর্দা, আড়তদারের পাওনা, বাজারের বারোয়ারী পূজার বৃত্তি, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় বাবদ চাঁদা প্রভৃতি কারণে ও অকারণে অসংখ্য দেয় কাটিয়া রাখিয়া কৃষককে তাহার প্রাপ্য দাম দেওয়া হয়।

৫. বাজারগুলিতে সঠিক ওজনের মাপ বা বাটখারার যেমন অভাব, তেমনি অভাব সর্বত্র একরূপ ওজনের। বাটখারার কারচুপিতে কৃষক যেমন প্রবঞ্চিত হয়, তেমনি বিভিন্ন অঞ্চলে ও বাজারে ওজনের বিভিন্নতা থাকায় ক্রয়-বিক্রয়ের জটিলতা ও হিসাবের অসুবিধা বাড়ে।

৬ ভারতে উৎপন্ন কৃষিপণ্যের নির্দিষ্ট মান বলিয়া কিছু নাই। কিংবা উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকেও গুণানুযায়ী সযত্নে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় না। ইহাতে কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় ভাল দর পাওয়া যায় না।

৭. গ্রামাঞ্চলে কোথাও উপযুক্তরূপে ফসল মজুদ ও সংরক্ষণের সন্তোষজনক ব্যবস্থা নাই। নিজেদের সামর্থ্যের অভাবে তাহারা ফসল মজুদের ব্যবস্থা করিতে পারে না। বাজারে আনীত ফসল অবিক্রীত থাকিলে উহা সংরক্ষণের জন্যও কোন ব্যবস্থা নাই। এ অবস্থায় ফসল উঠিলেই তাহা বাজারে আনিয়া ফেলা এবং বাজারে আনিলেই, যে দর পাওয়া যায় তাহাতেই বিক্রয় করা ছাড়া কৃষকগণের অন্য উপায় নাই। একারণেই ফসল কাটার অব্যবহিত পরে বাজারে অত্যন্ত বেশি ফসলের চালান আসে ও দর অত্যধিক হ্রাস পায়।

৮. গ্রামাঞ্চলে পথঘাট ও পরিবহণ ব্যবস্থার অনুন্নতির জন্য একস্থান হইতে অন্যত্র উদ্বৃত্ত ফসল সহজে চালান দেওয়া যায় না। ইহার ফলে বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দর দেখা দেয়। ইহাতে কৃষক ও ক্রেতা উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৯. গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ও যাতায়াতের অসুবিধা এবং নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা প্রভৃতির ফলে, কৃষকগণ কোন্ বাজারে কিরূপ দরে ফসলের ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে না। মূল্য ও বাজার সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে তাহারা ঠিক সময়ে, ঠিক দরে ফসল বেচিতে পারে না।

১০. উপযুক্ত দরের অপেক্ষায় ফসল ধরিয়া রাখা কৃষকের পক্ষে সম্ভব নহে। ইহার জন্য ঋণের প্রয়োজন। সহজ শর্তে ঋণ পাইলে, কৃষকগণ অধিক দরে ফসল বেচিয়া ঐ ঋণ শোধ করিতে পারিত।

১১. সর্বশেষে আর একটি বিষয় হইল, ভেজাল মিশ্রণ। ভারতে বর্তমানে বোধ করি এমন কোন কৃষিপণ্য নাই যাহাতে ভেজাল মিশ্রণ করা হয় না। চালের সহিত কাঁকড়, আটা-ময়দার সহিত ধূলা-বালি, চীনাবাদামের সহিত মাটির ডেলা, সরিষার সহিত শেয়ালকাঁটার বীজ ইত্যাদি এমন বহুতর ভেজালমিশ্রিত দ্রব্যের দর স্বভাবতই অল্প হইতে বাধ্য।

প্রতিকার

ভারতে কৃষিপণ্যের বিক্রয়ে যে সকল ত্রুটি বর্তমান তাহা দূরীকরণের জন্য তিনপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা। ২. আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ। ৩. [illegible]
বিক্রয়কার্য সংগঠিত করা।

১. নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠা (Regulated Markets): কৃষিপণ্যের বিক্রয়, লেন-দেন, বিভিন্নপক্ষের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের দেয় খরচ (charges) ও উহাদের পরিমাণ নির্ধারণ, মাপ ও ওজন ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মকানুন স্থির, সংশোধন ও প্রবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে বাজারটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য 'বাজার কমিটি' (market committee) স্থাপন করিয়া কৃষিপণ্য বিক্রয়ের বর্তমান অনেক ত্রুটি দূর করা যায়। ইহাতে সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারেই একরূপ নিয়মাবালী প্রচলিত থাকিলে কৃষকের প্রতি বহু অন্যায়ের অবসান ঘটিবে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা : ১৮৯৭ সালে বেরারে তুলার জন্য এরূপ বাজার ভারতে সর্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ইহার দীর্ঘকাল পরে ১৯২৭ সালে বোম্বাইয়ে তুলার বাজার আইন পাস করিয়া এরূপ বাজার স্থাপিত হয়। পরে মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব, মাদ্রাজ, মহীশূর, বরোদা ও হায়দরাবাদে এরূপ নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতে এরূপ মোট ১২২টি নিয়ন্ত্রিত বাজার ছিল। বর্তমানে এরূপ বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৭৮টি হইয়াছে।

২. আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাসমূহ (Miscellaneous Measures): ক. মাপ ও ওজনের নির্ধারিত মান প্রতিষ্ঠা (Standardisation of Weights and Measures): ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসৃত বিবিধ মাপ ও ওজনের পার্থক্য, ও উহার সুযোগ লইয়া ব্যাপক প্রবঞ্চনা নির্মূল করিবার জন্য সর্বত্র একরূপ মাপ ও ওজন প্রবর্তনের প্রয়োজন দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুভূত হইতেছিল।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা : পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশে ভারত সরকার সর্বত্র পুরাতন ওজন ও মাপ তুলিয়া দিয়া মেট্রিকপদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য ১৯৫৬ সালে আইন (Standards of Weights & Measures Act, 1956) পাস করেন। ইহাতে ওজনের একক—সেরের পরিবর্তে কিলোগ্রাম, দৈর্ঘ্যের একক গজের পরিবর্তে মিটার, ক্ষেত্রের একক বর্গগজের পরিবর্তে বর্গমিটার, জমির আয়তন পরিমাপের একক হিসাবে একরের পরিবর্তে হেক্টর, ঘনমানের (Volume) একক ঘনগজের পরিবর্তে ঘনমিটার এবং আয়তনের (capacity) একক গ্যালনের পরিবর্তে লিটার নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ভারত সরকার ধাপে ধাপে এই সকল নূতন মাপ এবং ওজন সর্বত্র প্রবর্তন করিয়েছেন। ১৯৬২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে নূতন মাপ ও ওজনের (weights) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ১৯৬৬ সালে সর্বত্র যাবতীয় নূতন মাপ ও ওজন প্রবর্তনের কার্য সম্পন্ন হইবে। ইহা দ্বারা কৃষিপণ্যের বিক্রয়ে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।

খ. কৃষিপণ্যের শ্রেণীবদ্ধকরণ (Grading of agricultural commodities): কৃষিসহ সকল পণ্যেই গুণ গুণের তারতম্য থাকে। ইহাদের ব্যবহার ও ব্যবহারকারী বিভিন্ন চাহিদা পৃথক, দরও পৃথক। কিন্তু উৎপন্ন দ্রব্যগুলি গুণে বিভিন্ন হইলেও যদি উহারা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে তবে, দূরবর্তী স্থানের ক্রেতারা ভরসা করিয়া উহা কিনিতে পারে না। অতএব উহার চাহিদা ও দর অল্প হয়। কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী উহাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ও পৃথক করা আবশ্যক। ইহা ছাড়া চাহিদা, বিক্রয়, রপ্তানি ও মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা : ভারতে এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুভূত হইতেছিল। ১৯৩৭ সালে কৃষি উৎপন্ন (শ্রেণীবদ্ধকরণ ও চিহ্নিতকরণের) আইন পাস হয়। উহার পর হইতে আজ পর্যন্ত ৩৩টি পণ্যের ১২০টি শ্রেণীবদ্ধকরণ হইয়াছে। সমুদ্র শুল্ক আইনের (Sea Customs Act) ১৯ ধারা অনুযায়ী তামাক, পশম, চন্দন কাঠের তৈল প্রভৃতি কতকগুলি রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবদ্ধকরণ হয়। বর্তমানে আভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রীত [illegible] দ্রব্য, ঘৃত, তৈল, ডিম, মাখন, গম, আটা, চাউল, আলু, [illegible] প্রভৃতি [illegible] সম্পর্কে বাধ্যতামূলক শ্রেণীবদ্ধকরণের নীতি সরকার অনুমোদন করিয়াছেন।

বাজার সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ (Marketing News) : ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ যাহাতে কৃষিপণ্যের বাজারের চলতি দর সম্পর্কে অবহিত হইতে পারে সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। তাহা না হইলে বিভিন্ন বাজারের দরে সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা : বর্তমানে বেতারকেন্দ্র হইতে নিয়মিতভাবে বাজারদর প্রচারিত হইতেছে। সরকারের বিক্রয় বিভাগ (Marketing Department) বাজার সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রচার করিয়া থাকেন। রাজ্যসরকারগুলিরও অনুরূপ কৃষিপণ্য বিক্রয় ও তদারকী দপ্তর রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন সাময়িকীও প্রকাশিত হইয়া থাকে।

ঘ. গুদামজাতকরণের সুবিধা (Warehousing facilities) : কৃষক যাহাতে উপযুক্ত দরের আশায় পণ্য ধরিয়া রাখিতে পারে, সেজন্য সারাদেশে কৃষিপণ্যের বাজারে ও প্রধান প্রধান উৎপাদন কেন্দ্রে গুদাম বা মজুদগৃহ নির্মাণের অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। ফল, তরকারি প্রভৃতি পচনশীল দ্রব্যের জন্য তাপনিয়ন্ত্রিত গুদাম বা হিমাগার (Cold Storage)-এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ইহাতে প্রতি বৎসর কৃষকগণের লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি বন্ধ করা সম্ভব।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা : ভারতে বোম্বাই ও কলিকাতায় অল্প কয়েকটি হিমাগার রহিয়াছে। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কিছুই নহে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ব্যক্তিগত মালিকানায় কৃষিপণ্য মজুদের ও সংরক্ষণের জন্য বহু গুদাম আছে। সমবায় ভিত্তিতেও এরূপ গুদাম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যায়। উক্ত প্রকার ব্যবস্থার সুযোগই ভারতে রহিয়াছে।

সারাভারত গ্রামীণ ঋণ সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার ব্যাপকভাবে গুদাম নির্মাণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে ১৯৫৬ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক কৃষি উৎপন্ন উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ করপোরেশন আইন (Agricultural Produce Development and Warehousing Act) পাস হইয়াছে। এই আইনের দ্বারা কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা, বিক্রয় সংরক্ষণ, মজুদকরণ, আমদানি ও রপ্তানির ক্ষমতা-প্রাপ্ত একটি জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ পর্ষৎ (National Cooperative Development and Warehousing Board) স্থাপিত হইয়াছে। ইহার অধীনে জাতীয় গুদামজাতকরণ উন্নয়ন তহবিল (National Warehousing Development Fund) খোলা হইয়াছে এবং একটি কেন্দ্রীয় গুদামজাতকরণ করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। রাজ্য সরকারগুলিকে একটি করিয়া রাজ্য গুদামজাতকরণ করপোরেশন স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীর এবং কেরল ছাড়া ভারতের সকল রাজ্যে রাজ্য গুদামজাতকরণ করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুদামজাতকরণ করপোরেশনগুলির দ্বারা যথাক্রমে ৭৮ ও ৪২২টি বৃহৎ এবং ৮০টি ক্ষুদ্রাকার গুদাম (warehouses) স্থাপিত হইয়াছে।

ঙ. পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন (Improvement of Transport) কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যাহাতে পণ্যচলাচল বৃদ্ধি পায় সেজন্য গ্রামাঞ্চলে সড়ক, জলপথ এবং রেলপথ পরিবহণের উন্নতি আবশ্যক। সারাবৎসর চলাচলের উপযোগী গ্রাম্য সড়ক নির্মাণ, রেলভাড়া হ্রাস, হিমায়ণের ব্যবস্থাযুক্ত রেলওয়াগনের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরাসরিভাবে জাতীয় সড়ক এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম্য স্থানীয় সড়ক পরিবহণের উন্নতির কার্য চলিতেছে।

চ. কৃষিপণ্যের গুণগত নিয়ন্ত্রণ (Quality Control) : ভেজাল দূরীকরণ এবং নির্ধারিত মান অনুযায়ী কৃষিদ্রব্য হইতে অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুতকরণ (যেমন ইক্ষু হইতে গুড় ইত্যাদি)-এর জন্য কৃষিপণ্যের গুণগত নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থা অবলম্বন করা আরম্ভ হইয়াছে।

ছ. কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির মান নির্ধারণ এবং আগাম ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ (Standardisation of Contracts and Regulation of Forward Trading) : কৃষিক্ষেত্রে

বাজারে ক্রয়-বিক্রয় কার্য যাহাতে দ্রুত নিষ্পন্ন হয় এবং বিবাদ-বিসংবাদ যাহাতে হ্রাস পায় এবং ফটকা কারবার (Speculation) যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না পায় সেজন্য বেচাকেনার চুক্তির নিয়মাবলী নির্ধারণ ও আগাম বেচাকেনার চুক্তি (Forward Trading Contract) নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা : কেন্দ্রীয় কৃষিপণ্য বিক্রয় বিভাগ কর্তৃক গম, চীনাবাদাম, বনস্পতি তৈল ও তিসি বীজ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তির নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হইয়াছে। ১৯৫২ সালে আগামবাজার নিয়ন্ত্রণ আইন (Forward Markets Regulation Act) পাস হইয়াছে। এই আইন কার্যকর করিবার জন্য আগাম বাজার কমিশন (Forward Markets Commission) নিযুক্ত হইয়াছে। ইহা খাদ্যশস্য সমেত ৩২টি কৃষিপণ্যে আগামচুক্তি নিষিদ্ধ ও তুলা, পাট, চীনাবাদাম প্রভৃতি ১৩টি পণ্যে আগামচুক্তি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।

৩. সমবায় ভিত্তিতে কৃষিপণ্য বিক্রয় (Cooperative Marketing) : কৃষিপণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রতিষ্ঠার দ্বারা সর্বোচ্চ স্তরে কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিবে। আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাগুলি গ্রহণের দ্বারা কৃষিপণ্যের চলাচল ও বিক্রয় সংক্রান্ত সুবিধা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সমগ্র ব্যবস্থাই মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের (Middlemen) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কৃষকগণের তুলনায় ইহারা সংখ্যায় অল্প, আর্থিক সামর্থ্যে অধিক শক্তিশালী। ইহাদের সামাজিক পদমর্যাদাও বেশি। সুতরাং কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সর্বনিম্ন স্তরে ব্যক্তিগতভাবে কৃষকগণ ইহাদের সহিত দরকষাকষিতে কখনই সমকক্ষ হইতে পারে না। অতএব কৃষিপণ্য বিক্রয়ের উন্নতির অন্যান্য ব্যবস্থা যতই উন্নত করা হউক, তাহাতে কৃষকগণের শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থা না করা গেলে, মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণই অধিক সুবিধা ভোগ করিবে। কৃষকগণের দরকষাকষি করার ক্ষমতা বৃদ্ধির একমাত্র পথ হইতেছে তাহাদের মধ্যে সমবায় বিক্রয় সংগঠন স্থাপন করা। তাহার ফলে দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে সমবেত শক্তির দ্বারা মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের সহিত মোকাবেলা করা সম্ভব হইবে।

সমবায় কৃষিপণ্যবিক্রয় সমিতি গঠনের দ্বারা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যাইবে।

ক. বিক্রেতা হিসাবে কৃষকের দরকষাকষির ক্ষমতা বাড়িবে। খ. মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের বিলোপ ঘটিলে কৃষকের আয় বাড়িবে। গ. সরাসরি উৎপাদনকারী বিক্রেতার নিকট দ্রব্য বিক্রয়ে সাধারণ খরিদ্দারগণ অপেক্ষাকৃত অল্পদরে কৃষিপণ্য কিনিতে পারিবে। ঘ. সমবায় বিক্রয় সমিতি কৃষকগণকে ঋণ দিয়া মহাজনের ক্ষমতা হ্রাস করিতে পারে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা : ভারতে প্রাথমিক, রাজ্য ও কেন্দ্রীয়—তিন প্রকার বিক্রয় সমিতিই রহিয়াছে এবং ইহাদের সংখ্যা ও কার্যাবলী প্রসারিত হইতেছে। ১৯৬১ সালের জুনমাস পর্যন্ত উহাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩১০৮, ২৪ ও ১১। কার্যকর পুঁজির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮২১ কোটি, ২০৮ কোটি ও ১০৩৪ কোটি টাকা।[১]

কৃষিপণ্যের বিক্রয়কার্যের উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা
ROLE OF COOPERATIVES IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL MARKETING

ভারতে কৃষিপণ্যের বিক্রয়কার্যে কৃষকগণ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহারা বিচ্ছিন্নভাবে নিজ নিজ পণ্যবিক্রয় করে। তাহাদের বিক্রয়যোগ্য পণ্যের পরিমাণ অল্প, বিক্রয় ব্যয় (selling cost) বেশি। ব্যবসায়িগণের সহিত কৃষকগণ দরকষাকষি করিয়া সুবিধা করিতে পারে না। মাপের নানারূপ অসাধুতা, অনেক মহাজন নিজেরাই ব্যবসায়ী বলিয়া কৃষকগণের নিকট প্রাপ্য ঋণের আসল ও সুদ আদায় বাবদ তাহাদের নিকট অত্যন্ত অল্প দরে

১. India 1962, p. 230.

অর্থাৎ বেচিতে কৃষকগণকে বাধ্য করে। বাজারের দরদাম সম্বন্ধে নিরক্ষর ও অজ্ঞ কৃষকগণ কোন সংবাদই রাখে না। বাজারগুলিতে গুদামের অভাব, ঋণের অভাব ইত্যাদি কারণে কৃষকগণ উপযুক্ত দর পায় না।

সমবায় বিক্রয়-পদ্ধতির সুবিধা (Advantages): সমবায় ভিত্তিতে কৃষিপণ্য বিক্রয়কার্য সংগঠিত করিলে এই সকল অসুবিধার সকলই অনেকাংশে দূর হইতে পারে। ইহাতে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি লাভ করা যায়:

১. সংঘবদ্ধতার দ্বারা কৃষকগণের দরকষাকষি করার ক্ষমতা বাড়িবে। ২. একত্রে পণ্যবিক্রয় করিলে একসঙ্গে অধিকপরিমাণে পণ্য বিক্রয়ের জন্য গাড়িভাড়া, প্রভৃতির জন্য বিক্রয় ব্যয়সংকোচ ঘটিবে। ৩. মাপ এবং ওজনের কারচুপি, বাজে আদায় প্রভৃতি, ব্যবসায়িগণের অসাধুতা বন্ধ হইবে। ৪. সমবায় বিক্রয় সমিতি সরাসরি ভোগকারিগণের নিকট পণ্য বিক্রয় দ্বারা মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণকে অপসারণ করিতে পারিবে। ইহাতে কৃষকগণ অধিক দর পাইবে। আর ক্রেতারা পূর্বাপেক্ষা অল্পদরে পণ্য খরিদ করিতে সমর্থ হইবে। ৫. বিক্রয়সমবায় সমিতি কৃষকগণকে ঋণদান করিয়া ফসল ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করিতে পারে। ৬. বিক্রয় সমিতিগুলি নিজেরাই গুদাম নির্মাণ করিয়া ফসলের মজুদকরণের অসুবিধা দূর করিতে পারে। ৭. বিক্রয় সমিতিগুলি কৃষক ও উৎপাদন সমিতিগুলিকে পরামর্শ দিয়া ও সাহায্য করিয়া ফসলের মানোন্নয়ন ও কৃষিপণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিতে পারে। ৮. কৃষকগণকে বাজারের অবস্থা ও দর সম্পর্কে অবহিত করিতে পারে।

উপরোক্ত বিভিন্নভাবে কৃষিপণ্যের বিক্রয়কার্যে সমবায় নীতির প্রয়োগে কৃষকের ও কৃষিপণ্য বিক্রয় কার্যের উন্নয়ন ঘটিতে পারে।

ভারতে সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় সমিতির অগ্রগতি (Progress): কৃষিপণ্যের বিক্রয়ে সমবায় কৃষিপণ্য বিক্রয় সমিতির উপযোগিতার জন্য অনেক দেশেই ইহার প্রসার ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ডেনমার্ক, নিউজীল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারতে তিন পর্যায়ের বিক্রয় সমিতি দেখা যায়। সর্বনিম্নস্তরে রহিয়াছে, প্রাথমিক বিক্রয় সমিতিগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ে রহিয়াছে কেন্দ্রীয় সমবায় বিক্রয় ইউনিয়ন বা ফেডারেশন। ইহারা মধ্যবর্তী পর্যায়ের সমিতি। প্রাথমিক সমিতিগুলির কার্যক্ষেত্র মহকুমা বা তালুক এলাকায় সীমাবদ্ধ। মধ্যবর্তী সমিতিগুলির কার্য জেলাভিত্তিতে। প্রাথমিক সমিতিগুলি ইহাদের সভ্য। সর্বোচ্চ পর্যায়ে রহিয়াছে রাজ্য বা প্রাদেশিক বিক্রয় সমিতি। ইহারা প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমিতিগুলিকে ঋণ দেয় ও তাহাদের নিকট হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া বাজারে বিক্রয় করে। ১৯৬১ সালের জুন মাসে ভারতে ২৪টি রাজ্য বিক্রয় সমিতি, ১৭১টি কেন্দ্রীয় বিক্রয় সমিতি ও ৩,১০৮টি প্রাথমিক বিক্রয় সমিতি ছিল। প্রাথমিক বিক্রয় সমিতিগুলির সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪,৬৭,৬২২ ও তিনস্তরের সমিতিগুলির মোট কার্যকর পুঁজির পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৬৪ লক্ষের বেশি।

ত্রুটি (Defects): ভারতে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির দরুন সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলি যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করিতে পারে নাই। যথা, ১. ঋণের স্বল্পতা। ২. উপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাব। ৩. সমিতির কর্মীদের দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব। ৪. গ্রামাঞ্চলে পরিবহণ ব্যবস্থার অনুন্নতি। ৫. সভ্যদের মধ্যে সমবায়ের প্রতি আনুগত্যের ও নিষ্ঠার অভাব।

[illegible]সমবায় ও কুটিরশিল্প (Cooperation & Cottage Industries) ঃ [illegible] গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন করিতে পারে। সস্তায় শিল্পের প্রয়োজনীয় উপযুক্ত কাঁচামাল [illegible]কার্যের তদারক, উৎপাদনের মান নির্ধারণ, ক্রেতাদের চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তদনুযায়ী উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ, পণ্যগুলির যথাযথ বিক্রয় সংগঠিত ও প্রচার করিতে পারে। ক্রেতাদের নিকট সরাসরি পণ্যবিক্রয় প্রভৃতির দ্বারা, মধ্যবর্তী দালাল ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করিবা, শিল্পীদের আয় বৃদ্ধি করিতে পারে। ক্রেতারাও প্রত্যক্ষভাবে শিল্পীসমবায়ের নিকট হইতে কম দরে পণ্য কিনিতে পারে।

৪. **সমবায় ও ভোগকারী** (Cooperation & Consumers) : ভোগকারিগণও নিজেদের সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া একসঙ্গে যাবতীয় প্রযোজনীয় দ্রব্যাদি সরাসরি উৎপাদকগণের নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত কম দরে কিনিতে পারে। একসঙ্গে অধিক দ্রব্য আনয়ন করায় পরিবহণ ব্যয় কমে। প্রত্যেক সভ্য সমবায় ভাণ্ডার হইতে পাইকারী দরে দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা পায়।

এক কথায়, দরিদ্র ব্যক্তিগণ সমবায় পদ্ধতিতে বৃহদায়তন উৎপাদন, ক্রয় ও বিক্রয়ের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা লাভ করিতে পারে। ইহাতে সকল ক্ষেত্রেই ব্যয় কমে ও আয় বাড়ে। ফলে নিজেদের শক্তিতে তাহাদের বিশ্বাস বাড়ে। ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় উন্নতি হয় বলিয়া জনসাধারণের ঐক্য এবং গণতান্ত্রিক-পদ্ধতিতে সমিতির কার্যকলাপ পরিচালিত হয় বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। সভ্যদের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি এবং গণতান্ত্রিক চেতনা বাড়ে বলিয়া তাহারা দেশের ও সমাজের প্রতি অধিকতর দায়িত্বশীল হয়।

ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা

ROLE OF COOPERATION IN DEVELOPMENTAL PLANNING IN INDIA

ভারতের সরকারী লক্ষ্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র, এজন্য ভারত সরকার অর্থনীতিক উন্নয়ন ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের চেষ্টায় নিযুক্ত। এই উভয় কাযেই সমবায়-পদ্ধতি কার্যকর। এজন্য ভারতের বর্তমান পটভূমিকায় সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে, আত্মরক্ষামূলক আন্দোলনের পরিবর্তে সমবায়, অর্থনীতিক কার্যক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক সংগঠনে, সমতা ও স্ব-ইচ্ছার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সমবায় সমিতিগুলি কৃষি এবং গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, উৎপন্নের উৎকর্ষ বৃদ্ধি, প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তন ও প্রসার, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সক্ষম। ইহাতে যেমন অর্থনীতিক উন্নতি সম্ভব তেমনি গ্রামসংগঠনের স্তরে গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় হইবে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনীতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক। সমবায়ের দ্বারা কৃষি ও কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতি হইলে, তাহাতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে সম্পদ ও আয় কেন্দ্রীভূত হইবে না। সর্বাধিকসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে ক্রমবর্ধমান আয় ছড়াইয়া পড়িবে। দেশে আয়ের বৈষম্য কমিবে। বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির ফলে, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শিল্পের অধিকতর সুষম উন্নতি ঘটিবে। অর্থাৎ আঞ্চলিক শিল্পায়ন ঘটিবে।

এইরূপে কৃষিতে, শিল্পে ও বিবিধ সহায়মূলক কার্যে সমবায়ের প্রসারে দরিদ্র জনসাধারণ কর্মের স্বাধীনতা, উন্নতির সুযোগ, বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা লাভ করিবে। সকলের উন্নতি সম্ভব বলিয়া, সমবায় আন্দোলন অধিকতর জনসমর্থন লাভ করিবে। সেজন্য এই পদ্ধতির স্থায়িত্ব ঘটিবে।

ব্যক্তির উন্নতির সহিত সমষ্টির কল্যাণের এই সমন্বয়ের সুবিধা রহিয়াছে বলিয়াই ভারত সরকার অর্থনীতিকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি সমবায় ক্ষেত্র সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবেচনায় ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের কার্যক্রম সফল করিবার পক্ষে সমবায় আন্দোলন একটি অপরিহার্য উপায়।

ভারতের সমবায় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
A BRIEF HISTORY OF THE COOPERATIVE MOVEMENT IN INDIA

আলোচনার সুবিধার জন্য ভারতের সমবায় আন্দোলনের ইতিবৃত্তকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়—

প্রথম পর্যায়: উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃষকদের ঋণভার অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯০১ সালে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন সমবায় ঋণদান সমিতি গঠনের সুপারিশ করেন। তাহার ফলে ১৯০৪ সালে সমবায় ঋণদান সমিতির আইন পাস হয়। ইহা ভারতের প্রথম সমবায় আইন। ইহার দ্বারা কৃষক ও অ-কৃষক দরিদ্র ব্যক্তিগণের মধ্যে শুধু সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯১১-১২ সাল পর্যন্ত ৮,১৭৭টি সমিতি গঠিত হয়। উহাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষের অধিক এবং পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩ কোটি টাকার বেশি।

দ্বিতীয় পর্যায়: ১৯০৪ সালের সমবায় আইনে ঋণদান ছাড়া অন্যপ্রকার সমিতি গঠনের ব্যবস্থা ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি স্থাপনের সুযোগ না থাকায় এবং সমিতিগুলিকে শহরাঞ্চল ও গ্রাম্য, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্তকরণের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা সুবিধাজনক না হওয়ায়, ১৯১২ সালে দ্বিতীয় সমবায় আইন পাস করা হয়। এই আইনে—ক. সমিতিগুলিকে দায় (liability) অনুযায়ী, সীমাবদ্ধদায়যুক্ত ও সীমাহীন দায়যুক্ত, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল; খ. ঋণদান ছাড়াও অন্যান্য প্রকার সমিতি যথা, ক্রয়, বিক্রয়, গৃহনির্মাণ, বীমা প্রভৃতি সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইল; গ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক, এই তিন প্রকারের কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

এই সকল ব্যবস্থার ফলে সমবায় সমিতির সংখ্যা, সদস্য সংখ্যা, উহাদের পুঁজির পরিমাণ, সকলই দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ সালে সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৮০০০, সভ্য সংখ্যা ১১ লক্ষ, ও চলতি পুঁজি ১৫ কোটি টাকার অধিক হয়।

তৃতীয় পর্যায়: ১৯১৯ সালে শাসনসংস্কার আইন পাসের দ্বারা সমবায় দপ্তর প্রাদেশিক সরকারগুলির নিকট হস্তান্তরিত হয়। তাহার পর হইতে বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক সমবায় আইন পাসের দ্বারা সমবায় প্রসারের চেষ্টা করা হয়। ইহাদের মধ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বিহার-উড়িষ্যার সমবায় আইন উল্লেখযোগ্য।

১৯২০-৩০ সালের মধ্যে আন্দোলনের দ্রুতগতি লক্ষণীয়। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর অর্থনীতিক মন্দার আঘাতে আন্দোলনের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। ১৯৩৩-৩৬ সালের মধ্যে বহু সমিতি বিলুপ্ত হয়।

ইহার পর ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপন ও উহার কৃষিঋণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ফলে, আবার সমবায় আন্দোলনে শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সমিতি, সদস্য ও পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে, ১ লক্ষ ১৬ হাজার, ৫০ লক্ষ, ও ১০৪ কোটি টাকারও অধিক হয়। ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত মোট জনসংখ্যার ৬ শতাংশে সমবায় আন্দোলন প্রসারিত হয়।

চতুর্থ পর্যায়: ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কাল। এই সময়ে সমবায় আন্দোলনের দ্রুত প্রসার ঘটে এবং ভোগকারী সমবায়, উৎপাদক সমবায়, পরিবহণ সমবায় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সমিতির প্রতিষ্ঠায় সমবায় আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য সাধিত হয়।

[illegible] সালে [illegible]র ফলে সাময়িকভাবে আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও [illegible] [illegible]নীতি আন্দোলনের প্রসারের নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইহার ফলে ১৯৫০-৫১ সালে পরিকল্পনা আরম্ভের মুখে দেখা যায় মোট সমিতির সংখ্যা হইয়াছে ১,৮৫,৬৩০টি ও চলতি পুঁজির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩০৬ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা।

পঞ্চম পর্যায়: পরিকল্পিত অর্থনীতির যুগে সমবায় আন্দোলন নূতন তাৎপর্য লাভ করে। ভারতের পুরাতন সমাজকাঠামোর পরিবর্তে সমবায় জীবন-যাপন পদ্ধতিকে নূতন সমাজকাঠামোরূপে গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পিত পথে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি আরম্ভ হয়। কৃষিকার্যে সমবায় খামারের প্রবর্তন দ্বারা ভূমিসংস্কারের সহিত ইহাকে গ্রথিত করা হয়। গ্রামীণঋণ দানের সুসংবদ্ধ কাঠামো গঠনের জন্য সমবায়কেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে সমবায়ের নূতন যুগ আরম্ভ হয়। ফলে প্রতি বৎসর ও প্রতি পরিকল্পনায় সমবায়ের উত্তরোত্তর অগ্রগতি দেখা যাইতেছে। ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৩২,৪৮৮, প্রাথমিক সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,৪২,৪৪,৫৪৩, ও চলতি পুঁজি বৃদ্ধি পাইয়া ১৩১২ কোটি টাকা হইয়াছে। ১৯৬১ সালের জুন মাস পর্যন্ত দেশবাসীর প্রায় ৩৯ শতাংশ (১৭.১২ কোটি) ইহার প্রভাবে আসিয়াছে।

ভারতের সমবায় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য: ভারতে সমবায় আন্দোলনের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমত, কৃষিঋণদান সমিতির প্রাধান্য। দ্বিতীয়ত, প্রথম হইতেই সরকারী প্রচেষ্টায় ইহার সূত্রপাত। জনসাধারণের আগ্রহে ইহার আরম্ভ হয় নাই।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য
ACHIEVEMENTS OF THE COOPERATIVE MOVEMENT

ভারতের সমবায় আন্দোলন নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়।

১. **সুদের হার হ্রাস:** সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ অল্প হইলেও উহার ফলে গ্রাম্য মহাজনগণ সুদের হার কমাইতে বাধ্য হইয়াছে।

২. **গ্রামবাসিগণের মধ্যে সঞ্চয়স্বভাব বৃদ্ধি:** সমবায় ঋণদান সমিতি, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি গ্রামীণ জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উৎসাহ দিয়া গ্রাম্য সঞ্চয় বৃদ্ধি করিয়াছে।

৩. **অনুৎপাদনশীল ঋণ হ্রাস:** সমিতিগুলির অস্তিত্ব, ইহাদের প্রচার ও ঋণদান নীতির ফলে ভোগের জন্য ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমিয়াছে।

৪. **উৎপাদনশীল ঋণ বৃদ্ধি:** কৃষকগণের উৎপাদনশীল ঋণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৫. **কৃষিকার্যের উন্নতি:** সমবায় সমিতির মারফত সরকারী কৃষি দপ্তর কর্তৃক উৎকৃষ্ট বীজ, পশু, সার ও যন্ত্রপাতির প্রচার, ব্যবহার শিক্ষাদান ও বণ্টন কার্য ঘটায় কৃষিকার্যের উন্নতি ঘটিয়াছে।

৬. **গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি:** সমবায় সমিতির মাধ্যমে ঋণদান, উৎপাদন সংগঠিত করা, বিক্রয় পরিচালনা ইত্যাদির ফলে গ্রাম্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে।

৭. **জনস্বাস্থ্যের উন্নতি:** সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মতরূপে সার প্রস্তুত শিক্ষাদান, জল নিকাশন ব্যবস্থার প্রবর্তন, স্বাস্থ্যসম্মতরূপে গোশালা নির্মাণ ও পশুর যত্ন শিক্ষাদান, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রবর্তন প্রভৃতির দ্বারা গ্রামাঞ্চলে জনস্বাস্থ্য এবং এতৎসম্পর্কিত [illegible] উন্নতি ঘটিয়া[illegible]

দরিদ্র জনসাধারণের সহায়তা : কৃষি ও কুটির শিল্প সমবায় দরিদ্র জনশ্রেণীর। ভোগকারী সমবায় সমিতি, শ্রমিক ও কর্মচারিগণের ঋণদান সমিতি প্রভৃতি সদস্যগণের নানাভাবে সেবা ও সাহায্য প্রদান করিতেছে।

৯. **ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালনার শিক্ষাদান :** ছোটবড় বিবিধ সমবায় সমিতিগুলি প্রকৃতপক্ষে উহার কর্মচারী ও পরিচালকবর্গের শিক্ষাক্ষেত্র। এই সকল সমিতির সদস্য সাধারণ কৃষক ও অন্যান্য জনসাধারণ, ইহাদের মধ্যে কাজ করিতে গিয়া কিরূপে অর্থনীতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইতেছে।

১০. **সামাজিক ও নৈতিক মূল্য :** সদস্যগণের মধ্যে বিবাদ কলহ ও মনোমালিন্য দূর করিয়া, সম-অধিকার ও সুযোগের ভিত্তিতে দরিদ্রজনশ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া, সমবায় আন্দোলন দেশের জনসাধারণের ঐক্য বৃদ্ধি, পারস্পরিক সহযোগিতা, সমাজচেতনা ও নৈতিক উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

সমালোচনা : কিন্তু ভারতে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে যতই সাফল্যের দাবি করা হউক না কেন, বাস্তবে ইহার সাফল্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে কয়েকটি সমবায় সংগঠনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটিলেও সামগ্রিকভাবে ইহা অতীতে ব্যর্থ হইয়াছে বলা চলে।

১. সমবায় আন্দোলন **প্রধানত কৃষিঋণদানের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ** রহিয়াছে। কৃষিজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রসারিত হয় নাই।

২. **কৃষি ঋণদান ক্ষেত্রেও ইহা ব্যর্থ হইয়াছে।** সারাভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটি দেখাইয়াছেন যে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া কৃষিঋণদান সত্ত্বেও সমবায় সমিতিগুলি কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণের মাত্র ৩ শতাংশ সরবরাহ করে। সুতরাং উহারা গ্রাম্য মহাজনদের অশুভ বন্ধন হইতে কৃষকগণকে মুক্ত করিতে পারে নাই।

৩. সমবায় সমিতিগুলি নিজেরাও **উচ্চহারে** (শতকরা ১২½ টাকা পর্যন্ত) **সুদ আদায়** করায় সুদের হার বিশেষ কমে নাই।

৪. জমি প্রভৃতি **স্থাবর সম্পত্তির জামিন ছাড়া সমবায় সমিতিগুলি ঋণ দেয় না।** ইহাতে দরিদ্র কৃষকগণ সমবায় ঋণের সুবিধা লাভ করে নাই। কারণ তাহাদের অনেকেরই জমির মালিকানা নাই। লাভ হইয়াছে প্রধানত ধনী ও মাঝারি কৃষকগণের।

৫. **অ-ঋণদান সমিতিগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করিতে পারে নাই।** এই সকল সমিতিগুলি, যথা, ক্রয়-বিক্রয় সমিতি, উৎপাদক সমিতি প্রভৃতির সহিত ঋণদান সমিতিগুলি কোন সংযোগ রাখে না। ফলে যাহারা ঋণ পাইল; তাহারা উহা উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করিল কিনা তাহার তদারকী ঘটে না।

৬. কৃষকগণের **দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহে** সমবায় আন্দোলন সম্পূর্ণ **ব্যর্থ হইয়াছে** বলা যায়।

৭. **অধিকাংশ সমিতিই স্বল্পকাল স্থায়ী** হয়। অনেক সমিতি কিছুদিন কাজের পর অচল হইয়া পড়ে। ঋণদান সমিতিগুলি ঋণ আদায়েও অক্ষমতা দেখাইয়াছে।

অবশ্য পরিকল্পনার গত এক দশকে সমগ্র সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন দ্বারা ইহার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে।

সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ (ত্রুটি ও সমস্যা)
CAUSES OF DRAWBACKS & PROBLEMS

যথেষ্ট আশা, প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা লইয়া ভারতে সমবায় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। সরকারের তরফ হইতেও ইহাতে আগ্রহ ও সাহায্যের কোন ত্রুটি হয় নাই। তৎসত্ত্বেও ভারতের সমবায় আন্দোলন উহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারে নাই। স্যার বিশ্বেশ্বরাইয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সারা ভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটি পর্যন্ত অনেকেই ইহার ব্যর্থতা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল কারণে ভারতে সমবায় আন্দোলন উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

১. সমবায় আন্দোলনের সাফল্যের কতকগুলি পূর্বশর্ত আছে। সদস্যদের মধ্যে ঐক্য, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, পরার্থপরতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ইত্যাদি গুণাবলী আবশ্যক। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও রক্ষণশীল মনোভাব প্রভৃতি ভারতে সমবায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে নাই।

২. অত্যধিক সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ গ্রাম্যজনসাধারণের মধ্যে উদ্যম ও উৎসাহকে বিনষ্ট করিয়াছে।

৩. সমিতিগুলির পরিচালনায় বিভিন্ন ত্রুটিও ইহাদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী। ঋণদানের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব, ঋণ আদায়ে অক্ষমতা, পরিচালকগণ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজন পোষণ, হিসাবের কারচুপি, স্বজন ও ধনী মাতব্বরদের কর্তৃত্ব, ঋণদানে অসাবধানতা, অনুৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ঋণদান, সমিতি পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতি অমান্য, দলাদলি, সমিতির কর্তৃত্বের মধ্যে কায়েমী স্বার্থের সৃষ্টি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল কারণে সমিতিগুলি কার্যদক্ষতা লাভ করে নাই।

৪. সমিতিগুলির আর্থিক সাচ্ছল্যের অভাব ও ঋণমঞ্জুর করিতে অযথা বিলম্ব সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

৫. ঋণদানসমিতির আধিক্য, সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। সমবায় যে একটি সম্পূর্ণ পৃথক কার্যপদ্ধতি, ইহা যে একটি নূতন আদর্শবাদ, জীবনযাপনের নূতন পথ, একথা জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

৬. সমবায় সমিতিগুলির অত্যন্ত ক্ষুদ্রায়তন এবং ঋণদান সমিতিগুলির সীমাহীন দায় উহাদের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণে অসুবিধা সৃষ্টি করিয়াছে।

৭. কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, উহারা সমবায় সমিতি ও উহাদের কার্যাবলীতে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে অন্যান্য সাধারণ ব্যাঙ্কগুলির মতই কাজকারবার চালাইয়াছে।

৮. সর্বোপরি, অতীতে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সামগ্রিক দুরবস্থাই সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। সে সময় কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়ায় শুধুমাত্র ঋণদান দ্বারা কৃষক ও কৃষির উন্নতির চেষ্টা বিফল হইয়াছে। ফলে সমবায় আন্দোলনও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

ভারতে সমবায় সংগঠনের কাঠামো
THE STRUCTURE OF THE COOPERATIVE MOVEMENT

ভারতের সমবায় সংগঠন তিন পর্যায়ে বিভক্ত।

১. সর্বনিম্নপর্যায়ে স্থানীয় বা গ্রামস্তরে রহিয়াছে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি।

-৬১ সালে সারাভারতে উহাদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩'৪২ কোটি এবং কার্যকর পুঁজির পরিমাণ ছিল ১,৩১২'০৯ কোটি টাকা।

২. **মাধ্যমিক পর্যায়ে** জেলাস্তরে রহিয়াছে প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন বা ইউনিয়ন। ১৯৬০-৬১ সালে এইরূপ পর্যায়ের সংগঠন—কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ছিল ৩৯০টি। উহাদের চল্তি পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩০৪'০৫ কোটি টাকা। ঐ বৎসর কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ১৮টি, এবং উহাদের চল্তি পুঁজি ছিল ৪৭'৬ কোটি টাকা। ১৯৬১ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় বিক্রয় সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল ১৭১টি। উহাদের চল্তি পুঁজি ছিল ১০'৩৪ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া দুগ্ধবিক্রয়, চিনি উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও বহু কেন্দ্রীয় সমিতি রহিয়াছে।

৩. **সর্বোচ্চ পর্যায়ে** রাজ্যস্তরে রহিয়াছে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্ক, সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমিতি (Apex Society) প্রভৃতি। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২১টি ও উহাদের চল্তি পুঁজির পরিমাণ ছিল ২২১'৬৫ কোটি টাকা। ১৯৬১ সালের জুন মাসে রাজ্য বিক্রয়সমিতির সংখ্যা ছিল ২৪টি এবং উহাদের মোট চল্তি পুঁজি ছিল ৯'০৮ কোটি টাকা। রাজ্য তন্তুবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ২২টি। উহাদের চল্তি পুঁজি ছিল ৬'৪৪ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া রাজ্য ইউনিয়ন নামে পরিচিত, সর্বোচ্চ পর্যায়ের আরো ২৯টি সমিতি ছিল।

সমবায় সমিতিগুলির প্রকারভেদ

DIFFERENT KINDS OF COOPERATIVE SOCIETIES

উদ্দেশ্য অনুযায়ী সমবায় সমিতিগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যথা—১. ঋণদান সমিতি ও অ-ঋণদান সমিতি।

১. **ঋণদান সমিতি (Credit Societies):** ইহাদের মধ্যে কৃষিঋণদান এবং অ-কৃষিঋণদান উভয় শ্রেণীর সমিতিই রহিয়াছে। ভারতে সকল পর্যায় ও শ্রেণীর ঋণদান সমিতির সাম্প্রতিক অবস্থা নিম্নরূপ।[১] 'কৃষিকার্যের অর্থসংস্থান' অধ্যায়ে সমবায় ঋণদান সমিতি ও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

সমিতি	বৎসর	সংখ্যা	কার্যকর পুঁজি
রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্ক	১৯৬০-৬১	২১	২২১'৬৫ কোটি টাকা
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক	,,	৩৯০	৩০৪ ,,
প্রাথমিক কৃষি-ঋণদান সমিতি	জুন ১৯৬১	২,১২,১২৯	২৭৩'৯২ ,,
শস্য ব্যাঙ্ক সমিতি	,,	৯,৪১২	৫'৩৫ ,,
কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক	১৯৬০-৬১	১৮	৪৭'৬ ,,
প্রাথমিক জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক	,,	৪৬৩	২৬'৯৯ ,,
অ-কৃষি ঋণদান সমিতি	জুন ১৯৬১	১১,৯৯৫	১৫০ ,,

২. **অ-ঋণদান সমিতি (Non-credit Societies):** ঋণ সমবায়ের অতিরিক্ত প্রাধান্য ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রধান ত্রুটি। ঋণদান ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশ্যে গঠিত সমিতির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। অতীতে ইহাদের বাঞ্ছনীয় বলিয়া গণ্য করা হইলেও, সম্প্রসারণে সবিশেষ চেষ্টা হয় নাই।

১। India. 1963

[illegible] অবলম্বন গ্রহণের পর হইতে [illegible]
[illegible] দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে, তেমনি অ-ঋণদান সমবায় সমিতিগুলির উপরও যথার্থ গুরুত্ব আরোপিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন সমবায় কার্যধারাকে গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠন ও উন্নয়নের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গীর পটভূমিকায়, স্বভাবতই কৃষিকার্যের যাবতীয় অংশে, কৃষিজাত ও বিবিধ কাঁচামাল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিক্রয়যোগ্য পণ্যে রূপান্তরকরণে (Processing), কৃষি ও কুটির শিল্পজাত পণ্যের বিক্রয়ে, গ্রাম্য পরিবহণে, ভোগকারী সমবায় বিপণি স্থাপনে, কুটির শিল্পের উৎপাদন সংগঠনে, পূর্ত কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকগণের শ্রম সরবরাহে, শস্যবীমা, শস্যরক্ষা, ইত্যাদি বিবিধ নূতন ও পুরাতন ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন বিস্তৃত করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এই সকল বিবিধ সমিতিগুলির উল্লেখযোগ্য কয়েকটির আলোচনা করা গেল।

ক. সমবায় বিক্রয় সমিতি (Cooperative Marketing Societies): ইহাদের দ্বারা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী দূরীভূত হইয়া উৎপাদক ও ভোগকারী উভয়ের লাভ হয়। উৎপাদকগণের আয় বাড়ে, ভোগকারিগণের ব্যয় কমে। ১৯৬১ সালের জুন মাসে দেশে ৩,১০৮টি প্রাথমিক বিক্রয় সমিতি, ১৭১টি কেন্দ্রীয় বিক্রয় সমিতি ও ২৪টি রাজ্যবিক্রয় সমিতি ছিল। প্রাথমিক সমিতিগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষেরও বেশি। উহাতে চলতি পুঁজি ছিল ২৮ কোটি টাকার অধিক।

খ. সমবায় প্রক্রিয়াজাতকরণ সমিতি (Cooperative Processing Societies): ইক্ষু হইতে চিনি ও গুড় প্রস্তুত, দুগ্ধ হইতে ছানা মাখন ঘি তৈয়ার, তৈলনিষ্কাশন, প্রভৃতি কার্যের দ্বারা বিবিধ দ্রব্যকে নানাবিধ বিক্রয়যোগ্য বিভিন্ন পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়। এইজন্য এই সকল কার্যকে প্রক্রিয়াজাতকরণ (processing) বলা হয়। এই প্রকার সমিতি স্থাপনে শুধু যে গ্রামবাসিগণের আয় বাড়িবে এবং তাহাদের ঋণগ্রহণ-যোগ্যতা বাড়িবে তাহা নহে, ইহাদের উন্নয়নের ফলে গ্রামাঞ্চলে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে নূতন সুযোগসুবিধা দেখা দিবে। ফলে পরিপূর্ণ সমবায়িক গ্রামীণ অর্থনীতি গঠন সহজ ও সম্ভব হইবে। এই সকল সমিতির মধ্যে সমবায় চিনিকারখানা, গুড় ও চিনি প্রস্তুতকারী প্রাথমিক সমিতি, দুগ্ধ ইউনিয়ন, তুলাবীজ ঝাড়াই, পাট ও তুলার গাঁইট বাঁধাই সমিতি প্রভৃতি প্রধান। ১৯৬১ সালের জুন মাসে এরূপ সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল ৬,৫৯১ এবং উহাদের সদস্য ও মোট কার্যকর পুঁজির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬,১০,৫৮১ এবং ৭৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা।

গ. সমবায় কৃষি (Cooperative Farming): গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় কৃষির প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। আগামী দশ বৎসরে যাহাতে দেশের কৃষিভূমির বিশিষ্টাংশে সমবায় কৃষি বিস্তৃত হইতে পারে সেজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় কৃষির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের কথা বলা হইয়াছিল। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত, কৃষির উৎপাদন ও গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায় কৃষির ব্যাপক সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ১৯৬১ সালের জুনমাসে নানারূপ সমবায় খামার সমিতির সংখ্যা ৬,৩২৫, উহাদের সদস্য সংখ্যা ৩০০৪, ৫০৬ ও কার্যকর পুঁজির পরিমাণ ছিল ৬·৭০ কোটি টাকা। (এসম্পর্কে 'কৃষিকার্যের সংগঠন' অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ঘ. ভোগকারী সমবায় (Consumers' Cooperative): দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তরকালে নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যসামগ্রী বণ্টনের জন্য বহু ভোগকারী সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়।

১৯৫১-৫২ সালে এরূপ প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ছিল ৩,৭৫৭ এবং সভ্যসংখ্যা ছিল ১৮'২ লক্ষ। বেচাকেনার পরিমাণ ছিল ৮২ কোটি টাকা। পরবর্তীকালে বহু সমিতি বিনষ্ট হয়। ১৯৬১ সালের জুনমাসে এরূপ সমিতির সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,১৩৩। উহাদের সভ্যসংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ লক্ষ। উহাদের মোট কার্যকর পুঁজির পরিমাণ ছিল ১১'৮২ লক্ষ টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় এরূপ আরও ২২০০ প্রাথমিক এবং ৫০টি পাইকারী সমিতি স্থাপিত হইবে।

ঙ. **শিল্পসমবায় সমিতি (Industrial Cooperatives) :** হস্তচালিত তাঁত, নারিকেল কাতা ও অন্যান্য কয়েকটি দেশীয় কুটির শিল্পে শিল্পসমবায় সমিতি এদেশে সফল হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে শিল্পসমবায়গুলির সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০,০০০। উহাদের সভ্যসংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ। তৃতীয় পরিকল্পনায় উহা বাড়াইয়া যথাক্রমে ৪০,০০০ ও ৩০ লক্ষ করা হইবে। (তৃতীয় খণ্ডে, 'কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প' অধ্যায়ে ইহাদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে)।

চ. **শ্রম ও পূর্ত সমবায় সমিতি (Labour and Construction Cooperatives) :** গ্রামাঞ্চলে সেচ ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকগণের দ্বারা শ্রম ও পূর্ত সমবায় সমিতি গঠনের উপর প্রথম পরিকল্পনাকাল হইতেই বারংবার গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। এইরূপ সমিতি গঠনের দ্বারা অদক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমিকগণ সংঘবদ্ধভাবে নিজেরাই বিভিন্ন প্রকল্পে শ্রম সরবরাহের ভার লইতে পারে। ফলে শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি ও ঠিকাদারদের শোষণ দূর হয়। রাজস্থান, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও অন্ধ্র রাজ্যে এইরূপ সমিতি অধিক গঠিত হইয়াছে।

ছ. **গৃহনির্মাণ সমবায় (Housing Cooperatives) :** শহর ও গ্রামাঞ্চলে এবং শিল্পাঞ্চলে গৃহনির্মাণ কার্যে, গৃহনির্মাণ সমবায় সমিতি গঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই প্রকার সমিতি অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে গৃহনির্মাণে সক্ষম। কারণ যাহাদের গৃহ নির্মিত হইবে তাহারাই ইহার সভ্য। এইরূপ সমিতিতে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ ও গৃহনির্মাণের মালমসলা দিয়া সাহায্য করিবার নীতি গৃহীত হইয়াছে। ১৯৬১ সালের শেষে দেশে ৬৪৫৮টি গৃহনির্মাণ সমবায় ছিল। ইহাদের কার্যাবলীর নেতৃত্ব ও সহায়তা দানের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় একটি কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ পরিষদ (Central Housing Board) ও প্রতি রাজ্যে রাজ্য গৃহনির্মাণ পরিষদ (State Housing Board) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হইয়াছে।

সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন : বিভিন্ন সুপারিশ

REORGANISATION OF THE COOPERATIVE MOVEMENT

অতীতে সমবায় আন্দোলনের দোষ-ত্রুটিগুলি দূর করিয়া উহাকে শক্তিশালী করিবার জন্য বিবিধ বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠান (যথা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ বিভাগ) নানাপ্রকার সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আংশিক ফল পাওয়া গেলেও আন্দোলনের বিশেষ উন্নতি দেখা যায় নাই। এই সকল সুপারিশে সমিতিগুলির পরিচালনার উন্নতি, হিসাব রক্ষণের ব্যবস্থা, ঋণ প্রদানের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য, সমিতিগুলির আয়তন, সমবায় শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি সম্পর্কে নানাবিধ পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল দোষ দূর করা অত্যন্ত প্রয়োজন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সকল সুপারিশের পশ্চাতে কোন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। কৃষি ও সমবায়কে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সমবায়ের ভিত্তিতে সমগ্র কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কার্যাবলী

সংগঠন দ্বারা যে উভয়ের উন্নতি সম্ভব ও উহাতে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া উভয়েই শক্তিশালী হইতে পারে, এইরূপ মৌলিক ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে ইতিপূর্বে কেহ সমবায় সম্পর্কে চিন্তা করেন নাই।

ক. সারাভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশ (AIRCSC): ১৯৫১-৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত সারা ভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটি গ্রামীণঋণ কাঠামোর পুনর্গঠনের জন্য যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা বস্তুতপক্ষে ভারতের সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠনেরই সুপারিশ। ভারত সরকার ঐ সকল সুপারিশ গ্রহণ ও কার্যে পরিণত করিয়াছেন। ফলে সমবায় আন্দোলন যে পথে পুনর্গঠিত হইতেছে তাহার মূল কথা হইল—

১. সমবায় কাঠামোর প্রত্যেক পর্যায়ে—প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও সর্বোচ্চ বা রাজ্য সমিতির স্তরে—সরকারকে আর্থিক ও অন্যান্য ভাবে কার্যকর অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজ্য সরকারগুলি সমবায় সমিতিসমূহকে ঋণদান ছাড়াও উহাদের শেয়ার কিনিয়া পুঁজির একাংশ সরবরাহ করিবে। পরে সমিতিগুলি যতই আত্মনির্ভরশীল হইবে ততই সরকার সরিয়া আসিবে। ২. সমবায় সমিতিগুলিকে বৃহত্তর করিতে হইবে। তাহাতে উহাদের শক্তি-সামর্থ্য ও কার্যকারিতা বাড়িবে। ৩. গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যান্য যাবতীয় কার্যে, যথা, ভূমিকর্ষণ, সেচ, কৃষিপণ্য ক্রয় বিক্রয়, বীজ ও সার বণ্টন, কুটির ও গ্রাম্য শিল্পসমূহ সংগঠন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমবায় নীতির প্রয়োগে গ্রাম্য জনসাধারণের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন সমবায় ভিত্তিতে পুনর্গঠন করিতে হইবে। ৪. সমবায় ঋণ, ক্রয়-বিক্রয় এবং উৎপাদনকারী সমবায় সমিতিগুলির কর্মপন্থার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। ৫ সমবায় সমিতিগুলির মধ্যমে কৃষিপণ্যের বিক্রয়কার্যের প্রসারের জন্য সারাদেশে সমবায় সমিতির দ্বারা ও সরকারী উদ্যোগে ও সাহায্যে অসংখ্য গুদাম প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল সরকারী ও সমবায় গুদামে পণ্য জমা দিয়া কৃষকগণ যে রসিদ পাইবে তাহার জামিনে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ৬ সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে মফঃস্বলের এক স্থান হইতে অন্যত্র সহজে টাকা পাঠাইতে পারে এবং সমবায় সমিতিগুলির কার্যে নানাভাবে সহায়তার জন্য রাষ্ট্রের মালিকানায় একটি নূতন ধরনের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। ৭ সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী করিবার জন্য অধিকসংখ্যক সমবায় কর্মিগণের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

খ. অন্যান্য বিশেষজ্ঞ মহল হইতে সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নের জন্য পরামর্শ: ১. অধিকসংখ্যায় সীমাবদ্ধ দায় সম্পন্ন ঋণদান সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। ২. জমির পরিবর্তে উৎপন্ন ফসলের জামিনে ঋণদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। ৩. কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলি সমবায় সমিতির ঋণের দাবিকে অগ্রাধিকার দিবে। ৪. রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে সমবায় আন্দোলনের উন্নতি ও সমবায় সমিতিগুলির সাহায্যের দিকে আরও মনোযোগ দিতে হইবে। ৫. রাজ্যসমবায় দপ্তরগুলিকে উপযুক্তরূপে সমবায় সমিতির হিসাবরক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য যোগ্য কর্মী বাড়াইতে হইবে।

গ. সমবায়ের পুনর্গঠনের জন্য স্যার ম্যালকম ডার্লিংয়ের সুপারিশ: দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিখ্যাত সমবায় বিশেষজ্ঞ স্যার ম্যালকম ডার্লিংকে কলম্বো-পরিকল্পনার পরামর্শদাতা রূপে ভারতে সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহার সুপারিশগুলি অনেকাংশে সারাভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটির সুপারিশের বিপরীত। তাহার প্রধান সুপারিশগুলি হইল: ১. বৃহত্তর আকারে সমবায় সমিতি গঠন বাঞ্ছনীয় নহে। ইহাতে সদস্যগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, মতৈক্য প্রভৃতি বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। এজন্য

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার সমিতি গঠনই সুবিধাজনক। ২. সমবায় আন্দোলনে ঘনিষ্ঠতর সরকারী অংশগ্রহণ উহার বিকাশে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে। ইহার ফলে সমবায়ের আত্মনির্ভরশীলতার নীতি ক্ষুণ্ণ হইবে। ৩. নানাপ্রকার অ-ঋণদান সমিতি যথা ক্রয় সমিতি, বিক্রয় সমিতি প্রভৃতি অধিক সংখ্যায় দ্রুতগতিতে স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় নহে। সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলন এখনও উহার অন্তর্নিহিত দুর্বলতামুক্ত হয় নাই। তদুপরি ইহার দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে দুর্বল ভিত্তির উপর বিরাট সংগঠন স্থায়ী হইবে না। ৪. সমবায় আন্দোলনের সম্প্রসারণের কার্যক্রম স্থানীয় অবস্থার দিকে এবং কৃষকদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রণয়ন ও কার্যকর করিতে হইবে। ৫. নূতন সমিতির সংখ্যাবৃদ্ধি যেমন প্রয়োজন, তেমনি পুরাতন সমিতিগুলির দোষ-ত্রুটি দূর করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

ঘ সমবায় সম্পর্কে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের প্রস্তাব: ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ সমবায়ের উন্নয়নের জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহার সারাংশ হইল যে, সমবায় আন্দোলনকে জনসাধারণের একটি নিজস্ব আন্দোলনে পরিণত করিতে হইবে। ইহাতে জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশগ্রহণের জন্য গ্রামীণক্ষেত্রে গ্রামসমাজকে ভিত্তি করিয়া সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন করিতে হইবে। এক-একটি গ্রাম লইয়া এক-একটি সমবায় সমিতি গঠন করিতে হইবে। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ একটি প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে, যে সকল গ্রাম খুব ছোট, তথায় সুবিধার জন্য একাধিক গ্রাম লইয়া একটি সমবায় সমিতি গঠন করা উচিত। তবে সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সামাজিক সংঘবদ্ধতার মৌলিক সমবায় নীতি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেজন্য, এই প্রকার সমিতির অধীনস্থ গ্রামগুলির জনসংখ্যা ৩০০০-এর (অর্থাৎ ৫০০ হইতে ৬০০ কৃষক পরিবারের) অনধিক এবং ঐগুলি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ৩-৪ মাইল পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত। এই সমিতিগুলি 'সেবা সমবায় সমিতি' (service cooperative) নামে পরিচিত হইবে। ইহারা নিজ নিজ গ্রামের অধিবাসিগণকে ঋণদান হইতে আরম্ভ করিয়া, গ্রামস্থ কৃষকগণের সেচ, সার, বীজ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিবে। কুটিরশিল্পের কারিগরদের জন্য কাঁচামাল সরবরাহ, উৎপাদন সংগঠিত ও তত্ত্বাবধান করা প্রভৃতি কার্যও পরিচালনা করিবে। সামাজিক ক্ষেত্রে গ্রামীণ সেবা সমবায়গুলি গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সহযোগিতায় শক্তিশালী হইবে। এইরূপ একদিকে গ্রামীণ জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবন গণতন্ত্র ও ব্যাপকতর সমবায় নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত হইবে।

পরিকল্পনাকালে সমবায় সম্পর্কে সরকারী নীতি
STATE & COOPERATION DURING THE PLAN PERIOD

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সূচনা হইতে সরকার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণে অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রথম পরিকল্পনা: প্রথম পরিকল্পনায় বলা হয়, দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায় এমন একটি অস্ত্র যাহা অর্থনৈতিক কার্যাবলীর এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় উদ্যোগ বজায় রাখিয়া পরিকল্পনার সামগ্রিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে সবিশেষ সাহায্য করিতে পারে।[১]

পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য সমবায় পদ্ধতির প্রয়োগকে পরিকল্পনার বিবিধ কার্যক্রমের অপরি-

১. First Five Year Plan, p. 163.

হিসাবে গণ্য বলিয়া বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথম পরিকল্পনায় আরও বলা হয়, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য যে নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিতে হইবে তাহার একটি হইল গ্রাম পঞ্চায়েত ও অপরটি হইল সমবায় সমিতি। ইহারা পরস্পরের সহায়তায় গ্রামস্তরে পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে সহায়ক হইবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীর পশ্চাৎপটে সমবায় আন্দোলন যাহাতে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করিতে পারে সেজন্য উহার পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫১ সালে গ্রামীণঋণ ব্যবস্থা ও সমবায়ের ভূমিকা অনুসন্ধান এবং গ্রামীণঋণের একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো গঠনের সুপারিশ করিবার জন্য মিঃ গোরওয়ালাকে সভাপতি করিয়া সারাভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটি নিয়োগ করেন।

কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় সাধারণভাবে সমবায় আন্দোলনের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং কৃষি-ঋণ, নূতন ক্ষেত্রে সমবায় নীতির পরীক্ষা ও সমবায় কর্মিগণের শিক্ষাদানের কিছু ব্যবস্থা ছাড়া ভারত সরকার সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠনের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন নাই। ঐ সময়ে সমবায় আন্দোলনের উন্নয়নের জন্য প্রধানত রাজ্যসরকারসমূহ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপরই নির্ভর করা হয়।[১]

দ্বিতীয় পরিকল্পনা: দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পিত উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে দেশে সমবায়অর্থনৈতিক ক্ষেত্র গঠন করাকে জাতীয় নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই সময়ে প্রধানত সারাভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষার সুপারিশগুলির ভিত্তিতে সমবায় আন্দোলন পুনর্গঠনের কার্যক্রম গৃহীত হয়। উহাতে গ্রামে ও শহরে সমবায় আন্দোলনের প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামাঞ্চলে সমবায় প্রসারের কার্যক্রমে তিনটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।[২] ১. গ্রামীণ সমবায়ের কার্য শুরু হইবে ঋণদান হইতে। পরে গ্রাম্য জনসাধারণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উহাকে সমবায় কৃষি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রমে প্রসারিত করিতে হইবে। ২. গ্রামের প্রতি পরিবারকে একটি-না-একটি সমবায় সমিতির সভ্য হইতে হইবে। ৩. গ্রামের প্রতিটি পরিবারের ঋণযোগ্যতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। পরিকল্পনায় আরও বলা হয় যে, কৃষিঋণ ছাড়া আরও যে সকল গ্রামীণ ক্ষেত্র সমবায়ের বিশেষ উপযোগী তাহা হইল বিক্রয় কার্য, সমবায় ভাণ্ডার, গ্রামীণ উৎপাদনের যাবতীয় ক্ষেত্রসমূহ, কুটির শিল্প, শ্রম ও পূর্তকার্য প্রভৃতি।

প্রাথমিক সমবায় সমিতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে কার্যকারিতার দিক হইতে যাহাতে সভ্যগণ পরস্পরের পরিচিত ও আস্থাভাজন হইতে পারে সেজন্য সমিতিগুলি নাতিবৃহৎ হওয়া উচিত। তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বৃহদায়তন সমিতি গঠন করা যাইতে পারে।

শহরাঞ্চলে সমবায় আন্দোলন প্রসারের যথেষ্ট সম্ভাবনার কথা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয়। এজন্য খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়, পরিবহণ, ক্ষুদ্র শিল্প, ব্যাঙ্কিং, গৃহনির্মাণ ও পূর্তকার্য সমবায়ের প্রসারের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশিত হয়।

ইহা ছাড়া দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সারাভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষার সকল সুপারিশই সরকার গ্রহণ ও কার্যে পরিণত করেন। তাহাতে বৃহত্তর আকারে সমিতি গঠন, ঋণসমবায়ের সহিত অন্যান্য সমবায়ের কার্যের সংযোগসাধন, সমবায় আন্দোলনের প্রতিস্তরে সরকারী অংশ গ্রহণ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কিন্তু ইতোমধ্যে স্যার ম্যালকম ডার্লিংয়ের মতামত প্রকাশিত হওয়ায় সরকার দ্বিধাগ্রস্ত

১. Review of the First Five Year Plan- p. 118.

২. Second Five Year Plan, pp. 221-23.

হইয়া পড়েন। কারণ স্তার ডার্লিং বৃহত্তর সমিতি গঠন, দ্রুত ঋণদান ক্ষেত্রে সমবায়ের প্রসার প্রভৃতির সমালোচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পর ১৯৫৮ সালে সমবায় নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গ্রামসমাজকে (village community) নিম্নতম সংস্থা ধরিয়া প্রতিগ্রামে একটি করিয়া গ্রাম বা পল্লীসমবায় প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাহাতে ইহাও বলা হয় যে, গ্রামের যাবতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব ও উদ্যোগের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পল্লীসমবায়ের (village cooperative) উপর ন্যস্ত করিতে হইবে।[১] অতঃপর ১৯৫৯ সালের জুন মাসে শ্রী ভি, এল. মেহ্‌তাকে সভাপতি করিয়া সমবায় ঋণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের ও সুপারিশের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ১৯৬০ সালের মে মাসে উহার রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করা হয়।[২] ১৯৬০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে ঐ সুপারিশ আলোচিত হওয়ার পর সরকার এই সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করেন তাহাই তৃতীয় পরিকল্পনার সমবায় নীতি।

তৃতীয় পরিকল্পনা : ইহাতে পল্লী সমিতির আয়োজন সম্পর্কে বলা হয় যে, সাধারণত এক-একটি গ্রাম লইয়া নিম্নতমস্তরে এক-একটি প্রাথমিক সমিতি গঠন করিতে হইবে। তবে, যেখানে গ্রামগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র সে ক্ষেত্রে সমিতির কার্যদক্ষতার জন্য একাধিক গ্রাম লইয়া প্রাথমিক সমিতি গঠন করা যাইতে পারে। তবে দেখিতে হইবে এই গ্রামগুলির মোট জনসংখ্যা যেন ৩০০০ বা, ৫০০ কৃষক পরিবারের বেশি না হয় এবং উহারা যেন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ৩-৪ মাইলের মধ্যে থাকে।

গড়ে এক-একটি গ্রামসমিতির অধীনে ৩০০০ ব্যক্তি সাধারণত বেশি মনে হইলেও পরিকল্পনা কমিশন এক্ষেত্রে কোন কঠোর নিয়ম প্রবর্তনের পক্ষপাতী নহেন। এই প্রকার সমিতির মাধ্যমেই গ্রামীণ সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সুতরাং স্তার ডার্লিং বৃহত্তর সমিতির এবং সমবায় ঋণদান কার্যের সহিত অন্যান্য কার্যের সমন্বয়ের যে সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে সাময়িক দ্বিধাগ্রস্ততার পর বর্তমানে ভারত সরকার বৃহত্তর সমবায় সমিতি ও একটি বহুমুখী সমিতির মাধ্যমে ঋণদান ও অন্যান্য কার্যের সংযোগ ও সমন্বয়ের পথই বাছিয়া লইয়াছেন বলা চলে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই পথেই সমবায় অগ্রসর হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকার সমবায় আন্দোলনের উন্নতির জন্য ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। এজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হইয়াছিল ৩৪ কোটি টাকা।

সমবায়ের পুনর্গঠনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা
GOVERNMENTAL MEASURES

১. বৃহদাকার সমিতি গঠনে সরকার উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন। ২. ঋণদান সমবায় সমিতিগুলির সহিত বিক্রয় সমবায় ও কৃষিজাত কাঁচামালের বিবিধ প্রক্রিয়াজাতকরণ সমবায় সমিতিগুলির (Processing Cooperatives) ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সহযোগিতা প্রবর্তিত হয়। ৩. ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দ্বারা স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ১৯৬০ সালের মধ্যে মফঃস্বলে ইহার ৪০০টি নূতন শাখা প্রতিষ্ঠার কার্যসূচী গৃহীত ও সম্পন্ন হয়।

১. The Third Five Year Plan, p. 201.
২. India 1961, p. 275.

৪. কৃষিঋণের প্রসারের জন্য ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে ১৬ কোটি টাকা লইয়া একটি দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ তহবিল [জাতীয় কৃষিঋণ (দীর্ঘমেয়াদী) তহবিল] খোলা হয়। সমবায় ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার কিনিবার জন্য রাজ্যসরকারগুলিকে ঋণদান, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মাঝারি মেয়াদের কৃষিঋণদান, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান ও উহাদের ঋণপত্র ক্রয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে এই তহবিল ব্যবহার করা হইবে। একই সময়ে এককোটি টাকার তহবিল লইয়া মাঝারিমেয়াদী ঋণদানের জন্য অপর একটি তহবিলও [জাতীয় কৃষিঋণ (স্থিতিকরণ) তহবিল] রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে খোলা হইয়াছে। প্রতি বৎসর ইহাতে ১ কোটি টাকা করিয়া চলতি অনুদান দেওয়া হইতেছে। দুর্ভিক্ষ, অজন্মা প্রভৃতি দৈব দুর্বিপাকের দরুন সমবায় সমিতিগুলি উহাদের স্বল্পমেয়াদী ঋণগুলি ফেরত দিতে অক্ষম হইলে যাহাতে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলির অসুবিধা না হয় সেজন্য, এই তহবিল হইতে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের দ্বারা প্রদত্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণকে মাঝারি মেয়াদী ঋণে পরিবর্তিত করিবার জন্য এই তহবিল হইতে পুনরায় ঋণ দেওয়া হইবে। দীর্ঘমেয়াদী তহবিলটি হইতে রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলির জন্য ৫ কোটি টাকার অধিক ঋণমঞ্জুর করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯৬০ সালের জুন মাস পর্যন্ত উহারা ৪·৯৩ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। মাঝারিমেয়াদী তহবিল হইতে এপর্যন্ত ঋণদানের কারণ ঘটে নাই। ৫. একটি কেন্দ্রীয় গুদামজাতকরণ করপোরেশন এবং প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য গুদামজাতকরণ করপোরেশন ও একটি জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ পরিষদ স্থাপনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে কৃষিপণ্য (উন্নয়ন ও গুদামজাতকরণ) করপোরেশন আইন পার্লামেন্টে পাস করা হয়। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঐ পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ ভাবে সমবায় আন্দোলনের এবং বিশেষভাবে কৃষিপণ্যের গুদামজাতকরণ, বিক্রয় এবং বিক্রয়োপযোগী করণ এই পরিষদের উদ্দেশ্য। ১০ কোটি টাকা পুঁজি লইয়া কেন্দ্রীয় গুদামজাতকরণ করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। চৌদ্দটি রাজ্যে গুদামজাতকরণ করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত মোট প্রায় ১৬৭০টি গুদাম ও ৪১০০টি গ্রাম্য গুদাম স্থাপিত হইয়াছে। ৬. সমবায় সমিতিগুলির মারফত প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ২টি পরিকল্পনার দশ বৎসরে মোট ৭৭৩ শতাংশ বাড়িয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে সমবায় সমিতিগুলির প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ২২.৯ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে উহা ২০০ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার ঋণের পরিমাণ ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৪ কোটি টাকা হইতে বাড়াইয়া ১৯৬৩-৬৪ সালে ৩০৮ কোটি টাকায় পরিণত করিয়াছে। ৭. দ্বিতীয় পরিকল্পনার পূর্ব পর্যন্ত ভারতের সমবায় আন্দোলন শুধু ঋণদানের ক্ষেত্রেই প্রধানত আবদ্ধ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় হইতে উহা কৃষিপণ্য বিক্রয় ও বিক্রয়যোগ্যকরণ, গুদামজাতকরণ, মজুদকরণ ও কৃষিকার্য প্রভৃতি বিবিধ নূতন অর্থনীতিক কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছে। গ্রামের সামগ্রিক জীবন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের পরামর্শমত গ্রামসমবায় ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সংগঠিত ও পরিচালিত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ৮. সমবায় কর্মীদের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত পুণায় সমবায় দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য সমবায় শিক্ষণ কলেজ ছাড়া, মধ্যবর্তী ও ব্লক পর্যায়ের কর্মীদের শিক্ষার জন্য ১৩টি, আঞ্চলিক ও নিম্নতর পর্যায়ের কর্মীদের শিক্ষার জন্য ৬২টি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। মোট ৫৪৩ জন উর্ধ্বতন পর্যায়ের, ৩,৪১৭ জন মধ্যবর্তী পর্যায়ের ও ৩৪,০০০ নিম্নতর পর্যায়ের কর্মীদের শিক্ষাদান করা হইয়াছে।

সমবায়ের অগ্রগতি ও তৃতীয় পরিকল্পনায় সমবায়ের লক্ষ্য
COOPERATION AND THIRD PLAN

১. গত দুইটি পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক কৃষিঋণদান সমিতির সংখ্যা ১,০৫,০০০ হইতে ২,১০,০০০-এ পরিণত হইয়াছে। এবং উহাদের মোট সভ্য সংখ্যা ৪৪ লক্ষ হইতে ১৭ কোটিতে পরিণত হইয়াছে। উহাদের দ্বারা প্রদত্ত ও মাঝারি স্বল্পমেয়াদী ঋণের পরিমাণ ২৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০০ কোটি টাকায় এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণের পরিমাণ ১৩ কোটি টাকা হইতে ৩৫ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদী ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়া ৫৩০ কোটি টাকা ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকায় পরিণত করা হইবে।

২. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেশে ১৬৭০টি গুদাম ও ৪১০০টি গ্রাম্য গুদাম স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে আরও ৯৮০টি গুদাম ও ৯২০০টি গ্রাম্য গুদাম স্থাপিত হইবে।

৩. প্রতি জেলায় গড়ে ১০টি করিয়া সারা ভারতে মোট ৩২০০টি পরীক্ষা-মূলক সমবায় খামার (Pilot-Project) চালু করা হইবে।

৪. শিল্প সমবায় (Industrial Cooperatives)-এর সংখ্যা বর্তমান ৩০,০০০ হইতে বাড়াইয়া ৪০,০০০-এ পরিণত করা হইবে।

৫. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায়ের প্রসারের জন্য মোট ৩৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ ৮০ কোটি টাকা।

৬. তৃতীয় পরিকল্পনা কালে সমবায়ের উন্নতির জন্য যে প্রকল্পসমূহ গৃহীত হইয়াছে তাহাতে সামগ্রিকভাবে, আগামী পাঁচ বৎসরে লক্ষ্য হইল—

—২৫ লক্ষ প্রাথমিক গ্রাম সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা।

—উহাদের সভাসংখ্যা হইবে আনুমানিক ৪ কোটি।

—গ্রামের সমস্ত অধিবাসীই ইহাদের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

—ইহাতে মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশে সমবায় বিস্তৃত হইবে।

—ইহাতে মোট কৃষিকার্যে নিযুক্ত জনসংখ্যার ৭৪ শতাংশ সমবায়ের অধীনে আসিবে।

সংক্ষেপে ভারতে সমবায় ক্ষেত্রের প্রসারের ইহাই তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রম।

৮

খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য মূল্যান্তর
Food Production & Food Prices

বিভিন্ন বিষয়েই ভারত বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের দেশ। বিপুল ঐশ্বর্য ও অতলস্পর্শী দারিদ্র, রোলস্‌রয়েস গাড়ি ও গো-যান, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাসাদ ও খড়ের ছাউনীর বস্তির এখানে সহাবস্থান দেখা যায়। তেমনি একটি সহাবস্থান দেখা যায় দেশের কৃষিপ্রাধান্য ও খাদ্যাভাবের মধ্যে।

গত বিশ বৎসর যাবৎ দেশের কৃষি, খাদ্য ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন সরকারী মহলে ভারতের খাদ্যাভাবের কথা আলোচিত হইতেছে। ইহার সমাধানের জন্য বহু সুপারিশ করা হইয়াছে। সরকার নিযুক্ত একাধিক কমিটি ইহার তদন্ত করিয়াছেন। অসংখ্য ব্যবস্থা ইহার প্রতিকারের জন্য গৃহীত হইয়াছে। সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে বলিয়া একাধিকবার নেতৃবর্গ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, সমস্যা যেমন ছিল তাহা অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যায় নাই। ১৯৩৭ সাল হইতে আজ পর্যন্ত দেশ খাদ্য আমদানির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল রহিয়াছে।

খাদ্য ঘাটতির হিসাব
ESTIMATE OF FOOD DEFICIT

ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন যথেষ্ট নহে। এজন্য খাদ্যের উৎপাদনে ঘাটতি রহিয়াছে। কিন্তু ঘাটতির সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। কারণ, খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে পরিসংখ্যানের যেমন ত্রুটি রহিয়াছে, তেমনি ত্রুটি রহিয়াছে প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ খাদ্যশস্যের প্রয়োজন সে সম্পর্কিত তথ্যের। তাহা ছাড়া জনসংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। ইহার উপর বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশবাসীর আয়বৃদ্ধির ফলে অনাহারী ও স্বল্পাহারী দেশবাসী পূর্ণতর আহারের সুযোগ পাইতেছে। অতএব খাদ্য ঘাটতির পরিমাণও স্থির নির্দিষ্ট নহে। তথাপি মোটামুটিভাবে পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব হইতে দেশে খাদ্যঘাটতির পরিমাণ কিছুটা অনুমান করা চলে। ১৯৪৭ হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দেশে আমদানিকৃত খাদ্যের পরিমাণ হইতে, প্রথম পরিকল্পনায় দেশে খাদ্যঘাটতির পরিমাণ তৎকালীন উৎপাদিত খাদ্যের ৬-৭ শতাংশ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ভারত সরকার নিজেও অবশ্য এই হিসাব সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। দেশবাসিগণের মাথাপিছু ১০·৭ আউন্স খাদ্য প্রয়োজন, এই ভিত্তিতে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায়, পরিকল্পনা কমিশন দেশে ৭০ লক্ষ টনের খাদ্যঘাটতি রহিয়াছে বলিয়া হিসাব করিয়াছিলেন। মাথাপিছু ১৮·৩ আউন্স খাদ্য প্রয়োজন, এই হিসাবের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১ কোটি টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য প্রথমে নির্দিষ্ট হয়। পরে উহা বাড়াইয়া ১·৫৫ কোটি টন করা হয়। সে সময় বলা হয় যে ইহাতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা আসিবে।

কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালে দেখা গেল মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ ১৬ আউন্স হইয়াছে। খাদ্যঘাটতি দূর হয় নাই। তাই তৃতীয় পরিকল্পনায় মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া ১৭·৫ আউন্স করিবার জন্য অতিরিক্ত ২·৪ কোটি টন খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

ইহার ফলে ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতে খাদ্যাভাব দূর হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণা পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

ভারতের খাদ্যসমস্যার প্রকৃতি
NATURE OF THE FOOD PROBLEM IN INDIA

ভারতের খাদ্যসমস্যার চারিটি দিক আছে। খাদ্যসমস্যার সমাধান করিতে হইলে ইহাদের কথা মনে রাখিতে হইবে।

১. **পরিমাণগত দিক:** পরিমাণ বিচারে ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের উৎপাদন ও বাজারে উহার যোগান অল্প।

২. **গুণগত দিক:** ভারতের খাদ্যের সমস্যা নিছক দানাজাতীয় খাদ্যের অভাবের সমস্যা নহে। দেশবাসিগণ অত্যন্ত দরিদ্র। তাহাদের প্রধান খাদ্যই চাউল, গম, যোয়ার, বাজরা, ও ভুট্টা। তাহারা দারিদ্র্যের জন্য ফল, শাকসবজি, ডিম, মাখন, দুগ্ধ প্রভৃতির ক্রয় ও ব্যবহারে অক্ষম। এজন্য স্বাস্থ্যবিধিসম্মত খাদ্য (balanced diet) হইতে বঞ্চিত। ফলে অধিকাংশ ব্যক্তিই অপুষ্টিজনিত অসুস্থতা ভোগ করে। সুতরাং ভারতীয়গণের খাদ্য শুধু পরিমাণেই অল্প নহে, নিকৃষ্টও বটে। বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রত্যেকটি সুস্থ ব্যক্তির প্রতিদিন ৩০০০ ক্যালোরি খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। অথচ ভারতবাসিগণের দৈনন্দিন আহার্য দ্রব্যের খাদ্যমূল্য গড়ে ২২০০ ক্যালোরির বেশি নহে। ইহার ফলে ব্যাপক অপুষ্টি, অসুস্থতা ও মৃত্যুহার অধিক হইয়াছে। শ্রমের ক্ষমতা হ্রাসেরও ইহা অন্যতম কারণ।

৩. **অর্থনীতিক দিক:** দেশবাসিগণ দরিদ্র বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই অর্থের অভাবে তাহারা খাদ্য ক্রয় করিতে পারে না। সুতরাং শুধু খাদ্যের উৎপাদন ও যোগান বাড়াইলেই খাদ্যসমস্যা দূর হইবে না। সকলেই যাহাতে খাদ্য কিনিবার ক্ষমতা লাভ করে সেজন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

৪. **প্রশাসনিক দিক:** দেশের খাদ্যব্যবসায়িগণের মধ্যে দুর্নীতি, চোরাকারবার ও মজুদদারী ও খাদ্য লইয়া ফটকাবাজীর মনোভাব এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, শুধু অধিক খাদ্য উৎপাদন, উৎপন্ন খাদ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিই খাদ্য সমস্যার সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নহে। লোভী ব্যবসায়িগণের কারসাজিতে যাহাতে খাদ্যের মূল্য না বাড়ে, খাদ্যশস্যের গোপন মজুদ দ্বারা যাহাতে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি না হয়, সে জন্য খাদ্যশস্যের উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থা প্রয়োজন। ইহার জন্য বিভিন্ন স্তরে সরকারী ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধান ও সমগ্র বিষয়টির উপর সরকারী সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ভারতের উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব
IMPORTANCE OF INCREASING FOOD PRODUCTION IN A DEVELOPING COUNTRY LIKE INDIA

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে খাদ্যসমস্যা পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে প্রচণ্ড অন্তরায়। এ সকল দেশের স্থায়ী ও ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ ছাড়া অন্য কোন পথ নাই। ইহার কারণ,—

১. ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান এখনও নিম্নতম স্তরে রহিয়াছে। তাহাদের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ সরকারী হিসাবে ১৫-১৬ আউন্সের মত। ক্যালোরির দিক দিয়া উহা মাত্র ২০০০-২২০০-এর মত। অথচ ন্যূনতম প্রয়োজন ৩০০০ ক্যালোরি খাদ্যের। এই অবস্থায়

(Second Food Grains Policy Committee) গঠিত হয়। এই কমিটি পরবর্তী [illegible] ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা (যথা, গভীর নলকূপ, রাসায়নিক সার, পতিত জমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি) ১ কোটি টন অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের পরামর্শ দান করেন। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটির ব্যয় ধার্য হয় ২৭১ কোটি টাকা। ভারত সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেন। তদনুযায়ী সিন্ধ্রিতে সার কারখানা ও মহীশূরে খাদ্য সম্পর্কিত প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠান (Institute of Food Technology) স্থাপিত হয়।

২. পরিকল্পনার যুগ: সমস্যা ও ব্যবস্থা: প্রথম পরিকল্পনাকালে, ১৯৫১ সালে পরিকল্পনা আরম্ভের সময়, পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে খাদ্যঘাটতির পরিমাণ ছিল উৎপাদিত খাদ্যের ৬-৭ শতাংশ। সে সময় দেশে খাদ্যের উৎপাদন ছিল ৪.৪০ কোটি টনের মত। আজ পর্যন্ত ভারতে যত খাদ্য আমদানি হইয়াছে তাহার মধ্যে ১৯৫১ সালেই সর্বাপেক্ষা অধিক আমদানি ঘটে (৪৭ লক্ষ টন—মূল্য ২১৬ কোটি টাকা)। ১৯৪৭ সাল হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ১২৩ কোটি টাকারও অধিক ব্যয়ে ৩০ লক্ষ টন করিয়া খাদ্যশস্য আমদানি হইতে থাকে। খাদ্যশস্যের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এইরূপ বৈদেশিক নির্ভরতা ও তজ্জন্য বিদেশী মুদ্রার অপচয় বন্ধ করিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন কৃষির উপর অগ্রাধিকার দান করিয়া খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার লক্ষ্য স্থির করেন। এজন্য প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যের উৎপাদন, ১৯৪৯ সালে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার (৫.৪ কোটি টন) ২৪ শতাংশ বৃদ্ধির অর্থাৎ অতিরিক্ত ৭৬ লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য গৃহীত হয়। প্রথম পরিকল্পনায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও অনুকূল বৃষ্টিপাতের ফলে খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্য অতিক্রম করে। নির্ধারিত লক্ষ্য ১৪ শতাংশ বৃদ্ধির স্থলে প্রকৃত উৎপাদন ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট উৎপাদন ৬.৫৮ কোটি টনে পরিণত হয়। ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম উৎপাদন ছিল ৫.২২ কোটি টন। অতএব প্রকৃতপক্ষে প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্য উৎপাদন ১.৩৬ কোটি টন বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে ১৯৫৩ সালে রেশনিং তুলিয়া দেওয়া হয়। খাদ্যের আমদানিও প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে মাত্র ৮ লক্ষ টন ও ৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি হয়। ইহাই খাদ্যশস্য আমদানির ইতিহাসে নিম্নতম পরিমাণ। সে সময় ভারত সরকার দেশে খাদ্য সমস্যার সমাধান ঘটিয়াছে বলিয়া দাবি করেন।

প্রথম পরিকল্পনাকালে খাদ্য সমস্যার সমাধানে গৃহীত সরকারী নীতি ও ব্যবস্থা: 'আরও খাদ্য ফলাও' অনুসন্ধান কমিটি (Grow More Food Enquiry Committee): ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রী ভি টি কৃষ্ণমাচারীকে সভাপতি করিয়া 'আরো খাদ্য ফলাও' আন্দোলন সম্পর্কে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটি বিশদ অনুসন্ধানের পর ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে রিপোর্ট পেশ করেন। কমিটি বলেন যে ১৯৪৭ সালের পর হইতে এই আন্দোলন খানিক পরিমাণে সাফল্য অর্জনে সমর্থ হইয়াছে। খাদ্যশস্য, তুলা ও পাটের উৎপাদন বাড়িয়াছে। কিন্তু কতকগুলি কারণে ইহা উপযুক্ত সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ইহার কর্মক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। আন্দোলনটিকে অত্যন্ত সাময়িক রূপে করা হইয়াছিল। ইহা ব্যাপকভাবে জন-সমর্থন লাভ ও উৎসাহ সৃষ্টি করিতে পারে নাই। গ্রামজীবনের বিভিন্ন সমস্যা যে পরস্পর সংযুক্ত, সেরূপভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যাকে দেখা হয় নাই। বীজ, সার ও সেচের সুবিধা অধিক পরিমাণে দেওয়া যায় নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কমিটি যে সুপারিশ করেন তাহার ফলে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রমের সহিত এই 'আরো খাদ্য ফলাও' আন্দোলন যুক্ত হইয়া উহার অংশে পরিণত হয়। কমিটির সুপারিশের মধ্যে গ্রামীণ সম্প্রসারণ সেবাকর্মের (Rural Extension Service) প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। ইহার ফলেই জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্মের (National

। Service) প্রবর্তন ঘটে। অবশ্যই খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্য আমদানি হ্রাস পায় এবং ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে রেশনিং প্রত্যাহার করা হয়। ইহার পরে খাদ্যশস্যের দর অত্যধিক হ্রাস পাইতে থাকায় সরকার উহার স্থিতির জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যাভাবঃ প্রথম পরিকল্পনার শেষে খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধিতে পরিকল্পনা কমিশন ও ভারত সরকার খাদ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ১ কোটি টন ধার্য করেন। পরে উহা বৃদ্ধি করিয়া ১.৫৫ কোটি টন করা হয়। ইতোমধ্যে দেশে পুনরায় খাদ্যাভাব দেখা দেয় ও খাদ্যঘাটতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৬ সাল হইতে খাদ্য আমদানি ১৪ লক্ষ টন হইতে বাড়িয়া ১৯৬০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৪৫ টনে পরিণত হয়। ইহার কারণগুলি সংক্ষেপে এই :

১. দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে ফসল বিনষ্ট হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে ও ১৯৫৯-৬০ সালে খাদ্য-শস্যের ফলন (যথাক্রমে ৬২ লক্ষ ও ৩৮ লক্ষ) হ্রাস পায়।

২. জনসংখ্যা এই দশকে আরও উচ্চ হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৬১ সালের লোক-গণনায় দেখা যায় এই দশকে প্রতি বৎসর ২ শতাংশ হারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ৭ কোটিরও বেশি। সুতরাং দেশে খাদ্যের চাহিদাও অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

৩. ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে অধিকাংশ খাদ্যশস্যের ফলনই কমে। খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতার সূচক সংখ্যা হ্রাস পায়।

৪. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ হইতে ঋণের সাহায্যে বড় বড় খাদ্যব্যবসায়িগণ গোপনে খাদ্য মজুদ করিতে থাকে। ইহাতে বাজারে যোগানের পরিমাণ আরও হ্রাস পায়।

৫. সীমান্তবর্তী অঞ্চল হইতে পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যশস্যের চোরাই চালানও পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যঘাটতির তীব্রতা বৃদ্ধি করে।

১৯৫৭ সালে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটি (অশোক মেহ্‌তা কমিটি আরও কয়েকটি নূতন কারণ প্রদর্শন করেন। যথা,—

৬. পরিকল্পনা সংক্রান্ত ব্যয়ের ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির দরুন স্বল্পাহারী ও অনাহারী দরিদ্র ব্যক্তিগণ অধিক পরিমাণে খাদ্যগ্রহণের সুযোগ পায়। তাহাতে দেশে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে।

৭. শস্যের উচ্চ মূল্যের দরুন কৃষকগণের পক্ষে, অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ শস্য বিক্রয় করিয়াই প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হয়। ইহাতেও বাজারে বিক্রীত শস্যের পরিমাণ হ্রাস পায়।

৮. শস্যের মূল্য ক্রমাগত বাড়িতেছে দেখিয়া, উৎপাদনকারিগণ আরও বেশি দরে বিক্রয় করিবার আশায়, বেশি করিয়া ফসল মজুদ করে। তাহাতেও বাজারে ফসলের যোগান কমিয়া যায়।

৯. খাদ্য সম্বন্ধে অভ্যাসের পরিবর্তন। মানুষ পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে দানা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিতেছে।

এইরূপে বিভিন্ন কারণে ফসলের যোগান কমিয়া ও চাহিদা বাড়িয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশে খাদ্যসংকট সৃষ্টি করে

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যসংকটের সমাধানে গৃহীত ব্যবস্থা : দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পুনবায় খাদ্যসমস্যা তীব্র হইলে ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহার প্রতিকারে সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করেন।

১. ১৯৫৬ সালের প্রথম দিকে খাদ্যরপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়।

২. ঐ বৎসরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত দুইটি দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির দ্বারা (পি. এল. ৪৮০) সরকার ৩১ লক্ষ টন গম ও ব্রহ্মদেশ হইতে ২০ লক্ষ টন চাউল আমদানি করিবার ব্যবস্থার দ্বারা দেশে খাদ্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করেন।

৩. দিল্লী, বোম্বাই ও কলিকাতার মত বড় শহরগুলির খাদ্যের অত্যধিক চাহিদা যাহাতে খোলাবাজারকে প্রভাবিত না করে, সেজন্য ঐ সকল স্থানে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে খাদ্যশস্যের বেসরকারী আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয় (Cordoning)।

৪. অত্যাবশ্যক পণ্য আইন (Essential Commodities Act) সংশোধন করিয়া বিভিন্ন রাজ্যে গত তিন মাসের গড়পড়তা দরে খাদ্যশস্যের স্থানীয় মজুদ ক্রয় ও বণ্টন করিতে রাজ্যসরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

৫. আমদানিকৃত চাউল ও গম ন্যায্যমূল্যের দোকান (Fair Price Shop) খুলিয়া উহাদের মারফত বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৮ সালে সারা ভারতে এরূপ ৫০,০০০ দোকান ছিল।

৬. ১৯৫৭ সালের জুন মাসে তিনটি গম অঞ্চল (Wheat Zones) ও জুলাই মাসে একটি চাউল অঞ্চল (Rice Zone) সৃষ্টি করা হয়। পরে পূর্বভারতে দ্বিতীয় একটি চাউল অঞ্চল সৃষ্টি করা হয়। এই সকল অঞ্চল সৃষ্টির উদ্দেশ্য উহাদের অভ্যন্তরে খাদ্যশস্যের অবাধ চলাচল বজায় রাখা, কিন্তু এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে খাদ্য চলাচল বন্ধ করা। ইহাতে স্থানীয় অঞ্চল হইতে খাদ্য অদৃশ্য হইবার সম্ভাবনা কমে।

৭. বিভিন্ন রাজ্যে ধান ও চাউলের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারিত হয়। ইহাতে মূল্যের অতিরিক্ত বৃদ্ধি বন্ধ হয় এবং সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্য ক্রয়ের সুবিধা হয়।

৮. খাদ্যশস্যের ফট্‌কাবাজী বন্ধ করিবার জন্য আগাম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি (Forward Trading) নিষিদ্ধ হয়।

৯. ময়দা কলের মালিকগণকে লাইসেন্স লইতে বাধ্য করা হয় এবং খোলা বাজার হইতে উহাদের গম ক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়।

১০. ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইয়া মজুদদারগণ যাহাতে খাদ্য গোপনে মজুদ করিতে না পারে, সেজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয়।

ক. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে খাদ্যশস্যের জামিনে প্রদত্ত ঋণ সংকোচ করিতে পরামর্শ দেয়।

খ. ঋণের মার্জিন বা প্রান্ত শতকরা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

গ. খাদ্যশস্যের জামিনে ৫০,০০০ টাকার অধিক নূতন ঋণদান এবং যে সকল ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণ ৫০,০০০ টাকার কম, তথায় উহার পরিমাণ বৃদ্ধি নিষিদ্ধ করা হয়।

ঘ. ধান-চাউলের জামিনে ঋণ ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের জামিনে ঋণ এমনভাবে কমাইতে বলা হয় যেন, ১৯৫৬ সালের অনুরূপ সপ্তাহে ঐ সকল প্রকার ঋণের তুলনায় প্রথমটির (ধান-চাউল) বাবদ ঋণ ৬৬ শতাংশ ও দ্বিতীয়টির (অন্যান্য খাদ্যশস্য) বাবদ ঋণ ৭৫ শতাংশের অধিক না হয়।

১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় (State Trading) প্রবর্তন দ্বারা মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করা হয়।

এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি খানিক পরিমাণে দমন করা হয়। কিন্তু ব্যবস্থাগুলি যে উপযুক্ত পরিমাণে সফল হয় নাই তাহা খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা হইতে স্পষ্ট হয়। ১৯৫৭ সালে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের সূচকসংখ্যা (১০২ ৩) একরূপে থাকিলেও ১৯৫৯, ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে উহা যথাক্রমে ১১৩৮, ১১৭০, ১১৭৬-এ উঠে। অবশ্য দানাজাতীয় শস্যের মূল্য ১৯৬০ তুলনায় ১৯৬১ সালে সামান্য হ্রাস পায়।[১]

খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি
FOOD GRAINS ENQUIRY COMMITTEE

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যসংকট তীব্র হইয়া দেখা দেওয়ায় ভারত সরকার উহার বিভিন্ন দিক সতর্করূপে পর্যালোচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করেন। এজন্য ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে শ্রীঅশোক মেহ্তাকে সভাপতি করিয়া একটি 'খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি' নিযুক্ত হয়। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে কমিটি রিপোর্ট পেশ করেন।

১৯৫৫ সালের মধ্যভাগ হইতে যে খাদ্যসমস্যা ও খাদ্য মূল্যস্তর বৃদ্ধি আরম্ভ হয়, কমিটিকে উহার কারণ অনুসন্ধান এবং আগামী কয়েক বৎসরে খাদ্যশস্যের চাহিদা ও যোগান কিরূপ হইতে পারে তাহা পর্যালোচনা করিতে বলা হয়। উহার রিপোর্টে কমিটি বলেন যে, ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্যের অভাব দেখা দিতে পারে। ইহাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি না রাখিলে সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। চাহিদা ও যোগানের বৈষম্যের ফলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পাইলে এ সকল বৈষম্য আরও বাড়িতে পারে। সুতরাং এ সকল বৈষম্যের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া, উহাদের ক্ষতির ফলাফল যথাসম্ভব দমন করাই সরকারী নীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। কমিটির মতে একদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অপর দিকে পরিবার পরিকল্পনার দ্বারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপর খাদ্যসমস্যার দীর্ঘকালীন সমাধান নির্ভর করিতেছে।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া কমিটি যে সকল ব্যবস্থাগ্রহণের সুপারিশ করেন তাহা দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পকালীন এই দুইভাগে বিভক্ত।

ক. **দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা:** ১. খাদ্যশস্যের মূল্যের স্থিতিকরণ সরকারী নীতির প্রাথমিক লক্ষ্যরূপে গৃহীত হওয়া আবশ্যক। এজন্য মূল্য স্থিতিকরণ পরিষদ (Price Stabilization Board) নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃত্বকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ইহা মূল্যস্থিতিকরণের সাধারণ নীতি ও কার্যক্রম স্থির করিবে।

২. উক্ত সংস্থা কর্তৃক নির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য খাদ্যশস্যের ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত নানারূপ কাজের প্রয়োজন হইবে। ইহার ভার লইবার জন্য খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন (Food Grains Stabilization Organisation) নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে। এই সংগঠন খাদ্যশস্যের একটি মজুদ ভাণ্ডার (buffer stock) সৃষ্টি করিবে। ইহার সাহায্যে খাদ্যশস্যের চাহিদা ও যোগানের সাময়িক বৈষম্য দূর করা হইবে।

৩. মূল্যস্থিতিকরণ পরিষদ যাহাতে মূল্য সংক্রান্ত পরিস্থিতির উপর নজর রাখিতে পারে ও

১. Third Five Year Plan, p. 122, Table 2.

...নীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে, সেজন্য উহাকে সহায়তা করিবার জন্য দুইটি সংস্থা স্থাপন করিতে হইবে। ইহাদের একটি হইল কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা সংসদ (Central Food Advisory Council) এবং অপরটি হইল মূল্যসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের দপ্তর (Price Intelligence Division)। প্রথমটি মূল্যস্থিতিকরণ পরিষদ ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী দপ্তরকে খাদ্যনীতি সম্পর্কে পরামর্শ দিবে। দ্বিতীয়টি মূল্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবে।

৪. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কমিটি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচকার্য, সার ও বীজ বণ্টন, পতিত জমির পুনরুদ্ধার প্রভৃতি ও উহাদের জন্য বরাদ্দ অর্থব্যয়ের সংশোধন ও পরিবর্ধনের জন্য নানারূপ সুপারিশ করেন।

৫. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশে খাদ্যঘাটতি দূর করিবার জন্য প্রতি বৎসর ২০-৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির জন্য সুপারিশ করেন।

৬. খাদ্যশস্যের অবাধ ব্যবসায় খাদ্যঘাটতির পরিস্থিতিতে অবাঞ্ছনীয়। অথচ পূর্বের মত সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রভৃতি ব্যবস্থাও নানা কারণে অসুবিধাজনক। এই অবস্থায় মধ্যপন্থা হিসাবে কমিটি খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়ের আংশিক ভার সরকার কর্তৃক গ্রহণের, অর্থাৎ জাতীয়করণের জন্য সুপারিশ করেন। এক কথায় খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় (State Trading in Food Grains) প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

খ. **স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা:** স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে কমিটি খাদ্যশস্যের বণ্টন অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়-নিয়ন্ত্রণ, সমবায় সমিতি, কলকারখানার মালিকগণের সংগঠন ও ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত খাদ্যশস্য বিক্রয়ের সুপারিশ করেন।

সমালোচনা: খাদ্যশস্য তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলি সম্পর্কে যে সকল সমালোচনা করা হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এই:

১. কমিটি খাদ্যাভাবের কারণ সম্বন্ধে বিশদ অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পরিস্থিতির অতি সাধারণ পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করিয়া নিতান্ত সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। কোন বিশিষ্ট প্রকারে চমকপ্রদ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

২. সরকারী আমলাতন্ত্র পরিচালিত খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন (Food Grains Stabilization Organisation) উপযুক্ত কার্যদক্ষতা দেখাইতে পারিবে কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছিল।

৩. কমিটি পরপর চারিটি নূতন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। অনেকের মতে ইহাতে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হইতে পারে।

৪. কমিটি খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন কর্তৃক খাদ্যের সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্য মজুদ ভাণ্ডার (buffer stock) সৃষ্টি করা ছাড়াও, একটি উপযুক্ত খাদ্যমজুদ ভাণ্ডার সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রতি বৎসর ২০-৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানির প্রয়োজনও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপে ঐ দুইটি ভাণ্ডার সৃষ্টি সম্ভব এবং বিদেশী মুদ্রার সংকটজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য আমদানি নীতির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেন নাই।

৫. খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে কমিটি যে সকল পরামর্শ দিয়াছে তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। ইতিপূর্বে অনেকেই অনেক সময় এসকল পরামর্শ দিয়াছেন।

৬. স্বল্পকালীন ব্যবস্থা এবং খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে কমিটি যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা অনেকের মতে সময়োপযোগী হইয়াছে।

সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা : ভারত সরকার কমিটির সাময়িক সুপারিশগুলির সকলই গ্রহণ ও কার্যে পরিণত করেন। ইহা ছাড়া খাদ্য আমদানির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রহ্মদেশের সহিত চুক্তি করা হয়। খাদ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের সুপারিশও গৃহীত হয়। খাদ্যের একটি মজুদ তহবিলও সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু সরকার প্রস্তাবিত মূল্যস্থিতিকরণ পরিষদ ও খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন প্রভৃতি স্থাপন করেন নাই। মনে হয় যে, তাঁহারা খাদ্যমূল্যের সাময়িক পর্যালোচনার যে ব্যবস্থা বর্তমান ছিল এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী দপ্তরের অধীনে যে কৃষিপণ্য বিক্রয়সংক্রান্ত বিভাগ রহিয়াছে উহার কার্যাবলীই বর্তমান অবস্থায় যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বর্তমান খাদ্য সংকট
PRESENT FOOD CRISIS DURING THE THIRD FIVE YEAR PLAN

তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে ১৯৬৩-৬৪ সালে দেশে পুনরায় খাদ্যসমস্যা যেরূপ তীব্র আকারে দেখা দেয় এবং খাদ্যমূল্যস্তর যেরূপ দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পায়, বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে এরূপ আর দেখা যায় নাই।

বর্তমান খাদ্য সংকটের কারণ (causes)—ইহার জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলিকে দায়ী করা যাইতে পারে :

১. **খাদ্যশস্যের ফলন হ্রাস :** দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ১৯৬০-৬১ সালে দেশে খাদ্য শস্যের মোট ফলন হইয়াছিল ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ টনের বেশি। তৃতীয় পরিকল্পনায় খাদ্য শস্যের উৎপাদন ১৯৬৫-৬৬ সালে ১০ কোটি টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর ১৯৬১-৬২ সালে খাদ্য উৎপাদন মাত্র ৬৬ হাজার টন বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী বৎসর ১৯৬২-৬৩ সালে উৎপাদন ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টন হ্রাস পায়। ১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৬২-৬৩ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৩৫.৬ হইতে কমিয়া ১৩১.৩-এ পৌঁছায়। দেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন হ্রাস বর্তমান খাদ্যসংকটের একটি প্রধান কারণ।

খাদ্যশস্যের ফলন	
বৎসর	**হাজার টন**
১৯৬০-৬১	৭,৯৬,৯১
১৯৬১-৬২	৭,৯৭,৫৭
১৯৬২-৬৩	৭,৭৫,০৭

২. **ব্যাপক গোপন মজুতদারী :** বর্তমান খাদ্যসংকটের আরেকটি প্রধান কারণ হইতেছে চড়া মুনাফার লালসায় ব্যাপকভাবে দেশের খাদ্যশস্য-ব্যবসায়ী, চাউল কল মালিক ও ধনী কৃষকগণ কর্তৃক খাদ্যশস্যের গোপন মজুতদারী। ইহাদের এই সমাজ বিরোধী কার্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক অধিক ঋণের যোগান ও কালো টাকার অস্তিত্ব যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। ইহার ফলে উৎপাদন হ্রাসের জন্য যে পরিমাণ খাদ্যাভাব দেশে দেখা দেওয়ার কথা, খাদ্যসংকট তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে।

৩. **খাদ্যশস্যের চলাচলে আঞ্চলিক প্রথা (Zonal system) :** ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে খাদ্যশস্যের স্বাধীন চলাচলের ব্যবস্থা নাই। রাজ্যগুলিকে কয়েকটি খাদ্য-অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে খাদ্যশস্যের চলাচল সরকারী অনুমতিসাপেক্ষ। ইহার ফলে উদ্বৃত্ত অঞ্চল হইতে ঘাটতি অঞ্চলে প্রয়োজনমত দ্রুতবেগে খাদ্যশস্য চালান করা যায় না। ইহাতে পশ্চিম বঙ্গ, কেরল, প্রভৃতির মত ঘাটতি রাজ্যগুলিতে খাদ্যসংকট অধিক তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে।

৪. মুদ্রাস্ফীতি ও আর্থিক আয়ের বৃদ্ধি: ঘাটতি ব্যয় সত্ত্বেও পরিকল্পনার ব্যয়ের ফলে মানুষের হাতে আর্থিক আয় বাড়িতেছে। ইহার দরুন খাদ্যশস্যের চাহিদাও দ্রুতবেগে বাড়িতেছে। দেশবাসীর খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তিত হইতেছে ও খাদ্যশস্য ব্যবহারের পরিমাণ (intake) বাড়িতেছে।

৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধি: দেশে উচ্চহারে জনসংখ্যার বৃদ্ধিও বর্তমান খাদ্যসংকটের জন্য দায়ী। কিন্তু অধ্যাপক এন. ভি. গ্যাডগিলের মতে বর্তমানে যে খাদ্যসংকট চলিয়াছে উহার সহিত জনসংখ্যার বৃদ্ধিব কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ বর্তমান-খাদ্যসংকট যেরূপ আকস্মিক ও তীব্র হইয়াছে, তাহাব জন্য জনসংখ্যাব বৃদ্ধিকে দায়ী কবা ঠিক নহে।

উপবোক্ত কারণগুলিব আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, দেশে বর্তমান খাদ্যসংকটের কারণ মূলত দুইটি। প্রথমত, দেশে খাদ্যশস্যের চাহিদা ও যোগানেব ব্যবধান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং চাহিদা যেখানে ক্রমবর্ধমান, উৎপাদন সেখানে স্থিতিশীল হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয়ত, দেশে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, যথোচিত রূপে দেশবাসিগণের মধ্যে উহার ন্যায্যবণ্টন ঘটিতেছে না। গোপন মজুতদারীব চোবা পথে বাজাব হইতে উহা অন্তর্ধান করিতেছে। অর্থাৎ স্বাভাবিক ও কৃত্রিম, এই দুই প্রকাব কাবণের সমন্বয়ে বর্তমান খাদ্যসংকটের উদ্ভব ঘটিয়াছে। এবং ইহারই ফলে, বর্তমানে খাদ্যশস্যেব দব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে ১৯৬২ সালে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তবের সূচকসংখ্যা ১১৮.৪ ছিল, ১৯৬৪ সালে উহা ১৪১.৫-এ পৌঁছায়। সামগ্রিকভাবে খাদ্যশস্যের দব ২৪ শতাংশ এবং ডাইল প্রভৃতি কোন কোন শস্যের দর ১৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

প্রতিবিধানে সরকারী নীতি ও ব্যবস্থাদি (Remedies : Policies and Measures adopted by the Govt): দেশে খাদ্যসংকটকে কেন্দ্র কবিয়া প্রচণ্ড বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পার্লামেণ্ট ও বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভায় ও আইনপবিষদে খাদ্যবিতর্ক উত্থাপিত হয়। দিল্লীতে কংগ্রেসেব AICC অধিবেশনে খাদ্যসমস্যা আলোচিত হয় ও উহা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত খাদ্য সম্পর্কিত প্রস্তাব অনুমোদন করে। ইহার পর পার্লামেণ্টে খাদ্য-বিতর্ক ঘটে ও তথায় এই সমস্যাব সমাধানে নূতন সবকারী নীতি ঘোষিত হয়। অতঃপর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টে তাঁহাব বক্তৃতায় আরও বিশদভাবে খাদ্যসংকট সমাধানে গৃহীতব্য সবকারী নীতি ও ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করেন। নিম্নে তাহা সংক্ষেপে দেওয়া গেল।

খাদ্যসংকট সমাধানেব জন্য সরকার দুই প্রকাব ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী। আশু খাদ্যসমস্যার তীব্রতা হ্রাস ও মূল্যবৃদ্ধি রোধ এবং খাদ্যশস্যের ন্যায্যবণ্টন, স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাগুলিব মূল উদ্দেশ্য। আর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্য হইল শেষ পর্যন্ত খাদ্যশস্যের উৎপাদনে দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা।

১. আশু বা স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থাগুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে: ক. বিদেশ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, থাইল্যাণ্ড ও কাম্বোডিয়া) হইতে অবিলম্বে চাউল, গম প্রভৃতি খাদ্য শস্যের আমদানি বৃদ্ধির দ্বারা দেশে খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ১৯৬৩ সালে ৪৬ লক্ষ টনের স্থলে ১৯৬৪ সালে ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করা হয়।

খ. বিভিন্ন রাজ্যে আরও অধিক সংখ্যায় ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলা হয় (১৯৬৩ সালে ৫৫ হাজারের স্থলে ১৯৬৪ সালে ৮০ হাজার)।

গ. চোরাচালান মজুতদারী প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্যের জন্য কঠোর আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

ঘ. কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্যস্তর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ঝা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষিজাত ফসল সম্পর্কে উৎপাদকগণের ও পাইকার এবং খুচরা ব্যবসায়িগণের দর ঘোষণা করিয়াছেন। এবং ইহা করিতে গিয়া দেশে উৎপন্ন ও আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের দর যাহাতে একরূপ হয়, সেজন্য তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পদরে আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের দর বাড়াইয়া দেশীয় শস্যের দরের সমান করিয়াছেন।

ঙ. কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি ১০ লক্ষের অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট বড় বড় শহরগুলিতে খাদ্য যোগাইবার নীতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। এবং কলিকাতায় ১৯৬৫ সালের ৫ই জানুয়ারী হইতে বিধিবদ্ধ রেশনিং প্রবর্তিত হইয়াছে।

চ. ইহা ছাড়া প্রতিরাজ্যকে একটি খাদ্য অঞ্চল বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে ও তথায় প্রতি রাজ্য সরকার খাদ্যশস্য ক্রয় করিবেন এবং সরকারী শস্য মজুদ হইতে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি ঘাটতি রাজ্যগুলির প্রয়োজনে খাদ্যশস্য সরবরাহ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

২. **দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাগুলি** হইতেছে এই যে: ক. দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে প্রথমেই আগামী ৬-৮ বৎসরের মধ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

খ. কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যস্তর সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সবকার কর্তৃক নিযুক্ত ঝা কমিটির রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে ও তাহা গ্রহণ করিয়া কেন্দ্রীয় সবকার রবিশস্যের উৎপাদকগণের ও পাইকারী এবং খুচরা বিক্রেতাগণের বিক্রয়দব স্থিব করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে উৎপাদকগণ ন্যায্যদর পাইবে ও তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইবে। অপরদিকে পাইকারী এবং খুচরা বিক্রেতাগণের পক্ষে চড়া দরে শস্য বেচিয়া মুনাফাবাজীর পথও বন্ধ হইবে।

একটি স্থায়ী কৃষিজাত দ্রব্য মূল্য কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ভবিষ্যতে যাবতীয় কৃষিজাত দ্রব্যেব দর ধার্য করিয়া দিবে।

গ. আবেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হইতেছে ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাস হইতে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত। ইহার ভার লইবার জন্য ভারতের খাদ্য করপোরেশন (Food Corporation of India) নামে একটি বিধিবদ্ধ সরকারী করপোরেশন গঠিত হইবে। প্রয়োজনবোধে প্রতিরাজ্যেও একটি করিয়া রাজ্য খাদ্য করপোরেশন গঠিত হইবে। ইহা সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক নীতি অনুসারে কাজ করিবে। তবে ইহা পাইকারী খাদ্যশস্য ব্যবসায়িগণের উচ্ছেদের পরিবর্তে তাহাদের সহযোগিতায় কাজ করিবে। পরে সাফল্যলাভ করিলে ইহা কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করিবে, এমনকি প্রয়োজনবোধে কৃষকগণকে ঋণও দিবে। খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের ফলে দেশে খাদ্যমূল্য স্তরের স্থিরতা দেখা দিবে ও মজুতদারী বন্ধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ঘ. খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সারের ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে এবং দেশে রাসায়নিক সারের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পাঁচটি নূতন বৃহৎ রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে।

ঙ. আগামী কয়েক বৎসর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে (C. D. P.) খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইবে।

৩. **জাতীয় খাদ্যনীতি (National Food Policy) :** দীর্ঘ পাঁচমাস রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণের সহিত প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর আলাপ আলোচনার পর দেশে যে জাতীয় খাদ্যনীতি গৃহীত হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১. এখন হইতে প্রত্যেকটি রাজ্যকে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল (zone) রূপে গণ্য করা হইবে

২. প্রত্যেক রাজ্যে, উহা উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি অঞ্চল, যাহাই হউক না কেন রাজ্য সরকার নিজ রাজ্যে বাজার হইতে উদ্বৃত্ত (market surplus) চাউল ও যাবতীয় মোটা দানার শস্য খরিদ করিবেন এবং উহা হইতে নিজ রাজ্যের প্রয়োজন মিটাইবেন।

৩ উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি রাজ্য উভয়েই নিজ রাজ্যে উৎপন্ন মোটা দানা জাতীয় খাদ্য শস্যের ২৫ শতাংশ অন্যান্য রাজ্যে রপ্তানি করিবে এবং ইহা এক রাজ্য সরকার কর্তৃক অপর রাজ্য সরকারের নিকট বিক্রয় হইবে (state to state basis)।

৪. উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলির রাজ্যসরকার সমূহ উক্ত রাজ্যগুলির অভ্যন্তর হইতে যে খাদ্যশস্য ক্রয় করিবেন তাহা হইতে ২০ লক্ষ টনের বেশি চাউল কেন্দ্রীয় সরকার ক্রয় করিয়া একটি কেন্দ্রীয় খাদ্যভাণ্ডার (Central Pool) সৃষ্টি ও উহা হইতে ৫ হইতে ১০ লক্ষ টনের একটি সাময়িক খাদ্য ভাণ্ডার (buffer stock) সৃষ্টি এবং উহা হইতে ঘাটতি রাজ্যের খাদ্যশস্যের অভাব পূরণ করা হইবে।

৫. আপাতত ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে P L 480 র শর্তানুযায়ী ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। পরে প্রয়োজন হইলে নগদমূল্যে আরও ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন আমদানি করা হইবে।

৬. এক রাজ্য হইতে অপর রাজ্যে খাদ্যশস্যের চালান একমাত্র সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিই নিজেদের হিসাবে করিতে পারিবেন এবং একমাত্র রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সরকারী যন্ত্র মারফতই বাজার হইতে যাবতীয় খাদ্যশস্যের ক্রয় ঘটিবে।

৭. একরাজ্য হইতে অপর রাজ্যে খাদ্যোপযোগী তৈলের চলাচল অবাধ ও নিয়ন্ত্রণবিহীন হইবে এবং ১৯৬২ সনের মার্চমাসের রবিশস্য উঠিলে, গমের আন্তঃরাজ্য চলাচল সম্পর্কে সরকারী নীতি গৃহীত হইবে।

৮ কলিকাতায় পুরাপুরি বিধিবদ্ধ রেশনিং ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী হইতে চালু হইয়াছে। বোম্বাই, কানপুর, আমেদাবাদ, প্রভৃতি শহরে অনুপচারিক রেশনিং (informal rationing) চলিতে থাকিবে।

কতদূর দৃঢ়তার সহিত এই নীতি অনুসৃত হইবে তাহার উপরই ইহার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। অতীতে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থতা সংকটে ইন্ধন যোগাইয়াছে। বর্তমান নীতিও তাহাদের সহযোগিতার উপর বিশেষ ভাবেই নির্ভরশীল।

পরিকল্পনাকালে খাদ্যমূল্যের গতি

TRENDS OF FOOD PRICES IN THE PLAN PERIOD

অর্থনীতিক উন্নয়নের পরিকল্পনায় সাধারণ মূল্যস্তর এবং বিশেষত খাদ্যমূল্যস্তরের এক বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। কারণ একদিকে খাদ্যমূল্যস্তরের বৃদ্ধিতে দেশের অধিকাংশ দরিদ্র জনসমষ্টির (যাহারা জীবনযাত্রার অত্যন্ত নিম্ন স্তরে রহিয়াছে) জীবনযাত্রার মান আরও হ্রাস পাইবে, ইহা পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের বিরোধী ; অপরদিকে খাদ্যের মত আবশ্যিক দ্রব্যে

মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রা সহ অন্যান্য সকল শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িবে। ইহাতে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। ফলে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। তাহাতে হয় লক্ষ্যানুযায়ী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে আরও বেশি অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন হইবে, নতুবা পূর্বনির্ধারিত আর্থিক ব্যয় হইলে লক্ষ্য অপূর্ণ থাকিবে। এক কথায় পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে। একারণে প্রথম পরিকল্পনাকাল হইতেই সাধারণ মূল্যস্তর এবং বিশেষত খাদ্যমূল্যস্তর সম্পর্কে সতর্কতার নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

পরিকল্পনার গত দশকে খাদ্যমূল্যস্তরের গতি সম্পর্কে দুইটি বিষয় দেখা যায়। ১. ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম পরিকল্পনার প্রথম বৎসর হইতে ১৯৫৫ সালের মার্চ পর্যন্ত খাদ্য-মূল্যস্তর নিম্নগামী ছিল। ২. ১৯৫৫ সালের জুলাই মাস হইতে পুনরায় খাদ্যশস্যের ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয়।

প্রথম পরিকল্পনাকাল : ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে খাদ্যের সূচক সংখ্যা ১২৫·২-এ পৌঁছায়। সে সময় খাদ্যের এরূপ উচ্চ মূল্যের প্রধান কারণ হইল, কোরিয়ার যুদ্ধের দরুন দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রচণ্ড চাপ। ইহার পর সরকারের মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী মুদ্রা ও আয়-ব্যয় নীতির (monetary and fiscal policy) ফলে খাদ্যমূল্যের সূচকসংখ্যা ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ৯৯·৯-এ নামে। পরবর্তী দুইবৎসর ধরিয়া উহা প্রায় একরূপই থাকে। উহার পর ১৯৫৩-৫৪ সালে আশাতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ফলে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর আরও হ্রাস পায়। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে খাদ্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ৮২·৯-এ পরিণত হয়। এই অবস্থায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয় এবং খাদ্যমূল্যের হ্রাস রোধ করিয়া কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় ও মজুদ করেন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর সামগ্রিকভাবে ১৯৫১ সালের তুলনায় ২৪ শতাংশ হ্রাস পায় (১৯৫২-৫৩=১০০)।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল : দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। আংশিকভাবে এই মূল্যবৃদ্ধি প্রথম পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তরের অতিরিক্ত হ্রাসকে সংশোধন করিলেও শেষ পর্যন্ত উহা মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ২৭ শতাংশ বাড়ে। যাবতীয় খাদ্যশস্যের মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা ১৯৫৬ সালে ৯২·৮ হইতে ১৯৬১ সালে ১১৭·৬-এ দাঁড়ায়। ১৯৫৬ সালের তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর ১৯৬১ সালে ২৬·৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (১৯৫২-৫৩=১০০)।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য একদিকে খাদ্য উৎপাদন ও যোগানের হ্রাস ও অপরদিকে চাহিদা বৃদ্ধি—এই দুই প্রকার কারণই দায়ী (পূর্ববর্তী অংশে খাদ্যঘাটতির কারণ আলোচনা করিতে গিয়া এ সম্পর্কে বিভিন্ন কারণগুলি নির্দেশ করা হইয়াছে। ঐ সকল কারণ এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যমূল্যস্তর বৃদ্ধির সমস্যা : দ্বিতীয় পরিকল্পনা কাল হইতে, দেশে দ্রুত খাদ্যের চাহিদা ও যোগানের অর্থাৎ উৎপাদনের ব্যবধান বৃদ্ধি ও ঘাটতি ব্যয় নীতির ও তৎসহ ব্যাঙ্কের দাদন বৃদ্ধির নীতির ফলে খাদ্যমূল্যস্তরে ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়। মজুতদারীর প্রবণতা ইহাতে ইন্ধন যোগায়। খাদ্যমূল্যস্তরের এই ঊর্ধ্বগতি নিছক কোনো সাময়িক সমস্যা বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। কাহারও কাহারও মতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত ভারসাম্যহীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলে দেশের অর্থনৈতিক

ও যে খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিয়াছে, বর্তমানে খাদ্যসংকট ও অস্বাভাবিক মূল্যস্তরের বৃদ্ধি সেই গভীর সমস্যারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ দিকে অশোক মেহ্‌তা কমিটির যে সকল সুপারিশ প্রকাশিত ও সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহাতে মূল্যস্তরবৃদ্ধির সমস্যা খানিকপরিমাণে প্রশমিত হইলেও উহা পরে সাময়িক বলিয়া প্রমাণিত হয়। এবং অনতিকাল পরেই তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরের শেষ ভাগ হইতেই পুনরায় উহা আত্মপ্রকাশ করে।

তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার সময় পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনা কালে দেশে মূল্যস্তর স্থির রাখিবার প্রয়োজনীয়তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহারা সমস্যাটিকে দুইদিক হইতে দেখিয়াছিলেন। প্রথমত, খাদ্য ও যাবতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যস্তরের নিম্নগতি অবাঞ্ছিত। কারণ তাহাতে কৃষিজাতদ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধিতে কৃষক সমাজ নিরুৎসাহিত হইবার আশংকা থাকে। সুতরাং উৎপাদনবৃদ্ধিতে উপযুক্ত আর্থিক প্রণোদনা যোগাইবার জন্য কৃষিজাতদ্রব্যের দর কৃষকসমাজের দিক হইতে সন্তোষজনক হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, বাজার দর আবার বেশি হইয়া পড়িলে একদিকে যেমন ভোগকারিগণের ও স্থির আয়ের শ্রেণীগুলির জীবন দুর্বহ হইবার আশংকা দেখা দিবে, তেমনি অপরদিকে উহাতে মজুরশ্রেণীর জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি ও শিল্পের কাঁচামালের দর বৃদ্ধি পাইলে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্ষুণ্ণ হইবে। এই কারণে পরিকল্পনা কমিশন দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের দর স্থির রাখিবার প্রয়োজনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এবং দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার অল্পকাল পরে, ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস হইতেই মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়। মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে ১২৭.৪ হইতে ১৯৬৪ সালের জুন মাসে ১৪৭.৭-এ উঠে (১৯৫২-৫৩ = ১০০)। তুলনামূলক ভাবে বলা হয় যে, ১৯৫২ সাল হইতে ১৯৬৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১১ বৎসরে মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা যেখানে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ২৭.৪ পয়েন্ট, অর্থাৎ ১১ বৎসরে ২৭%, সেখানে ১৯৬৩ সালের মার্চ হইতে ১৯৬৪ সালের জুন পর্যন্ত ১৫ মাসে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে ২৪.৪ পয়েন্ট, বা ২০%।[1] মূল্যস্তরের এই বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী পর্যন্ত অভূতপূর্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধু খাদ্যশস্য নহে, যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য, যথা, তৈল, গুড়, ডাল, আলু প্রভৃতি সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই সমানে মূল্য বৃদ্ধি ঘটে।

কারণ: এই অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবে, খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা ও যোগানে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান ছাড়াও, ব্যাপক গোপন মজুতদারী, কালোটাকার খেলা, ব্যাঙ্কের দাদন বৃদ্ধি, ঘাটতি মুদ্রানীতি প্রধানত দায়ী। সাধারণভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অনেকে অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করিলেও এত অল্পসময়ের মধ্যে হঠাৎ এত অধিক মূল্যবৃদ্ধির পশ্চাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা গোপন মজুতদারীই প্রকৃত পক্ষে প্রবল কারণ হইয়াছে। ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে সরকারী নীতির দুর্বলতা উহাদের দুঃসাহস বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

প্রতিরোধে সরকারী ব্যবস্থা: স্বভাবতঃই এই আকস্মিক ও অভাবিত সংকটের সম্মুখীন হইয়া ইহা দমনের জন্য সরকার যে নীতি ও ব্যবস্থাদি ঘোষণা করেন তাহাতে সরকারী নীতির পরিবর্তন সূচিত হয়। মূলগতভাবে সরকারী নীতি হইয়াছে দ্বিমুখী।

একদিকে ইহার লক্ষ্য যেমন মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দমন করা, অপরদিকে ইহার লক্ষ্য

---

১. যুগান্তর, ২৫শে [illegible], ১৯৬[illegible]।

হইতেছে মূল্যস্তর বৃদ্ধি দমন করিতে গিয়া যেন উহা আবার এরূপ কার্যদা না যায় যাহাতে কৃষককুলের উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ বিনষ্ট হইতে পারে। সুতরাং সরকার মূল্যস্তরবৃদ্ধি রোধ করিতে যেমন চাহেন, তেমনি চাহেন কৃষকগণের পক্ষে উৎসাহজনক দর। ইহার সহিত সরকারী নীতির উদ্দেশ্য হইতেছে অনতিরিক্ত মূল্যে ভোগকারিগণের মধ্যে খাদ্যশস্যের যথাযথ বণ্টন।

১. এই সকল উদ্দেশ্য অনুসরণ করিয়া সরকার দেশে ৮০ হাজার ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। একই উদ্দেশ্যে সরকার সমবায় বিপণি খুলিতেও উৎসাহ দিতেছেন।

২. ১০ লক্ষ বা ততোধিক অধিবাসীবিশিষ্ট শহরগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য যোগাইবার ভার লইয়াছেন এবং তথায় বিধিবদ্ধ রেশনিং চালু করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। দেশের বাকী অংশে খাদ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের ভার থাকিবে রাজ্য সরকারগুলির উপর।

৩. বিদেশ হইতে ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি দ্বারা সরকারের হাতে মজুত শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইতেছে।

৪. মজুতদারগণের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। মজুতদার ও মুনাফা-খোরদের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকারবিহীন জরুরীবিচার (Summary trial) ব্যবস্থা সম্বলিত একটি অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই চারিটি ব্যবস্থাদ্বারা খাদ্যমূল্যস্তর বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হইবে। ইহা ছাড়া আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

৫. ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাস হইতে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তিত হইয়াছে। এজন্য 'ভারতের খাদ্য করপোরেশন' (Food Corporation of India) নামে একটি বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় করপোরেশন গঠিত হইয়াছে। অবশ্য ইহা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্যশস্যের যাবতীয় পাইকারী-ব্যবসায় স্বহস্তে গ্রহণ করিবে না। কারণ উহার উপযোগী সংগঠন, অভিজ্ঞতা ও কর্মীর অভাব আছে। এবং একেবারে খাদ্যশস্যের বেসরকারী পাইকারী ব্যবসায় উচ্ছেদ করাও সরকারের ইচ্ছা নহে। সুতরাং ইহা কৃষকগণের নিকট হইতে সরকার নির্ধারিত দরে শস্য কিনিবে এবং পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়িগণের সহযোগিতায় কাজ করিবে। ভবিষ্যতে ইহার কর্মপরিধি ক্রমে বৃদ্ধি করা হইবে।

৬. সরকার যাবতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায্য দর বাঁধিয়া দিবেন। এজন্য আপাততঃ ঝা কমিটির রিপোর্ট সরকার গ্রহণ করিয়া রবিশস্যের সরকারী দর ঘোষণা করিয়াছেন। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার একটি স্থায়ী কৃষিজাত দ্রব্যমূল্য কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন। উহা ভবিষ্যতে যাবতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদকগণের ও ব্যবসায়িগণের বিক্রয় দর বাঁধিয়া দিবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা দুইটির দ্বারা ব্যবসায়িগণের দ্বারা গোপন মজুতদারী বন্ধ হইবে এবং খাদ্যশস্যসহ যাবতীয় কৃষিজাতদ্রব্যের ন্যায্য দর ও উহার স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া সরকার আশা করেন। কিন্তু, খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় যেরূপ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ভাবে প্রবর্তিত হইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে এবং তৎসহ খাদ্যশস্যের পাইকারী ব্যবসায়িগণের উপর এখনও নির্ভর করিবার নীতি অব্যাহত রাখা হইয়াছে, তাহাতে সরকারী খাদ্য বণ্টন নীতি কতটা কার্যকর হইবে সে সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ খাদ্য করপোরেশন যে পরিমাণ শস্য মজুত (buffer Stock) করিবেন তাহা অল্প। এরূপ অবস্থায় শুধু শস্যের দর ঘোষণা করিয়া দিয়া ও লাইসেন্স মারফত পাইকারী ব্যবসায়ী ও মজুতদারগণকে শাসন করিবার চেষ্টা বিশেষ সফল হইবে কিনা সন্দেহ।

খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়
STATE TRADING IN FOOD GRAINS

ভারতের খাদ্য সমস্যা যে স্থায়ীরূপ ধারণ করিয়াছে তাহা যতটা না প্রকৃত ঘাটতির দরুন, তদপেক্ষা অধিক হইতেছে বণ্টনের ত্রুটিজনিত। একাধিকবার এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে ১৯৫৮-৫৯ সালে যখন ৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টন খাদ্য উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব বৎসর অপেক্ষা ৭৫ লক্ষ টন অধিক ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের দর ১৯৫৮-৫৯ সালে চড়া ছিল। বর্তমানেও সরকারী হিসাবে দেশে খাদ্যের ঘাটতি হইতেছে ৬ শতাংশ কিন্তু তুলনায় খাদ্যশস্যের দর চড়িয়াছে ২৪ শতাংশ। অতএব নিঃসন্দেহে খাদ্যের উৎপাদনের ঘাটতি অপেক্ষা বণ্টনের ত্রুটি, অর্থাৎ ব্যাপক মজুতদারী ও মুনাফা লালসাই দেশে খাদ্যশস্যের দর বৃদ্ধির প্রধান কারণ। ভারতের খাদ্য সংকটের অনেকখানিই কৃত্রিম। এই সত্যের উপলব্ধির ফলে ১৯৫৮-৫৯ সালেই ভারত সরকার দেশে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যবণ্টনের ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করা। কিন্তু সে সময় যেরূপভাবে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালিত হইয়াছিল তাহাতে সমস্যা কিছুমাত্র দূর হয় নাই। এ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের ফলে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দ্বারা শুধু কৃষকের নিকট হইতে শস্য খরিদ করিবার এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাইকারী ব্যবসায়ীদের মারফত উহা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছে। তাহার পর পাইকার হইতে খুচরা দোকানী ও খরিদ্দার পর্যন্ত খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ইহার ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা যেমন একদিকে গোপন মজুতে সমর্থ হইয়াছিল তেমনি সাধারণ খরিদ্দারকে সরকার তাহাদের ভাগ্যের নিকট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এপর্যন্ত এরূপ ব্যবস্থাই চলিতেছিল। নামে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় হইলেও উহা সম্পূর্ণতই ব্যবসায়ী-নির্ভর ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর হইতে পুনরায় যে তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে, অবশেষে তাহাতে পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনার সংকল্প সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ও ইহাকে একটি স্থায়ী সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। খাদ্যসংকট সমাধানের জন্য সরকার বর্তমানে যে সকল ব্যবস্থা ও নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা তাহাদের অন্যতম। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য দুইস্তরেই পৃথক সংস্থা গঠিত হইবে। কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হইবে একটি কেন্দ্রীয় 'খাদ্য করপোরেশন', এবং প্রতিরাজ্যে স্থাপিত হইবে একটি করিয়া রাজ্য 'খাদ্য করপোরেশন'। নিচে 'খাদ্য করপোরেশনের' বিবরণ দেওয়া হইল।

ভারতের খাদ্য করপোরেশন
THE FOOD CORPORATION OF INDIA

পার্লামেন্টে গৃহীত The Food Corporation of India Act নামক আইনের দ্বারা 'ভারতের খাদ্য করপোরেশন' নামে একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য ব্যবসায় সংস্থা ও প্রতিরাজ্যে একটি করিয়া রাজ্য খাদ্য ব্যবসায় সংস্থা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পুঁজি (Capital): ভারতের খাদ্য করপোরেশনের প্রারম্ভিক শেয়ার পুঁজি অনধিক ১০০ কোটি টাকা এবং রাজ্য খাদ্য করপোরেশনগুলির পুঁজি অনধিক ১০ কোটি টাকা হইবে। ইহার সম্পূর্ণই ভারত সরকার সরবরাহ করিবেন।

পরিচালনা (Management): ভারতের খাদ্য করপোরেশনের পরিচালনার ভার থাকিবে ১২ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিচালকপর্ষদের (Board of Directors)

উপর। ইহাদের একজন চেয়ারম্যান ও একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তিনজন পরিচালক হইবেন কেন্দ্রীয় খাদ্য, অর্থ ও সমবায় মন্ত্রকের প্রতিনিধি। কেন্দ্রীয় গুদাম করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টার হইবেন ইহার একজন পরিচালক। ইহারা ছাড়া আরও ছয়জন পরিচালক থাকিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে, করপোরেশনকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এক বা একাধিক পরামর্শদাতা কমিটি নিয়োগ করিতে পারেন।

উদ্দেশ্য (Objects) : করপোরেশনের উদ্দেশ্য হইতেছে সবিশেষ পরিমাণে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তন করা এবং দেশের খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিকা অধিকার করা।

কার্যাবলী (Functions) : ভারতের খাদ্য করপোরেশন একটি স্বয়ংচালিত সংগঠন রূপে লাভক্ষতির বাণিজ্যিক নীতি অনুসরণ করিয়া কাজ করিবে। ইহা খাদ্যশস্যের একটি সাময়িক ভাণ্ডার (buffer stock) হাতে রাখিবে এবং প্রধানত খাদ্যশস্যের ক্রয়, গুদামজাতকরণ, চলাচল, বণ্টন ও বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় মনে করিলে, ইহা অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়েও আত্মনিয়োগ করিবে। ইহা ছাড়া, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করিবে, সরকারের অনুমতি লইয়া ইহা সে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে (যেমন কৃষকগণকে ঋণপ্রদান)। এবং প্রয়োজনীয় মনে করিলে, ইহা চাউলকল, ময়দাকল ও অন্যান্য রূপ কলকারখানা স্থাপন করিয়া খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য নানারূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা খাদ্যোপযোগী করিতে ও ঐ সকল ব্যবসায় চালনা করিতে পারিবে। ১৯৬৫ সালের ১৪ই জানুয়ারি মাদ্রাজে ইহার উদ্বোধন সম্পন্ন হইয়াছে।

বিলম্বে হইলেও, এই ব্যবস্থাটি সমর্থনযোগ্য এবং ইহার দ্বারা ব্যবসায়িগণের সমাজবিরোধী কার্যাবলীর সুযোগ হ্রাস পাইতে পারে। কিন্তু কার্যত ইহা কিরূপ ভাবে পরিচালিত হয় তাহার উপর ইহার ফলাফল সবিশেষ নির্ভরশীল।

খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against State Trading in food grains) : দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষদিকে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশে ভারতে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। কিন্তু সে সময় ইহা লইয়া বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং ইহাতে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের বিষয়ে সরকার দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এবং এজন্য নূতন কোন সংস্থা স্থাপন না করিয়া, সরকারী খাদ্যদপ্তর মারফত খাদ্যশস্যের অত্যন্ত সীমবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় চালিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বর্তমানে পুনরায় তীব্র খাদ্যসংকট আত্মপ্রকাশ করায় শেষ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি হইতে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের ও এজন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। খাদ্যশস্যের বণ্টনে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে নিচে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

পক্ষে যুক্তি : ১. সম্প্রতি দেশে উৎকট মুনাফা লালসায় খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী, চাউলকল মালিক ও বৃহৎ উৎপাদকগণ খাদ্যশস্যের গোপন মজুত দ্বারা যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে দেশে খাদ্যবণ্টনের পুরাতন ব্যবস্থা যে আর মোটেই নির্ভরযোগ্য নহে তাহা প্রমাণিত

হইয়াছে। সুতরাং এইরূপ পুনঃ পুনঃ কৃত্রিম খাদ্যসংকট দূর করিবার একমাত্র সমাধান হইতেছে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তন।

২. ইহার ফলে দেশবাসিগণের মধ্যে খাদ্যশস্যের ন্যায্য বণ্টন সম্ভব হইবে এবং দেশে খাদ্যশস্যের মূল্যের স্থিরতা দেখা দিবে।

৩. দেশে একশ্রেণীর ব্যবসায়িগণের মধ্যে মুনাফালোলুপতার জন্য যে কালোটাকার খেলা চলিতেছে এবং তদ্দরুন মূল্যস্তর বৃদ্ধির প্রবণতা শক্তিশালী হইতেছে, তাহাও এই ব্যবস্থাতে খানিকপরিমাণে দমিত হইবে। এবং ক্রেতাগণ সরকার নির্ধারিত ন্যায্য দরে খাদ্যশস্য পাইলে মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের শোষণ হইতে রক্ষা পাইবে।

৪. অর্থনীতিক পরিকল্পনা সফল করিবার পক্ষেও ইহা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কারণ পরিকল্পিত উৎপাদনের সহিত পরিকল্পিত খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা না থাকায়, দেশে খাদ্যবণ্টনে বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল। ইহারই সুযোগ লইয়া মুনাফাখোরী ও মজুতদারী ইদানীং কালে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং দেশে খাদ্যাভাবের দরুন যে পরিমাণ খাদ্য সংকট দেখা দেওয়ার কথা, তাহাপেক্ষা বেশি পরিমাণে এই সংকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের দ্বারা সুষ্ঠু পরিকল্পনার পক্ষে একটি দীর্ঘ-অপেক্ষিত ব্যবস্থা গৃহীত হইল।

৫. এই ব্যবস্থায় কৃষকগণের নিকট হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ন্যায্য দরে শস্য ক্রয় করা হইবে ও তাহাতে কৃষকগণ মধ্যবর্তী ব্যবসায়িগণের অন্যায় শোষণ হইতে রক্ষা পাইবে। ইহাতে উপযুক্ত দাম পাওয়ায় কৃষকগণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইবে।

বিরুদ্ধে যুক্তি: ১. অনেকের মতে, সরকার ইতিপূর্বে খাদ্যশস্যে যে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহাতেই যখন সফল হন নাই, তখন এরূপ বৃহৎ ও ব্যাপকভাবে দেশে উহা প্রবর্তন করিবার কোন যুক্তি নাই।

২. ইহাতে যে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে ও ধরিয়া রাখিতে হইবে, তাহার উপযোগী গুদাম সরকারের নাই। সুতরাং খাদ্য করপোরেশন কর্তৃক ক্রীত শস্য ধারণে ও সংরক্ষণে সংকট উপস্থিত হইবে।

৩. এই ব্যবস্থাতে পাইকারী খাদ্যশস্য ব্যবসায়িগণকে বিশেষ স্থান দেওয়া হইয়াছে, সরকারী অনুমতি লইয়া তাহারা খাদ্যশস্যাদি ক্রয় ও বিক্রয় করিতে পারিবে। ইহার ফলে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় নামে 'রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়' হইলেও উহা খাদ্যশস্যের পুরাতন বেসরকারী ব্যবসায়ী মহলের উপরই নির্ভরশীল থাকিবে। ইহা অনেকের মতে অবাঞ্ছিত এবং খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের ভাবী ব্যর্থতার কারণ হইয়া উঠিতে পারে।

৪. বিপুল আকারে খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে যে বিরাট পুঁজির প্রয়োজন হইবে তাহা সংগ্রহ করিতে সরকারকে কম অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

৫. খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের ফলে খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ে নিযুক্ত কারবারিগণ ও তাহাদের বিপুলসংখ্যক কর্মচারিগণ তাহাদের পুরাতন কর্ম ও জীবিকাচ্যুত হইবে। ইহা নূতন একটি সমস্যাসৃষ্টি করিবে।

উপসংহার: খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় প্রবর্তনের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি গভীর ভাবে বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, নানারূপ অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই। পরিকল্পিত অর্থনীতির অপরিহার্য অংশরূপে, দেশে খাদ্য ন্যায্যবণ্টনের উপায় রূপে, মুনাফালোলুপ ব্যবসায়ীমহলের লোভ দমনের ব্যবস্থা রূপে,

[illegible] খাদ্যরোধের অন্যতম অস্ত্রহিসাবে এবং কৃষকগণের ও ভোগকারিগণের পক্ষে ন্যায্য দাম সুনিশ্চিত করিবার উপায় হিসাবে ইহা বর্তমানে একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পথে যে সকল অসুবিধা রহিয়াছে যথা, পুঁজি ও গুদামের স্বল্পতা, অতীত সরকারী ব্যর্থতা প্রভৃতি, তাহা অবশ্যই দূর করিতে হইবে, এবং উহাতে খানিক সময় লাগিতে পারে। খাদ্য-শস্যের ব্যবসায় হইতে বিচ্যুত ব্যবসায়িগণ ও তাহাদের কর্মচারিগণ সকলেই যে কর্মচ্যুত হইবে, তাহা নহে, কারণ, এই ব্যবস্থায় তাহাদেরও স্থান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সকলদিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য।

পরিশিষ্ট ঃ

ভারত সহ বিভিন্নদেশের একরপ্রতি চাউল উৎপাদন ক্ষমতা (১৯৫৯-৬০

দেশ	পাউণ্ড
মিশর	২,৯৮৫
জাপান	২,৮২৫
মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র	২,২৩০
চীন	২,০৬৪
তুরস্ক	২,০২২
সোভিয়েত রুশ	১,৩১৪
ব্রহ্ম দেশ	১,০১১
পাকিস্তান	৮৮০
ভারত	৮৩৭

যোজনা ঃ [illegible] এপ্রিল, ১৯৬৪ হইতে

৯

গ্রামীণ পুনর্গঠন
Rural Reconstruction

দীর্ঘকাল ধরিয়া জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়িগণের শোষণে, অত্যাচারে ও সরকারী অবহেলায়, এবং আধুনিক শিল্পগুলির অসমান প্রতিযোগিতায় ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস হইয়াছে। কৃষি ও কুটিরশিল্পের অবনতির ফলে গ্রামবাসিগণের মধ্যে ব্যাপক ও তীব্র দারিদ্র্য, অনাহার, অশিক্ষা, কর্মহীনতা প্রভৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের নিমিত্ত গ্রামীণ পুনর্গঠনের কথা নানাদিক হইতে উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী গ্রামে ফিরিয়া যাইবার আহ্বানও জানাইয়াছিলেন। চরকা ও কুটিরশিল্পের প্রচলনের উপর গান্ধীজী এই কারণেই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন।

গ্রামীণ পুনর্গঠনের তিনটি দিক-কাছে। প্রথমত, ইহার বৈষয়িক দিক। ইহার জন্য গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ও স্বাস্থ্যের উন্নতি প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ইহার সাংস্কৃতিক দিক। গ্রামবাসিগণের শিক্ষা সাংস্কৃতিক উন্নতি আবশ্যক। তৃতীয়ত, ইহার নৈতিক দিক। ইহার দ্বারা তাহাদের ব্যক্তিত্বের উন্মেষ বুঝায়। সুতরাং গ্রামীণ পুনর্গঠন বলিতে উন্নত বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনে গ্রামবাসিগণের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন বুঝায়।

অতীতে গ্রামীণ পুনর্গঠনের জন্য যে সব সরকারী প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল তাহা, সরকারী কৃষি, সমবায়, সেচ, বন, পশু, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা দপ্তরগুলি কর্তৃক পরিচালিত হইত। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল লাভ করা যায় নাই। তাহার কারণ,—১. সারাদেশের প্রয়োজনের তুলনায় সে চেষ্টা ছিল অকিঞ্চিৎকর। ২. গ্রামীণ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায় গ্রামবাসিগণের সমর্থন সংগ্রহ ও আগ্রহ সৃষ্টির চেষ্টার পরিবর্তে, উপর হইতে কার্যক্রম চাপাইয়া দেওয়া হইত। ৩. বিভিন্ন সরকারী দপ্তরগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিত। উহাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা ছিল না। গ্রামীণ পুনর্গঠন প্রচেষ্টার পশ্চাতে কোন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT

অতীতের ত্রুটি হইতে পরিকল্পনা কমিশন উপলব্ধি করিয়াছেন যে গ্রামীণ জীবনের পুনর্গঠনের জন্য গ্রাম্য জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতায় বহুমুখী, সর্বাঙ্গীণ ও সুসংবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োজন। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Community Development Project) এই উপলব্ধির ফল।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প বা 'Community Development Project' কথাটি মার্কিন দেশীয়। তথায় গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এই প্রকার প্রচেষ্টা বহুদিন ধরিয়া প্রচলিত। ভারত-মার্কিন সাহায্য কার্যক্রমের (Indo-U. S. A. Aid Programme) দ্বারা ভারতে এই জাতীয় প্রচেষ্টা প্রবর্তিত হইয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শে ইহা ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মূল কথা হইতেছে, স্থানীয় ভাবে মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণতম উন্নয়ন সাধন করা।

লক্ষ্য (Objectives): ইহার লক্ষ্য তিনটি—শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক। ক. শিক্ষা ও প্রচার দ্বারা গ্রাম্য জনসাধারণের ভাবধারা ও মনোভাবের পরিবর্তন

সাধন। খ. বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন। গ. জনস্বাস্থ্য, অবসরবি... সুযোগ-সুবিধা ও নাগরিক জীবনের উন্নয়ন দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন সাধন। এই সকল কাজের মধ্য দিয়া প্রত্যেকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে উদ্যোগ সৃষ্টি করা, সমবায় সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতির মধ্য দিয়া যৌথচিন্তা ও যৌথ কার্যকলাপ প্রবর্তন করাই সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য। সরকার শুধু ইহাতে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দান করেন।

আদর্শ (Ideals): ইহার মতে দেশের মূল শত্রু তিনটি—দারিদ্র, রোগ ও অজ্ঞতা। জনসাধারণ ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতায় এই তিনটি শত্রু ধ্বংস করিয়া দেশের বৃহত্তম কল্যাণ প্রতিষ্ঠাই সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আদর্শ।

কার্যক্ষেত্র (Scope) প্রথম পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্ষেত্র হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করা হয়—

ক. কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সেচের প্রসার, উন্নত সার, বীজ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সাহায্য ও উৎসাহ দান, পশুপালন, ধান্য রোপণ, ভূমিসংক্রান্ত গবেষণার প্রসার ইত্যাদি।

খ. গ্রামবাসিগণের পার্শ্বজীবিকার সংস্থানের জন্য গ্রাম্যকুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের পুনরুজ্জীবন, পুনর্গঠন ও প্রসারে উৎসাহ ও সাহায্য দান। গ. গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক, ও উচ্চতর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার বিস্তার। ঘ. জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, প্রসূতিসদন প্রতিষ্ঠা ও গ্রামাঞ্চলে জল নিষ্কাশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা। ঙ. পথঘাটের উন্নতির দ্বারা পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার। চ. গ্রামাঞ্চলে উন্নত ধরনের গৃহাদি নির্মাণের ব্যবস্থা। ছ. স্থানীয় প্রতিভা ও ঐতিহ্য অনুযায়ী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সূচী, ক্রীড়াসূচী, মেলার অনুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ ও প্রতিভার বিকাশ এবং সহযোগিতা ও ঐক্য সৃষ্টি। জ. কৃষক, কারিগর ও অন্যান্য কর্মিগণের কার্যের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক শিক্ষাদান।

কার্যপদ্ধতি ও উপায় (Method & Agency): গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল দিকের সহিত সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত কার্যাবলী বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে সমর্থন, উৎসাহ, উদ্যোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা সকলের সমবেত চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হইবে। ইহাই সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যপদ্ধতি। তাহাতে একটি মাত্র সরকারী কর্তৃপক্ষের মারফত প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরকারী সাহায্য প্রদান করা হইবে। এই সরকারী গ্রাম উন্নয়ন প্রচেষ্টা প্রধানত কৃষিতে কেন্দ্রীভূত হইবে এবং গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের সরকারী প্রচেষ্টা হিসাবে থাকিবে। ইহাই জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্ম (National Extension Service) নামে পরিচিত। এজন্য বলা হইয়াছে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প হইতেছে গ্রামীণ পুনর্গঠনের কার্য পদ্ধতি (Method) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্ম হইতেছে উহার উপায় (agency) বিশেষ।

বৈশিষ্ট্য (features): প্রথমত ইহাতে গ্রামীণ উন্নয়নে স্থানীয় গ্রাম্য অধিবাসিগণের চেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয়। যাহাতে গ্রামবাসিগণ নিজের চেষ্টায় নিজের উন্নতি করিতে পারে সেজন্য তাহাদিগকে সাহায্য করাই ইহার কাজ। দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট কয়েকটি সীমাবদ্ধ এলাকা লইয়া ইহা কার্য আরম্ভ করে এবং তথায় উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এক-

[illegible] এলাকার উন্নয়ন ভার লইবার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারে কাজ আরম্ভ করিলে সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। তৃতীয়ত, ইহা একসঙ্গে গ্রামীণ জীবনের নানা দিকের উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করে। চতুর্থত এজন্য বহুমুখী উদ্দেশ্যবিশিষ্ট একটি মাত্র সংগঠনের সাহায্য গ্রহণ করা হয় এবং তাহা যেন প্রত্যেকটি কৃষকের প্রয়োজন সাধন করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। পঞ্চমত এজন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সাহায্যের বন্দোবস্ত করা হয়। সংক্ষেপে ইহাই সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য।

প্রকল্পের প্রকারভেদ :
TYPES OF PROJECTS

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প দুই প্রকারের : ক. বুনিয়াদী গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (The Basic Type Rural Community Development Project) : ২ লক্ষ অধিবাসী আছে এরূপ ৩০০টি গ্রাম ও প্রায় ৫০০ বর্গমাইল লইয়া একটি করিয়া বুনিয়াদী প্রকল্প সংগঠিত হয়। ইহাতে কৃষির উন্নয়ন কার্যকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। স্থানবিশেষে ১০০টি গ্রাম লইয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বুনিয়াদী প্রকল্পও গঠিত হইতে পারে।

খ. যৌগিক সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Composite Type Community Development Project) : এই প্রকার প্রকল্পের কৃষি ও কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে এবং গ্রামাঞ্চলে শহরবাসের বিবিধ সুবিধাসমূহ প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

সাংগঠনিক রূপ
ORGANISATION

প্রত্যেক প্রকল্প দুইটি স্তরে বিভক্ত : ক. নিম্নস্তরে গড়ে ১০০ গ্রাম্য পরিবার ও উহার ৫০০ সদস্য লইয়া এক একটি গ্রাম ইউনিট গঠন করা হয়। এরূপ প্রত্যেকটি গ্রাম ইউনিটের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্থানীয় কার্য পরিচালিত হয়।

খ. উচ্চ স্তরে ১০০টি গ্রাম ইউনিট ও উহাদের ৬০-৭০ হাজার অধিবাসী লইয়া এক-একটি উন্নয়ন ব্লক গঠন করা হয়। আয়তনের দিক দিয়া ইহার কার্য ১৫০-২০০ বর্গমাইলে বিস্তৃত। প্রতিটি সমষ্টি উন্নয়নে তিনটি করিয়া এরূপ উন্নয়ন ব্লক থাকে। প্রত্যেকটি ব্লকের কেন্দ্র হিসাবে এক-একটি আধা-গ্রাম-শহর (rural-cum-urban township) স্থাপিত হয়। এরূপ এক-একটি শহরের অধিবাসী গড়ে ১০০০ পরিবার বা ৫০০০ ব্যক্তি। এই শহরগুলি ব্লকের অন্তর্গত চারিদিকের গ্রামগুলির প্রাণকেন্দ্রবিশেষ। ইহাতে ব্লকের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকে, এবং হাসপাতাল, সাধারণ ও কারিগরি বিদ্যালয়, সমাজশিক্ষাকেন্দ্র, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরজীবনের সকল সুবিধা যথা, বিদ্যুৎ, পাকা নর্দমা, পানীয় জলের কল, সুসজ্জিত বাজার প্রভৃতি সকল ব্যবস্থাই থাকে।

প্রশাসনিক কাঠামো
ADMINISTRATIVE SET-UP

সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশাসনিক কাঠামো ৫টি পর্যায়ে বিভক্ত : ক. সর্বনিম্ন পর্যায়ে প্রতি দশটি গ্রামইউনিটের ভারপ্রাপ্ত একজন করিয়া গ্রামসেবক আছেন।

খ. ইহাদের উপর ব্লক পর্যায়ে একজন করিয়া ব্লক উন্নয়ন অফিসার (Block Development Officer) আছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কৃষি, সমবায়, পশু পালন ও কুটির শিল্প প্রভৃতির আট জন বিশেষজ্ঞ কর্মচারী থাকেন। যে সকল রাজ্যে পঞ্চায়েতী

[illegible] চালু হয় সেই স্তরে স্থানীয় পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যগণ ও প্রগতিশীল কৃষক, সমাজসেবী, মহিলা, পার্লামেণ্ট ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীর স্থানীয় সদস্যগণকে লইয়া একটি ব্লক উন্নয়ন কমিটি ব্লকস্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ও উহা কার্যকর করিবার ভারপ্রাপ্ত। অন্যথায় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির উপর এই ভার প্রদত্ত হয়।

গ. জেলাস্তরে একজন করিয়া জেলা উন্নয়ন অফিসার (District Development Officer) থাকেন। জেলার সমগ্র উন্নয়ন প্রকল্পগুলির তদারকী এবং উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যে জনসমর্থন আদায় করা তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব। ব্লকপঞ্চায়েত সমিতিসমূহের সভাপতি ও পার্লামেণ্ট এবং রাজ্যবিধানমণ্ডলীর স্থানীয় সদস্য প্রভৃতি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের লইয়া গঠিত বিধিবদ্ধ জেলা পরিষদ প্রত্যেক জেলায় সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যে পরিণতির ভারপ্রাপ্ত থাকে।

ঘ. রাজ্যস্তরে প্রতিরাজ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বোচ্চ কর্তা হইতেছেন রাজ্য উন্নয়ন কমিশনার (State Development Commissioner) এবং উন্নয়ন কমিটি (State Development Committee)।

ঙ. সর্বোচ্চ স্তরে রহিয়াছে সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও উহার অন্তর্গত কেন্দ্রীয় কমিটি। প্রধান মন্ত্রী ইহার সভাপতি, পরিকল্পনা কমিশনের সকল সদস্য এবং খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী দপ্তর, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তর এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের ৪ জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইহার সভ্য। ইহা শুধু নীতি নির্ধারণ করে। নীতি কার্যকর করিবার ভার সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রশাসকের (Administrator of the Community Projects)-এর উপর ন্যস্ত।

অর্থ সংস্থান (Finance): এই প্রকল্পে ভারত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কারিগরি সাহায্য চুক্তি (Technical Cooperation Mission Agreement) অনুযায়ী ১৪২'৪ লক্ষ ডলার অর্থসাহায্য পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া মার্কিন ফোর্ড ফাউণ্ডেশনও কর্মিগণকে কারিগরি শিক্ষাদানকার্যে সাহায্য করিয়াছে।

প্রত্যেক উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায় উন্নয়ন কার্যের ব্যয় সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম এই যে, উহার একাংশ স্থানীয় জনসাধারণকে অর্থের ও শ্রমের দ্বারা দিতে হইবে। অপর অংশ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তভাবে বহন করিবে।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি
PROGRESS

১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর ২৭'৩৩৮টি গ্রামের ১'৬৭ কোটি অধিবাসিসমন্বিত ৫৫টি প্রকল্প লইয়া ভারতে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প শুরু হয়। ঐ ৫৫টি উন্নয়ন প্রকল্প ৩০০টি উন্নয়ন ব্লকের সমান। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ৭'৭৫ কোটি অধিবাসীর ১,৪০,০০০টি গ্রামে, ৯৮৮ উন্নয়ন ব্লকে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্ম প্রসারিত হয়। ইহাতে মোট সরকারী ব্যয় হয় ৪৬'০২ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া নগদ টাকায় ও শ্রমের দ্বারা জনসাধারণ দান করিয়াছে আনুমানিক ২৬'১৩ কোটি টাকা।[১]

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৩,৭০,০০০, গ্রাম লইয়া গঠিত ৩১০০টি উন্নয়ন ব্লকে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্য সম্প্রসারিত হয়। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের সারা গ্রামাঞ্চলে এই

৭৫১, Review of the First Plan. p. 10

... হইয়াছে। প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় ইহাতে মোট ২৩৪.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার জন্য আনুমানিক ব্যয় হইবে ৩২১.৯ কোটি টাকা।

১৯৬৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত জনসাধারণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে ১২৯.৭২ কোটি টাকা। ঐ সময় পর্যন্ত সরকারী ব্যয় হইয়াছে ৩৪৩.৬৩ কোটি টাকা।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের পুনর্গঠন (Re-organisation of C. D. P): ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে বলবন্তরায় মেহ্‌তা কমিটির (১৯৫৬) পরামর্শে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যক্রমের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

১. পূর্বে প্রত্যেক উন্নয়ন ব্লকে উন্নয়নের তিনটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায়ে, ব্লকে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কর্ম প্রবর্তন করিয়া উন্নয়নের প্রাথমিক কার্যাদি সম্পূর্ণ করা হইত। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ৩ বৎসরের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী অনুসরণ করিয়া প্রগাঢ়-উন্নয়নের কাজ চলিত। তৃতীয় পর্যায়ে ছিল প্রগাঢ়-উন্নয়নের পরবর্তী স্তর। ইহাতে প্রথম ও তৃতীয় পর্যায়ে উপযুক্ত ব্যয় বরাদ্দের অভাবে উন্নতি ঘটিত না। ফলে হতাশা ও ব্যস্ততা দেখা দিত। বর্তমানে সমষ্টি উন্নয়নের কার্যসূচী দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক পর্যায়ে পাঁচ বৎসর করিয়া কাজ চলিবে। এবং ইহার পূর্বে প্রথমে এক বৎসরের জন্য কৃষি উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া প্রত্যেক ব্লকে প্রাক্ সম্প্রসারণ (pre-extension) কাজে হাত দেওয়া হইবে।

উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঁচ বৎসরের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। ইহাতে সম্প্রসারণ সেবাকর্মের উপর জোর দেওয়া (extension function) হইবে। এই পরিবর্তনের ফলে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সর্বদেশব্যাপী বিস্তারের লক্ষ্য পূরণের তারিখ, ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসের পরিবর্তে ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত প্রসারিত করা হয়।

২. মেহ্‌তা কমিটির দ্বিতীয় সুপারিশ ছিল যে, সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যসূচী প্রণয়ন ও উহার পরিচালনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্থানীয় জনসাধারণের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। অর্থাৎ ক্ষমতা ও দায়িত্বের গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ আবশ্যক। এই সুপারিশ গৃহীত হওয়ায় গ্রাম, ব্লক ও জেলাস্তরে—গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ, জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়া গঠিত এই তিন পর্যায়ের গণতান্ত্রিক সংগঠন স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহারা সমবায় সমিতি ও সরকারের সহযোগিতায় গ্রাম, ব্লক ও জেলাস্তরে স্থানীয় বিবিধ উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও উহাদের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবে। এই ব্যবস্থাকেই 'পঞ্চায়েতী রাজ' বলা হইয়াছে।

১৯৬৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সারা ভারতে মোট ৪,৮৭৭টি প্রথম পর্যায়ের দ্বিতীয় ও দ্বিতীয়োত্তর পর্যায়ের ব্লক ছিল। ইহাদের অধীন গ্রামের সংখ্যা ছিল ৫.৬৬ লক্ষ ও জনসমষ্টি ছিল ৪০.৩৩ কোটি। সম্প্রসারণের পূর্ববর্তী পর্যায়ের ব্লক ছিল ৩১৮টি।

সম্পাদিত কার্য ও সমালোচনা (Achievements and Criticisms): সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবর্তে কল্যাণমূলক কার্যাবলীর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরে ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইতে থাকে। মেহ্‌তা কমিটির হিসাবে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত, সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্মের এলাকায় প্রায় ১১ শতাংশ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সপ্তম মূল্যায়ন বিবরণে (Seventh Evaluation Report) বলা হইয়াছে যে মোট কৃষিজমির তুলনায় দো-ফসলী জমির অনুপাত সামান্যই বাড়িয়াছে। উন্নত ধরনের কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার অতি ধীর গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

...হইয়াছিল যে প্রত্যেক ...তে একটি করিয়া বহুমুখী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহারা উন্নয়ন কার্যে সাহায্য করিবে এবং প্রত্যেক কৃষকপরিবার ইহাদের সভ্য হইবে। সপ্তম মূল্যায়ন বিবরণে জানা যায় যে উহার তদন্তের অন্তর্গত অর্ধেকসংখ্যক ব্লকেই কোন বহুমুখী সমিতি ছিল না। আর যেখানে ছিল, তথায় উহাদের মাত্র ২২ শতাংশ ছিল বহুমুখী সমিতি। তাহা ছাড়া সমবায় সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য যেমন চেষ্টা করা হইয়াছে, তেমন উহাদের কার্যের উন্নতির চেষ্টা হয় নাই। অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকপরিবারগুলিই সমবায় সমিতি দ্বারা উপকৃত হইয়াছে।

গ্রাম্য শিল্পগুলির উন্নতি সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হইলেও, ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত উহাদের বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। গ্রাম্য-শিল্পমূল্যায়ন কমিটি (১৯৫৯) বলিয়াছেন যে, শুধু পরীক্ষামূলক চেষ্টা ছাড়া আর কোন কিছু হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতেই এদিকে চেষ্টা আরম্ভ হয়। একমাত্র খাদিশিল্পের উন্নতির জন্যই বেশি অর্থব্যয় করা হইয়াছে। অন্য ক্ষেত্রের জন্য ব্যয় বরাদ্দ অল্প। হস্তচালিত তাঁত শিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্পের কারিগরগণের শিক্ষাও বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্যে মাত্র ৩৭ শতাংশ বিভিন্ন শিল্পে যোগ দিয়াছে। যে সকল শিল্পসমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে উহাদের অধিকাংশই সরকারী ঋণপ্রাপ্তির লোভেই স্থাপিত হইয়াছে। সমিতিগুলির আয়তন সাধারণত ক্ষুদ্র। কারিগরদের দক্ষতা সামান্যই বাড়িয়াছে। জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণ কমিটি (UN Study Team) সুবিধা ও ব্যয়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ক্রমাগত গ্রাম্য শিল্প প্রতিষ্ঠার ঝোঁকের সমালোচনা করিয়াছেন।

গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ অগ্রসর হইয়াছে। সপ্তম মূল্যায়ন বিবরণে বলা হইয়াছে যে, গড়ে প্রতি পাঁচটি গ্রামে তিনটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং প্রতি হাজার গ্রামবাসীপিছু ১·১৬টি মাধ্যমিক ও অন্যান্য বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। কিন্তু উহাতে ছাত্রদের উপস্থিতি হতাশাজনক। অনেকক্ষেত্রে গ্রামের ৫৩ শতাংশ বালক-বালিকা মাত্র ভর্তি হইয়াছে। শিক্ষকগণও উন্নয়নের কার্যে আগ্রহ দেখান না।

বয়স্কশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন কার্যও অধিক অগ্রসর হয় নাই। সপ্তম মূল্যায়ন বিবরণে বলা হইয়াছে যে উপযুক্ত পরিমাণে সমষ্টি কেন্দ্র (Community Centre), নারী সংগঠন ও যুবসংগঠন স্থাপিত হয় নাই। পূর্বস্থাপিত অনেক সমষ্টি কেন্দ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যে জনসাধারণের অংশগ্রহণেও অবনতি দেখা যায়। গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিগণও ইহাতে সমভাবে যোগ দেয় নাই।

উপসংহার (Conclusion): বিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে মূল্যায়ন করিয়াছে (১৯৬১) তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মোটের উপর উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যাবলী সঠিকদিকে পরিচালিত হইলেও উহা অত্যন্ত ধীরে অগ্রসর হইতেছে। তবে পঞ্চায়েতীরাজ যে সকল রাজ্যে প্রবর্তন করা হইয়াছে তথায় জনসাধারণের মধ্যে সাড়া পাওয়া যাইতেছে। পঞ্চায়েতগুলি যাহাতে উপযুক্ত নেতৃত্ব দান করিতে পারে সেজন্য ১৯৬৩ সালের মধ্যে ২৫ লক্ষ কর্মী শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ইহা একটি কঠিন সমস্যা। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত সরকারী কর্মচারী বাছাই করাও আর একটি সমস্যা। এই কাজে শিক্ষকদের আগ্রহ সৃষ্টি করাও প্রয়োজন। উপযুক্ত কর্মীর অভাব সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে আশঙ্কা করিয়া ১৯৫৯ সালের জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণ কমিটি প্রতিবৎসর ৩০০ ব্লকে কাজে হাত দিয়া ধীর গতিতে অগ্রসর হইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা ...

[illegible] ১৯৬৩ সালের পরিবর্তে ১৯৬৭ সালে ইহা বিস্তার করার কাজ [illegible] ধরিয়া উহা গৃহীত হয় নাই।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের গতি-প্রকৃতি আলোচনায় সপ্তম মূল্যায়ন বিবরণে বলা হইয়াছিল যে, ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে এই ধারণা জন্মে যে, ইহার চেষ্টাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত নহে। উহাতে জনসাধারণ অপেক্ষা সরকারী ছাপই প্রধান। সমগ্র কর্মধারাই, প্রকৃত অগ্রগতি অপেক্ষা আশার উপরই অধিক নির্ভরশীল। তবে মনে হয় পঞ্চায়েতের গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ইহাকে ব্যাপকতর রূপ ও দৃঢ়তর ভিত্তি দিয়া সার্থকতায় পরিণত করিতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই আশাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্ম
NATIONAL EXTENSION SERVICE

১৯৫২ সালে 'আরো খাদ্য ফলাও' অনুসন্ধান কমিটি উন্নত সার, সেচ, বীজ ও যন্ত্রপাতি এবং কৃষিপদ্ধতি দ্বারা সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টায় কৃষির উন্নয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতেও কৃষি সম্প্রসারণ সেবাকর্ম (Agricultural Extension Service) প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। গ্রামে গ্রামে ইহার যিনি ভারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ কর্মী থাকিবেন তিনি কৃষির সকল ক্ষেত্রে কৃষকদের পরামর্শ দান ও সাহায্য করিবেন। এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ১৯৫৩ সালের ২রা অক্টোবর ভারত সরকার মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাকর্মের উদ্বোধন করেন। ইহার ঠিক এক বৎসর পূর্বে একই দিনে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রবর্তিত হয়।

সম্প্রসারণ সেবাকর্মকে, সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায় বলিয়া গণ্য করা হইত। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের যে পরিবর্তন ঘটে তাহাতে, সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সহিত সম্প্রসারণ সেবাকর্মসূচীর পার্থক্য দূর করা হয়। সে সময় স্থির হইয়াছে যে, এখন হইতে সকল অঞ্চলের উন্নয়নই পাঁচ বৎসর করিয়া দুইটি পর্যায়ের মধ্য দিয়া যাইবে। প্রথম পর্যায়ে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। পরবর্তী পর্যায়ের পাঁচ বৎসরে সম্প্রসারণ কার্যের প্রাধান্য থাকিবে।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মত সম্প্রসারণ সেবাকর্মের কাঠামো দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত। নিম্নতর স্তরে রহিয়াছে গ্রাম ইউনিট। উচ্চতর পর্যায়ে রহিয়াছে সম্প্রসারণ ব্লক। ১০০টি গ্রাম লইয়া একটি ব্লক গঠিত। প্রতি ১০টি গ্রামের ভার একজন করিয়া গ্রামসেবকের (village level worker) উপর ন্যস্ত। ব্লক উন্নয়ন অফিসার সমগ্র ব্লকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য ৩ জন কর্মচারী, ২ জন সমাজশিক্ষা কর্মচারী, একজন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ তদারকী কর্মচারী রহিয়াছে। রাজ্যের সকল উন্নয়ন বিভাগ ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প দপ্তর হইতে সম্প্রসারণ সেবাকর্মের জন্য অর্থদান করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতেও অর্থ ও শ্রমদান লওয়া হয়।

কার্যাবলী : ইহার প্রধান কর্ম নিম্নপ্রকার : ১. গ্রামবাসিগণের নিকট আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ কার্যকর জ্ঞান এবং তৎসহ সরকারী সাহায্য পৌঁছাইয়া দেওয়া। ২. গ্রামবাসিগণের বাস্তব সমস্যা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গবেষণা দ্বারা সমাধানের জন্য ঊর্ধ্বতন স্তরে প্রেরণ করা। ৩. গ্রামবাসিগণের মধ্যে সমষ্টিবদ্ধ কার্যকলাপ বৃদ্ধির জন্য সমবায় সমিতি, উন্নততর কৃষি সমিতি (better farming society), মহিলা মণ্ডল প্রভৃতি গঠন করা ইত্যাদি।

অগ্রগতি ঃ প্রথম পর্যায়ে ১১২টি ব্লকে সম্প্রসারণ সেবাকর্মের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে ইহার সারা ভারতে বিস্তারের কার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

সমালোচনা ঃ অল্পকালের মধ্যেই ইহার কার্য দ্রুত প্রসারিত হইলেও কার্যধারাতে নিম্নোক্ত কতকগুলি ত্রুটির জন্য আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় নাই ঃ

১. গ্রামবাসিগণকে বৈষয়িক সাহায্যদানের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগ ও উৎসাহ-সৃষ্টির সবিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ২. সরকারী কার্যাবলী পুরাতন খাতেই প্রবাহিত হইয়াছে। তাহাতে জনসাধারণ সরকারী নির্ভরশীলতামুক্ত হয় নাই। ৩. বিভিন্ন শাখার কার্যের মধ্যে যথাযথ সংযোগ সাধিত হয় নাই। ৪. কাগজপত্রে কাজকর্মই অধিক হইয়াছে। সরকারী কর্মচারিগণ জনসাধারণের বাস্তব সংস্পর্শে খুব অল্পই আসিয়াছেন। ৫. জনসাধারণ এই সকল কর্মপ্রচেষ্টাকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই—'সরকারী ব্যাপার' বলিয়া মনে করিয়াছেন। কারণ কাজের উদ্যোগ সরকারী কর্মচারিগণই সর্বদা লইয়াছে। তাহাদের মধ্যে জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতামূলক মনোভাবের অভাব দেখা গিয়াছে। ৬. গ্রামসেবকের দায়িত্ব ও কাজ অত্যধিক।

সম্প্রতি সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিবর্তন দ্বারা সম্প্রসারণ সেবাকর্ম উহার অঙ্গীভূত হইয়াছে। গ্রামপঞ্চায়েত, ব্লকপঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্থাপন করিয়া জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত এই সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের হস্তে সম্প্রসারণ সেবাকর্মের কর্মসূচী প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণভার দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে সম্প্রসারণ সেবাকর্ম ও সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প একযোগে উহাদের আদর্শ ও লক্ষ্য লাভে, ভারতের গ্রামীণ জীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সক্ষম হইবে বলিয়া ভারত সরকার আশা করেন।

প্রশ্নপত্র ও উত্তর সংকেত

১ ঃ কৃষি-অর্থনীতির গঠন, সমস্যা ও বিকাশ

1. Discuss the place and importance of agriculture in India's developing economy. [Ans. ৭৯ ৮০ পৃঃ]
2. Point out briefly the structural features of Indian agriculture. [Ans. ৮০-৮২ পৃঃ]
3. Discuss the causes and effects of low productivity of Indian agriculture. [Ans. ৮২-৮৪ পৃঃ]
4. Discuss the importance of the development of India's agriculture. [C. U B Com. 1963] [Ans. ৮৪ পৃঃ]
5. How do you propose to reorganise Indian agriculture so as to raise its productivity from the present low level ? [Ans. ৮৫-৮৬ পৃঃ]
6. Describe the programme of agricultural development under the Third Five Year Plan. [Ans. ৮৮-৯০ পৃঃ]
7. What in your opinion should be the main lines of agricultural reorganisation in India ? [C. U. B. Com. 1954] [Ans. ৮৫-৮৬ পৃঃ]
8. Comment on the proposal for giving priority to agriculture in India's economic plans. [B. U. B. Com. (MOD) 1962, C. U. B. Com. 1961] [Ans. ৭৯-৮০, ৮৪, ৮৭, ৮৮-৮৯ পৃঃ]

[illegible] an outline of the programme of [illegible] India's Third Five Year Plan. In what respects, if any, [illegible] programme differ from that envisaged in the Second Five Year Plan?
[C. U., B. A. (old) 1963]. [Ans. ৮৭, ৮৮-৯০ পৃঃ]

10. Explain the main impediments in the way of agricultural improvement in India and comment on the measures adopted for removing them.
[C. U., B. Com (old) 1963] [Ans. ৮০-৮২, ৮৭-৯০ পৃঃ]

11. Comment on the principal measures that have been adopted in India to increase agricultural productivity since 1951. [B. U., B. A. (old) 1963]
[Ans. ৮৭-৯০ পৃঃ]

12. Examine the importance of agriculture in a programme of rapid economic development. Do you think that this importance has been adequately recognised in our five year plans? [B. U., B. A. (Mod) 1963]
[Ans. ৮৪, ৮৭, ৮৮-৮৯ পৃঃ]

13. Discuss how far the emphasis put on agriculture in India's Five Year Plans is justified or adequate. [B. U., B. Com. (Part I) 1963]
[Ans. ৮৭, ৮৮-৮৯, ৮৪ পৃঃ]

14. Comment on the measures that have been adopted in India during the plan period for the development of agriculture.
[C. U., B. Com. (Part I) 1964] [Ans. ৮৭-৯০ পৃঃ]

15. How far are India's Five Year Plans stimulating both agricultural and industrial development? [B. U., B. A. (Mod) 1964]
[Ans. প্রথম খণ্ডের ৮৭-৯০ পৃঃ দেখ]

২ : কৃষি-সংস্কার

1. Examine the principal types of land tenure in India and discuss the economic bearings of each. [C. U., B. Com. 1962] [Ans. ৯১-৯৩ পৃঃ]
2. Discuss the effects of the abolition of the Zemindary system upon the rural economy in India. [C. U. B, A. 1959] [Ans. ৯৫ পৃঃ]
3. Discuss the different aspects of the question of fixing ceilings on agricultural holdings in India. [C. U., B. Com. 1959] [Ans. ৯৭-৯৯ পৃঃ]
4. Write a short note on the objectives, merits and achievements of the Bhoodan Movement. [Ans. ১০৩-৪ পৃঃ]
5. Write a short note on the ceiling on land holdings.
[Ans. ৯৭-৯৯ পৃঃ] [C. U., B Com. 1961, '63, B. U. B., Com. (Mod) 1961, '62]
6. Discuss the main problems faced by agricultural labourers in India. What are the difficulties in the way of regulating wages of agricultural labourers in India? [N. B. U., B. A. (old) 1963] [Ans. ৯৯-১০২ পৃঃ]
7. Describe the chief features of the recent agrarian reforms in India and comment on their significance for the country's economic development.
[B. U., B. A. (Part II) 1963] [Ans. ৯৪-৯৯ পৃঃ]
8. Write short note on progress of land reform.
[B. U., B. Com. (New) 1964] [Ans. ৯৫-৯৯ পৃঃ]
9. Give a brief review of the main provisions of the land reforms legislation adopted in West Bengal. How are they going to affect agricultural productivity? [C. U., B. A. (Part II) 1964] [Ans. ৯৫ পৃঃ

৩ ঃ কৃষিগত প্রযুক্তি বিদ্যা

1. How far do you think the emphasis placed in the Five Year Plans upon agriculture and Irrigation has been correct ?
[C. U. B. Com. 1953] [Ans. ৮৪, ১০৫-৬, ১০৭-৮ পৃঃ]

2. What are the different types of irrigation that are to be found in the different parts of the country ? Critically estimate their importance.
[C. U. B. Com. 1955] [Ans. ১০৬ পৃঃ]

3. Discuss the possibilities and limitations of mechanised farming in India.
[C. U. B. A. 1955] [Ans. ১১১-১৪ পৃঃ]

4. Write short notes on :
The Damodar Valley Project. [C. U., B. Com. (old) 1962] [Ans. ১০৮-৯ পৃঃ]

৪ ঃ কৃষিকার্যের সংগঠন

1. Discuss the different proposals which have been made to solve the problems of subdivision and fragmentation of agricultural holdings in India.
[C. U. B. Com. 1957] [Ans. ১১৮ পৃঃ]

2. Examine the case for Cooperative Farming in India. What measures would you suggest for the development of cooperative farming in this country ?
[C. U. B A 1959] [Ans. ১২২-২৪ পৃঃ]

3. Discuss the case for and against Cooperative Farming in India.
[C. U. B Com. 1961] [C. U. B. A. 1961 B.U.,B.Com. (Mod) 1963, B.A. (Mod) 1964] [Ans. ১২২-২৪ পৃঃ]

4. Write a short note on the concept of Economic Holding. Are agricultural land holdings in India economic ? [Ans. ১১৭-১৮ পৃঃ]

5. Write a note on Cooperative Village Management.
[C. U. B. Com. (old) 1964] [Ans. ১২৫-২৬ পৃঃ]

6. Distinguish between Collective and Cooperative farming, Would you recommend Cooperative farming for India ? [B. U., B. A. (Pass) 1962]
[Ans. ১২০, ১২২-২৪ পৃঃ]

7. "Cooperative farming is the only solution to increase agricultural productivity in India." Comment on this view in the light of possibilities and limitations of Cooperative farming in India.
[B U., B. Com. (old) 1962] [Ans. ১২২-২৪ পৃঃ]

8. Examine the Case for the introduction of Cooperative farming in India.
[B. U., B. A. (Part II) 1964] [Ans. ১২২-২৪ পৃঃ]

9. Discuss the grounds on which the introduction of Cooperative farming is advocated in India. [B. U. B. A. (Mod) 1962] [Ans. ১২২ পৃঃ]

10. "The chief source of trouble in Indian agriculture is the pressure of population on agricultural land and the low productivity per head." Discuss in this connection how far Cooperative farming can increase agricultural productivity. [N. B. U., B. A. (old) 1963] [Ans. ১১৯, ১২২-২৪ পৃঃ]

৫ ঃ কৃষিকার্যের অর্থসংস্থান

1. What are the main objects of debt legislation in India ? How far has they been successful ? [C. U. B. A. 19

2. Examine the problem of indebtedness of Indian agriculturists and suggest measures for checking such indebtedness.

[C. U., B. Com. 1955] [Ans. ১৩০-৩১ পৃঃ]

3. What are your suggestions for the reorganisation of the rural credit structure in India ? [C. U., B. Com. 1956] [Ans. ১৩২-৩৩পৃঃ]

4. Examine the agencies for the supply of rural credit in India. How would you organise the system ? [C. U., B. A. 1957] [Ans. ১৩১-৩৩ পৃঃ]

5. Give your own evaluation of the scheme for "integrated structure of rural credit" recommended by the All India Rural Credit Survey.

[C U., B. Com. 1959] [Ans. ১৩৩-৩৫ পৃঃ]

6. How far do you think the establishment of the State Bank of India has solved the problem of rural banking facilities in the country ?

[C.U., B. A. 1956, '59, '61] [Ans. ১৩৬-৩৭ পৃঃ]

7. Examine the part played by the Reserve Bank of India in the provision of agricultural finance. [C. U., B.A. 1960] [Ans. ১৩৫-৩৬ পৃঃ]

8. Discuss the causes of the inadequate development of the cooperative credit movement in India. [C. U., B. A. 1961] [Ans. ১৩৮-৩৯পৃঃ]

9. Discuss the main features of the "Integrated scheme of Rural Credit" as recommended by the All India Rural Credit Survey Committee.

[B. U., B. Com. 1961] [Ans. ১৩৩-৩৫ পৃঃ

10. Discuss fully the main problems in the field of agricultural credit in India. [B. U., B.A. (Pass) 1962] [Ans. ১২৭-২৮, ১৩১-৩২ পৃঃ

11. Discuss the part played by the State Bank of India in providing credit to agriculture. [C.U.B.A (old) 1963, C.U.,B.A. (Part II) 1964] [Ans. ১৩৬-৩৭ পৃঃ

12. Comment on the adequacy of the present institutional arrangements for agricultural credit in India. Discuss, in this connection, the role of the State Bank in providing agricultural credit..

[N. B. U., B.A. (old) 1963] [Ans. ১৩১-৩২. ১৩৬-৩৭ পৃঃ

13. Give a brief account of the existing sources of agricultural finance in Indi with special reference of the role of the cooperative movement.

[B. U. B. A. (Mod) 1963] [Ans. ১৩১-৩২, ১৩৮-৩৯ পৃঃ

14. Discuss the present position of rural banking facilities in India. How far d you think the State Bank of India might solve the problem of rur banking ? [B. U. B.A. (Mod) 1963] [Ans. ১৩১-৩২. ১৩৬-৩৭ পৃঃ

15. Discuss the part played by the Reserve-Bank of India and the State-Ban of India in the provision of agricultural finance.

[B, U. B.A. (Pass) 1964] [Ans. ১৩৫-১৩৭ পৃঃ

৬ : কৃষিপণ্যের বিক্রয় সংগঠন

1. What measures would you suggest for removing the existing difficulties of the marketing of agricultural crops in India.

[C. U., B, A. 1952] [Ans. ১৪৭-৫০ পৃঃ

2. Describe the various ways in which cooperation can solve the problem of agricultural marketing and rural cottage industries.

[C. U. B. Com. 1952

Ans. সমবায়ের দ্বারা কৃষিপণ্যের বিক্রয়ে কি সুবিধা পাওয়া সম্ভব তাহার জন্য ১৫০-৫২ পৃষ্ঠা দেখ; কুটির শিল্পে ইহার সহায়তা সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ের ১৫৪ পৃষ্ঠা দেখ।]

8. What are the various ways in which cooperation can help (a) agricultural marketing and (b) rural industries in India.

[C. U., B. A. 1955] [পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দেখ]

9. What are the defects of the present system of marketing of agricultural produce in India ? How can they be removed ?

[B. U., B. Com (Mod) 1964] [Ans. ১৪৫-৫০ পৃঃ]

৭ : সমবায় ক্ষেত্র

1. Trace briefly the history of the cooperative movement in India. What factors have been responsible for the slow progress of the movement in the country ? [C. U , B A. 1956] [Ans. ১৫৫-৫৮ পৃঃ]
2. Write a short note on the role of cooperation in developmental planning in India. [Ans. ১৫৪ পৃঃ]
3. Critically examine the achievements of the cooperative movement in India. [Ans. ১৫১-৫৭ পৃঃ]
4. Give your suggestions for the reorganisation of the cooperative movement in India. [Ans. ১৬১-৬৩ পৃঃ]
5. Write a note on Goverment's policy regarding cooperation in the planning period. [Ans ১৬৩-৬৬ পৃঃ]
6. State the measures adopted by the Government for the development of the cooperative movement in recent years [Ans. ১৬৫-৬৬ পৃঃ]
7. Give a critical review of the progress of Cooperative movement in India. What role has been assigned to Cooperation in India's Five Year Plans ?

   [C. U., B A. (old) 1963] [Ans. ১৫৫-৫৮, ১৬৩-৬৫ পৃঃ]
8. Give a critical estimate of tl.~ progress of the cooperative movement in this country. [C U B. Com (Part I) 1964] [Ans. ১৫৫-৫৮, ১৬৪ পৃঃ]

৮ : খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য মূল্যস্তর

1. Examine the importance of increasing production of food grains in a developing country like India. [C. U. B Com. 1958] [Ans. ১৬৯-৭০ পৃঃ]
2. What are the causes of food shortage in India ? Discuss the measures adopted by the Government to remedy the shortage. [C. U. B.A. 1958]

   [Ans. ১৭৩-৭৫ পৃঃ]
3. How do you explain the rising food prices in India in recent times ? What measures would you recommend to stabilize food prices ?

   [C. U. B. Com, 1960] [Ans. ১৭৩-৭৭ পৃঃ]
4. Examine the causes of continuous rise in the prices of foodgrains in India. What measures were recommended by the Foodgrains Enquiry Committee of 1957 for the stabilization of foodgrains' prices in the country ?

   [C. U. B A, 1960] [Ans. ১৭৬-৭৭ পৃঃ]
5. Examine the main causes explaining the continuous rise in prices in India. What steps would you suggest for checking this rise ?

   [B. U , B A. (Pass) 1962] [Ans. ১৭৬-৭৭, ১৮০-৮১ পৃঃ]
6. Discuss the measures that have been adopted by the Govt. of India in recent times to meet the food situation.

   [C. U, B. Com. (Part I) 1963] [Ans. ১৭৬-৭৭ পৃঃ]

7. Indicate the causes of the rising prices of foodgrains in India [illegible] years and suggest measures for dealing with them,
[B. U. B.A. (old) 1963] [Ans. ১৭৩-৭৭, ১৮০-৮২ পৃঃ]

8. Discuss the reasons for the rise in prices of essential consumer goods in India over the last decade. What steps would you suggest to hold the price line ? [B. U. B.A. (Mod) 1963] [Ans. ১৭৩-৭৭ পৃঃ]

9. Describe the principal measures taken by the Reserve Bank of India in dealing with the problem of rising prices during the plan period.
[B. U. B.A, (Part II) 1963]

10. Give a critical survey of the measures adopted by the Government of India for checking the rise in prices. [B. U. B. Com. (Part I) 1963]
[Ans. ১৭৩-৭৭, ১৮০-৮১ পৃঃ]

11. Suggest some measures to stabilize food prices in India. Give reasons in each case. [B. U. B. Com. (Part I) 1964] [Ans. ১৭৮-৮০, ১৮৫-৮৭ পৃঃ]

12. Examine the causes of recent rise in foodgrains prices in the country and suggest measures for stabilizing them [B, U. B.A. (Part II) 1964]
[Ans. ১৭৭-৮৪ পৃঃ]

৯ : গ্রামীণ পুনর্গঠন

1. Describe the main features of the Community Development programme in India. [C. U. B A 1957] [Ans. ১৮৮-৯১ পৃঃ]

2. Give your own views on the achievements and prospects of the Community Development and National Extension Services in India.
[C U. B. Com, 1959] [Ans ১৮৯, ১৯১-৯৫ পৃঃ]

3. Give a critical estimate of the performance of the Community Development Project of india. [B. U. B. Com, (old) 1961] [Ans. ১৯১-৯৪ পৃঃ]

4. Write short note on Community Development Project.
[C. U., B. Com, (old) 1963] [Ans. ১৮৮-৯৪ পৃঃ]

5. Give an account of the contributions of the Community Development Projects and the National Extention Service to the rural development of India. [N. B U , B.A. (old) 1963] [Ans. ১৮৮-৯৫ পৃঃ]

6. Give a critical account of the progress made by the Community Development and National Extension service programmes in India.
[B. U., B A. (Part II) 1963] [Ans. ১৯১-৯৫ পৃঃ]

তৃতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্র

* শিল্প *

……"শিল্পায়ন ব্যতীত দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা, দেশরক্ষা এবং অর্থনীতিক পুনরুত্থানের সমস্যা-সমূহের সমাধান অসম্ভব।………………"

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি, ১৯৩৮

১

ভারতের শিল্পায়ন
India's Industrial Development

শিল্পায়ন কাহাকে বলে ?
WHAT IS INDUSTRIALISATION ?

শিল্পায়ন একটি প্রক্রিয়া। ইহা দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কার্যাবলীর ধারাবাহিক ক্রমপরিবর্তনের প্রক্রিয়া বুঝায়। উৎপাদন প্রক্রিয়ার সম্প্রসারণ, নূতন শিল্প স্থাপন, নূতন বাজার প্রতিষ্ঠা, নূতন অঞ্চলের সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার ইত্যাদি সকল কার্যই ইহার অন্তর্গত। ইহার ফলে পুঁজি ব্যবহারের প্রগাঢ়তা (deepening) ও ব্যাপ্তি (widening) ঘটে। অর্থাৎ প্রতি একক পণ্য উৎপাদনে যেমন পূর্বাপেক্ষা অধিক পুঁজির বিনিয়োগ হয় (প্রগাঢ়তা) তেমনি উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত পুঁজিগঠনও বাড়ে (ব্যাপ্তি)। এজন্য শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে পুঁজির প্রগাঢ়তা ও ব্যাপ্তির প্রক্রিয়াও বলা হয়।[১]

শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার উৎপাদন কার্যে পুঁজির প্রগাঢ়তা ও ব্যাপ্তির জন্য উৎপাদনক্ষমতা বাড়ে। ইহার ফলে আয়বৃদ্ধি ঘটে। এজন্য শিল্পায়নকে উন্নয়ন প্রক্রিয়াও বলা হয়। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। দেশবিশেষে সম্পদের অবস্থিতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য, রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রকৃতি ও নীতি প্রভৃতি শিল্পায়নের ধরনধারণ, আবশ্যকীয় সময় প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে।[২] ভারতের শিল্পায়নের গতি-প্রকৃতির আলোচনায় এই বিষয়গুলি স্মরণযোগ্য।

কৃষি ও শিল্পায়ন
AGRICULTURE & INDUSTRIALISATION

কৃষি ও শিল্পায়ন পারস্পরিক সম্পর্কহীন বা পরস্পরবিরোধী নহে। উহারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। শিল্পায়নের জন্য কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। কৃষির আধুনিকীকরণ না হইলে স্বল্পোন্নত দেশসমূহে শিল্পায়নের গতি মন্থর হইতে বাধ্য, কারণ উহা ব্যতীত দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের হাতে ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পায় না। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যাদির চাহিদাও প্রয়োজনানুযায়ী বৃদ্ধি পায় না। অন্যদিকে শিল্পায়নের প্রসার না হইলে কৃষিরও খুব বেশি উন্নতি করা সম্ভব হয় না। কারণ আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য করিতে হইলে কৃষিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য যাবতীয় পুঁজিদ্রব্য উৎপাদনের জন্য শিল্পায়ন প্রয়োজন। উপরন্তু, আধুনিকীকরণের ফলে কৃষি হইতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে আকর্ষণ করিবার জন্যও শিল্পায়নের প্রসার একটি অপরিহার্য শর্ত। স্বল্পকালীন দৃষ্টিতে কৃষি ও শিল্পকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে হয় কারণ, রাষ্ট্রীয় সাহায্য একটিকে দিলে অপরটিকে হয়ত বঞ্চিত করিয়াই দিতে হয়। কিন্তু দীর্ঘকালীন বিচারে উহারা পরস্পরের পরিপূরক। শিল্পোন্নত বহু দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কৃষির উন্নয়ন ঐ সকল দেশের শিল্পায়নের প্রসারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

কৃষি ও শিল্প আসলে পরস্পর নির্ভরশীল। শিল্পের দিক হইতে যত উন্নতই হউক না কেন,

---

১. Fiscal Policy and Business Cycles. A. Hansen.

২. The Industrial Economy of India : S. C. Kuchhal.

[illegible] কেবল কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন না করিয়া খুব বেশি [illegible]
[illegible] না।

কৃষিক্ষেত্র নানাভাবে শিল্পক্ষেত্রকে সাহায্য করে। যেমন—১. নগরাঞ্চলের বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ইত্যাদি সরবরাহ করে। ২. কৃষকদের হাতে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টির ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের উপযোগী বাজারের সৃষ্টি করে। ৩. বিদেশে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করিয়া প্রয়োজনীয় পুঁজি দ্রব্য আমদানি করিবার সুযোগ সৃষ্টি করে। ৪. কৃষিজ দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা অর্জিত অর্থ মূলধন সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা যায়। আবার শিল্পায়নের সাথে সাথে কৃষির উন্নতি সাধিত না হইলে দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ফলে বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত-জনিত সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি, অতিরিক্ত নগরীকরণ এবং প্রচলিত সামাজিক ধাঁচের বিপর্যয় ঘটা সম্ভব।

শিল্পায়নের প্রক্রিয়া
PROCESS OF INDUSTRIALISATION

মানব সমাজের অর্থনৈতিক বিবর্তন ঘটিয়াছে প্রধানত তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া:—প্রথম স্তর: কোনপ্রকারে জীবনধারণের পর্যায় (Subsistence phase); দ্বিতীয়: বাণিজ্যের পর্যায় (Commercial phase); তৃতীয়: শিল্পায়নের পর্যায় (Industrial phase)। এই তিনটি পর্যায় সুস্পষ্টভাবে বিভক্ত হয় নাই: একটি পর্যায় হইতে অপরটিকে সহজে আলাদা করা যায় না। অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির পথে উহারা পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া যায়। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে এই স্তরগুলি আবার পাশাপাশিও থাকিতে পারে।

শিল্পায়নের পর্যায় তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর: নানাবিধ প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রাথমিক উৎপন্নকে (Primary products) অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালে পরিণতকরণ। দ্বিতীয় স্তর: অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্যকে ভোগতৃপ্তির উপযোগী ভোগ্যপণ্যে পরিণতকরণ। তৃতীয় স্তর: যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য পুঁজিদ্রব্য নির্মাণ।

প্রথম স্তরের কাজ নির্ভর করে দেশের সম্পদের উপরে। দ্বিতীয় স্তরের কার্যাবলী বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যের সাহায্যেও সম্পাদন করা যায়। বেশির ভাগ স্বল্পোন্নত দেশেই প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের শিল্পগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, যে দেশে প্রথম স্তরের শিল্পই শুধু গড়িয়া উঠিয়াছে সে দেশের উৎপন্নের অধিকাংশই রপ্তানি হইয়া যায় আর দ্বিতীয় স্তরের শিল্পজাত দ্রব্যাদি সাধারণত নিজ দেশের বাজারের যোগান দিয়া থাকে। তৃতীয় স্তরের শিল্প গঠন শিল্পায়নের যথেষ্ট উন্নত স্তরেই সম্ভব।

শিল্পায়নের গতি কোন্ দেশে কি প্রকারের হইবে তাহা নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর, সরকারের প্রকৃতি, ক্ষমতা ও নীতির উপর। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে শিল্পায়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ মাত্র। শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা কৃষি, খনি, যানবাহন, শক্তি উৎপাদন এবং অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নয়নের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া করিতে হয়। অন্য সকল বিষয় বাদ দিয়া শুধুমাত্র শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা সফল করা যায় না।

শিল্পায়নের ফলাফল
EFFECTS OF INDUSTRIALISATION

শিল্পায়নের উদ্দেশ্য মোটামুটি ভাবে: ১. জীবনধারণের মানের উন্নয়ন এবং, ২. মানবিক কল্যাণের বৃদ্ধি সাধন। এই উদ্দেশ্য কতখানি পূর্ণ হইল তাহা জানিবার জন্য শিল্পায়নের বিভিন্ন দিকের ফলাফল সম্পর্কে ভাল করিয়া জানা দরকার। শিল্পায়নের ফলাফলকে তাই তিনভাগে বিচার করা হয়:—

১. আভ্যন্তরীণ কাঠামোগত পরিবর্তন; ২. বৈদেশিক বাণিজ্যের ধাঁচের পরিবর্তন; ৩. সামাজিক ফলাফল।

১. আভ্যন্তরীণ কাঠামোগত পরিবর্তন: শিল্পায়নের ফলে জনসাধারণের মধ্যে পেশাগত কাঠামোর পরিবর্তন হয়। কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাতে শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পায়। এই পরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাবিধ সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারখানায় শ্রমিকের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, কর্মহীনতায় বিপদ হইতে রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে আইনকানুন তৈয়ারি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইহা ছাড়াও

শিল্পায়নের ফলে কয়েকটি বিশিষ্ট শহরাঞ্চলে অধিক সংখ্যক লোক আসিয়া ভিড় করে, অধিক সংখ্যক শহর সৃষ্টি হয়, ফলে সামাজিক ব্যবস্থার বৃদ্ধি পায় এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নানাবিধ বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সাধারণত দেখা যায় যে দ্রুত শিল্পায়নের ফলে যে হারে শহরাঞ্চলে কারখানা গড়িয়া উঠে, ঠিক সেই হারে রাস্তাঘাট ও যানবাহন, বাসগৃহনির্মাণ, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যাবলী, বিদ্যালয় এবং প্রয়োজনীয় অবসরবিনোদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটে না। ইহার ফলে সামাজিক কল্যাণ গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। অধিকন্তু শিল্পায়নের ফলে নগরাঞ্চল গ্রামাঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করে এবং ইহাতে আঞ্চলিক অসাম্য সৃষ্টি হয়।

২. বৈদেশিক বাণিজ্যের ধাঁচের পরিবর্তন: পূর্বে যে দ্রব্য দেশে উৎপন্ন হইত না শিল্পায়নের ফলে সেই দ্রব্য দেশে উৎপন্ন হইলে বিদেশ হইতে ঐ দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পায়। অপরদিকে অন্যান্য দ্রব্যের আমদানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাও দেখা দেয় (যেমন, শিল্পায়নের জন্য পুঁজি দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, বিভিন্ন কাঁচামাল, অর্ধ সমাপ্ত দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য অতিরিক্ত অংশ)। আমদানি কমিবার দিকে না বাড়িবার দিকে ঝোঁক বেশি হইবে তাহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে আমদানি-রপ্তানির উপর বিশেষ কোন বাধা-নিষেধ না থাকলে শিল্পায়নের ফলে প্রাথমিক আমদানি বৃদ্ধির সম্ভাবনাই বেশি থাকে।[১] অধিকন্তু শিল্পায়নের ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে ফলে বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে, সুতরাং বিদেশ হইতে ভোগ্যদ্রব্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা বাড়িবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলি যদি শিল্পায়নের জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে তবে আমদানি হয়ত হ্রাস পাইবে, ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও হ্রাস পাইবে। অপরদিকে শিল্পায়নের ফলে যদি আমদানির ক্ষমতা হ্রাস না পায়, তবে জীবনধারণের মান ও উপাদানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে।

৩. সামাজিক ফলাফল: শিল্পায়নের ফলে এমন কতকগুলি সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যাহাতে ঐ বিষয়ে সামাজিক নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১. শিল্প প্রসারের ফলে প্রতিযোগিতামূলক এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাবের সৃষ্টি হয়; ইহাতে গ্রামীণসমাজে স্বাভাবিক ঐক্যবোধ লোপ পায়। গ্রামীণ-সমাজের স্বয়ংসম্পূর্ণতা নষ্ট হয়। ইহা নগরাঞ্চল, জাতি এবং বহির্জগতের সহিত নানান সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ২. শিল্পায়নের ফলে দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত কুটির ও নানাবিধ কারুশিল্প ধ্বংস হয়। ফলে এই সকল জীবিকা হইতে বহু লোক বিচ্যুত হয়। চিরাচরিত সামাজিক বিধি অনুশাসন ও রীতিনীতি বিপর্যস্ত হয়। ৩. শিল্পায়নের ফলে এমন দ্রব্যাদির উৎপাদন হয় যাহাতে রোগ ইত্যাদি প্রশমিত হয়। ফলে আয়ু বৃদ্ধি ঘটে। তাহাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পায়নের অগ্রগতির সাথে সাথে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাহাতে কৃষিনির্ভর অর্থনীতির বিবর্তনের ভার যতদূর সম্ভব লাঘব করা যায়। শিল্পায়নের প্রত্যক্ষ ফলাফল শহরাঞ্চলই বেশি ভোগ করে। ঘনবসতি, বস্তিজীবন, দারিদ্র্য, কর্মহীনতা, অপরাধ প্রবণতা, দুরবস্থা ইত্যাদি শহরজীবনের প্রধান সমস্যা। ইহাকে দূর করিবার জন্য নূতন ধরনের উপযুক্ত সংগঠন প্রয়োজন। নানাবিধ আইন প্রবর্তন করিয়া এবং বিভিন্নমুখী সমাজকল্যাণমূলক কার্যের ব্যাপক সম্প্রসারণের দ্বারা এ সমস্যার অনেকখানি সমাধান সম্ভব। তবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ ব্যাপারে সমধিক, একথা বলাই বাহুল্য।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের শিল্পোন্নয়নের পথে বাধা
OBSTACLES TO INDUSTRIALISATION OF UNDERDEVELOPED COUNTRIES

স্বল্পোন্নত দেশের শিল্পায়নের পথে বাধাগুলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: ১. অর্থনৈতিক পরিবেশ, ২. জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপাদান ৩. সামাজিক উপাদান ৪. প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৫. আন্তর্জাতিক প্রভাব।

১. অর্থনৈতিক পরিবেশ: স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পায়নের নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকগুলি দেখা যায়: ক. পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অতিশয় নগণ্য। খ. শক্তি উৎপাদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে না। গ. দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারের সীমাবদ্ধ আয়তন। ঘ. যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদি মেরামত করিবার বন্দোবস্ত এবং আনুষঙ্গিকদ্রব্য ...

১ League of Nations. Industrialisation and Foreign Trade. p. 91

[illegible]র অভাবের ফলে মেরামত করিয়া লইলে যে যন্ত্রে কাজ চলিত তাহা না করিয়া নূতন যন্ত্র [illegible] কাজ চালাইতে হয়। ইহাতে উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে। ঙ. শিল্পের অপচিত দ্রব্যাদি কাজে লাগাইয়া উপজাত দ্রব্য তৈরী করিবার মত প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকে। চ. শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্পোন্নত দেশে সাধারণত এই প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একান্ত অভাব থাকে। ছ. পুঁজি সংগ্রহের ব্যবস্থার অভাবও শিল্পায়নে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। জ. ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ঋণদানের সংগঠনের অভাবও স্বল্পোন্নত দেশের শিল্পোন্নতির পথে

২. **জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপাদানসমূহ:** দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি শিল্পায়নকে ব্যাহত করে। যে উদ্বৃত্ত সঞ্চিত হইয়া পুঁজিরূপে উৎপাদনের কাজে সাহায্য করিতে পারিত, জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে তাহা সৃষ্টি করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ফলে সঞ্চয় অপ্রচুর হইয়া পড়ে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমিতে থাকে। মাথাপিছু গড় উৎপাদন স্বল্প হয়, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও স্বল্প হয় এবং শিল্প বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

৩. **সামাজিক উপাদান:** স্বল্পোন্নত দেশে শিল্প বিকাশের পথে কতকগুলি সামাজিক বাধা শিল্পোন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত অপরিহার্য উপাদানগুলিকে প্রভাবিত করে:—ক. শিল্পের উদ্যোক্তা; খ. শ্রম; গ. পুঁজি।

ক. বর্ণভেদ ও অনুরূপ বিবিধ পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক প্রথা শিল্পের নেতা বা উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রধান প্রতিবন্ধক। স্বল্পোন্নত দেশসমূহে ইহারা ইচ্ছানুযায়ী কর্ম বা উদ্যোগ গ্রহণের উৎসাহকে কঠোরভাবে দমন করে।

খ. নিরক্ষরতা, শ্রমের গতিশীলতার অভাব, শ্রমিকদিগের শিক্ষাদানের সুব্যবস্থার অভাব, স্থায়ী শিল্প শ্রমিকবাহিনী সৃষ্টির জন্য প্রণোদনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গৃহীত নানাবিধ ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য ও অসফলতা ইত্যাদি শ্রম সংক্রান্ত বিবিধ ব্যাপারে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে।

গ. স্বল্পোন্নত দেশে মুষ্টিমেয় ধনবানের হাতে যে উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত হয় তাহা অনেক ক্ষেত্রেই বিনিয়োগের জন্য পাওয়া যায় না। বিলাসব্যসনে ও নানাপ্রকারের অপচয়মূলক ব্যয়ে সেই অর্থ ব্যবহৃত হয়।

৪. **প্রশাসনিক ব্যবস্থা:** শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচীকে সফল করিবার জন্য দক্ষ ও সৎ শাসনব্যবস্থা দরকার। কারণ কার্যসূচী নিখুঁত হইলেও শাসনব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হইলে শিল্পোন্নয়ন সফল হইতে পারে না। বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা ক্রমশই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সরকারী নীতি ও কার্যক্রমের দ্বারা শিল্পোন্নয়ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—উভয় ভাবেই প্রভাবিত হয়। তাই যুক্তিবিহীন, আকস্মিক বা খামখেয়ালী কোন সরকারী কার্যের ফলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হইতে পারে। যেমন শ্রমসংক্রান্ত আইন-কানুন, লাইসেন্স প্রথা, করনীতি, শিল্প জাতীয়করণ নীতি—এই সকল ব্যাপারে সরকারী কার্যক্রম সুবিবেচনার সহিত পরিচালিত না হইলে শিল্পোন্নয়ন বাধা প্রাপ্ত হয়।

৫ **আন্তর্জাতিক প্রভাব:** শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলিকে সাধারণত শিল্পোন্নত দেশগুলি হইতে শিল্পের যন্ত্রপাতি, কলকবজা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি আমদানি করিতে হয়। বিদেশের উপরে এই নির্ভরতার জন্য শিল্পায়নে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। শিল্পোন্নত দেশগুলি শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলিতে এ রকমের যন্ত্র পাঠাইতে রাজী না হইতেও পারে। আবার কখনো কখনো অনগ্রসর দেশগুলি যে পরিমাণ পুঁজিদ্রব্য আমদানি করিতে চাহে, শিল্পে অগ্রসর দেশগুলি সেই পরিমাণ পুঁজিদ্রব্য যন্ত্রপাতি কলকবজা পাঠাইতে সক্ষম না হইতেও

পারে। অনুন্নত শিল্পোন্নত দেশগুলির যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা এমন ভাবে তৈয়ারী করা হইতে পারে যাহাতে ঐগুলি কেবলমাত্র শিল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষেই উপযুক্ত, অনগ্রসর দেশগুলি উহাদের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত না হইতেও পারে। অনেক সময় "পেটেণ্ট" ইত্যাদির দ্বারা অনুন্নত দেশে ঐসকল যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া দিতে পারে।

শিল্পায়নের সহায়ক ব্যবস্থাসমূহ :
MEASURES FACILITATING INDUSTRIALISATION

শিল্পায়নের সহায়ক ব্যবস্থাসমূহকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

১. দেশীয় ; ২. আন্তর্জাতিক।

১. দেশীয় ব্যবস্থাসমূহ : ক. উৎপাদনের আভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহের যোগান যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা (অর্থাৎ শিল্পের উদ্যোক্তা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পুঁজিদ্রব্য শ্রম ও দক্ষতা, কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান বৃদ্ধি) : উদ্যোক্তার অভাব পূরণের জন্য কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষার প্রসার, "শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন" ইত্যাদির ন্যায় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, এবং বেসরকারী উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে সরকারী উদ্যোগে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠন—ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। পুঁজির অভাব এই সকল দেশে যখন তীব্র, তখন ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহ সৃষ্টির জন্য সরকার মিশ্র উদ্যোগে (সরকারী ও বেসরকারী) শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারেন, অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে যাহারা ঋণ দিবে তাহাদিগকে ন্যূনতম প্রতিদানের নিশ্চয়তা দিতে হইতে পারে। শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষাদানের সুবন্দোবস্ত, শ্রমের ভৌগোলিক সচলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, শিল্পে উপযুক্ত-সংখ্যক শ্রমিক সংগ্রহের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক তত্ত্বাবধান, প্রয়োজনমত অন্যদেশ হইতে শ্রমিকের আগমনে উৎসাহদান এবং কর্মসংস্থান কেন্দ্র স্থাপন—ইত্যাদি ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

দেশীয় সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার, আভ্যন্তরীণ কাঁচামালের গুণগত উন্নতিসাধন, কাঁচামালের মূল্যান্তর হ্রাসের নিমিত্ত কৃষি ও খনির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা—ইত্যাদির দ্বারা কাঁচামাল সংক্রান্ত অসুবিধা দূর করা যাইতে পারে।

খ. উৎপাদন কৌশল ও পদ্ধতির উন্নতি সাধন : শিল্পায়নের কার্যসূচীর মধ্যে ক্ষুদ্রশিল্পের যথাযথ স্থান নির্ধারণ করিতে হইবে। শিল্পে অনগ্রসর দেশে ক্ষুদ্র এবং হস্তশিল্প ইত্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম। এই কারণে বিভিন্ন আয়তনের শিল্পের জন্য উৎপাদনের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে অর্থনীতিক রূপান্তরের ফলে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যার তীব্রতা প্রশমিত করা সম্ভব।

গ. সরকারী নীতি : শিল্পায়নের অন্তরায়সমূহ দূর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারী নীতিগুলিকে চারিটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

১. সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতি।
২. ঋণদান সংক্রান্ত নীতি।
৩. লেনদেনের উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত নীতি।
৪. শিল্পায়নের পরিকল্পনা।

১. সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতি : ইহার মূল লক্ষ্য হইবে পুরাতন এবং নূতন শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা, অনুৎপাদনশীল কার্যে ফটকাজাতীয় বিনিয়োগ বন্ধ করা, শিল্পে নিযুক্ত

[illegible] উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি [illegible] শিল্পায়নের জন্য [illegible]
[illegible] কার্যকরী হইতে পারে।

২. ঋণদান সংক্রান্ত নীতি : এই নীতি রাষ্ট্র কর্তৃক এমনভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে না পারে। কারণ দ্রুত শিল্পায়নের কার্য আরম্ভ হইলে বিপুল অর্থব্যয় করিতে হয়, ফলে মুদ্রাস্ফীতির বিপদ দেখা দেয়।

৩. লেনদেনের উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত নীতি : বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য থাকার ফলে সকল দেশের জন্য একই প্রকারের লেনদেনের উদ্বৃত্ত সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করা যায় না। প্রতিটি দেশকেই স্বীয় অবস্থানুযায়ী নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে স্বীয় দেশের সম্পদের প্রকৃতি ও ব্যবহারযোগ্যতা, রপ্তানি দ্রব্যের প্রকৃতি, পরিমাণ ও বৈচিত্র্য অথবা পরিবর্তনীয়তা, স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং নূতন শিল্পগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও পুঁজিদ্রব্যের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়কে হিসাবের মধ্যে ধরিতে হয়। এই প্রসঙ্গে শুল্কনীতির কথা উঠে। মনে রাখা দরকার, কেবলমাত্র উচ্চশুল্কের প্রাচীর তুলিয়া শিল্পোন্নয়নের কাজ সমাধা করা যায় না। প্রয়োজনীয় সম্পদ যোগাড় করিতে না পারিলে শিশুশিল্পের পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। উপরন্তু, ইদানীংকালে সংরক্ষণমূলক শুল্কনীতির পরিবর্তে বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, আমদানির উপরে বিধিনিষেধ আরোপ ইত্যাদি নীতিই গৃহীত হইতেছে।

৪. শিল্পায়নের পরিকল্পনা : শিল্পায়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য কেবলমাত্র কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াই পূর্ণ করা যায় না। শিল্পায়নের পরিকল্পনা তাই এই বিষয়গুলিকে বিবেচনা করিয়া নীতি নির্ধারণ করিবে—ক. অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন। খ. শিল্পায়নের উপযুক্ত হার। গ. শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকার। ঘ শিল্পবিকাশের ব্যাপ্তি সম্পর্কে লক্ষ্য নির্ধারণ।

২. আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ : শিল্পোন্নত দেশগুলি স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পায়নে সাহায্য করিতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলি শিল্পায়নে অগ্রসর হইতে পারে। অবশ্য এই ব্যবস্থা কতখানি কার্যকরী হইবে তাহা নির্ভর করিবে, কি কি দ্রব্য স্বল্পোন্নত দেশগুলি রপ্তানি করে, রপ্তানির মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রার কি পরিমাণ আয় হয়, কোন্ দেশের মুদ্রায় ঐ বৈদেশিক আয় উপার্জন হয়, এবং বাণিজ্যের শর্ত ইত্যাদির উপর।

স্বল্পোন্নত দেশে বিদেশী পুঁজির আগমন দুইটি কার্য সাধন করে : ১. দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের বিনিয়োগের সুবিধা সৃষ্টি করে। ২. বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় উৎপাদনের উপাদান আনয়নের ব্যবস্থা করে। অনেক সময় বিদেশী পুঁজি দেশী পুঁজির বিনিয়োগের উৎসাহ সৃষ্টি করে।

শিল্পক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার আমদানিও স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে ক্রমাগতই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। এই প্রকার আমদানি দুই ভাবে ঘটে : ক. কারিগর, ইঞ্জিনীয়ার, এবং অপরাপর বিশেষজ্ঞ ঋণ হিসাবে গ্রহণ, খ. স্বল্পোন্নত দেশের কর্মীদের বিশেষ উন্নত শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিল্পোন্নত দেশে যাইবার ব্যবস্থা।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পায়নে নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্য করিতে পারে : ১. সরাসরি আর্থিক বা কারিগরি সাহায্য প্রেরণ ; ২. দুই দেশের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে ভাবধারার বিনিময় ; ৩ শিল্পোন্নত দেশসমূহের শিল্পায়নের গতিপথে বিভিন্ন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার লেনদেন ; ৪. বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত থাকা ইত্যাদির মাধ্যমে সাহায্য লাভ করা স্বল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ করপোরেশন, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ইত্যাদির নাম উল্লেখ করা যায়।

ভারতের শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্য
FEATURES OF INDUSTRIALISATION IN INDIA

শিল্পবিকাশের দিক হইতে বর্তমান পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলির পশ্চাতে অবস্থান করিলেও, বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের প্রতিষ্ঠা ভারতে লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা মানিয়া লইতে হইবে যে এই শিল্পায়ন পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ধারা অনুসরণ করে নাই। ফলে ইহার নানাবিধ অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। ভারতে শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

১. বৃহদায়তন শিল্পের প্রসার সামগ্রিকভাবে সীমাবদ্ধ এবং অপর্যাপ্ত। এই জাতীয় শিল্পের তুলনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রাধান্য। এই প্রাধান্য লক্ষিত হয় বিশেষ করিয়া কর্মসংস্থান ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যার দিক হইতে।

২. শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে হাল্কা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য (যেমন, সুতাকল, চিনির কারখানা প্রভৃতি)।

৩. বুনিয়াদী ও ভারী শিল্পের অভাব। মূল ও ভারী শিল্পের বিকাশ না ঘটিলে কোন দেশেই শিল্পায়নের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না।

৪. যোগ্যতর দেশীয় শিল্পব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগের অভাব। ফলে ভারতে "ম্যানেজিং এজেন্সী" প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।

৫. বিদেশী পুঁজির উপর শিল্পায়নের জন্য নির্ভরতা। বিদেশী শাসনের সুযোগে ও স্বার্থে বিদেশী পুঁজির আগমনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে অতীতে বিদেশী স্বার্থে ভারতের সম্পদের নির্বিচার শোষণ ঘটে।

৬. ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রাকার ও অ-লাভজনক আয়তনের সমস্যা রহিয়াছে। তুলাবস্ত্র শিল্প ও কয়লাখনিশিল্পে ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়।

৭. উদ্যোগের অভাব। সাধারণভাবে বলা যায় যে ভারতে ব্যক্তিগত মালিকানা ও উদ্যোগের দ্বারাই শিল্পায়ন (যদিও অসম্পূর্ণ) হইয়াছে। তবে, পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও উদ্যোগে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন ও প্রসার ইদানীংকালের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

৮. শিল্পায়নে ভারসাম্যের অভাব। ভারতে একদিকে বুনিয়াদী ও ভারীশিল্পের অনগ্রসরতা, অন্যদিকে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রাধান্য অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করিয়াছে।

৯. ভারতের শিল্পগুলির সুষম আঞ্চলিক বণ্টনের অভাব রহিয়াছে। বর্তমানে দেশের ৪টি অঞ্চলে দেশের শিল্পসমূহের কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়াছে। যথা, ক. পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার নিকটবর্তী ভাগীরথীর দুই তীরবর্তী অঞ্চল। খ. বোম্বাই অঞ্চল। গ. বিহার-উড়িষ্যার ছোটনাগপুর অঞ্চল। ঘ. মহীশূর-মাদ্রাজের নীলগিরি অঞ্চল। ইহাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই ভারতের সর্বাধিক শিল্পকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়াছে। ১৯৫৪ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ভারতের ১৯ শতাংশ, বোম্বাইয়ে ১৭ শতাংশ ও মাদ্রাজে ১০ শতাংশ শিল্প অবস্থিত।

১০. ভারতে বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে একচেটিয়া মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। প্রধানতঃ, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথাকে অবলম্বন করিয়াই ইহার উদ্ভব হইয়াছে। বনস্পতি তৈল, ডেয়ারীজাত দ্রব্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং রেলের সাজসরঞ্জাম নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োজিত পুঁজির ৮৫ শতাংশের অধিক কয়েকটি ম্যানেজিং এজেন্সীর কবলিত। রবার, চিনি, বয়ন, কাগজ ও কাগজ-জাত শিল্পের বিনিয়োজিত পুঁজির অর্ধাংশ ম্যানেজিং এজেন্সীগুলির কবলিত। ইহা জাতীয় স্বার্থের দিক হইতে অবাঞ্ছিত। তাহা ছাড়া শিল্পে

বিনিয়োজিত একচেটিয়া পুঁজির সহিত আবার ব্যাঙ্ক পুঁজির অত্যন্ত পরিণয় ঘটিয়াছে। ইহাতে জাতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজির প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে।

১১. পরিকল্পিত অর্থনীতির যুগ হইতে বর্তমানে ভারতে পরিকল্পিত শিল্পায়ন চলিতেছে। ইহাতে শিল্পায়নের গতিপ্রকৃতি ও প্রসার সম্পূর্ণরূপে সরকারী নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে পরিচালিত হইতেছে।

ভারতের আধুনিক শিল্পায়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

A BRIEF HISTORY OF MODERN INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN INDIA

ভারতে আধুনিক শিল্প পবর্তনের ইতিহাস একশত বৎসরের অধিক কালের নহে। ১৮৬০ সাল হইতে ভারতে আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠার যুগ আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়।[১] ভারতের শিল্পায়নের এই একশত বৎসরের ইতিহাসকে চারিভাগে ভাগ করা যায়—১. প্রথম যুগ: ১৮৬০—১৯১৩। ২. দ্বিতীয় যুগ: ১৯১৪—১৯৩৯। ৩. তৃতীয় যুগ: ১৯৪০—১৯৫০। ৪. চতুর্থ যুগ (পরিকল্পনার প্রথম দশক): ১৯৫১—৬১।

১. শিল্পায়নের প্রথম যুগ: ১৮৬০-১৯১৩

PERIOD I : 1860-1913

এই যুগ ভারতের আধুনিক শিল্পায়নের প্রারম্ভকাল। অধ্যাপক গাডগিল প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতে ইংরেজশাসনকালকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম পর্যায়ে সাম্রাজ্যবিস্তার, দ্বিতীয় পর্যায়ে সংহতিসাধন ও তৃতীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার শুরু হয়। ভারতে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠা এই তৃতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। এই সময়ে, বিশেষত ১৮৬০-৭০ সালে, দেশে ইউরোপীয় পুঁজি ও পরিচালনায় দ্রুত একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে থাকে। এই সময়ে যে সকল শিল্পের দ্রুত উন্নতি ঘটে উহাদের মধ্যে, চা, কফি, চটকল শিল্প তুলাবস্ত্র ও কয়লাখনি শিল্প উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই শিল্পগুলির অব্যাহত অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আরম্ভ সত্ত্বেও প্রথম ৫৩ বৎসরের শিল্পপ্রচেষ্টার অগ্রগতি অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। ভারতে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রকৃত আরম্ভ হয় আলোচ্যকালের শেষ দিকে। শিল্পায়নের এই প্রথম যুগের শেষে ভারতে যন্ত্রশিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২·১ লক্ষ (১৯১১) এবং ২০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭১১৩। ইহাদের দুই-তৃতীয়াংশের কম কারখানায় যন্ত্রশক্তি ব্যবহৃত হইত।[২]

২. দ্বিতীয় যুগ: ১৯১৪-৩৯

PERIOD II : 1914-39

শিল্পায়নের এই দ্বিতীয় যুগ নানা ঘটনাবৈচিত্র্যে পূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতের শিল্পগুলি অভূতপূর্ব মুনাফালাভে উৎসাহিত হয়। ফলে প্রথম মহাযুদ্ধকাল হইতে ১৯২০ সাল পর্যন্ত শিল্পোদ্যম প্রসারিত হইতে থাকে এবং যুদ্ধশেষের পর অনেকগুলি যৌথমূলধনী শিল্পকারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৬ সালে নিযুক্ত ভারতের প্রথম শিল্প কমিশন ভারতের শিল্পসম্ভাবনা অনুসন্ধান করে ও উহার প্রসার সম্পর্কে পরামর্শ দান করে। ১৯২১ সালে নিযুক্ত প্রথম ফিসক্যাল কমিশন ভারতের শিল্পায়নে সহায়তার জন্য বিচারমূলক সংরক্ষণের সুপারিশ করিলে উহা গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ভারতের টাকার বাট্টাবিনিময় হারের অস্থিরতা রপ্তানি বাণিজ্যে অসুবিধা সৃষ্টি করে। ১৯২৯ সালে শ্রমিক আন্দোলন প্রবলাকার ধারণ করে। ১৯২৯-৩৩ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মন্দা ভারতের শিল্পগুলিকে প্রচণ্ড আঘাত করে। ১৯৩৪ সালের পর হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি ঘটে। আলোচ্যকালে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ে ও কিছু কিছু নূতন শিল্প স্থাপিত হয়। লৌহ, ইস্পাত, তুলাবস্ত্র, দিয়াশলাই, কাগজ ও কার্ডবোর্ড, খনিশিল্প, সিমেন্ট, চিনি, কাচ, রাসায়নিক দ্রব্য, সাবান, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিল্পের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পায়। কারখানার সংখ্যা ১৯৩৯ সালে দাঁড়ায় ১১,৬১৩। উহাতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭,৫০,০০০।

১. The Industrial Evolution of India : D. R. Gadgil. p. 45.

২. Ibid. p. 114.

৩. তৃতীয় যুগ : ১৯৪০-৫০

PERIOD III : 1940-50

এই সময়ে স্পষ্টত তিনটি পর্যায় দেখা যায়। প্রথমত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শিল্পগুলিকে উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ দান করে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত যুদ্ধযুগে ভারতে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি যুদ্ধের চাহিদা মিটাইবার জন্য উহাদের সর্বাধিক ক্ষমতা পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করে। ভারতীয় শিল্পগুলির উৎপাদন এই সময় সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়। শিল্পগুলি আশাতিরিক্ত ও অভূতপূর্ব মুনাফায় স্ফীত হয়। নূতন কতকগুলি শিল্পও এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাদের মধ্যে লৌহমিশ্রিত এবং অ-লৌহ বিবিধ ধাতুশিল্প, ডিজেল ইঞ্জিন,পাম্প, সেলাইকল, সাইকেল প্রভৃতি শিল্প, বয়ন, চা, তৈল নিষ্কাশন প্রভৃতি শিল্পের যন্ত্রপাতি নির্মাণশিল্প, কস্টিকসোডা, ক্লোরিন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনশিল্প উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধপরবর্তী সংকটের যুগ দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ উহাদের যন্ত্রপাতিগুলি পুরাতন ও ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়ে এবং যুদ্ধাবসানে বিদেশী প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। নিকৃষ্ট উৎপাদন ও অধিক উৎপাদন ব্যয় উহাদের রপ্তানি হ্রাস করে। ইহার অল্প কাল পরেই দেশবিভাগ ও রাজনৈতিক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলায় শিল্পগুলি আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশ বিভাগের দরুন উৎকৃষ্ট তুলা, পাট প্রভৃতি কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চলের অধিকাংশ পাকিস্তানের অংশীভূত হয় এবং পাকিস্তানের অন্তর্গত অঞ্চলের ভারতীয় পণ্যের বাজার হাতছাড়া হইয়া যায়। পরিবহণ ব্যবস্থায় বিভ্রাট ঘটে। পাকিস্তানের সীমান্ত-সংলগ্ন পূর্বপঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে অনেক কুশলী শ্রমিক পাকিস্তানে চলিয়া যায়। সর্বোপরি, স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে ভারতের বহু বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানার হস্তান্তর হয় এবং অভিজ্ঞ বিদেশী পরিচালক ও শিল্পে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারিবর্গ ভারত ত্যাগ করে।

তৃতীয়ত, ১৯৪৭ সালের শেষ দিক হইতে ১৯৫১ সালের প্রথম দিক পর্যন্ত পুনরুন্নতির কাল। এই সময়ে স্বাধীন ভারত সরকার শিল্পগুলির পুনর্বসন ও উন্নতির জন্য নানাবিধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে থাকেন। শিল্পে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য ১৯৪৭ সালে শিল্পবিরোধ আইন ও কয়লা খনিশ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন পাস হয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রমিক-মালিক ও সরকারের মধ্যে বৈঠকের বা 'শিল্পে শান্তি'র চুক্তি হয়। ১৯৪৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন স্থাপনের আইন পাস হয়; ৭ই এপ্রিল প্রথম সরকারী শিল্পনীতি ঘোষিত হয়; ৬ই অক্টোবর কর্মচারী রাজ্যবীমা করপোরেশন স্থাপিত হয়; ফ্যাক্টরী আইন ও কয়লাখনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও বোনাস আইন পাস হয়। বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে একটি বিস্তারিত ঘোষণা প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয় ফিস্ক্যাল কমিশন নিযুক্ত হয় এবং পরিশেষে ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হয়। পরিবহণের উন্নয়নের ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং শিল্পের পুরাতন যন্ত্রপাতির রদবদলের জন্য পুঁজিদ্রব্য আমদানি করা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে পুনরায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও পুরাতন শিল্পের সম্প্রসারণ এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। শিল্পোৎপাদনের সূচকসংখ্যা (১৯৪৬=১০০) ১৯৪৯ সালে ১০৬.৩ ও ১৯৫১ সালে ১১৭.৪-এ পরিণত হয়।

৪/ চতুর্থ যুগ : পরিকল্পনার যুগে শিল্পের অগ্রগতি : ১৯৫১
PERIOD IV : INDUSTRIAL PROGRESS UNDER THE PLANS : 1951

ক. প্রথম পরিকল্পনা ও শিল্পায়ন :

১. **লক্ষ্য :** প্রথম পরিকল্পনাতে কৃষি, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল। পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের মাত্র ৮ শতাংশ বরাদ্দ হইয়াছিল শিল্প ও খনিজের উন্নয়নের জন্য। শিল্পক্ষেত্রে নূতন বিনিয়োগের লক্ষ্য স্বভাবতই অল্প ধার্য হইয়াছিল, গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছিল কার্যরত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মক্ষমতা পরিপূর্ণ ব্যবহারের উপর। মোটামুটিভাবে সে লক্ষ্য পূর্ণ হইয়াছে বলা যায়।

২. **বরাদ্দ :** প্রথম পরিকল্পনায়, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ৯৪ কোটি টাকা ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ২৩৩ কোটি টাকা নূতন বিনিয়োগ লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল।

৩. **অগ্রগতি :** রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ৬০ কোটি টাকা ও বেসরকারীক্ষেত্রে প্রায় ২৩৩ কোটি টাকা প্রকৃত বিনিয়োগ ঘটে। সুতরাং প্রথম পরিকল্পনাকালে মোট ২৯৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়। ইহা ছাড়া বেসরকারীক্ষেত্রে পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তন ও যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য ২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রকৃত ব্যয় হয় ১০৫ কোটি টাকা।

সামগ্রিকভাবে দেখিতে গেলে এই সময়ে শিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ সালের তুলনায় (১৯৫১ = ১০০) উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৬ সালে ১৩২'৮-এ পৌঁছায়। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসর পুঁজি দ্রব্যের উৎপাদন প্রায় ৭০ শতাংশ, শিল্পের বিবিধ কাঁচামালের উৎপাদন ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায় ও ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মোট শিল্পোৎপাদন ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া নূতন শিল্পস্থাপন দ্বারা শিল্পের বৈচিত্র্যকরণও সাধিত হয়।

৪. **সমালোচনা :** ক. কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রে আরব্ধ অগ্রগতিকে পরিকল্পনায় বিভিন্ন শিল্পের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে সর্বত্র সমরূপে সন্তোষজনক অগ্রগতি ঘটে নাই। তুলাবস্ত্র, চিনি, বনস্পতি, সিমেন্ট, কাগজ, সোডা অ্যাশ, কস্টিকসোডা, রেয়ন, বৈদ্যুতিক ট্র্যান্সফরমার, সাইকেল, সেলাইকল ও খনিজ তৈল পরিশোধন প্রভৃতি শিল্পে লক্ষ্যানুযায়ী উৎপাদন ঘটিয়াছে বলা যায়। কিন্তু লৌহ-ইস্পাত, এ্যালুমিনিয়াম, যন্ত্রপাতিনির্মাণ, সার, ডিজেল ইঞ্জিন ও পাম্প নির্মাণ, মোটর গাড়ি, রেডিও প্রভৃতি অনেক শিল্পে লক্ষ্যানুযায়ী অগ্রগতি ঘটে নাই। খ. রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ লক্ষ্যানুযায়ী হয় নাই। গ. বেসরকারীক্ষেত্রেও যন্ত্রপাতির পরিবর্তন এবং আধুনিকীকরণের লক্ষ্য পূরণ হয় নাই।

খ. দ্বিতীয় পরিকল্পনা ও শিল্পায়ন :

১. **লক্ষ্য :** শিল্পায়নের উপর এবং বিশেষত মূল ও ভারীশিল্পের উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হয় এবং এজন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দান করা হয়। তবে উহার সহিত বেসরকারী ক্ষেত্রের যথাযোগ্য ভূমিকাও নির্দিষ্ট হয়। উভয়ের সম্প্রসারণ লক্ষ্যই গৃহীত হয়। পরিকল্পনা কমিশন শিল্পায়নের পাঁচটি অগ্রাধিকার নির্দেশ করেন :

ক. লৌহ-ইস্পাত ও ভারী রসায়ন শিল্পের প্রসার। খ. উন্নয়নমূলক বিবিধ পুঁজিদ্রব্য উৎপাদন শিল্পের (যথা এ্যালুমিনিয়াম, রাসায়নিক মণ্ড, রং ইত্যাদি) প্রসার। গ. চটকল, চিনি

বস্ত্রশিল্পের মত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় শিল্পের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও রদবদল। ঘ. যে সকল শিল্পে উৎপাদনক্ষমতা সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হইতেছে না উহাদের পরিপূর্ণ ব্যবহারসাধন। ঙ. বিকেন্দ্রিত ভোগ্যপণ্য শিল্পের (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের) উৎপাদন কার্যক্রমের সহিত সংগতি রাখিয়া বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্য শিল্পের সম্প্রসারণ।

২. **বরাদ্দ :** দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে শিল্প সম্প্রসারণের জন্য মোট ১০৯৪ কোটি টাকা বিনিয়োগের লক্ষ্য গৃহীত হয়। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের জন্য ৫৫৯ কোটি ও বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য ৫৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। দুই ক্ষেত্র মিলিয়া উৎপাদক দ্রব্যের জন্য ৭৫৯ কোটি টাকা, যন্ত্রপাতি শিল্পের জন্য ১৫৬ কোটি টাকা ও ভোগ্যপণ্য শিল্পের জন্য ১৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বরাদ্দের ৯৮ শতাংশ ও বেসরকারী ক্ষেত্রের বরাদ্দের ৬৮ শতাংশ পুঁজি ও উৎপাদকদ্রব্য শিল্পের জন্য, এবং ২ শতাংশ ও ৩২ শতাংশ ভোগ্যপণ্য শিল্পের জন্য বরাদ্দ হয়। এককক্ষেত্র হিসাবে ধাতুশিল্পের জন্য সর্বাধিক (৪৫.৯ শতাংশ) ব্যয় বরাদ্দ হয়। উহার পরেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের স্থান (১৩.৭ শতাংশ)। ইহা ছাড়া বেসরকারী ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির রদবদলের জন্য আরও ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়।

৩. **অগ্রগতি :** দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দেখা যায় মোট বিনিয়োগ নির্ধারিত লক্ষ্যের ৪৩ শতাংশ অতিক্রম করিয়াছে। নির্ধারিত বিনিয়োগ লক্ষ্য ১,০৯৪ কোটি টাকার স্থলে প্রকৃত বিনিয়োগ ঘটিয়াছে ১,৫৭০ কোটি টাকা। উহার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ঘটিয়াছে ৭২০ কোটি ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ৮৫০ কোটি টাকা। এই বিপুল বিনিয়োগের ফলে শিল্পোৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৫৬ সালে ১৩২.৬ (১৯৫১ = ১০০) হইতে বাড়িয়া ১৯৬০-৬১ সালে ১৯৪তে পৌঁছায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে শিল্পোৎপাদন প্রতি বৎসর গড়ে ৭ শতাংশ হারে বাড়ে ও মোট ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সমগ্র দশ বৎসরে ভারতের সংগঠিত শিল্পের মোট উৎপাদন দ্বিগুণ হইয়াছে বলা যায়।

৪. **সমালোচনা :** ক. দ্বিতীয় পরিকল্পনার আর্থিক বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত লক্ষ্যের ৩০ শতাংশ অধিক হইলেও, ইহাতে প্রকৃত বিনিয়োগ সে অনুপাতে বাড়ে নাই। এবং প্রকৃতপক্ষে আর্থিক বিনিয়োগ ৩০ শতাংশ অধিক হওয়া সত্ত্বেও উহাদ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্যের ৮৫ ভাগ উৎপাদনক্ষমতা মাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ মূল্যবৃদ্ধির দরুন লৌহ-ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যয়বৃদ্ধি। খ. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সামগ্রিকভাবে শিল্পোৎপাদনে বিশিষ্ট অগ্রগতি ঘটিলেও প্রায় প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ক্ষেত্রেই লক্ষ্য অপেক্ষা প্রকৃত অগ্রগতি কম হইয়াছে। লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৪৩ লক্ষ টন, উৎপাদন হইয়াছে ২২ লক্ষ টন। সিমেন্টের লক্ষ্য ছিল ১.৩ কোটি টন, হইয়াছে ৮০ লক্ষ টন। শিল্পযন্ত্রপাতির উৎপাদনও লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারে নাই। লক্ষ্যে পৌঁছাইবার ব্যর্থতার জন্য অভিজ্ঞতার অভাব, উপযুক্ত কারিগরিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব ও বিদেশী মুদ্রার অসুবিধাকে প্রধানত দায়ী করা যায়।

গ. তৃতীয় পরিকল্পনা ও শিল্পায়ন :

১. **লক্ষ্য :** জাতীয় আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য পূরণের অভিপ্রায়ে আগামী ১৫ বৎসরে আরও দ্রুত শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্য লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই জন্য পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে শক্তি উৎপাদনে, পরিবহণের সম্প্রসারণে, শিল্প ও খনিজের উৎপাদনে দেশ যাহাতে ক্রমেই অধিকপরিমাণে

স্বাবলম্বিতাযুক্ত হইতে পারে সেজন্য দক্ষতা ও কারিগরিজ্ঞান আয়ত্ত করা সহ মূল ও ভারীশিল্পের আরও দ্রুত উন্নতি আবশ্যক। এই লক্ষ্য লইয়াই তৃতীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে।

২. **অগ্রাধিকার:** নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে এজন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। ক. দ্বিতীয় পরিকল্পনার অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলি সমাপ্তকরণ। খ. ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং ও যন্ত্রপাতিনির্মাণ শিল্পের সম্প্রসারণ ও বৈচিত্র্যসাধন। গ. মূল কাঁচামাল ও উৎপাদক দ্রব্যের (খনিজ তৈল, এ্যালুমিনিয়াম, জৈব ও অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য) উৎপাদন বৃদ্ধি। ঘ. অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ, কাগজ, কাপড়, চিনি, বনস্পতি তৈল, ও গৃহনির্মাণ দ্রব্য প্রভৃতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেশীয় শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা পূরণ।

৩. **বরাদ্দ:** শিল্পক্ষেত্রে মোট নূতন বিনিয়োগ ২,৯৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের লক্ষ্য ১,৮০৮ কোটি ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ১,১৮৫ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া বেসরকারী ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির বদলবদলের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে ১৫০ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের মধ্যে রহিয়াছে লৌহ-ইস্পাত, শিল্পযন্ত্রপাতি, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, মূল রাসায়নিক, খনিজ তৈল পরিশোধন প্রভৃতি শিল্প।

শিল্পায়নের এই কর্মক্রম পূর্ণ হইলে ১৯৬৫-৬৬ সালে শিল্পোৎপাদনের সূচকসংখ্যা ৩২৯-এ পৌঁছাইবে (১৯৫১ = ১০০) বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন।

৪. **অগ্রগতি:** তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে বাৎসরিক ৭ শতাংশ হারে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে (১৯৫৬ = ১০০)। ইহা পরিকল্পনার লক্ষ্য (বাৎসরিক ১১ শতাংশ বৃদ্ধি) পূর্ণ করিতে পারে নাই। তিনটি সরকারী ইস্পাত কারখানাতেই '৬৩ সালের মার্চ মাসে প্রকৃত উৎপাদন নির্ধারিত উৎপাদন ক্ষমতা অতিক্রম করিয়াছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে পুঁজিদ্রব্য ও মধ্যবর্তী দ্রব্যের ক্ষেত্রে যতটা অগ্রগতি হইয়াছে, ভোগ্যপণ্য উৎপাদন মোটেই তদ্রূপ হয় নাই। ইহা ছাড়া, পরিবহণ, শক্তি ও কয়লার উৎপাদনেও বিশেষ অগ্রগতি লক্ষিত হয়। কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে আশানুরূপ অগ্রগতি লাভ হয় নাই।

উপসংহার: পরিকল্পনার গত দশকে ভারতের শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। ইহার ফলে ভারতে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত ও বিপুল বৈচিত্র্য সাধিত হইতেছে। ভারতের অর্থনীতির নব রূপায়ণ ঘটিতেছে। ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

শিল্পের সম্প্রসারণ দ্বারা অর্থনীতির শিল্পভিত্তিকে দৃঢ় করা হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতে উচ্চ হারে বিনিয়োগ দ্বারা শিল্পগুলির উৎপাদনক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইতেছে।

মূল ও ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিল্পায়নের বুনিয়াদ রচনা করা হইতেছে।

শিল্পের বৈচিত্র্যকরণ ঘটিতেছে। শিল্পায়িত দেশের প্রয়োজনীয় বহু নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপিত হইতেছে। ইহাতে আত্মনির্ভর শিল্প প্রসারের পথ উন্মুক্ত হইতেছে।

আঞ্চলিক শিল্পায়ন দ্বারা দেশের সর্বত্র শিল্পের সুষম বণ্টনের চেষ্টা চলিতেছে। নূতন ইস্পাত কারখানাগুলির, ভারী যন্ত্রপাতি শিল্পের ও ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির স্থান নির্বাচন হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

শিল্পায়নের কার্যক্রমে রাষ্ট্রায়ত্তক্ষেত্রের পাশাপাশি যেমন বেসরকারী ক্ষেত্রকে স্থান দান করা হইয়াছে, তেমনি সংগঠিত বৃহদায়তন শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

শিল্পায়নের সামগ্রিক নেতৃত্ব ও উদ্যোগভার রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তবে বেসরকারীক্ষেত্র সম্পর্কে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি হইতে সরকারী মনোভাব উহার অধিকতর অনুকূল হইয়াছে।

১৯৫১ সাল হইতে বর্তমানে শিল্পের যে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিতেছে তাহার মধ্যে ভোগ্যপণ্য শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় (৪৫ শতাংশ) মধ্যবর্তী পর্যায় ও পুঁজি দ্রব্য শিল্পের উৎপাদন অধিক বৃদ্ধি পাইতেছে (৮৫ শতাংশ)। শিল্পশ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

বেসরকারী শিল্পে উদ্যোগ গ্রহণের মনোভাব বাড়িতেছে এবং বিদেশী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া বেসরকারী ক্ষেত্রে দেশীয় ও বিদেশী পুঁজি কর্তৃক মিলিতভাবে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

বেসরকারীক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় পুঁজিও ক্রমবর্ধমান পরিমাণে দেশীয় বিনিয়োগকারিগণের নিকট পাওয়া যাইতেছে। দেশীয় পুঁজির বাজার যে সম্প্রসারিত হইতেছে ইহা তাহার পরিচয়।

তবে এই শিল্পসম্প্রসারণের পথে চারিটি বিঘ্ন রহিয়াছে। ১. প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার অভাব; ২. কারিগরি জ্ঞানের অভাব; ৩. কাঁচামাল, শক্তি ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাব; ৪. পরিবহণের বিভ্রাট। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের সাফল্য এই সমস্যাগুলি সমাধানের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিবে।

উৎপাদনের কাজ চলিতে পারে। বিদেশী মুদ্রাব্যয় করিয়া বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি, কলকবজা অথবা অন্যান্য কাঁচামাল আমদানি করিতে হয় না।

১০. ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে পরিবহণ বিভ্রাট শিল্পায়নের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। বৃহদায়তন শিল্পায়নের প্রয়োজনে দেশের একস্থান হইতে অপর স্থানে যন্ত্রপাতি, কলকবজা, শ্রমিক, কাঁচামাল, জ্বালানি এবং উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদির চলাচল বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। ফলে এই সকল দেশের দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থার উপরে বিরাট চাপ পড়ে। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রসারে এই অসুবিধা এড়ান যায়। কারণ ইহাতে অধিক পরিবহণের প্রয়োজন হয় না।

১১. ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের ক্রয়শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদাও স্বল্প। এই স্বল্পচাহিদা মিটাইবার পক্ষে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পই উপযুক্ত।

১২. ব্যবসাবাণিজ্যের মন্দা দেখা দিলে বৃহদায়তন শিল্পের বিপর্যয় ঘটে। কিন্তু কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উৎপাদনের স্থিরব্যয় কম বলিয়া মন্দার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। আর পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যবিধানের ক্ষমতা কুটির এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পেরই অধিক।

১৩. ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ব্যতীত প্রতিকূল লেনদেনের উদ্বৃত্তের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নহে। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের দ্বারা রপ্তানিযোগ্য বহু দ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ইহাতে রপ্তানি বৃদ্ধি ও লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সমস্যার তীব্রতা অনেক হ্রাস করা যায়।

১৪. উৎপাদন ব্যয়ের দিক হইতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতি, কারিগরিজ্ঞান ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবহার করিতে পারিলে উহাতে বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় কম পড়ে। স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে এই সুবিধা কম নহে।

মন্তব্য : উপরে আলোচিত কারণসমূহ হইতে ভারতের অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। একটি হিসাব হইতে দেখা যায় ভারতে যেখানে "কারখানাজাতীয় প্রতিষ্ঠানে" ৩০ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে সেখানে কুটির শিল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে ২ কোটি লোক নিযুক্ত আছে। একমাত্র হস্তচালিত তাঁতশিল্পেই ৫০ লক্ষ লোক নিযুক্ত রহিয়াছে (এই সংখ্যা সকল প্রকার বৃহদায়তন শিল্প, খনি বাগিচা-শিল্পের ন্যায় সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার প্রায় সমান)। ১৯৬২-৬৩ সনে যেখানে কারখানা-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপন্নের মূল্য ছিল ১৬৯০ কোটি টাকা, সেখানে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মূল্য ছিল ১২১০ কোটি টাকা।

এই পটভূমিকায় ভারতের অর্থনীতিতে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের সাথে সাথে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এই কারণেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপরে পরিকল্পনা কমিশন যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সমস্যা
PROBLEMS OF COTTAGE & SMALL-SCALE INDUSTRIES

ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও নানা সমস্যা ও অসুবিধার জন্য এই শিল্পের যথাযোগ্য সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সম্ভব হইতেছে না। নিম্নে ঐ সমস্যা ও অসুবিধাগুলির আলোচনা করা হইল।

১. অনুন্নত দেশের কৃষিতে যেমন, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি **পুঁজির সমস্যা তীব্র**। যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মাল ক্রয় এবং শ্রমিকদের মজুরি প্রদান ইত্যাদির জন্য অর্থের প্রয়োজন। নিদারুণ দারিদ্র্যের জন্য শিল্পীরা প্রধানত মহাজন ও ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এমন শর্তে ঋণ সংগ্রহ করে যাহাতে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমবায় সমিতির নিকট হইতে প্রাপ্ত অতি নগণ্য সাহায্যে সমস্যার সমাধান হয় না। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত এই সকল শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করিতে চাহে না। সরকারী সূত্র হইতে অর্থসাহায্য ও ঋণপ্রাপ্তির যথেষ্ট সুব্যবস্থা নাই। সুতরাং পুঁজির সমস্যা যে জটিল তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

২. **উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও কলকবজার অভাবে** কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে। পুরাতন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভারতীয় কারিগররা বাধ্য হইয়া পুরাতন যন্ত্রপাতি লইয়াই কাজ চালাইয়া যাইতেছে। উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশলও যুগোপযোগী নহে। যে কারিগরিবিজ্ঞান ও শিল্পদক্ষতা লইয়া ভারতীয় শিল্পীরা কাজ করে তাহা দ্বারা এই শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নহে।

৩. **উপযুক্ত কাঁচামাল সুবিধামত দরে সংগ্রহ করা** একটি সমস্যা। উৎকৃষ্ট কাঁচামাল না পাইলে উচ্চমানের দ্রব্য উৎপাদন করা যায় না। ফলে বিক্রয়ের অসুবিধা দেখা দেয়। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কৃষি ও বৃহৎশিল্পগুলি যোগায়। ঐ কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত মধ্যস্বত্বভোগীরা সংশ্লিষ্ট থাকে বলিয়া কুটির শিল্পীরা অনেক অসুবিধা ভোগ করে।

৪. **কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়করণের অসুবিধা** কারিগরদের সম্মুখে অপর একটি সমস্যা। মহাজন কিংবা ব্যবসায়ীর নিকটেই সমগ্র উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিবে এই রকম শর্তেই কারিগররা অনেক সময় ঋণ গ্রহণ করে। আবার মধ্যস্বত্বভোগীরা বিক্রয়করণের বিভিন্ন স্তরে সংযুক্ত থাকিয়া সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে উৎপাদক উৎপন্নের ন্যায্যমূল্য হইতে বঞ্চিত হয়। শিল্পজাত দ্রব্যের মান নির্ধারণ এবং তদনুযায়ী নমুনা ঠিক করার ব্যাপারেও ভারতীয় কারিগরের অসুবিধা রহিয়াছে। ফলে দেশী ও বিদেশী বাজারে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বিক্রয়ের পরিমাণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না।

৫. **বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটির** ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্য পরাজিত হইতেছে। বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যও পরিস্থিতিকে অধিকতর জটিল করিয়া তুলিতেছে। একথা মনে করিলে ভুল হইবে যে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পগুলি একান্তভাবেই দুর্বল ও দক্ষতাহীন বলিয়াই সকল ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করিতেছে।

৬. **কুটির শিল্পের পণ্য ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর** পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক **আরোপিত স্থানীয় কর (চুঙ্গি)** ইহার অন্যতম সমস্যা। এই কর ক্রেতাগণের পরিবর্তে বিক্রেতা অর্থাৎ উৎপাদকগণকেই বহন করিতে হয়। বস্তুত সুদীর্ঘকালের সরকারী ঔদাসীন্য ও বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণীর সচেতন প্রতিরোধের ফলেই এই প্রকার অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সকল সমস্যার সমাধানের যথার্থ কোন ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রয়োজনমত সম্প্রসারণ ঘটে নাই।

গ্রহণীয় প্রতিবিধানসমূহ
REMEDIES SUGGESTED

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সমস্যার বিভিন্ন প্রতিবিধানের কথা বিভিন্ন সূত্র হইতে বলা হইয়াছে। নিম্নে উহাদের আলোচনা করা হইতেছে:

১. পুঁজির সমস্যা সম্পর্কে সুপারিশ : ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের[১] পুঁজির সমস্যা সম্পর্কে সুপারিশ হইল : ক. কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে ঋণদানের ব্যাপারে বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলি অধিকতর সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিবে। খ. প্রতিটি রাজ্যে একটি করিয়া রাজ্যঅর্থকরপোরেশন স্থাপন করিতে হইবে। এই বিষয়ে কার্ভে কমিটির[২] সুপারিশ হইল : ক. ভারতের স্টেট ব্যাঙ্ক গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের দিকে আরও বেশি দৃষ্টি দিবে। খ. কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশনের মাধ্যমেই কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে ঋণ দিবে। গ. কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠান চলতি পুঁজি যোগান দিবে। চলতি পুঁজির বিষয়ে শ্রফ কমিটি[৩] বলিয়াছেন যে, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের নিকট হইতে সরকার যে সকল দ্রব্য ক্রয় করেন তাহার মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে অযথা সরকারী বিলম্ব উহাদের চলতি পুঁজির সমস্যাকে তীব্র করে। মূল্য পরিশোধের পদ্ধতিকে সহজতর করা উচিত। নিখিল ভারত গ্রাম্যঋণ সমীক্ষা কমিটির মতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের ব্যাপারে রাজ্যঅর্থসংস্থান করপোরেশন যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পুঁজির সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ উন্নয়ন করপোরেশন (Special Development Corporation) গঠনের সুপারিশ করা হইয়াছে। এই করপোরেশন কাঁচামাল ক্রয়, উৎপাদনের মান নির্ধারণ, বিক্রয়করণ, প্রচার, কারিগরি ও ব্যবস্থাপন সংক্রান্ত উপদেশ ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করিবে।

২. উৎপাদন কৌশলের উন্নতি সম্পর্কে সুপারিশ : অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও কলাকৌশলের সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাদলের সুপারিশ হইল গবেষণা ও কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর। এই উদ্দেশ্যে চারিটি শিল্পকলা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে। ইহারা উন্নততর উৎপাদন-পদ্ধতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষণা করিবে এবং নানাবিধ যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলাফল সম্পর্কে কারিগরদিগকে শিক্ষিত করিবে। নূতন নূতন নকশা সম্পর্কে গবেষণার জন্য 'ডিজাইন' বা নকশা সম্পর্কিত জাতীয় স্কুল স্থাপনের সুপারিশও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দল করিয়াছেন। কাজ করিতে করিতে কর্মিগণ যাহাতে উন্নততর শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার জন্য "শিক্ষার-সহিত-উৎপাদন" কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার।

৩. কাঁচামাল সম্পর্কে সুপারিশ : ক্ষুদ্র শিল্পীরা যাহাতে উপযুক্ত কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন কার্যে অসুবিধা বোধ না করে তাহার জন্য কাঁচামাল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগণের অস্তিত্বের ফলে কাঁচামালের মূল্যান্তরে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তাহার জন্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে কাঁচামাল যোগানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

৪. বিক্রয়ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে সুপারিশ : সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি স্থাপনের মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় এবং উৎপাদকের ন্যায্য মূল্য লাভ সুনিশ্চিত করা যায়। দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন শিল্প প্রদর্শনীতে ভারতীয় উৎপন্ন দ্রব্য প্রেরণ, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে সংবাদাদি প্রেরণ ও সংগ্রহ, বিদেশের

---

১. The Ford Foundation International Planning Team. এই দল কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিভিন্নদিক আলোচনা করিয়া ১৯৫৪ সালে এক Report দাখিল করে।

২. The Village & Small Industries (Second Five-Year Plan) Committee. ইহার সভাপতি প্রখ্যাত অধ্যাপক D. G. Karve-র নামানুসারে এই কমিটি Karve Committee বলিয়া পরিচিত।

৩. The Shroff Committee on Finance for the *Private Sector*.

সম্ভাব্য বাজার সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং বিদেশী ক্রেতাদের অবহিত করিবার জন্য সুনিপুণ প্রচার ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন দ্রব্যাদি জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার জন্য প্রদর্শনী, স্থায়ী মিউজিয়ম, বিক্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

৫. **অন্যান্য সহায়তা :** বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প যাহাতে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে সেই চেষ্টা করাই একমাত্র পন্থা। কিন্তু এই আত্মনির্ভরতা অর্জন করা সময়সাপেক্ষ। যতদিন না ইহা হইতেছে ততদিন সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ইহাদের প্রতিযোগিতার শক্তিবৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যেমন, বৃহৎ শিল্পগুলির উপরে উৎপাদন শুল্ক বসান এই জাতীয় শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ ও ক্ষেত্র নির্ধারণ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়াও কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ে রেয়াতের ব্যবস্থা, প্রয়োজনমত এই শিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য—ইত্যাদি ব্যবস্থাও অনেকখানি সাহায্য করিবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বৃহদায়তন শিল্প পরস্পরের পরিপূরক—এই দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হইলে উভয়জাতীয় শিল্পের কার্যসূচী ও উৎপাদন-সূচীর মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা একান্ত কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুত উভয়ের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রে সমন্বয়-সাধন পূর্বক শিল্পায়নের অগ্রগতিতে উভয়েই অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারী নীতি ও গৃহীত ব্যবস্থা
GOVERNMENTAL POLICIES & MEASURES ADOPTED

পরিকল্পনার রচয়িতারা একবাক্যে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে, বিশেষ করিয়া গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়নে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপায় হিসাবে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইহার যথোপযুক্ত স্থান নির্দেশ করেন। এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য গৃহীত বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে করা হইল :

১. বিভিন্ন শিল্পের বিশেষ বিশেষ সমস্যার বিচার ও বিশ্লেষণের জন্য নিম্নলিখিত ছয়টি শিল্পে ছয়টি সর্বভারতীয় পর্ষৎ স্থাপন করা হয়, যথা—খাদি ও গ্রামীণ শিল্পপর্ষৎ, তাঁত শিল্পপর্ষৎ, হস্তশিল্প পর্ষৎ, সিল্ক পর্ষৎ, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প পর্ষৎ, নারিকেল কাতা পর্ষৎ। বিভিন্ন রাজ্যেও প্রয়োজনানুযায়ী অনুরূপ রাজ্য পর্ষৎ স্থাপন করা হয়।

২. বৃহৎ শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের সংরক্ষণের জন্য বৃহৎশিল্পজাত দ্রব্যের উপরে শুল্ক বসান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য রেয়াত প্রথার প্রবর্তন, বৃহদায়তনশিল্পের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

৩ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে অর্থ সরবরাহের জন্য রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশন ও জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন স্থাপিত হয়। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে এই উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করা হয়। স্টেট ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে অর্থসাহায্য করিবার যে কার্যসূচী রচিত হয় তদনুযায়ী প্রথম পরিকল্পনাকালে ৯টি অঞ্চলে পথদেশক কর্মসূচী চালু করা হয়। স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত "পথদেশক" কার্যক্রম অনুসারে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ অবধি ৯ কোটি টাকার ঋণের ব্যবস্থা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক কেন্দ্রীয় সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণদানের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধাদান করা হয়।

৪. সরকার যাহাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্য অধিকতর পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে তাহার সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও বিচার করিবার জন্য একটি বিবিধদ্রব্য-ক্রয় কমিটি (Stores

Purchase Committee) নিযুক্ত হইয়াছিল। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী প্রয়োজনের নানাবিধ দ্রব্য সরবরাহের দায়িত্ব বিভিন্ন কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে দেওয়া হয়।

৫. আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাদলের সুপারিশ অনুযায়ী ৪টি প্রযুক্তিবিদ্যার আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান।[১]

প্রথম পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে নানাবিধ সাহায্য দেওয়া হয়। যথা—ঋণদান, শিক্ষাব্যবস্থা, কারিগরি পরামর্শদান, সুবিধাজনক শর্তে উন্নতধরনের কলকবজা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। এই সকল সাহায্যের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় মোট ৪৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

৬. কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্পর্কে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অনুসৃত সরকারী নীতি মূলত প্রথম পরিকল্পনাকালের অনুসৃত নীতি ও কার্যসূচীরই ব্যাপকতর রূপ। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের সরকারী নীতি ও কার্যসূচী কর্ভে কমিটির সুপারিশের উপরে ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে।

১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসম্পর্কে সুপারিশ করিবার সময় কার্ভে কমিটি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন: ক. গ্রামীণ শিল্পগুলিতে প্রযুক্তিবিদ্যাগত পরিবর্তনের ফলে যেন অতিরিক্ত কর্মহীনতার সৃষ্টি না হয়। খ. গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা যেন করা যায়। গ. বিকেন্দ্রিত সমাজব্যবস্থায় দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন।

৭. পিরামিডের প্রশস্ত ভিত্তির মত সারা দেশব্যাপী শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপনের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ শিল্পের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের কথা বলা হইয়াছে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য সুনিশ্চিত বাজারের ব্যবস্থা, কয়েক প্রকারের বস্ত্রের উৎপাদন হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া, কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় কয়েক প্রকারের যন্ত্রপাতির উৎপাদনভার ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উপরে ছাড়িয়া দেওয়া ইত্যাদি সরকারী ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

যে সকল বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদনশক্তি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগান হয় নাই, সেই সকল শিল্পের আর কোন সম্প্রসারণ করিতে দেওয়া হইবে না—এই নীতি গৃহীত হইয়াছে। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য প্রথম পরিকল্পনাকালে শিল্পসমবায় সমিতির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার শেষে শিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল (১৯৫৬ সালে) ১২,৩০০; ১৯৬১ সালের জুন মাসে উহা ৩৬০০০-এর অধিক হয়।

হস্তশিল্পের উন্নয়নমূলক কার্যসূচী দৃঢ়তর করা হয়। চারিটি আঞ্চলিক 'নকশা'কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে আরও ৬০টি শিল্প উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের কার্যসূচীর রূপায়ণের ফলে প্রায় ৩ লক্ষ লোকের পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ১৭৫ কোটি টাকা।

৮. ঋণ ও পুঁজি সরবরাহের ব্যাপারে ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই হইতে "গ্যারান্টি কার্যক্রম" (Guarantee Scheme) প্রবর্তিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শক্রমে ভারত

১. ইহারা Regional Small-Industries Service Institutes নামেও পরিচিত। এই চারিটি কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ফরিদাবাদে অবস্থিত।

সরকার এই কার্যক্রম প্রচলন করিয়াছেন। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অথবা ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে যে ঋণ প্রদান করিবে তাহার গ্যারান্টি দিবেন ভারত সরকার। ঋণপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র শিল্পের লোকসান হইলে লোকসানের অংশ ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ভারত সরকারও বহন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের "শিল্প অর্থ সংস্থান বিভাগে" (Industrial Finance Department) "গ্যারান্টি সংস্থা" স্থাপিত হয়। এই কার্যক্রমের ফলে ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পাইবে। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ঋণদানের ব্যাপারে পূর্বের মত দ্বিধাগ্রস্ত হইবে না। ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে প্রবর্তিত "ঋণ গ্যারান্টি কার্যক্রম" অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার অন্যান্য ঋণদানকারী ব্যাঙ্ক এবং অর্থ-প্রতিষ্ঠানের সহিত একযোগে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ক্ষুদ্রশিল্পকে প্রদত্ত ঋণের ঝুঁকিবহনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই বাবদে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস অবধি ৩২ কোটি টাকার গ্যারান্টি প্রদত্ত হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্থান

PLACE ASSIGNED IN THE THIRD PLAN

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যসূচী রূপায়ণের ব্যাপারে নিম্নলিখিত লক্ষ্যগুলি রাখা হইয়াছে :

ক. কারিগরদের উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি, কারিগরি পরামর্শ, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়া উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা ; খ. অর্থসাহায্য, বিক্রয় রেয়াত এবং সংরক্ষিত বাজারের উপর নির্ভরতা উত্তরোত্তর কমাইয়া আনা ; গ. গ্রামাঞ্চলে ও ছোট শহরে শিল্পবিকাশের সহায়তা করা ; ঘ. বৃহদায়তন শিল্পের সহায়ক হিসাবে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশ সাধন করা, ঙ. কারিগর এবং কারুশিল্পীদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা। এই সকল লক্ষ্য পূরণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত কার্যসূচী ও ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে :

১. গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও ব্যবস্থাপনার জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে।

২. উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহারের উপরে অধিক জোর দেওয়া হইয়েছে ; এই উদ্দেশ্যে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের জন্য, নূতন নকশা ও উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য গবেষণা চালনা করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে যন্ত্রপাতি যোগানের জন্য যে কিস্তিবন্দ-ক্রয়ের (Hire-purchase) ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তৃতীয় পরিকল্পনায় সেই ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত হইবে।

৩. সুবিধাজনক শর্তে অহেতুক বিলম্ব না করিয়া দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী এবং চলতি পুঁজি সরবরাহের জন্য "শিল্পে রাষ্ট্রীয় সাহায্য আইনের" মাধ্যমে অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঋণ সরবরাহের ব্যাপারে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ব্যবস্থা করিতে হইবে ইহাও লক্ষ্য হিসাবে স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলি তৃতীয় পরিকল্পনাকালে চলিতে থাকিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খাদি ও গ্রামীণশিল্প কমিশন, জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন ইত্যাদির ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা ব্যাঙ্ক অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের গ্যারান্টি দিবে।

৪. অর্থসাহায্য ও বিক্রয় রেয়াত ইত্যাদি ক্রমশই কমাইয়া আনিতে হইবে। কারিগরি ও যানবাহনের উন্নতির ফলে খাদির মূল্য হ্রাস পাইবে আশা করা গিয়াছে। তাই অর্থসাহায্যের

প্রয়োজন কমিয়া আসিবে। অন্যদিকে বিক্রয় রেয়াতের ব্যবস্থা একেবারেই রদ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা-অনুদানের বিষয় (Management grants) বিভিন্ন সময়ে বিচার করিতে হইবে।

৫. ইহাও স্থির করা হইয়াছে যে কোন শিল্পের ক্ষেত্রে সম্মিলিত উৎপাদন কার্যসূচী নির্ধারণ ও প্রয়োগের পূর্বে উপযুক্ত অনুসন্ধান ও সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

৬. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল অবধি দেখা গিয়াছে যে গ্রামাঞ্চলেই বিভিন্ন গ্রামীণশিল্প যেমন খাদি, রেশম, নারিকেল কাতা ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বড় বড় শহরের অভ্যন্তরে অথবা নিকটেই গড়িয়া উঠিয়াছে। সমগ্র দেশের বিস্তৃত অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা ছড়াইয়া দিবার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে অথবা ছোট শহরে ক্ষুদ্রশিল্প সম্প্রসারণের উপর জোর দেওয়া হইবে।

৭. যে সমস্ত শিল্পে (যেমন খাদি ও নারিকেল কাতা) সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যাপারে অনেকদূর অগ্রগতি হইয়াছে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকেই সংগঠন ও অর্থের দিক হইতে সুদৃঢ় করিবার নীতি অনুসরণ করা হইবে এবং অধিকতর সংখ্যায় শ্রমিকদিগকে সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হইবে। আর যে সকল শিল্পে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই, সেইগুলিতে উহা গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে।

৮. তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যসূচীর জন্য সরকারী উদ্যোগে ২৬৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বেসরকারী উদ্যোগে প্রায় ২৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

৯. তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন আয়তনবিশিষ্ট ৩০০টি নূতন শিল্প-উপনিবেশ (Industrial Estates) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই সকল উপনিবেশ যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র ও মধ্যমায়তন শহরের নিকটেই প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই উপনিবেশগুলি এমন অঞ্চলে স্থাপন করার চেষ্টা করা হইবে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক কারিগরের সমাবেশ আছে, এবং যেন ঐ কারিগরেরা উপনিবেশের উন্নত যন্ত্রপাতি ও আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে পারে।

১০. সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের বিনিয়োগের ভিত্তিতে হিসাব করা হইয়াছে যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যসূচী রূপায়িত হইলে প্রায় ৮০ লক্ষ লোকের আংশিক এবং পূর্ণতর কর্মসংস্থান করা যাইবে। আর ৯ লক্ষ লোকের পূর্ণ কর্মসংস্থান করা যাইবে।

সরকারী নীতির মূল্যায়ন

CRITICAL APPRAISAL OF THE STATE POLICY

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে এই শিল্পের নিজস্ব যোগ্যতার কথাই চিন্তা করা উচিত। দক্ষতাসম্পন্ন বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রের সম্প্রসারণকে ব্যাহত করিয়া ইহার উন্নয়ন কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ক্ষুদ্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু ইহার যথাযোগ্য ভূমিকা হইবে গ্রামাঞ্চলের কৃষিনির্ভর জনসাধারণের পার্শ্বজীবিকা সৃষ্টি করা এবং বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করা। এই দিক হইতে বিচার করিলে বিগত কয়েক বৎসরের অনুসৃত বৃহদায়তন শিল্পের উপর করভার আরোপের নীতি কতটা ফলপ্রসূ হইবে সে বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। সরকারী কর্তব্য হওয়া উচিত বৃহদায়তন শিল্পের অঙ্গ এবং সহায়ক হিসাবে ক্ষুদ্রশিল্পের সম্প্রসারণ করা।

শিল্পকৌশলের উন্নতি সাধন করিয়া আধুনিক কালের চাহিদা মিটাইবার মত শক্তি অর্জনে সহায়তা করিয়া ইহাদের বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করা উচিত। সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী ছিটেফোঁটা সাহায্যের দ্বারা ইহাদের মূল সমস্যার সমাধান করা যাইবে না।

তবে আশার কথা এই যে ইদানীংকালে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে যাহাতে গড়িয়া উঠিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের প্রতি প্রযোজ্য নীতি নির্ধারিত হইতেছে। ভারতের প্রায় ৩০০০ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অংশ তৈয়ারির ব্যাপারে ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে কতটা কাজে লাগাইতে পারে এই বিষয়ে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী-দপ্তর অনুসন্ধান করিয়াছেন। জাপানে অনুসৃত নীতি এইখানে সাফল্যের সহিত প্রবর্তিত হইতে পারে। জাপানের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। যন্ত্রপাতির যে অংশগুলি তৈয়ারি করিতে উচ্চ স্তরের নৈপুণ্য দরকার, সেইগুলিই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি তৈয়ারি করে। অন্যান্য অংশগুলি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই তৈয়ারি করান হয়। ইহাতে বৃহৎ শিল্পগুলির বিপুল পরিমাণ পুঁজি এই সকল দ্রব্য উৎপাদনের কাজে বিনিয়োগ করিতে হয় না বলিয়া উহা অন্য অধিকতর লাভজনক ও প্রয়োজনীয় কাজে বিনিয়োগ করা যায়। অপরদিকে ক্ষুদ্র শিল্পগুলি উহাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য অনায়াসেই বাজার খুঁজিয়া পায়।

জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশন ও অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে কয়েকটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এই কার্যসূচীকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং কয়েকটি ক্ষুদ্রশিল্পের সহিত যন্ত্রপাতির অংশাদি নির্মাণের ব্যাপারে ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

সরকারী নীতি ক্ষুদ্র শিল্পগঠনে উৎসাহদানেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নহে। যে সকল শিল্পে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি সুদক্ষ উৎপাদনে বাধা দিতেছে, সরকারী নীতি এমন হওয়া উচিত যাহাতে ঐ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে জোটবন্দ হইতে উদ্বুদ্ধ করা যায়। প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়াও এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতে হইবে।

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে, গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্পের কার্যসূচী কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজনে রচিত হয়। উদ্দেশ্যগুলি হইল: ক. অপেক্ষাকৃত কমপুঁজি ব্যয় করিয়া বেশি কর্মসংস্থান করা; খ. ভোগ্য দ্রব্যের বর্ধিত চাহিদার বৃহত্তর অংশ মিটাইবার ব্যবস্থা করা; গ. পুঁজি ও শিল্পনৈপুণ্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার; এবং ঘ. একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতি ও অপরদিকে বৃহদায়তন শিল্পের সহিত সমন্বয়-সাধনের জন্য গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন ও জাতীয় আয়ের অধিকতর সুষম বণ্টন। এই উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর রূপায়ণের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর আরও বেশি নির্ভর করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ২৬৫ কোটি ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ৩২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বৃহদায়তন ভোগ্য পণ্যশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণের পরিবর্তে উহাদের যন্ত্রপাতির সর্বাধিক ক্ষমতা পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উহার সহিত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণের নীতি গৃহীত হয়। অর্থাৎ এক কথায় ভোগ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য প্রধানত ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের বর্ধিত উৎপাদনের উপরই নির্ভর করা হয়। এই নীতি তৃতীয় পরিকল্পনাতেও অব্যাহত রহিয়াছে।

ভোগ্যপণ্য বৃদ্ধির জন্য বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্যশিল্পের পরিবর্তে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উপর নির্ভরতার সমর্থনে যুক্তি: দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দ্রুত শিল্পায়নের

জন্য মূল ও ভারীশিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদত্ত হয় এবং এজন্য ১০৭৪ কোটি টাকার বিনিয়োগ বরাদ্দ হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও এই নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে এবং শিল্পায়নের জন্য মোট ২,৯৯৩ কোটি টাকার বিনিয়োগ বরাদ্দ হইয়াছে। এইরূপ বিপুল ব্যয়ের দ্বারা পরিকল্পনাকালে দেশে আর্থিক আয় দ্রুত এবং অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যেহেতু ইহা বিনিয়োগ ব্যয় সেজন্য এরূপ ব্যয়ে দেশবাসীর হস্তে ক্রয়ক্ষমতা যত দ্রুত বৃদ্ধি পায়, কর্মসংস্থান তত দ্রুত বাড়ে না। তাহা ছাড়া ইহা পুঁজিদ্রব্যশিল্পের জন্য ব্যয় বলিয়া ভোগ্য পণ্যের উৎপাদনও ইহাতে বাড়ে না। সুতরাং এরূপ ব্যয়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অথচ পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতেছে দেশে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন; তাহারা যাহাতে আরও দ্রব্যসামগ্রী ভোগে সমর্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনাকালে ভোগ্যপণ্যের চাহিদাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। সুতরাং কিভাবে পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান এবং ভোগ্যপণ্যের যোগান বাড়ান যায় তাহার সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্যা সহজে দূর করা যাইত যদি বৃহদায়তন ভোগ্য পণ্য-শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হইত। ভারতে এপর্যন্ত বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্য উৎপাদন শিল্পই উন্নতিলাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহাদের সম্প্রসারণ কিছু কঠিন হইত না। কিন্তু এ পথ গ্রহণে নিম্নোক্ত কতকগুলি অসুবিধা ছিল:

ক. একই সঙ্গে পুঁজি দ্রব্যশিল্প ও ভোগ্য পণ্যশিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাব রহিয়াছে। সুতরাং প্রথমোক্ত শিল্পের সম্প্রসারণকেই বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে ভবিষ্যতে ভোগ্যপণ্যশিল্পের সম্প্রসারণে দেশ আত্মনির্ভর হইবে। খ. বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্য শিল্পের সম্প্রসারণ করিতে হইলে বিদেশ হইতে যথেষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইত। সেজন্য যে পরিমাণ বিদেশীমুদ্রা লাগিত তাহা ভারতের নাই। গ. বর্তমান বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির মালিকানা একচেটিয়া কারবারীদের হস্তগত। সুতরাং ইহাদের সম্প্রসারণফলে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া শিল্পপতিদের হাতে আয় ও অধিক ক্ষমতা আরও কেন্দ্রীভূত হইত। ইহা ভারতে সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের লক্ষ্যের বিরোধী। এসকল কারণে বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্য শিল্পের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত হয় নাই।

ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির অপর পথ হইতেছে ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন। ভারত সরকার নিম্নোক্ত কারণে এই পথই গ্রহণ করিয়াছেন:

ক. ইহাদের উৎপাদন পদ্ধতিতে অধিক পুঁজি ও কারিগরিজ্ঞানের প্রয়োজন নাই দেশের বর্তমান সামর্থ্যের দ্বারাই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। খ. বিশেষ যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নাই বলিয়া কোন যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে এবং সেজন্য বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হইবে না। গ. ইহাদের ক্ষেত্রে অল্পসময়ের মধ্যেই উৎপাদন আরম্ভ ও বৃদ্ধি করা যায় (Short fruition lag)। সুতরাং দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির চাপ ইহারা অল্পকালের মধ্যেই প্রতিরোধে সমর্থ। ঘ. ইহাদের ক্ষেত্রে পুঁজির তুলনায় অধিকশ্রম লাগে (labour-intensive) বলিয়া ইহাদের সম্প্রসারণে অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থান সম্ভব ঙ. দেশের সর্বত্র এবং বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ইহারা ব্যাপকভাবে বিক্ষিপ্ত থাকায় ইহাদের উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দ্বারা বর্ধিত জাতীয় আয়ের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সমবণ্টন ঘটিবে। চ. এই সকল শিল্পগুলির উন্নয়নে দেশে অধিকতর বিকেন্দ্রিত, আঞ্চলিক শিল্পায়ন ঘটিবে। ছ. পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে গ্রামাঞ্চলে পথঘাট, পরিবহণ বিদ্যুৎসরবরাহ, কারিগরিবিদ্যা প্রভৃতির উন্নতি ঘটিলে, পূর্বে যে সকল স্থানীয় দ্রব্য ও কাঁচামাল

সংঘটিত হইত সেগুলি ব্যবহারের সুযোগ ও সম্ভাবনা বাড়িবে এবং তাহার ফলে এই সকল স্থানীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ঐ সম্পদগুলি ব্যবহারে সমর্থ হইবে। ইহাতে স্থানীয় সম্পদের দ্বারা স্থানীয় শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের সাহায্যে স্থানীয় চাহিদা সন্তোষজনকরূপে পূরণ সম্ভব হইবে। জ. এই সকল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি একদিকে কৃষি ও অপরদিকে বৃহদায়তন শিল্পের মাঝামাঝি অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে ইহারা যোগসাধনের সেতু। কৃষি এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের ফলে নানাপ্রকার কৃষিজ কাঁচামালের উৎপাদন বাড়িবে। ঐগুলি স্থানীয়ভাবেই ব্যবহার করিবার জন্য নানাপ্রকার কৃষি-নির্ভর শিল্পের (agro-industries) প্রয়োজন হইবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সে প্রয়োজন পূরণ করিতে পারে। অপরদিকে বৃহদায়তন শিল্পেরও অনেক প্রয়োজনীয় কাঁচামালের প্রক্রিয়াজাত করণের (processing) জন্য এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও সাজসরঞ্জাম নির্মাণের জন্য নূতন শিল্পের প্রয়োজন হইবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সে প্রয়োজনও অংশত পূরণে সমর্থ। জাপান তাহার দৃষ্টান্ত।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর নির্ভরতার সরকারী নীতি নিঃসন্দেহে সমর্থনীয়।

ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সামর্থ্য ঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতে দেশে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধানত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উপর নির্ভর করা হইতেছে বলিয়া, কেহ কেহ ইহাদের দ্বারা কতটা পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব সে প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। গত দুই পরিকল্পনার দশবৎসরে এজন্য মোট ২১৮ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে; ক্ষুদ্র শিল্পগুলির, হস্তচালিত তাঁতশিল্পের, খাদি ও গ্রাম্য শিল্পের, কারুশিল্পের, নারিকেল কাতা ও রেশম শিল্পের কার্যক্রম প্রণয়নের, সামঞ্জস্য বিধানের, প্রণীত কার্যক্রম রূপায়ণের ও এসকল কার্যে নেতৃত্বদানের জন্য কেন্দ্রীয় পর্ষৎ (Central Board) স্থাপিত হইয়াছে ; সম্প্রসারণ সেবাকর্ম প্রচলিত হইয়াছে, প্রত্যেক রাজ্যে ক্ষুদ্রশিল্প সেবা সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে ; ৫৩টি সম্প্রসারণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ১০০০টি ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা লইয়া ৬০টি শিল্প উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে, কারিগরি সাহায্য, কাঁচামাল সরবরাহ ও যন্ত্রপাতি বিক্রয় প্রভৃতি নানাবিধ সুবিধা প্রদত্ত হইতেছে।

উপরোক্ত নানাবিধ সহায়তার ফলে দেখা যায়, দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে, ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি, সেলাইকল তৈয়ার, বৈদ্যুতিক মোটর তৈয়ার, বৈদ্যুতিক পাখা, সাইকেল প্রভৃতি নির্মাণকারী নূতন ক্ষুদ্র শিল্পে ২৫ হইতে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুরাতন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলির মধ্যে, ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে হস্তচালিত তাঁত শিল্পের উৎপাদন ৭৪.২ কোটি গজ হইতে বাড়িয়া ১৯০ কোটি গজে, খাদির উৎপাদন ৭৩ লক্ষ গজ হইতে বাড়িয়া ৭.৪ কোটি গজে এবং কাঁচারেশমের উৎপাদন ২৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে বাড়িয়া ৩৬ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যগুলি অনেক শিল্প পূরণ করিতে পারে নাই তাহার ফলে দেশে ভোগ্যপণ্যের স্বল্পতা মূল্য বৃদ্ধি ঘটাইয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ হিসাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অক্ষমতাকে দায়ী করিলে ভুল হইবে। কারণ দেখা যায়, উপযুক্ত পরিমাণে কাঁচামালের যোগান, ঋণের অভাব, ত্রুটিপূর্ণ বিক্রয় ব্যবস্থা এবং পুরাতন উৎপাদন পদ্ধতি—এই বাধাগুলি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদন উপযুক্তরূপে বাড়িতে দেয় নাই। অতএব ইহাকে

অপসারণে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রকৃত উৎপাদন নিঃসন্দেহে আরও বৃদ্ধি পাইবে। ক্ষুদ্র, সামরিকভাবে ইহাদের পুনর্গঠন, সম্প্রসারণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন স্তরের উন্নতির জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইতে পারে। ইহাকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অসুবিধা বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

ক্ষুদ্র শিল্প উপনিবেশ
INDUSTRIAL ESTATE

১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে ক্ষুদ্র শিল্প পর্ষৎ (Small-scale Industries Board) ভারতে শিল্প উপনিবেশ স্থাপনের কার্যক্রম মঞ্জুর করে। ঐ কার্যক্রমের দ্বারা ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত ১১০টি শিল্প উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১২৫টি শিল্প উপনিবেশ স্থাপনের কার্য সম্পাদিত হয়। তন্মধ্যে ৮৪টি সক্রিয় হইয়াছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল অন্যূন ১০০০। শিল্প উপনিবেশ স্থাপনের জন্য রাজ্যসরকার ও জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প করপোরেশনকে অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে।

এই সকল শিল্প উপনিবেশগুলি দুই প্রকারের: বৃহৎ শহরের প্রান্তে স্থাপিত বৃহৎ শিল্প-উপনিবেশ এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের এলাকায় স্থাপিত ক্ষুদ্রাকার শিল্প উপনিবেশ।

গুরুত্ব: ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিস্তার পরিকল্পিত অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে পুঁজি, কাঁচামাল ও শ্রমিক ছাড়া আরো অনেক বিষয়ের প্রয়োজন। কারখানাগৃহ, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ, পর্যাপ্ত জলের যোগান, গ্যাস, বাষ্পশক্তি, রেলওয়ে সাইডিং ইত্যাদি অন্যান্য অনেক সুবিধা চাই। দেশে সর্বত্র বিদ্যুতের সরবরাহ নাই। অন্যান্য বিষয়গুলিও ক্ষুদ্রশিল্পের উদ্যোক্তাগণের সাধ্যাতিরিক্ত। এজন্য সুনির্বাচিত স্থানে বাজার অথবা কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চলের নিকটে সরকারী ব্যয়ে উপরোক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সরবরাহের বন্দোবস্ত করা যায়। এই স্থানগুলিই শিল্প-উপনিবেশ নামে পরিচিত। এই সকল উপনিবেশে কারখানাগৃহ, জল, বিদ্যুৎ ও বাষ্পশক্তির সরবরাহ, রেলওয়ে সাইডিং প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া উহাতে একাধিক ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের সুযোগদান করা হয়। শিল্পের উপযোগী সুবিধা ছাড়াও এই উপনিবেশগুলিতে শ্রমিকগণের আদর্শ বাসগৃহ, তাহাদের সন্তান-সন্ততির জন্য বিদ্যালয়, চিকিৎসা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা থাকে। ফলে এই উপনিবেশগুলি নানাদিক দিয়া শিল্পদক্ষতা বৃদ্ধির পক্ষে আদর্শ স্থানীয় হয়। একারণে ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে এজাতীয় শিল্প উপনিবেশ স্থাপনের গুরুত্ব অতুলনীয়। উপরোক্ত নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দান করিয়া ইতোমধ্যেই শিল্প উপনিবেশগুলি ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নে বিশেষ সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও ৩০০টি ক্ষুদ্র শিল্প উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে।

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নয়নে পথদেশক প্রকল্প
PILOT PROJECTS FOR THE DEVELOPMENT OF COTTAGE & SMALL INDUSTRIES

১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের ২৪টি ব্লকে প্রগাঢ় উন্নতির পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পথদেশক প্রকল্প প্রবর্তিত হয়। শিল্পসম্প্রসারণ সেবা ও উদারহস্তে ঋণ প্রদান দ্বারা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রগাঢ় এবং সুসংহত উন্নয়ন ইহার উদ্দেশ্য। খাদি ও গ্রামশিল্প কমিশন, সারাভারত হস্তচালিত তাঁত পর্ষৎ, ক্ষুদ্রশিল্প পর্ষৎ, কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষৎ ও সারাভারত

কারুশিল্প পর্ষৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত পরিকল্পনা লইয়া ইহা গঠিত। ১৯৬৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৮৪টি পথদেশক প্রকল্পে কার্যরত ছিল।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা
ROLE OF COOPERATION IN DEVELOPING SMALL AND COTTAGE INDUSTRIES

গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া স্থানীয় চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, আয় বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক শিল্প সম্প্রসারণের জন্য প্রথম পরিকল্পনাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের কথা বলা হইয়াছিল এবং তজ্জন্য শিল্প সমবায় গঠনের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। গ্রাম্য কারিগরগণের নিজস্ব সঞ্চয় নাই কিংবা জামিন রাখিয়া ঋণ লইবার মত কোন সম্পত্তিও নাই। সুতরাং কারিগরগণের সমবায় গঠন করিয়া গ্রাম্যশিল্প গঠন ও পরিচালনা করিলে সরকারের পক্ষ হইতে ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়ার সুবিধা হয় এবং এই প্রকার শিল্পগুলির পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলির সমবায়মূলক ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহা বর্তমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

ইতিপূর্বে ভারতে শিল্প সমবায়ের অগ্রগতি সামান্য হইলেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহার উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। হস্তচালিত তাঁত, ধাতু, খাদি, মৃত্তিকাপাত্র, চামড়া পাক করণ, চিনি উৎপাদন প্রভৃতি শিল্পে ১৯৬২ সালের জুন মাস পর্যন্ত সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ হাজার, সদস্য সংখ্যা ২৮ লক্ষ এবং চলতি পুঁজির পরিমাণ ১৩৫ কোটি টাকার অধিক হইয়াছে।

১৯৫৮ সালে শিল্পসমবায়গুলির উন্নয়ন সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞদল নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ঐগুলি সরকার বর্তমানে কার্যে পরিণত করিতেছেন।

শিল্পসমবায়গুলির অগ্রগতির পর্যালোচনা, উহাদের সমস্যা অনুধাবন ও সাফল্যের বাধা দূরীকরণের জন্য পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল।

যে সকল ক্ষেত্রে শিল্প সমবায়গুলি অগ্রসর হইয়াছে তথায় আর্থিক ও সাংগঠনিক সংহতি সাধনের জন্য এবং কর্মিসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। নূতন ক্ষেত্রেও শিল্পসমবায় সম্প্রসারিত করিবার কথা বলা হইয়াছে। এজন্য কতকগুলি সুনির্বাচিত অঞ্চলে পৃথক শিল্পসমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

৩

কয়েকটি প্রধান বৃহদায়তন শিল্প

Principal Large-scale Industries

বর্তমান অধ্যায়ে ভারতের চারিটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, যথা, তুলাবস্ত্র, চটকল, লৌহ-ইস্পাত ও কয়লাখনি শিল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

তুলাবস্ত্র শিল্প

COTTON TEXTILE INDUSTRY

ক. অতীত ইতিহাস (brief history) : ১৮১৮ সালে ভারতে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত হইলেও ১৮৫৪ সালে ইহার প্রকৃত উন্নতি শুরু হয়। বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কাপড়ের কলের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে ভারতে দেশীয় কাপড়ের কলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। পশ্চিম ভারতের তুলা উৎপাদনকারী অঞ্চলের সন্নিকটে বোম্বাই ও আমেদাবাদে প্রথমাবধিই ভারতের কাপড়ের কলগুলি কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধ বস্ত্রশিল্পে অভূতপূর্ব সমৃদ্ধি সৃষ্টি করে। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে প্রথমে জাপানী কাপড়ের প্রতিযোগিতা ও পরে ১৯৩০ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দা বস্ত্রশিল্পে সংকট সৃষ্টি করে। ১৯২৭ সালে বস্ত্রশিল্প সংরক্ষণের সুবিধা লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে পুনরায় এ শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটে। যুদ্ধের পর দেশ বিভাগ জনিত কাঁচামালের অভাব এবং পুরাতন যন্ত্রপাতি ইহার অগ্রগতি ব্যাহত করে।

খ গুরুত্ব (importance) : নিম্নলিখিত কারণে তুলাবস্ত্র শিল্প ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

১. ভারতের শিল্পগুলির মধ্যে ইহা সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান করিতেছে (প্রায় ৯ লক্ষ শ্রমিক)।

২. ভারতের তুলাতাঁত শিল্পে নিযুক্ত প্রায় ১ কোটি তাঁতীকে সুতা yarn সরবরাহ করিয়া তাহাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিতেছে।

৩ ইহাতে বর্তমানে প্রায় ১২২ কোটি টাকা পুঁজি খাটিতেছে এবং এই পুঁজির প্রায় সমগ্র অংশই ভারতীয় মালিকানা ও পরিচালনার অধীন।

৪. ভারতের বিদেশীমুদ্রা অর্জনকারী শিল্পগুলির মধ্যে ইহার স্থান তৃতীয় (১৯৬০-৬১ সালে অর্জিত বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ ৫৭ কোটি টাকারও অধিক, যদিও ১৯৬৩ ৬৪ সালে ইহা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়া প্রায় ৫৯ কোটি টাকাতে দাঁড়ায়)।

৫. বিশ্বের বস্ত্রের বাজারে ভারত দ্বিতীয় রপ্তানিকারী দেশ।

গ বর্তমান অবস্থা (present position) : ১৯৬৩ সালের প্রথমদিকে ভারতে ৫১০টি কাপড়ের কল ছিল। ইহাদের সকলের আয়তন এক রকমের নহে। ঐ সময়ে মাকুর সংখ্যা ছিল ১.৪১ কোটি এবং তাঁত ছিল ২ লক্ষ (তন্মধ্যে স্বয়ংক্রিয় তাঁতের সংখ্যা ১৫,০০০)। পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে (১৯৫১-৬১) বস্ত্রের মোট উৎপাদন ৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬১ সালে ৫১২.৭ কোটি গজে পরিণত হইলেও কিন্তু পরবর্তী দুই বৎসর ধরিয়া বস্ত্রের উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া ১৯৬৩ সালে ইহা ৪৮৩.৬ কোটি গজে পরিণত হয়।

ঙ. অগ্রগতি ও সম্ভাবনা (progress and prospects) : ১. অগ্রগতি : ১৯৫০-৫১ সালের কাঁচাপাটের উৎপাদন ৩৩ লক্ষ গাঁইট হইতে বাড়িয়া ১৯৬১-৬২ সালে ৬৪ লক্ষ গাঁইটে (ভারতে ইহাই সর্বকালের সর্বোচ্চ উৎপাদন) পৌঁছায়। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে উৎপাদন যথাক্রমে ৫৪ লক্ষ এবং ৫৯ লক্ষ গাঁইটে দাঁড়ায়। ১৯৬৩ সালে ১২.৮৮ লক্ষ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইদানীং কালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন একরূপ স্থিতাবস্থা লাভ করিয়াছে। তবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। অক্টোবর '৬৩ হইতে সেপ্টেম্বর '৬৪—এই এক বৎসরে এই রপ্তানির মূল্য ১৭০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

২. সম্ভাবনা : নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও চটকল শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উজ্জ্বল। কারণ অন্যান্য পবিবর্ত সামগ্রী উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও পাটের মত এত সস্তা ও টেকসই দ্রব্য অদ্যাবধি উৎপন্ন হয় নাই। বারংবার একই চটের থলি ব্যবহারের সুবিধা, অত্যন্ত অল্প দাম এবং আধুনিক শিল্পযুগে পাটজাত নানাবিধ দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার প্রভৃতির দরুন পাটজাত দ্রব্যের ভবিষ্যৎ বাজার যথেষ্ট সম্ভাবনাময় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। উপরন্তু আরো একটি ঘটনা হইতে চটকলশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। ১৯৩৯ সাল হইতে একটি কার্য-সময় সংক্রান্ত চুক্তি (working time agreement) চটকলশিল্পে প্রচলিত ছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতীয় চটকল মালিক সমিতি (IJMA) উহার সদস্য চটকলগুলির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিত। এবং এই উদ্দেশ্যে (বাজারের অবস্থা অনুযায়ী) চটকলগুলিতে কত তাঁত চালু থাকিবে এবং সপ্তাহে কত ঘণ্টা করিয়া কলগুলি কাজ করিবে তাহাও এই চুক্তির দ্বারা সমিতি নির্ধারণ করিত। উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি এই যে, ১৯৬৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরিয়া প্রচলিত চুক্তিটি রদ করা হইয়াছে। ইউরোপে ও আমেরিকার প্রধান দেশগুলিতে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান কর্মতৎপরতা ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের ভবিষ্যৎ বাজারের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতর করিয়াছে বলিয়াই ঐ চুক্তি রদের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

লৌহ-ইস্পাত শিল্প
IRON & STEEL INDUSTRY

ক. অতীত ইতিহাস (brief history) : ১৮৩০ সালে দক্ষিণ আর্কটে আধুনিক পদ্ধতিতে লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৮৭৪ সালে ঝরিয়া কয়লাক্ষেত্রে বরাকর লৌহ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৯ সালে উহা বেঙ্গল আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী কিনিয়া লয়। ১৯০০ সালে উহার উৎপাদন হয় ৩৫০০০ টন। ১৯০৭ সালে বিহারের সাকচীতে জামসেদজী টাটা, টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হইতেই প্রকৃতপক্ষে ভারতে আধুনিক লৌহ-ইস্পাত শিল্পের আরম্ভ হয়। ১৯০৮ সালে আসানসোলের নিকটে হীরাপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৯২৩ সালে ভদ্রাবতীতে মহীশূর লৌহ-ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ সালে লৌহ-ইস্পাত শিল্পে সংরক্ষণ প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৯ সালে ভারতে উৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮ লক্ষ টন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শিল্পটি আরও উৎসাহ পায়। ১৯৪৭ সালে ১৩ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড ও ৮.৯ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। ১৯৫০ সালে লৌহপিণ্ড ও ইস্পাতের উৎপাদন দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫ লক্ষ টন ও ১০ লক্ষ টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে লৌহপিণ্ড ও ইস্পাতের উৎপাদন ৪৯ লক্ষ ও ২৮ লক্ষ টন অতিক্রম করে।

খ. গুরুত্ব (importance) : লৌহ-ইস্পাত দেশের শিল্পায়নের মৌল কাঁচামাল। ইহার উপর অন্যান্য শিল্পের বিকাশ নির্ভর করে। সেজন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় লৌহ-ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। ভারতের ক্রমবর্ধমান

শিল্পায়নের জন্য লৌহ-ইস্পাতের চাহিদা বাড়িতেছে। ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অতিরিক্ত লৌহ-ইস্পাত বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজারও রহিয়াছে।

গ. বর্তমান অবস্থা (present position): ১৯৫৭ সালে দেশে ছোট ও বড় সর্বমোট লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৪৭। সে বৎসর শিল্পটিতে ৮১·০৬ কোটি টাকা স্থির পুঁজি ও ৩৯·৭৪ কোটি টাকা চলতি পুঁজি এবং ৭৩ হাজার শ্রমিকসহ মোট ৯০ হাজারের অধিক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। ঐ বৎসর মোট উৎপন্ন লৌহপিণ্ড ও ইস্পাতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ও ১৩ লক্ষ টন। ১৯৬৩ সালে ৬৭ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড ও ৪৩ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে।

ঘ সরকারী নীতি ও অগ্রগতি (Government's policy and progress): ১৯৫২ সালে ভারত সরকার নিজ শিল্পনীতির অনুসরণে বেসরকারী লৌহ-ইস্পাত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনক্ষমতার সম্প্রসারণ এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় নূতন লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইহার ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৮৪·৯ কোটি টাকা ব্যয়ে টাটা কোম্পানীর ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা ৮ লক্ষ টন হইতে বাড়াইয়া ১৫ লক্ষ টন করা হয় এবং ৪২·৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লক্ষ টন হইতে ৮ লক্ষ টন করা হয়। বেসরকারী লৌহ-ইস্পাত উৎপাদন ক্ষেত্রে এই দুইটিই প্রধান প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকারীক্ষেত্রে রুরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে তিনটি নূতন লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয় এবং মহীশূরের সরকারী লৌহ-ইস্পাত কারখানার উৎপাদনও ১ লক্ষ টন করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ১ কোটি টন ইস্পাতপিণ্ড ও ১৫ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড বিক্রয়ের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বেসরকারী ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইবে ৩২ লক্ষ টন ইস্পাতপিণ্ড, বাকি অংশ সরকারী ক্ষেত্রে। ইহার জন্য রুরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুরের কারখানাগুলির সম্প্রসারণ ও বোকারোতে চতুর্থ সরকারী লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হইবে। নাইভেলীতেও একটি সরকারী লৌহপিণ্ড উৎপাদনকারী কারখানা স্থাপিত হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী লৌহ-ইস্পাত উৎপাদন ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্য আনুমানিক ৫২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে। লক্ষ্যানুযায়ী কার্য সম্পন্ন হইলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতে ২·৪১ কোটি টন ইস্পাত উৎপন্ন হইবে।[১]

রাষ্ট্রীয় লৌহ-ইস্পাত কারখানাগুলি হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড নামে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে গঠিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে।

ঙ. সমস্যা (problems): বর্তমানে শিল্পটির সম্প্রসারণের সম্মুখে কয়েকটি প্রধান সমস্যা রহিয়াছে। প্রথমটি হইল প্রয়োজনীয় **পুঁজির সমস্যা**। বেসরকারী ক্ষেত্রে ইহার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণ সংগৃহীত হইয়াছে। আর সরকারীক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েত ও বৃটেনের সহযোগিতা গৃহীত হইয়াছে। বোকারোতে নূতন ইস্পাতের কারখানা স্থাপনে মার্কিন সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুত সাহায্য দিতে অস্বীকার করায় ইদানীং সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট হইতে সাহায্য লাভের চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সমস্যাটি হইল **ধাতুশিল্পের উপযোগী কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট**

১. Third Plan. p. 407.

হইছে। সেজন্য উৎকৃষ্ট কয়লার সংরক্ষণ ও ধাতুশিল্পে নিকৃষ্ট কয়লা ধৌত করিয়া ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছে। এ কারণে কয়েকটি কয়লা ধৌতকরণ কারখানা বসান হইয়াছে। ইহা ছাড়া **উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের অভাব** ও উপযুক্ত **পরিবহণের সমস্যা**ও রহিয়াছে।

কয়লা খনি শিল্প
COAL MINING INDUSTRY

ক. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (brief history): রাণীগঞ্জে ১৮১৪ সালে খনি হইতে প্রথম কয়লা উত্তোলিত হয়। উহার পর রেলপথ স্থাপনের ফলে কয়লা খনিশিল্প উৎসাহিত হইলে, ইহাতে যৌথ-মূলধনী কারবারের আকারে খনিশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে থাকে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই ছিল বৃটিশ পুঁজি দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত। ১৮৬৮ হইতে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসরে ভারতে কয়লার উৎপাদন ৫ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টনে পরিণত হইয়াছে।

খ. গুরুত্ব (importance): কয়লা শক্তির অন্যতম বহু-ব্যবহৃত উৎস। ভারতে রেলপথ পরিবহণ ও শিল্পায়নের দ্রুত বৃদ্ধির দরুন ক্রমান্বয়ে কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে। শক্তি উৎপাদন ছাড়া, কয়লা হইতে গ্যাস ও অন্যান্য নানাপ্রকার উপজাত মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ঐ সকল উপদ্রব্য অন্যান্য শিল্পের আবশ্যকীয় কাঁচামাল। ভারতের বর্তমান শিল্পোন্নয়নের কার্যক্রমে এজন্য কয়লার গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সেজন্য কয়লা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরকারী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

গ. বর্তমান অবস্থা (present position): বর্তমানে ভারতে কার্যরত ৮৪৩টি কয়লা খনি রহিয়াছে। উহাতে ৩·৬৬ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। এদেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রায় ৩৫ হাজার বর্গমাইল ব্যাপী অঞ্চলে কয়লা খনি রহিয়াছে। উহাতে মজুদ কয়লার পরিমাণ আনুমানিক ৬ হাজার কোটি টন।

শিল্পনীতির অনুসরণে ভারত সরকার কয়লাখনি শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ভার রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উপর অর্পণ করিয়াছেন। ইহার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে কয়লাখনি শিল্পের ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৫৬ সালে জাতীয় কয়লা উন্নয়ন করপোরেশন লিমিটেড গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খনি পরিচালনা ও নূতন খনি প্রতিষ্ঠা করাই ইহার কার্য। ইহা ছাড়া বাকি অংশে পুরাতন বেসরকারী কয়লা খনিগুলিও রহিয়াছে। এইরূপে বর্তমানে কয়লা খনি শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রই সহাবস্থান করিতেছে।

ঘ. অগ্রগতি (progress): প্রথম পরিকল্পনায় কয়লা খনি শিল্পের জন্য কোন কার্যক্রম গৃহীত হয় নাই। কারণ তৎকালে কয়লার চাহিদা পূরণের ক্ষমতা খনিগুলির ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় শিল্প ও পরিবহণ সম্প্রসারণের কার্যক্রমের সহিত সংগতি রাখিয়া ৬ কোটি টন পর্যন্ত কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হয় (১৯৫৫ সালের উৎপাদন ছিল ৩·৮২ কোটি টন)। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ১২ কোটি টন ও বেসরকারী ক্ষেত্রে ১ কোটি টন উৎপাদন বাড়ান হইবে বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার দরুন দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কয়লা খনি শিল্পের উৎপাদন-লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই। ১৯৬৩ সালে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে।

ঙ. বর্তমান সমস্যা (present problems): কয়লা খনি শিল্পের বর্তমান সমস্যাগুলি নিম্নরূপ—১. বেসরকারী কয়লাক্ষেত্রের সমস্যা। ২. রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লা ক্ষেত্রের সমস্যা। ৩. পরিবহণ সমস্যা। ৪. উৎকৃষ্ট কয়লার অভাব। ৫. নিঃশেষিত কয়লা খনিগুলির ভরাটকরণ।

১. **বেসরকারী কয়লাক্ষেত্রের সমস্যা:** ভারতের বেসরকারী কয়লা খনির প্রতিষ্ঠানগুলির সর্বপ্রধান সমস্যা উহাদের স্বল্পায়তন। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়াতেই ভারতের অধিকাংশ ক্ষুদ্রাকার কয়লা খনি অবস্থিত। ভারতের কয়লা খনি প্রতিষ্ঠানগুলির ৪০ শতাংশই অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার। ইহাদের যন্ত্রপাতি অপর্যাপ্ত ও পুরাতন এবং কারিগরি জ্ঞানেরও যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এজন্য উৎপাদন অত্যন্ত কম এবং উত্তোলন ব্যয় অত্যন্ত বেশি। খনিগুলির অধিকাংশই অ-লাভজনক।

২. **রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাক্ষেত্রের সমস্যা:** দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনির সম্প্রসারণের কার্যক্রম রূপায়িত করিতে গিয়া যে সকল অসুবিধা দেখা গিয়াছে তাহা এই— ক. কার্যত সম্পূর্ণ জনহীন অঞ্চলে নূতন কয়লা খনি প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছে। খ. নূতন খনি অঞ্চল জরীপ, খনির কার্যারম্ভের জন্য স্থান নির্বাচন ও ঐ সকল স্থান দখল করিতে বহু সময় লাগিয়াছে। গ. রাষ্ট্রায়ত্ত খনি পরিচালনার সংগঠনটি প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই গঠন করিতে হইয়াছে। এবং এজন্য অভিজ্ঞ কর্মচারীর প্রচণ্ড অভাব অনুভূত হইয়াছে। ঘ. রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের খনিযন্ত্রপাতি আমদানি করিতে বিদেশী মুদ্রার অভাবের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

৩ **পরিবহণ সমস্যা:** উত্তোলিত কয়লা খনিমুখ হইতে ব্যবহারকারী অঞ্চলে আনয়নের বেলায় রেলপথ পরিবহণের মালগাড়ির দ্রুত চলাচলের অভাবে খনিগুলিতে অত্যধিক মজুদের সংকট দেখা দেয়।

৪. **উৎকৃষ্ট কয়লার অভাব:** ভারতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা, এবং বিশেষত ধাতুশিল্পের উপযোগী কয়লার অভাব থাকায় এই প্রকার কয়লার সংরক্ষণ ও উহাদের স্থলে নিকৃষ্টতর কয়লার ব্যবহারের প্রয়োজন রহিয়াছে। এজন্য আবার কয়লা ধৌতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

৫ **নিঃশেষিত কয়লাখনির ভরাটকরণ** (stowing): কয়লাখনিগুলি হইতে কয়লা উত্তোলিত হইবার ফলে যখন খনিগহ্বর নিঃশেষিত হইতে থাকে তখন খনির উপরিভাগ যাহাতে ধসিয়া না পড়ে সেজন্য খনিগর্ভ বালি দিয়া ভরাট করিতে হয়। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ। বেসরকারী খনি-মালিকগণ ব্যয়-সংকোচের জন্য এ দায়িত্ব উপযুক্তরূপে পালন করে না। ইহাতে প্রায়ই খনি অঞ্চলে দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

চ. প্রতিকার ও গৃহীত ব্যবস্থা (remedies and measures adopted):
১. ক্ষুদ্রকার বেসরকারী কয়লাখনি প্রতিষ্ঠানগুলির একীকরণ (amalgamation) দ্বারা বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উন্নত যন্ত্রপাতি প্রবর্তন ও ব্যয়সংকোচ সম্ভব হইবে। ১৯৫৫ সালে এজন্য শ্রীবলবন্ত রায় মেহ্তার সভাপতিত্বে কয়লাখনিসমূহের একীকরণ কমিটি নিযুক্ত হয়। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। কমিটি ক্ষুদ্রাকার কয়লাখনিগুলির একীকরণ, পুনর্গঠন ও উন্নয়নের সুপারিশ করেন। ১৯৬১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৭টি একীকরণ সম্পাদিত হইয়াছে।[১] যে সকল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় একীভূত হইতে সম্মত নহে উহাদের একীকরণে বাধ্য করিবার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় আইন পাস করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

২. রাষ্ট্রায়ত্ত কয়লাখনিগুলির যে সমস্যা তাহা নিতান্ত সাময়িক; জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে ঐগুলি অনেকাংশে অপসারিত হইবে।

১. Third Five Year Plan. p. 513.

৩. কয়লা শিল্পের যন্ত্রীকরণের সমস্যাটি গভীর। ইহার জন্য অধিক পুঁজি, বৃহদায়তন সংগঠন এবং শ্রমিকগণের কারিগরি জ্ঞানের উন্নতি প্রয়োজন। জাতীয় কয়লা উন্নয়ন করপোরেশন গঠন ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির একীকরণের দ্বারা ইহার পথ সুগম হইতেছে। তবে বিদেশ হইতে যন্ত্র আমদানি করিবার পথে বিদেশী মুদ্রার অভাব একটি প্রবল বাধা রহিয়া গিয়াছে।

৪. কয়লাসংরক্ষণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা (coal conservation): ক. ১৯৫২ সালে কয়লাখনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন পাস করিয়া নিরাপত্তা ছাড়াও কয়লা সংরক্ষণের সহায়তার নিমিত্ত কয়লাখনির বাধ্যতামূলক ভরাটকরণের (stowing) ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। খ. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪টি কেন্দ্রীয় কয়লাধৌতকরণ কারখানা ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অধীনস্থ একটি কয়লাধৌতকরণ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। উহার মধ্যে দুর্গাপুর ও কারগলিতে ২টি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। অন্য তিনটি স্থাপনের কাজ তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথমদিকে শেষ হইবে। গ. কোককয়লা সংরক্ষণের জন্য উহার সহিত নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা মিশ্রিত করিয়া দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় ব্যবহার করা হইতেছে।

ছ. তৃতীয় পরিকল্পনা ও কয়লাখনি শিল্প: ১. তৃতীয় পরিকল্পনা কালে তাপবিদ্যুৎ, রেলপথ উন্নয়ন এবং লৌহ-ইস্পাত, সিমেণ্ট ও অন্যান্য শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সংগতি রাখিয়া কয়লাখনি শিল্পের উৎপাদন লক্ষ্য ৯·৮৬ কোটি টন ধার্য করা হইয়াছে। ২. এজন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নূতন কয়লাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা এবং তজ্জন্য প্রায় ১০৩ কোটি টাকা[১] পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে। এসম্পর্কে বৃটেন, পোল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে কারিগরি সহায়তা আহ্বান করা হইয়াছে। বেসরকারী কয়লাক্ষেত্রেও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে ৬০ কোটি টাকা পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে।[২] ৩. কয়লা-শিল্পের কারিগরি জ্ঞানের উন্নতির জন্য কয়লাশিল্প সম্পর্কে কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা-বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইতেছে। ৪. দ্রুত কয়লা চলাচলের নিমিত্ত রেলপথ, সড়ক ও জলপথ পরিবহণের উন্নতির ব্যবস্থাও গৃহীত হইতেছে। ৫. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত কয়লাধৌতকরণ কারখানা স্থাপনের কার্য ও লক্ষ্য ১৯৬৩ সালে সম্পূর্ণ হইয়াছে। পুরাতন কয়লা ধৌতকরণ কারখানা সম্প্রসারণ এবং, আরও ছয়টি নূতন কয়লা ধৌতকরণ কারখানা স্থাপিত হইবে।

১. Third Five Year Plan. p. 521
ibid. p. 522.

৪

শিল্পায়নের কতিপয় আধুনিক সমস্যা
Some Modern Industrial Problems

এই অধ্যায়ে ভারতের শিল্পায়নের কয়েকটি আধুনিক সমস্যার আলোচনা করা যাইতেছে। এইগুলি হইতেছে: ১. শিল্পসংস্কার (rationalisation) ; ২. শিল্পের স্থান নির্বাচন (location) ; ও ৩. উৎপাদিকা শক্তির (productivity) সমস্যা।

শিল্প সংস্কার
RATIONALISATION OF INDUSTRY

১. উৎপত্তি (origin) : শিল্প সংস্কার (Rationalisation) কথাটি বর্তমান শতাব্দীর প্রথমদিকে জার্মানী হইতে ধীরে ধীরে ইয়োরোপের বিভিন্ন শিল্পপ্রধান দেশসমূহে লক্ষণ প্রচারিত ও জনপ্রিয় হইয়া উঠে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে শিল্প ও অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত জার্মানীতে শিল্প ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রশ্ন গুরুতর হইয়া উঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডের সহিত প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট আন্তর্জাতিক বাজার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য জার্মানীর শিল্পগুলির বিজ্ঞানসম্মত ও সুসংবদ্ধ সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা মূলত জাতীয় উৎপাদিকা শক্তির (productivity at the national level) উপর নির্ভর করে। শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি দক্ষতাসম্পন্ন, সুসংবদ্ধ, পরস্পরের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ও সহযোগিতাসম্পন্ন না হইলে জাতীয় উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পায় না।

২. শব্দার্থ ও প্রয়োগক্ষেত্র (meaning and scope) : শিল্প সংস্কার শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। ইহার দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার, বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও বিভাগের কার্যাবলীর সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধান, শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা পণ্য বিক্রয়ব্যবস্থা এবং পরিবহণ ও অর্থসংস্থানের উন্নয়ন, এমনকি কারবারের কাঠামোর পরিবর্তন (structural change) ও কারবারী জোট গঠন (combination) পর্যন্ত বুঝায়।

৩. উদ্দেশ্য (object) : সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে অপচয় (waste) এবং অদক্ষতা দূর করিয়া সর্বাধিক ব্যয়সংকোচ লাভ করাই শিল্পসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য।

শিল্প সংস্কারের যৌক্তিকতা : প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
RATIONALE OF RATIONALISATION : NEED & IMPORTANCE

চারিপ্রকার সুফলদায়ী বলিয়া শিল্প সংস্কার আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এই কারণে উহার গুরুত্ব সবিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সুফলগুলি যথাক্রমে : ১. শিল্প বা শিল্পপতিগণের সুবিধা। ২. শ্রমিকগণের সুবিধা। ৩. ভোগকারিগণের সুবিধা। ৪. সমগ্র দেশ বা সমাজের সুবিধা।

১. শিল্প বা শিল্পপতিগণের সুবিধা (advantages to the industry or employers) : ক. উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট মান প্রবর্তন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা ও বিশেষায়ণ বৃদ্ধির দরুন অপচয় হ্রাস ও বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সংকোচ বাড়ে। খ. যন্ত্রীকরণ, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, সরলীকরণ প্রভৃতির দরুন শিল্পের দক্ষতা ও উৎপাদিকা শক্তি বাড়ে। গ. বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বৃহদায়তন উৎপাদন ও বিশেষায়ণ এবং

যন্ত্রীকরণের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বাড়ে। ঘ. দুর্বল, ক্ষুদ্র ও অদক্ষ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস করিয়া বৃহৎ শক্তিশালী সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান গঠনে ও চাহিদার সহিত উৎপাদনের সামঞ্জস্যের সুবিধা হয় বলিয়া শিল্পের স্থিতি (Stability) বাড়ে। ঙ. শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জোটগঠন প্রভৃতির ফলে আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অপচয়মূলক অনাবশ্যক তীব্র প্রতিযোগিতা দূর হয়। চ. প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতা ও জোটগঠন দ্বারা বিক্রয় খরচ (selling cost) কমে। ছ. বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় বলিয়া বিশেষায়ণ প্রভৃতির দরুন যন্ত্রপাতির সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয়। জ এই সকল কারণে সামগ্রিক ফল হিসাবে পণ্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস পাইয়া শিল্পের প্রতিযোগিতা-শক্তি বাড়ে। ঝ. বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্পজোট গঠিত হওয়ায় বাজারে উহারা অধিক ঋণের সুবিধা পায় এবং নিজেরাও অধিক পরিমাণে গবেষণা প্রভৃতির জন্য বেশি ব্যয় করিতে সমর্থ হয়।

২ **শ্রমিকগণের সুবিধা** (advantages to the employees): ক. বিশেষায়ণ, যন্ত্রীকরণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির দরুন শ্রমিকগণের দক্ষতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। খ. ইহাতে তাহাদের উপার্জন ও জীবনযাত্রার মান বাড়ে। গ. বিবিধ শিল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, যন্ত্রীকরণ ও বিশেষায়ণের জন্য শিল্পের মধ্যে বিবিধ প্রক্রিয়া বা কাজের মিল বাড়ে। ঘ. সেজন্য শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি পায়।

৩. **ভোগকারিগণের সুবিধা** (advantages to the consumers): শিল্পসংস্কারের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও উৎপন্নদ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় বলিয়া ভোগকারিগণ স্বল্পদামে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় ও ভোগে সমর্থ হয়।

৪. **সমগ্র দেশ বা সমাজের সুবিধা** (advantages to the society): পণ্যের মূল্য হ্রাস, উৎকর্ষ বৃদ্ধি, শ্রমিকগণের দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধির ফলে শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বাজারে পণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় ও তাহাতে উত্তরোত্তর দেশের কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও জাতীয় আয় বাড়িতে থাকে। দেশীয় সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত হয় এবং শিল্পের স্থিতি বাড়ে বলিয়া দেশের অর্থনৈতিক স্থিতি ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।

শিল্প সংস্কারের অন্তরায়
OBSTACLES TO RATIONALISATION

শিল্প, শ্রমিক, ভোগকারী এবং জাতীয় স্বার্থ, সকল দিক হইতেই শিল্প সংস্কারের বাঞ্ছনীয়তা সত্ত্বেও সকল দেশেই শিল্পপতি ও শ্রমিক, এই দুই পক্ষ হইতে ইহার বিরোধিতা দেখা যায়।

ক. **শিল্পপতিগণের বিরোধিতা:** ১. ইহাতে পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিত্যাগ করিতে যেমন পুরাতন বিনিয়োজিত পুঁজি বিনষ্ট হয় তেমনি নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয় ও আনুষঙ্গিক পরিবর্তনে যথেষ্ট পরিমাণে নূতন পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। ভবিষ্যতে ইহার ফলে উপযুক্ত মুনাফা আর্জিত হইবে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চয়তার অভাবে শিল্পপতিগণ শিল্প সংস্কারে উৎসুক হয় না। ২. ইহার জন্য যেরূপ অধিকপরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন তাহার সংস্থানও সহজ নহে। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ৩. শিল্প সংস্কারের দ্বারা শিল্পের পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপাদন ব্যয় ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির ও সমগ্র শিল্পটির যে পূর্বতন ভারসাম্য ছিল তাহার

আমূল পরিবর্তন ঘটিবে। নূতন অবস্থায় কোথায় কিরূপভাবে কোন্ প্রকারের ভারসাম্য দেখা দিবে, তাহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশেষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা অনিশ্চিত বোধ হয় বলিয়া পুরাতন নিশ্চিত অবস্থা পরিত্যাগ করিতে শিল্পপতিগণ অনিচ্ছুক হয়। ৪. আধুনিককালে সকল দেশেই জাতীয়করণের ঝোঁক দেখা যাইতেছে। প্রচুর অর্থব্যয়ে শিল্পসংস্কারের পর যদি শিল্পের জাতীয়করণ ঘটে সে আশঙ্কাও বেসরকারী শিল্পসংস্কারে নিরুৎসাহিত করে।

খ. **শ্রমিকগণের বিরোধিতা:** ১. ইহাতে শ্রমিকগণের উপর কাজের চাপ যেরূপ বৃদ্ধি পায় তাহাদের মজুরি সেরূপ বাড়ান হয় না। ২. ইহাতে পুরাতন শ্রমিকগণের একাংশের কর্মচ্যুতি অনিবার্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রতি বৎসর ১৪ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হইতেছে। এই কারণে ভারতের সকল শ্রমিক সংগঠনগুলিই কমবেশি পরিমাণে শিল্পসংস্কারের বিরোধিতা করিতেছে এবং ইহার প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্মঘটও হইয়াছে।

ভারতে শিল্পসংস্কার
RATIONALISATION IN INDIA

ভারতে শিল্পসংস্কার আন্দোলন বেশি দিনের নহে। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ ও চতুর্থ দশকের প্রথমভাগে বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রভাবে যখন প্রধান প্রধান ভারতীয় শিল্পসমূহের অবস্থা খারাপ হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িল তখন ব্যয়সংকোচ করিয়া মূল্যহ্রাসের প্রক্রিয়া কাটাইবার জন্য শিল্পসংস্কারের প্রয়োজনীয়তার দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৩২ সালে শুল্কপর্ষদ (Tariff Board) তুলাবস্ত্র শিল্পের সংরক্ষণের দাবি বিবেচনা করিতে গিয়া উহার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। ইহার পর বস্ত্রশিল্পের মালিক সমিতি কয়েকটি তুলাবস্ত্রশিল্পে শিল্পসংস্কারের চেষ্টা করেন। কিন্তু অচিরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় উহা বেশি অগ্রসর হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পুনরায় ভারতে শিল্পসংস্কারের দাবী তীব্র হইয়া ওঠে। কারণ এই সময়ে ভারতীয় শিল্পগুলির অধিক উৎপাদন ব্যয় ও নিম্নমানের দ্রব্য উৎপাদনের ফলে বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে এবং রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা বিশেষ ফল লাভ করে না। স্বাধীনতালাভের পর সরকার শিল্পসংস্কার উৎসাহদানের নীতি গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাকালে শিল্পসংস্কারের কাজ বিশেষভাবে অগ্রসর হয়। এ সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে ভারতের শিল্পগুলির মধ্যে কয়েকটি শিল্পে শিল্পসংস্কার বিশেষভাবে প্রসারিত হইয়াছে। যথা, চটকল, তুলাবস্ত্র কাগজ ও চিনি শিল্প

চটকলে শিল্পসংস্কার
RATIONALISATION OF THE JUTE MILL INDUSTRY

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন কারণে ভারতের চটকল শিল্পে সংস্কার অপরিহার্য হইয়া পড়ে

ক প্রয়োজনীয়তা (necessity): ১. অধিকাংশ পুরাতন যন্ত্রপাতি। ২. অধিক উৎপাদন ব্যয়। ৩. উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষের অভাব। ৪. ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেখানে চটকল শিল্প রহিয়াছে, এবং চটকলের শিল্পসংস্কারের ফলে বিশ্ববাজারে উহাদের প্রতিযোগিতাশক্তি বৃদ্ধি। ৫. ব্রাজিল, পাকিস্তান, জাপান, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে আধুনিক উন্নত চটকল শিল্পের আবির্ভাবের ফলে বিশ্ববাজারে নূতন প্রতিযোগীর আবির্ভাব। ৬. বিশ্ববাজারে চটের ও চটের থলির প্রতিযোগী হিসাবে সস্তাদামের পরিবর্তক দ্রব্যের আবির্ভাব। ভারতের চটকলশিল্পে এই অসুবিধাগুলি বর্তমান।

ভারতের চটকল শিল্প বর্তমানে দেশের প্রধান বিদেশী মুদ্রা উপার্জনকারী শিল্প। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ইহা সর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত শিল্প। বিনিয়োজিত পুঁজি এবং নিযুক্ত শ্রমিক

সম্পদ ও চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় শিল্পের সর্বাধিক উৎপাদন সম্ভব। স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, আঞ্চলিক ভাবে দেশের সর্বত্র কর্মসংস্থানের সুষমবণ্টন ও বৃদ্ধি, বিভিন্ন অঞ্চল ও রাজ্যের মধ্যে আয়ের সামঞ্জস্য বিধান এবং সকল অঞ্চলের সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নে জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি প্রভৃতি সুবিধালাভ করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজনীয় সরকারী বিবিধ ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে।

ঙ. **গৃহীত সরকারী নীতি ও ব্যবস্থা (policies & measures adopted by the Government):** ভারতের শিল্পায়ন কর্মসূচীতে শিল্পগুলির আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ১৯৫২ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে নবস্থাপিত শিল্পের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে নূতন অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় আশা করা হইয়াছিল যে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্প্রসারণের ফলে নূতন অঞ্চলে শিল্প প্রসারের সুযোগ বাড়িবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নূতন অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠার ও ভারসাম্যবিশিষ্ট আঞ্চলিক শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শিল্পায়নের বৈষম্য হ্রাস করিবার নীতি গৃহীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার ফলে নূতন শিল্পের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পে স্বল্পোন্নত অঞ্চলগুলির প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। এজন্য বিশেষত 'শিল্পউপনিবেশ' কার্যক্রমের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা হইতেছে।

ভারতে শিল্পের উৎপাদনশীলতা
INDUSTRIAL PRODUCTIVITY IN INDIA

শিল্পের উৎপাদনশীলতা বলিতে শ্রমিকগণের মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ বুঝান হয়। উৎপাদনশীলতার এইরূপ মাপকাঠি ব্যবহার করে দেখা যায় যে উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে এই ক্ষেত্রে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে।

ভারত সরকার কতৃক প্রণীত হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩৯ সালে ভারতের কারখানা শ্রমিকগণের উৎপাদন ক্ষমতার সূচক সংখ্যা ১০০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪০ সালে উহা ১০৪.২-এ পরিণত হয়। ইহার পর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় (৭২.৫)। অতঃপর ১৯৪৮ সাল হইতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৩ সালে সূচক-সংখ্যা ১০৫.৮-এ এবং ১৯৫৪ সালে উহা ১১৩.তে পরিণত হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শ্রমের উৎপাদনশীলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শিল্পের সুসম্বন্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত সংস্কার দ্বারাই উৎপাদনশীলতার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইহার জন্য শিল্পমালিক, শ্রমিকসংঘ এবং সরকার, এই তিন পক্ষেরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য রহিয়াছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে উহাদের সকলেরই সর্বাধিকতম প্রচেষ্টার দ্বারাই একমাত্র ভারতের দারিদ্র্যের পাপচক্র, কর্মহীনতা এবং স্বল্প উৎপাদনশীলতার অভিশাপ দূর করা সম্ভব। একমাত্র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দ্বারাই শ্রমিকগণের অধিকতর আয়ের ও উচ্চতর জীবনযাত্রার পথ সুগম করা যায়। সেজন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও শিল্প-সংস্কার পদ্ধতির সহিত তাহাদের সহযোগিতা আবশ্যক। তেমনি শিল্পমালিকগণও অনেক সময় মনে করেন যে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইলে শ্রমিকগণের উপর কাজের চাপ বাড়াইতে হইবে। তবেই তাহাদের মুনাফাও বাড়িবে। ইহাও ভুল ধারণা। ইহার জন্য

প্রয়োজন সুদক্ষ যন্ত্রপাতি, কারখানার অভ্যন্তরে উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি, উপযুক্ত উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ, শ্রমিকগণের কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং শ্রমিকগণকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রণোদিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ও আর্থিক উৎসাহের ব্যবস্থা। এবং এ সকল উৎসাহ দানের ব্যবস্থা এরূপ হওয়া আবশ্যক যেন তাহাতে শুধু ব্যক্তিগতভাবে নহে, সমষ্টিগতভাবে সকল শ্রমিকগণই উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ হয়।

ভারতের শিল্প-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

MEASURES ADOPTED FOR RAISING INDUSTRIAL PRODUCTIVITY IN INDIA

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যার সহিত শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহা উপলব্ধি করিয়া প্রথম পরিকল্পনা কালেই এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হয়। ১৯৫২ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা হইতে ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিবিদ্যা [illegible] বিশেষজ্ঞকে ভারতে আমন্ত্রণ করা [illegible] এই বিশেষজ্ঞ দলের অনুসন্ধান [illegible] ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে একটি [illegible] উৎপাদনশীলতা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা [illegible] এবং এজন্য ঐ বৎসর [illegible] একটি [illegible] বিশেষজ্ঞদল [illegible]। ১৯৫৬ সালে জাপানে একটি ভারতীয় উৎপাদনশীলতা [illegible]। প্রত্যাবর্তনের পর দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম সুপারিশ পেশ করে। [illegible] ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর [illegible] একটি [illegible] ইহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ১৯৫৮ [illegible] পরিষদ (NPC) [illegible] করিবার জন্য বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর [illegible] স্থাপিত হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে। ১৯৬০ সালে [illegible] দফা কার্যক্রম [illegible] হয়। [illegible] আশা করা হয়। ১৯৬১ সালে [illegible] ২০টি [illegible] সূচিতে ৪০০০ ম্যানেজার, [illegible] উচ্চপদস্থ ব্যবস্থাপক কর্মচারীগণ ও [illegible] করিয়াছেন। একটি [illegible] একটি [illegible] ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষণের [illegible]।

৫

শিল্পের অর্থসংস্থান
Industrial Finance

আধুনিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠনে ও পরিচালনায় বিপুল পরিমাণ পুঁজির অবিরাম যোগান অত্যাবশ্যক। শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাকে যদি আধুনিক সভ্যতার সঞ্চালিকা শক্তি—হৃদপিণ্ড বলা যায় তবে, শিল্পপুঁজির অবিরাম সরবরাহ উহার প্রাণদায়িকা শক্তি—রক্তের সহিত তুলনীয়। পুঁজির যোগানের প্রাচুর্য বা স্বল্পতার দ্বারা দেশের শিল্পায়নের গতি, প্রকৃতি ও সীমা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

প্রয়োজনীয় পুঁজির প্রকারভেদ
CAPITAL REQUIREMENTS TYPES

শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, পরিচালনা ও সম্প্রসারণ এই তিন প্রকার কারণেই পুঁজির প্রয়োজন। পুঁজির ব্যবহার অনুযায়ী ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য যে পুঁজির দরকার তাহাকে স্থির পুঁজি (fixed capital) ও দৈনন্দিন মজুরি, কাঁচামাল ইত্যাদি চলতি ব্যয়ের জন্য যে পুঁজির আবশ্যক তাহাকে চলতি পুঁজি (Working or Circulating Capital) বলে। উৎপাদন ব্যবস্থা যত বেশি পুঁজিনির্ভর বা পুঁজিঘন (capital intensive) হয় ততই অধিক পরিমাণে স্থির পুঁজির প্রয়োজন হয়। স্থির পুঁজি একবার নিয়োজিত হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিযুক্ত থাকে। এজন্য ইহাকে দীর্ঘমেয়াদী পুঁজি বলে। অপর পক্ষে চলতি পুঁজি এক বৎসরের অধিক দিনের জন্য বিনিয়োজিত থাকে না। উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় দ্বারা উহা ফেরত পাওয়া যায়। এজন্য ইহাকে স্বল্পমেয়াদী পুঁজি বলে। এইরূপে পুঁজিকে দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তবে কখনও কখনও, আবার উহাদের মধ্যবর্তী আর এক প্রকার পুঁজির অস্তিত্ব নির্দেশিত হয় যাহা খুব বেশি দিনের জন্য বিনিয়োজিত না থাকিলেও খুব অল্প দিনের জন্য যে বিনিয়োজিত থাকে, তাহা নহে। এই প্রকার পুঁজিকে মধ্যমেয়াদী পুঁজি বলে।

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের পুঁজির সমস্যা
THE PROBLEM OF CAPITAL IN UNDERDEVELOPED COUNTRIES LIKE INDIA

ক. সাধারণ সমস্যা (**the general problem**)**:** ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পায়নের প্রধান অসুবিধা শিল্প পুঁজির অভাব। এই সকল দেশের জনসাধারণের স্বল্প উৎপাদন-ক্ষমতা ও আয় এবং সেজন্য সঞ্চয়ের স্বল্পতা, আবার, স্বল্পতার দরুন শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার স্বল্পতা, স্বল্পচাহিদার ফলে শিল্পপতিগণের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে অনিচ্ছা, পুঁজির বাজারের সীমাবদ্ধতা, ব্যাঙ্কগুলির শিল্পে ঋণদানে অনিচ্ছা এবং দেশের মুষ্টিমেয় বিত্তশালী শ্রেণীর মধ্যে শিল্পে বিনিয়োগের দ্বারা ঝুঁকি গ্রহণে বিমুখতা ইত্যাদি, ইহাদের পুঁজির চাহিদা ও যোগানকে সীমিত করিয়া স্বল্পোন্নতিকে দীর্ঘস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে।

খ. আধুনিক সমস্যা (**the recent problem**)**:** বর্তমানে পরশাসনমুক্ত ভারতসহ এই সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন নীতি গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু, শিল্পপুঁজির অপ্রতুলতা ইহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। এই সকল দেশে এবং বিশেষত ভারতে, অতীতে একমাত্র বেসরকারী উদ্যোগেই শিল্পায়ন ঘটিয়াছে। কিন্তু

বর্তমানে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ও উচ্চহারে শিল্পায়ন ব্যতীত জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের অসম্ভাব্যতা এবং সে দায়িত্ব পালনে বেসরকারী উদ্যোগের অক্ষমতা ও বেসরকারী উদ্যোগনির্ভর ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কুফল সম্বন্ধে সরকারের চেতনা ভারতে শিল্পায়নে রাষ্ট্রকে উদ্যোগগ্রহণে প্রবুদ্ধ ও প্রবৃত্ত করিয়াছে। এজন্য স্বাধীনতালাভের পর হইতে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে দেশে পুঁজির সমস্যা আরও তীব্র হইয়াছে। ইহার দুইটি দিক: ১. দেশের অভ্যন্তরে পুঁজির উৎস বিকশিত হয় নাই। অথচ শিল্পায়নের তাগিদে বেসরকারী এবং রাষ্ট্রীয় উভয় ক্ষেত্রে পুঁজির চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। পুঁজির মোট যোগান ও মোট চাহিদার ব্যবধান সম্প্রসারিত হইতেছে। ২. তাহা ছাড়া শিল্পায়নের জন্য বিদেশী যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, অপরিহার্য কাঁচামাল ও কারিগরিবিজ্ঞানের আমদানির প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু সেজন্য উপযুক্ত পরিমাণে বিদেশী মুদ্রার সম্বলের অভাব রহিয়াছে।

ভারতের বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে পুঁজির সমস্যা
THE PROBLEM OF CAPITAL IN THE PRIVATE SECTOR IN INDIA

সঠিক উপলব্ধির জন্য ভারতের বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের পুঁজির সমস্যার আলোচনাকে ১. বৃহদায়তন শিল্পের পুঁজির সমস্যা এবং ২. ক্ষুদ্র ও মধ্যায়তন শিল্পের পুঁজির সমস্যা—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন।

১. বৃহদায়তন শিল্পের পুঁজির সমস্যা (the problem of capital of large scale industries): ক **পুঁজির চিরাচরিত উৎস** (traditional sources of capital): এযাবৎ ভারতের বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যে সকল উৎস হইতে পুঁজি সংগ্রহ করিয়াছে তাহা এই,—১. স্থির পুঁজির অর্থসংস্থানের জন্য শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়, আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় অর্থাৎ সঞ্চয় তহবিলের ব্যবহার ও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক হইতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করিয়া উহাকে বার বার মঞ্জুর করাইয়া কার্যতঃ দীর্ঘমেয়াদী ঋণে রূপান্তরিতকরণ। আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গ হইতে এবং দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ এবং ম্যানেজিং এজেন্টগণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ। ২. চলতি পুঁজির অর্থসংস্থানের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ, জনসাধারণের নিকট হইতে মেয়াদী আমানত গ্রহণ ও দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ ও ম্যানেজিং এজেন্টগণ হইতে ঋণ গ্রহণ।

খ. বর্তমান অসুবিধা (present difficulties): স্বাধীনতার পরবর্তীকাল হইতে এবং বিশেষত পরিকল্পনার যুগে পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয় নির্বাহ এবং রাষ্ট্রীয় শিল্পক্ষেত্রের সম্প্রসারণের তাগিদে দেশে সরকারী ঋণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের অধিকাংশ সরকারী ঋণে আকৃষ্ট হইতেছে এবং ব্যক্তিগত ও কোম্পানীগুলির আয়ের ও সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। ফলে বেসরকারী শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য পুঁজির সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্বল্পমেয়াদে ঋণ দিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নহে। জীবনবীমা কোম্পানীগুলির জাতীয়করণের দরুন বেসরকারীক্ষেত্রের দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ও পুঁজির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস অপসারিত হইয়াছে। ইদানীংকালে পুঁজির বাজার সম্প্রসারিত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে কিন্তু ইহাও প্রয়োজনের উপযুক্ত নহে।

২. ক্ষুদ্র ও মধ্যমায়তন শিল্পের পুঁজির সমস্যা (the problem of capital of small and medium scale industries): বৃহদায়তন শিল্পের তুলনায় ভারতের ক্ষুদ্র ও মধ্যমায়তন শিল্পের পুঁজির সমস্যা আরও বেশি তীব্র।

খ. উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র (objects and scope) : শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন কেবলমাত্র ব্যাপকমালিকানার যৌথমূলধনী কারবার (public limited company) ও সমবায় সমিতি—এই দুই প্রকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ঋণদানের ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। দ্রব্য-উৎপাদনে, প্রক্রিয়াজাতকরণে, জাহাজীকারবারে, খনিজশিল্পে, হোটেল পরিচালনায়, বিদ্যুৎ অথবা অন্যান্য শক্তি উৎপাদনে এবং পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণকার্যে (preservation of goods) নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান ইহার নিকট হইতে ঋণ লইতে পারে।

গ. সম্বল (resources) : ইহার সম্বল নিম্নরূপ। **১. শেয়ারপুঁজি** (share capital) : ইহার অনুমোদিত পুঁজি ১০ কোটি টাকার মধ্যে ৮·৩৪ কোটি আদায়ীকৃত (paid up)। আইন অনুসারে শেয়ারের মূল্য ফেরত ও ২½ শতাংশ হারে লভ্যাংশ দান সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি (guarantee) রহিয়াছে। লভ্যাংশের সর্বোচ্চ হার ৫ শতাংশে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তবে করপোরেশনে সঞ্চয় তহবিল (reserve fund) উহার আদায়ীকৃত পুঁজির সমান না হওয়া পর্যন্ত এবং উপরোক্ত সরকারী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রদত্ত সরকারী অর্থ করপোরেশন সরকারকে প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত করপোরেশন সর্বোচ্চহারে লভ্যাংশ দিতে পারিবে না। **২. ঋণপুঁজি** (Debenture capital) : চলতি পুঁজিবৃদ্ধির জন্য করপোরেশন ঋণপত্র বিক্রয় করিতে পারে। তবে ঋণপুঁজি ও করপোরেশন প্রদত্ত নিশ্চয়তা (guarantee) বাবদ উহার মোট দায় আদায়ীকৃত পুঁজি ও সঞ্চয় তহবিলের মোট পরিমাণের দশগুণের বেশি হইতে পারিবে না। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত করপোরেশনের বিক্রীত ঋণপত্রের পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি টাকার বেশি। **৩. আমানত** (Deposit) : রাজ্যসরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নিকট হইতে করপোরেশন অন্যূন ৫ বৎসরের জন্য মোট ১০ কোটি টাকা আমানত গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু এপর্যন্ত এরূপ কোন আমানত গৃহীত হয় নাই। **৪. বিশেষ সঞ্চয় তহবিল :** শক্তি বৃদ্ধির জন্য করপোরেশনের সাধারণ সঞ্চয় তহবিল ছাড়াও অতিরিক্ত একটি বিশেষ সঞ্চয় তহবিল সৃষ্টি করা হইয়াছে। সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাপ্তব্য লভ্যাংশ দ্বারা এই তহবিল সৃষ্ট হইয়াছে। ইহার মোট পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা না হওয়া পর্যন্ত এরূপভাবে সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাপ্তব্য লভ্যাংশ সঞ্চিত হইতে থাকিবে। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে ইহার পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকায় উপনীত হয়। **৫. অন্যান্য ঋণ :** উপরোক্ত সূত্র হইতে সংগৃহীত আর্থিক সম্বল ছাড়াও করপোরেশন ভারতসরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণের মোট পরিমাণ ছিল ৩৫·৬ কোটি টাকা। ১৯৬৩ সালের মার্চ অবধি মোট ২১·৮ কোটি টাকা মূল্যের ঋণ করপোরেশন বিভিন্ন দেশ হইতে পাইয়াছে।

ঘ কার্য (functions) : শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সহায়তার জন্য করপোরেশন নিম্নলিখিত কার্যাবলীর ভারপ্রাপ্ত :—

১. **ঋণপ্রদান :** করপোরেশন অনধিক ২৫ বৎসরের মেয়াদে সম্পত্তির জামিনে অথবা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার কিনিয়া ঋণ দিতে পারে।

২. **শেয়ার ক্রয় :** ১৯৬০ সালে শিল্পঅর্থসংস্থান করপোরেশন আইন সংশোধন করিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিতে ও যে প্রতিষ্ঠানকে ডিবেঞ্চার কিনিয়া অথবা সম্পত্তির জামিনে ঋণ দেওয়া হইয়াছে ইচ্ছা করিলে ঐ ঋণকে ঋণপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার পুঁজিতে রূপান্তরিত করিবার অধিকার করপোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে।

৩. **দায়গ্রহণ** (underwriting): কর্পোরেশন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার স্টক বণ্ড বা ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ইহা সম্পাদনে কর্পোরেশন নিজে কোন শেয়ার বা ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয়ে বাধ্য হইলে অনধিক ৭ বৎসরের মধ্যে উহা বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে।

৪. **নিশ্চয়তাদান** (guaranteeing): সর্বসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ঋণপত্রের জামিনে অনধিক ২৫ বৎসরের মেয়াদে সংগৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইয়া ঋণদাতাকে ঋণ প্রত্যর্পণ সম্পর্কে নিশ্চয়তাদানের ক্ষমতাও কর্পোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিদেশী যন্ত্রপাতি নির্মাতাগণের নিকট হইতে কিস্তিবন্দী শর্তে যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছে উহাদের পক্ষ হইয়া ঋণশোধ সম্বন্ধে বিদেশী বিক্রেতাকে নিশ্চয়তা দান করিতে পারে।

৫. **প্রতিনিধিরূপে কার্য**: কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন উহাদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে।

সুদের হার: ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কর্পোরেশন শতকরা ৫½ টাকা হারে সুদ আদায় করিয়াছে এবং সময়মত কিস্তিপ্রদানে শতকরা ½ টাকা রেয়াত দিয়াছে। পরে সুদের হার বাড়ান হয়। ১৯৬২ সালের জুন হইতে শতকরা ৭½ টাকা হারে সুদ আদায় করা হইতেছে ও পূর্বের মত শতকরা ½ টাকা রেয়াত দেওয়া হইতেছে।

৬. **সম্পাদিত কার্য** (working and achievements): ১. প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৬৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১৬ বৎসরে কর্পোরেশন মোট ১৯৬.৭৮ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। উহার মধ্যে ১২০.১ কোটি টাকার প্রকৃত ঋণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই ঋণের শতকরা ৭০ ভাগ নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বাকি অংশ পুরাতন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতির রদবদল, আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

২. ঋণপ্রাপ্ত শিল্পগুলির মধ্যে চিনি, তুলাবস্ত্র, রাসায়নিক, সিমেন্ট ও কাগজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কাঁচ শিল্প প্রধান।

৩. বিগত ষোল বৎসরে কর্পোরেশনের সাহায্যপ্রাপ্ত মোট ৩৩৪টি প্রকল্পের মধ্যে ২২৭টি প্রকল্পই নূতন। ঐ ৩৩৪টি প্রকল্পের মোট ব্যয় ৫৫০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে কর্পোরেশন ১৯৬.৭৮ কোটি টাকা, বা এক তৃতীয়াংশের বেশী সাহায্য করিয়াছে। কর্পোরেশন যে সকল প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করে তাহারা অন্যান্য সূত্র হইতে কি পরিমাণ মূলধন স্বীয় চেষ্টায় সংগ্রহ করিতে পারে তাহা বুঝিয়া সেই অনুযায়ী সাহায্য করে। কারণ, কর্পোরেশনের কার্যকে বিচার করিতে প্রায়ই এই মানদণ্ড ব্যবহার করা হয়।

৪. ১৯৬৪ সালের জুন অবধি উৎপাদক সমবায় সমিতিগুলি কর্পোরেশনের নিকট হইতে ৩৭.৮৬ কোটি টাকা ঋণ পাইয়াছে। উহাদের অধিকাংশই সমবায় চিনি উৎপাদন সমিতি।

৫. ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে কর্পোরেশন দায়গ্রহণ কার্য আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৬৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ইহা ১২.৩১ কোটি টাকার পরিমাণ দায়গ্রহণ করিয়াছে।

৬. ১৯৫৭-৫৮ সাল হইতে কর্পোরেশন কিস্তিবন্দী মূল্যপ্রদান শর্তে বিদেশী যন্ত্রপাতি আমদানির মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দান কার্য আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৬৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত কর্পোরেশন প্রায় ৩২ কোটি টাকার পরিমাণ নিশ্চয়তা দান করিয়াছে।

৭. কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৬৪র জুন পর্যন্ত মোট বিদেশী মুদ্রা ঋণের পরিমাণ ১৬.৮৯ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ডলার, পশ্চিম জার্মানীর মার্ক ও ফরাসী ফ্রাঁ আছে।

করপোরেশনের আয়-ব্যয় ও ঋণপরিশোধ সংক্রান্ত কার্যাবলীর দ্বারা উহার ক্রমবর্ধমান দক্ষতা ও সাফল্য প্রমাণিত হয়। প্রতিষ্ঠা কাল হইতে এপর্যন্ত উহার মোট আয় বাড়িতেছে ও পরিচালনা ব্যয় কমিতেছে। ইহার ফলে নীট মুনাফার বৃদ্ধির দরুন পুঁজির উপর ২½ শতাংশ হারে লভ্যাংশ দেওয়ার জন্য পূর্বে যে সরকারী সাহায্য (subvention) দেওয়া হইত, তাহার প্রয়োজন দূর হইয়াছে। করপোরেশন সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণও অংশত পরিশোধে সমর্থ হইয়াছে। ঋণপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থার উন্নতিও করপোরেশনের কার্যাবলীর সাফল্যের অন্যতম পরিচায়ক। সম্প্রতিকালে উহাদের মধ্যে কয়েকটি ১২ শতাংশ লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছে। এবং উহাদের মধ্যে সুদ প্রদানে ও আসল প্রত্যর্পণে খেলাপকারীর সংখ্যাও কমিয়াছে।

এপর্যন্ত অনধিক ১৫ বৎসরের মেয়াদে এবং সাধারণত ১২ বৎসরের অনধিককালের মেয়াদেই ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

চ. সমালোচনা (criticisms) : ১৯৫২ সালে পার্লামেন্ট শিল্পঅর্থসংস্থান করপোরেশন আইনের সংশোধন প্রস্তাব আলোচনার সময় শিল্পঅর্থসংস্থান করপোরেশনের কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা হয়। সে সময় উহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয় উহাদের মধ্যে উল্লেখনীয় হইল: ১. স্বজনপোষণ ও পক্ষপাতিত্ব। ২. কতিপয় বৃহৎ শিল্পপতি কর্তৃক ইহার কার্যাবলীতে প্রভাব বিস্তার। ৩. পশ্চাদপদ রাজ্যগুলিতে শিল্পোন্নয়নে ব্যর্থতা। ৪. বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানের প্রতি সদয় মনোভাব। ৫ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন কার্যক্রমের বহির্ভূত শিল্পে ঋণদান এবং ভারী ও মূল শিল্পে অবহেলা ৬. অধিক মুনাফাঅর্জনকারী ও বাজার হইতে ঋণ সংগ্রহে সমর্থ প্রতিষ্ঠানে ঋণদান। ৭ ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তদারকীর অভাব। ৮ ঋণ মঞ্জুর করিতে বিলম্ব। ৯. অধিক পরিচালন ব্যয়। ১০. সাধারণ পুঁজি (equity capital) সরবরাহের ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি। এজন্য শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশনও নিযুক্ত হয়। উহার পরামর্শে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ১৯৬৩ সালে লোকসভায় এস্টিমেটস কমিটি পুনরায় এই বলিয়া ইহার সমালোচনা করে যে, প্রতিষ্ঠাকালে ইহাকে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইতে ইহা বিচ্যুত হইয়াছে এবং ইহা আশানুরূপ কাজ করিতে পারে নাই এবং অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইহা পক্ষপাতিত্ব করিয়াছে।

সম্প্রতি শিল্পঅর্থসংস্থান করপোরেশন আইনের সংশোধন ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া সরকার করপোরেশনের অনেকগুলি ত্রুটি দূর করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হইল ১৯৬০ সালের সংশোধন দ্বারা করপোরেশনের নিকট হইতে ঋণ পাইবার যোগ্য 'শিল্প-প্রতিষ্ঠানের' সংজ্ঞার সম্প্রসারণ ও করপোরেশন কর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পুঁজি (equity capital) সরবরাহের ও বিদেশী মুদ্রায় ঋণদানের ব্যবস্থা। ইতোমধ্যেই বিশেষত দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ দিক হইতে করপোরেশনের ঋণদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে ইহা শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ায় শিল্প উন্নয়নে ইহা আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করিতে পারিবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে।

২. জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশন লিমিটেড

THE NATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

ক. স্থাপনা ও সংগঠন (formation and organisation) : ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে ১ কোটি টাকা অনুমোদিত পুঁজি ও ১০ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত পুঁজি লইয়া একটি সীমাবদ্ধ মালিকানার যৌথমূলধনী কোম্পানীরূপে (Private Limited Company) ইহা গঠিত হয়। ইহার পুঁজির

সবগুলিই ভারত সরকারের। বর্তমানে আদায়ীকৃত পুঁজি ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব। হইয়াছে। ইহার পরিচালনার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ন্যূনতম ১৫ ও সর্বাধিক ২৫ জন সদস্য লইয়া একটি পরিচালক পর্ষৎ আছে।

খ উদ্দেশ্য ও কার্যক্ষেত্র (objects and scope): ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি নির্মাণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং বেসরকারী মালিকানার অধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে উহাদের বর্তমান কারবার পরিচালনায় অথবা নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠায় পুঁজি ও অন্যান্য সম্পদ দ্বারা সাহায্য প্রদান। জাতীয় শিল্পোন্নয়নের জন্য যে সকল শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অথচ মুনাফার অনিশ্চয়তা ও অত্যধিক পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজন বলিয়া যাহা স্থাপিত হয় নাই সে সকল শিল্প স্থাপনে বিশেষ সহায়তা দানই ইহার মূল উদ্দেশ্য।

গ. সম্বল (resources): নিজ পুঁজি ছাড়া ইহা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহ, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ ও সরকারী অনুদান (grant) গ্রহণ এবং শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় দ্বারা আর্থিক সম্বল বৃদ্ধি করিতে পারে।

ঘ. কার্যাবলী (functions) : ১ নিজের উদ্যোগে অথবা শিল্পপতিগণের অনুরোধে নূতন শিল্প স্থাপনের কর্মসূচি পরীক্ষা করা ইহার প্রাথমিক কর্তব্য। ২ অতঃপর বেসরকারী উদ্যোক্তাগণ অনিচ্ছুক হইলে করপোরেশন নিজেই নূতন শিল্পটি স্থাপনের ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। তবে পুঁজিপ্রধান শিল্প ব্যতীত এবং পশ্চাদপদ অঞ্চলে ছাড়া করপোরেশন এরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করে না। ৩ নবস্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানটি আত্মনির্ভর হইলে করপোরেশন উহা বেসরকারী উদ্যোগের নিকট বিক্রয় করিয়া দিবে। তবে প্রয়োজনবোধে উহা নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনেও রাখিতে পারে। ৪. শিল্পোন্নয়নের সংশ্লিষ্ট কর্ম হিসাবে করপোরেশন বেসরকারী ও রাষ্ট্রীয়, উভয় ক্ষেত্রের শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে পারে। ঋণের জন্য করপোরেশন শতকরা ৭ টাকা হারে সুদ আদায় করে। তবে সময়মত কিস্তি জমা দিলে শতকরা ৫ টাকা হারে সুদ আদায় করা হয়। ৫. মনোনীত শিল্প সংক্রান্ত ঋণদান কার্যে করপোরেশন সরকারের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। ৬ ভবিষ্যৎ শিল্পোন্নয়নের নূতন সম্ভাবনা আবিষ্কারে সহায়তার জন্য একদল কারিগরি বিশেষজ্ঞ শিক্ষণ করাও করপোরেশনের অন্যতম কর্তব্য।

ঙ. ক্ষমতা (powers): কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, তদন্ত, পরামর্শদান, পরিচালক সমিতিতে সদস্য নিয়োগ, কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত অংশীদারিত্ব গ্রহণ প্রভৃতির ক্ষমতা করপোরেশনকে প্রদান করা হইয়াছে।

চ. সম্পাদিত কার্য ও সাফল্য (working and achievements):

১. ভারী ঢালাই কারখানা, ইক্ষুর ছোবড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত, রং-এর মালমসলা উৎপাদন, কৃত্রিম রবার উৎপাদন, ছোট যন্ত্রপাতির উপযুক্ত ইস্পাত ও মিশ্র ধাতুর উৎপাদন ইত্যাদি কয়েকটি শিল্প স্থাপন সম্পর্কে বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় করপোরেশন প্রাথমিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছে।

২. ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং কার্যের যন্ত্রপাতি এবং চশমার কাচ উৎপাদন; কাঁচা ফিল্ম, অ্যালুমিনিয়ম ও কৃত্রিম রবার ইত্যাদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন; ঔষধ, রং ও

রসায়ক শিল্পের প্রাথমিক মালমসলা উৎপাদন প্রভৃতি শিল্পস্থাপনের কার্যে করপোরেশন নিযুক্ত রহিয়াছে। এসম্পর্কে রাঁচীতে সোভিয়েত সহায়তায় ভারী যন্ত্রপাতি উৎপাদনশিল্প-প্রতিষ্ঠা ও চেকোশ্লোভেকিয়ার সহায়তায় চশমার কাচের কারখানা স্থাপনের বিষয় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

৩ ভারতে শিল্প সংক্রান্ত নকশা তৈয়ার ও পরামর্শদানকার্যের প্রবর্তনের জন্য করপোরেশন একটি নিজস্ব 'প্রযুক্তিবিন্যাসংক্রান্ত পরামর্শদান সংস্থা' (Technological Consultancy Bureau) প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই সংস্থা বহু শিল্পকে প্রযুক্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে নানাভাবে সহায়তা করিয়াছে।

৪. চটকল ও সুতীবস্ত্র শিল্পের পুনর্বাসন ও যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ২৮ কোটি টাকা ঋণ করপোরেশন মঞ্জুর করিয়াছে। উহার মধ্যে ১৪.৯ কোটি টাকা মিলগুলি প্রকৃতপক্ষে লইয়াছে। যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার তৈয়ার শিল্পে ঐ সময় পর্যন্ত ২ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। একই সময় পর্যন্ত কিস্তিবন্দী মূল্য প্রদানশর্তে দেশীয় যন্ত্রপাতির ক্রয়ের জন্য স্বল্পকালীন ঋণ হিসাবে চটকল ও সুতীবস্ত্র শিল্পে ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে। সম্প্রতি বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতির আমদানির জন্য নিশ্চয়তা ও জামিনের পরিবর্তে ঐ শিল্প দুইটিতে স্বল্পকালীন ঋণদানের আর একটি ব্যবস্থা করপোরেশন প্রবর্তন করিয়াছে। ১৯৬৩ সালে ভারতসরকার স্থির করেন যে তুলাবস্ত্র ও চটকল শিল্পের আধুনিকীকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য আর জাতীয়শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের মাধ্যমে ঋণ না দিয়া শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশনের মারফত দেওয়া হইবে। ১৯৬৪ সালে শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপনের পর, উহাকে এই ভার দেওয়া হইয়াছে।

ছ সমালোচনা (criticism): দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বরাদ্দ ৫৫ কোটি টাকার অতি অল্পই করপোরেশন ব্যবহার করিয়াছে। এবং উহার কার্য ধীর গতিতে অগ্রসর হইয়াছে। তবে ইহার জন্য বিদেশী মুদ্রার সংকটই প্রধানত দায়ী।

৩. শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন লিমিটেড

THE INDUSTRIAL CREDIT & INVESTMENT CORPORATION LTD.

ক স্থাপনা ও সংগঠন (formation and organisation): ভারত সরকারের সমর্থনে বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শে মার্কিন সরকারের সম্মতিতে এবং মার্কিন, বৃটিশ ও ভারতীয় বিনিয়োগকারিগণের সহযোগিতায় ইহা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে ২৫ কোটি টাকার অনুমোদিত পুঁজি লইয়া ইহা ভারতীয় কোম্পানী আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়। ইহার আদায়ীকৃত পুঁজির পরিমাণ ৫ কোটি টাকা। ইহাতে ভারতীয় বিনিয়োগকারিগণের অংশ ১৫ কোটি টাকা, ইংলণ্ডের কমনওয়েলথ উন্নয়ন অর্থ সংস্থান কোম্পানী লিমিটেড মারফত বৃটিশ বিনিয়োগকারিগণের অংশ ১ কোটি টাকা ও মার্কিন বিনিয়োগকারি-গণের অংশ ৫০ লক্ষ টাকা।

খ. উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী (objects and functions): ভারতের বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে ঋণদানের উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। ১. শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, সম্প্রসারণ, ও উহাদের যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণের জন্য ঋণদান, ২. শিল্পপ্রতিষ্ঠানে দেশী ও বিদেশী বেসরকারী পুঁজির অংশ গ্রহণে উৎসাহদান এবং ৩. শিল্পবিনিয়োগক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানাকে উৎসাহিত করা ও পুঁজির বাজারের সম্প্রসারণ প্রভৃতি এই উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। এজন্য করপোরেশন নিম্নোক্ত কার্য সম্পাদন করিতেছে: ১. দীর্ঘ ও মাঝারিমেয়াদী ঋণ সংস্থানের জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিয়া সাধারণ পুঁজি সরবরাহ। ২.

২. উহাদের শেয়ার, স্টক ও বণ্ড বা ডিবেঞ্চার ক্রয় কিনিতে বা উহাদের বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করিতে পারে। নিজে ডিবেঞ্চার কিনিলে তাহা পরে শেয়ার ঐ কোম্পানীর পুঁজিতে রূপান্তরিত করিতে পারে।

৩ শিল্প প্রতিষ্ঠানের দেয় কিস্তির টাকার ও উহারা বাজার হইতে বা তপশীলী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন, রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশন বা অন্যান্য অনুমোদিত লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণ লইয়া থাকিলে ঐগুলির জন্য গ্যারান্টি দিতে পারে।

৪. শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন, রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশন, বা অন্যান্য অনুমোদিত লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহারও গ্যারান্টি দিতে পারে।

৫. শিল্প প্রতিষ্ঠানের যথার্থ (bonafide) বাণিজ্যিক হুণ্ডি বা প্রত্যর্থ পত্র (Promissory Note) নিজে স্বীকার করিতে (accept) বা বাট্টা বা পুনর্বাট্টা করিতে পারে।

২. পরোক্ষভাবে ঋণ: উন্নয়ন ব্যাঙ্ক নিম্নোক্তরূপ মেয়াদী ঋণের জন্য পুনঃ অর্থসংস্থান করিতে পারে—

১. শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন, রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশন, শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ করপোরেশন ও অন্যান্য অনুমোদিত লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ৩-২৫ বৎসরের মেয়াদী ঋণ;

২. তপশীলী ব্যাঙ্ক ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ৩-১০ বৎসরের মেয়াদী ঋণ।

৩. উপরোক্ত দুইটি শ্রেণীর লগ্নীকারী যে কোনও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ৬ মাস হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ্য রপ্তানি মেয়াদী ঋণ (export credit)।

৪. শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন, রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশন অথবা অনুমোদিত লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পদ বাড়াইবার জন্য শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক উহাদের শেয়ার, স্টক, বণ্ড বা ডিবেঞ্চার কিনিতে পারে।

শিল্প ঋণের পুনঃসংস্থানই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া আইনের দ্বারা, প্রয়োজন হইলে, শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক পুনঃ অর্থসংস্থান করপোরেশনকে (R. F. C.) উহার অন্তর্ভুক্ত করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে।

৩. শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (Development Assistance Fund) নামে একটি অতিরিক্ত তহবিল সৃষ্টি করিবে। যে সকল শিল্পে, অত্যধিক বিনিয়োগ করিতে হয় বলিয়া বা মুনাফার হার অত্যন্ত অল্প বলিয়া, ইত্যাদি নানা কারণে সাধারণ উপায়ে অর্থসংগ্রহে অসুবিধা হয়, অথচ উহারা এরূপ গুরুত্বপূর্ণ যে উহাদের বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন, এই তহবিল হইতে ঐরূপ শিল্পে আর্থিক সহায়তা দান করা যাইবে। প্রথমে কেন্দ্রীয় সরকার-প্রদত্ত অর্থ লইয়া এই তহবিল গঠিত হইবে এবং সরকারী ও অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত ঋণ, অনুদান, দান, উপহার প্রভৃতি ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিবে।

৪. শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক যে শুধু আর্থিক সহায়তাই দিবে, তাহা নহে। ইহা বাজার ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত গবেষণার অনুসন্ধানের ন্যায় প্রবর্তনামূলক কাজেও হাত দিবে এবং কারিগরি-অর্থনীতিক (Techno-economic) পর্যালোচনা চালাইবে যে কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তনা, ব্যবস্থাপনা ও সম্প্রসারণের জন্য কারিগরি ও প্রশাসনিক

...দান করিবে। ... ব্যবসায় ঋণ পূরণের জন্য পরিকল্পনা, প্রবর্তনা ও উন্নয়নের দ্বারা নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।

ইহার ব্যাপক দায়িত্ব পালনে যাহাতে কোন বাধা উপস্থিত না হয় সেজন্য একমাত্র নিজের লগ্নীপত্রের জামিনে (own securities) ঋণ নিষিদ্ধকরণ ব্যতীত উন্নয়ন ব্যাঙ্কের গ্রহণযোগ্য অন্য কোন প্রকার, লগ্নীপত্রের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয় নাই।

ঙ· **সম্বল (resources) ঃ** উন্নয়ন ব্যাঙ্কের যথোপযুক্ত সম্বলের, যাহাতে কোনও অভাব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ইহার প্রারম্ভিক পুঁজি ১০ কোটি টাকা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ১৫ বৎসর পরে ১৫টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ্য ১০ কোটি টাকার সুদ-বিহীন ঋণ লইয়া উন্নয়ন ব্যাঙ্ক কার্যারম্ভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার, স্বাভাবিক শর্তে আরও ঋণ দিতে পারেন এবং ব্যাঙ্ক নিজের ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া ও জনসাধারণের নিকট হইতে কমপক্ষে ১২ মাসের মেয়াদী আমানত গ্রহণ করিয়া সম্বল বাড়াইতে পারে। ইহার উপর উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে অনধিক ৯০ দিনের মেয়াদে ২টি উৎকৃষ্ট সহিযুক্ত ট্রাস্টি সিকিউরিটি জমা দিয়া ঋণ লইতে পারে এবং যথার্থ বাণিজ্যিক হুণ্ডি ও প্রত্যর্থ পত্র জমা রাখিয়া উহার উপর অনধিক ৫ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের ঋণ পাইতে পারে। ইহাছাড়া, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক এই তহবিল হইতে অর্থ লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয় শিল্প ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী লেনদেন তহবিল [National Industrial Credit (long terms operations) Fund নামে জাতীয় কৃষি ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী) তহবিলের ন্যায় একটি তহবিল প্রতিষ্ঠার কথা আছে। উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এই প্রস্তাবিত তহবিল হইতেও ঋণ লইতে পারিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথমে এই তহবিলে এককালীন ১০ কোটি টাকা ঋণ দিবে ও পরে ১৯৬৫ সালের জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইবে সে বৎসর হইতে প্রতি বৎসর ৫ কোটি টাকা প্রদান করিবে।

উন্নয়ন ব্যাঙ্ক যাহাতে অন্যান্য অনুমোদিত লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার, ঋণপত্র প্রভৃতি কিনিতে পারে সেজন্য কিংবা উহার নিজের লেনদেনের প্রয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই তহবিল হইতে উন্নয়ন ব্যাঙ্ককে ঋণ দিবে। আবার এই তহবিল হইতে অর্থ লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উন্নয়ন-ব্যাঙ্কের বণ্ড বা ডিবেঞ্চার কিনিয়া উহার সম্বল বাড়াইতে সাহায্য করিতে পারে।

উপরোক্ত যাবতীয় সূত্র ছাড়াও, ভারত সরকারের অনুমতি লইয়া উন্নয়ন ব্যাঙ্ক যে কোনও সূত্র হইতে ঋণ লইতে, এমন কি যে কোনও ব্যাঙ্ক বা বিদেশে অবস্থিত লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান হইতে বিদেশী মুদ্রায় ঋণ লইতে পারে এবং সরকারী ও বেসরকারী সূত্র হইতে উপহার, অনুদান, দান প্রভৃতি গ্রহণ করিতে পারে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ন্যায় উন্নয়ন ব্যাঙ্ককেও সর্বপ্রকার করভার হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

... **কার্য ও ভবিষ্যৎ (working and future) ঃ** বিবিধ শিল্পের প্রবর্তন, উন্নয়ন ... অর্থসংস্থানের সহিত জড়িত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রীয় সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানরূপে ... ব্যাঙ্ক কাজ করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সুতরাং, সাধারণত অন্যান্য অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে সকল বাধার মধ্যে কাজ করিতে হয়, উন্নয়ন ব্যাঙ্ককে তাহা হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে এবং ইহার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন প্রকার কার্য যে কোন উপায়ে সম্পাদনের জন্য ইহাকে সবিশেষ স্বাধীনতা, সম্বল ও সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

ইহা পুনঃঅর্থসংস্থানের কাজ করিবে বলিয়া ইতিপূর্বে স্থাপিত পুনঃঅর্থসংস্থান করপোরেশন-এর ... অস্তিত্বের আর প্রয়োজন না থাকায় ... ইহার সহিত একীভূত করা হইয়াছে। ...

পুনঃ অর্থসংস্থান বাবদ যে কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় ঋণের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা হইতে দ্বিগুণ করিয়া ১ কোটি টাকা করা হইয়াছে ও পুনঃঅর্থসংস্থান বাবদ প্রদত্ত ঋণের হিসাবের বকেয়া পাওনার (outstanding balance) উপর এই ঊর্ধ্বসীমা প্রয়োগ করা হইবে স্থির করা হইয়াছে। এইরূপে উন্নয়ন ব্যাঙ্কের অধীনে পুনঃঅর্থসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মিল থাকায় ভবিষ্যতে শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশনের (I. F. C.) ও জাতীয় শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনকেও (N. I. D. C.) ইহার সহিত একীভূত (merger) করিবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। ইহার ফলে ভারতের সীমাবদ্ধ সম্পদের আরও যথার্থ ব্যবহার সম্ভব হইবে।

ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া
UNIT TRUST OF INDIA

ক ভূমিকা (introduction) ঃ স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নমূলক কার্যপ্রক্রিয়ার পক্ষে অপরিহার্য একটি শর্ত হইল, দেশের বিভিন্ন অংশের সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়া উহা এমনভাবে গতিশীল করা যেন ঐ সঞ্চয় বিনিয়োগের পথে প্রবাহিত হয়। এই সকল দেশের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল, উপরন্তু এই স্বল্প সঞ্চয়েরও একটি অংশ অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারতের মত দেশে অনুৎপাদনশীল খাতে সঞ্চয়ের একটা অংশ পরিচালিত হইবার কারণ এই যে, এ সকল দেশে টাকা ও পুঁজির বাজার সুসংগঠিত নহে। অথচ, এই বাজার সুসংগঠিত না হইলে সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ের তারল্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখিয়া লাভজনক ভাবে উহা বিনিয়োগ করা যায় না। সমাজের সঞ্চয়কে গতিশীল করার সাধারণ সমস্যার সহিত জড়িত হইয়া আছে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়ের প্রশ্ন। ইহারা সমগ্র সঞ্চয়কারীদের একটা বিরাট অংশ। এককভাবে ইহাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ নগণ্য হইলেও সামগ্রিক বিচারে অর্থনীতিতে ইহারা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে, কারণ মোট অর্থসরবরাহে ইহাদের অবদান কম নহে। সমাজের বিনিয়োগকারীদের প্রধানত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। বৃহৎ বিনিয়োগকারীরা নিজেদের যাবতীয় সম্বল একত্রিত করিয়া উৎপাদনের কাজে লাগাইতে পারে এবং এ ব্যাপারে তাহারা বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লাভ করিতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা এই সুবিধা পায় না বলিয়া অন্যের দয়ার উপরে নির্ভর করে। পুঁজির ও টাকার বাজারের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার ফলে শিল্পের মালিকানায় ইহারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। ক্ষুদ্র ও মধ্যবিত্ত বিনিয়োগকারীদের প্রধান অসুবিধা হইল যে ইহারা ইহাদের স্বল্পসঞ্চয় বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন লাভজনকখাতে খাটাইতে পারে না। ফলে সমগ্র সঞ্চয়কে একটিমাত্র ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। এই প্রকার কাজের ঝুঁকি ও বিপদ সহজেই অনুমেয়। বহুক্ষেত্রেই ইহাদের বিনিয়োগ লাভজনক হয় না। দেশে যখন মূল্যস্তর বাড়িতে থাকে তখন সঞ্চয়ের গতিশীলতা সৃষ্টি করা এক জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এতাবস্থায় সরকারী বিধিব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া উঠে। মূলত এই প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যেই ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের বিনিয়োগে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ লাভের ব্যবস্থা করিবে। বিনিয়োগযোগ্য অর্থকে ভাগে ভাগে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া দিবে। ইহাতে লোকসানের সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে। বিনিয়োজিত

অর্থের নিরাপত্তা, নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ও পুঁজিমূল্য বৃদ্ধি-জনিত (Capital appreciation) অপরাপর সুবিধা সঞ্চয়কারীরা ভোগ করিবে।

খ. স্থাপনা ও সংগঠন (**formation & organisation**) : ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর ভারতীয় পার্লামেন্টের এক আইনের বলে ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হয়। ইহা সরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই হইতে ইহা কার্য শুরু করিয়াছে। ৯জন সদস্য (ট্রাস্টী) লইয়া গঠিত একটি বোর্ড ট্রাস্টের কর্ম পরিচালনা করিবে। বোর্ডের সভাপতি যদি সর্ব সময়ের জন্য (whole time) নিযুক্ত না হন, তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উল্লিখিত ৯ জন সদস্য (ট্রাস্টী) ছাড়াও আরো একজন কার্যনির্বাহক ট্রাস্টী নিয়োগ করিবে।

গ. উদ্দেশ্য ও কার্যক্ষেত্র (**objects & scope**) : এই ট্রাস্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়, ইউনিট বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিবে। এইভাবে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে উহা নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হইবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি সঞ্চয়কারীদের আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইউনিটের মুদ্রিত মূল্য (Face value) সর্বোচ্চ ১০০৲ হিসাবে ধার্য করা হইয়াছে। আপাততঃ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারিগণের নিকট হইতে ১০০ কোটি টাকার পরিমাণ পুঁজি সংগ্রহ ও লগ্নী করাই ইহার লক্ষ্য।

ঘ সম্বল (**resources**) : ৫ কোটি টাকার প্রাথমিক পুঁজি লইয়া ট্রাস্ট কার্যারম্ভ করিয়াছে। এই পুঁজির মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশ নিম্নরূপ,—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২½কোটি টাকা জীবনবীমা করপোরেশন ৭৫ লক্ষ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকার ৭৫ লক্ষ টাকা, বেসরকারী ক্ষেত্রের তপশীলভুক্ত বাণিজ্যিক ও অন্যান্য অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ—১ কোটি টাকা। এই প্রারম্ভিক পুঁজি বিভিন্ন লগ্নীপত্রে (securities) এরূপভাবে লগ্নী করা হইবে যেন তাহা হইতে গড়ে ৬%-এর অধিক হারে আয় হইতে পারে। এই প্রারম্ভিক লগ্নীর ভিত্তিতে সমমূল্যের কতকগুলি 'একক' (units) সৃষ্টি করিয়া তাহা লগ্নীতে ইচ্ছুক জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইবে। ঐ এককগুলি বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহা, আবও নানারূপ লগ্নীপত্রে (যথা সরকারী লগ্নীপত্র, শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি) লগ্নী করা হইবে। ট্রাস্ট কর্তৃক বিক্রীত প্রত্যেকটি 'ইউনিটের' মুদ্রিত মূল্য (face value) ১০ টাকার কম ও ১০০ টাকার বেশী হইবে না। ইউনিটগুলির উপরে বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত লভ্যাংশের পরিমাণ অনুযায়ী উহাদের দর নিরূপিত হইবে এবং সেই দরে ঐ গুলিকে বাজারে বিক্রয় করা হইবে। ট্রাস্ট কখন কি দরে ইউনিটগুলিকে পুনরায় ক্রয় করিয়া লইবে তাহা বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত হইবে। ইউনিট ক্রয়ের ব্যাপারে কোন সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই—অর্থাৎ যে কোন ক্রেতা তাহার ইচ্ছানুযায়ী যত খুশী সংখ্যক 'ইউনিট' ক্রয় করিতে পারিবে। ইউনিটগুলিকে প্রয়োজনমত হস্তান্তর করা চলিবে। ব্যাঙ্কের নিকট ইউনিট জমা রাখিয়া তাহার বিনিময়ে ঋণ পাওয়া যাইবে।

ঙ. কার্য (**functions**) : স্টেটব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ও অপর ৩৬টি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ৩৫০০ হাজার শাখার মাধ্যমে ইউনিট বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা হইবে। ইউনিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ সুনির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ করা হইবে এবং প্রতি আর্থিক বৎসরের শেষে খরচ বাদ দিয়া যে লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে উহার শতকরা ৯০% ইউনিট-ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। এই বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশের পরিমাণ বিনিয়োজিত অর্থের শতকরা ১০ ভাগ হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। যেহেতু ট্রাস্ট ইউনিট ক্রেতাদের তরফে ও উহাদের স্বার্থে কাজ করিবে সেইজন্য ট্রাস্টকে আয়কর, অতিরিক্ত কর এবং অন্যান্য কর

ইত্যাদি হইতে সম্পূর্ণভাবে রেহাই দেওয়া হইবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক মূলধন অর্থপ্রদান করিয়াছে তাহাদের ঐ পুঁজি-লব্ধ আয়কেও অতিরিক্ত মুনাফা করের হাত হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে। ইউনিট ক্রেতারা তাহাদের লভ্যাংশের উপরে কোন আয়কর দিবে না বটে তবে অতিরিক্ত কর তাহারা দিবে।

চ. **মন্তব্য (comments)**: ১. ভারতে এই প্রকারের প্রতিষ্ঠান ইহাই প্রথম। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় এই প্রকারের বহু প্রতিষ্ঠান আছে এবং উহারা সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভূত কাজ করিয়া যাইতেছে। ভারতেও বিনিয়োগের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টির জন্য বেসরকারী ক্ষেত্রেও অনুরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথা বিভিন্ন দিক হইতে উত্থাপিত হইয়াছে। এই দাবির মধ্যে যুক্তি আছে স্বীকার করিতে হইবে। ২. এই প্রকার প্রতিষ্ঠানের ইউনিট ক্রয় করিয়া অর্থ লগ্নী করিলে সঞ্চয়কারীদের যথার্থই উপকার। কারণ ট্রাস্ট স্বীয় লাভের শতকরা ৯০% লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করিয়া দিলে উহা বিনিয়োজিত অর্থের শতকরা ১০ ভাগ হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে অন্য প্রকারে সরাসরি বিনিয়োগ না করিয়া (যেমন শেয়ার ক্রয়ে বা ঋণপত্রে) ইউনিট ক্রয় করিলেই অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা। তদুপরি এই মুনাফা অনতিবিলম্বেই বণ্টিত হইয়া যাইবে। ৩. বিনিয়োগকারীরা পরিচালনা সংক্রান্ত নানাবিধ অসুবিধা হইতে মুক্ত থাকিবে। ৪. সর্বোপরি ট্রাস্টের এরূপ কাজের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ফল লাভ করা সম্ভব হইবে। ৫. তাহাছাড়া, ইহার মারফত লগ্নী করিলে লগ্নীকারিগণের লগ্নীকৃত অর্থের নিরাপত্তা ও তারল্য (অর্থাৎ, যে কোন সময় উহা বন্ধক রাখিয়া ঋণ লওয়ার এবং বিক্রয় করিয়া অর্থ ফিরিয়া পাওয়ার ও হস্তান্তরের সুবিধা) বজায় থাকিবে।

তবে সরকারী আয়ত্তাধীনে এইরূপ একচেটিয়া ট্রাস্ট স্থাপিত হওয়ায় বেসরকারী বৃহৎ লগ্নীকারীদের মধ্যে আশঙ্কা জাগিয়াছে যে, ইহাতে পশ্চাৎদ্বার দিয়া শিল্প ক্ষেত্রে জাতীয়করণের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু এইরূপ আশঙ্কার পশ্চাতে কোন সারবত্তা এখন পর্যন্ত নাই। কারণ ইউনিট ট্রাস্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রভৃতির মালিক হইলেও উহাদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে, একথা বলা যায় না। কারণ, জীবনবীমা কর্পোরেশনও অনেক বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মালিক হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যে কোন হস্তক্ষেপ করে নাই।

ক্ষুদ্র ও মধ্যমায়তন শিল্পের অর্থসংস্থানের প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাসমূহ

FINANCING INSTITUTIONS AND AGENCIES FOR SMALL SCALE AND MEDIUM SIZED INDUSTRIES

ভারতে ক্ষুদ্র ও মধ্যায়তন শিল্পসমূহের মাধ্যমগুলির মধ্যে রাজ্যঅর্থসংস্থান করপোরেশন পুনঃঅর্থসংস্থান করপোরেশন, স্টেট ব্যাঙ্ক, নিশ্চয়তাদান সংস্থা, জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প করপোরেশন সমূহ এবং রাজ্যসরকারের শিল্পে সাহায্যদান আইনের অন্তর্গত ব্যবস্থা (State Aid to Industries Act) উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

১. রাজ্যঅর্থসংস্থান করপোরেশনসমূহ

STATE FINANCIAL CORPORATIONS

ক. **স্থাপনা ও সংগঠন (formation and organisation)**: কেন্দ্রমাত্র যৌথ মালিকানার যৌথমূলধনী কারবারের ও সমবায় ভিত্তিতে সংগঠিত মধ্যায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থানের

জন্য শিল্পঅর্থসংস্থান করপোরেশন (IFC) স্থাপিত হইলে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত এককমালিকানা, অংশীদারী কারবার ও সীমাবদ্ধ মালিকানার যৌথমূলধনী কারবারের (private limited company) ভিত্তিতে সংগঠিত ক্ষুদ্র এবং মাধ্যমিক আয়তনের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য পৃথক অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এজন্য ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যসরকারগুলিকে অর্থসংস্থান করপোরেশন স্থাপনের ক্ষমতা দিয়া পার্লামেন্ট কর্তৃক একটি রাজ্যঅর্থসংস্থান করপোরেশন আইন (State Financial Corporations Act, 1951) পাস হয়। বর্তমানে ভারতের ১৫টি রাজ্যেই এরূপ অর্থসংস্থান করপোরেশন কার্যরত রহিয়াছে।

সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারগুলির অভিরুচিক্রমে ইহাদের পুঁজির পরিমাণ ন্যূনতম ৫০ লক্ষ টাকা হইতে সর্বাধিক ৫ কোটি টাকার মধ্যে নির্দিষ্ট। ইহাদের শেয়ারের ৭৫ শতাংশ সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ, সমবায় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান খরিদ করিয়াছে। বাকি ২৫ শতাংশ জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যন্ত ভারতের ১৫টি রাজ্যের অর্থসংস্থান করপোরেশনগুলির আদায়ীকৃত পুঁজির মোট পরিমাণ ছিল ১৫ ৩২ কোটি টাকা। ইহাদের শেয়ারের মূল্য প্রত্যর্পণ সম্পর্কে রাজ্যসরকারের নিশ্চয়তা প্রদত্ত হইয়াছে এবং লভ্যাংশের সর্বোচ্চ সীমা ৫ শতাংশের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পরামর্শপূর্বক রাজ্যসরকার নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন। করপোরেশনের শেয়ারগুলিকে ভারতের ট্রাস্ট আইনের অন্তর্গত 'ট্রাস্টী সিকিউরিটি' এবং ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের অন্তর্গত 'অনুমোদিত সিকিউরিটি' হিসাবে গণ্য করা হয়।

শিল্পঅর্থসংস্থান করপোরেশনের ন্যায় ইহাদের পরিচালনাভার ও একজন করিয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টর, একটি কার্যকরী সমিতি ও একটি পরিচালক পর্ষৎ-এর উপর ন্যস্ত।

খ. উদ্দেশ্য ও কার্যক্ষেত্র (objects and scope). বিশেষরূপে এককমালিকানা, অংশীদারী কারবার ও সীমাবদ্ধ মালিকানার যৌথমূলধনী কারবারের ভিত্তিতে সংগঠিত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও মধ্যমায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অর্থসংস্থানই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য।

গ. সম্বল (resources) : ১. নিজস্ব আদায়ীকৃত পুঁজি, ২. প্রয়োজনবোধে নিজ ডিবেঞ্চার ও অন্যান্য ঋণপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ; এবং ৩. অন্যূন ৫ বৎসরের মেয়াদে জনসাধারণের নিকট হইতে গৃহীত আমানত—এই তিনটিই ইহাদের আর্থিক সম্বল। ইহাদের ঋণপত্রগুলির আসল প্রত্যর্পণ ও উহাদের প্রদেয় সুদ সম্পর্কে রাজ্যসরকার নিশ্চয়তা প্রদান করেন। জনসাধারণের নিকট হইতে গৃহীত আমানত উহাদের আদায়ীকৃত পুঁজির পাঁচগুণের অধিক হইতে পারে না।

১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৫টি রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশন ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া মোট ২১.৩ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত পুঁজি মোট ১৫ ৩২ কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাদ্রাজ, কেরালা, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র ও আসামের রাজ্যঅর্থসংস্থান করপোরেশনগুলি মোট ৯.১ কোটি টাকা জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত পাইয়াছিল। ৭টি করপোরেশন রিজার্ভব্যাঙ্ক হইতে মোট ৪ কোটি টাকা মাঝারি মেয়াদের ঋণ পাইয়াছিল এবং ৯টি করপোরেশন সরকারের নিকট হইতে ৯০ দিনের মেয়াদে ২.২ কোটি টাকা ঋণ পাইয়াছিল।

ঘ. কার্যাবলী (functions) : ১. ইহারা সরকারী ও বেসরকারী সিকিউরিটি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতির জামিনে ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ডিবেঞ্চার খরিদ করিয়া অনধিক ২০ বৎসরের মেয়াদে প্রত্যক্ষ ঋণদান করে। ২. অন্যত্র হইতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান

কর্তৃক অনধিক ২০ বৎসরের মেয়াদে সংগৃহীত ঋণের প্রত্যর্পণ সম্বন্ধে ঋণদাতাকে নিশ্চয়তা দান করে। ৩. শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির শেয়ার ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের দায়গ্রহণ করে। ৪. ইহারা ঋণের সুদ প্রদান ও আসল প্রত্যর্পণে খেলাপকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বভার গ্রহণ ও উহাদের বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে। ৫. রাজ্যসরকার কর্তৃক ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদানের ক্ষেত্রে ইহারা রাজ্যসরকারের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে। ৬. ইহারা পুনঃঅর্থ সংস্থান করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া শিল্পে পুনঃঅর্থসংস্থানের সুবিধালাভ করিয়াছিল। বর্তমানে এই বিষয়ে ইহারা শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের অধীনস্থ হইয়া কাজ করিতেছে।

ঙ. **সম্পাদিত কার্য (working and achievements) :** ১. ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সকল রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশনগুলি মোট ৮৭'১৪ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। উহার মধ্যে ৫৪'৭০ কোটি টাকা বিতরিত হইয়াছে। ২. ১৯৬৪ সালের মার্চ পর্যন্ত উহাদের দ্বারা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতি ঋণপত্রের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ টাকা। ৩. ইহাদের সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পগুলির মধ্যে সুতাবস্ত্র, ইঞ্জিনীয়ারিং, বিদ্যুৎ সরবরাহ, তৈলনিষ্কাশন, চা ও রবার বাগিচাই প্রধান। তৃতীয় পরিকল্পনার তিন বৎসরে ইহারা ৫০'৬৮ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে।

চ. **সমালোচনা (criticisms) :** ইহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের মধ্যে উল্লেখনীয় : ১. ক্ষুদ্র ও মধ্যমায়তন শিল্পের প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের প্রদত্ত সাহায্য নগণ্য। ২. ঋণের আবেদনপত্র বিবেচনায় অত্যধিক বিলম্ব হয়। ৩. অধিকাংশ আবেদনপত্র নামঞ্জুর করা হয়। ৪. ঋণমঞ্জুরীতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় ইত্যাদি।

ছ. **মন্তব্য (comments) :** ইহাদের কার্যে দোষারোপ করা হইলেও কার্যক্ষেত্রে কতকগুলি অসুবিধাই এজন্য অধিক দায়ী। যেমন—১. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি উহাদের হিসাবপত্র সঠিকরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। সুতরাং ঋণ মঞ্জুর করিবার পূর্বে উহাদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে দীর্ঘ সময় লাগে। ২. আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলির জামিন রাখিবার উপযুক্ত সম্পত্তির অভাব অনেকের আবেদনপত্র নাকচের কারণ। ৩. ক্ষুদ্রপ্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা ও সাফল্য অল্প কয়েকটি ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল বলিয়া উহাদের স্থায়িত্বের অভাব। ৪. আবেদন পত্র বিবেচনার জন্য উপযুক্ত কারিগরি বিশেষজ্ঞের অভাব ইত্যাদি। তবে সম্প্রতি-কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশনগুলির কার্যাবলীর সমীক্ষা সম্পাদন, কয়েকটি রাজ্যে ইহাদের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করিতে স্টেট ব্যাঙ্কের সম্মতি, ঋণ-নিশ্চয়তা দান কার্যসূচীতে ও পুনঃঅর্থসংস্থান কার্যপরিধিতে রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশনগুলির অন্তর্ভুক্তি দ্বারা ইহাদের কার্যাবলীর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের চেষ্টা চলিতেছে। ১৯৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইহাদের কার্যাবলীর কিভাবে উন্নতি করা যায় তাহা অনুসন্ধানের জন্য একটি অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগ করেন। এই অনুসন্ধানকারী সমিতি ১৯৬৪ সালে উহার রিপোর্ট পেশ করিয়াছে ও বর্তমানে উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

২. স্টেট ব্যাঙ্ক

STATE BANK OF INDIA

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে স্টেট ব্যাঙ্ক নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য নানাবিধ সহায়তা প্রদান করে :

১. ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির উন্নয়নে রাজ্য অর্থসংস্থান করপোরেশন, সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ, কেন্দ্রীয় এবং

রাজ্যসরকার ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া ১৯৫৬ সালের শেষভাগ হইতে ৯টি মনোনীত এলাকায় একটি পথদেশক কর্মসূচী (pilot scheme) প্রবর্তিত হয়। ইহাতে ঋণপ্রার্থী ক্ষুদ্রশিল্প স্থানীয় সমবায় ব্যাঙ্ক অথবা স্টেট ব্যাঙ্কের শাখার নিকট সর্বপ্রকার ঋণের আবেদনপত্র পেশ করিয়া থাকে। রাজ্যসরকারের শিল্প দপ্তর, ক্ষুদ্রশিল্প সেবাসংস্থা প্রভৃতির সহযোগিতায় ঐ আবেদনপত্র বিবেচিত হয়। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এই কর্মসূচী ৩৮৯৯ ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত হয় এবং মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৬ কোটি টাকা। ইহা ছাড়া স্টেট ব্যাঙ্কের সহযোগী ব্যাঙ্কগুলি আরও ৮৬৬ ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থায় ৬·৭ কোটি টাকা ঋণ দিয়াছে।

২. পথদেশক কর্মসূচীর অন্তর্গত ক্ষুদ্রশিল্পসংস্থাগুলিতে স্টেট ব্যাঙ্ক উদার ঋণদানের নীতি (liberalised credit scheme) গ্রহণ করিয়াছে।

৩. ১৯৬০-৬১ সালের জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প করপোরেশনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদানকার্যে উহার নিশ্চয়তাদানের কার্যসূচীর সম্প্রসারণের জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক ১৪টি ক্ষুদ্রশিল্পসংস্থাকে ৪·৮৬ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। ইহার নিয়ম হইতেছে, ক্ষুদ্রশিল্পগুলির কাঁচামাল হইতে তৈয়ারী পণ্য পর্যন্ত সকলদ্রব্যের জামিনে স্টেট ব্যাঙ্ক উহাদের পূর্ণ মূল্য পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করিবে। ইহাতে স্টেট ব্যাঙ্ক উহার সাধারণ-সীমার অধিক যে পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করিবে সে সম্পর্কে জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প করপোরেশন নিশ্চয়তা দান করিবে।

৪. বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যঅর্থসংস্থান করপোরেশন কর্তৃক ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ঋণ প্রদান কার্যের দক্ষতাবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণে সহায়তা করিবার জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অনেকগুলি রাজ্যঅর্থসংস্থান করপোরেশনের প্রতিনিধিত্ব করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে।

৫. ১৯৬০-৬১ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক সমবায় ভিত্তিতে গঠিত ক্ষুদ্রশিল্পে (শিল্পসমবায়) ঋণদান আরম্ভ করিয়াছে এবং ৮টি শিল্প সমবায়ে মোট ১·৫৯ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে।

৩. নিশ্চয়তাদান সংগঠন

GUARANTEE ORGANISATION (RESERVE BANK OF INDIA)

ক্ষুদ্রশিল্পে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য লগ্নীপ্রতিষ্ঠান যাহাতে সহজে ঋণদানে সমর্থ হয় সেজন্য উহাদের অনুমোদিত ঋণের আবেদন পত্রে ঋণপরিশোধ সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে নিশ্চয়তাদানের জন্য একটি নিশ্চয়তাদান সংগঠন ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ১৯৬৪ সালের মার্চ অবধি নিশ্চয়তাদানের জন্য মোট ৮৭৫১ আবেদনপত্র মঞ্জুর হইয়াছে এবং এই বাবদে মোট মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ৩২·৮ কোটি টাকা।

৪. শিল্পে রাজ্যসহায়তা আইন

STATE AID TO INDUSTRIES ACT

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলি উহাদের স্ব স্ব রাজ্যে রাজ্যসহায়তা আইনের অধীনে মোট ১০·০৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানে ঋণদান করিয়াছে।

৫. কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য

CENTRAL GOVERNMENT AID

ক্ষুদ্রায়তনশিল্পের উন্নয়নে প্রত্যক্ষ সহায়তাদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বৎসর তাহাদের বাজেটে ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদানের জন্য রাজ্যসরকারগুলিকে অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকেন। এই ঋণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৫৮-৫৯,১৯৫৯-৬০ ও ১৯৬০-৬১ সালে প্রদত্ত সহায়তার পরিমাণ

যথাক্রমে ৪·৩৪ কোটি, ৪·৭৭ কোটি ও ৪·৯৫ কোটি টাকা। ১৯৬৭-[illegible] বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫·৬০ কোটি টাকা।

৬. জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প করপোরেশন লিমিটেড
NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION PRIVATE LTD.

ক. স্থাপনা ও সংগঠন (formation and organisation) : ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত পুঁজি লইয়া সীমাবদ্ধ মালিকানার যৌথমূলধনী কারবারের আকারে ইহা গঠিত হইয়াছে। ইহার সমস্ত শেয়ারই সরকার কর্তৃক ক্রীত।

খ. উদ্দেশ্য ও কার্যক্ষেত্র (objects and scope) : ১. বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তনশিল্পের উৎপাদন কার্যক্রমের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা; ২. ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির দ্বারা বৃহদায়তন শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও উহাদের উৎপন্নদ্রব্যের আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি উৎপাদন; ৩. ক্ষুদ্রশিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা ইত্যাদি করপোরেশনের উদ্দেশ্য। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অর্থসংস্থানে ইহা সহায়তা করিতে পারে বটে, তাহাপেক্ষা উহার কারিগরি বিক্রয়সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নয়নে সাহায্য করাই ইহার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

গ. সম্বল (resources) : নিজ পুঁজি ছাড়া প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ইহাকে ঋণদানের ব্যবস্থা আছে। তাহা ছাড়া ১৯৬০-৬১ সালে ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়ন ঋণ তহবিল (DLF) হইতে ১ কোটি ডলার ঋণ পাইয়াছে। এই বিদেশী মুদ্রা ঋণ ব্যবহারের শর্ত এই যে, যে কোন একটি আবেদন পত্রে ৫০,০০০ ডলার পর্যন্ত মূল্যের যন্ত্রপাতি কমিউনিস্ট দেশ বাদে অন্য যে কোন দেশ হইতে ক্রয় করা চলিবে কিন্তু উহার অধিক মূল্যের যন্ত্রপাতি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতেই কিনিতে হইবে।

ঘ. সম্পাদিত কার্য (working and achievements) : ১. সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সহিত উহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া করপোরেশন ঐগুলি সরবরাহের সাব-কন্ট্রাক্ট ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিতরণ করিয়া উহাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ে সাহায্য করে। ২. বৃহদায়তন শিল্পের বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্ষুদ্রশিল্পে উৎপাদনের বন্দোবস্ত করে। ৩. বিভিন্নস্থানে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র শিল্পের কারখানাগুলির সুবিধার জন্য ইহা সচল মেরামতি কারখানা (mobile repair shop), সচল পণ্য প্রদর্শনী (mobile exhibition) প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছে। ৪. ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদনের মান নির্ধারণ ও উহাদের বাজার, নকশা প্রভৃতি সম্পর্কে কারিগরি পরামর্শ দেয়। ৫. ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিস্তিবন্দী মূল্যপ্রদান শর্তে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। ৬. প্রয়োজনবোধে ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের দায় গ্রহণ করিতে পারে। ৭. ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাঙ্ক ও লগ্নী প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ সংগ্রহ করিলে প্রয়োজনবোধে ঋণদাতাকে ঋণশোধের নিশ্চয়তা দান করে। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ইহা ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য ৬৬ কোটি টাকার ফরমাশ সংগ্রহ করিয়াছে এবং কিস্তিবন্দী শর্তে ১৮ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়াছে। গত ১০ বৎসরে করপোরেশন ৪,৬০০টি ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠানকে ২০ কোটি টাকার অধিক যন্ত্রপাতি সহজ কিস্তিবন্দী শর্তে ক্রয়ের সুবিধা দিয়াছে। ইহার দ্বারা ৪২% নূতন ক্ষুদ্র শিল্প-উদ্যোক্তাগণ প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছে। করপোরেশনের সাহায্যে ইদানীংকালে ৫০০০ নূতন ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপিত হইয়াছে এবং ১,৩৫০০০ ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠান ৮০ কোটি টাকার সরকারী কন্ট্রাক্ট পাইয়াছে। ভারতের ক্ষুদ্রশিল্পজাত নানাবিধ দ্রব্যে করপোরেশন ইউরোপীয় দেশগুলির আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হইয়াছে।

শিল্পের পুনঃঅর্থসংস্থান করপোরেশন লিমিটেড
REFINANCE CORPORATION FOR INDUSTRIES LTD.

প্রধানত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে বাণিজ্যিকব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ দেয় উহার পুনঃসংস্থান করিবার জন্য ১৯৫৮ সালের জুন মাসে শিল্পের পুনঃঅর্থসংস্থান করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছিল। ৩-৭ বৎসরের মেয়াদে প্রদত্ত অনধিক ৫০ লক্ষ টাকার ঋণের পুনঃসংস্থান এই করপোরেশন করিতে পারিত এবং যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুঁজি ও সঞ্চিত তহবিলের মোট পরিমাণ ২.৫ কোটি টাকার অধিক নহে, উহারাই এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ইহা ৫৫.১ কোটি টাকার ঋণের পুনঃসংস্থান মঞ্জুর করিয়াছিল। ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইহা কেন্দ্রীয় সরকার হইতে ২৪.৫০ কোটি টাকা ঋণ পাইয়াছিল। ইহার অনুমোদিত ও আদায়ীকৃত পুঁজি ছিল যথাক্রমে ২৫ কোটি ও ১২.৫০ কোটি টাকা। ১৯৬৪ সালে স্থাপিত ভারতের শিল্পউন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহিত ইহার উদ্দেশ্যের মিল থাকায় ইহার পৃথক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

ভারতে বিদেশী পুঁজি
FOREIGN CAPITAL IN INDIA

ভারতে বিদেশী পুঁজির ভূমিকা, উহার প্রয়োজনীয়তা ও অপকারিতা লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বিতর্ক চলিয়াছে। স্বাধীনতার পূর্বে উহার বিরোধিতায় দেশ সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অনেকের মতে বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রয়োজন ঘটিয়াছে। ভারতীয় শিল্পপতিদের একাংশ এবং জাতীয় নেতৃত্ব বর্তমানে বিদেশী পুঁজির সাদর আহ্বানের পক্ষপাতী। সুতরাং বর্তমানকালে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের নূতন সমর্থক সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি ইহার সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণকারীদের অভাব হয় নাই। সেজন্য বিতর্কমূলক বিষয়টি উপযুক্তরূপে অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে বিনিয়োজিত বিদেশী পুঁজির তথ্য
FACTS ABOUT FOREIGN CAPITAL INVESTED IN INDIA

ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তা ও অপকারিতা আলোচনার সুবিধার জন্য তৎপূর্বে দেশে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের সূত্রপাত, পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

১. **সূচনা:** ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে আধুনিক ব্যাঙ্কিং, রেলপরিবহণ এবং আধুনিক যন্ত্রশিল্প বেসরকারী বৃটিশ পুঁজির দ্বারা প্রবর্তিত হয়। চা, রবার ও কফি বাগিচা শিল্পের প্রতিষ্ঠাও উহার দ্বারাই ঘটিয়াছিল। বৃটেনের উপনিবেশ হিসাবে ভারতে আধুনিক শিল্পে বৃটিশ পুঁজি রূপেই বিদেশী পুঁজির আগমন ঘটে।

২. **পরিমাণ:** সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও, কাহারও কাহারও মতে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯১৪ সালে ভারতে বিনিয়োজিত মোট বৃটিশ অর্থাৎ বিদেশী পুঁজির আনুমানিক পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি পাউণ্ড।[১] ১৯৩৩ সালে উহা ১০০ কোটি পাউণ্ডে পরিণত হয়।[২] রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রস্তুত একটি হিসাবে ১৯৪৮ সালে ভারতে বিনিয়োজিত বেসরকারী বিদেশী পুঁজির পরিমাণ ছিল ৩২০.৪২ কোটি টাকা। তন্মধ্যে বৃটিশ পুঁজির পরিমাণ ছিল ২৩০ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট বিদেশী পুঁজির ৭২ শতাংশ)। এই হিসাব অসম্পূর্ণ। কারণ ইহাতে ভারতে অবস্থিত বিদেশী ব্যাঙ্ক ও ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধরা হয় নাই।

১. India Today And Tomorrow, R. P. Dutt. p. 55.
২. Estimated by the British Associated Chambers of Commerce in India.

১৯৬০ সালে বেসরকারীক্ষেত্রে বিনিয়োজিত বিদেশী পুঁজির পরিমাণ দাঁড়ায় [illegible] কোটি টাকা। সরকারের নীট বিদেশী ঋণদায় ১৯৬০ সালে ৬০৯ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারত মোট ৩৯২১'৮০ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম পরিকল্পনায় ৩৯৪'২২ কোটি টাকা পর্যন্ত, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২,৩৩৩'৫৬ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় (ডিসেম্বর, ১৯৬৩ পর্যন্ত) ১১৯৪ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে।

৩. **প্রকৃতি ঃ** অতীতে বিদেশী পুঁজি ভারতের রেল পরিবহণ, বাগিচা ও খনিজ শিল্পেই অধিক পরিমাণে বিনিয়োজিত হইয়াছিল। অর্থাৎ উহারা এরূপ শিল্পে আকৃষ্ট হইত যাহার দ্রব্য কাঁচা মাল হিসাবে নিজের দেশে রপ্তানি করা চলিত। বর্তমানে বেসরকারীক্ষেত্রে বিনিয়োজিত পুঁজি চারিটি প্রধান ক্ষেত্রে আবদ্ধ—বাগিচা, খনিজ তৈল, রাসায়নিক ও ধাতুদ্রব্য শিল্প।

৪. **উৎস ঃ** বিদেশী পুঁজির উৎসবিচারে দেখা যায়, স্বাধীনতার পূর্বকালে বৃটেনই প্রকৃতপক্ষে বিদেশী পুঁজির একমাত্র উৎস ছিল। কিন্তু বর্তমানে উহাতে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যদিও এখন পর্যন্ত ভারতের বিদেশী পুঁজির মধ্যে বৃটিশ পুঁজিই প্রধান তথাপি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ বাড়িতেছে। নীচে ১৯৬০ সালে ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত বেসরকারী বিদেশী পুঁজির প্রধান উৎস প্রদত্ত হইল ঃ

দেশ	পরিমাণ
বৃটেন	৪৪৬ কোটি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১১৩ ,,
বিশ্বব্যাঙ্ক	৭৮ ,,
অন্যান্য	৫৩ ,,
মোট	৬৯০ ,,

পরিকল্পনাকালে (অর্থাৎ ১৯৫১ হইতে ১৯৬৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত) সাহায্য প্রদানকারী দেশগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম (২২৯৯ কোটি টাকা) ও সোভিয়েত দেশ দ্বিতীয় (৩৮৫ কোটি টাকা) পশ্চিম জার্মানী তৃতীয় (৩৫৮ কোটি টাকা) এবং বৃটেন চতুর্থ স্থান অধিকারী (২৭৩ কোটি টাকা)।

ইদানীংকালে বৃটেনের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রতিবৎসর অধিক বিদেশী পুঁজি আমদানি হইতেছে। পশ্চিম জার্মানীর পুঁজিও বৃদ্ধি পাইতেছে।

৫. **প্রকারভেদ ঃ** দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ দিক হইতে বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত বিদেশী পুঁজির (Direct) অনুপাত হ্রাস ও সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত বিদেশী পুঁজির (Portfolio) অনুপাত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬০ সালে বেসরকারীক্ষেত্রে মোট বিনিয়োজিত বিদেশী পুঁজির মধ্যে প্রত্যক্ষ বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত (Direct) বিদেশী পুঁজির পরিমাণ প্রায় ৫৬৬ ৪ কোটি টাকা ও সরকারী সূত্রের বিদেশী পুঁজির পরিমাণ প্রায় ১২৪'১ কোটি টাকা।

৬. **রূপ ঃ** ইদানীংকালে ভারতে আগত বিদেশী পুঁজির দ্বারা বিশুদ্ধ বিদেশী কারবারী প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিবর্তে ভারতীয়গণের সহিত যুক্ত মালিকানায় কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এইরূপ বিদেশী পুঁজির প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের কোম্পানী আইনের নিয়মানুযায়ী '(India) Ltd.'-নাম লইয়া স্থাপিত হইতেছে। এরূপ প্রতিষ্ঠানের আধিক্য লক্ষণীয়।

প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয়ের ১০'১ শতাংশ, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সরকারী ব্যয়ের ২১'৭ শতাংশ ও তৃতীয় পরিকল্পনার সরকারী ব্যয়ের ২৯'৩ শতাংশ বিদেশী পুঁজি ও ঋণের দ্বারা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তা : পক্ষে যুক্তি
THE NEED FOR FOREIGN CAPITAL IN INDIA : ARGUMENTS IN FAVOUR

নিম্নোক্ত কারণে ভারতে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করা হয় :

১. **দেশীয় পুঁজির স্বল্পতা :** ভারতবাসিগণের আয় ও সঞ্চয় সামান্য বলিয়া দেশে শিল্প পুঁজির ঘাটতি রহিয়াছে। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পন্থা গ্রহণের পর ভারতে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য পুঁজির প্রয়োজন বাড়িয়াছে। বিদেশী পুঁজির সাহায্যে দেশে পুঁজির ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

২. **দেশীয় সঞ্চয় হার বৃদ্ধিতে উৎসাহ দান :** ভারতে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া দেশীয় সঞ্চয় হার বৃদ্ধিতে উৎসাহদান করিতে পারে।

৩. **ঝুঁকি বহন :** ভারতীয় সঞ্চয়কারীগণ ঝুঁকিবিমুখ। সেজন্য শিল্পক্ষেত্রে তাহারা অগ্রসর হয় না। পক্ষান্তরে বিদেশী বিনিয়োগকারিগণ তাহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ শিক্ষা হইতে বিভিন্ন শিল্পের সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া সহজেই নূতন নূতন শিল্প স্থাপনের ঝুঁকি গ্রহণ করে। ভারতে অতীতকালে যন্ত্রশিল্প স্থাপনের ঝুঁকি বিদেশী পুঁজিই বহন করিয়াছে।

৪. **কারিগরি ও সাংগঠনিক জ্ঞান :** ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে আধুনিক শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার বিশিষ্ট কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে। এজন্য বিদেশী সহায়তা প্রয়োজন। এবং বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রণের দ্বারা এই সুবিধা সহজেই লাভ করা যায়।

৫. **বিদেশী মুদ্রার সংস্থান :** শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে নানাবিধ যন্ত্রপাতি কলকবজা বিদেশ হইতে আমদানির প্রয়োজন দেখা দেয়। স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্জিত বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ স্বভাবতই অপর্যাপ্ত বলিয়া শিল্পের প্রয়োজনে উক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে গিয়া যে প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত (unfavourable balance of payment) দেখা দেয় তাহা বিদেশী পুঁজির সহায়তায় সহজেই দূর করা যায়।

৬. **মুদ্রাস্ফীতি পরিহার :** শিল্পোন্নয়নের জন্য বিদেশী পুঁজির সাহায্য ছাড়া নানাবিধ যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইলে রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা মূল্যশোধ করিতে হয়। ভারতে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে বিপুল পরিমাণ রপ্তানি করা প্রয়োজন হইবে তাহাতে দেশে নানাবিধ ভোগ্যপণ্যের ঘাটতি দেখা দিবে এবং ইহার ফলে একদিকে ভোগকারীদের প্রচণ্ড অসুবিধা ও অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়িবে। বিদেশী পুঁজির সাহায্য লইলে এই অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

বিদেশী পুঁজি আমন্ত্রণের অসুবিধা : বিপক্ষে যুক্তি
ARGUMENTS AGAINST FOREIGN CAPITAL

শিল্পায়নে বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরতার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শিত হয় :

১. **দেশীয় সম্পদের যথেচ্ছ শোষণ :** দ্রুত মুনাফালাভের জন্য বিদেশী পুঁজি সাধারণত বাণিজ্যমূলক প্রচেষ্টায় অধিক আকৃষ্ট হয়। এই জন্যই ভারতে খনিজ উত্তোলন ও বাগিচা শিল্পে অধিক পরিমাণে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োজিত হইয়াছে। ইহাতে দেশীয় সম্পদের

অপব্যবহার ঘটিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ব্রিটিশ আমলে কেবলমাত্র বিপুল মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে ধাতু নিষ্কাশক কয়লা (metallurgical coal) ভারতের বাহিরে রপ্তানির ফলে ভারতের সীমাবদ্ধ ঐ জাতীয় কয়লার যোগান শোচনীয়ভাবে হ্রাস পায়। অথচ ঐ সম্পদ দেশের সার্বিক প্রয়োজনে সংরক্ষণ করার একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাহা ছাড়া অধিক মুনাফার জন্য ভোগ্যপণ্যশিল্পেও ইহা উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে দেশে রপ্তানিনির্ভর ও ভারসাম্যহীন শিল্প প্রসার ঘটে।

২. **দেশীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা :** বিদেশী পুঁজির আগমনে শিল্পায়নের অগ্রগতি হইলেও দেশীয় উদ্যোগ ও পুঁজি সাধারণভাবে ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হয়। অভিজ্ঞতা, আর্থিক শক্তি, নৈপুণ্য ইত্যাদি বিষয়ে দেশীয় শিল্প সচরাচর বিদেশী পুঁজির সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে না। ফলে ইহার অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

৩. **পক্ষপাতিত্ব :** বিদেশী পুঁজির দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ, বীমা, পরিবহণ ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করে।

৪. **উচ্চতর লাভের শর্ত :** সাধারণত উচ্চতর লাভের নিশ্চয়তা ছাড়া বেসরকারী বিদেশী পুঁজি আগমনে সম্মত হয় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যাইতে পারে যে ভারতে বিনিয়োজিত কানাডীয় পুঁজিতে ৩৩.৩ শতাংশ হারে ও মার্কিন পুঁজিতে ১৯.২ শতাংশ হারে মুনাফা দিতে হইয়াছে। তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োজিত মার্কিন পুঁজিতে প্রাপ্ত লাভের হার ১০-১২ শতাংশের বেশী নহে[১]।

৫. **অনিশ্চয়তা :** বিদেশী পুঁজি কখন দেশ পরিত্যাগ করিবে তাহার কোন স্থিরতা থাকে না। দেশত্যাগী বিদেশী পুঁজি পরিকল্পিত অযত্ন ও অবহেলা দ্বারা শিল্পের নানা বিধ ক্ষতিসাধন করে। এ সম্পর্কে বৃটিশ পুঁজিপরিত্যক্ত ভারতের চা-বাগানগুলির শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৬. **নিরাপত্তার অভাব :** যুদ্ধ অথবা শান্তি যে কোন অবস্থাতেই বুনিয়াদী ও ভারী শিল্পে বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরতা জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক।

৭. **শিল্প কৌশল গোপন :** বিদেশী পুঁজি দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উহাতে দেশীয় শ্রমিক নিয়োগ করিলেও উৎপাদন-সংক্রান্ত নিজস্ব গোপনতথ্য সহজে প্রকাশ করিতে চাহে না। ফলে ঐ বিষয়ে স্বল্পোন্নত দেশগুলি চিরকালই পশ্চাৎপদ হইয়া থাকে।

৮. **বিদেশী একচেটিয়া কারবারের প্রসার :** ইদানীংকালের তথ্যাদি হইতে দেখা যায় যে বিদেশী পুঁজি স্বল্পোন্নত দেশে বিনিয়োগের ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট ধারা ও নীতি অনুসরণ করে। দেখা যাইতেছে যে সাধারণত বিদেশী একচেটিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে উহাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি দ্বারা শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিয়া উহাদের কারবারের আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি ঘটাইতেছে। এবং ইহাতেও উহারা অল্প কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শিল্পই বাছিয়া লইয়াছে। ভারতে ১৯৪৮ সাল হইতে এ পর্যন্ত যে নূতন বিদেশী পুঁজি বিনিযোজিত হইয়াছে উহার ৭৫ শতাংশ খনিজতৈল ও বিবিধ দ্রব্য উৎপাদন শিল্পে বিনিযোজিত হইয়াছে।

৯. **বিদেশীমুদ্রা তহবিলের উপরে চাপবৃদ্ধি :** বিদেশী পুঁজির আগমনে যেমন বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত নানাবিধ সংকটের সাময়িক সমাধান সহজ হয় তেমনি ঐ পুঁজির নির্গমন

১. Census of Foreign Assets & Liabilities, Reserve Bank of India.

এবং উহার সুদ ও লভ্যাংশ প্রেরণে বিদেশী মুদ্রা তহবিল নিঃশেষ হইতে থাকে। ১৯৫৮-৫৮ সালে ভারতে মোট ১৫৫ কোটি টাকার বিদেশী পুঁজির আগমন হইয়াছে। অথচ ঐ সময়ে পুঁজির নির্গমন ও সুদ ও লভ্যাংশ প্রেরণবাবদ ভারতের ৩৭৫ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে।

১০. **অর্থনীতিক শোষণ ও রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণঃ** দেশ হইতে সুদ ও লভ্যাংশ বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়া যায়। ইহাতে দেশের পুঁজি গঠনের হার যথোপযুক্ত রূপে বাড়ে না। শুধু তাহাই নহে এই অর্থনীতিক লাভ ও শোষণ সুনিশ্চিত করিবার জন্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলি স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে রাজনীতিক জালে জড়াইয়া উহাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করিবার চেষ্টা করে।

মন্তব্যঃ বিদেশী পুঁজির সাহায্যে শিল্পায়নের নীতিকে দেশের অর্থনীতিক ও রাজনীতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত। বিদেশী পুঁজি সর্বক্ষেত্রে ও সর্বঅবস্থাতেই বিদেশী বলিয়াই অস্পৃশ্য এবং বর্জনীয় এই রকমের কোন চিরস্থির সিদ্ধান্ত বর্তমান জগতে গ্রহণ করা যায় না। অনগ্রসর দেশগুলিকে উন্নয়নের কাজে পুঁজি দ্বারা সহায়তা করা কর্তব্য এই উপলব্ধি বিশেষ করিয়া যুদ্ধ পরবর্তীকালে অগ্রসর দেশগুলির চেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছে। একদেশ হইতে পুঁজি অপর দেশে প্রবাহিত হইয়াছে। দুর্বল ভগ্নদশাগ্রস্ত অর্থনীতিক বুনিয়াদকে আপাতদৃষ্টিতে দৃঢ় করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। সাফল্য ও অসাফল্য দুই-ই জুটিয়াছে। বিভিন্নরূপে পুঁজি অনগ্রসর দেশগুলিতে শুধুমাত্র আর্থিক শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইলে তর্কাতীতভাবে তাহা গ্রহণযোগ্য ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু আধুনিককালের চলমান জগতের অভিজ্ঞতা এই আকাঙ্ক্ষাকে বিঘ্নিত করে। রাজনীতিক নাগপাশ অর্থনীতিতে সহায়তার অনুষঙ্গ হিসাবে আসিয়া পড়ে। অগ্রসরদেশ আপন রাজনীতিক কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত করিতে প্রয়াসী হয়। ফলে অর্থনীতিক ও রাজনীতিক উভয় প্রকারের স্বাধীনতার কার্যত বিনাশ ঘটে।[১]

ভারতের অতীত অভিজ্ঞতা ইহার সাক্ষ্য বহন করে। এই কারণেই বিদেশী পুঁজির প্রতি এত তীব্র অভিযোগ। নতুন পটভূমিকায় সব কিছুরই নূতন বিশ্লেষণ প্রয়োজন। একথা আজ ভারতীয় নীতিতে স্বীকৃত হউক যে বিদেশী সাহায্য ও পুঁজির আগমন আন্তরিক ভাবেই চাহিব, তবে শর্তহীনভাবে। রাজনীতিক বা অর্থনীতিক কোন শর্তই যেন বিদেশী পুঁজির আগমনের পশ্চাতে না থাকে। জাতীয় সার্বভৌমত্বের খাতিরেই এই শর্তহীনতার শর্ত অপরিহার্য।

ইদানীংকালে ভারতে বিদেশী পুঁজির আগমনে কতটা উপকার ঘটিয়াছে সে সম্পর্কে অধ্যাপক বি. আর. সেনয় সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রথম পরিকল্পনাকালে আগত বিদেশী সাহায্যের অধিকাংশই সোনার চোরাই আমদানিকার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রাপ্ত বিদেশী সাহায্যের একটি বৃহৎ অংশ প্রধানত খাদ্যশস্যের গোপন মজুদ ধারণ ও অংশত চোরাই সোনা আমদানি কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। উহার সামান্যই বিদেশী পুঁজিপতিগণ ভারতীয় সম্পত্তি খরিদের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার মতে, ভারতে আগত বিদেশী পুঁজির অপব্যবহারের দরুন, উহা দেশে পুঁজিগঠনের কাজে সবিশেষ সাহায্য করে নাই।

১. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে (থাইল্যাণ্ড, মালয়, লাওস ও ফিলিপাইন, দঃ ভিয়েতনাম, পাকিস্তান, ইরাণ প্রভৃতি) সাহায্যের নামে যুদ্ধ জোটে জড়াইবার মার্কিনী দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে সরকারী নীতি
GOVERNMENT POLICY REGARDING FOREIGN CAPITAL

১. **স্বাধীনতার পূর্বযুগে** তদানীন্তন ভারতসরকারের নীতি ছিল ভারতে **বিদেশী (বৃটিশ)** পুঁজির শর্তবিহীন অনিয়ন্ত্রিত আগমন। কিন্তু ভারতের শিল্পে, বহির্বাণিজ্যে ও ব্যাঙ্কিং-ব্যবসায়ে বিদেশী পুঁজির আধিপত্য, বিদেশী শাসন ও শাসকশক্তি কর্তৃক বিদেশী পুঁজির প্রতি আনুকূল্য এবং দেশীয় শিল্পের প্রতি বিদেশী পুঁজির বিরোধিতা—এ সকল কারণে দেশবাসীও জাতীয় নেতৃত্ব বিদেশী পুঁজির নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিল।

২. **স্বাধীনতালাভের পর** বিদেশী পুঁজির প্রতি দেশবাসী ও স্বাধীন সরকারের মনোভাব উহার অনুকূলে পরিবর্তিত হয়। বিদেশী পুঁজি সম্পর্কে স্বাধীনভারত সরকারের মনোভাব ও মূল নীতি দুইটি ঘোষণায় প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে একটি ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ঘোষিত প্রথম শিল্পনীতি ও অপরটি ১৯৪৯ সালের ৬ই এপ্রিল পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি।

দেশের দ্রুত শিল্পায়নে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজনীয় সহায়তার গুরুত্ব উল্লেখ করিয়া **প্রথম শিল্পনীতিতে বলা হয়**—১. ভারতীয় শিল্পে বিদেশী পুঁজির অংশ গ্রহণের বিষয়টি প্রতিক্ষেত্রে সতর্ক বিবেচনা করিয়া মঞ্জুর করিবার জন্য প্রয়োজন রহিয়াছে। এজন্য আইন পাস করা আবশ্যক। ২. বিদেশী পুঁজির দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠানের গরিষ্ঠ মালিকানা ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণভার ভারতীয়গণের হস্তে থাকা আবশ্যক। ৩. বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের স্থান যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়গণের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয় সে জন্য সকলক্ষেত্রে ভারতীয়গণের উপযুক্ত কারিগরি ও বিশেষজ্ঞোচিত শিক্ষাদান ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।

পার্লামেন্টের নিকট **১৯৪৯ সালের ৬ই এপ্রিল বিবৃতিতে** ভারতের প্রধান মন্ত্রী ভারত সরকারের মনোভাবের আরও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ঘোষণা করেন যে, অতীতে যে পরিবেশে বিদেশী পুঁজির নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হইত, স্বাধীনতালাভের পর তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে বিদেশী পুঁজি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইল দেশের সর্বাধিক সুবিধার জন্য উহার ব্যবহার। শুধু ভারতের সঞ্চয়ের স্বল্পতার জন্য নহে, বিদেশী বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও শিল্পজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির সুবিধার জন্য বিদেশী পুঁজির প্রয়োজন রহিয়াছে। তিনি বলেন যে,—১. দেশী বিদেশী সকল প্রতিষ্ঠান সরকারের শিল্পনীতি মান্য করিয়া চলিবে। ২. দেশী ও বিদেশী পুঁজির মধ্যে কোন তারতম্য করা হইবে না। ৩. সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়াই বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা অর্জন করিতে হইবে। ৪. কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ ঘটিলে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইবে। ৫. বিদেশী পুঁজির মুনাফা উহার স্বদেশে প্রেরণের বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত থাকিবে এবং উহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ইচ্ছাও সরকারের নাই। তবে, এ সম্পর্কে বিদেশী মুদ্রার পরিস্থিতির উপর বিষয়টি নির্ভর করিবে। **প্রথম পরিকল্পনায়ও** দ্রুত শিল্পায়নের জন্য বিদেশী পুঁজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ইঙ্গিত করা হয়। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনা-কালে আশানুরূপ পরিমাণে বিদেশী পুঁজির আগমন না ঘটায় ও বিদেশী সহায়তা না পাওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের প্রারম্ভে উহার প্রতি সন্দেহ দেখা দেয়।

প্রথম পরিকল্পনাকালে ভারত সরকার কর্তৃক বিদেশী পুঁজি আগমনে উৎসাহদানের নীতি অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও ভারত-প্রবেশে উহার অনিচ্ছার প্রধান কারণগুলি হইতেছে—১. ভারত সরকার কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্য গ্রহণ; ২. রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের

প্রাধান্ত ঘোষণা ; এবং ৩. ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে সংবিধানের সংশোধন দ্বারা বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে উহার ক্ষতিপূরণ দানের বিষয়টিকে আদালতের এক্তিয়ার হইতে পার্লামেন্টের বিশেষ অধিকারভুক্তকরণের ঘটনা।

৩. ভারত সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতিতে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার সামান্ত লক্ষণগুলি বিশ্বব্যাঙ্কসহ বিদেশী বিনিয়োগকারিগণ কর্তৃক সমালোচিত হইলে, এবং **দ্বিতীয় পরিকল্পনার** প্রথম দুই বৎসরে বিদেশী মুদ্রাসংকট দেখা দিলে, ভারত সরকারের বিদেশী পুঁজি সংক্রান্ত নীতিতে পুনরায় পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে ১৯৪৮ সালের প্রথম শিল্পনীতিতে বিদেশী পুঁজি সংক্রান্ত যে নীতি গৃহীত হইয়াছিল তাহাই অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। এখন পর্যন্ত ঐ মূল নীতি অব্যাহত থাকিলেও উহার ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগে বিদেশী পুঁজির প্রতি অধিকতর উদারতা প্রদর্শিত হইতেছে। ১৯৫৬ সালের পর ভারত সরকার নানাবিধ ব্যবস্থার দ্বারা বিদেশী পুঁজির দ্বিধাহীন আগমনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতে ও স্বদেশে বিদেশী পুঁজির মুনাফার উপর যাহাতে দুইবার কর ধার্য না হয় সেই জন্য ভারত সরকারের উৎকণ্ঠা, ১৯৫৭ সালে মার্কিন পুঁজির মুনাফা প্রেরণ ও আসলের নির্গমন সম্বন্ধে মার্কিন সরকারের সহিত ভারত সরকারের চুক্তি এবং সম্প্রতি বিদেশে বিনিয়োগে ইচ্ছুক মার্কিন পুঁজির জাতীয়করণ ও অন্যান্য ঝুঁকির বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের গ্যারান্টি প্রদানের পরিকল্পনায় সম্মতিদানের জন্য ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে ভারত সরকারের বিদেশী পুঁজিসংক্রান্ত নীতি ক্রমে বিদেশী পুঁজির নিয়ন্ত্রণের নীতি হইতে উহাকে সাদর আহ্বানের নীতিতে পরিবর্তিত হইয়াছে। অথচ একই সঙ্গে পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের স্বার্থে বিদেশী পুঁজির আগমন নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সরকার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতেও পারিতেছেন না।

৪. **বর্তমান সরকারী নীতি** এই ভাবে প্রকাশ করা যায়—ক. বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের প্রতিটি আবেদন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দ্বারা বিবেচিত হয়: ১. উহাতে প্রকৃতই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিবে কিনা। ২. যে শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা আবেদনপত্রে বলা হইয়াছে সে ক্ষেত্রে দেশীয় পুঁজি ও কারিগরবিজ্ঞানের অভাব আছে কিনা। ৩. উহাতে বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হইবে কিনা অথবা বিদেশী মুদ্রার উপার্জন বাড়িবে কিনা। ৪. দেশের উৎপাদনশীলতা তাহাতে বাড়িবে কিনা। খ. বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয় নাই। যে ক্ষেত্রে ভারতীয় পুঁজি বিনিয়োজিত হইয়াছে তথায় চাহিদার তুলনায় বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা অল্প হইলে বিদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সে জন্য ভোগ্যপণ্য শিল্পেও বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ সম্ভব। গ. সাধারণভাবে বাণিজ্যিক কারবারে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগের অনুমতি দানে বিরোধী হইলেও যে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ কারিগরি জ্ঞানের আবশ্যক সে সকল বাণিজ্যিক প্রচেষ্টায়ও সরকার বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে সম্মতি দিতে পারেন। ঘ. সাধারণ ভাবে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের গরিষ্ঠ মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে ভারতীয় অংশগ্রহণের নীতি অনুসরণ করিলেও ১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে প্রদত্ত ঘোষণায় ভারত সরকার ইহাকে কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্য এই যে নূতন বিদেশী প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ পুঁজি বিদেশীগণ সরবরাহ করিলেও যদি উহার সাহায্যে উহার ভারতীয় অংশীদারগণ ভারতীয় কারিগরিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটাইতে সমর্থ হয় তাহা হইলে ভারত সরকার এই প্রকার বিদেশী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দিতে পারেন।

উপরোক্ত উদার নীতির ফলেও প্রয়োজনীয় বিদেশী পুঁজির আগমন আশানুরূপ হারে

৬

শিল্পের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা
Industrial Administration and Management

পরিচালনা বলিতে শিল্প সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ, নীতি নির্ধারণ এবং প্রধান লক্ষ্য স্থির করিবার কার্যাবলীকে বুঝায়। আর ব্যবস্থাপনা শব্দটির দ্বারা পরিচালনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনের জন্য সংগঠনের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন, উহাদের দৈনন্দিন তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ বুঝায়। অভীষ্ট পূরণের জন্য মন যেমন দেহকে চালনা করে, ব্যবস্থাপনাকর্তৃপক্ষ তেমনি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুসংবদ্ধ, সঞ্জীবিত, চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। কলকারখানা স্থাপন ও পুঁজির সংস্থান শিল্প সংগঠনের একদিক মাত্র। অপর দিক হইতেছে উহার লোকবলের উপযুক্ত ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশকে সুসংহত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া উহাকে নিরুপদ্রব কার্যক্ষমতা দান করা। ইহার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, অনুভূতিশীল ও উদ্ভাবনীশক্তি সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। শিল্প সংগঠনের সাফল্য এজন্য উহার সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষরূপে নির্ভর করে।

ভারতের শিল্পক্ষেত্র বর্তমানে দুইটি অংশে বিভক্ত। একটি বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র (Private Sector)। অপরটি রাষ্ট্রায়ত্ত বা সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র (State or Public Sector)। স্বভাবতই উভয় ক্ষেত্রেই সুদক্ষ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রহিয়াছে। এজন্য প্রথমে বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প ব্যবস্থাপনার আলোচনা করিয়া পরে রাষ্ট্রায়ত্তক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনার বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প-ব্যবস্থাপনা
INDUSTRIAL MANAGEMENT IN THE PRIVATE SECTOR

ভারতের বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে যৌথমূলধনী কারবাররূপে গঠিত বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলির তিন প্রকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলিত। যথা, ১. ম্যানেজিং এজেন্ট কর্তৃক ব্যবস্থাপনা। ২. পরিচালক পর্ষৎ কর্তৃক ব্যবস্থাপনা। ও ৩ সেক্রেটারিজ ও ট্রেজারাস কর্তৃক ব্যবস্থাপনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার ভার প্রধানত 'ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি' বা ম্যানেজিং এজেন্টগণের (Managing Agents) উপর ন্যস্ত। এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডারগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত পরিচালক পর্ষৎ (Board of Directors) থাকিলেও উহা পরিচালন কর্তৃপক্ষ মাত্র। প্রতিষ্ঠানগুলির দৈনন্দিন কার্য-পরিচালনভার ব্যবস্থাপক প্রতিনিধি বা ম্যানেজিং এজেন্টগণই বহন করে।

ম্যানেজিং এজেন্সীপ্রথা
THE MANAGING AGENCY SYSTEM

ক. সূত্রপাত ঃ (origin) ঃ ভারতে কাঁচামালের প্রাচুর্য, সুলভ শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান ও বিরাট বাজার থাকায় আধুনিক শিল্প প্রসারের বিপুল সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া বৃটেনের শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারিগণ এদেশে যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই এজন্য বিদেশী অর্থাৎ বৃটিশ পুঁজি ও প্রচেষ্টায় আধুনিক শিল্প স্থাপনের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সে প্রচেষ্টা সফল হইতে থাকে ও বৃটিশ পুঁজির মালিকানা ও পরিচালনায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল ইংলণ্ডে গঠিত। ইংলণ্ডে অবস্থিত বিনিয়োগকারিগণ হইতে ভারতের ভৌগোলিক দূরত্ব, ভারতে স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তার এবং যন্ত্রশিল্পের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও কারিগরি-

জ্ঞানের অভাব, এই সকল কারণে ইংলণ্ডে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থাপনার ভার লইবার উপযুক্ত অথচ এদেশের অবস্থা ও জনসমাজের সহিত পরিচিত এবং বৃটিশ বিনিয়োগকারিগণের আস্থাভাজন একশ্রেণীর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়। সে সময় ভারতে বসবাসকারী, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী ও পূর্ব হইতে এদেশে বাণিজ্যরত কয়েকটি ইংরেজ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইংলণ্ডে গঠিত অথচ ভারতে কার্যরত বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত এই সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ম্যানেজিং এজেন্টরূপে পরিচিতি লাভ করে। ঠিক্ কোন্ সময় হইতে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হয় তাহা জানা না গেলেও অনেকের অনুমান যে ১৮৩৩ সালে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক অধিকার বিলোপের পর হইতে ইহাদের কার্যকলাপ আরম্ভ হয়।[১] পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কার্যেও ম্যানেজিং এজেন্টগণ নিযুক্ত হইতে থাকে। বলা যাইতে পারে ইহা শিল্পের ব্যবস্থাপনার এক ঔপনিবেশিক প্রথা। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থারই ইহা অনুষঙ্গ।

খ. সংজ্ঞা (**definition**) ঃ কোন শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জন্য চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ (individual), অংশীদারী কারবার (partnership), অথবা যৌথ-মূলধনী কারবার কেই (প্রাইভেট বা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী) ম্যানেজিং এজেন্ট বলা হয়। সাধারণতঃ বৃহদায়তন যৌথমূলধনী শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার জন্য ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারতের প্রতি ৩টি যৌথমূলধনী কারবারের মধ্যে একটির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণভার ম্যানেজিং এজেন্টের উপর ন্যস্ত ছিল।[২]

গ. ভূমিকা (**role**) ঃ ভারতের দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের ভাষায় 'ভারতের শিল্পায়নের প্রথমযুগে, যখন উদ্যোগ ও পুঁজি কোনটিই পর্যাপ্ত ছিল না, সে সময়ে ম্যানেজিং এজেন্টগণই উভয়ের যোগান দিয়াছে এবং তুলাবস্ত্র, চটকল, ইস্পাত প্রভৃতির মত ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি কয়েকটি সুবিখ্যাত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তনের উৎসাহ এবং সযত্ন লালনপালনের জন্যই বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।" ভারতে এমন কোন সুসংগঠিত শিল্প নাই বলিলে চলে, যাহা ম্যানেজিং এজেন্টগণের দ্বারা উপকৃত হয় নাই। চটকল, তুলাবস্ত্র, লৌহ ইস্পাত, সিমেন্ট, কাগজ, চা, রবার ও কফি বাগিচা, কয়লাখনিশিল্প ইত্যাদি দেশের সকল প্রধান শিল্পই ম্যানেজিং এজেন্টগণের দ্বারা প্রবর্তিত ও ব্যবস্থাপিত। ইহারাই গত শতাব্দীতে ভারতের শিল্পসম্ভাবনা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়া শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক ঝুঁকি বহন করিয়া নিজেদের কঠোর পরিশ্রমে শিল্প প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জনের দ্বারা শিল্পায়নে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করিয়াছে ও ভারতের শিল্পায়নের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে।

ঘ. কার্যাবলী ও সুফল (**functions and merits**) ঃ ম্যানেজিং এজেন্টগণের কার্যাবলী তিন প্রকারের। ১. তাহারা বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তক (**promoters**)। ২. তাহারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক (managers)। ৩. তাহারা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থসংস্থানকারী (**financiers**)। এই তিনপ্রকার কার্যাবলীর মধ্য দিয়া তাহারা শিল্পের সেবা করিয়া থাকে।

১. **The Economic Problems of India. Vera Anstey. p. 113.**

২. **Research and Statistics Division of the Company Law Administration.**

শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তনা (promotion) : যে কোন আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠা স্থাপনের পূর্বে উহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্য চালাইতে হয় (preliminary investigation) ও প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলী সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে হয় (long term planning)। এই সকল কার্য ব্যয়, পরিশ্রম ও সময়সাপেক্ষ। আশানুরূপ সম্ভাবনা দেখা না গেলে অনেক সময় শেষপর্যন্ত আর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় না। ফলে অর্থ ও শ্রম বৃথা নষ্ট হয়। ইহাই শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রবর্তনের ঝুঁকি। এই ঝুঁকি ম্যানেজিং এজেন্টগণই বহন করে। আর, যে সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ঘটে, তথায় প্রতিষ্ঠানটি উন্নতিলাভ না করা পর্যন্ত ম্যানেজিং এজেন্টগণ উহার সযত্ন শুশ্রূষার (nursing) দায়িত্ব গ্রহণ করে।

২ **ব্যবস্থাপনা** (management) : অতীতে দেশে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ও কারিগরী বিষয়ে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞের যথেষ্ট অভাব ছিল। বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলি সে সময় একাধিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া এই অভাব পূরণ করিয়াছে। ইহার ফলে যৌথমূলধনী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পৃথক আইনগত অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই অথচ, একযোগে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান একই ম্যানেজিং এজেন্টের ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকায়, ব্যবস্থাপনায় কাহারও ব্যয় অধিক হয় নাই।

৩. **অর্থসংস্থান** (finance) : আধুনিক যৌথমূলধনী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য দেশের পুঁজির বাজার ও জনসাধারণের মধ্যে বিনিয়োগের মনোবৃত্তি সৃষ্টি হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু ভারতের সঞ্চয়কারিগণের মধ্যে ঝুঁকিবিমুখতা, উপযুক্ত পুঁজির বাজারের অভাব শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অনিচ্ছা প্রভৃতি কারণে ম্যানেজিং এজেন্টগণকে উহাদের প্রবর্তিত ও ব্যবস্থাপনার অধীনে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইয়াছে। উহাদের সন্তোষজনক আর্থিক অবস্থা ও উহাদের মাধ্যমে বিদেশী পুঁজির আগমন ভারতের দেশীয় পুঁজির অভাব অনেকাংশে দূর করিয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্টগণ নিম্নোক্ত নানাভাবে অর্থসংস্থানে সাহায্য করিয়া থাকে—ক. বিখ্যাত কোন ম্যানেজিং এজেন্টের ব্যবস্থাপনার অধীনস্থ যৌথমূলধনী শিল্পপ্রতিষ্ঠান বাজারে ম্যানেজিং এজেন্টের সুনামের জন্য সহজেই উহার শেয়ার ডিবেঞ্চার বিক্রয় দ্বারা অর্থ সংগ্রহে সমর্থ হয়। খ. ম্যানেজিং এজেন্টগণ নিজেরাও উহাদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ডিবেঞ্চার কিনিয়া লগ্নী করিয়া থাকে। ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানেই এরূপ বেশি দেখা যায়। গ. সুপরিচিত ম্যানেজিং এজেন্টগণ জনসাধারণের নিকট হইতে মেয়াদী আমানত গ্রহণ করে ও তাহা হইতে উচ্চতর সুদের শর্তে অধীনস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ঋণদান করে। ঘ অধীনস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ঋণদাতাগণের নিকট হইতে ঋণ লইবার ব্যবস্থা করিলে ম্যানেজিং এজেন্টগণ সেক্ষেত্রে ঋণপরিশোধের নিশ্চয়তা দিয়া (guarantee) ঋণ প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। ঙ. ম্যানেজিং এজেন্টগণ পৃথকভাবে লগ্নী প্রতিষ্ঠান (investment trust) স্থাপন করিয়া উহাদের দ্বারা অধীনস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে দীর্ঘ, মাঝারি ও স্বল্পমেয়াদী ঋণের যোগান দেয়। চ. অধীনস্থ এক প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ অপর প্রতিষ্ঠানে ঋণ দিয়া তাহারা অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির ঋণের চাহিদা পূরণ করিয়া থাকে। ছ. অতীতে ভারতের ম্যানেজিং শিল্প প্রতিষ্ঠানই প্রবর্তন ও চালনা করে নাই। তাহারা একই সঙ্গে বীমা, ব্যাঙ্কিং, লগ্নী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, পরিবহণ ও বাণিজ্যিক নানাবিধ প্রতিষ্ঠান প্রবর্তন ও উহাদের ব্যবস্থা-

পুনার ভার গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে উহাদের মাধ্যমে শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থলগ্নী কারবারের এক সংহতি (integration) গঠিত হইয়াছে। ফলে অধীনস্থ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ঋণ-প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা হয় নাই। জ. ম্যানেজিং এজেন্টগণের মাধ্যমে দেশে বিদেশী পুঁজির আগমনে উহাদের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির পুঁজির অভাব বিদেশী পুঁজির দ্বারা আংশিকভাবে পূরণ হইয়াছে।

সংক্ষেপে, ইহাই হইতেছে ভারতে ম্যানেজিং এজেন্টগণের কার্যকলাপ ও ভারতীয় শিল্পের উন্নয়নে ম্যানেজিং এজেন্টগণের অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ঙ **ম্যানেজিং এজেন্সীপ্রথার ত্রুটি বা কুফল** (**defects or evils of the Managing Agency system**): ভারতের শিল্পোন্নতিতে নানাভাবে সহায়তা করা সত্ত্বেও ম্যানেজিং এজেন্টগণের বিরুদ্ধে নানাবিধ অনাচারের (malpractices) অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। ঐ অভিযোগগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

১ **প্রবর্তনাসম্পর্কিত অভিযোগ**—ক. ম্যানেজিং এজেন্টগণ শিল্পকারবার প্রবর্তন করিতে গিয়া প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠানের নিকট অধিকমূল্যে যন্ত্রপাতি বিক্রয় এবং উচ্চহারে প্রবর্তনার পারিশ্রমিক আদায় করিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ব্যয়ভার চাপাইয়া দেয়। খ. ইহাদের হস্তে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির একচেটিয়া কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়াছে। গ. ম্যানেজিং এজেন্টগণ এদেশে প্রধানত ভোগ্যপণ্য ও বাগিচা শিল্পস্থাপনেই উদ্যোগ লইয়াছে। ফলে দেশের শিল্পায়নে ভারসাম্যের অভাব ঘটিয়াছে।

২ **ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অভিযোগ**—ক. বর্তমানের অনেক ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানই উহাদের অতীতের উদ্যোগ ও ঝুঁকি বহনের মনোভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের অনেকেরই আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার উপযোগী প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা নাই। ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলিতেই এরূপ বেশি দেখা যায়। খ অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে উহারা মুনাফার তুলনায় অত্যধিক হারে ব্যবস্থাপনার পারিশ্রমিক আদায় করিয়াছে। গ ইদানীংকালে দেখা গিয়াছে যে ম্যানেজিং এজেন্টগণ অত্যধিক মূল্যে একে অপরের নিকট ব্যবস্থাপনার অধিকার বিক্রয় করিয়া প্রভূত মুনাফা করিয়াছে। ইহাতে অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

৩. **অর্থসংস্থান সম্পর্কে অভিযোগ**—ক. ম্যানেজিং এজেন্টগণ অত্যধিক চড়া সুদে ঋণ দিয়াছে। খ. তাহারা বেহিসাবী ব্যয় প্রভৃতির দ্বারা অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের অর্থের অপব্যয় করিয়াছে। গ অধীনস্থ কোম্পানীগুলি ম্যানেজিং এজেন্টগণের স্বার্থে ও হুকুমে চড়াহারে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়া, নানারূপ ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে। ঘ. ম্যানেজিং এজেন্টগণ অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থাপনাকার্যে শিল্পগত স্বার্থ অপেক্ষা আর্থিক স্বার্থের দ্বারাই অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে। ইহাতে শেষ পর্যন্ত শিল্পের ক্ষতি ঘটিয়াছে। ঙ. তাহাদের নিকট অবস্থিত অধীনস্থ কোম্পানীগুলির প্রচুর অর্থ ম্যানেজিং এজেন্টগণকে ফট্‌কাকারবারে প্রলোভিত করিয়াছে। ইহাতে অধীনস্থ কোম্পানীগুলির সর্বনাশ ঘটিয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্সীর কুফলের প্রতিকার
REMEDIES

ম্যানেজিং এজেন্সীপ্রথার অনাচার ও ত্রুটি দূর করিবার জন্য ১৯৩৬ সালের সংশোধিত কোম্পানী আইনে ম্যানেজিং এজেন্টগণের উপর কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। কিন্তু

ইহাতেও প্রথাটি ত্রুটিমুক্ত না হওয়ায় অবশেষে ১৯৫৬ সালে নূতন কোম্পানী আইন পাস করিয়া ম্যানেজিং এজেন্টগণের কার্যাবলী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সর্বশেষে ১৯৬০ সালে উক্ত আইনের সংশোধন দ্বারা কোম্পানীসমূহের ব্যবস্থাপনার জন্য 'সচিব ও কোষাধ্যক্ষ' প্রতিষ্ঠান নামক নূতন প্রকারের ব্যবস্থাপকসংস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

ক. ১৯৫৬ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইনের দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্সীর উপর আরোপিত বিধিনিষেধ :

১. **নিয়োগ ও কার্যকাল :** ক. ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ বা পুনর্নিয়োগে কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারগণের সাধারণ সভায় প্রস্তাব পাস করিয়া উহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি লইতে হইবে। খ. ১৫ বৎসরের বেশি সময়ের জন্য প্রথম নিয়োগ ও পরে ১০ বৎসরের বেশি সময়ের জন্য পুনর্নিয়োগ করা চলিবে না।

২ **অধীনস্থ কোম্পানীর সংখ্যা :** কোন ম্যানেজিং এজেন্ট ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্টের পর ১০টির অধিক কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব লইতে পারিবে না।

৩. **পদ শূন্য হওয়া, অপসারণ ও বরখাস্ত :** ক ম্যানেজিং এজেন্ট দেউলিয়া হইলে, ফৌজদারী অপরাধে উহার ৬ মাসকাল দণ্ড হইলে বা পদত্যাগ করিলে কিংবা ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কোন পরিবর্তন ঘটিলে, ম্যানেজিং এজেন্সীর পদ শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে। খ. ম্যানেজিং এজেন্টের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য আদালত কর্তৃক রিসিভার নিযুক্ত হইলে ম্যানেজিং এজেন্ট সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইবে। গ. প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ, গুরুতর অবহেলা বা অব্যবস্থার অভিযোগে অধীনস্থ কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণ ম্যানেজিং এজেন্টকে অপসারণ করিতে পারিবে।

৪. **পারিশ্রমিক :** ম্যানেজিং এজেন্টগণ অন্যূন ৫০,০০০ টাকা ও সর্বাধিক, অধীনস্থ কোম্পানীর মুনাফার ০ শতাংশ পর্যন্ত পারিশ্রমিকের অধিকারী হইবে। ইহার অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দানের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন আবশ্যক।

৫. **আর্থিক লেনদেন :** ক. অধীনস্থ এক কোম্পানীর অর্থ অন্য কোম্পানীতে ঋণ দেওয়া বা লগ্নী করা চলিবে না। খ ম্যানেজিং এজেন্ট অধীনস্থ কোন কোম্পানীর নিকট হইতে ঋণ লইতে পারিবে না। গ অধীনস্থ কোম্পানীর নিকট হইতে চলতি হিসাবে ২০,০০০ টাকার অধিক নিজের নিকট জমা রাখিতে পারিবে না।

৬. **ক্ষমতা ও কার্যাবলী :** ক. ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান স্বয়ং কোন ম্যানেজিং এজেন্টের অধীনস্থ হইবে না। খ. অধীনস্থ কোম্পানীর বিনা অনুমতিতে ম্যানেজিং এজেন্ট উহার সমজাতীয় কোন কারবার পরিচালনা করিতে পারিবে না। গ. পরিচালকমণ্ডলীর মোট সদস্য সংখ্যা ৫ জন হইলে, অধীনস্থ কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীতে ম্যানেজিং এজেন্ট ১ জনের বেশি ও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ৫ জনের বেশি হইলে ২ জনের বেশি সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবে না। ঘ. অধীনস্থ কোম্পানীর অনুমতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া ম্যানেজিং এজেন্ট অপর কাহারও নিকট অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাভার হস্তান্তরিত করিতে পারিবে না। ঙ উত্তরাধিকার সূত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী লাভ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি লইতে হইবে। চ কর্মচারী নিয়োগ ও স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ে ম্যানেজিং এজেন্ট অধীনস্থ কোম্পানীর নির্দেশ মান্য করিবে। ছ. অধীনস্থ কোম্পানীর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ম্যানেজিং এজেন্ট উহার সহিত কোন ক্রয়-বিক্রয় অথবা শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি বিক্রয়ের দায়গ্রাহকের কার্যের জন্য চুক্তিবদ্ধ হইতে পারিবে না।

৭. **অন্যান্য :** ক. কেন্দ্রীয় সরকার আবশ্যক মনে করিলে কোন শিল্পে বা কারবার বিশেষে ম্যানেজিং এজেন্ট লোপ করিতে পারিবে। খ. ম্যানেজিং এজেন্ট পদত্যাগ করিলে, উহার পদ শূন্য হইলে, উহাকে বরখাস্ত করা হইলে বা উহার দোষে কারবার উঠিয়া গেলে তজ্জন্য কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না। গ. ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্ববর্তী ২ বৎসরকালের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্টের পুনর্নিযোগ না ঘটিলে, ঐ তারিখ হইতে উহার কার্যকাল শেষ হইবে।

খ. ১৯৬০ সালের সংশোধিত কোম্পানী আইন : ইহার সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য ধারা এই যে, কোন প্রতিষ্ঠানেই একই সময়ে ম্যানেজিং এজেন্ট, সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড ট্রেজারার্স, ম্যানেজার বা ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রভৃতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে কোন একটির অধিক নিয়োগ করা চলিবে না। ইহাতে প্রতিষ্ঠানের অহেতুক ব্যয়বৃদ্ধি বন্ধ হইবে।

বর্তমান পরিস্থিতি
PRESENT POSITION

১৯৬০-৬১ সালে, ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্যে পরিণত হয়। উক্ত আইনমত ১৯৬০ সালের ১৫ই আগস্ট পুরাতন সকল ম্যানেজিং এজেন্টের কার্যকাল পুনর্নিযুক্ত না হইলে শেষ হয়। স্বভাবতই ঐ তারিখের মধ্যে অনেকের পুনর্নিয়োগ ঘটে, কয়েকটি ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান নূতন আইনে প্রবর্তিত সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড ট্রেজারার্স-এ রূপান্তরিত হয় ও কয়েকটি ম্যানেজিং এজেন্সী বাতিল হইয়া যায়। ফলে ১৯৬০ সালের ১৬ই আগস্ট ম্যানেজিং এজেন্টগণের অধীন কোম্পানীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩০৮। উহার পর হইতে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে স্থাপিত ৫৬৩৮টি কোম্পানীর মধ্যে মাত্র ৬৬টি কোম্পানীতে ম্যানেজিং এজেন্সী নিযুক্ত হয়, ৩৮৯৭টি কোম্পানী পরিচালক পর্ষৎ দ্বারা চালিত হইবে বলিয়া স্থির হয়, ১৬৪২টি কোম্পানী ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ দ্বারা, ১৩টি কোম্পানী সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড ট্রেজারার্স দ্বারা ও ১০টি কোম্পানী নূতন শ্রেণীর ম্যানেজার দ্বারা চালিত হইবে বলিয়া স্থির হয়।

ম্যানেজিং এজেন্সীর ভবিষ্যৎ
FUTURE

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে প্রভূত তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। **ইহার পক্ষাবলম্বিগণের মতে** নিম্নোক্ত কারণে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা বজায় রাখিবার প্রয়োজন রহিয়াছে : ১ ইহাদের অবসানে বিনিয়োগকারী এবং যৌথমূলধনী কারবারগুলির মধ্যে একটি অপরিহার্য যোগসূত্র ছিন্ন হইবে। ভারতে সুসংগঠিত পুঁজির বাজার না থাকায় ম্যানেজিং এজেন্টগণের বিলোপসাধনে অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। ২. ইহাদের অবলুপ্তি ভারতের শিল্পগুলিতে দীর্ঘ, মাঝারি ও স্বল্পমেয়াদী ঋণের যোগান সংকুচিত করিবে। ৩. ভারতের সুপরিচিত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় উহাদের অধীনস্থ কোম্পানীগুলির শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ক্রয়ে বিনিয়োগকারিগণ সহজেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের ন্যায় ভারতে পুঁজি সরবরাহকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান না থাকায় ঐ কার্যে ম্যানেজিং এজেন্টগণ একটি অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করিয়াছে। বর্তমানেও ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। দেশে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপক এবং ঝুঁকি বহনকারী প্রবর্তকের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। এই সকল কার্য সম্পাদনের জন্য ভারত ম্যানেজিং এজেন্টগণের নিকট ঋণী। বর্তমান শিল্প সম্প্রসারণের যুগে ইহাদের অবসান বেসরকারী শিল্পের অগ্রগতিকে ক্ষুণ্ণ করিবে।

এই প্রথার বিরোধিগণের মতে বর্তমানে ম্যানেজিং এজেণ্টগণের আর পূর্বের ন্যায় প্রয়োজনীয়তা নাই। উপরন্তু উহাদের অনাচারের জন্য এই প্রথার অবসানই বাঞ্ছনীয়। এই প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি নিম্নরূপ: ১. বর্তমানে পুঁজির বাজারের উন্নতি ঘটিয়াছে। ম্যানেজিং এজেণ্টগণও পূর্বের ন্যায় আর সবিশেষ শিল্পপুঁজি যোগান দেয় না। সরকারী উদ্যোগে দীর্ঘ ও মাঝারিমেয়াদে শিল্পঋণ সরবরাহের জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার বিলোপ সাধনে শিল্পপুঁজির যোগানে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না।

২. ম্যানেজিং এজেণ্টগণ তাহাদের কার্যকলাপে যেরূপ অনাচার ও দুর্নীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে তাহাতে শিল্প ব্যবস্থায় এরূপ সামন্ততান্ত্রিক প্রথার অবসানই সকল দিক দিয়া বাঞ্ছনীয়। শুধু অতীত গুণাবলীর অজুহাতে আর ইহাদের বজায় রাখিবার প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নহে।

৩. ইহাদের অভাবে ব্যবসায়ী প্রতিভা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব ঘটিবে বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত নহে। ম্যানেজিং এজেণ্টগণের ব্যবস্থাপনার বহির্ভূত একাধিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও দক্ষতা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

৪. ভারতের শিল্পায়নে ম্যানেজিং এজেণ্টগণের অভিভাবকত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় উহাদের অবসান ব্যতীত নূতন শিল্পযুগের সূচনা সম্ভব নহে।

ভারত সরকার পরস্পরবিরোধী দুইটি মতের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপসাধনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এবং ইহার সংস্কারসাধনের চেষ্টা না করিয়া অবসান ঘটান উচিত হইবে না। কোম্পানী আইন কমিটির মতে দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা, বেসরকারী শিল্প ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের সহায়তা প্রভৃতি কারণে ইহার অনাচার ও ত্রুটিগুলি দূর করিয়া বেসরকারী শিল্পের প্রয়োজনে সঞ্চয় সংগ্রহের নিমিত্ত ইহাকে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনও এই নীতি অনুসরণ করিয়া ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার অবসান ঘটায় নাই। তবে ইহার ত্রুটিগুলি দূর করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। একই সঙ্গে উক্ত আইনের দ্বারা ইহাদের বিকল্প স্বরূপ সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড ট্রেজারার্স কিংবা পরিচালক পর্ষতের (Board of Directors) দ্বারা ব্যবস্থাপনার ভার বহনের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ব্যবস্থাপনার এই বিকল্প প্রথা সফল প্রমাণিত হইলে বেসরকারী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনাগত উন্নতি ঘটিবে, ইহা আশা করা যায়।

সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড ট্রেজারার্স
SECRETARIES & TREASURERS

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে ভারতে সর্বপ্রথম সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড ট্রেজারার্স নামে একটি বিকল্প ব্যবস্থাপক সংস্থা অনুমোদিত হয়। ম্যানেজিং এজেণ্টগণের কবল হইতে মুক্ত হইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে সুস্থ, প্রগতিশীল ও সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার অধীনে চালিত হয় সে উদ্দেশ্যে উক্ত আইনে ইহার প্রবর্তন ঘটিয়াছিল।

যে কোন অংশীদারী কারবার অথবা যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড ট্রেজারার্স রূপে অপর যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ বা আংশিকভার বহনের জন্য নিযুক্ত হইতে পারে। তবে উহা পরিচালক পর্ষতের তদারকী, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার অধীন থাকিবে।

সুবিধা (advantages): ম্যানেজিং এজেন্সীর তুলনায় ইহার সুবিধা—১. কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে যে কোন শিল্পে বা কারবারে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা নিষিদ্ধ করিতে

ারে। কিন্তু ইহার ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য নহে। ২. বর্তমানে কোন ম্যানেজিং এজেন্টের অধীনে ১০টির বেশি প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে না, কিন্তু সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড ট্রেজারার্স-এর ক্ষেত্রে এইরূপ কোন সীমা নাই।

অসুবিধা (disadvantages): ম্যানেজিং এজেন্সীর তুলনায় ইহার অসুবিধা—১. কোন একক ব্যক্তি দ্বারা সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড ট্রেজারার্স সংস্থা গঠন করা যায় না, কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্সী কারবার গঠন করা চলে। ২. ইহারা অধীনস্থ কোম্পানীর নীট মুনাফার ৭½% এর বেশি পারিশ্রমিক লইতে পারে না, কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্ট ১০% পর্যন্ত পারিশ্রমিকের অধিকারী। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনে ইহারা অধিক পারিশ্রমিক পাইতে পারে। ৩. পরিচালক পর্ষদের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে ইহারা ম্যানেজিং এজেন্টগণের মত অধীনস্থ কোম্পানীর উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয় অথবা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে পারে না। ৪. ম্যানেজিং এজেন্টগণের মত ইহারা অধীনস্থ কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদের কোন সদস্য মনোনয়ন করিতে পারে না।

অন্যান্য বিষয়ে ইহাদের উপরে কোম্পানীর আইনের দ্বারা আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলি ম্যানেজিং এজেন্টদের মতই। ইহাদেরও প্রথম নিয়োগ ১৫ বৎসরের বেশি ও পুনর্নিয়োগ ১০ বৎসরের বেশি করা যায় না। এবং উহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন আবশ্যক হয়।

মন্তব্য (comments): শিল্পের ব্যবস্থাপনার জন্য ভারত সরকার এইরূপ যে নূতন সংস্থার প্রবর্তন করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে এক নূতন শ্রেণীর ব্যবস্থাপক সংস্থা সৃষ্টি করা। তবে ইহার সূত্রপাতে এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। কারণ এখন পর্যন্ত যে সকল সেক্রেটারীজ এ্যাণ্ড ট্রেজারার্স-এর সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে উহাদের অধিকাংশই ম্যানেজিং এজেন্সী কারবারের রূপান্তর।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF THE PUBLIC OR STATE ENTERPRISES

ভারতের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইদানীংকালে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের গুরুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। অতীতের বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পসম্প্রসারণে ভারসাম্যের অভাব, শিল্পোন্নয়নের ফলে একচেটিয়া বেসরকারী অর্থনৈতিক ক্ষমতার উদ্ভব, অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি প্রভৃতি দূর করিবার জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পক্ষেত্রকেই ভারতের শিল্পায়নে নেতৃত্ব দান করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই উৎপাদনে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রাধান্য ঘটিয়াছে। ভারতের ভবিষ্যৎ শিল্পায়নে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতেই দেশের শিল্পক্ষেত্রের অধিকতর কর্মসংস্থান, সম্পদ উৎপাদন এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ঘটিবে। তাহা ছাড়া বাণিজ্য, বীমা, ব্যাঙ্কিং, শিল্পঋণ সরবরাহ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও সম্প্রসারণ ঘটিতেছে। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৮৪৯ কোটি টাকার বিনিয়োগ ঘটিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ, সুদক্ষ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়টিও বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ

FORMS OF STATE ENTERPRISES

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের উদ্যোগ রাষ্ট্রের হস্তে থাকিলেও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপের বিভিন্নতা অনুসারে উহাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সাংগঠনিক রূপ প্রধানত নিম্নোক্ত প্রকারের:

১. সরকারী বিভাগীয় সংগঠন (Departmental Organisation)।

২. বিশেষ আইনেব দ্বাবা বিধিবদ্ধ করপোরেশন বা 'স্ট্যাটুটরী করপোরেশন' বা 'পাবলিক করপোবেশন' (Statutory or Public Corporation)।

৩. সবকাবী যৌথমূলধনী কারবার (Government Joint Stock Company)।

সরকারী বিভাগীয় সংগঠন
GOVERNMENT DEPARTMENTAL ORGANISATION

বৈশিষ্ট্য (features) ঃ কোন সবকাবী বিভাগ বা দপ্তবেব অধীন, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তদাবকীতে কাববাব চালনা বাষ্ট্রীয় কাববাবেব প্রাচীনতম রূপ। ১. ইহাতে পবিচালিত কাববাবটি এবং সবকাবেব মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। সবকাব বা বাষ্ট্রেব সাধাবণ প্রশাসনিক কাঠামোব অঙ্গ হিসাবে কাববাবটিকে গণ্য কবা হয়। ২. সবকাবেব কোষাগাব হইতে ইহাব ব্যয়েব অর্থ প্রদান এবং ইহাব যাবতীয় আয় সবকাবী কোষাগাবেই জমা কবা হয়। ৩. সাধারণত যে সকল ক্ষেত্রে সবকাবী কোষাগাবেব আয় লাভ কবাই প্রধান উদ্দেশ্য তথায় এজাতীয় সংগঠন স্থাপিত হয। ৪. ইহাদেব পবিচালনা ও ব্যবস্থাপনাব ভাব প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তবেব উপব ন্যস্ত থাকে।

দৃষ্টান্ত (examples) ঃ ভাবতে পোস্টঅফিস, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, লবণ উৎপাদন, বেলপবিবহণ, চিত্তবঞ্জন বেল কাবখানা এবং পেবাম্বুবেব অখণ্ড বেল কামবা (integral coach) নির্মাণেব কাবখানা, অল ইণ্ডিয়া বেডিও প্রভৃতি এই জাতীয় সংগঠন। ভাবতেব দেশরক্ষাব জন্য প্রযোজনীয় অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য উৎপাদনেব কাবখানাগুলিও এই প্রকাব ব্যবস্থায় পবিচালিত হয।

গুণ (merits) ঃ এইরূপ সংগঠনেব সুবিধা তিনটি—১. ইহাতে সবকাবেব সর্বাধিক পবিমাণ প্রত্যক্ষ নিযন্ত্রণ সুনিশ্চিত হয। ২. এইরূপ ব্যবস্থায় সর্বাধিক পবিমাণ গোপনতা বক্ষিত হইতে পাবে। ৩. ইহাব দোষত্রুটিব জন্য আইনসভায় বা পার্লামেণ্টে সহজেই প্রশ্ন উত্থাপন ও সমালোচনা কবা যায়।

দোষ (demerits) ঃ এই জাতীয় সংগঠনেব অসুবিধা—১ প্রত্যক্ষ সবকাবী বিভাগীয় নিযন্ত্রণেব জন্য সবকাবী দপ্তবেব চিবাচবিত গতাংগতিক নীতিতে ইহা চালিত হয়। লাল ফিতাব দৌবাত্ম্যে ইহাব কাযে অহেতুক বিলম্ব ঘটে। ২. ঘনঘন বিভাগীয় মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ সবকাবী কর্মচাবিগণেব পবিবর্তনে ইহাব কার্য ও নীতিতে ঘনঘন পবিবর্তন ঘটে। তাহাতে কাববাবেব ধাবাবাহিক কার্যসূত্র বক্ষিত হয না। ৩ ইহাতে কাযবত সর্বস্তবেব সবকাবী কর্মচাবিগণ তাহাদেব কার্যে রুটিনমাফিক কাযেব অতিবিক্ত কোন উদ্যোগ ও তৎপবতাব লক্ষণ প্রদর্শন কবে না। এবং কোন গাফিলতী ও ত্রুটিব জন্য দাযী ব্যক্তিগণকে খুঁজিযা বাহিব কবা কঠিন হয়। ৪. বাজাবে ইহাদেব উৎপাদিত পণ্যেব বা সবববাহকৃত সেবাব চাহিদাব পবিবর্তন ঘটিলে তদনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম, নীতি ও কার্যপদ্ধতিব সামঞ্জস্য সাধনেব ক্ষমতা এই প্রকাব প্রতিষ্ঠানেব নাই। ৫. সবকাবী দপ্তব নৈর্ব্যক্তিক বলিয়া বাজাবে ক্রেতাগণেব চাহিদা, পছন্দ, রুচি প্রভৃতির প্রতি ইহাব কোন লক্ষ্য থাকে না। ৬. সবকাবী দপ্তব হওয়ায় ইহা আয় অনুযায়ী ব্যয়েব নীতিতে পবিচালিত হয় না। ববং অধিকাংশ স্থলেই আয়াতিবিক্ত ব্যয ঘটিযা কারবাবে লোকসান ঘটায়। ৭. দৈনন্দিন কার্যে অবিবত সবকাবী হস্তক্ষেপ এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানেব আব একটি ত্রুটি।

মন্তব্য (comments) ঃ ইহাব গুণ অপেক্ষা দোষ বেশি বলিয়া শিল্পবাণিজ্যেব প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে এই প্রকাব সংগঠন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় করপোরেশন
STATUTORY CORPORATION

বৈশিষ্ট্য (features) : সরকারী দপ্তর পরিচালিত রাষ্ট্রীয় কারবারে ত্রুটির জন্য সম্প্রসারণশীল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের প্রয়োজনের অধিকতর উপযুক্ত একপ্রকার নূতন সংগঠন সৃষ্টি হয়। ইহা 'পাবলিক করপোরেশন' বা বিধিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় করপোরেশন নামে পরিচিত। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় কারবারগুলি এই প্রকারের। ভারতেও এই প্রকার কারবার গঠিত হইয়াছে। ইহাদের বৈশিষ্ট্যগুলি এই—১. ইহারা পার্লামেন্টের বিশেষ আইনের দ্বারা গঠিত হয়। ২. ঐ আইনের দ্বারা ইহাদের উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, কার্যক্ষেত্র ও পরিধি নির্দিষ্ট হয়। ৩. ইহাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত একটি পরিচালক পর্ষতের উপর ন্যস্ত হয়। ৪. আর্থিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়। ৫. ইহাদের স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হয়।

দৃষ্টান্ত (examp es) : ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, শিল্প অর্থসংস্থান করপোরেশন, জীবন বীমা করপোরেশন, দামোদর ভ্যালী করপোরেশন, এয়ার ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশন প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

গুণ (merits) : এই প্রকার সংগঠনের সুবিধা—১. সরকারী দপ্তরের লালফিতার দৌরাত্ম্য ইহাতে অল্প। ২. বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ন্যায় ইহার পরিচালনা নীতি বাজারের অবস্থা অনুযায়ী সহজ পরিবর্তনযোগ্য হইতে পারে। ৩. দৈনন্দিন কার্যাবলীতে প্রত্যক্ষ সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটে না। ৪. পার্লামেন্টে ইহাদের কার্যাবলীর দোষত্রুটির সমালোচনা দ্বারা উহা দূর করা যায়।

ত্রুটি (demerits) : ইহাদের অসুবিধা—১. ইহারা যে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উহাদের সংশোধন না করা পর্যন্ত ইহাদের কার্যাবলী ও সাংগঠনিক কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা যায় না। এবং উহা সম্পাদনেও বিলম্ব ঘটে। সুতরাং বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মত ইহাদের সহজ পরিবর্তনশীলতা দেখা যায় না। ২. ইহাদের কার্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তরের হস্তক্ষেপ যে ঘটে না তাহা নহে। জীবনবীমা করপোরেশনের লগ্নী কার্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তরের সাম্প্রতিক হস্তক্ষেপের ঘটনা ('মুন্দ্রা ঘটনা') এ সম্পর্কে স্মরণীয়। ৩. শ্রমিক কর্মচারিগণের তরফ হইতে এই অভিযোগ করা হয় যে, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সময় সরকার বলিয়াছিলেন যে, ইহারা অধিক পরিমাণে শ্রমিককর্মচারী স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অভিজ্ঞতা হইতে ইহার বিপরীত ঘটনাই দেখা যায়। ৪. ইহাদের ব্যবস্থাপনার ভার এপর্যন্ত প্রধানত উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারিগণের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাদের শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কোন অভিজ্ঞতাই নাই।

মন্তব্য (comments) : সরকারী ক্ষমতায় সজ্জিত অথচ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পরিবর্তন যোগ্যতা সম্পন্ন এই প্রকার রাষ্ট্রীয় করপোরেশনকে অনেকেই রাষ্ট্রীয় কারবার পরিচালনার জন্য আদর্শ সংগঠন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রীগোরওয়ালার মতে, দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও লাভক্ষতির বাণিজ্যিক নীতি যে সকল ক্ষেত্রে অনুসরণীয় তথায় এই প্রকার প্রতিষ্ঠান অনুপযুক্ত। অবশ্য বর্তমানে এই সকল করপোরেশনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপনা-বিশেষজ্ঞ ভারতীয় কর্মচারীর অভাবই ইহাদের কার্যদক্ষতার অভাবের প্রধান কারণ। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সম্প্রতি উৎপাদন, পরিবহণ, সংসরণ,

লৌহ-ইস্পাত এবং বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রাদপ্তরগুলির অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেণ্ট সার্ভিস' নামে একটি পৃথক সরকারী কর্মচারী শ্রেণী সৃষ্টি করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন।

সরকারী যৌথমুলধনী কারবার
GOVERNMENT JOINT STOCK COMPANY

বৈশিষ্ট্য (features) : ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে যে সর্বাধুনিক সাংগঠনিক রূপ প্রবর্তিত হইতেছে তাহা সীমাবদ্ধ মালিকানার যৌথমূলধনী কারবারের। বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ও ব্যাপক মালিকানার যৌথ মূলধনী কারবার (অর্থাৎ প্রাইভেট ও পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী) ভারতের কোম্পানী আইন অনুযায়ী গঠিত হইয়া থাকে। উক্ত আইনের ৬১৭ ধারায় সরকারী মালিকানায় যৌথমূলধনী কারবার গঠনের ব্যবস্থা আছে। ১. এইগুলি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে গঠিত হয়। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার, কেবল এক বা একাধিক রাজ্যসরকার, অথবা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার ও জনসাধারণ বা বেসরকারী ব্যক্তিবর্গ ইহাদের শেয়ারের মালিক হইতে পারে। তবে মোট শেয়ারপুঁজির ৫১% সরকারের হাতে থাকিবে। এইরূপ অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে বিদেশী পুঁজি অংশগ্রহণ করিয়াছে। ২. ইহাদের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার সাধারণ যৌথমূলধনী কারবারের ন্যায় একটি পরিচালক পর্ষতের উপরে ন্যস্ত। তবে, এইরূপ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই একটি বাদে অন্য সকল শেয়ার রাষ্ট্রপতির নামে খরিদ করা হয় বলিয়া ইহাদের শেয়ারহোল্ডারগণের বাৎসরিক সভা ডাকা হয় না, এবং কার্যত সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণই পরিচালক নিযুক্ত হয়।

দৃষ্টান্ত (examples) : বর্তমান অধিকাংশ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানই এইরূপ। সিন্ধ্রি ফারটি-লাইজারস্ এ্যাণ্ড কেমিক্যালস প্রাইভেট লিঃ, হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড, হিন্দুস্থান শিপ্‌ইয়ার্ড প্রাইভেট লিমিটেড, স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত।

গুণ (merits) : ১. ইহারা অধিকতর পরিমাণে ব্যবসা বাণিজ্যের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হয় বলিয়া অন্যান্য ধরনের সরকারী কারবার অপেক্ষা ইহাদের কর্মদক্ষতা অধিক। ২. যৌথমূলধনী কোম্পানীর আকারে গঠিত হয় বলিয়া সরকার হইতে ইহাদের সাংগঠনিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে। ৩. কোম্পানী আইন অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয় বলিয়া উক্ত আইনের চৌহদ্দির মধ্যে ইহাদের ব্যবস্থাপনার আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। ৪. করপোরেশনের আকারে গঠিত সরকারী কারবারের ন্যায় ইহাদের হিসাব-পত্র ইত্যাদি পার্লামেণ্ট বা আইনসভায় পেশ করা বাধ্যতামূলক নহে। ইহাতে সরকারের পক্ষে কিয়ৎপরিমাণে পার্লামেণ্ট বা আইন সভার সমালোচনা এড়ানো সম্ভব হয়। ৫. বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট শেয়ার বিক্রয় দ্বারা ইহা অতিরিক্ত পুঁজি সংগ্রহে সক্ষম।

ত্রুটি (Demerits) : ১. সরকারী প্রতিষ্ঠানের এই প্রকার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর রূপ বিভ্রান্তিকর। কারণ প্রকৃতপক্ষে আকারে যৌথমূলধনী কারবার হইলেও প্রকৃতিতে ইহা সরকারের এককমালিকানার কারবার ছাড়া আর কিছুই নহে। ২. অনেকে এই বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশবাসী ও পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি এড়াইবার জন্যই সরকার এইরূপ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর আকারে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেছেন। ৩. ইহাদের পরিচালকপর্ষতে যে সকল সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হয় তাহাদের ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নাই; অনেকক্ষেত্রে বেসরকারী শিল্পের

অনেককে ঐ অভাব পূরণের জন্য পরিচালক পর্যদে নিয়োগ করা হয় বটে, তবে তাহাতে সামগ্রিকভাবে পরিচালনার সংহতি দেখা যায় না।

মন্তব্য (comments): শ্রীগোরওয়ালার মতে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও লাভক্ষতির বিবেচনা যে সকল রাষ্ট্রীয় কারবারে প্রধান সেখানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর আকারে গঠিত প্রতিষ্ঠানই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পার্লামেন্টের এস্টিমেট কমিটি (Estimates Committee) কিংবা ইকাফে (ECAFE)[১] সম্মেলন ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তবে প্রথম পরিকল্পনাকালে পরিকল্পনা কমিশন ও ভারত সরকার এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। ফলে এই প্রকার রাষ্ট্রীয় কারবারই অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হইয়েছে।

উপসংহার
CONCLUSION

ভারতসরকার রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনীতিক ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করায় একদিকে যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় কারবারগুলির উপযুক্ত সাংগঠনিক রূপ, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, কার্যদক্ষতা প্রভৃতির সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে রাষ্ট্রীয় কারবারের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সাফল্যের জন্য ব্যবস্থাপনায় স্বায়ত্তশাসন, আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা, উপযুক্তভাবে হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা, পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের নিকট উহাদের কার্যবিবরণী পেশ, উহাদের জন্য মন্ত্রিগণের দায়িত্ব এবং ঐ সকল প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি নীতি গৃহীত হওয়া আবশ্যক। এই মূলনীতিগুলির মাপকাঠিতে বিচার করিলে উপরোক্ত তিন প্রকার রাষ্ট্রীয় কারবারের সংগঠনের মধ্যে পাব্লিক করপোরেশনের আকারে গঠিত রাষ্ট্রীয় কারবারগুলিই সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ উপরোক্ত মূলনীতিগুলির অধিকাংশই উহাতে অনুসৃত হয়।

১. ECAFE অর্থাৎ United Nation Economic Commission for Asia and the Far East.

৭

শিল্প ও শ্রমিক
Industry and Labour

ভারতীয় শিল্পশ্রমিকের বৈশিষ্ট্য
CHARACTERISTICS OF INDIAN INDUSTRIAL LABOUR

অন্যান্য অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও শিল্পের অনগ্রসরতা, জনসংখ্যায় কৃষিজীবীর প্রাধান্য এবং পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব হেতু ভারতীয় শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় :

১. ভারতীয় শ্রমিকগণের অধিকাংশই কৃষকসন্তান। গ্রামে জীবিকার অভাবে ইহারা বাধ্য হইয়া শহরে ও শিল্পাঞ্চলে আগমন করিলেও গ্রামীণ জীবনের আকর্ষণে, একান্নবর্তী পরিবারের প্রভাবে এবং সামান্য হইলেও জমির টানে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। সেজন্য এখনও **ভারতে স্থায়ী শিল্পশ্রমিকবাহিনী গড়িয়া উঠে নাই।**

২. শ্রমিকগণের মধ্যে কোন বিশেষ শিল্পের বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতি স্থায়ী আনুগত্য দেখা যায় না। **ইহাদের অধিকাংশই সাময়িক শ্রমিক** (casual Labour)। ইহারা শিল্প হইতে শিল্পান্তরে, স্থান হইতে স্থানান্তরে কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়।

৩. অল্প কিছুদিন পরেই ছুটি বা দীর্ঘ ছুটি, দিবারণে বা অসুস্থতা প্রভৃতির জন্য কর্মে অনুপস্থিত থাকে। ভারতের শিল্পগুলিতে **শ্রমিকদের প্রায়শ অনুপস্থিতি** অন্যতম প্রধান সমস্যা।

৪. ভারতীয় শ্রমিকগণের মধ্যে আয়ের স্বল্পতা ও তজ্জনিত নিম্নমানের জীবনযাত্রা এবং শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির অভাবে **দক্ষতার সবিশেষ অভাব** দেখা যায়।

স্বল্পদক্ষতার কারণ
CAUSES OF LOW EFFICIENCY

ভারতীয় শ্রমিকগণের শিল্পদক্ষতার অভাব সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকগণের শিল্পদক্ষতা কত কম তাহা দেখাইবার জন্য অনেক তথ্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইহাদ্বারা ভারতীয় শিল্পশ্রমিকগণের কোন অন্তর্নিহিত অক্ষমতা প্রমাণিত হয় না। কারণ, ভারতীয় শিল্পগুলির যন্ত্রপাতি যেমন পুরাতন, ব্যবস্থাপনা যেমন ত্রুটিপূর্ণ, উৎপাদন পদ্ধতিও তেমনি অধিক পরিমাণে শ্রমনির্ভর। এই সকল ত্রুটি দূর হইলে ভারতীয় শ্রমিকের শিল্পদক্ষতা যে বৃদ্ধি পাইতে পারে তাহা প্রমাণের জন্য কাহারও মতামতের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই। পরিকল্পনার গত এক দশকে ভারতীয় শিল্পশ্রমিকের ক্রমবর্ধমান দক্ষতা ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিয়াছে। ভারতীয় শ্রমিকের স্বল্প শিল্পদক্ষতার কারণগুলি নিম্নরূপ :

১ ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ু শ্রমিকগণের একটানা কঠোর পরিশ্রমের প্রতিকূল। এজন্য কর্মবিরতির দরুন দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়।

২. ভারতীয় শ্রমিকগণের অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতাই তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য কার্যে অনুপযুক্ত করিয়া তোলে।

৩. শ্রমিকগণের নিরক্ষরতা ও কারিগরিজ্ঞানের অভাব তাহাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পথে অন্যতম বাধা।

৪. কর্মে প্রায়শ অনুপস্থিতি এবং কর্ম হইতে কর্মান্তরে ক্রমাগত পরিবর্তনের জন্য কোন কর্মেই উহারা উচ্চস্তরের দক্ষতা অর্জন করিতে পারে না।

৫. স্বল্পমজুরির হার তাহাদের দক্ষতাহ্রাসের অন্যতম কারণ। এইরূপ আয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয়, উপযুক্ত পরিধেয় ও বাসস্থান সংগ্রহে তাহারা অক্ষম।

৬. নিম্ন মানে জীবনযাপন করিতে বাধ্য হওয়ায় শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য ও দক্ষতার উন্নতি সম্ভব হয় না।

৭ ভারতের সমাজজীবন নানাভাবে শ্রমের সচলতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া শ্রমিকের দক্ষতা সৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। একান্নবর্তী পরিবার বর্ণপ্রথা প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়।

৮ ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশেরই কারখানার আভ্যন্তরীণ অবস্থা, আলো-বাতাস ইত্যাদি ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে। ফলে শ্রমিকগণের দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে।

৯. ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির যন্ত্রপাতি পুরাতন ও উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নহে বলিয়া শ্রমিকগণের দক্ষতা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না।

১০ ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, বিশেষায়ণের অভাব এবং শ্রমিকগণের প্রতি কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের অভাবও শ্রমিকদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং ইহাতে দক্ষতা নষ্ট হয়।

ভারতীয় শ্রমিকের শিল্পদক্ষতা বৃদ্ধির উপায়

MEASURES FOR IMPROVING EFFICIENCY OF INDIAN LABOUR

ভারতীয় শ্রমিকগণের শিল্পদক্ষতা বৃদ্ধি একটি জটিল সমস্যা। ইহার জন্য যেমন রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রহিয়াছে, তেমনি প্রয়োজন নানারূপ সমাজ সংস্কার, মালিক ও শ্রমিকের সহযোগিতা, বিজ্ঞানের ব্যবহার প্রভৃতি। ইহার জন্য প্রয়োজন রহিয়াছে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষাবিস্তারের, শ্রমিকগণের বাসস্থানের উন্নতি ও রোগপ্রতিষেধক নানাপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের, ন্যায্য এবং প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থা প্রবর্তনের, কারখানার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের, দুর্ঘটনা নিরোধক ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের। কারখানার অভ্যন্তরে তাপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ, শিল্প সংস্কার ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিরও প্রবর্তন আবশ্যক। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনাতে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ, কাজের ঘণ্টা হ্রাস, স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে ১৯৪৭ সাল হইতে অদ্যাবধি নানারূপ আইন পাস করিয়া, মালিক ও শ্রমিকগণের সহিত যুক্ত বৈঠক করিয়া, দেশের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, শ্রমিক মালিক বিরোধ হ্রাস ও উহাদের সম্পর্কের উন্নতির চেষ্টা করিয়া সরকার ইতিমধ্যেই আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তবে এ ক্ষেত্রে আরও প্রচেষ্টার সুযোগ রহিয়াছে।

ভারতে শিল্পবিরোধ

INDUSTRIAL DISPUTES IN INDIA

শিল্পায়নের অব্যাহত অগ্রগতি, শিল্পের সমৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে শান্তিপূর্ণ এবং সন্তোষজনক সম্পর্ক সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ইহার অবনতি ঘটিলে অর্থাৎ শিল্পবিরোধের ফলে শিল্পের উৎপাদন হ্রাস,

মালিকের মুনাফা হ্রাস, শ্রমিকের আয় হ্রাস এবং জাতীয় আয়ের স্বল্পতা ঘটিয়া থাকে। সকল দিক হইতেই শিল্পবিরোধ ক্ষতিকর বলিয়া আধুনিক কালে সকল দেশেই শিল্পে শান্তি রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে।

ভারতে প্রথম মহাযুদ্ধকালের পূর্বে শিল্পবিরোধ একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। সোবিয়েত বিপ্লবের পরে পৃথিবীর সর্বত্র শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নবজাগরণ ঘটিলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও উহার প্রভাবে শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ১৪৭টি করিয়া ধর্মঘট ঘটে। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই হার বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতে শিল্পবিরোধ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ঐ দুই বৎসর যথাক্রমে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ও ১ কোটি ৬৫ লক্ষ শ্রম দিবস নষ্ট হয়। উহার পর নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে ১৯৫৪ সালে শ্রমবিরোধের পরিমাণ কমিয়া আসে। উহার পর ১৯৫৫ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পুনরায় শ্রমবিরোধ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯ সাল হইতে ইহার হ্রাসের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ঐ বৎসর ৬১ ২১ লক্ষ শ্রম দিবস নষ্ট হয়।

শ্রমবিরোধের কারণ (causes): শ্রমবিরোধের কারণগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—১. অর্থনীতিক, ২. রাজনীতিক ও অন্যান্য।

১. অর্থনীতিক কারণসমূহ: ক **নিম্নমজুরির হার**—যুদ্ধযুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতেছে, শ্রমিকের উৎপাদনের দক্ষতাও বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ তদনুযায়ী শ্রমিকগণের মজুরির হার বাড়িতেছে না। ইহাতে জীবনধারণের ব্যয় বৃদ্ধি ও অর্থনীতিক দুর্দশার চাপে শ্রমিকগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে।

খ. **কারখানার আভ্যন্তরীণ অসন্তোষজনক অবস্থা**—কারখানা আইন থাকা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে শৈথিল্যের জন্য অধিকাংশ কারখানার অভ্যন্তরে উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষিত হয় না। ইহাতে প্রায়ই দুর্ঘটনাদি ঘটিয়া থাকে।

গ. **কাজের দীর্ঘ সময়**—বহুদিন ধরিয়া শ্রমিকগণ কাজের সময় হ্রাস করিবার দাবিতে আন্দোলন করিতেছে। ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরী আইনে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারিত হইলেও শ্রমিকগণ উহা আরও হ্রাস করাইবার পক্ষপাতী। তাহা ছাড়া কারখানা আইন প্রযুক্ত হয় নাই এমন বহু কারখানায় কাজের দীর্ঘ সময় চালু আছে।

ঘ. **কাজের নিরাপত্তার অভাব**—অধিকাংশ কারখানাতেই শ্রমিকগণকে স্থায়ী না করা ও যথেচ্ছ ছাঁটাই প্রভৃতির দরুন শ্রমিকগণের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী অসন্তোষ রহিয়াছে।

ঙ. **শিল্প সংস্কার**—বর্তমানে তুলাবস্ত্র, চটকল প্রভৃতি শিল্পে শিল্প সংস্কারের ফলে বৃহৎ সংখ্যক শ্রমিকের কর্মচ্যুতির আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

চ. **বোনাস্**—ইদানীংকালে বোনাসের দাবিকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে সকল শিল্পেই শ্রমিক অসন্তোষ দানা বাধিতেছে।

২ রাজনীতিক ও অন্যান্য কারণ: ক **রাজনীতিক আন্দোলন**—অতীতে এবং বর্তমানে ভারতের রাজনীতিক আন্দোলন এবং রাজনীতিক দলগুলি শ্রমিক আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

খ. **ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের দাবি**—শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকগণের অংশগ্রহণের দাবিও ইদানীংকালের শিল্প বিরোধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

গ. **শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান রাজনীতিক চেতনা**—স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক অধিকার-সম্পন্ন নাগরিক হিসাবে আপন অধিকার আদায়ে ভারতের শ্রমিক পূর্বাপেক্ষা অধিক সচেতন হইয়া উঠিয়াছে।

ঘ. **শ্রমিক সংঘগুলির ক্রমবর্ধমান শক্তি**—ইদানীংকালে শ্রমিক সংঘগুলি সকল

আদালতের শরণাপন্ন হইতেছে। কিন্তু ইহা ব্যয়বহুল হওয়ায় শ্রমিকপক্ষই অধিকতর অসুবিধা ভোগ করে। বর্তমানে পুনরায় আপীল আদালত প্রবর্তনের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

৪. শ্রমবিরোধ আদালতের রায় বাতিলের অধিকার সরকারকে দান করা সম্পর্কেও প্রবল সমালোচনা করা হইয়াছে। ইহাতে সরকারকে স্বেচ্ছাচারের ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহার ফলে আদালতের সাহায্যে বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থার উপর শ্রমিকদের ভরসা হ্রাস পাইয়াছে।

৫. সর্বোপরি, বর্তমান ব্যবস্থায় স্বেচ্ছামূলক আপস আলোচনার পথ উন্মুক্ত রাখা হইলেও, তুলনায় বাধ্যতামূলক সালিসীর উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। ইহাতে বাধ্যতামূলক সালিসী ব্যবস্থার কুফলগুলি থাকিয়া যাইতেছে ও শিল্পে শ্রমিকমালিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায়, শ্রমিকগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়, শ্রমিকসংঘ আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইতেছে।

শিল্পবিরোধ নিরোধের বা শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়
MEASURES FOR PREVENTION OF INDUSTRIAL DISPUTES OR PROMOTION OF INDUSTRIAL PEACE

শিল্পবিরোধ ঘটিলে উহার দ্রুত মীমাংসার ব্যবস্থা যেমন প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন শিল্পবিরোধ নিরোধের ও শিল্পে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, এই দুইপ্রকার ব্যবস্থা ইহার জন্য প্রয়োজন। প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে রহিয়াছে ত্রিদলীয় সম্মেলন, নিয়মানুবর্তিতার জন্য শ্রমিক মালিক আচরণ বিধি, যৌথদরকষাকষি, মজুরি পর্ষৎ, শ্রমবিরোধ আদালতের রায় কার্যকর করণ, ব্যবস্থাপনা কার্যে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ইত্যাদি। পরোক্ষ ব্যবস্থার মধ্যে কারখানার আভ্যন্তরীণ পরিবেশের উন্নতি ও দুর্ঘটনা নিরোধের জন্য আইন, মজুরিসংক্রান্ত আইন, শ্রমিককল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আইন এবং মুনাফায় শ্রমিকদের অংশপ্রাপ্তি প্রভৃতি উল্লেখনীয়। এই সকল পরোক্ষ ব্যবস্থা দ্বারা শ্রমিকগণের অসন্তোষের কারণ দূরীভূত হইলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের স্থায়ী উন্নতি ঘটিতে পারে ও শিল্পে শান্তিস্থাপিত হইতে পারে।

ক. প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাসমূহ

১. **ত্রিদলীয় সম্মেলন** (**tripartite conference**) : ১৯৪২ সালে ভারত-সরকার শ্রমিক, মালিক ও কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের প্রতিনিধি লইয়া একটি ত্রিদলীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। তদবধি নিয়মিতভাবে এই সম্মেলন আহূত হইতেছে। এই প্রকার ত্রিদলীয় সম্মেলনের অধিবেশন এবং উহার স্থায়ীকমিটির কার্যের দ্বারা শিল্পের স্বার্থসংশ্লিষ্ট তিনপক্ষের মধ্যে অধিকতর পারস্পরিক বোঝাপড়ার দ্বারা শ্রমসংক্রান্ত সর্বসম্মত নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ সম্ভব হয়। ফলে শ্রমিক মালিক বিরোধের অনেক কারণ দূর করা সহজ হয়। এই সম্মেলন সরকারকে শ্রমনীতি সম্পর্কে পরামর্শ দেয় এবং সরকারীনীতি উহাতে ঘোষিত হইলে তদনুযায়ী শ্রমিক ও মালিক কর্তৃপক্ষ উহার সহিত নিজেদের কার্যাবলীর সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে।

২. **নিয়মানুবর্তিতার আচরণবিধি** (**code of discipline**) : ১৯৫৭ সালের পঞ্চদশ শ্রমসম্মেলনে একটি নিয়মানুবর্তিতার আচরণবিধি গৃহীত হয়। পরস্পরের সহিত প্রত্যক্ষ আলোচনা, মধ্যস্থ মারফত আপস-আলোচনা, ও স্বেচ্ছামূলক সালিসীর দ্বারা বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি গ্রহণে শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষকে স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুত করানই ইহার উদ্দেশ্য। এই আচরণবিধির প্রধান ধারাগুলি এই : ক. নোটিশ ব্যতীত কোন ধর্মঘট বা লক-আউট হইবে

না; খ. ধীরগতিতে উৎপাদন চালাইবার পথ গৃহীত হইবে না; গ. কলকব্জা যন্ত্রপাতির কোন ক্ষতি করা হইবে না; ঘ. হিংসা, ভীতিপ্রদর্শন, বলপ্রয়োগ অথবা প্ররোচনাদান করা হইবে না; ঙ. শিল্পবিরোধের বর্তমান আইনগত পদ্ধতি অনুসৃত হইবে; চ. আপস চুক্তি ও রায় অবিলম্বে কার্যকর করা হইবে ইত্যাদি। শ্রমিকগণের সকল কেন্দ্রীয় সংগঠন ও মালিক-গণের প্রধান সংগঠনসমূহ এই আচরণ বিধি গ্রহণ করায় ভারতে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের মধ্যে আচরণের মান নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনের পক্ষে একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

৩. **যৌথ দরকষাকষি (collective bargaining):** শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আলাপ-আলোচনা ও দরকষাকষি দ্বারা চুক্তির মাধ্যমে মজুরির হার ও কাজের শর্ত স্থির করিবার পদ্ধতিকে যৌথ দরকষাকষির পদ্ধতি বলা হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই পদ্ধতির সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তগুলি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়: ক. অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন এবং শ্রমিক সংঘগুলিতে শ্রমিকদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। ইহা করিতে পারিলে এই পদ্ধতির মাধ্যমে সহজে বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায়। কারণ, ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সংঘের মাধ্যমেই মালিকদের নিকট সর্বজনস্বীকৃত দাবিগুলি দৃঢ়ভাবে উত্থাপন করা যায়। সকল শ্রমিকের জন্য একটি ইউনিয়ন না থাকিলে ইহা সম্ভব হয় না। একটি মাত্র শিল্প প্রতিষ্ঠানে, গোটা শিল্পে আঞ্চলিক ভাবে বা জাতীয় স্তরে সকল শিল্পেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব। খ. সরকার, মালিক, শ্রমিক ও জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ সহ-যোগিতা। জনসাধারণের অনুমোদন, শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষের পারস্পরিক বোঝাবুঝির মনোভাব, যৌথ দরকষাকষি চলাকালে মালিকপক্ষ কোন প্রকারের শ্রমিকবিরোধী কার্য করিতে না পারে তাহার জন্য সরকার কর্তৃক উপযুক্ত আইন রচনা--ইত্যাদি অবস্থার সৃষ্টি হইলে যৌথ দরকষাকষি সফল হইতে পারে। গ. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসাব ও সংবাদ সংগ্রহের জন্য শ্রমিক-দের নিজস্ব গবেষণার প্রতিষ্ঠান স্থাপন। যৌথ দরকষাকষির সময় প্রয়োজনীয় তথ্য, হিসাব ও সংবাদাদি সহ প্রস্তুত হইয়া শ্রমিকপক্ষের মুখপাত্রগণ আলাপ-আলোচনায় সুষ্ঠুভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

যৌথ দরকষাকষি পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক বিরোধ হ্রাস পায়, শিল্পে উৎপাদন অব্যাহত থাকে, সমৃদ্ধি শ্রমিক কল্যাণ ও শ্রমিক ঐক্য বৃদ্ধি পায়। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার জন্য এখনও প্রধানত বাজারের অবস্থা ও কিয়ৎ পরিমাণে সরকারী আইনের দ্বারা মজুরিহার ও কাজের অন্যান্য শর্ত স্থির হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রমিকদের দিক হইতে ইহা অসন্তোষজনক। অবশ্য বর্তমানকালে শ্রমিকগণের উৎপাদন ক্ষমতাবৃদ্ধি, যন্ত্র-পাতির আধুনিকীকরণ ও শিল্পের মুনাফাবৃদ্ধি ও শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির ফলে ভারতে যৌথ দরকষাকষির সুযোগ বাড়িতেছে। ভূতপূর্ব শ্রমমন্ত্রী শ্রী ভি. ভি. গিরি প্রমুখ অনেকের মতে ভারতে ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য ইহার অনুকূলে সরকারী নীতি গ্রহণ করা আবশ্যক। বিশেষত: ভারতের মত দেশে বাধ্যতামূলক সালিশীর পরিবর্তে যৌথ দরকষাকষি দ্বারা শ্রমিক মালিক বিরোধ মিটাইবার ব্যবস্থা শিল্পে শান্তি স্থাপনে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। ভারতীয় অর্থনীতির পটভূমিকায় যৌথ দরকষাকষির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনায় প্রথমেই বাটা কোম্পানীর কথা উল্লেখ করিতে হয়। বাটা কোম্পানীর শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে ১৯৪৮ সালের যৌথ দরকষাকষির চুক্তি এই ব্যাপারে ভারতে সর্বপ্রথম চুক্তি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীকালে ঐ কোম্পানীতে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি (ইহা ব্যা

র্ডের সালিশীর মাধ্যমে) ও বোনাস প্রদান সম্পর্কে দুইটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯৫০ সালের শ্রম-সম্পর্ক বিলের (Labour Relations Bill) কথা উল্লেখ করিতে হয়। ই বিলে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে শিল্পবিরোধ মিটাইবার ব্যবস্থা ছিল। নানা কারণে এই বিল আইনে রূপান্তরিত হইতে পারে নাই। এই প্রকারের চুক্তি ভারতে আরও কয়েকটি শিল্পে সম্পাদিত হইয়াছে। যথা—বোম্বাই মিল মালিক সমিতি ও রাষ্ট্রীয় মিল মজদুর সংঘ, টাটা কাম্পানী ও টাটা শ্রমিক ইউনিয়ন, মহীশূর পেপার মিলস্, ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়ম ওয়ার্কস্, মাদী স্পিনিং এ্যাণ্ড উইভিং মিলস্, আসাম অয়েল কোং এবং ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোং।

৪. **মজুরিপর্ষৎ (wage board) :** আদালতের সাহায্যে সর্বদা সন্তোষজনকরূপে মজুরি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি হয় না। অথচ এই বিষয় লইয়াই অনেক গুরুতর শ্রমবিরোধের সৃষ্টি হয়। এজন্য দেখা গিয়াছে শ্রমিক, মালিক ও একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই তিনপক্ষ লইয়া প্রত্যেক শিল্পের জন্য পৃথক মজুরিপর্ষৎ গঠন করিলে তাহাতে সহজে সন্তোষজনক মজুরিহার নির্ধারিত হইতে পারে। ফলে মজুরিহার জনিত শ্রমবিরোধ দূর হইতে পারে। ভারতের সংবাদ পত্রের জন্য অনুরূপ মজুরি পর্ষতের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। এজন্য ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ভারতের পঞ্চদশ শ্রমসম্মেলনের শ্রমিকপক্ষ হইতে বাগিচা, খনি, ইঞ্জিনীয়ারিং তুলাবস্ত্র লৌহ-ইস্পাত রাসায়নিক, চিনি, বেসরকারী বিদ্যুৎ ও সিমেন্ট শিল্প, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ, দেশরক্ষা শিল্পের অসামরিক কর্মী এবং ডক বন্দর কর্মিগণের জন্য মজুরিপর্ষৎ গঠনের প্রস্তাব করা। তন্মধ্যে সরকার এপর্যন্ত তুলাবস্ত্রশিল্প, চিনি, চটকল ও সিমেন্ট শিল্পের জন্য মজুরিপর্ষৎ নিয়োগ করিয়াছেন। ১৯৬০ সালে তুলাবস্ত্র ও সিমেন্টশিল্পের মজুরি পর্ষতের সুপারিশ ও তৎসংক্রান্ত সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রমসম্মেলনের স্থায়ী কমিটির পরামর্শে সরকার একটি বোনাস কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন।

৫. **ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকগণের অংশগ্রহণ (worker's participation in management) :** শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পের ব্যবস্থাপনার ভার শ্রমিকগণের হস্তে অর্পণ করাই সমাজতান্ত্রিক মতবাদের শিক্ষা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই জন্য শ্রমিকগণের উপর শিল্পের ব্যবস্থাপনার ভার অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও শিল্পক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনায় এই ব্যবস্থা আংশিকভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রথম মহাযুদ্ধের পর শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ও মালিকের যুক্ত কমিটি গঠনের জন্য আইন পাস হয়। ১৯১৭ সালে হুইটলে কমিটির সুপারিশে ইহা ইংলণ্ডে প্রবর্তিত হয় বলিয়া ইহাদের তথায় হুইটলে কাউন্সিল বলা হয়। ভারতে ইহা ওয়ার্কস কমিটি নামে পরিচিত।

১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইনে ১০০ বা ততোধিক শ্রমিকনিয়োগকারী প্রতি কারখানায় স্থায়িভাবে ইহা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতিবিধানই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎপরবর্তীকালে ইহাদের কার্যের উল্লেখযোগ্য ও সন্তোষজনক কোন ফল পাওয়া যায় না। পরে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে শ্রমিকমালিক সহযোগিতার (labour-mangement cooperation) উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। ভারতের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের জন্য ইহাকে একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯৫৬ সালে এজন্য একটি অনুসন্ধানীদল (study group) নিযুক্ত হয় ও উহা কতকগুলি সুপারিশ পেশ করে। তাহার পর ১৯৫৭ সালের পঞ্চদশ শ্রমসম্মেলনে বিষয়টি সম্পর্কে আরও আলোচনা চলে এবং উহা একটি কর্মসূচী প্রণয়নের নিমিত্ত একটি সাবকমিটি নিয়োগ করে। ঐ কমিটি কোন্ কোন্ শিল্পে ব্যবস্থাপনাকার্যে শ্রমিকগণের অংশগ্রহণ প্রথম প্রবর্তিত হইবে তাহার একটি তালিকা প্রণয়ন

করে। ১৯৫৮ সালে ব্যবস্থাপনাকার্যে শ্রমিক মালিক সহযোগিতা কিরূপে সুনিশ্চিত ও সম্ভব করা যায় সে জন্য একটি আলোচনা (seminar) আহ্বান করা হয়। উহার ব্যবস্থাপনার জন্য শ্রমিক-মালিক যুক্ত কমিটি কি ভাবে গঠিত হইবে এবং উহাদের কি কি কাজ থাকিবে সে সম্পর্কে কতকগুলি সুপারিশ করে। ১৯৬০ সালে পুনরায় একটি দ্বিতীয় আলোচনাবৈঠক আহ্বান করা হয়। উহা এই প্রকার যুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিষদের (joint management council) কার্যে সহায়তা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সংগঠন স্থাপনের পরামর্শ দেয়। সম্মেলনের পরামর্শে শ্রমিক-মালিক সহযোগিতার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। ১৯৬৫ সালের নবেম্বর অবধি মোট ৬০টি ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ২০টি ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ৪০টি। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নূতনতর ক্ষেত্রে যুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিষদ স্থাপনের কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে। ফলাফল সম্পর্কে বলা যায় যে কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল হইলেও সাধারণ ভাবে ইহা খুব সন্তোষজনক নয়। এই অসন্তোষজনক ফলের জন্য যে সকল কারণ প্রদর্শিত হয় তাহা হইল : ক যৌথ ব্যবস্থাপনা পরিষদের দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদনের জন্য শ্রমিক ও মালিক-উভয় পক্ষের প্রয়োজনীয় শিক্ষণ ব্যবস্থার অভাব। খ কোন কোন্ বিষয়ে ঐ পরিষদ আলোচনা করিবে এবং সংবাদাদি পাইবার অধিকারী হইবে সে সম্পর্কে মতৈক্যের অভাব। গ. শ্রমিক সংঘগুলির আভ্যন্তরীণ বিরোধ। এই বিরোধের ফলে পরিষদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে নাই। শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকসংঘ ছাড়া যুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিষদের কার্যে সাফল্য লাভ করা যায় না ইহা স্বীকার করিতেই হয়।

১৯৬১ সালে শ্রমিক-মালিক সহযোগিতার জন্য একটি ত্রি-দলীয় কমিটি (Tripartite Committee on Labour Management Cooperation) স্থাপিত হয়। ১৯৬২ সালে সরকার বর্তমান পরিষদগুলির কার্যাবলী অনুসন্ধান ও নূতন পরিষদ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য বিশেষ দায়িত্ব সম্বলিত একজন কর্মচারী নিয়োগ করে।

৬ শ্রমবিরোধ আদালতের রায় ও চুক্তি অবিলম্বে কার্যে পরিণতকরণ (enforcement of awards) : শ্রমবিরোধ আদালতের রায় ও আপস চুক্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রে মান্যকরা হয় না বলিয়া উহাতে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। এজন্য ১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইনে জরিমানার ব্যবস্থা থাকিলেও সামান্য (২০০৲) বলিয়া উহা কার্যকর হয় নাই। একারণে ১৯৫৮ সালের জুন মাসে একটি কেন্দ্রীয় কার্যকরণ এবং মূল্যায়ন কমিটি (Central Inplementation and Evaluation Committee) গঠিত হইয়াছে। রাজ্যস্তরেও অনুরূপ কমিটি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী দপ্তরে মূল্যায়ন ও কার্যকরণ সংস্থা (Evaluation and Inplementation Cell) সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রম আইন, শ্রমবিরোধ আদালতের রায় ও আপস চুক্তির দ্রুত কার্যে পরিণতি ঘটিতেছে।

খ. পরোক্ষ ব্যবস্থাসমূহ

১. কাজের শর্তাদি ও পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন
LEGISLATION FOR IMPROVEMENT OF CONDITIONS AND ENVIRONMENT OF WORK

ক. ফ্যাক্টরী আইন (factory legislation) : কাজের শর্ত এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নই কারখানা আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কলকারখানায় শিশুদের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও দুর্ঘটনা নিরোধের

জন্য ১৮৮১ সালে ভারতে সর্বপ্রথম ফ্যাক্টরী আইন পাস হয়। কয়েকবার ইহার সংশোধনের পর ভারতের শ্রমিকগণ সম্পর্কে রাজকীয় কমিশনের সুপারিশ এবং আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তরের প্রবর্তিত বিধিগুলি গ্রহণ করিয়া ১৯৩৪ সালে একটি নূতন ফ্যাক্টরী আইন পাস করা হয়। স্বাধীনতালাভের পর পুনরায় নূতন অবস্থার উপযোগী একটি সম্পূর্ণ নূতন ফ্যাক্টরী আইন প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৯৪৯, '৫০, '৫৩ ও '৫৪ সালে ইহা সংশোধিত হয়। ইহার উল্লেখ-যোগ্য বিধিগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি প্রধান: ১. সাধারণত ২০ জন ও শক্তি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান হইলে ১০ জন শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে 'ফ্যাক্টরী' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ২. বয়স্ক শ্রমিকগণের কাজের ঘণ্টা দিনে ৯ ও সপ্তাহে মোট ৪৮ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। ৩ ফ্যাক্টরীগুলিতে শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য রক্ষা, দুর্ঘটনা হইতে নিরাপত্তা ও শ্রমকল্যাণের নানা ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ৪. কারখানায় নিয়োগের উপযুক্ত কিশোরগণের বয়স ১২ হইতে বাড়াইয়া ১৪ করা হয়। ৫. সাময়িক ও স্থায়ী শ্রমিকগণের মধ্যে পার্থক্য দূর করা হয়।

খ. খনিসম্পর্কিত আইন (Mining Legislation): ফ্যাক্টরী আইনের মত খনি আইনেরও উদ্দেশ্য হইল খনি শ্রমিকের কাজের শর্ত এবং পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন।

১. ভারতের প্রথম খনি আইন পাস হয় ১৯০১ সালে। ১৯২৩ সালে ইহার স্থলে আর একটি নূতন আইন পাস করা হয়। অবশেষে স্বাধীনতালাভের পর ১৯৫২ সালে, ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরী আইনের ন্যায় খনি-শ্রমিকগণের কাজের শর্তাদি ও পরিবেশ প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা বিষয় সম্পর্কে একটি ব্যাপক আইন পাস হয়। ইহার দ্বারা—

১. সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা ও খনির উপরে দিনে ৯ ঘণ্টার এবং খনিগর্ভে ৮ ঘণ্টার অধিক কাজ নিষিদ্ধকরণ, ২. অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি প্রদান; ৩. সকাল ৬ টার পূর্বে ও সন্ধ্যা ৭ টার পরে কাযে নারীশ্রমিকনিয়োগ নিষিদ্ধকরণ, ৪ ১৮ বৎসরের কম বয়সের শ্রমিকের খনিগর্ভে কাজের জন্য নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ, ৫ বেতনসহ ছুটি ও বিকল্প ছুটির ব্যবস্থা, ৬ কার্যস্থলে শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা ও শ্রমক ল্যাণ কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি প্রবর্তিত হয়।

গ. অন্যান্য শিল্পের শ্রমিককর্মচারী সংক্রান্ত আইন (Legislation for other Categories of Workers and Employees): বাগিচাশিল্পের শ্রমিক-গণের কাজের শর্তাদি ও পরিবেশ সম্পর্কে ফ্যাক্টরী আইনের অনুরূপ ১৯৫১ সালে বাগিচাশিল্প শ্রমিক আইন (Plantation Labour Act) পাস হয় এবং ১৯৫৪ সালের ১লা এপ্রিল হইতে প্রবর্তিত হয়। ইহা ব্যতীত দোকান কর্মচারিগণ সম্পর্কে, পরিবহণকর্মিগণ সম্পর্কে ও ডক শ্রমিকগণ সম্পর্কে আইন পাস করা হইয়াছে।

২ মজুরি সংক্রান্ত আইন
WAGE LEGISLATION

ক. মজুরি প্রদানের আইন (Payment of Wages Act): ১৯৩৬ সালে শ্রমিকগণের মজুরি প্রদান আইন পাস করিয়া নিয়মিত মজুরী প্রদানের এবং মালিক পক্ষের খুশীমত জরিমানা ও বেতনকাটা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা হয়। উহার পর আইনটি কয়েকবার সংশোধিত হয়। সর্বশেষ সংশোধন ঘটে ১৯৫৭ সালে। কিন্তু এই আইনের দ্বারা শ্রমিকগণের জীবনধারণের মত মজুরির ব্যবস্থা না হওয়ায় স্বাধীনতালাভের পর নূতন আইন পাসের প্রয়োজন হয়।

ন্যূনতম মজুরি আইন (Minimum

শ্রমিকদের মজুরির হার সাধারণ ভাবেই কম। তন্মধ্যে এমন বহু শিল্প আছে শ্রমিকদের কঠিন দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয় অথচ মজুরির হার অবিশ্বাস্যরকমের অল্প। এই সমস্ত শিল্পের শ্রমিকরাই সর্বাপেক্ষা বেশী শোষিত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠান লইয়া এই সকল শিল্প গড়িয়া উঠে। ইহাতে নিযুক্ত শ্রমিকেরা শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ গড়িয়া তুলিতে বিভিন্ন কারণে অক্ষম। ফলে সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের দর কষাকষির ক্ষমতা হইতে ইহারা বঞ্চিত। এই সকল কারণে অতিশয় অল্প হারের মজুরিতে কাজ করা ছাড়া ইহাদের কোন উপায় থাকে না।

পৃথিবীর বহু শিল্পোন্নত দেশে অত্যধিক শোষিত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়াছে। ভারতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের প্রস্তাব বহুকাল পূর্বেই উত্থাপিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের (ILO) ন্যূনতম মজুরির প্রস্তাব মানিয়া লইতে ১৯২৬ সালে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকার ইহা মানিয়া লয় নাই। পরবর্তীকালে 'রয়েল কমিশন অন লেবর'ও প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানের অভাবের অজুহাতে এই প্রস্তাবকে স্বীকার করে নাই। তবে কমিশন আসামের চা বাগিচার শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য একটি মজুরি পর্ষৎ স্থাপনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বিভিন্ন সময়ে স্থাপিত শ্রম অনুসন্ধান কমিটিগুলিও (Labour Enquiry Committees) ইহার সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু করা হয় নাই। ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইন এই দিকে প্রথম সরকারী পদক্ষেপ বলিয়া বর্ণনা করা যায়। এই আইনের দ্বারা কয়েকটি নির্দিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যে সকল শিল্পে শ্রমিকেরা কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজ করে, অথচ মজুরি পায় খুবই কম, সেই সকল শিল্পের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোগ করা হইবে। প্রয়োজনবোধে কোন নূতন শিল্পে এই আইন প্রয়োগের ক্ষমতা রাজ্য সরকারকে দেওয়া হইয়াছে, তবে যে শিল্পে এক হাজারের কম শ্রমিক নিযুক্ত সেখানে এই আইন প্রয়োগ করা চলিবে না।

মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে রাজ্য সরকার নিজে কোন শিল্পের পক্ষে প্রযোজ্য মজুরির হার ঘোষণা করিতে পারে, অথবা কোন কমিটি নিয়োগ করিয়া তাহাকে নির্দিষ্ট শিল্পের সকল দিক অনুসন্ধান করিয়া তথায় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দায়িত্ব দিতে পারে। মজুরি সংক্রান্ত সব প্রস্তাব সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং প্রকাশনের তিন মাস পর কার্যকর হইবে। প্রচলিত মজুরির হার পাঁচ বৎসর বলবৎ থাকিবে। অতঃপর ঐ মজুরি হারের পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইলে সরকার এই উদ্দেশ্যে উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করিয়া তাঁহার সুপারিশ সম্পর্কে বিবেচনা করিবে। বিভিন্ন উপদেষ্টা কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সরকার উপদেষ্টা পর্ষৎ নিয়োগ করিবে। প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষৎ স্থাপনের কথাও এই আইনে বলা আছে। এই সকল কমিটি ও পর্ষতে শ্রমিক ও মালিকদের সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকিবে এবং ইহা ছাড়া কয়েকজন নিরপেক্ষ সদস্য থাকিবেন যাহাদের সংখ্যা কমিটির মোট সদস্য সংখ্যার ⅓ এর বেশী হইবে না। সদস্যরা সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন। এই মজুরিহার ফুরণ (piece-work) ও সময় (time-work) এই দুই প্রকার কাজের ক্ষেত্রেই নির্ধারিত হইবে। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ, নারী, শিশু ও শিক্ষানবীশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হারে মজুরি নির্ধারিত হইবে। এবং মজুরিহারের নির্ধারণে অঞ্চল ভিত্তিতে ও কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী

অনুরূপ হইতে পারে। ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারণে মূল মজুরির সহিত জীবনযাত্রার ব্যয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ভাতা (cost of living allowance) যুক্ত হইতেও পারে, অথবা না হইতে পারে। এবং অর্থের বা দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে এই মজুরি নির্ধারিত হইতে পারে।

অদ্যাবধি সমস্ত রাজ্য সরকারই কয়েকটি শিল্পে ন্যূনতম মজুরি আইন প্রয়োগ করিয়াছে তন্মধ্যে চাউলকল, ময়দাকল, মোটর পরিবহণ, চর্মশোধন, বাগিচা শিল্প, কার্পেট নির্মাণ, লাক্ষা তামাক ইত্যাদি শিল্প অন্যতম। ইহা ছাড়াও কয়েকটি রাজ্য সরকার কৃষির সহিত সংশ্লিষ্ট নানাবিধ কাযে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করিয়াছে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যেই বহু শিল্পে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু সব রাজ্যেই সমস্ত তালিকাভুক্ত শিল্পে এখনও ন্যূনতম মজুরিহার নির্ধারিত করা যায় নাই, তাই ন্যূনতম মজুরি আইনের একটি সংশোধনের (১৯৬১) দ্বারা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সময়ের সীমা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মন্তব্য (**Comments**) **:** ১ এই আইনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর কোন কোন অংশের সুবিধা হইয়াছে বটে, তবে এক হাজার শ্রমিকের কম হইলে কোন শিল্পে ইহার প্রয়োগ হইবে না—এ নীতির ফলে, অনেক শিল্পই এই আইনের অধীনে আসে নাই। বাগিচা শিল্প ছাড়া অন্য কোন বৃহৎ শিল্প এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ফলে চটকল, কয়লাখনি ইত্যাদি শিল্পের শ্রমিকেরা এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হইল না, অথচ এই সকল ক্ষেত্রে শোষণ খুবই ব্যাপক ও গভীর। ২. ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে সরকারী বিভাগের পূর্ণ কর্তৃত্ব বাঞ্ছনীয় নহে। এই ব্যাপারে প্রত্যেক শিল্পে একটি করিয়া মজুরি পর্ষৎ স্থাপিত হওয়াই উচিত। এবং উহা স্থায়ী ভিত্তিতে গঠিত হইলে তাহাতে সুফল লাভের সম্ভাবনা বেশি। ৩ ন্যূনতম মজুরির কোন সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে কোথাও নির্ধারিত হয় নাই। কোন্ নীতির ভিত্তিতে এই মজুরিহার স্থির করা হইবে সে বিষয়েও পরিষ্কার ভাবে কিছু বলা হয় নাই। ৪. কোন শিল্পে যদি এই আইন লঙ্ঘন করা হয় তবে তাহাকে বলবৎ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কোন বিধি এই আইনে নাই। সুতরাং মালিকেরা আইন ভঙ্গ করিলেও শ্রমিকদের কিছুই করিবার থাকিবে না। ৫. এ পর্যন্ত অনেকগুলি শিল্পে ন্যূনতম মজুরির হার নির্ধারিত হইলেও উহাদের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য রহিয়াছে। এ কারণে সারা ভারতে সকল ধরনের শিল্পেই জাতীয়ভাবে নির্ধারিত একটি সাধারণ মজুরিহারের প্রয়োজন রহিয়াছে।

বোনাস পরিকল্পনা ও বোনাস কমিশনের রিপোর্ট (**Bonus Scheme & Bonus Commission Report**) **:** ভারতে শ্রম বিরোধের ক্ষেত্রে বোনাসের সমস্যা আধুনিক কালে প্রভূত গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। বোনাস এবং মজুরি সংক্রান্ত বিরোধই ভারতে সর্বাপেক্ষা বেশি শ্রমদিবস নষ্ট করিয়াছে। তাই শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বোনাস সমস্যার সমাধান অতিশয় জরুরী। এই সমস্যার বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিযুক্ত সমাধানের জন্য ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রী এম, আর মেহেরের সভাপতিত্বে সাতজন সদস্য লইয়া বোনাস কমিশন গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :—ক. কমিশনের মতে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের "সমৃদ্ধিতে" (prosperity) শ্রমিকদের অংশই হইল 'বোনাস'। কমিশন মনে করেন যে, বোনাসকে এই ভাবে দেখিলে স্বল্প আয়ের শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি (actual wage) এবং প্রয়োজন ভিত্তিক মজুরির (need-based wage) মধ্যে পার্থক্য কমাইয়া আনা যায়। খ. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে বোনাস হিসাব করিবে এবং সেই ভাবে উহা প্রদান

করিবে। কোন একটি বৎসরের বোনাস ঐ বৎসরের মুনাফার ভিত্তিতেই হিসাব করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কমিশন সমগ্র শিল্পের জন্য বা একটি অঞ্চলের সমস্ত শিল্পের জন্য, কোন একটি সর্বজনগ্রাহ্য বোনাস-সূত্র সুপারিশ করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। গ. বোনাসের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে কমিশনের সূত্রটি (formula) এইরূপ :— "প্রাপ্তব্য উদ্বৃত্তের" (available surplus) ৬০% বোনাস হিসাবে বণ্টন করিতে হইবে। শ্রমিকের বাৎসরিক মূল মজুরি ও মহার্ঘ ভাতার ৪% অথবা ৪০ টাকা (শিশুদের ক্ষেত্রে ২৫ টাকা)—এই দুইটির মধ্যে যাহা অধিক, তাহাই হইবে শ্রমিকের মাথাপিছু বোনাসের ন্যূনতম পরিমাণ। বোনাসের সর্বোচ্চ পরিমাণ হইবে সমগ্র বৎসরে প্রদত্ত মূলমজুরি ও মহার্ঘ ভাতার ২০%। যে বৎসরের বোনাস দেওয়া হইবে, সেই বৎসর শেষ হইবার পর ৮ মাসের মধ্যেই বোনাস দিয়া দিতে হইবে। ঘ. "প্রাপ্তব্য উদ্বৃত্তে"র পরিমাণ বাহির করিতে বাৎসরিক মোট মুনাফা (gross profit) হইতে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ বাদ দিতে হইবে—(১) অবপূর্তি, (২) আয় কর, (৩) অতিরিক্ত কর (super-tax), (৪) অগ্রগণ্য শেয়ারের উপরে প্রদত্ত প্রকৃত লভ্যাংশ, (৫) সাধারণ শেয়ারের উপরে ৭% হারে লভ্যাংশ ও (৬) সঞ্চিত তহবিলের (reserve fund) উপরে ৪% হারে লভ্যাংশ।

কমিশন প্রচলিত মজুরি হারের মধ্যে বোনাসকে অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। কারণ, মজুরির হার শিল্প বা অঞ্চল হিসাবেই সাধারণ নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু মুনাফা পরিবর্তনশীল। বোনাসকে শ্রমিকের উৎপাদনের সহিত যুক্ত করার প্রস্তাবও কমিশন সমর্থন করেন নাই। প্রাপ্তব্য উদ্বৃত্ত নির্ণয়ে মোট মুনাফা হইতে শিল্পের পুনর্বাসন ব্যয় (rehabilitation costs) বাদ দেওয়া হয় নাই। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বোনাস নির্ধারিত হইবে মুনাফার দ্বারা। তদুপরি কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, বোনাসের সূত্র (formula) সব দিক হইতে নিখুঁত না হইলেও চলিবে। সূত্রটি জটিলতামুক্ত, সহজে বোধগম্য, এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকট মোটামুটিভাবে ন্যায্য ও শোভন হইলেই চলিবে।

মালিকদের পক্ষ হইতে বোনাস সূত্রের বিরুদ্ধে যে দাবি উপস্থাপিত হয় তাহা হইল : ক. আদায়ীকৃত মূলধনের উপরে ৭% এর পরিবর্তে ৮·৫% হারে আয়ধার্য করিতে হইবে। খ. সঞ্চিত তহবিলের উপরে ৪% এর পরিবর্তে ৬% আয় ধার্য করিতে হইবে। গ. "প্রাপ্তব্য উদ্বৃত্ত" নির্ধারণে, মোট মুনাফা হইতে অতিরিক্ত মুনাফা করও (super-profits tax) বাদ দিতে হইবে।

সরকারী নীতি (Governmental policy) : দীর্ঘকাল পরে ১৯৬৪-র আগষ্ট মাসে বোনাস কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশনের সুপারিশের যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহা হইল :—ক. "প্রাপ্তব্য উদ্বৃত্ত" নির্ধারণে মোট মুনাফা হইতে সকল প্রকার প্রত্যক্ষ কর (direct taxes) এবং শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকার যে করের সুবিধা প্রদান করিয়াছেন তাহা বাদ দেওয়া হইবে। খ. আদায়ীকৃত মূলধনের উপর ৮·৫% হারে আয় (কমিশনের সুপারিশ ৭%), সঞ্চিত তহবিলের উপরে ৬% আয় (কমিশনের সুপারিশ ৪%) বাদ দেওয়া হইবে। ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭·৫% এবং ৫% আয় বাদ দেওয়া হইবে ধার্য করা হইয়াছে। গ. সরকারের মতে, একটা বিশেষ সীমার উর্ধ্বে প্রাপ্য বোনাস নগদ হিসাবে প্রদান না করিয়া ঋণপত্রের আকারে দেওয়া উচিত। তবে এই বিষয়টি শ্রমিক-সংঘের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ আলোচনা অথবা ত্রিদলীয় সম্মেলনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার কথা সরকার বলিয়াছেন।

. . . . **Comments)**: শ্রমিকপক্ষের সুবিধা হয় এমন একটি মাত্র সুপারিশ মানিয়া লইয়া সরকার মালিক পক্ষের প্রায় সব কয়টি প্রধান দাবি মানিয়া লইয়াছেন। সকল শিল্পের মালিককেই ন্যূনতম বোনাস দিতে হইবে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের উপকৃত করিবে। কিন্তু যে ভাবে কমিশনের সুপারিশগুলিকে সরকার মালিকদের দাবি অনুযায়ী পরিবর্তন করিয়াছেন তাহাতে শ্রমিকদের প্রাপ্য বোনাসের পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইবে। ইতোমধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে সরকারী সিদ্ধান্তে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এমতাবস্থায় যে উদ্দেশ্যে বোনাস কমিশন গঠিত হইয়াছিল এবং যে লক্ষ্য পূরণের জন্য বোনাস কমিশন বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশসমূহ সরকারের নিকট রাখিয়াছিলেন, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য,—অর্থাৎ, বোনাস-সমস্যার স্থায়ী সমাধান ও তদ্দ্বারা শিল্পবিরোধের একটি কারণ দূরীকরণ,—সরকারী সিদ্ধান্তের দ্বারা কতদূর সফল হইবে সে বিষয়ে নূতন করিয়া সংশয় দেখা দিবে।

৩ শ্রমিক-কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন

WELFARE AND SOCIAL SECURITY LEGISLATION

ক **শ্রমিককল্যাণ ব্যবস্থা (welfare measures)**: ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরী আইন, ১৯৫১ সালের বাগিচাশ্রমিক আইন এবং ১৯৫২ সালের খনি আইনের অন্তর্গত সকল শিল্পে, ক্যান্টিন, ক্রেসে বা শিশু লালনাগার, বিশ্রামগৃহ, স্নানাগার, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা এবং শ্রমকল্যাণ কর্মচারী নিয়োগের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কয়লা ও অভ্রখনিসমূহে কল্যাণমূলক কার্যক্রম রূপায়ণের জন্য তহবিল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। মোটর পরিবহণ শিল্পের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

১. ১৯৪৭ সালের কয়লাখনি শ্রমিককল্যাণ আইন (Coal Mines Labour Welfare Act, 1947) পাস করিয়া একটি কয়লাখনি শ্রমিককল্যাণ তহবিল (Coal Mines Labour Welfare Fund) সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা ২টি কেন্দ্রীয় হাসপাতাল, ৮টি শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও প্রসূতিসদন সহ আঞ্চলিক হাসপাতাল, ২টি ডিসেপেন্সারী এবং ২টি টি বি. ক্লিনিক পরিচালনা করিতেছে। ম্যালেরিয়া বিনাশ এবং বি. সি. জি. টিকাদান কার্যও ইহা দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

এই তহবিল হইতে বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র, নারী কল্যাণ কেন্দ্র, শিশু উদ্যান ও পরিবার পরামর্শদান কেন্দ্র পরিচালিত হইতেছে। খনিশ্রমিক সন্তানদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাদান কার্যও ইহা পরিচালনা করিতেছে।

ইহার সহায়তা এবং ঋণদান কার্যক্রমের দ্বারা শ্রমিকগণের গৃহাদি নির্মাণ চলিতেছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে এই তহবিলের মোট আয় আনুমানিক ৩·২৮ কোটি টাকা। তন্মধ্যে কল্যাণমূলক এবং গৃহাদি নির্মাণ কার্যের জন্য ইহার ব্যয় আনুমানিক ৩ কোটি টাকা।

২. ১৯৪৬ সালের অভ্রখনি শ্রমিক কল্যাণ আইন (Mica Labour Welfare Act, 1946) অনুসারে অভ্রখনি শ্রমিকগণের চিকিৎসা, শিক্ষা, এবং অবসরবিনোদন ইত্যাদি ব্যবস্থার জন্য একটি অভ্রখনি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল (Mica Mines Labour Welfare Fund) স্থাপন করা হইয়াছে। ইহা বর্তমানে তিনটি হাসপাতাল পরিচালনা করিতেছে এবং আর একটি হাসপাতাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। শিশুকল্যাণ কেন্দ্র এবং প্রসূতি সদনসহ অনেকগুলি ডিসপেন্সারী কার্যরত রহিয়াছে। অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইহার দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

[illegible]১৯৫১ সালের বাগিচা শ্রমিক [illegible] Lab[illegible] [illegible] কোম্পানীগুলিকে শ্রমিকদেব জন্য গৃহনির্মাণ এবং হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারি প্রবৃত্ত কবান হইয়াছে। কযেকটি কোম্পানী শ্রমিকসন্তানদেব প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা কবিতেছে।

১৯৬১ সালেব মোটব পরিবহণ শ্রমিক আইন (Motor Transport Worke: Act) দ্বারা এই শিল্পেব শ্রমিকদেব জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও লৌহ আকব-খনি শ্রমিক আইন (Iron Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1961) দ্বাবা প্রতি টন আকবে ২৫ পয়সা হাবে 'সেস্' প্রবর্তনেব ব্যবস্থা কবা হইয়াছে। 'সেস্' হইতে লব্ধ অর্থ শ্রমকল্যাণে ব্যবহৃত হইবে।

খ. সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা (social security measures) : শ্রমিকগণেব সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলিব মধ্যে ১৯২৩ সালেব শ্রমিকগণেব ক্ষতিপূবণ আইন, প্রসূতিকল্যাণ সম্পর্কে বিবিধ আইন, ১৯৪৮ সালেব কর্মচাবী বাজ্যবীমা আইন, ১৯৫২ সালেব প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১. দুর্ঘটনা, পেশাগত রোগ ও মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ : ১৯২৩ সালেব শ্রমিকগণেব ক্ষতিপূবণ আইনেব (Workmen's Compensation Act, 1923) দ্বারা কার্যরত অবস্থায় আহত, পেশাগত বোগ এবং তজ্জনিত মৃত্যুব দরুন শ্রমিকগণকে ক্ষতিপূবণ প্রদানেব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয। ৫০০ টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী কর্মচাবিগণ এই সুবিধা ভোগ করে। ১৯৬২ সালে সংশোধন দ্বাবা আইনটিব প্রযোগক্ষেত্র প্রশস্ত কবা হইয়াছে।

২. প্রসূতিকল্যাণ : ১৯২৯ সালে বোম্বাই প্রদেশে প্রথম প্রসূতিকল্যাণ আইন পাস হয। তৎপব মধ্যপ্রদেশে ১৯৩০ সালে এইরূপ আইন পাস হয়। পবে শ্রম সম্পর্কে বাজকীয় কমিশনেব সুপাবিশে ভাবতেব প্রায সকল প্রদেশে এই প্রকাব আইন পাস কবা হয। বর্তমানে প্রাদেশিক বা বাজ্য আইন ছাডাও এসম্পর্কে আবও তিনটি কেন্দ্রীয আইনে ইহাব ব্যবস্থা কবা হইয়াছে। যথা—১৯৪১ সালেব খনি প্রসূতিকল্যাণ আইন, ১৯৪৮ সালেব কমচাবী বাজ্যবীমা আইন এবং ১৯৫১ সালেব বাগিচাশ্রমিক আইন। এই সকল আইন দ্বাবা প্রসূতিগণেব আর্থিক সাহায্য নিযন্ত্রিত হয়। প্রসূতিকল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনেব তাবতম্যেব জন্য এক্ষেত্রে সারাভাবতে একই প্রকাব ব্যবস্থা প্রবর্তনেব উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে প্রসূতিকল্যাণ আইন রচিত হয। ইহা কর্মচাবী বাজ্যবীমা আইনেব অন্তর্গত ক্ষেত্র ছাডা অন্যান্য সকল কাবখানা, খনি ও বাগিচাতে প্রযোজ্য হইবে। খনিশিল্পেব ক্ষেত্রে এই আইন ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রবর্তিত হইযাছে। অন্যান্য শিল্পে এই আইন প্রয়োগের দাযিত্ব বাজ্যসবকারসমূহেব হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

৩. বীমা : ১৯৪৮ সালেব কর্মচাবী বাজ্যবীমা আইন (Employees' State Insurance Act) ভাবতেব শ্রমিকগণেব সামাজিক নিবাপত্তা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইহা দ্বাবা শ্রমিকগণেব স্বাস্থ্য, প্রসূতি কল্যাণ ও দুর্ঘটনা বীমাব সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। বর্তমানে ইহা কাশ্মীব ব্যতীত ভারতেব সর্বত্র প্রবর্তিত হইযাছে। ইহাব অন্তর্গত ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ :

ক. ভাবতেব সাবাবৎসর ব্যাপী চালু ও শক্তি ব্যবহাবকাবী এবং ২০ জন বা ততোধিক শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগকাবী সকল কারখানাতে এই আইন প্রযোজ্য হইলেও সবকাব প্রয়োজন মনে করিলে অন্য যে কোন শিল্প, বাণিজ্যিক বা কৃষি প্রতিষ্ঠানে ইহা সম্প্রসারণ করিতে পারেন।

[illegible] ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।
ইহা দ্বারা পাঁচ প্রকার কল্যাণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। যথা,—ক. পীড়া; খ. প্রসূতিকালীন; গ. অকর্মণ্যতা; ঘ. পোষ্য; এবং ঙ. চিকিৎসা। পীড়িতাবস্থায় ৫৬ দিনের জন্য অর্ধেক মজুরির হারে অর্থ সাহায্য, সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে ৬ সপ্তাহ করিয়া মোট ১২ সপ্তাহের জন্য দৈনিক ৭৫ প. হারে অর্থ সাহায্য, অকর্মণ্যতার দরুন অর্থ সাহায্য, পোষ্যবর্গের জন্য অর্থ সাহায্য ও বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ইহাতে রহিয়াছে।

ঘ. এই আইন দ্বারা নিরাপত্তা কর্মসূচী পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের প্রতিনিধি ও পার্লামেন্টের দ্বারা নির্বাচিত ২ জন প্রতিনিধি এবং মালিকপক্ষ ও চিকিৎসকগণের প্রতিনিধি লইয়া 'কর্মচারী রাজ্যবীমা করপোরেশন' নামে একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে।

ঙ. 'কর্মচারী রাজ্যবীমা তহবিল' নামে কর্মচারী রাজ্যবীমা করপোরেশনের একটি তহবি স্থাপিত হইয়াছে। শ্রমিক কর্মচারী, মালিকপক্ষ এবং সরকারের প্রদত্ত চাঁদা লইয়া এই তহবি গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালের শেষ পর্যন্ত কর্মচারিগণের চাঁদার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪·০৮ কোটি টাকা ও মালিকপক্ষের চাঁদার পরিমাণ হয় ৩·১৯ কোটি টাকা।

১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে আইনটি সংশোধিত হয় এবং ১৯৫২ সালে প্রথমে কানপুর ও দিল্লীতে প্রবর্তিত হয়। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ইহা ভারতের ১৫৭টি শিল্পকেন্দ্রের প্রায় ২১ লক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়াছে। এ পর্যন্ত বীমাকৃত ব্যক্তিগণকে মোট ৫·২৯ কোটি টাকার সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে।

৪. **প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড :** বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকগণের জন্য বাধ্যতামূলক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন শ্রমিকগণের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এসম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় ১৯৪৮ সালের কয়লাখনি প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং বোনাস কর্মসূচী আইনের (Coal Mines Provident Fund and Bonus Scheme Act, 1948)। ১০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী শ্রমিক ও কর্মচারিগণের ক্ষেত্রে ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে। এই আইনের দ্বারা শ্রমিকগণ হইতে তাহাদের মূল বেতন ও ভাতার ৬¼% ও মালিকপক্ষ হইতে অনুরূপ ৬¼% চাঁদা লইয়া শ্রমিকগণের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড সৃষ্টি করা হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ঐ তহবিলে মোট ৪৩৭·৭৯ কোটি টাকা জমিয়াছে। তহবিলটি পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, শ্রমিক ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধি লইয়া একটি ট্রাস্টী বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইন (Employees' Provident Fund Act, 1952) তিন বৎসর বা উহার অধিককাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত ও ২০ জন বা তদূর্ধ্ব শ্রমিক কর্মচারীযুক্ত সকল কারখানাতেই প্রযোজ্য। যে সকল শ্রমিক কর্মচারী একটানা এক বৎসরের জন্য অথবা এক বৎসরের বা উহাপেক্ষা অল্পকালের মধ্যে অন্তত ২৪০ দিন প্রকৃতপক্ষে কাজ করিয়াছে, এবং যাহাদের বেতন ও ভাতার মোট পরিমাণ মাসিক ৫০০ টাকার অধিক নহে, তাহাদের পক্ষে মূল বেতনের ৬¼% প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের চাঁদা হিসাবে দেয় বাধ্যতামূলক। তবে শ্রমিকেরা ইচ্ছা করিলে ইহা অপেক্ষা বেশি হারে চাঁদা দিতে পারে, এবং সর্বোচ্চ হার হইবে ৮⅓। মালিক পক্ষেরও অনুরূপ পরিমাণ প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের চাঁদা দেওয়া বাধ্যতামূলক। প্রথমে ৬টি প্রধান শিল্পে ইহা প্রবর্তিত হয়। ১৯৬৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ইহা ২৪,৩৪৫ শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৮ লক্ষ শ্রমিক কর্মিগণের ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছে। ঐ সময় পর্যন্ত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড তহবিলে মোট প্রায় ৪৩৮ কোটি টাকা চাঁদা জমিয়াছে। উহার মধ্য হইতে ঋণ ও প্রাপ্য পরিশোধ বাবদ

১৩৪ কোটি টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া একটি মৃত্যুত্রাণ তহবিল (Death Reserve Fund) সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা হইতে মৃত্যু, অসামর্থ্য ও অবসর গ্রহণের জন্ম প্রাথমিক ত্রাণমূলক অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইবে। ১৯৬০ সালে আইনটি সংশোধন করা হইয়াছে। ফলে, কোন কোন শিল্পে ৮% হারে ফাণ্ডের চাঁদা দিতে হইবে তাহা স্থির করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বাধ্যতামূলকভাবে ৮% হারে চাঁদা দিতে হইবে এমন শিল্পের নামোল্লেখ ঐ সংশোধনীতে করা হইয়াছে।

৫. **অন্যান্য ক্ষতিপূরণ** : ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনের বিভিন্ন সংশোধন দ্বারা শ্রমিকগণকে ছাঁটাই বা বাধ্যতামূলকভাবে কর্মহীন রাখিবার (Lay off) জন্য ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ আইনের ১৯৫৭ সালের সংশোধন দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া গেলে অথবা ইহার মালিকানার হস্তান্তর ঘটিলে ক্ষতিপূরণ দানের নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে।

মুনাফায় শ্রমিকগণের অংশগ্রহণ ব্যবস্থা
PROFIT SHARING

শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি ও শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকগণের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে শ্রমিকগণের আগ্রহ সৃষ্টি—এই বিবিধ উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্যের অনেক অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মুনাফার অংশবিশেষ শ্রমিককর্মীদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে।

শ্রমিকগণকে মুনাফার অংশবিশেষ প্রদানের জন্য শ্রমিক ও মালিকপক্ষের মধ্যে স্বেচ্ছামূলক চুক্তিকেই মুনাফায় শ্রমিকগণের অংশ গ্রহণ ব্যবস্থা (Profit Sharing) বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। ফরাসী দেশে ১৮২০ সালে এই ব্যবস্থা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। ১৮৭০ সালের পর ইহা মার্কিন দেশে প্রচলিত হয়। ভারতে ১৯৩৭ সালে টাটা আয়রন এণ্ড স্টিল কোম্পানীতে ইহা প্রথম প্রবর্তিত হয়। ভারতের শিল্পক্ষেত্রে স্বাধীনতালাভের পর শিল্পে অশান্তি দূর করিবার উপায় হিসাবে ইহা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

সুবিধা—১. শ্রমিকগণের মধ্যে কাজের প্রতি নিষ্ঠা বাড়ে। ২. প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য তাহারা যত্নবান হয়। ৩. কঠোর পরিশ্রমে উৎসাহিত হওয়ায় শ্রমিকগণের দক্ষতা বাড়ে ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। ৪. প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকগণের আনুগত্য বাড়ে। ৬. শ্রমিক মালিক বিরোধ হ্রাস পায় ও প্রতিষ্ঠানে শান্তি স্থাপিত হয়। ৭. প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন অব্যাহত থাকে ইত্যাদি।

অসুবিধা—১. প্রতিষ্ঠানের যতদিন মুনাফা হয় ততদিন ইহা চালু থাকে। ২. শুধুমাত্র বড়, সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিয়মিত মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানেই ইহার প্রবর্তন সম্ভব। ৩. ইহাতে শ্রমিকগণের দক্ষতা অনুযায়ী পুরস্কার মিলে না। ৪. প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সঠিকভাবে নিরূপণ করা অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া মুনাফানির্ধারণে শ্রমিকগণের কোন হাত থাকে না। উহার সমস্তটাই মালিকপক্ষের সততার উপর নির্ভর করে। সুতরাং শ্রমিকগণের নিকট ঘোষিত মুনাফার পরিমাণ কতটা গ্রহণযোগ্য তাহা সন্দেহজনক। ৫ মুনাফাতে শ্রমিকগণের অংশ নির্ধারণের কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নাই। অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে ইহার হিসাব ও বণ্টন ঘটে। ৬. মুনাফা কমিলে শ্রমিকগণের প্রাপ্য অংশও কমে। তাহাতে পুনরায় শ্রমিকগণ বিক্ষুব্ধ হয়। তাহা ছাড়া কোন মুনাফা না হইলে শ্রমিকগণ কিছুই পাইবে না।

মালিক শ্রেণীর অধিকাংশ কখনই শ্রমিক আন্দোলনকে ভালভাবে গ্রহণ করে নাই। যখনই কোন শিল্পে ইউনিয়ন গড়িয়া উঠিয়াছে, মালিক পক্ষ সেই ইউনিয়নকে বলপ্রয়োগে ধ্বংস করিবার জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন কর্মীদের ভীতিপ্রদর্শন ও ছাঁটাই ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে ব্যর্থ হইলে নিজেরা দালাল ও অনুগত লোক নিয়োগ করিয়া পাল্টা ইউনিয়ন গঠন করাইয়াছে। ২. সরকারী বিরোধিতা: প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে সরকার অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছে বলি। শ্রমিকপক্ষ অভিযোগ করে। এ বিষয়ে মালিক শ্রেণী সরকারের নিকট হইতে যে পরিমাণ আনুকূল্য পাইয়াছে শ্রমিক শ্রেণী বহুক্ষেত্রেই উপযুক্ত সংরক্ষণ পায় নাই বলিয়া শ্রমিক পক্ষ মনে করে। ৩. শ্রমিক-যোগানদার (Jobbers), সদার ইত্যাদি শ্রেণীর বিরোধিতা: এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়াছে এবং সুস্থ শ্রমিক আন্দোলন গঠনে বাধা দিয়াছে।

ভারতে সুস্থ শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার উপায়: ভারতের শিল্পায়নে শ্রমিক শ্রেণীর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে তাহা সার্থকভাবে পালনের জন্য ঐক্যবদ্ধ, অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং সর্বব্যাপ্ত শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলনের প্রয়োজন রহিয়াছে। এই প্রকার শ্রমিক আন্দোলনই ভবিষ্যৎ সমাজতান্ত্রিক ভারতের দৃঢ় ভিত্তি। এইজন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া উপরে বর্ণিত ত্রুটিগুলি দূর করা আবশ্যক: ১. দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেক কারখানায় শ্রমিকগণের একটি মাত্র ঐক্যবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপন করিতে হইবে। ২. কারখানার বা প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিক কর্মীকে উহার সভ্য হইতে হইবে। ৩. সভ্যগণ নিয়মিত চাঁদা দিয়া ট্রেড ইউনিয়নের আর্থিক সম্বল বৃদ্ধি করিবে। ৪. প্রত্যেক শিল্পে একটি মাত্র ইউনিয়ন গঠন করিতে হইবে (one union for one industry)। শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় ইউনিয়নগুলি উহার সদস্য হইবে। ৫. গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রমিক ইউনিয়নগুলির কার্য পরিচালনা করিতে হইবে। উহাতে রাজনীতিক দলাদলি ও হস্তক্ষেপ বন্ধ করিতে হইবে। ৬. শ্রমিকগণের মধ্য হইতে নেতৃত্ব সৃষ্টি করিতে হইবে। ৭. ট্রেড ইউনিয়ন কর্মিগণের ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আন্দোলন ছাড়াও বিভিন্ন শ্রমিক কল্যাণমূলক কার্যধারা ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে প্রবর্তন করিতে হইবে। ৯. শ্রমিকগণের মধ্যে সাধারণ ও রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাইতে হইবে। ১০. মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে হইবে। এ সম্পর্কে বলা যায় যে, এই মর্মে ১৯৪৭ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইনের সংশোধন করা হইলেও উহা অদ্যাবধি কার্যে পরিণত হয় নাই।

ট্রেড ইউনিয়ন আইন
TRADE UNION ACT

অন্যান্য দেশের মতই ভারতেও যে সকল মানবদরদী ও জনকল্যাণব্রতিগণ প্রথম শ্রমিক সংগঠন প্রবর্তনের চেষ্টা করেন রাজরোষ ও মালিক পক্ষের নির্যাতনের মধ্য দিয়াই তাহারা পুরস্কৃত হন। এমন কি আদালতের রায়ে শ্রমিক সংঘগুলিকে বেআইনী ও ষড়যন্ত্রকারী সংগঠন বলিয়াও ঘোষণা করা হয় (১৯২১ সালের মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায়)। স্বভাবতই ট্রেড ইউনিয়ন ও উহার নেতৃবর্গকে এইরূপ দেওয়ানী ও ফৌজদারী অপবাদের দায় হইতে মুক্তিদানের জন্য শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম যুগে ইউনিয়ন গঠনের আইনস্বীকৃত অধিকার ভারতের শ্রমিক

আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল। ১৯২৬ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাস করিয়া (Trade Union Acts, 1926) শ্রমিকগণকে এই অধিকার দেওয়া হয়। এই আইনে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি রেজিস্ট্রী করিবার ব্যবস্থা হয় এবং কোন কোন্ উদ্দেশ্যে ইউনিয়নের সাধারণ তহবিল হইতে ব্যয় করা যাইবে তাহা লিপিবদ্ধ হয়। রাজনৈতিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে পৃথক তহবিল গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা ইউনিয়নগুলির হিসাব পরীক্ষা করাইয়া প্রতিবৎসর নিয়মিত ভাবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির রেজিস্ট্রারের নিকট তাহা পাঠাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইউনিয়নের আইনসঙ্গত উদ্দেশ্যে কার্যকলাপের জন্য ইউনিয়ন নেতাগণকে ফৌজদারী অপরাধের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হয়।

কিন্তু এই আইনে মালিকপক্ষ কর্তৃক ইউনিয়নগুলির স্বীকৃতির ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘকাল ধরিয়া এজন্য শ্রমিকগণের মধ্যে আন্দোলন চলে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন সংশোধিত হয়। ইহার দ্বারা শ্রমআদালতের নির্দেশে মালিকপক্ষ কর্তৃক ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দান বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি এই সংশোধিত আইনটি ভারত সরকার কার্যকর করেন নাই। এই জন্য শ্রমিকগণের মধ্যে বিক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে। ১৯৬০ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইনের আর একটি সংশোধন পাস হইয়াছে। ইহা দ্বারা ট্রেড ইউনিয়নগুলির রেজেস্ট্রী সংক্রান্ত কতকগুলি অসুবিধা দূর করা হইয়াছে।

রাষ্ট্র ও শিল্প
State & Industry

পশ্চাৎপট

পৃথিবীর সর্বত্রই রাষ্ট্রশক্তি ও দেশের শিল্পগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক এই যে, রাষ্ট্র সর্বদাই দেশের বিকাশ ও সমৃদ্ধির জন্য শিল্পোন্নয়নে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করে। ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্র ও শিল্পের মধ্যে এই স্বাভাবিক সম্পর্কই বিদ্যমান ছিল। এই কারণে তৎকালীন ভারতে নানাবিধ দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অভূতপূর্ব উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সে যুগের শিল্পকর্মচঞ্চল ভারতের গ্রাম ও শহরগুলির বিবিধ পণ্যসম্ভার ও ভারতীয় কারিগরগণের শিল্পনৈপুণ্য একাধিক ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারিগণের বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। ভারতের সেই পণ্যসম্ভার ইয়োরোপের বাজারে বিক্রয়ের লোভই ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, পর্তুগীজ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীগুলিকে ভারতে আগমনে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

শুল্কনীতি ঃ বৃটিশ যুগ
TARIFF POLICY : BRITISH PERIOD

কিন্তু ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর হইতে পরাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভারতের শিল্পগুলির ও শিল্পায়নের প্রতি শাসক শক্তির দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির পরিবর্তন ঘটে। ভারতে বৃটিশরাজের শিল্পসম্পর্কিত মনোভাব ও নীতিকে কালপর্যায়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১ ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের বিনাশ নীতি ঃ পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বিস্তারের পূর্বে কোম্পানী যখন শুধু বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ছিল, তখন উহার স্বার্থ ছিল ভারত হইতে কুটিরশিল্পজাত বিবিধ দ্রব্য, এবং প্রধানত সূক্ষ্মবস্ত্রাদি সর্বাধিক পরিমাণে ভারত হইতে রপ্তানি। সে সময় ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর বিরাট পরিমাণ রপ্তানি ঘটিত। কিন্তু ১৮৫৭ সালের পর কোম্পানীর শাসন অবসানের পর হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইংরেজ শোষণে ভারত হইতে বিপুলপরিমাণ ধনসম্পদ ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতে থাকে এবং তাহার ফলে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ ধনতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পুঁজি সৃষ্ট হয়।[১] ১৭৬০ হইতে ১৮২০ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে নানাবিধ যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়। এই অনুকূল শক্তির প্রভাবে সে সময় ইংলণ্ডে আধুনিক ধনতান্ত্রিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা জন্মলাভ করে। ইংলণ্ডে আধুনিক বস্ত্রশিল্প দ্রুত উন্নতি লাভ করায়, বৃটিশশিল্পের স্বার্থে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই তৎকালীন ভারতের বৃটিশশাসকগণের ভারতীয় শিল্পসম্বন্ধে বিরোধিতার নীতি গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে ভারতে বিনাশুল্কে বৃটিশ তুলাবস্ত্র আমদানি ও ইংলণ্ডে ভারতীয় তুলাবস্ত্রাদির রপ্তানির উপর শতকরা ৬০-৭০ ভাগ শুল্ক ধার্য হয়। অনেক ভারতীয় দ্রব্যের ইংলণ্ডে আমদানি নিষিদ্ধ হইয়া যায়। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ১৮১৪ হইতে ১৮৩৫ সালের মধ্যে ভারতে ইংলণ্ডের রপ্তানি বস্ত্রের পরিমাণ ১০ লক্ষ গজেরও কম হইতে বাড়িয়া ৫ ১০ কোটি গজের অধিক হয়। আর ভারত হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানিকৃত ভারতীয় বস্ত্রের পরিমাণ ১২৫ লক্ষ খণ্ড হইতে কমিয়া ৩০৬,০০০ খণ্ডে পরিণত হয়। ১৮৪৪ সালে উহা আরও কমিয়া ৬৩,০০০ খণ্ডে দাঁড়ায়। যুগযুগান্তকাল ব্যাপী যে ভারত পৃথিবীর বিভিন্নদেশে বস্ত্ররপ্তানি করিত সে দেশ ১৮৫০ সালে মোট বৃটিশ তুলাবস্ত্র রপ্তানির একচতুর্থাংশ আমদানি করে।[২] ইহার ফলে ভারতের পুরাতন বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস সম্পাদিত হয় এবং ভারতের তৎকালীন

---

১. Brook Adams : The Laws of Civilisation and Decay.

২. India Today and Tomorrow. R. P. Dutt p, 48.

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে ভারসাম্য ছিল তাহা বিনষ্ট হইয়া ভারত কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হয়।

২. অবাধ বাণিজ্য নীতি ঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে রেলপরিবহণ ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সূত্রপাতে আধুনিক শিল্পসম্ভাবনা সৃষ্ট হইলে, ভারতের অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও সুলভ মানবিক সম্পদের ব্যবহারে অকল্পনীয় মুনাফা অর্জনের লোভে এদেশে বৃটিশপুঁজি আকৃষ্ট হয়। ইংলণ্ডে সংগৃহীত ভারত সরকারের ঋণের মাধ্যমে ভারতে বৃটিশপুঁজির আগমনের যে সূত্রপাত ঘটিয়াছিল, এই সময় হইতে প্রথমে তাহা রেলপথে ও পরে বাগিচা খনি ও চটকল শিল্পে বিনিয়োজিত হইতে থাকে। ১৮৫৭ সালে ভারতে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ও প্রত্যক্ষ বৃটিশশাসন প্রবর্তন এবং ১৮৫৭ সালে ভারতে কোম্পানী আইন পাস করিয়া সীমাবদ্ধ মালিকানার যৌথমূলধনী কারবার স্থাপনের দ্বারা এই প্রক্রিয়া সহায়তা লাভ করে। লক্ষণীয় যে, বৃটিশপুঁজি ও মালিকানায় স্থাপিত এই সকল শিল্পগুলি ছিল মুখ্যত রপ্তানিনির্ভর। ইহা ঔপনিবেশিক বনতান্ত্রিক শোষণের অন্যতম সুস্পষ্ট পরিচায়ক। বলা বাহুল্য এই সকল বৃটিশ শিল্পে সরকারের পক্ষপাতিত্ব ছিল। এই সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নীতির পরিবর্তন ঘটে। ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ডে Corn Law তুলিয়া দিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্তিত হয়। ইংলণ্ডে সুলভে কাঁচা মাল আমদানি ও সস্তায় অন্যান্য দেশে বৃটিশ শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় সুনিশ্চিত করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। ভারতেও ঐ নীতি অনুসৃত হইতে থাকে কারণ তৎকালীন ভারত সরকারের নীতি ছিল, 'যাহাতে ইংলণ্ডের মঙ্গল তাহাতে ভারতেরও মঙ্গল'। কিন্তু ১৮৫৭ সালে ভারতের শাসনব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণের পর বৃটিশ ভারতসরকার ব্যয় সংকুলানের জন্য ভারতে আমদানি বৃটিশদ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক আরোপ করে। পরে উহা বাড়ান হয়। ইংলণ্ডের ম্যানচেস্টার চেম্বার অব কমার্স ভারত সচিবের নিকট ঐ আমদানি শুল্কের ছত্রচ্ছায়ায় ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করিলে, ভারত সচিব ভারত সরকারের নিকট কৈফিয়ত তলব করে এবং ইংলণ্ডের শিল্পপণ্যের প্রতিকূল কোন সংরক্ষণমূলক শুল্ক পার্লামেন্ট বরদাস্ত করিবে না বলিয়া মন্তব্য করে। শেষপর্যন্ত ভারতে উৎপন্ন তুলাবস্ত্রের উপর আন্তঃশুল্ক ধার্য করিয়া এই বিবাদের আপসরফা করা হয়। এইরূপে প্রথম মহাযুদ্ধকাল পর্যন্ত বৃটিশ ভারত সরকারের শিল্পসংক্রান্ত নীতির মর্মকথা ছিল ভারতে বৃটিশ স্বার্থে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ ও বৃটিশপুঁজি পরিচালিত রপ্তানিনির্ভর শিল্প ছাড়া অন্য যে কোন দেশীয় শিল্প প্রচেষ্টার বিরোধিতা। এই নীতি ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ভারতে আগত বৃটিশপণ্যাদির উপর ধার্য আমদানি শুল্ক কখনও বৃদ্ধি করা হইলেও উহার পশ্চাতে রাজকোষের আয়বৃদ্ধিই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য দেশীয় শিল্পের সহায়তা নহে। আর দেশীয় শিল্পায়নের প্রতি সরকারী বিরোধিতাও ছিল খুবই প্রকাশ্য। বলাবাহুল্য এই প্রকার সরকারী নীতির অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল অত্যন্ত শ্লথগতিতে শিল্পায়ন। ইহারই প্রতিবাদে ১৯০৫ সনে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

৩. বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি (discriminating protection) ঃ বৃটিশ-ভারত সরকারের দেশীয় শিল্পের প্রতি দীর্ঘকালের প্রকাশ্য প্রতিকূলতার নীতি পরিত্যক্ত হয় ১৯২৩ সালে। ঐ সময়ে ভারত সরকার অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করিয়া বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন। সরকারের এই নীতি পরিবর্তনের কারণ ঃ

১. প্রথম মহাযুদ্ধকালে প্রাচ্যে ভারতবর্ষ প্রধান বৃটিশ যুদ্ধ ঘাঁটিতে পরিণত হয় কিন্তু, স্থানীয় শিল্পাভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় প্রবল অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

২. বর্তমান শতাব্দীতে ভারতে বৃটিশদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য বিদেশী পণ্য ও পুঁজির আমদানি হইতে থাকে। ইহাতে ভারতে একচেটিয়া বৃটিশ বাজার ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়।

৩. ভারতের উদীয়মান দেশীয় শিল্পপতিগণের শিল্পসম্পর্কে অনুকূল সরকারী নীতি গ্রহণের ক্রমবর্ধমান দাবি ও উহার পশ্চাতে জাতীয় নেতৃবর্গের সমর্থন।

৪. প্রথম মহাযুদ্ধকালে নিযুক্ত ভারতের রাজকীয় শিল্পকমিশন (১৯১৬) কর্তৃক শিল্প-প্রতিষ্ঠায় সরকারী আনুকূল্য দানের সুপারিশ ও শিল্পায়নের গুরুত্বনির্দেশ।

এই সকল কারণে ভারত সরকার অবশেষে ১৯২১ সালে একটি ফিসক্যাল কমিশন নিয়োগ

করেন। ইহাই ভারতের প্রথম ফিসক্যাল কমিশন। স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা ছিলেন উহার সভাপতি।

প্রথম ফিসক্যাল কমিশন : ১৯২১-২৩
THE FIRST FISCAL COMMISSION : 1921-23

সংশ্লিষ্ট সকল দিক হইতে ভারত সরকারের শুল্কনীতি (tariff policy) পরীক্ষা এবং এ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শদানের জন্য ১৯২১ সালে এগারোজন সদস্য লইয়া প্রথম ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হয়। শিল্পসংরক্ষণের জন্য শুল্কনীতি প্রয়োগ সম্পর্কে কমিশন একমত হইলেও গ্রহণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশনের সদস্যগণের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে। ৬ জন সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টে, দেশবাসীর উপর ভারলাঘবের যুক্তিতে, বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়। এই নীতি প্রয়োগে সংরক্ষণের আবেদনকারী শিল্পগুলির মধ্যে যোগ্যতাবিচারের জন্য তিনটি মূলনীতি (triple formula) ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। যথা :

১. আবেদনকারী শিল্পটির কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধা (natural advantages), যথা, কাঁচামাল, সুলভ শ্রমিক এবং শক্তির পর্যাপ্ত সরবরাহ অথবা বিরাট অভ্যন্তরীণ বাজার থাকা চাই।

২. শিল্পটি এরূপ হইবে যে সংরক্ষণ ব্যতীত উহা মোটেই উন্নতিলাভ করিবে না অথবা, দেশের স্বার্থে উহার যত দ্রুত উন্নতি বাঞ্ছনীয় ততটা সম্ভব হইবে না।

৩. শিল্পটি এরূপ হইবে যেন অবশেষে উহা সংরক্ষণ ছাড়াই বিশ্বপ্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে।

উপরোক্ত সুপারিশ ব্যতীত, কমিশন আরও কয়েকটি পরামর্শ দেয়। যেমন, প্রয়োজন হইলে দেশরক্ষা সম্পর্কিত শিল্পকে সংরক্ষণের শর্ত বাদ দান করা যাইতে পারে এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি বিনা শুল্কে আমদানি করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া, সংরক্ষণনীতি প্রয়োগের জন্য কমিশন একটি স্থায়ী শুল্কপর্ষৎ (tariff board) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে।

ভারত সরকারের ফিসক্যাল নীতি (fiscal policy of the government) : ১৯২৩ সালে প্রথম ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশগুলি পেশ হইবার অল্পকাল পরেই ১৯২৩ সালের বাজেট অধিবেশনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকারের ফিসক্যাল নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা দ্বারা বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি ও উহার প্রয়োগের জন্য তিনটি মূল শর্ত গৃহীত হয়, কিন্তু ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশকৃত একটি স্থায়ী শুল্কপর্ষৎ (Tariff Board) স্থাপনের প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করেন না। উহার পরিবর্তে সাময়িক শুল্কপর্ষৎ (ad hoc Tariff Board) স্থাপনের সিদ্ধান্ত লওয়া হয় এবং সংরক্ষণের আবেদন নিষ্পত্তি করিবার উদ্দেশ্যে আবেদন বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক জটিল ও কালক্ষেপণকারী পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

প্রথম ফিসক্যাল নীতির লব্ধ ফল (achievements of the first fiscal policy) : প্রথম বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি ভারতের প্রধান কয়েকটি শিল্প, যথা, লৌহ-ইস্পাত (১৯২৪-৪৭), তুলাবস্ত্র (১৯২৭-৪৭), কাগজ (১৯২৭), দিয়াশলাই (১৯২৮), ভারী রসায়ন (১৯৩১) এবং চিনি (১৯৩২) প্রভৃতি শিল্পে প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মোট ১১টি শিল্প ইহার আশীর্বাদ লাভ করে। এই শিল্পগুলিতে সংরক্ষণের দরুন নিম্নোক্ত সুবিধা পাওয়া যায় :

১. সংরক্ষিত শিল্পগুলির উৎপাদন সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। ইস্পাতপিণ্ডের উৎপাদন আটগুণ, সুতীবস্ত্রের উৎপাদন আড়াই গুণ, দিয়াশলাইয়ের উৎপাদন ৩৮% ও কাগজের উৎপাদন ১৮০% বাড়ে। চিনির উৎপাদন বাড়ে প্রায় ৩৯ গুণ (২৪০০০ টন হইতে ৯, ৩১,০০০ টন)।

২. সংরক্ষিত শিল্পগুলিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ১৯২৩ হইতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে সংরক্ষিত শিল্পগুলির মোট কর্মসংস্থান ৪৬·৮% বাড়ে (৫ লক্ষ ৮০ হাজার হইতে ৮ লক্ষ ৮১ হাজার)। আর ঐ সময়ে অ-সংরক্ষিত শিল্পে কর্মসংস্থান বাড়ে ২৩·৬% (৮ লক্ষ ৭০ হাজার হইতে ১০ লক্ষ ৫১ হাজার)।

৩. ১৯২৯-৩২ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার আঘাতে একমাত্র লৌহপিণ্ড উৎপাদন শিল্প ছাড়া অন্যান্য সংরক্ষিত শিল্পের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। এই সময়ে অ-সংরক্ষিত শিল্পগুলিতে মন্দা চলিলেও সংরক্ষিত শিল্পগুলিতে উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়াছে।

৪. সংরক্ষিত শিল্পগুলির উন্নতির ফলে উহাদের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য কতিপয় নূতন শিল্পের বিকাশ ঘটিয়াছে।

৫. সম্প্রসারণশীল সংরক্ষিত শিল্পগুলির চাহিদা পূরণের জন্য উহাদের কাঁচামাল (তুলা, ইক্ষু ইত্যাদি) বাড়িয়াছে। ইহাতে কৃষকগণ উপকৃত হইয়াছে।

সমালোচনা (criticisms): প্রথম ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশ ও ভারত সরকারের প্রথম ফিসক্যাল নীতির নিম্নরূপ সমালোচনা করা হয়:

১. প্রথম ফিসক্যাল কমিশন বা ভারত সরকার কেহই ফিসক্যাল নীতিকে দেশের শিল্পায়নের ও সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় হিসাবে গণ্য করেন নাই। তাহাদের এ সম্পর্কে কোন চিন্তাধারাই ছিল না। বরং ইহাকে তাঁহারা আবেদনকারী শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার জন্য সাময়িক ভাবে সহায়তা দানের উপায় হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন। ফলে যে সকল শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা দ্বারা দেশের সুশৃঙ্খল শিল্পবিকাশ ঘটে নাই। ২. সংরক্ষণ দানে তিনটি মূলনীতির কঠোর প্রয়োগে অধিক সংখ্যক শিল্প সংরক্ষণ লাভ করিতে পারে নাই। তিনটি নীতির দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির ব্যাখ্যা বলিয়া গণ্য করা যায়। আর তৃতীয়টি সম্বন্ধে শুল্ক পর্ষদের পক্ষেও ভবিষ্যৎবাণী করা অসম্ভব। ৩. সরকারী ভাবে ভারত সরকার সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করিলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মনোভাব শিল্পায়নের বিরোধী ছিল। অস্থায়ী শুল্কপর্ষৎ স্থাপন, ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখা, শুল্কপর্ষৎ অস্থায়ী হওয়ায় উহাদের কার্যাবলীর মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাব প্রভৃতির মধ্যে সরকারী শিল্পায়ন বিরোধী মনোভাব পরিস্ফুট হয়। ৪. শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিকেই সংরক্ষণ দানের দ্বারা প্রথম শিল্প নীতিতে দেশে নূতন শিল্প স্থাপনের বিরোধী নীতি অনুসৃত হয়। ৫. বিভিন্ন শিল্পের সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে ও ব্যবস্থাগ্রহণের বিলম্বে অনেক ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের সুবিধা ও উদ্দেশ্য আংশিক ভাবে বিনষ্ট হয়। ৬. সংরক্ষণ নীতির সহিত পূর্বাপর সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত (Imperial Preference) নীতি অনুসৃত হওয়ায় (১৯৩১, '৩৫ ও '৩৯ সালের ভারত-বৃটেন চুক্তিসমূহ) ভারতে বৃটিশ দ্রব্যের ক্ষেত্রে শুল্ক সম্পর্কে বিশেষ সুবিধা প্রদত্ত হইতে থাকে। ইহার ফলে সংরক্ষণ নীতি সবিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়। তবে, সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সীমাবদ্ধভাবে হইলেও, প্রথম ফিসক্যাল নীতিতে ভারতের প্রধান শিল্পগুলি সম্প্রসারণের যে কিছুটা সুবিধা ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগ এবং সংরক্ষণ
PROTECTION IN WORLD WAR II AND POST-WAR PERIODS

১৯৩৯ সালে যুদ্ধারম্ভের পর বিচারমূলকসংরক্ষণ নীতি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। উপরন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটিশ ভারত সরকার ঘোষণা করেন যে যুদ্ধকালে স্থাপিত শিল্পগুলি উপযুক্তরূপে সংগঠিত ও পরিচালিত হইলে উহাদের সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হইবে। এই অবস্থায় যুদ্ধকালে ভারতে কয়েকটি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধ শেষ হইবার পর ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার একটি শুল্কপর্ষৎ নিয়োগ করিয়া সংরক্ষণ লাভেচ্ছু শিল্পগুলির নিকট হইতে আবেদন পত্র আহ্বান করেন। এই সময়ে সরকার সংরক্ষণের যোগ্যতা বিচারের কঠোর শর্ত খানিক পরিমাণে শিথিল করেন এবং শুল্কপর্ষৎকে নিদেশ দেন যে জাতীয় স্বার্থে কোন শিল্পে সংরক্ষণদানকে উহা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিলে, পর্ষৎ সেরূপ সুপারিশ করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া সংরক্ষণের বিকল্প বা অতিরিক্ত সাহায্যদানের সুপারিশ করিবার ক্ষমতাও শুল্কপর্ষৎকে প্রদান করা হয়।

শুল্কনীতি : স্বাধীনযুগ
TARIFF POLICY SINCE INDEPENDENCE

১৯৪৭ সালে শুল্কপর্ষৎ পুনর্গঠন করিয়া তিন বৎসরের জন্য যুদ্ধকালীন শিল্পগুলিকে সহায়তা দান সম্পর্কে সুপারিশ করিতে বলা হয়। ১৯৪৫-৫০ সালের মধ্যে ৯০টি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিয়া অন্তবর্তী শুল্কপর্ষৎ পুরাতন ২২টি শিল্পের সংরক্ষণ অব্যাহত রাখিবার ও নূতন ৩৮টি শিল্পে সংরক্ষণ প্রবর্তনের সুপারিশ করে। এই নূতন শিল্পগুলির মধ্যে সাইকেল, সেলাইকল, বৈদ্যুতিক মোটর, এ্যালুমিনিয়াম, প্লাস্টিক, সোডা এ্যাস, তাঁতবস্ত্রকলের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সংরক্ষণ প্রদত্ত হয়।

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন : ১৯৪৯-৫০
SECOND FISCAL COMMISSION 1949-50

স্বাধীনতালাভের পর ১৯৪৮ সালে গৃহীত শিল্পসম্পর্কিত প্রথম প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে 'পরিবর্তনশীল জাতীয় নীতির আবশ্যকীয় লক্ষ্য সর্ববিধ উপায়ে উৎপাদনের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং উহার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন।' এজন্য উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক হিসাবে উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী শুল্কনীতি নির্ধারণের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, সরকারের শিল্পনীতির লক্ষ্য হইবে অন্যায় বিদেশী প্রতিযোগিতা বন্ধ করা ও ভোগকারিগণের উপর অযৌক্তিক বোঝা আরোপ না করিয়া দেশের সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি করা। এই সংকল্পের অনুসরণে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীভি. টি কৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে ১৯২২ সাল হইতে সরকারের সংরক্ষণ-নীতি সংক্রান্ত কার্যাবলী পরীক্ষা ও ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ বা শুল্কনীতি সংক্রান্ত পরামর্শদানের জন্য দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশন নিযুক্ত হয়। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে কমিশন সুপারিশ পেশ করেন।

ক. সংরক্ষণ সম্পর্কে কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গী (outlook) : কমিশন বলেন যে,— ১. সংরক্ষণ নীতি নিজে কোন লক্ষ্য নহে, উহা লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় মাত্র। সে লক্ষ্যও সাময়িকভাবে একটি দুটি শিল্পে সহায়তাদান নহে, উহার প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়ন ও জাতীয় কল্যাণ সাধন। ২. সংরক্ষণ নীতি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়নের পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্যক। নতুবা, উহাতে ভারসাম্যবিহীন

বিশৃঙ্খল শিল্পোন্নয়ন এবং দেশবাসীর উপর ব্যয়ভারের অসম বণ্টন ঘটিবে। ৩. সংরক্ষণদানের ব্যয়ভারকে অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক ব্যয় (social cost) বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এবং ইহার সহিত সর্বাধিক সামাজিক সুবিধার (maximum social advantage) সঙ্গতি রাখিতে হইবে। ৪. শুধু সংরক্ষণদান করিলেই রাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হয় না। সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিল্প-গুলিকে পরবর্তী পরিচর্যারও প্রয়োজন আছে।

খ. সুপারিশ (recommendations): ১. কমিশন শিল্পগুলিকে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহাদের সংরক্ষণপ্রাপ্তির যোগ্যতাবিচারে নিম্নোক্ত শর্ত আরোপ করেন:

ক. দেশরক্ষা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প: ব্যয় যাহাই হোক, জাতীয় স্বার্থে এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উহাদের সংরক্ষণ করিতে হইবে।

খ. বুনিয়াদী ও মূল শিল্প: অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় এইগুলি অন্তর্ভুক্ত হইলে, ঐ যুক্তিতেই ইহাদের সংরক্ষণ ও অন্যান্য সাহায্য দান করিতে হইবে। শুল্ককর্তৃপক্ষ ইহাদের সাহায্যের পরিমাণ, শর্ত ইত্যাদি স্থির করিবেন ও মধ্যে মধ্যে ইহাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবেন।

গ. অন্যান্য শিল্প: অন্যান্য শিল্পের মধ্যে আবার তিন প্রকার শিল্প থাকিতে পারে। প্রথমত, ইহাদের মধ্যে যে সকল শিল্পের উন্নয়ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পাইবে উহাদের ঐ যুক্তিতেই সংরক্ষণ দান করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ইহাদের মধ্যে যেগুলি পরিকল্পিত বুনিয়াদী ও মূল শিল্পের পরিপূরক ও সহায়ক উহাদের সংরক্ষণের দাবি ও বিবেচনা করিতে হইবে। তৃতীয়ত, অন্যান্য যাবতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে—ক. শিল্পটির বর্তমান সুবিধা ও উহার প্রকৃত বা সম্ভাব্য উৎপাদন খরচের বিবেচনায় উহা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সংরক্ষণ বা সহায়তা ছাড়াই আত্মনির্ভর হইতে সক্ষম হইবে কিনা, এবং/অথবা খ. জাতীয় স্বার্থে শিল্পটিকে সংরক্ষণদান বাঞ্ছনীয় এবং সংরক্ষণ ব্যয়ভার দেশবাসীর উপর অধিক হইবে কিনা—এই দুইটি বিষয়ের দ্বারা উহাদের সংরক্ষণযোগ্যতা স্থির করিতে হইবে।

২ ইহা ছাড়া অন্যান্য সুপারিশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল: ক. অন্যান্য সুবিধা থাকিলে কাঁচামালের স্থানীয় যোগান বিবেচনার প্রয়োজন নাই। খ. সম্ভাব্য বিদেশী বাজারের কথা বিবেচনা করিতে হইবে। গ. একটি সংরক্ষিত শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য অপর যে সকল সংরক্ষিত শিল্প কাঁচামাল রূপে ব্যবহার করিবে, উহাদের 'ক্ষতিপূরণমূলক সংরক্ষণ'-এর সুবিধা দিতে হইবে। ঘ. যে সকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ শিল্পে (embryonic industry) প্রচুর পুঁজি, বিশেষায়ণ ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন এবং যাহাদের ক্ষেত্রে তীব্র বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা আছে উহাদের সংরক্ষণদান বাঞ্ছনীয়। ঙ জাতীয় স্বার্থে কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ প্রবর্তিত হইতে পারে। তবে ইহাদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়। চ. সংরক্ষণনীতি পরিচালনার জন্য একটি বিধিবদ্ধ ও স্থায়ী শুল্ক কমিশন স্থাপন করিতে হইবে। ছ. সংরক্ষণপ্রাপ্তির শর্ত হিসাবে সংরক্ষিত শিল্পগুলির দক্ষতা সর্বোচ্চ স্তরে বজায় রাখিতে হইবে। জ. সংরক্ষণমূলক শুল্ক হইতে আয়ের একাংশ লইয়া একটি উন্নয়ন তহবিল (Development Fund) সৃষ্টি করিয়া উহা হইতে প্রয়োজনীয় শিল্পে অর্থ সাহায্য প্রদান করা যাইতে পারে।

গ. সুপারিশগুলির কার্যে পরিণতি (implementation): ভারত সরকার দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের সকল সুপারিশই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ১৯৫২ সালে শুল্ককমিশন আইন (Tariff Commission Act) পাস করিয়া ৩ হইতে ৫ জন সদস্য লইয়া একটি স্থায়ী শুল্ককমিশন গঠন করিয়াছেন। ইহাঁকে ব্যাপক ক্ষমতা দান করা হইয়াছে।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে শুল্ককমিশন কার্য আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কমিশন সংরক্ষণ প্রবর্তনের জন্য ১৪টি নূতন শিল্পের আবেদনপত্র ও সংরক্ষণ বজায় রাখিবার জন্য ৮৩টি আবেদনে অনুসন্ধান কার্য সম্পন্ন করিয়াছে। নূতন আবেদনকারিগণের মধ্যে ৩টির আবেদন নামঞ্জুর ও ১১টির আবেদন মঞ্জুর করা হয়। সম্প্রতি দেখা যাইতেছে নবস্থাপিত শিল্পগুলির মধ্য হইতে সংরক্ষণের জন্য অতি অল্প আবেদনপত্র আসিতেছে। ইহার কারণ সম্ভবত বর্তমান আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নবপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি সংরক্ষণের প্রয়োজন তেমন অনুভব করিতেছে না।

ঘ. মূল্যায়ন (evaluation): দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশকৃত সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে দুইটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা হইল :

১. অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইলেই কোন শিল্পকে সংরক্ষণ দিতে হইবে, এই যুক্ত বিজ্ঞানসম্মত নহে, ইহাতে শুল্ককমিশনের কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তাহা ছাড়া পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সকল শিল্পেরই সংরক্ষণ প্রয়োজন না হইতেও পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ লৌহ-ইস্পাত শিল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৭ সালের পর হইতে ইহা স্বেচ্ছায় আর সংরক্ষণের আবেদন করে নাই।

২ সংরক্ষণ নীতির অবসান সম্পর্কে কমিশন কোন কথা বলেন নাই। অথচ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে ইহার প্রয়োজন থাকিলেও, বেসরকারী মালিকানার অধীন শিল্পে ইহা দীর্ঘকাল বজায় রাখা শুধু অনাবশ্যক নহে, ক্ষতিকরও হইতে পারে। ইহাতে সংরক্ষিত শিল্পে কায়েমীস্বার্থ সৃষ্টি হয় এবং তাহা হইতে রাজনৈতিক দুর্নীতি ও একচেটিয়া শিল্পসংহতি জন্মিতে পারে।

কিন্তু এই বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, দেশের শিল্পোন্নয়ন ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নতির অঙ্গ ও উপায় হিসাবে সংরক্ষণ নীতি সম্পর্কে দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গী, প্রথম ফিসক্যাল কমিশনের তুলনায় শুধু যে উদার তাহা নহে, বরং সামগ্রিক, যথাযথ ও বাস্তবানুগ। শিল্প বিশেষের প্রয়োজনের খণ্ডিতক্ষেত্রে ইহা নিজের সুপারিশগুলিকে আবদ্ধ না রাখিয়া দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও কল্যাণের পটভূমিকায় সংরক্ষণের সমস্যাকে বিচার ও বিবেচনা করিয়া সুপারিশ প্রদান করিয়াছে। ইহার সুপারিশগুলি শুধু ভারতের শুল্ক ও সংরক্ষণ নীতিতে নবযুগের সূচনাই করে নাই, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও এসম্পর্কিত চিন্তার এবং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি নবপর্যায়ের সূত্রপাত ঘটাইয়াছে।

সরকারের শিল্প নীতি

INDUSTRIAL POLICY OF THE GOVERNMENT

স্বাধীনতালাভের পর ভারত সরকার দেশের সুসংহত, ভারসাম্যযুক্ত এবং ব্যাপক শিল্পায়নের লক্ষ্য গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে প্রথম শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ নীতির অনুসরণে পার্লামেন্টে ১৯৫১ সালে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন পাস হয়। ১৯৫২ সালের ৮ই মে হইতে উহা বলবৎ হয়। ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে বিবেচনা করিয়া সরকার দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ভারতের বর্তমান শিল্পায়ন প্রচেষ্টা এই দ্বিতীয় প্রস্তাব অনুসরণ করিয়াই চলিতেছে। সংক্ষেপে উহাদের আলোচনা করা গেল :

প্রথম শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব : ১৯৪৮
FIRST INDUSTRIAL POLICY RESOLUTION . 1948

১. **উদ্দেশ্য (objectives) :** ক. সর্বসাধারণের জন্য ন্যায়বিচার ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে এরূপ একটি সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপন, খ. দেশের সম্ভাব্য সম্পদ ব্যবহার করে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নয়ন, গ ক্রমবর্ধমান উৎপাদন; ঘ সকলের জন্য সমাজের সেবা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মোচন—এই চারিটি বিষয় প্রথম শিল্পনীতির উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হয়।

২. **সরকারের ভূমিকা (role of the Government) :** ইহাতে ভারতে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তনের সংকল্প উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, এইরূপ ব্যবস্থায় দেশে পরিকল্পিত শিল্পোন্নয়নের এবং জাতীয় স্বার্থে শিল্পগুলির নিয়ন্ত্রণের সর্বময় দায়িত্ব সরকারের উপর থাকিবে। এজন্য রাষ্ট্র ক্রমবর্ধমান পরিমাণে শিল্পক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করিবে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্যাপকভাবে হয়ত ইহা সম্ভব হইবে না। সেজন্য সর্বসাধারণের স্বার্থে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার অধিকার সরকার ঘোষণা করিলেও, বেসরকারী উদ্যোগের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়।

৩. **বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা নির্দেশ (role assigned to the private sector) :** নিজস্ব ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণের সকল সুযোগ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে, কিন্তু সমগ্রিক শিল্পোন্নয়নের স্বার্থে ও প্রয়োজনে উহাকে প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। সরকারী উদ্যোগের সম্প্রসারণের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করিয়া বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র দেশের শিল্পায়নের প্রয়োজন ও ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে সহযোগিতা করিবে।

৪. **সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রবিভাগ (demarcation of spheres) :** শিল্পগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়: ক **সম্পূর্ণ একচেটিয়া সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র :** অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি দেশরক্ষা শিল্পাদি, পরমাণু শক্তি উৎপাদন ও রেলপরিবহণ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত। খ **সরকার-নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র :** কয়লা, লৌহ ইস্পাত, বিমাননির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রপাতি নির্মাণ (রেডিও ব্যতীত) এবং খনিজ তৈলশিল্পাদি ইহার অন্তর্গত। এই ক্ষেত্রে সরকার বর্তমান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে দশ বৎসরের জন্য কার্য পরিচালনার অনুমতি দিবেন। উহার পর এসম্পর্কে তাঁহারা পুনর্বিবেচনা করিবেন। তবে প্রয়োজন হইলে যে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার অধিকার রাষ্ট্রের থাকিবে এবং তজ্জন্য ন্যায়সম্মত ক্ষতিপূরণ প্রদত্ত হইবে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে উহা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আইন অনুযায়ী বিধিবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত 'পাবলিক কর্পোরেশন'-রূপে গঠিত হইবে। গ. **সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শাসনাধীন বেসরকারী ক্ষেত্র :** জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত কতকগুলি শিল্প ইহার অন্তর্গত। যথা, লবণ, মোটরগাড়ি ট্রাক্টর, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ভারী যন্ত্রপাতি, ভারী রসায়ন, সার, রবার, পশম ও তুলাবস্ত্র, সিমেন্ট, চিনি, কাগজ, সংবাদপত্রের কাগজ, বিমান ও সমুদ্র পরিবহণ, খনিজ প্রভৃতি। ইহাদের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের ভার রাষ্ট্রের থাকিবে ঘ **সাধারণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারী ক্ষেত্র :** ব্যক্তিগত ও সমবায় প্রচেষ্টার অন্যান্য সকল শিল্প ইহার অন্তর্গত। ইহা সাধারণত বেসরকারী প্রচেষ্টার জন্য উন্মুক্ত থাকিবে, তবে প্রয়োজন মনে করিলে সরকার ইহাতেও অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

৫. বিদেশী পুঁজি (foreign capital) : সাধারণ ভাবে বিদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ক্ষমতা ভারতীয়গণের হস্তে রাখিতে হইবে। সর্বক্ষেত্রে বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের স্থান গ্রহণের জন্য ভারতীয়গণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬. কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প (small & cottage industries) : ইহাদের গুরুত্ব নির্দেশ করিয়া বলা হয় যে ইহাদের উন্নয়নের ভার রাষ্ট্রের উপর থাকিবে। স্থানীয় সম্পদের দ্বারা স্থানীয় ভোগকারীগণের চাহিদা পূরণে ইহারা বিশেষ উপযোগী।

৭ শুল্কনীতি (tariff policy) : অন্যায় বিদেশী প্রতিযোগিতা বন্ধ ও ভোগকারিগণের উপর অযৌক্তিক ভার আরোপ না করিয়া ভারতের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার জন্য উপযুক্ত শুল্কনীতি গ্রহণের কথাও ঘোষণা করা হয়।

৮. কর ব্যবস্থা (system of taxation) : সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহদান এবং মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে বিত্তের কেন্দ্রীকরণ বন্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনমত কর-নীতির পর্যালোচনা ও পরিবর্তনের কথা ঘোষিত হয়।

সমালোচনা (criticisms) : ভারতের প্রথম শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব দক্ষিণ অথবা বামপন্থী কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। তবে ভারত সরকার যে এক প্রকার মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। ভারতের অবস্থানুযায়ী পরিবর্তনযোগ্য একটি স্থিতিস্থাপক নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রের মধ্যে সীমারেখা টানিয়া সরকার ভারতে এক নূতন নজীর স্থাপন করেন। অনেক শিল্পপতি ইহাকে স্বাগত জানাইলেও সাধারণভাবে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্র রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতার ভয়ে কিছু পরিমাণে ভীত হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া দশ বৎসর পর রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনার কথাতেও তাহাদের মধ্যে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয়। এই নীতিতে ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের বেড়াজালে শিল্প ব্যবস্থা কণ্টকিত হইয়া পড়ে। অবশ্য মিশ্র অর্থনীতিক ব্যবস্থায় ইহা অপরিহার্য।

শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন : ১৯৫১

INDUSTRIES (DEVELOPMENT & REGULATION) ACT 1951

প্রথম শিল্প নীতি অনুযায়ী ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বেসরকারী শিল্পগুলির উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৫১ সালে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন পার্লামেন্টে পাস হয়। ইহার উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি এই : ১. ইহার সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত সকল বর্তমান শিল্পগুলিকে সরকারের নিকট রেজিস্ট্রী করিতে হইবে। ২. কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অনুমতি বিনা ঐ তালিকার অন্তর্গত কোন নূতন শিল্প স্থাপন বা পুরাতন শিল্পগুলির সম্প্রসারণ চলিবে না। ৩. তালিকাভুক্ত শিল্পগুলির অন্তর্গত কোন প্রতিষ্ঠানে যদি উৎপাদন হ্রাস, অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি অথবা উৎকর্ষের অবনতি ঘটিলে সরকার উহার তদন্তের আদেশ দিতে পারেন। ৪. অনুরূপভাবে, ভোগকারিগণের স্বার্থক্ষুণ্ণ হইলে সরকার তদন্তের আদেশ দিতে পারেন। ৫. তদন্তের পর প্রদত্ত সরকারী আদেশ প্রতিপালিত না হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। ১৯৫২ সালের ৮ই মে এই আইন প্রবর্তন-কালে প্রথম ৩৭টি শিল্পে উহা বলবৎ করা হয়। পরে ১৯৫৩ সালে উহা আরও ৮টি শিল্পে এবং ১৯৫৭ সালে অতিরিক্ত ৩৪টি শিল্পে প্রবর্তিত হয়।

এই আইনের দ্বারা—১. ১৯৫২ সালে মালিক, শ্রমিক ও ভোগকারিগণের প্রতিনিধি লইয়া একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শদাতা পরিষদ (Central Council) গঠিত হইয়াছে। ২. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের শেষ পর্যন্ত বিভিন্নশিল্পের জন্য ১৮টি উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) গঠিত হইয়াছে। ৩. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদপ্তর হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটি অনুমতি দান কমিটি (Licensing Committee) গঠিত হইয়াছে। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে সরকার নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের আবেদনপত্র বিবেচনা ত্বরান্বিত করিবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে ঘোষণা করেন যে ১০ লক্ষ টাকার কম সম্পত্তি ও ১০০ জনের কম শ্রমিক লইয়া গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন অনুমতি পত্র লাগিবে না।

দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব : ১৯৫৬
SECOND INDUSTRIAL POLICY RESOLUTION 1956

ক. প্রয়োজনীয়তা (need) : ১ ভারতের পার্লামেণ্ট কর্তৃক সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের লক্ষ্য গ্রহণ ; ২ ১৯৪৮ সাল হইতে '৫৫ সাল অবধি দেশে শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতি , ৩. প্রথম পরিকল্পনার দ্বারা দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রস্তুতি হিসাবে কৃষির পুনরুজ্জীবন এবং ৪. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের অগ্রাধিকার প্রদান—এই চারিটি কারণে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায়, ১৯৫৬ সালের ৩০ শে এপ্রিল ভারত সরকার দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

খ উদ্দেশ্য (objectives) : ১. শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধির দ্বারা অর্থনৈতিক বিকাশের হার বৃদ্ধি করা , ২ ভারী এবং যন্ত্রপাতি শিল্প প্রতিষ্ঠা করা , ৩. রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা ; ৪. ক্রমবর্ধমান সমবায় ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা , ৫ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং বেসরকারী একচেটিয়া কারবার বন্ধ করা , এবং ৬. দেশের মধ্যে আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করা—এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গ. শিল্পের শ্রেণীবিভাগ (classification of industries) : এই প্রস্তাবে শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ১ প্রথম শ্রেণী : ইহার অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলি মোট ১৭টি। (পরমাণুশক্তি শিল্প, লৌহ ইস্পাত, ভারী ঢালাই, ভারী যন্ত্রপাতি, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোম, জিপ্‌সাম, গন্ধক, সোনা এবং হীরার খনি, তামা, সীসা, দস্তা, টিন ইত্যাদির উত্তোলন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিমান নির্মাণ, জাহাজ নিমাণ, বিমান ও রেলপরিবহণ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার, রেডিয়ো বাদে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রপাতি নিমাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টন ইত্যাদি শিল্প ইহার অন্তর্গত)। ইহাদের ক্ষেত্রে বর্তমান বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান বজায় থাকিবার অনুমতি প্রদত্ত হইলেও ইহাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্পূর্ণ ভার রাষ্ট্রের থাকিবে। ২. দ্বিতীয় শ্রেণী : ইহাতে ১২টি শিল্প আছে। ইহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইবে। তবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে বেসরকারী ক্ষেত্রকে উন্নয়নের সুযোগদান করা হইবে। ৩. তৃতীয় শ্রেণী : উপরোক্ত দুইটি তালিকা-বহির্ভূত অন্যান্য যাবতীয় শিল্প ইহার অন্তর্গত। ইহাদের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। তবে প্রয়োজনবোধে ইহাদের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতে পারে।

ঘ. রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারী ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক (**relation between the public and the private sectors**) : আপাতদৃষ্টিতে শিল্পের যে কোন

বিভাগে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে করা হইয়াছে, এ কথা মনে হইলেও সামান্য লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সকল ক্ষেত্রেই বেসরকারী উদ্যোগকেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং, দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রীয় এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলি সম্পূর্ণ পৃথক করিবার পরিবর্তে সকল শ্রেণীর শিল্পেই উহাদের দ্বৈত অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া পরস্পরকে পরস্পরের অনুপূরক ও পরিপূরক করা হইয়াছে। এবং বেসরকারী উদ্যোগকে যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য গ্রাম্য, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন এবং তজ্জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন, আঞ্চলিক শিল্পায়ন দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শিল্পায়নের ভারসাম্য আনয়ন, কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা কর্মীদের অভাব দূর করিবার জন্য কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষার প্রসার এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করিবার জন্য শ্রমিকগণের নানাপ্রকার আরাম ও প্রণোদনার কথাও প্রস্তাবে বলা হয়।

ঙ. **প্রথম ও দ্বিতীয় শিল্পনীতির তুলনা** (**comparison between the first and the second industrial policy resolutions**): ১ প্রথম শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ প্রবর্তিত হইয়াছে। ২ প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। ৩. দ্বিতীয় শিল্পনীতির দ্বারা অল্প কয়েকটি শিল্প বাদে প্রয়োজন মনে করিলে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতিদানের অধিকার সরকারকে প্রদান করা হইয়াছে। ৪ রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সমবায় ক্ষেত্র গঠনের কথা দ্বিতীয় শিল্পনীতি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। তাহা প্রথম প্রস্তাবে ছিল না। ৫. প্রথম প্রস্তাবে যেরূপ বেসরকারী শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা বলা হইয়াছিল, লক্ষ্য করিবার বিষয় যে দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে সেরূপ কোন উল্লেখই নাই। বরং সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগকে সমপরিমাণ সুযোগসুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

চ. **মূল্যায়ন** (**evaluation**): ১ উল্লিখিত তিন শ্রেণীর যে কোনটিতে রাষ্ট্রকর্তৃক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার ঘোষিত হওয়ায়, ইহার দ্বারা বেসরকারী ক্ষেত্রের সংকোচন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই জন্য বেসরকারী উদ্যোগের পক্ষে নিজের আয়ত্তাধীনে আর কোন ক্ষেত্র থাকিল না, এই বলিয়া শিল্পপতিগণ দ্বিতীয় শিল্পনীতির প্রবল সমালোচনা করিয়াছেন। ২ তাহাদের আর একটি সমালোচনা হইল যে, সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারী উদ্যোগের সহাবস্থানের ব্যবস্থা করা হইলেও বেসরকারী ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের লেজুর হিসাবে রাখা হইয়াছে। ৩. দ্বিতীয় শিল্পনীতির আর একটি দক্ষিণপন্থী সমালোচনা এই যে, ইহাতে সরকার বাস্তব জ্ঞান অপেক্ষা আদর্শবাদ দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছেন। ৫. রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা তুলিয়া দেওয়ায় সরকার দক্ষিণপন্থিগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া বামপন্থিগণ সমালোচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে পূর্বাপেক্ষা সরকার অধিক পরিমাণে স্থিতিস্থাপকনীতি গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা সত্ত্বেও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পুনর্ঘোষণা না করায় এবং সকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজনবোধে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে স্থাপনের অনুমতি ও সহায়তা দানের ঘোষণার মধ্যে উহার পরিচয় পাওয়া যায়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় ভারতের গণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামো এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের লক্ষ্যের চৌহদ্দির মধ্যে দ্বিতীয় শিল্পনীতির দ্বারা বেসরকারী

উদ্যোগকে উহার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা প্রমাণের নবতম সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনীতিক কাঠামোতে বেসরকারী উদ্যোগ বজায় থাকিবে কিনা তাহার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার বেসরকারী উদ্যোগের হস্তেই আরোপ করা হইয়াছে। অন্যান্য দিক যথা, আঞ্চলিক শিল্পায়ন, সমবায় ক্ষেত্রের প্রসার প্রভৃতি দ্বিতীয় শিল্পনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বাঞ্ছনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রশ্নপত্র ও উত্তর সংকেত

১ : ভারতের শিল্পায়ন

1. "The Industrial System of India is unevenly and in most cases inadequately developed." Elucidate. [C. U. B. Com. 1949] [Ans. ২০৯-১০ পৃঃ]
2. Give a critical estimate of the progress of Industrialisation in India since the introduction of the First Five Year Plan. [C. U. B. A. 1962] [Ans. ২১২-১৫ পৃঃ]

২ : কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প

1. Discuss the role that Cottage and Small Industries can play in the economic development of India. [B. U. B. A. (Old Course) 1962-63] [Ans. ২১৬-১৮ পৃঃ]
2. Explain the difficulties faced by the small scale industries in India and comment on the measures adopted by the Government to deal with them [B. U. B. A. (3-yr. modified course) 1962] [Ans. ২১৮-২৩ পৃঃ]
3. On what lines and by what methods would you like to develop our Cottage and small scale industries so that they may play a useful part in India's economic development? [C. U. B. A. 1959] [Ans. ২১৯-২১ পৃঃ]
4. Give a critical estimate of the measures adopted by the Government of India for the development of small scale industries. [C. U. B. Com. 1961] [Ans. ২২১-২৩, ২২৮-২৯ ও ২২৪-২৫ পৃঃ]
5. Describe the various ways in which cooperation can solve the problems of rural cottage industries. [C. U. B. Com 1952] [Ans. ২২৯ পৃঃ]
6. Discuss how far it is practicable to increase the supply of essential consumer goods in India through the encouragement of cottage and small industries. C. U. B. Com. 1958] [Ans. ২২৭-২৮ পৃঃ]
7. Discuss the rationale of fostering the small scale and cottage industries in India under present conditions [Ans. ২২৫-২৭ পৃঃ]
8. Indicate briefly the measures recently adopted by the Government of India to assist the development of cottage and small industries. [C. U. B. A 1962] [Ans. ২২১-২৪, ২২৮-২৯ পৃঃ]

৩ : কয়েকটি প্রধান বৃহদায়তন শিল্প

1. Consider in brief the present position and future prospects of the Jute Industry in India. [C. U. B. Com. 1964, B. A. 1952,'58., B. Com. 1950] [Ans. ২৩২-৩৫ পৃঃ]
2. What are the main problems of the Jute Mill Industry in the present times? What measures do you suggest to improve the competitive position of the industry in the world market? [C. U. B. A. 1959, '60] [Ans. ২৩২-৩৫ পৃঃ]

3. What problems have faced the Indian Cotton Mill Industry since the end of World War II ? What measures would you suggest to improve the present position of the industry ? [B. U. B. Com. 1964. C U. B. A. 1961]
[Ans ২৩০-৩২ পৃঃ]

4. Discuss carefully the current problems of either the jute mill industry or the Coal mining industry of India. What measures would you suggest for improving the present position of the Industry ?
[C U. B Com. 1964, B. A 1962] [Ans ২৩২-৩৫ ও ২৩৭-৩৯ পৃঃ]

5. Critically discuss the problems of either the Iron and Steel Industry or the Jute Mill industry in India [C. U B. Com 1962] [Ans ২৩৫ ৩৭ ও ২৩২-৩৫ পৃঃ]

6. Examine the present position and problems of either the Jute Mill Industry or the Coal Mining Industry of India. [B U. B Com 1963]
[Ans ২৩২ ৩৫ ও ২৩৭ ৩৯ পৃঃ]

৪ ঃ শিল্পায়নের কতিপয় আধুনিক সমস্যা

1. Discuss the case for rationalisation of the Cotton Textile Industry in India and point out briefly the measures already taken in this connection.
[B U. B A 1961 B. Com (New Course) 1962] [Ans ২৪৩-৪৫ পৃঃ]

2 Examine the case for rationalisation of industries in India under present conditions What safeguards would you like to adopt in introducing schemes of rationalisation in Indian industries ? [B U B Com (Old Course) 1962]
[Ans. ২৪০ ৪২ পৃঃ]

3 Write short notes on
(1) industrial location in India, and (2) industrial productivity in India.
[Ans ২৪৫-৪৮]

৫ ঃ শিল্পের অর্থসংস্থান

1 Discuss the problems of industrial finance in the private sector in India
[Ans ২৫০ ৫২ পৃঃ]

2. Describe the organisation and functions of the Industrial Finance Corporation of India and comment upon its working
[C. U B A 1955, 59, B Com 1952 56, '62] [Ans. ২৫৪ ৫৭ পৃঃ]

3. Give an account of the special agencies that have been set up in India after World War II for providing long term finance to private industry.
[C U. B. A 1955, B Com 1957, '58, '59] [Ans ২৫২ ৫৩ পৃঃ]

4. Examine the main financial requirements of large scale industries in India. What part has been played by the Industrial Finance Corporation in meeting these requirements ? [C U B. A. 1961] [Ans ২৪৯-৫০ ও ২৫৪ ৫৭ পৃঃ]

5. Consider the financial problems of small and medium scale industries in India and discuss the measures that have been adopted in recent years to solve these problems [C U. B. A. 1960 , B Com. 1960] [Ans. ২৫০ ৫২ পৃঃ]

6. Give a critical account of the working of the institutions set up in India for long term financing of industries. [C U. B. Com. 1961] [Ans. ২৫৪-৬৪ পৃঃ]

7. Give a critical estimate of the activities of the principal agencies of the supply of finance to large scale industries. [B. U. 1961] [Ans. ২৫৪-৬৪ পৃঃ]

8. Examine the functions of the principal agencies financing large scale industries in India. [B. U. B. A. (Old Course) 1962] [Ans. ২৫৪-৬৪ পৃঃ]
9. What are the main sources of supply of long term finance for large scale industries in India ? Comment on the adequacy of these sources.
[B. U. B. A. (3-year Degree Course) 196?] [Ans. ২৫৪-৬৪ পৃঃ]
Examine the case for and against encouraging the flow of foreign capital into India under existing circumstances. [C. U. B A. 1961 ; B. U. 1961]
[Ans. ২৭৩-৭৫ পৃঃ]

৬ ঃ শিল্পের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

1. "The Managing Agency System has outlived its usefulness." Discuss this statement. [C. U. B. Com. 1951] [Ans. ২৮০-৮৬ পৃঃ]
2. How far is it necessary to do away with the system of managing agency system in this country ? Give full reasons. [C. U. B. Com. 1955]
[Ans. ২৮০-৮৬ পৃঃ]
3. Give your own evaluation of the part played by the Managing Agency System in India's economic development. [C. U. B. Com. 1959, B. A. 1960]
[Ans. ২৮০-৮৬ পৃঃ]
4. Compare and contrast the different forms of State enterprise in India. Which do you think is the best suited to the needs of this country, and why ?
[C. U. B. Com. 1962] [Ans. ২৮৭-৯১ পৃঃ]
5. Critically estimate the role of Managing Agents as suppliers of Industrial Finance in India. Do you think that the elimination of Managing Agents will create a void in the financial machinery of the country ?
[B. U. B. Com (3-year Modified Course) 1962] [Ans. ২৮০-৮৬ পৃঃ]

৭ ঃ শিল্প ও শ্রমিক

1. Discuss the causes of low efficiency of Indian labour and suggest measures for improving it. [Ans. ২৯২ ৯৩ পৃঃ]
2. Discuss the causes of Industrial Disputes in India. What measures have been taken to promote industrial peace in the country.
[C. U. B. Com. 1952 , '54 ; C. U. B. A. 1951; '52, '57, '58, '60] [Ans. ২৯৪-৯৯ পৃঃ]
3, Describe and comment on the measures adopted by the Government to settle industrial disputes in India. [C. U. B. Com. 1960., '61] [Ans. ২৯৭-৯৯ পৃঃ]
4. Discuss the causes of Industrial disputes in recent years in India. How far would you favour compulsory arbitration as a means of settling such disputes at the present time ? [C.U. B. Com. 1953, '56 ; B. A. 1954, '57] [Ans. ২৯৪-৯৬ পৃঃ]
5. What measures have been taken in recent years to provide social security to Industrial workers ? Give your answer with special reference to Employee's State Insurance Scheme. [C. U. B. A. 1953] [Ans. ৩০৭-১০ পৃঃ]
6. Examine the existing machinery for the settlement of Industrial disputes in India. [B. U. B. Com. (3-yrs. modified course.) 1962] [Ans. ২৯৭-৯৯ পৃঃ]
7, Describe and comment critically on the industrial dispute legislation in India.
[B. U. B. A. Old Course. 1962] [Ans. ২৯৭-৯৯ পৃঃ]

8. **Explain the present position of the legal machinery for the settlement of Industrial disputes in India. How far do you think compulsory arbitration would be an effective measure for settling industrial disputes in the country ?**
[C. U. B A. 1962] [Ans ২৯৭-৯৯, ২৯৫-৯৬ পৃ:]

9. Trace the growth of the Trade Union movement in India What obstacles have stood in the way of the development of the movement ?
[C U B Com 1957, B A 1961] [Ans ৩১১ ১০ ৩১৪-১৫ পৃ:]

10 Point out the main features of the growth of Trade Union Movement in India. What are its major drawbacks ? [B U B A (3 yr modified course) 1962]
[Ans. ৩১৩ ১৫ পৃ:]

৮ঃ রাষ্ট্র ও শিল্প

1 "The Indian Fiscal Commission 1949 50 approached their task from a new angle and laid down new principles of protection " Elucidate the statement [C U B A 1955] [B U B Com 1962] [Ans ৩২১-২৩ পৃ:]

2 Explain the principal changes in the Fiscal Policy of India as the result of the recommendations of the Fiscal Commission of 1949 50 [B U. 1961]
[Ans ৩২১-২৩ পৃ:],

Write a short note on

(a) The Fiscal Policy of 1949 50 [C U B. A 1959, 61 , B Com. 1960, '61]

(b) Discriminating Protection [C U B Com 1962] [Ans ৩২১ ২৩ পৃ:]

4 "The conditions laid down by the Indian Fiscal Commission of 1923 for the application of discriminating protection were too stringent and made the policy of protection to a great extent nugatory " Discuss the statement and examine in this connection the principles enunciated by the Fiscal Commission of 1949 50 for granting protection to Indian Industries.
[B U. B Com. (Modified Course) 1962] [Ans ৩২০, ৩২৮ পৃ:]

5 Comment on the present Industrial Policy of the Government of India.
[C. U B Com 1955] [Ans. ৩২৬ ২৮ পৃ:]

6. Briefly discuss the revised Industrial Policy of the Government of India.
[C U B Com 1957] [Ans ৩২৬-২৮ পৃ:]

7. Elucidate the main features of the Industrial Policy of the Government of India as enunciated from time to time [C U. B Com 1959] [Ans. ৩২৪ ২৮ পৃ:]

8 Discuss the main features of the present Industrial Policy of the Government of India. [C U B Com 1961] [Ans. ৩২৬ ২৮ পৃ:]

9. Write a short note on the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.
[C U, B. Com. 1961 (Comp)] [Ans. ৩২৫-২৬ পৃ:]

10. Examine critically the Industrial Policy as enunciated by the Government of India in 1956. [B U B Com 1962] [Ans. ৩২৬ ২৮ পৃ:]

চতুর্থ খণ্ড

তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিক ক্ষেত্র

পরিবহণ • মুদ্রা ও মুদ্রাবিনিময়

টাকার বাজার ও ব্যাঙ্কিং • ব্যবসায়-বাণিজ্য • মূল্যান্তর

"............ বাণিজ্যের স্রোত
ধরণী বেষ্টন করে জোয়ার-ভাঁটায়।
পণ্যপোত ধায় সিন্ধুপারেপারে।..."

রবীন্দ্রনাথ

[illegible] হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আনুমানিক প্রকৃত ব্যয় হয় ১২৫০ কোটি টাকা ([illegible] ১০৮৫·১ কোটি টাকা)।[১] তৃতীয় পরিকল্পনায় এজন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ১৪৮৬ কোটি টাকা।

পরিবহণের প্রকারভেদ
TYPES OF TRANSPORT

ভারতে চারিপ্রকার পরিবহণের ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে। যথা,—১. রেলপরিবহণ। ২. সড়কপরিবহণ। ৩. জলপথ পরিবহণ। এবং ৪. বিমান পরিবহণ।

১. রেলপথ পরিবহণ
RAILWAY TRANSPORT

১৮৪৯ সালে কলিকাতার নিকটে পরীক্ষামূলকভাবে রেলপথ স্থাপনের পর ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল হইতে বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত ২০ মাইল পথে যাত্রী চলাচলের জন্য রেলপথ উন্মুক্ত হয়। এই তারিখটি ভারতে রেল পরিবহণের জন্ম তারিখ বলিয়া গণ্য করা হয়। উহার পর হইতে ক্রমাগত রেলপরিবহণের সম্প্রসারণ ঘটিতে থাকে। কিন্তু ব্রহ্মদেশের পৃথকীকরণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দেশভাগের ফলে রেলপথের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাইয়া ১৯৪৭-৪৮ সালে ২১,২৪০ কি মি. পরিণত হয়। তৎপরবর্তী কাল হইতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টার ফলে পুনরায় রেলপথের সম্প্রসারণ ঘটিতেছে। ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম পরিকল্পনার আরম্ভকালে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২১,৩০০ কি. মি ১৯৬২-৬৩ সালে উহা ৫৭,৪০৪ কি. মিটারে পরিণত হয়।

সরকারী নীতি (Government Policy) : ১. প্রথম হইতেই ভারতে রেলপথ স্থাপন ও পরিচালনার ভার ইংলণ্ডে গঠিত বৃটিশ কোম্পানীগুলির হস্তে অর্পিত হয়। সে সময় সরকার ইহাদের পুঁজির উপর শতকরা ৫ টাকা সুদ প্রদানের নিশ্চয়তা (Guarantee) দান করেন। ইহাতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হওয়ায় রেলপথ সংক্রান্ত সরকারী নীতির পরিবর্তন হয়। ১৮৬৯ সালে সরকার নিজেই রেলপথ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহাতেও সুবিধা না হওয়ায় পরে সংশোধিত আকারে পুনরায় পূর্বের 'গ্যারান্টি প্রথা' প্রবর্তন করা হয়। এই নিয়মে ভারতে রেলপথ স্থাপন ও পরিচালনার তিন প্রকার পদ্ধতি গৃহীত হয়। যথা সরকারী রেলপথে সরকারী পরিচালনা, সরকারী রেলপথে বেসরকারী কোম্পানী দ্বারা পরিচালনা; এবং বেসরকারী রেলপথ বেসরকারী কোম্পানী দ্বারা পরিচালনা। এইরূপে প্রধানত বেসরকারী বৃটিশ পুঁজির দ্বারাই ভারতে রেলপথের বিস্তার ঘটে। ১৯০৫ সালে রেলপথের পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের জন্য রেলওয়ে বোর্ড স্থাপিত হয়।

২. ১৯২১ সালে নূতন রেলপথ নীতি গ্রহণ সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্য স্যার উইলিয়াম এ্যাকওয়ার্থের সভাপতিত্বে একটি সরকারী কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি ক্রমে ক্রমে রেলপথের জাতীয়করণের সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ গৃহীত হয় ও ১৯২৫ হইতে ১৯৩৪ সালে ভারতীয় রেলপথের জাতীয়করণ সম্পূর্ণ হয়।

৩. বর্তমানে ভারতীয় রেলপথের মালিকানা রাষ্ট্রের। ইহার সামগ্রিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার ৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত রেলওয়ে বোর্ডের উপর ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় রেল পরিবহণ মন্ত্রীদপ্তরের সচিব ইহার সভাপতি।

৪. ১৯৪৯ সালে ভারতে ৩৭টি বিভিন্ন রেলপথ ছিল। সামগ্রিকভাবে উহাদের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালনার সুবিধার জন্য ১৯৫১ সালে একটি আইন [Railway Companies (Emergency Provisions) Act, 1951.] পাস করিয়া উহাদের (২৯৫ কি. মি. দৈর্ঘ্য-সমন্বিত কয়েকটি ছোট বেসরকারী মালিকানাধীন রেলপথ বাদে) পুনর্গঠন করা হয়। ইহার দ্বারা ভারতের সকল রেলপথগুলিকে ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

ক. দক্ষিণ রেলপথ (Southern Railway) : ভূতপূর্ব M. S. M, S. I. ও Mysore

---

[১] Third Five Year Plan. P. 536.

Rly. লইয়া ১৯৫১ সালের ১৪ই এপ্রিল ইহা গঠিত হয়। মোট দৈর্ঘ্য বর্তমানে ৬,১৬২ মাইল। মাদ্রাজে ইহার কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত।

খ. কেন্দ্রীয় রেলপথ (Central Railway) : ভূতপূর্ব G. I. P. R., Nizam's State Rly. ও Scindia & Dholpur Rly. লইয়া ১৯৫১ সালের ৫ই নভেম্বর ইহা স্থাপিত হয়। মোট দৈর্ঘ্য বর্তমানে ৫,৭০৯ মাইল। কেন্দ্রীয় কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত।

গ. পশ্চিম রেলপথ (Western Railway) : ভূতপূর্ব B. B. & C. I. Saurashtra, Kutch. Rajasthan ও Jaipur Rly. লইয়া ইহা ১৯৫১ সালের ৫ই নভেম্বর স্থাপিত হয়। বর্তমান মোট দৈর্ঘ্য ৬,০৬৪ মাইল। কেন্দ্রীয় কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত।

ঘ. উত্তর রেলপথ (Northern Railway) : ভূতপূর্ব পূর্বপঞ্জাব যোধপুর, বিকানীর রেলপথ ও E. I. R.-এর একাংশ লইয়া ইহা ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল গঠিত হয়। বর্তমান মোট দৈর্ঘ্য ৬,৪২৯ মাইল। দিল্লীতে ইহার কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত।

ঙ. উত্তর-পূর্ব রেলপথ (North-Eastern Railway) : ভূতপূর্ব O. T., A. R., ও B. B. & C I.-এর একাংশ লইয়া ১৯৫২ সালের ১৪ই এপ্রিল ইহা গঠিত হয়। বর্তমান মোট দৈর্ঘ্য ৩,০৭৮। গোরক্ষপুরে ইহার কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত।

চ. পূর্ব রেলপথ (Eastern Railway) : ভূতপূর্ব E. I. R.-এর উত্তরাংশ বাদে বাকী অংশ লইয়া ১৯৫৫ সালের ১লা আগস্ট ইহা গঠিত হয়। মোট দৈর্ঘ্য ২,৩৮১ মাইল। কেন্দ্রীয় কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত।

ছ. দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ (South-Eastern Railway) : ভূতপূর্ব B. N. R. লইয়া ইহা ১৯৫৫ সালের ১লা আগস্ট গঠিত হয়। মোট দৈর্ঘ্য ৩,৪৯৫ মাইল। কেন্দ্রীয় কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত।

জ. উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (North-East Frontier Railway) : ভূতপূর্ব O. T. ও Assam Rly.-এর একাংশ লইয়া ১৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী ইহা গঠিত হয়। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১,৭৪৯ মাইল। পাণ্ডুতে কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত।

ঝ. পশ্চিম-কেন্দ্রীয় রেলপথ (West Central Railway) : সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে কেন্দ্রীয় কার্যালয় লইয়া কেন্দ্রীয় রেলপথের একাংশ দ্বারা এই নূতন রেলঅঞ্চলটি স্থাপিত হইয়াছে।

রেলপথ পুনর্গঠনের ফলে দেশের সর্বত্র যাত্রী ও পণ্যচলাচলে একরূপ মাশুল, যাত্রীদের জন্য একই প্রকারের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান, রেলপথের আর্থিক স্থায়িত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

রেলপরিবহণের গুরুত্ব (Importance of The Indian Railways) : ১. ভারতের সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে রেলপরিবহণের গুরুত্ব প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নূতন শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও আঞ্চলিক শিল্পায়ন, গ্রামাঞ্চলে শিল্পজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ, শিল্পাঞ্চলে কৃষিজাত কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি, দেশের সর্বত্র খাদ্যের যথাযথ বণ্টন, শ্রমের সচলতা বৃদ্ধি, রপ্তানিবন্দরগুলিতে পণ্যের সময়োপযোগী সরবরাহ বৃদ্ধি প্রভৃতি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানাভাবে ভারতের রেলপরিবহণ ব্যবস্থা দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নের সহায়তা করিতেছে। ১৯৬২-৬৩ সালে গড়ে প্রতিদিন রেলপথগুলি ৪৮ লক্ষ যাত্রী ও প্রায় ৫ লক্ষ টন পণ্য বহন করিয়াছে।

২. তাহা ছাড়া ভারতের রেলপরিবহণ দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় কারবারও বটে। ১৯৬২-৬৩ সালে ইহাতে ১৯০৪ কোটি টাকা বিনিয়োজিত এবং উহা হইতে মোট আয়ের পরিমাণ ছিল

৫৭০ কোটি টাকা। এই আয় হইতে প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে অর্থ প্রদত্ত হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে রেলপথের আয় হইতে ১৯৫৯-৬০ সালে ৫৭.২৭ কোটি টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহে রেলপথ হইতে ১১৫ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৫০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই উৎস হইতে ১০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

৩. কর্মসংস্থানের দিক দিয়াও ভারতীয় রেলপথের গুরুত্ব কম নহে। ১৯৬২-৬৩ সালে উহাতে ১২,১৭,৫৫৭ জন ব্যক্তি কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া ২৩৩ কোটি টাকার মজুরী ও বেতন উপার্জন করিয়াছে।

৪. ইহা ছাড়া রেলপথের সম্প্রসারণ দেশে দেশী ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের সুবিধা বৃদ্ধি, জাতীয় সংহতি, প্রশাসনিক ও দেশরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিতেছে।

রেলপরিবহণ ও পরিকল্পনা (**Railways & planning**): ১. সম্প্রতিকালে রেলপরিবহণের প্রধান সমস্যা ছিল রেলপথের সংস্কারসাধন, পুনর্বাসন, যন্ত্রপাতি ও রেল লাইনের নবীকরণ। এই জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ৪২৩.৭০ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

২. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রেলপথের সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য ১১২১.৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়। ইহার দ্বারা ক. যাত্রীবহন ক্ষমতা ৩ শতাংশ বৃদ্ধি, খ. পণ্যবহন ক্ষমতা ১৬.২০ কোটি টন পর্যন্ত বৃদ্ধি ; গ. ১২০০ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপন, ১৩০০ মাইল ডবল লাইন এবং ৮৮০ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিকীকরণ ; ঘ. ইঞ্জিন, যাত্রীগাড়ি ও পণ্যবাহী গাড়ি বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার রেলপথ সম্প্রসারণ কার্যক্রম মোটামুটি-ভাবে সন্তোষজনকরূপে কার্যে পরিণত হইয়াছে।

৩. পরিকল্পনার গত একদশকে (১৯৫১—১৯৬১) রেলপথ উন্নয়নের দ্বারা যাত্রীপরিবহণ ক্ষমতা ২৭ শতাংশ ও পণ্যপরিবহণ ক্ষমতা ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত দশ বৎসরে ১৩০০ মাইল রেলপথ ডবল করা হইয়াছে। ৮০০ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ ঘটিয়াছে। পুরাতন বহু রেলওয়ে ইয়ার্ডের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, ও পুনর্বিন্যাস এবং নূতন ইয়ার্ড প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল এরূপ ৭০০ মাইল রেলপথ পুনরায় স্থাপন ছাড়াও নূতন ১২০০ মাইল রেলপথ বসান হইয়াছে। জরুরী প্রয়োজন ও কয়লা এবং ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া রেলপথের এই সম্প্রসারণ সম্পাদিত হইয়াছে।

৪. তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলপথ সংক্রান্ত কর্মসূচীতে প্রতিবৎসর ৩ শতাংশ হারে রেলপথের যাত্রী পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পণ্য পরিবহণ ক্ষমতা ৯.১০ কোটি টন বৃদ্ধির (অর্থাৎ ২৪.৫০ কোটি টন পর্যন্ত) লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। এজন্য মোট ১৩২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন কারখানার বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন তৈয়ারী, ১৬০০ মাইল রেলপথ ডবল করা, ১১০০ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ, ৫০০০ মাইল পুরাতন রেলপথ তুলিয়া নূতন রেলপথ বসান, ২৫০০ মাইল পুরাতনের স্থলে নূতন রেললাইন বসান। ২২৫০ মাইলের স্লিপার পরিবর্তন, উন্নত বৈদ্যুতিক সংকেত প্রেরণ ব্যবস্থার প্রবর্তন, ১২০০ মাইল নূতন রেলপথ সম্প্রসারণ শ্রমিক-কর্মচারী ও যাত্রীদের জন্য বিবিধ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রবর্তন, এবং সাজসরঞ্জাম নির্মাণে আত্মনির্ভর হওয়া প্রভৃতি, তৃতীয় পরিকল্পনার রেলপথ উন্নয়ন কার্যক্রমের লক্ষ্য। ইহাতে ১৮৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রারও প্রয়োজন হইবে।

পরিশেষে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রেলপথের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ সত্ত্বেও

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে এখনও যথেষ্ট রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে বলা চলে না। ১৯৪৮-৪৯ সালের তথ্যে দেখা যায় দেশের প্রতি ১০০ বর্গমাইলে ভারতে মাত্র ২৭ মাইল রেলপথ ছিল। তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬৬ মাইল, ইংলণ্ডে ২০ মাইল ও বেলজিয়ামে ৪০ মাইল রেলপথ ছিল। ঐ সময়ে প্রতি ১ লক্ষ ব্যক্তিপিছু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২২৪ মাইল, ইংলণ্ডে ৪৬ মাইল, কানাডায় ৪৬৫ মাইল এবং ভারতে ৯'৬ মাইল রেলপথ ছিল।

২ সড়কপরিবহণ
ROAD TRANSPORT

পথ বা সড়ককে গতির চিহ্ন বলা হয়। সে হিসাবে ভারত যে গতিহীন দেশ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথম পরিকল্পনার শেষেও ভারতে মোট সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ৩,২০,০০০ মাইল। প্রতিবর্গমাইল অঞ্চলে জাপানে পথের দৈর্ঘ্য ৩০, ফ্রান্সে ২৬, ইংলণ্ডে ২০ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ আর ভারতে মাত্র ০২২ মাইল।[১] শুধু দৈর্ঘ্যে নহে, গুণের দিক দিয়াও ভারতের অধিকাংশ সড়কই এখন পর্যন্ত কাঁচা। পাকা সড়ক অল্প।

সড়কপরিবহণের গুরুত্ব (Importance of road transport) ভারতের মত দরিদ্র, অনুন্নত, অথচ বিরাট কৃষিপ্রধান দেশে সড়কপরিবহণ জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে রেলপথের যে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহা প্রধানত বড় শহর, শিল্পাঞ্চলগুলি ও বন্দরসমূহকেই সংযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের বাসস্থান ও উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র গ্রামাঞ্চলের সামান্যই উহাতে উপকৃত হইয়াছে। সারাদেশে বিস্তৃত, বিক্ষিপ্ত, পরস্পর বিচ্ছিন্ন, দুর্গম গ্রামগুলি উপযুক্ত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাহীন থাকায় কৃষি ও কুটির শিল্পের উৎপাদন ও বিক্রয়, গ্রাম্য জনসাধারণের সচলতা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, গ্রাম্য সঞ্চয়ের সংগ্রহ ও উপযুক্ত ব্যবহার, শিক্ষার প্রসার, গ্রামাঞ্চলে শহরের শিল্পজাত পণ্যের বাজার ইত্যাদি সকলই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিয়া গিয়াছে। সুতরাং কৃষির পুনর্গঠন, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠন, গ্রাম্যজনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি ও দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য ভারতে সড়কপরিবহণের যথেষ্ট প্রসার অপরিহার্য। ভারতের বর্তমান প্রত্যক্ষ ভোগনির্ভর কৃষির পরিবর্তে বাজারনির্ভর কৃষির প্রচলন করিতে হইলে গ্রামাঞ্চলে সড়কপরিবহণের সম্প্রসারণ আবশ্যক। সারাদেশে আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্য ও সর্বপ্রকার অর্থনীতিক কার্যকলাপের বিস্তার সড়কপরিবহণের প্রসার ব্যতীত অসম্ভব। ইহার প্রসার আঞ্চলিক শিল্পায়ন, গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক। রেলপথপরিবহণ অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। তুলনায় স্থানীয় প্রচেষ্টায় অল্পব্যয়ে সহজেই সড়ক পরিবহণের বিস্তার সম্ভব। সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ও তুলনায় অল্প। দেশের এমন অনেক দুর্গম অঞ্চল আছে যেখানে রেলপথ স্থাপন অসম্ভব। সেজন্য সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সড়কপরিবহণ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। দেশরক্ষার ক্ষেত্রেও ইহার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনীতিক উন্নয়নে সড়কপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

সরকারের সড়কনীতি (Road Policy of the Government): ১৯৪৩ সালের পূর্বে সড়কসম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন দায়িত্ব ছিল না। সড়কগুলি তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের বিষয় ছিল। সড়কপরিবহণের উন্নয়নের জন্য ১৯৪৩ সালে নাগপুরে

১. Agricultural Problems of India, C. B. Mamoria, p. 683

ভারত সরকারের উদ্যোগে প্রাদেশিক পূর্তবিভাগের কর্মকর্তাগণের এক সম্মেলন আহূত হয়। ঐ সম্মেলনে ১০ বৎসরের জন্য একটি সড়ক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। ইহা নাগপুর পরিকল্পনা (Nagpur Plan) নামে পরিচিত।

নাগপুর সম্মেলন ভারতের সড়কগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করে :

ক জাতীয় সড়ক (National Highways)

খ রাজ্যসড়ক (State Highways)।

গ. জেলার প্রধান ও অপ্রধান সড়ক (District Roads)।

ঘ গ্রাম্য সড়ক (Village Roads)।

এই পরিকল্পনায় জাতীয় এবং রাজ্যসড়কের সম্প্রসারণ ও জেলা এবং গ্রাম্যসড়কগুলির সম্প্রসারণ দ্বারা গ্রাম ও জেলার বিভিন্ন অংশকে জাতীয় ও রাজ্যসড়কের সহিত এবং রেলস্টেশনের সহিত যুক্ত করিবার কার্যক্রম গৃহীত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কোন গ্রামই যেন প্রধান সড়ক হইতে ৫ ২০ মাইলের অধিক দূরত্বে না থাকে। নাগপুর পরিকল্পনায় মোট ৩৭১ ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩,৩১০০০ মাইল সড়ক নির্মাণের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

পরবর্তীকালে, মূল্যস্তর বৃদ্ধির দরুন, নাগপুর পরিকল্পনার ব্যয় ৭৪৪ কোটি টাকা পড়িবে বলিয়া অনুমিত হয় এবং যন্ত্রকুশলীগণের মধ্যেও অভাব পরিলক্ষিত হইয়া পড়ে। এসব কারণে নাগপুর পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার সময় বাড়ান হয়। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সড়কনির্মাণ কার্যের জন্য ৪৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

পরিকল্পনা ও সড়ক নির্মাণ (Planning & Road Development) : প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাতে ভারতে ৯৭,০০০ মাইল পাকা ও ১,৫১,০০০ মাইল কাঁচা সড়ক ছিল। পরিকল্পনার শেষে ৬৮,০০০ মাইল নূতন রাজ্যসড়ক ও ৬০০০ মাইল জাতীয় সড়ক নির্মিত হয়। ইহাতে মোট ব্যয় পড়ে আনুমানিক ১৩৫ কোটি টাকা।[১]

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সড়ক উন্নয়নের জন্য মোট ২২৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়।[২] ইহা দ্বারা ১৯৬১ সালের মধ্যে নাগপুর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিবার লক্ষ্য গৃহীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতে সড়কসমূহের মোট দৈর্ঘ্য দাড়ায় ৩,৯ ,০০০ মাইল। সুতরাং নাগপুর পরিকল্পনার লক্ষ্য অপেক্ষা ৬৩,০০০ মাইল অধিক সড়ক নির্মিত হইয়াছে। সড়কের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাইলেও এখনও ইহাদের কয়েকটি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। অনেক স্থানেই নদীর উপর সেতু নির্মাণ বাকি। মোট সড়কের ৬০ শতাংশই কাঁচা। অধিকাংশ সড়কই অপ্রশস্ত। বর্তমানে ১৫,০০০ মাইল জাতীয় সড়কের মধ্যে মাত্র ২,৩০০ মাইল দুইদিকে গাড়ি চলাচলের মত প্রশস্ত।

সড়কপরিবহণের উন্নয়নের জন্য তৃতীয় পরিকল্পনার আরম্ভকালে ২০ বৎসরের জন্য একটি সড়কপরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে ১৯৮১ সালে সড়কের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করিয়া ৬,৫৭,০০০ মাইলে পরিণত করা হইবে। তাহাতে ভারতের কোন গ্রামই পাকা সড়কের ৪ মাইলের এবং সাধারণ সড়কের ১.৫ মাইলের অধিক দূরত্বে থাকিবে না। তৃতীয় পরিকল্পনার এই লক্ষ্যের আংশিক পূরণের জন্য ৩২৪ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সড়ক পরিবহণের অগ্রগতি (Development of Road Transport) : ১৯২০ সাল হইতে ভারতে পেট্রোলচালিত যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ি দ্বারা সড়কপরিবহণের সূত্রপাত হয়। উহার পর হইতে ক্রমান্বয়ে সড়কপরিবহণের প্রসার ঘটিতে থাকে। ১৯৩৮-৩৯

১. Review of the First Five Year Plan. p. 235.

২. Third Five Year Plan. p. 550.

সালে পণ্যবাহী মোটর গাড়ির সংখ্যা ছিল ১২,৩৯৭। ১৯৪৬-৪৭ সালে উহা ৪০,১০৭ হয়। ১৯৬০-৬১ সালে ইহার সংখ্যা ১,৬০,০০০-এ দাঁড়ায়। সুতরাং পণ্যবাহী মোটর গাড়ির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। তুলনায় যাত্রীবাহী গাড়ির সংখ্যা ১৯৩৮-৩৯ সালের পর যুদ্ধকালে প্রথমে হ্রাস পাইয়া পরে ১৯৪৬-৪৭ সালে যুদ্ধপূর্ব স্তরে পৌঁছায়। উহার পর হইতে ১৯৬০-৬১ সালে যাত্রীবাহী গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫০,০০০-এ পরিণত হয়।

সড়কপরিবহণের সরকারী নীতি (Road transport policy of the Governments) : সড়কপরিবহণ সম্পর্কে সরকারী নীতি দুইটি। একটি হইল সড়কপরিবহণের জাতীয়করণ নীতি। অপরটি হইল রেল ও সড়কপরিবহণের সমন্বয় (**Rail-Road** Coordination) নীতি।

১. সড়কপরিবহণ জাতীয়করণ নীতি (Nationalisation of Road Transport Policy) : ভারতে বেসরকারী উদ্যোগে মোটর পরিবহণের সূত্রপাত হয়। প্রথম পরিকল্পনার আরম্ভকালে সরকারী হিসাবে মোটর পরিবহণকারী ছোট ও বড় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মোট প্রায় ১ লক্ষের মত। ইহাদের প্রায় অর্ধেকই ছিল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পুঁজি অল্প। পরিচালনব্যয় অধিক। মেরামতি ব্যবস্থার জন্যও বেশি ব্যয় পড়ে। ফলে মোটর পরিবহণের মাশুলও বেশি হয়। তুলনায় বৃহদায়তন মোটর পরিবহণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দ্বারা কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যয়সংকোচ সম্ভব। তাহাতে মাশুল হ্রাস ও যাত্রিগণের স্বাচ্ছন্দ্য ও পণ্যপ্রেরণের নানা সুবিধা বৃদ্ধি পাইতে পারে। নিজস্ব মেরামতি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া আরও ব্যয় হ্রাস সম্ভব। এসকল কারণে, ১৯৪৬ সালে বেসরকারী, সরকারী ও রেলপথের অধীন মোটর পরিবহণের সমন্বয়সাধনের নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালের সড়কপরিবহণ করপোরেশন আইনে রাজ্যসরকারগুলিকে নিজ নিজ রাজ্যে সরকারী সড়কপরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন ও পরিচালনার জন্য বিধিবদ্ধ রাজ্য সড়কপরিবহণ করপোরেশন স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। উহার পর হইতে সকল রাজ্যে রাজ্য পরিবহণ করপোরেশন স্থাপন দ্বারা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ প্রসারিত করা হইতেছে। ইহাতে বেসরকারী পরিবহণ প্রতিষ্ঠানগুলি জীবিকাচ্যুত হওয়ার সমস্যা দেখা দিয়াছে। এজন্য রাষ্ট্রীয় পরিবহণেও অনেক রাজ্যসরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অংশ গ্রহণে আহ্বান জানাইয়াছেন। পরিকল্পনা কমিশনের মত হইল যে সম্ভব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রিত হইয়া বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত। গ্রামাঞ্চলে পরিবহণকর্মের উন্নতির জন্য সমবায় পরিবহণ সমিতি গঠনেও উৎসাহদান করা হইতেছে।

প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ক্ষেত্রে ১৭.১৩ কোটি টাকা বিনিয়োজিত ছিল। ইহাতে সরকারী, বেসরকারী, ও রেলপথ কর্তৃপক্ষ এই তিন পক্ষেরই অংশ ছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ক্ষেত্রে ১২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। ইহাতে তথায় গাড়ির সংখ্যা ৩০০০-এ বৃদ্ধি পাইয়া রাষ্ট্রীয় পরিবহণের অধীনে মোট গাড়ির সংখ্যা ১১,০০০-এর অধিক দাঁড়ায়। ইহাতে ভারতে মোটরপরিবাহিত মোট যাত্রার এক-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের অধীনে আসে। পণ্য পরিবহণকার্য সম্পূর্ণত বেসরকারী ক্ষেত্রের অধীন থাকিয়া যায়। সমগ্র প্রথম পরিকল্পনাকালে সরকারী ও বেসরকারী মোট যাত্রীবাহী গাড়ির সংখ্যা ২৩ শতাংশ ও পণ্যবাহী গাড়ির সংখ্যা ২৬ শতাংশ বাড়ে।[১] দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় পরিবহণের সম্প্রসারণের

১. Review of the First Five Year Plan, p. 2[illegible]

জন্য ২৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। ইহাতে রাষ্ট্রীয় পরিবহণে গাড়ির সংখ্যা ৫০০০ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু বিদেশী মুদ্রার সংকটের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবহণ সম্প্রসারণের লক্ষ্য সম্পূর্ণ হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় পরিবহণের প্রসারের জন্য ২৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। ইহাতে রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহণ ক্ষেত্রে গাড়ির সংখ্যা ৭৫০০ বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সড়কপরিবহণ সম্প্রসারণ কর্মসূচীর সাফল্য নির্ভর করিবে প্রধানত দেশের মোটর গাড়ি উৎপাদন শিল্পের উপর। এজন্য মোটরগাড়ি শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে। যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ির উৎপাদন ৮২ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে দেশে মোট যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ির সংখ্যা বর্তমান (১৯৬০-৬১) ২,০০,০০০-এর স্থলে ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩,৬৫,০০০ হইবে (যাত্রীবাহী গাড়ি ৫০,০০০ হইতে ৮০,০০০ ও পণ্যবাহী গাড়ি ১,৬০,০০০ হইতে ২,৮৫,০০০।)

২. **রেল-সড়কপরিবহণের সমন্বয় (Rail-Road Coordination):** অযথা প্রতিযোগিতা দ্বারা রেল ও সড়কপরিবহণ উভয়ের ব্যয় যাহাতে বৃদ্ধি ও আয় হ্রাস না পায় সেজন্য উহাদের কার্যাবলীর সমন্বয় প্রয়োজন। ইহাতে উভয় প্রকার পরিবহণে অপচয় দূর ও উভয়ের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব।

ভারতে ১৯৩০ সালের মধ্যে সড়কপরিবহণের সহিত রেলপরিবহণের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং রেলপরিবহণের আয় হ্রাস পাইতে থাকে। এই অবস্থায় রেল ও সড়কপরিবহণের সমন্বয়ের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু উভয় প্রকার পরিবহণের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ ছাড়া উহাদের পরিপূর্ণ সমন্বয় সম্ভব নহে, অথচ সে সময় তাহা সম্ভবও ছিল না। সেজন্য আইনের দ্বারা সড়কপরিবহণের নিয়ন্ত্রণ নীতি গৃহীত হয়। এজন্য ১৯৩৯ সালে মোটর গাড়ি আইন (Motor Vehicles Act) পাস হয়। ১৯৪৬ সালে সরকার, রেলকর্তৃপক্ষ ও বেসরকারী পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, এই তিনপক্ষের দ্বারা সম্মিলিতভাবে সড়ক পরিবহণকার্যের ভার গ্রহণের নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু ইহাও ব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে ১৯৪৮ সালে পার্লামেন্টে সড়কপরিবহণ করপোরেশন আইন পাস হয়। ১৯৫০ সালে ইহার পরিবর্তে পার্লামেন্টে অপর একটি আইন পাস করা হয়। ইহার দ্বারা রাজ্যসমূহে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের সম্প্রসারণ ও তজ্জন্য রাষ্ট্রীয় পরিবহণ করপোরেশন গঠনের পথ প্রস্তুত করা। তাহার পর হইতে অদ্য পর্যন্ত অধিকাংশ রাজ্যেই রাষ্ট্রীয় পরিবহণ করপোরেশন গঠিত হইয়াছে। বাকি রাজ্যগুলিতেও এজন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

বর্তমানে, পরিবহণের চাহিদা দ্রুতবৃদ্ধি, ও মোটর গাড়ি ও জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রেলপরিবহণের সমগ্র ও সড়কপরিবহণের একাংশ রাষ্ট্রীয়করণ হওয়ায় রেল-সড়কপরিবহণের সমন্বয়ের সমস্যার তীব্রতা কমিয়াছে। তথাপি সরকার এসম্পর্কে সচেতন আছেন। আগামী পাঁচ হইতে দশ বৎসরের জন্য পরিবহণের সমন্বয় সম্পর্কে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী নীতি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে পরিবহণ নীতি ও সমন্বয় কমিটি (নিয়োগী কমিটি) নামে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন।

৩. জলপথ পরিবহণ
WATER TRANSPORT

ভারতের জলপথ পরিবহণকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, ক. আভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ ও খ. সামুদ্রিক পরিবহণ। নিম্নে ইহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল।

ক. অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ (Inland Water Transport) : ভারতের অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথের দৈর্ঘ্য ৫০০০ মাইলের অধিক। পূর্বাঞ্চলে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ও উহাদের শাখা-প্রশাখা, মহানদীর খালসমূহ, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা-গোদাবরী ও উহাদের শাখা-প্রশাখা, কেরলের খাল ও সামুদ্রিক খাঁড়িগুলি, মাদ্রাজ ও অন্ধ্রদেশের বাকিংহাম খাল এবং পশ্চিম উপকূলের খালসমূহই ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথ হিসাবে উল্লেখনীয়। দেশের অভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় বাণিজ্যে ইহারা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণের উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। গত দুইটি পরিকল্পনায় এজন্য মোট ১ কোটি টাকারও কম ব্যয় হইয়াছে। ১৯৫২ সালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পরিবহণ ব্যবস্থার সমন্বয়ের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার যুক্তভাবে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র পরিবহণ সমন্বয় পর্ষৎ (Ganga-Brahmaputra Transport Coordination Board) গঠন করে। ইহা বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে গঙ্গার উর্ধ্বভাগে পরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টায় নিযুক্ত। অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল। ১৯৫৯ সালে কমিটি উহার রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। এই অভ্যন্তরীণ জলপথ পরিবহণ কমিটির (Inland Water Transport Committee) পরামর্শকে ভিত্তি করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়নের কর্মসূচী প্রণয়ন এবং এজন্য ৭·৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

খ. সমুদ্রপরিবহণ (Shipping) : ভারতের মত দেশের পক্ষে দেশীয় সমুদ্রপরিবহণ ব্যবস্থার যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে। ভারতের নিজস্ব সমুদ্র পরিবহণ ব্যবস্থা এখনও সামান্য। অথচ দেশীয় সমুদ্র পরিবহণের অভাবে বিদেশী জাহাজের দ্বারা পণ্য আমদানি-রপ্তানি করিতে হয় বলিয়া উহাতে মাশুল বেশি লাগে। ফলে বিদেশের বাজারে রপ্তানি পণ্যের দাম ও স্বদেশে আমদানি পণ্যের দাম বেশি পড়ে। ইহাতে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতাশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। বিদেশী জাহাজের মাশুল দিতে গিয়া বিদেশী মুদ্রা ব্যয় হয়। দেশীয় সমুদ্রপরিবহণের দ্বারা এই সকল অসুবিধা দূর হইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহাতে দেশে কর্মসংস্থানের নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি হইবে এবং দেশরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমুদ্রপরিবহণের উন্নয়নের জন্য যথাক্রমে ১৮·৭ কোটি ও ৫২·৭ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার ফলে ভারতের সমুদ্রপরিবহণ ক্ষমতা ১৯৫০-৫১ সালে মোট ৩·৯১ লক্ষ টন (Gross Registered Tonnage) হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ৪·৮০ লক্ষ টনে ও ১৯৬০-৬১ সালে ৯·০৫ লক্ষ টনে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে উহার মধ্যে ৬·১৩ লক্ষ টন হইল গভীর সমুদ্রপরিবহণ (Overseas) ক্ষমতা ও ২·৯২ লক্ষ টন উপকূলীয় পরিবহণ ক্ষমতা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় এজন্য ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। ইহাতে পরিবহণ ক্ষমতা ৩,৭৫,০০০ টন (GRT) বৃদ্ধি পাইবে। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের অংশে থাকিবে ১,৫৯,০০০ টন, বাকি অংশ বেসরকারী ক্ষেত্রের। ৫৭টি জাহাজ সংগ্রহ দ্বারা এই লক্ষ্য পূর্ণ হইবে। মোট বর্ধিত টনের মধ্যে আবার ১,৩২,৫০০ টন (GRT) উপকূলীয় পরিবহণে ও বাকি ২৪২০০০ টন (GRT) গভীর সমুদ্রপরিবহণে ঘটিবে। ইহার ফলে ১৯৬৫-৬৬ সালে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতের সমুদ্রপরিবহণ ক্ষমতা ১৪·২ লক্ষ টনে (GRT) পরিণত হইবে। ইহাই জাতীয় সমুদ্রপরিবহণ পরিষদের (National Shipping Board) লক্ষ্য।

... (Government ...) ... ভারতীয় জাহাজী প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিত। ফলে ... অস্তিত্ব কোন রকমে বজায় ছিল মাত্র। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের পর সরকার ... সমুদ্রপরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ১৯৪৭ সালেই এসম্পর্কে নীতি নির্ধারণের জন্য একটি সমুদ্রপরিবহণ নীতি-সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি (Shipping Policy Committee) নিয়োগ করেন। উহা ৫ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় জাহাজের পরিবহণ ক্ষমতা ২০ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধির পরামর্শ দেয়। ১৯৫০ সালে সরকার ভারতের উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজের জন্য সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ ও ইহার জন্য উপযুক্ত কর্মী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া দেশীয় জাহাজী কোম্পানীগুলিকে পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণদান ও সাহায্যের নীতি গ্রহণ করেন। সরকারকে সমুদ্রপরিবহণ সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য জাতীয় সমুদ্র পরিবহণ পরিষদ নামে একটি স্থায়ী সংস্থা নিযুক্ত হইয়াছে। দেশীয় জাহাজী ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ নীতির অনুসরণে সরকারী উদ্যোগে (sponsored) দুইটি সমুদ্রপরিবহণ করপোরেশন গঠিত হইয়াছে। ১৯৫০ সালে ভারত জাপান ও ভারত অস্ট্রেলিয়া পথে পণ্য পরিবহণ এবং ভারত সিঙ্গাপুর ও ভারত-দক্ষিণপূর্ব আফ্রিকা পথে, পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের জন্য ১০ কোটি টাকা পুঁজি লইয়া ইস্টার্ন শিপিং করপোরেশন স্থাপিত হয়। ইহা ভারত-আন্দামান পথেও জাহাজ চালনা করে। ১৯৫৬ সালে ১০ কোটি টাকা লইয়া ওয়েস্টার্ন শিপিং করপোরেশন নামে আর একটি ... কোম্পানী স্থাপিত হয়। ইহা ভারত পারস্য উপসাগর, ভারত লোহিত সমুদ্র, ভারত পোল্যাণ্ড ও ভারত-সোভিয়েত দেশ পথে জাহাজ চালনা করে।

ইহা ছাড়া বিশাখাপত্তনম শিপইয়ার্ডের উন্নয়ন করা হইয়াছে এবং কোচিনে দ্বিতীয় শিপইয়ার্ড স্থাপনের কর্মসূচী গৃহীত হইয়াছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ

CIVIL AIR TRANSPORT

১৯১১ সালে কয়েকটি স্থানে বিমান ভ্রমণ প্রদর্শনীর সহিত ভারতের আকাশে বিমানের আবির্ভাব সূচিত হইলেও ১৯২৭ সালে বেসামরিক বিমানদপ্তর স্থাপনের পূর্বে বেসামরিক বিমান পরিবহণের সূত্রপাত হয় নাই। বিমান পরিবহণের প্রকৃত অগ্রগতি আরম্ভ হয় ১৯৪৭ সাল হইতে। ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিমান পরিবহণের উন্নয়নের জন্য ৬·৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিমান পরিবহণের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য মোট ২৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে ব্যয়ের লক্ষ্য ছিল বিমানবন্দর স্থাপন, সংসরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়ের লক্ষ্য ছিল বিমান পরিবহণের ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাহিদা পূরণ। বর্তমানে ভারতের বেসামরিক বিমান পরিবহণ দপ্তর ৮৫টি বিমান বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। আরও চারিটি নূতন বিমান বন্দর নির্মিত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিমান পরিবহণের উন্নয়নের জন্য ২৫ ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

সরকারী নীতি

GOVERNMENT POLICY

প্রথমে ভারতের বিমান পরিবহণ কার্য অনেকগুলি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হইতে থাকে। কিন্তু ইহাদের কার্য সন্তোষজনক না হওয়ায়, ব্যয় বেশি পড়ায় ও তাহার প্রতিযোগিতার দরুন উহারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, ১৯৫০ সালে বিমান পরিবহণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। ইহা রাজাধ্যক্ষ কমিটি নামে পরিচিত। ইহা স্বেচ্ছামূলকভাবে বিমান

[illegible] ও ব্যয় হ্রাসের জন্য ভারত সরকার সমগ্র বেসরকারী বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করেন। ১৯৫৩ সালে পার্লামেন্টে বিমান পরিবহণ করপোরেশন আইন নামে একটি আইন পাস করিয়া অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিমান পরিবহণের কার্য পরিচালনার জন্য দুইটি বিমান পরিবহণ করপোরেশন স্থাপিত হয়। উহাদের একটি ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ করপোরেশন এবং অপরটি এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশন্যাল। প্রথমটি অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণের ভারপ্রাপ্ত, দ্বিতীয়টি বৈদেশিক বিমান পরিবহণের।

২

মুদ্রা ও মুদ্রাবিনিময়
Currency & Exchange

জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ক্ষেত্রেই অগ্রগতির পশ্চাতে এক একটি মৌল আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের অবদান রহিয়াছে। যন্ত্রবিদ্যায় যেমন 'চক্র' (wheel), বিজ্ঞানে যেমন অগ্নি, রাষ্ট্রনীতিতে যেমন 'ভোট', অর্থনীতিতে তেমনি 'মুদ্রা' বা টাকা—মানব সভ্যতার বিভিন্নক্ষেত্রে এক একটি যুগান্তকারী উদ্ভাবন। মানুষের সমাজজীবনে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে দিকটি রহিয়াছে তাহার সমস্ত কিছুর ভিত্তিই মুদ্রা।[১] মুদ্রার আবির্ভাব পৃথিবীতে 'বাণিজ্যিক সভ্যতার' সূচনা করিয়াছে।

বহু বৎসর পূর্বে মুদ্রার ব্যবহার আরম্ভ হইলেও, বর্তমানকালে উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির অর্থনীতিতে একটি উল্লেখনীয় ব্যবধান দেখা যায় যে, উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনুন্নত দেশগুলিতে মুদ্রার ব্যবহার স্বল্প। ইহার কারণ উন্নত দেশগুলিতে উৎপাদন ব্যবস্থা বাজারনির্ভর। সুতরাং ভোগকারীরা ও ব্যবহারকারীরা বাজার হইতে প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী খরিদ করিয়া প্রয়োজন দূর করে। অতএব ঐ সকল দেশে যাবতীয় ক্রয়-বিক্রয় কার্যেই টাকার ব্যবহার হয় বলিয়া দেশের সকল উৎপাদনক্ষেত্রেই বিশেষায়ণ বৃদ্ধি পায়। আধুনিক অর্থনীতির সকল অঙ্গ পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। কিন্তু অনুন্নত দেশে উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধানত ভোগনির্ভর। উৎপাদনের একাংশের এখনও সরাসরি পণ্যবিনিময় ঘটিয়া থাকে। বাজারে টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করিবার মত সামগ্রীর পরিমাণ অল্প। ফলে সমগ্র অর্থনীতিতে টাকার প্রচলন ও ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকে। ইহাতে উৎপাদনের বিকাশ, আর্থিক সঞ্চয়ের বৃদ্ধি ও সংগ্রহ, অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি, উৎপাদনের বিশেষায়ন প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে না। ইহা স্বল্পোন্নত অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভারতে ইংরেজ আমলে, গত শতাব্দী হইতে আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও, মুদ্রাগত বিনিময় ও লেনদেন প্রসারের এখনও যথেষ্ট সুযোগ রহিয়া গিয়াছে। এই অসম্পূর্ণতার জন্য আধুনিক মুদ্রাগত ব্যবস্থা দ্বারা জাতীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দেয়।

ভারতের মুদ্রাব্যবস্থা
THE INDIAN CURRENCY SYSTEM

ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার আলোচনাকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা, ক. অতীত মুদ্রাব্যবস্থাগুলির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ও খ বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থা।

ক. সংক্ষিপ্ত অতীত কাহিনী
A BRIEF HISTORY OF THE INDIAN CURRENCY SYSTEM

আধুনিক জগতে অর্থের (Money) তিনটি রূপ (forms) ধাতুমুদ্রা (Coins), পত্রমুদ্রা (Paper Currency) ও ঋণ (Credit)। ইহার মধ্যে ধাতুমুদ্রা ও পত্রমুদ্রাকে এক কথায় সরকারী মুদ্রা (Currency) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ভারতে ধাতুমুদ্রার প্রচলন বহুকাল হইতেই ঘটিয়াছে। কিন্তু

১, An Outline of Money. G. Crowther. p 4

পত্রমুদ্রার প্রচলন ইংরেজ শাসনের অবদান। ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার অতীত ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া ইংরেজশাসনে মুদ্রার আলোচনা করা গেল।

১. ১৮৩৫ সালের মুদ্রা আইন :—ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ ভূভাগে শাসনকার্যের সুশৃঙ্খলা আনয়ন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্বার্থে, কোম্পানীর রাজত্বে ১৮৩৫ সালে মুদ্রা আইন প্রবর্তিত হয়। ইহা দ্বারা তৎকালীন দেশের ইংরেজশাসিত বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় মুদ্রার স্থলে সর্বত্র এক প্রকার এক ওজনের রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্তিত হয়। এজন্য এই আইনটি রৌপ্যমুদ্রার একীকরণ আইন নামেও পরিচিত। কর্নওয়ালিশের সময় ইংরেজ রাজত্বে যে রৌপ্যমুদ্রা প্রবর্তিত হয়, তাহাই সমগ্র ইংরেজশাসিত ভারতে একমাত্র মুদ্রায় পরিণত হয়। এই রৌপ্যমুদ্রা মান ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

২ পত্রমুদ্রার প্রবর্তন : অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ভারতে কয়েকটি বেসরকারী ইউরোপীয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তাহাদের নিজ নিজ পত্রমুদ্রার প্রবর্তন করিলেও উহাদের প্রচার সামান্যই ছিল। ১৮০৬ সালে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা (যাহা ১৮০৯ সালে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল-এ রূপান্তরিত হয়) সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ব্যাঙ্ক নিজ নামে পত্রমুদ্রা প্রচলন করে। সরকার উহাকে স্বীকৃতি দেয়। পরে ১৮৪০ সালে বোম্বাই এবং ১৮৪৩ সালে মাদ্রাজে যথাক্রমে ব্যাঙ্ক অব বোম্বে ও ব্যাঙ্ক অব মাদ্রাজ অনুরূপভাবে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হয়। ইহারাও নিজ নিজ অঞ্চলে নিজ নিজ পত্রমুদ্রা প্রবর্তন করে। পত্রমুদ্রা প্রবর্তনের এই পরীক্ষা সফল হওয়ায় অবশেষে ১৮৬১ সালে ভারত সরকার ঐ ব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে পত্রমুদ্রা প্রচলনের একমাত্র অধিকার নিজহস্তে গ্রহণ করেন।

৩ স্বর্ণবিনিময় মান : ১৮৭৪ সাল হইতে আন্তর্জাতিক বাজারে রৌপ্যের দর কমিতে থাকে। ইহাতে ভারতের রৌপ্যমুদ্রার মূল্যও কমিতে থাকে। অনেক রৌপ্যমুদ্রাধীন দেশ রৌপ্যমুদ্রামান পরিত্যাগ করে। ভারতেও স্বর্ণমুদ্রামান প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা হয়। ১৮৯২ সালে এসম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হার্শেল কমিটি স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। ভারতের উপযোগী স্বর্ণমুদ্রামান নির্ধারণের জন্য ১৮৯৮ সালে ফাউলার কমিটি নামে আর একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি ভারতে স্বর্ণবিনিময় মান (Gold Exchange Standard) প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। এই প্রস্তাবে ভারতের অভ্যন্তরে রৌপ্যমুদ্রা বজায় রাখিবার সুপারিশ করা হয়। ভারতে উহার পরিবর্তে স্বর্ণমুদ্রা লভ্য হইবে না। কিন্তু দেশের বাহিরে ভারতীয় মুদ্রাকে ইংলণ্ডের স্বর্ণমুদ্রার সহিত বিনিময়যোগ্য করিবার এবং ভারতের রৌপ্যমুদ্রার সহিত ইংলণ্ডের পাউণ্ডের বিনিময় হার ১ শি. ৪ পে রাখিবার পরামর্শ দেওয়া হয়। ফলে বস্তুতপক্ষে দেশের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রার প্রবর্তন ছাড়াই এই মুদ্রামান স্বর্ণমানে পরিণত হয়। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত ইহা প্রচলিত ছিল।

৪. স্বর্ণপিণ্ডমান : ১৯১৭ সালে মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার জন্য স্বর্ণবিনিময় মান পরিত্যক্ত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে রৌপ্যমূল্যের বৃদ্ধি ও ভারতের অনুকূল লেনদেন বাণিজ্যের দরুন ভারতীয় মুদ্রার প্রকৃত বিনিময় হার বৃদ্ধি পায়। ফলে, সরকারী বিনিময় হার (১টা.=১ শি. ৪ পে) অকার্যকর হইয়া পড়ে। মুদ্রাবিনিময় ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা চলিতে থাকে। অবশেষে ১৯২৫ সালে ভারতের উপযুক্ত মুদ্রামান সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য হিল্টন ইয়ং কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশন ভারতে স্বর্ণপিণ্ডমান (Gold Bullion Standard) প্রবর্তনের সুপারিশ করে। ইহার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য ১টা.=১ শি. ৬ পে. ধার্য করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করে। ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নামে একটি কেন্দ্রীয়ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব ইহার সুপারিশগুলির অন্যতম। ১৯২৭ সালে ভারত সরকার স্বর্ণপিণ্ডমান প্রবর্তন করেন। ইহা ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বজায় ছিল। দেশের অভ্যন্তরে রৌপ্যমুদ্রা ও পত্রমুদ্রা প্রচলিত থাকে। শুধু বৈদেশিক লেনদেনের প্রয়োজনে ভারতের টাকাকে ইংলণ্ডের পাউণ্ডে ভাঙাইবার ব্যবস্থা হয়। পাউণ্ড সে সময় স্বর্ণমানে ছিল। সুতরাং ভারতীয় টাকাকে পাউণ্ডে ভাঙাইলে স্বর্ণমানের সুবিধা পাওয়া যাইত।

৫. স্টার্লিং বিনিময়মান : ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক মন্দার চাপে ইংলণ্ড হইতে স্বর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে। স্বর্ণের বহির্গমন বন্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। ভারতের মুদ্রামানের গাঁটছড়া স্টার্লিং (অর্থাৎ পাউণ্ড স্টার্লিং) এর সহিত বাঁধা ছিল। সেজন্য ভারতও স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে। পাউণ্ডের সহিত টাকার বিনিময় হার অবশ্য অপরিবর্তিত রাখা হয়। তখন ভারতের অভ্যন্তরে অবশ্য রৌপ্য ও পত্রমুদ্রাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু পাউণ্ডের সহিত বিনিময়হার নির্দিষ্ট থাকায় বৈদেশিক প্রয়োজনে টাকাকে পাউণ্ড-স্টার্লিংয়ে ভাঙান যাইত। এজন্য এসময়ের ভারতীয় মুদ্রামান স্টার্লিং

বিনিময় মানের নামে পরিচিত। পাউণ্ড তখন পত্রমুদ্রামানে (Paper Currency Standard) পরিণত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বজায় থাকে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইহা আইনগতভাবে দেশে মুদ্রাপ্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত হয়। টাকা ও পাউণ্ডের বিনিময় হার বজায় রাখা ও টাকার বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের ভার ইহার উপর অর্পিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতের মুদ্রাব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হয়।

খ. বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থা
PRESENT SYSTEM OF CURRENCY

১৯৪৬ সালের ১লা মার্চ ভারত আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের (International Monetary Fund) সদস্য হইবার ফলে ভারতের মুদ্রামানে একটি নূতন পরিবর্তন ঘটে। ইহার দ্বারা টাকার সহিত স্টার্লিংয়ের দীর্ঘকালের বন্ধন ছিন্ন হয় এবং ভারত স্বাধীন হইবার পূর্বেই ঐ তারিখ হইতে ভারতীয় মুদ্রা আইনের দৃষ্টিতে একটি স্বাধীন মুদ্রায় পরিণত হয়। ভারতের বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

১. ভারতের বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থা একটি পত্রমুদ্রাব্যবস্থা ঃ কারণ ১ টাকার পত্রমুদ্রা (one rupee paper note) ও ১ টাকার ধাতুমুদ্রাকে দেশের আইনসংগত মুদ্রা (Legal Tender Money) ও মান মুদ্রা (Standard Money) বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সভ্য হওয়ায়, ভারতীয় মুদ্রার সহিত আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের সম্পর্ক রহিয়াছে। কারণ, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সভ্য হইবার সময়, প্রথামত ভারতকে টাকার স্বর্ণমূল্য ঘোষণা করিতে হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় মুদ্রার নির্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য নির্ধারিত হওয়ায় ভারতের মুদ্রামান অভ্যন্তরীণক্ষেত্রে পত্রমুদ্রামান হইলেও আন্তর্জাতিকভাবে ইহা স্বর্ণসমতামান বলিয়া গণ্য করা যায়।

২. অন্যান্য দেশের মুদ্রায় বিনিময় যোগ্যতা ঃ আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিলের উদ্দেশ্য উহার সদস্যদেশগুলির পরস্পরের মুদ্রার অবাধ বিনিময় প্রবর্তন করা। তবে, যতদিন পর্যন্ত উহার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, ততদিন সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে উহার সদস্যদেশগুলি নিজেদের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়ে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। তদনুযায়ী ভারতের মুদ্রাও অন্যান্য সদস্যদেশের মুদ্রা পরিবর্তনযোগ্যতা লাভ করিয়াছে। এইজন্যই স্টার্লিংয়ের পূর্বের কঠিন বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতীয় মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময়ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

৩. পত্রমুদ্রা ঃ দেশের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে পত্রমুদ্রার পরিমাণই অধিক। বর্তমানে ১৲, ২৲, ৫৲, ১০৲, ১০০৲, ও ১০০০৲, ৫০০০৲, ও ১০,০০০৲ টাকা মূল্যের পত্রমুদ্রা প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৲ টাকার পত্রমুদ্রা ভারত সরকারের অর্থদপ্তর কর্তৃক প্রচলিত হয়। অন্যান্য পত্রমুদ্রা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রচলন করে। ১৯৬৪ সালের মার্চের শেষে ভারতে ২৪১১ কোটি টাকার পত্রমুদ্রা প্রচলিত (Total notes in circulation) ছিল। ধাতুমুদ্রার মধ্যে ১ টাকার ধাতুমুদ্রা ও স্বল্পতর মূল্যের মুদ্রা রহিয়াছে। সর্বপ্রকার মুদ্রার মোট প্রচলিত পরিমাণ ১৯৬৪ সালের মার্চে ছিল ২৬৭০ কোটি টাকা।

৪. পত্রমুদ্রার জন্য জমার পদ্ধতি ঃ ভারতে বর্তমানে পত্রমুদ্রার জমার পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন দ্বারা ভারতে আনুপাতিক জমা তহবিল (Proportional Reserve System) পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছিল। উহাতে নিয়ম ছিল যে, মোট প্রচলিত পত্রমুদ্রার ৬০ শতাংশ ভারত সরকারের ঋণপত্র, হুণ্ডি ও রৌপ্যমুদ্রায়

জমা রাখিতে হইবে। বাকি ৪০ শতাংশ জমা রাখিতে হইবে স্বর্ণ ও স্টার্লিং পাওনা বা ঋণপত্রে। উহার মধ্যে স্বর্ণের মূল্য ৪০ কোটি টাকার কম হইবে না। পরে ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হইবার ফলে পত্রমুদ্রার জামিন হিসাবে অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার ঋণপত্র বা পাওনা গ্রহণযোগ্য হয়। তদনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধিত হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিদেশী মুদ্রার সংকটের দরুন ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া পত্রমুদ্রার আনুপাতিক জমা পদ্ধতির পরিবর্তে ন্যূনতম জমা পদ্ধতি (Minimum Reserve System) প্রবর্তিত হয়। ইহাতে স্বর্ণে ১১৫ কোটি টাকা ও বিদেশী মুদ্রায় ৪০০ কোটি, মোট ৫১৫ কোটি টাকার ন্যূনতম জমা রাখিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। পরে ১৯৫৭ সালে পুনরায় বিদেশী মুদ্রার সংকট গভীর হইলে বিদেশী মুদ্রার জমার পরিমাণ কমাইয়া ৮৫ কোটি টাকা করা হয়। অর্থাৎ স্বর্ণ ও বিদেশী মুদ্রায় মোট ২০০ কোটি (১১৫ কোটি টাকা+৮৫ কোটি টাকা) টাকা জামিন রাখিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। এজন্যই ১৯৫৭ সালে পুনরায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধিত হয়। এই নূতন পদ্ধতিতে ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ জমা রাখিতে গিয়া নূতন করিয়া স্বর্ণ কিনিতে হয় নাই। পূর্বে জমা তহবিলে যে স্বর্ণ ছিল তাহাই বর্তমান আন্তর্জাতিক বাজার দরে ১১৫ কোটি টাকা মূল্যের সমান বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। এই সংশোধনের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল সরকারের ঘাটতিব্যয়ের নীতি অনুযায়ী সুবিধামত মুদ্রাপ্রচলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করা। কারণ, প্রচলিত পত্রমুদ্রার পরিমাণ যাহাই হোক না কেন এই পদ্ধতিতে জমার পরিমাণ বৃদ্ধির কোন প্রয়োজন নাই। ইহাতে ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থার সম্প্রসারণশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য ইহা দ্বারা ইচ্ছামত পত্রমুদ্রা প্রচলনের সুবিধা বৃদ্ধি পাইল বলিয়া মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে, অনেকে এই সমালোচনা করিয়াছেন।

৫. **দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা :** বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সাম্প্রতিক কালে দশমিক মুদ্রার প্রচলন। পূর্বে ১৯০৬ সালের মুদ্রাঙ্কন আইন অনুসারে ভারতে ১ টাকার মুদ্রা ও নোট, ৮ আনা, ৪ আনা, ২ আনা, ১ আনা, ২ পয়সা, ১ পয়সা, ১ পাই প্রভৃতি মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ইহাদের সকলগুলিই ছিল প্রতীক মুদ্রা (token money)। অর্থাৎ উহাদের লিখিত মূল্য অপেক্ষা ধাতব মূল্য অল্প ছিল। ১৯৫৭ সালে দশমিক মুদ্রাব্যবস্থা প্রবর্তনের দ্বারা ঐ সকল প্রতীক মুদ্রার পরিবর্তে টাকাকে ১০০ ভাগে ভাগ করিয়া উহার এক একটি অংশকে ১ পয়সা নাম দেওয়া হইয়াছে। এবং পুরাতন স্বল্প মূল্যের প্রতীক মুদ্রার স্থলে ১ প, ২. প., ৫. প. ১০ প. ২৫ প ও ৫০ পয়সার নূতন প্রতীক মুদ্রা প্রবর্তিত হইয়াছে। মুদ্রাব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত করা ও হিসাবকার্যে সুবিধা, এই দুই উদ্দেশ্যে এই সংস্কার করা হইয়াছে। ১৯৬৪ সালের মার্চের শেষে ভারতে ৯০ কোটি টাকার স্বল্পমূল্যের দশমিক মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

স্টার্লিং পাওনা

STERLING BALANCES

গত দুই দশকে ভারতের অর্থনীতিক আলোচনা প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের নিকট ভারতের প্রাপ্য অর্থ, অর্থাৎ স্টার্লিং পাওনার কথা বহুবার আলোচিত হইয়াছে। বিবিধ দিক দিয়াই ইহা তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেও ভারতে প্রচলিত পত্রমুদ্রার জন্য জমা হিসাবে কিছু পরিমাণ স্টার্লিং পাওনা ইংলণ্ডে রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পত্রমুদ্রার জামিন হিসাবে উহার আর কোন গুরুত্ব ছিল না। ১৯৩৮-৩৯ সালে ইংলণ্ডে রক্ষিত এইরূপ স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ

ছিল ৬৬'৯৫ কোটি টাকা। অথচ ৬ বৎসর পরে ১৯৪৫-৪৬ সালে ইংলণ্ডের নিকট প্রাপ্য স্টার্লিংয়ের পরিমাণ ছিল ১,৭৩৩ কোটি টাকা।

কারণ (Causes)ঃ ইংলণ্ডের নিকট প্রাপ্য স্টার্লিংয়ের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রধান কারণ চারিটিঃ ১. মিত্রশক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারতে যুদ্ধের জন্য যে বিরাট পরিমাণ সামরিক ও বেসামরিক দ্রব্য ক্রয় করে তাহার মূল্য স্টার্লিংয়ে পরিশোধ করে। উহা ইংলণ্ডে জমা হয়। ২. ইংলণ্ড সরকার ভারত সরকারের যুদ্ধব্যয়ের একাংশ বহন করিতে রাজী হয়। ৩. ভারতীয়গণের হস্তে ডলার ও অন্যান্য বিদেশী মুদ্রা (স্টার্লিং বাদে) যাহা সঞ্চিত ছিল তাহার সকলই (বৃটিশ) সাম্রাজ্য ডলার তহবিলে (Empire Dollar Pool) অপসারিত হয়। ৪. ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে তৎকালে অনুকূল উদ্বৃত্ত ঘটিয়াছিল। উহার দরুনও ইংলণ্ডে ভারতের পাওনা অর্থ সঞ্চিত হয়।

ফলাফল (Effects)ঃ একদিকে ইংলণ্ডে যতই স্টার্লিং পাওনা জমা হইতে থাকে ততই ভারতে উহার ভিত্তিতে পত্রমুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ এইরূপে অতিরিক্ত টাকা সৃষ্টি করিয়া মিত্রশক্তি ভারতে তাহাদের সমস্ত যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করে। ইহার ফলে ভারতে ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় ও উহার দরুন দেশবাসী অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করে।

আদায় (Realisation)ঃ যুদ্ধের পর ভারতের নিকট ইংলণ্ডের এই দেনা পরিশোধের প্রশ্ন ওঠে এবং ইংলণ্ডের দিক হইতে ইহাতে সবিশেষ অনিচ্ছা দেখা যায়। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ও ১৯৪৮ সালে দুইটি চুক্তির দ্বারা স্টার্লিং দেনা পরিশোধের পদ্ধতি স্থির হয়। প্রথম চুক্তিতে স্থির হয় যে কিস্তিতে এই দেনা শোধ করা হইবে। এবং এজন্য ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নিকট ১নং ও ২নং হিসাব নামে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুইটি হিসাব খোলা হয়। প্রথমটি চলতি হিসাব (Current Account)। উহাতে স্টার্লিং পাওনার মধ্যে ৬'৫০ কোটি পাউণ্ড জমা করা হয়। এবং স্থির হয় যে তখন হইতে চলতি বাণিজ্যের লেনদেনের উদ্বৃত্ত উহাতে জমা হইবে এবং ঐ হিসাব হইতে প্রয়োজনমত ভারত টাকা তুলিবে। আর দ্বিতীয় হিসাবে বাদ বাকি স্টার্লিং পাওনা জমা করা হয়। স্টার্লিং পাওনার এই অংশ অবিলম্বে তোলা যাইবে না বলিয়া স্থির হয় (Fixed Account)। দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা ১৯৫১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৪ বৎসরে ১৬'০০ কোটি পাউণ্ড তুলিবার ব্যবস্থা হয়। ১৯৫১ সালের জুন মাসে পুনরায় একটি চুক্তি দ্বারা ১৯৫৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২নং হিসাব হইতে ১নং হিসাবে ৩৫'০০ কোটি পাউণ্ড স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা হয়। ইহাও স্থির হয় যে ১৯৫৭ সালের জুন মাসের পর ২নং হিসাবে বকেয়া অর্থ ১নং হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে।

স্টার্লিং পাওনা হইতে পাকিস্তানের প্রাপ্য, বৃটিশ কর্মচারীদের পেনসন, বৃটিশ সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত সাজসরঞ্জামের মূল্য প্রভৃতি বাদে, ভারতসরকারের প্রাপ্য অংশ দাঁড়ায় প্রায় ১,০১০ কোটি টাকা। উহা হইতে টাকা তোলার ফলে স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ কমিয়া প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে দাঁড়ায় ৮৮৪ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনার ব্যয়ের দরুন, পরিকল্পনার শেষে ১৯৫৫-৫৬ সালে উহার পরিমাণ দাড়ায় ৭১৪ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্য আমদানি বৃদ্ধি ও প্রচুর পুঁজিদ্রব্য আমদানি ও লেনদেনের ঘাটতির ফলে মুদ্রা সংকটের দরুন, স্টার্লিং পাওনা তোলা হইতে থাকে। ফলে ১৯৬১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১৩৫ কোটি টাকায় পরিণত হয়। বর্তমানে ইহা পত্রমুদ্রার অপরিহার্য জামিন হিসাবে গণ্য করা হইতেছে। এইরূপে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে গত দুই দশকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার অন্তর্ধান ঘটে।

টাকার বহির্বিনিময় মূল্য হ্রাস
DEVALUATION OF THE RUPEE

ভারতে বর্তমানে পত্রমুদ্রামান রহিয়াছে। এই ব্যবস্থায় দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হার সরকারকে বাঁধিয়া দিতে হয় এবং উহা বজায় রাখিবার জন্য দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় সরকার ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত দেশীয় মুদ্রার বহির্বিনিময়হার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যে ও লেনদেনে ঘাটতি চলিতে থাকিলে, উহার প্রতিকারের জন্য অনেক সময় মুদ্রার বহির্বিনিময় হার হ্রাস করা হয়। ইহাতে বিদেশী মুদ্রায় দেশীয় মুদ্রা সস্তা হয় এবং দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার দর বাড়ে। সুতবাং একই পরিমাণ দেশীয় দ্রব্য বিদেশীরা কিনিলে, উহার দাম বাবদ পূর্বাপেক্ষা অল্প পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা লাগে। অর্থাৎ বিদেশীদের নিকট দেশীয় পণ্য সস্তা হয়। সুতরাং রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে দেশীয় মুদ্রায় বিদেশী মুদ্রার দর বাড়ে বলিয়া, একই পরিমাণ বিদেশী দেনা শোধ করিতে পূর্বাপেক্ষা অধিক দেশীয় মুদ্রা লাগে। অর্থাৎ পূর্বের মত একই পরিমাণ বিদেশী দ্রব্য আমদানি করিলে উহার দাম দিতে পূর্বাপেক্ষা বেশি দেশীয় মুদ্রা প্রয়োজন হয়। অতএব আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়ে। সুতরাং আমদানি হ্রাস পায়। এইরূপে রপ্তানি বৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ও লেনদেনের ঘাটতি দূর করিবার জন্য দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস একটি জনপ্রিয় অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার অসুবিধা এই যে, এই পদ্ধতি সাময়িক ফলদান করে মাত্র।

অন্যান্য দেশে, মুদ্রার বিনিময় হার একাধিকবাব হ্রাসের ঘটনা দেখা গেলেও ভারতে ১৯৪৯ সালে যে টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়, তাহা ভারতেব মুদ্রাব্যবস্থাব ইতিহাসে প্রথম। ১৯৪৯ সালের ২০ শে সেপ্টেম্বর টাকার ডলার (মার্কিন) মূল্য ৩০.২২৫ সেণ্ট হইতে ২১ সেণ্ট-এ এবং স্বর্ণমূল্য ০.২৬৮৬০১ গ্রাম হইতে ০.১৮৬৬২১ গ্রামে হ্রাস করা হয়। একই সময়ে স্টার্লিংয়ের মূল্য একই অনুপাতে হ্রাস করাতে টাকা ও স্টার্লিংয়ের পূর্বেব বিনিময় হার (অর্থাৎ ১টা = ১ শি. ৬ পে) অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ টাকার ডালার ও স্বর্ণমূল্য ৩০.৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়।

কারণ (Causes) : সরকারী বক্তব্য অনুযায়ী নিম্নোক্ত কারণে টাকার বহির্বিনিময় মূল্যহ্রাস প্রয়োজন হইয়াছিল।

১. ১৯৪৬ সাল হইতে বৈদেশিক বাণিজ্যের, বিশেষত ডলাব এলাকার সহিত বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকে। (এই সকল দেশগুলির সহিত লেনদেনের ঘাটতি ১৯৪৬ সালে ৪.৮৪ কোটি, ১৯৪৭ সালে ৮৫.৮০ কোটি ও ১৯৪৮ সালে ৪৯.৬৬ কোটি টাকা হয়।) ১৯৪৮ সালে মোট লেনদেনের ঘাটতি হয় ১২২ কোটি টাকা। ১৯৪৯ সালে উহা ১৪৬.৬ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ইহার প্রতিকারের চেষ্টা মুদ্রামূল্য হ্রাসের একটি কারণ।

২. ঐ সময়ে ইংলণ্ডের বৈদেশিক লেনদেনেও, বিশেষত ডলার এলাকার সহিত বাণিজ্যে, ঘাটতি দেখা দেয়। ইহাতে স্টার্লিং এলাকার কেন্দ্রীয় বিদেশী মুদ্রার তহবিলের উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে এবং উহা ক্রমাগত কমিতে থাকে। (১৯৪৯ সালের ১লা মার্চ হইতে ইহার পরিমাণ ৫৫.২০ কোটি পাউণ্ড হইতে কমিয়া ১৯৪৯ সালের ৩০শে জুন ৪০.৬০ কোটি পাউণ্ডে দাঁড়ায়।) উপায়বিহীন হইয়া ১৯৪৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড পাউণ্ডের ডলার মূল্য ৩০.৫ শতাংশ হ্রাস করে। ইংলণ্ড পাউণ্ডের বিনিময় মূল্য হ্রাস করায়, স্টার্লিং এলাকার সহিত বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, ভারত সরকারও টাকার ডলার মূল্য ৩০.৫ শতাংশ হ্রাস করেন।

৩. ভারতের বাণিজ্য প্রধানত ইংলণ্ড ও স্টার্লিং অঞ্চলের সহিত পরিচালিত হওয়ায়, স্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাসের সমতালে টাকার বহির্বিনিময় মূল্য হ্রাস না করিলে ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের দাম স্টার্লিং এলাকায় অধিক হইত। তাহাতে ভারতের হ্রাসমান রপ্তানি আরও গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। বরং টাকার বহির্বিনিময় মূল্য হ্রাসের ফলে, স্টার্লিং এলাকার সহিত বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৪. ইহাতে ডলার এলাকায় রপ্তানি বৃদ্ধি সম্ভব হইবে।

ফলাফল (Effects) ঃ ১৯৪৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর টাকার মূল্য হ্রাসের দরুন অনুকূল ও প্রতিকূল দুই প্রকার ফলাফল দেখা যায়।

ক. অনুকূল প্রতিক্রিয়া ঃ ১. ডলার অঞ্চলে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯ সালের প্রথম তিন মাসের তুলনায় ১৯৫০ সালের প্রথম তিন মাসে উহা ৬৯ শতাংশ বর্ধিত হয়। ২. ভারতের মোট রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পরবর্তী ছয় মাসে, উহার পূর্ববর্তী ছয় মাসের তুলনায় মোট রপ্তানি ৪৯ শতাংশ বর্ধিত হয়। ইহার ফলে, ১৯৪৯ সালের শেষ তিন মাসে ও ১৯৫০ সালের প্রথম তিন মাসে ভারতের লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়। এবং মোটের উপর ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫০-৫১ সালে লেনদেনের ঘাটতি কমিয়া যথাক্রমে ১৪২ কোটি ও ২২ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ৩. ভারতের সুতীবস্ত্র রপ্তানি উল্লেখনীয় রূপে বৃদ্ধি পায়। মুদ্রামূল্য হ্রাসের পূর্ববর্তী নয় মাসে মোট রপ্তানি মাত্র ২·৫ কোটি টাকার স্থলে পরবর্তী ছয় মাসে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়া ৭·৭ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

কিন্তু এই অনুকূল প্রতিক্রিয়াগুলি স্বল্পকালস্থায়ী বলিয়া প্রমাণিত হয়। কারণ ১৯৫০ সালের দ্বিতীয় তিন মাসেই পুনরায় বহির্বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দেখা দেয়।

খ. প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া ঃ ১. ডলার অঞ্চল হইতে খাদ্য ও যন্ত্রপাতি আমদানির মূল্য বাবদ ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ২. পাকিস্তান তখন মুদ্রামূল্য হ্রাস করে নাই। উহার নিকট হইতে কাঁচা পাট ও তুলা প্রভৃতি আবশ্যকীয় কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ডলার এলাকার মতই দাম বেশি পড়িতে থাকে। ৩. মুদ্রামূল্য হ্রাসের ফলে ভারতের মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৯ সালের আগস্ট হইতে ১৯৬০ সালের জুন মাসে মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা ৩৮৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৯৫·৬-এ পরিণত হয়।

মন্তব্য ঃ সর্বশেষে স্মরণযোগ্য যে, মুদ্রামূল্য হ্রাসের সহিত বাণিজ্য ও লেনদেনের যে অনুকূল উদ্বৃত্ত ঘটে তাহা সম্পূর্ণরূপে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নহে। উহা আমদানি হ্রাসের চেষ্টারও আংশিক ফল। কারণ মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতসরকার আমদানি হ্রাসের জন্য কতকগুলি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং মাত্র বাণিজ্য ও লেনদেনের সাময়িক উদ্বৃত্ত সৃষ্টি এবং সেক্ষেত্রেও আমদানি নিয়ন্ত্রণের কঠোরতার কথা মনে রাখিলে, টাকার মূল্য হ্রাসের দ্বারা সত্যই ভারতের কতখানি মঙ্গল হইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ভারত সরকার যখন মুদ্রামূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, সে সময় অনেকে উহার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে ইহাতে ভারতের সবিশেষ উপকার হইবে না কিন্তু অপকার যথেষ্ট হইতে পারে। কারণ, ভারতের আমদানি দ্রব্যগুলি প্রধানত ডলার এবং যে সকল অঞ্চল মুদ্রামূল্য হ্রাস করে নাই তথাকার। এবং উহারা এরূপ যে আমদানি না করিলে চলে না। মুদ্রামূল্য হ্রাসের দ্বারা ইহাদের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে; আমদানির পরিমাণও কমান যাইবে না। অপরদিকে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়া উহাদের বিদেশে সস্তা

হ্রাস পাইলেও, চাহিদা বিশেষ বাড়িবে না। ইহা ছাড়া মুদ্রার বিনিময় মূল্য হ্রাস করিলে, দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বাড়িতে পারে। ভারতে মুদ্রামূল্য হ্রাসের পরবর্তীকালের ইতিহাস হইতে সমালোচকদের সাবধান বাণীই অনেকাংশে সত্য হইয়াছে।

সাম্প্রতিক বিদেশীমুদ্রা সংকট
THE RECENT FOREIGN EXCHANGE CRISIS

অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টায় ভারতের মত অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়ন কার্যক্রম রূপায়ণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজি দ্রব্য ও অত্যাবশ্যক নানারূপ কাঁচামাল আমদানির প্রয়োজন হইয়া থাকে। যতদিন পর্যন্ত ইহারা আত্মনির্ভরশীল উন্নয়নের পর্যায়ে না পৌঁছায়, অর্থাৎ বিবিধ পুঁজিদ্রব্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত ইহাদের আমদানির পরিমাণও বাড়িতে থাকে। ইহার সহিত ভারতের মত খাদ্যাভাবের দেশ হইলে, সেজন্যও আমদানি বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। অর্থাৎ এক কথায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দরুন, এসকল দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি কিছুদিনের জন্য আমদানি-নির্ভর হইয়া পড়ে। আমদানির জন্য বিদেশী মুদ্রা চাই। বিদেশী মুদ্রা দুইভাবে সংগৃহীত হইতে পারে। প্রথমত, রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া। দ্বিতীয়ত, বিদেশী পুঁজি, সাহায্য ও ঋণ সংগ্রহ করিয়া। রপ্তানি বৃদ্ধির অসুবিধা এই যে, এই সকল দেশ সাধারণত অল্প কয়েকটি কৃষিজ ও খনিজ প্রাথমিক উৎপন্ন রপ্তানি করে। অনুন্নতির জন্য ইহাদের উৎপাদন ও রপ্তানির বৈচিত্র্য-করণ ঘটে নাই। এমতাবস্থায় ইহাদের রপ্তানির বৃদ্ধির সুযোগ সীমাবদ্ধ। অপর দিকে দ্রুত উন্নয়নের জন্য যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন তাহা শুধু ঋণ ও সাহায্য দ্বারা সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা কঠিন। অতএব, সাধারণভাবে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ গ্রহণ করিলে, স্বল্পোন্নত দেশগুলির বিদেশীমুদ্রা সংকট কমবেশি পরিমাণে দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। তবে, দেশবিশেষে কোন কোন বিশেষ বিশেষ অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা বা ঘটনা বিদেশী মুদ্রার সংকটের তীব্রতা লাঘব বা বৃদ্ধি করিতে পারে। ভারতের সাম্প্রতিক বিদেশী মুদ্রার সংকটের আলোচনা করিবার পূর্বে এই কথাগুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

সংকটের বিবরণ
ACCOUNT OF THE CRISIS

প্রথম পরিকল্পনাকালে: প্রধানত কৃষি, সেচ পরিবহণ ও শক্তিউৎপাদন বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল, শিল্পোন্নয়নকে নহে। কারণ, প্রথমোক্ত বিষয়গুলির উন্নতি ছাড়া শিল্পায়নের ভিত্তি প্রস্তুত হয় না। তাহাতে ৪০০ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা লাগিবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে লেনদেনের ঘাটতি দাঁড়ায় ৩১৮ কোটি টাকা। উহার মধ্যে ১৯৬ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্য হইতে পাওয়া যায় এবং বাকি অংশ পরিশোধের জন্য ১২২ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রার তহবিল হইতে তোলা হয়। সুতরাং প্রথম পরিকল্পনায় বিদেশী মুদ্রার সংকট কিছু দেখা দেয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনা যখন আরম্ভ হয় তখন ভারতের হাতে বিদেশী মুদ্রার তহবিলে ছিল ৭৫৯ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে: বিদেশী মুদ্রার মোট ঘাটতি ১১০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কার্যত ঘাটতি দাঁড়ায় ১৯২০ কোটি টাকায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবার সময় অনুমিত হইয়াছিল যে, বিদেশী মুদ্রার তহবিল হইতে ২০০ কোটি টাকা তুলিলেই চলিবে। কিন্তু ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং যে, পরিমাণ বিদেশী সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল তদপেক্ষা ৫০ শতাংশ অধিক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও,

পরিকল্পনাকালের শেষ পর্যন্ত বিদেশী মুদ্রা তহবিল হইতে ৬০০ কোটি টাকা তুলিতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে বিদেশীমুদ্রার সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত চিত্র প্রকাশ পায়। ঐ পাঁচ বৎসরে মোট আমদানি হয় ৫৩৭০ কোটি টাকা, মোট রপ্তানি হয় ৩০৬৫ কোটি টাকার দ্রব্য। অর্থাৎ ঘাটতির পরিমাণ ২৩০৫ কোটি টাকা। ইহা হইতে অদৃশ্য আমদানি ও রপ্তানি খাতে অনুকূল লেনদেন উদ্বৃত্ত ৩৮৫ কোটি টাকা বাদ দিলে মোট লেনদেন উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯২০ কোটি টাকা (এই হিসাবে সরকারী দান ধরা হয় নাই)।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সংকটের কারণ

CAUSES OF THE CRISIS IN THE SECOND PLAN

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিদেশীমুদ্রার তীব্র সংকটের কারণগুলি নিম্নরূপ। ১. পরিকল্পনার রূপায়ণের অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ কম করিয়া ধরা হইয়াছিল। ২ পরিকল্পনায় বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি সরকার অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু মুদ্রার ঘাটতি কত দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে এবং তজ্জনিত সংকট কত গভীর হইবে ও তাহার জন্য কত সতর্কভাবে বিদেশী মুদ্রার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে তাহা সরকার পূর্বে বুঝিতে পারেন নাই। ৩. উন্নয়নশীল দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানির প্রয়োজন সরকার পূর্বাহ্ণে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ফলে, তাহাদের অনুমিত আমদানি অপেক্ষা প্রকৃতপক্ষে আমদানি অধিক হইয়াছে। ৪ দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথমদিকে বেসরকারী ক্ষেত্রের আমদানিও অধিক হইয়াছিল। পরিমাণে অত্যন্ত বেশি না হইলেও আমদানির সময়ের দিক হইতে ইহা সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি করিয়াছে। ৫ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পর পর দুই বৎসর কৃষির ফলন কম হওয়ায় অত্যন্ত অধিক পরিমাণে খাদ্য আমদানি করিতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অনুমিত হইয়াছিল পাঁচ বৎসরে ৬০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করিলেই চলিবে। কিন্তু উহার স্থলে ২ কোটি টন খাদ্য আমদানি করিতে হয়। ৬. বস্ত্র শিল্পের জন্য কাঁচা তুলাও অধিক পরিমাণে আমদানি করিতে হয়। ৭ ইহা ছাড়া সাময়িকভাবে তখন দেশরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পায় ও উহার জন্য বিদেশী সাজসরঞ্জাম কিনিতে হয়। ৮. সাময়িকভাবে সুয়েজসংকটের জন্য জাহাজী মাশুলও বেশি পড়ে। ৯. আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যস্তর বৃদ্ধির দরুন আমদানি দ্রব্যের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ১০. পরিশেষে, রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে ব্যর্থতাও সংকট সৃষ্টির জন্য আংশিকরূপে দায়ী।

সরকারী ব্যবস্থা

GOVERNMENTAL MEASURES

সংকট রোধের জন্য সরকার যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহা হইল,—১. কঠোরভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণ। ২. বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের অনুমতি দানে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন। ৩. উপযুক্ত বিদেশী মুদ্রা সংগৃহীত না হইলে নূতন কোন আমদানিতে অনুমতি না দেওয়া। ৪. রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ। ৫ অতিরিক্ত বিদেশী মুদ্রা ঋণ ও সাহায্যরূপে সংগ্রহের চেষ্টা। এসম্পর্কে একটি বিষয় উল্লেখনীয় যে, বিদেশী মুদ্রার তহবিলের দ্রুত হ্রাসের ফলে, ভারতের পত্রমুদ্রার জামিন হিসাবে আইনগতভাবে যে বিদেশী পাওনা বা লগ্নীপত্র জমা রাখিতে হইত তাহা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য প্রথমে ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া মোট ৪০০ কোটি টাকার ন্যূনতম বিদেশী লগ্নীপত্র জমা রাখিবার ব্যবস্থা হয়। ইহাও পরে অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে আশঙ্কা করিয়া ১৯৫৭ সালে পুনরায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া বিদেশী লগ্নীপত্রের জমার পরিমাণ কমাইয়া ৮৫ কোটি টাকা করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিদেশী মুদ্রা :
FOREIGN EXCHANGE IN THE THIRD PLAN

তৃতীয় পবিকল্পনায মোট আমদানিব পবিমাণ ৬৩০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান কবা হইযাছে। (বিদেশী ঋণ পবিশোধেব জন্য ৫৫০ কোটি+উন্নয়নমূলক কার্যেব জন্য পুঁজিদ্রব্য ২১০০ কোটি+যন্ত্রপাতিব সংবক্ষণ জনিত (maintenance imports) আমদানি ৩৬৫০ কোটি টাকা=৬৩০০ কোটি টাকা)। আব মোট রপ্তানিব পবিমাণ প্রায ৩৭০০ কোটি টাকা অনুমিত হয। সুতবাং তৃতীয় পবিকল্পনাকালে ২৬০০ কোটি টকাব বিদেশী মুদ্রা ঘাট্তি হইবে বলিযা ধবা হয়। তৃতীয় পবিকল্পনাব চাবি বৎসবে বিদেশী মুদ্রাব প্রকৃত অবস্থা বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। তবে বপ্তানিব ক্ষেত্রে উন্নতি পবিলক্ষিত হইতেছে ইহা স্বীকাব কবিতে হইবে। এই পবিকল্পনাব প্রথম বৎসবে (৬১-৬২) আমদানি ও বপ্তানি যথাক্রমে ১০৯০ কোটি টাকা ও ৬৬০ কোটি টাকা, ঘাট্তি ৪৩০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় বৎসবে (৬২-৬৩) যথাক্রমে ১১৩১ ও ৬৮৫ কোটি টাকা; ঘাট্তি ৪৪৬। তৃতীয় বৎসবেও (৬৩-৬৪) উহা যথাক্রমে ১১৪৩ ও ৭৭৭ কোটি টাকা, ঘাট্তি ৩৬৬ কোটি টাকা। ১৯৬৪ সালেব ডিসেম্বরে যে বৎসব শেষ হইযাছে সেই বৎসবে উহা যথাক্রমে ১০৭০ ও ৮৩৫ (ঘাট্তি ২৩৫) কোটি টাকা হইযাছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এমতাবস্থায পবিত্রাণেব একমাত্র পথ দেখা যাইতেছে বিদেশী সাহায্য। তৃতীয পবিকল্পনাব প্রথম তিন বৎসবেব (অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ সাল হইতে ১৯৬৩-৬৪ সাল পযন্ত) জন্য মোট ২৮৩৩৮ কোটি টাকাব বিদেশী ঋণ, দান ও সাহায্য পাওয়া গিযাছে, তাহাব মধ্যে ১৯৬৩ সালেব ডিসেম্বব পযন্ত ব্যয হইযাছিল ১১৯৪২ কোটি টাকা। তৃতীয় পবিকল্পনাব চতুর্থ বৎসবেব জন্য (১৯৬৪ ৬৫) প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রাব অনুমিত হিসাব ৫২৪ হইতে ৫২৮ কোটি টাকা এবং ইহাব মধ্যে Aid India Consortium ৪৯০ কোটি টাকা সংগ্রহ কবিয়া দেওযাব প্রতিশ্রুতি দিযাছেন।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পুনরায় বিদেশী মুদ্রার সংকট (foreign exchange problem in the third plan) : দ্বিতীয় পবিকল্পনাব শেষ দিকে নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বনেব পব, বিদেশী মুদ্রাব সমস্যা সাময়িকভাবে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও উহাব স্থায়ী সমাধান যে সুদূবপবর্তী তাহা জানা ছিল। তৃতীয় পবিকল্পনাকালে বিদেশী মুদ্রাব অনুমিত প্রযোজন হইতেও, এ সম্পর্কে যে ভবিষ্যতে দুশ্চিন্তাব অবকাশ থাকিবে তাহা ধবিয়াই লওয়া হইযাছিল। তৃতীয় পবিকল্পনাব প্রথম বৎসবে ১৯৬১ ৬২ সালেই বিদেশী মুদ্রাব ঘাটৃতিব দরুন দেশেব বিদেশী মুদ্রা তহবিল কমিযা যায। কিন্তু সে সময বপ্তানি বৃদ্ধি ও ১৯৬৩ সালে বিদেশী সাহায্যেব উৎকৃষ্টতব ব্যবহাবেব দ্বাবা সংকট কাটান হয এবং ভবিষ্যতে মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক মাত্রায বিদেশী মুদ্রাব তহবিল বজায থাকিবে বলিযা আশা হয়। কিন্তু সে আশা মিথ্যা প্রমাণিত কবিযা ১৯৬৫ সালেব ফেব্রুয়াবী মাসে বিদেশী মুদ্রাব তহবিল কবিযা ৭৯ কোটি টাকায পবিণত হয। ইহা আইনত যে ন্যূনতম বিদেশী মুদ্রাব তহবিল থাকাব কথা (৮৫ কোটি টকা), তাহাপেক্ষা কম। অথচ, ১৯৬৪ সালে বপ্তানিদ্বাবা অর্জিত আয় পূর্বাপেক্ষা ৫২ কোটি টাকা বেশি হইযাছিল।

অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণমাচাবী বর্তমানে বিদেশী মুদ্রা তহবিল কমিবাব যে তিনটি কাবণ নির্দেশ কবিয়াছেন তাহা হইল,—ক. খাদ্য এবং বাসায়নিক সাব ইত্যাদি অধিক আমদানিব দরুন মোট আমদানি বেশি হইয়াছে (১৯৬৩ সালে ১১৭৮ কোটি টাকাব স্থলে, ১৯৬৪ সালে ১২৫০ কোটি টাকা)।

[illegible] ।

[illegible]ভারতে অবস্থিত বিদেশী কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক তাহাদের স্বদেশে মুনাফা [illegible], বিদেশী জাহাজ ভাড়া, বিদেশী ঋণের সুদ প্রদান, ইত্যাদি কারণে বিদেশী মুদ্রায় বিদেশে অর্থ প্রদান করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়াও, বেআইনী আমদানির মূল্যপ্রদান (smuggling), এবং বিদেশী সাহায্য যথাযথ ব্যবহারে অক্ষমতা প্রভৃতি কারণও এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী।

সমাধানে সরকারী ব্যবস্থা (Govt measures) : এই সমস্যার আশু সমাধানে যে সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে তাহা এই : ক. আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিল হইতে জরুরী ঋণের জন্য (stand by loan) বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইতিপূর্বেই বর্তমান পরিকল্পনা কালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাতহবিলের নিকট আমাদের দেনা হইয়াছে ২০ কোটি টাকা।

খ. আমদানি কঠোর ভাবে সংকোচনের উদ্দেশ্যে খাদ্য, রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য, পুস্তক, পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় আমদানির উপর মূল্যের ১০% নিয়ন্ত্রণ মূলক আমদানি শুল্ক বসান হইয়াছে।

গ. ব্যাঙ্করেট ৫% হইতে বাড়াইয়া ৬% করা হইয়াছে।

ঘ. রপ্তানি আরও বাড়াইয়া আরও বেশি বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের উপর জোর দেওয়া হইতেছে এবং এজন্য বর্তমান বাজেটে রপ্তানিকারিগণকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

ঙ. আরও অধিক পরিমাণে বিদেশী পুঁজি দেশে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

ভারত ও আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার
INDIA & THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীর সকল প্রধান দেশগুলিতে স্বর্ণমান ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে নানা কারণে স্বর্ণমুদ্রামান বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। বহুবিধ পরীক্ষার পর শেষপর্যন্ত ১৯৩১ হইতে ১৯৩৬ সালের মধ্যে পৃথিবীর সকল প্রধান দেশই স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে ও পত্রমুদ্রামান গ্রহণ করে। ইহার ফলে প্রত্যেক দেশই নিজ নিজ মুদ্রার বহির্বিনিময় মূল্য (external value) নিয়ন্ত্রণ করে। ইহাতে নানারূপ জটিলতা সৃষ্টি হয়। রপ্তানিবৃদ্ধি ও আমদানি হ্রাস করিয়া আন্তর্জাতিক লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে মুদ্রার বহির্বিনিময় মূল্য হ্রাস চলিতে থাকে। ইহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হ্রাস পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীযুগে যাহাতে এই তিক্ত ও অস্বস্তিকর অবস্থার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং বিভিন্ন দেশের পত্রমুদ্রামান থাকাসত্ত্বেও যাহাতে সকলদেশের মুদ্রার বহির্বিনিময় মূল্যের স্থিরতা থাকে, ও উহারা সহজেই পরস্পরের সহিত বিনিময়যোগ্য হয় এবং ইহার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে, সেজন্য যুদ্ধকালেই মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হয়। ইহার নাম 'আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার' (International Monetary Fund)। ইহার উদ্দেশ্য পাঁচটি : ১. আন্তর্জাতিক মুদ্রাগত সহযোগিতা বৃদ্ধি। ২. সদস্য-দেশগুলির মুদ্রার বহির্বিনিময় হারের স্থিরতা বৃদ্ধি ও মুদ্রার প্রতিযোগিতামূলক বহির্বিনিময় মূল্যহ্রাস পরিহার। ৩. মুদ্রার বহুবিনিময়যোগ্যতা (multilateral convertibility) প্রতিষ্ঠা। ৪. মুদ্রার বহুবিনিময়যোগ্যতা প্রতিষ্ঠার দ্বারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার। এবং ৫. সদস্য দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের সাময়িক অসুবিধায় সাহায্যদান।

[illegible]য়াছে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকে [illegible] চাঁদার এক-চতুর্থাংশ অথবা [illegible]
[illegible]শমাংশের মধ্যে যেটি অল্পতর তাহা দেয় চাঁদার অংশ হিসাবে আন্তর্জাতিক [illegible]
জমা দিতে হয়। বাকি অংশ নিজ মুদ্রায় দেওয়া চলে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র, চলতি [illegible]
লেনদেনের ঘাটতি হইলে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের নিকট হইতে, সাধারণত উহাদের [illegible]
চাঁদার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা কিনিতে পারে। ইহা ছাড়া প্রয়োজন [illegible]
প্রতিবৎসর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ করিয়া বেশিও কিনিতে পারে। তবে মোট ক্রয়ের পরিমাণ
চাঁদার ২০০ শতাংশের অধিক হইবে না। এইরূপ বিদেশী মুদ্রা কিনিতে হইলে, দেশীয় মুদ্রার
দ্বারা দাম দিতে হয়। তাহা ছাড়া, সদস্য হইবার সময় প্রত্যেক দেশকে উহার মুদ্রার স্বর্ণ অথবা
ডলার মূল্য ঘোষণা করিতে হয় এবং উহা বজায় রাখিতে হয়। অবশ্য প্রয়োজন হইলে, কোন
সদস্যরাষ্ট্র নিজের মুদ্রার ঘোষিত বহির্বিনিময় মূল্য, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের অনুমতি ছাড়া,
দশ শতাংশ পরিমাণ পর্যন্ত হ্রাস করিতে পারে। ইহার অতিরিক্ত হ্রাস করিতে হইলে
আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের অনুমতি লইতে হয়।

ভারত এই সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। পূর্বে ভারতের চাঁদার পরিমাণ ছিল ৪০
কোটি ডলার। সম্প্রতি ইহার সদস্যদের চাঁদা ৫০ শতাংশ বর্ধিত হইয়াছে। ইহাতে ভারতসহ
সকল দেশের পক্ষেই ইহার নিকট হইতে অধিক পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা ক্রয় করা সম্ভব হইবে।

সদস্য হইবার পর হইতে ১৯৬৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, ভারত ইহার নিকট হইতে
বিভিন্ন সময়ে মোট ২৭৪ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা কিনিয়াছে অর্থাৎ ঐ পরিমাণে সাহায্য
পাইয়াছে। তন্মধ্যে ১৫৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে
বিদেশী মুদ্রার সংকটের সময় ভারতকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার কর্তৃক সাহায্য প্রদান এসম্পর্কে
উল্লেখযোগ্য।

সাময়িক বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি সংক্রান্ত সাহায্য ছাড়াও, ভারতের বিবিধ উন্নয়ন প্রকল্পে
আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার কারিগরি ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ দল পাঠাইয়া তাহাদের পরামর্শলাভ ও
অভিজ্ঞতা ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছে।

ইহা ছাড়া, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হওয়ার ফলে ভারতের মুদ্রামান স্টার্লিংয়ের
অধীনতামুক্ত হইয়া আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মুদ্রামানে পরিণত হয়। পরিশেষে, আন্তর্জাতিক
মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্য হইবার ফলে ভারত বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্য হইতে পারিয়া নানাভাবে উপকৃত
হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের সদস্যপদ গ্রহণের দ্বারা ভারত
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা প্রকার সুবিধাভোগে সক্ষম হইয়াছে।

৩

ভারতের টাকার বাজার ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা
The Indian Money Market and The Banking System

টাকার বাজার ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আধুনিক অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং পরিবহণের উন্নতির ফলে সকল দেশেরই অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য প্রসারিত হয়। ইহাকে সহায়তা দিয়া বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থারও সম্প্রসারণ আবশ্যক। ব্যাঙ্ক বলিতে প্রধানত স্বল্পমেয়াদে ঋণদানকারী ও ঋণগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বুঝায়। উৎপাদনকারিগণকে স্বল্প মেয়াদে কার্যকর পুঁজি (working capital) ঋণ দেওয়া ও ব্যবসায়িগণকে স্বল্পমেয়াদে ঋণদান করিয়া অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য প্রসারে সাহায্য করাই আধুনিক ব্যাঙ্কগুলির প্রধান কার্য। ইহার সহিত দেশের সঞ্চয়কারিগণের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় সংগ্রহ করাও ইহাদের কার্যের অঙ্গ। ফলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসারে দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য, উৎপাদন ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়।

ভারতের টাকার বাজার
THE INDIAN MONEY MARKET

টাকার বাজার কাহাকে বলে (What is a Money Market)? দেশের বিভিন্ন উৎপাদনক্ষেত্রে ও ব্যবসায় বাণিজ্যে সর্বদাই স্বল্প মেয়াদে ঋণের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা স্বল্প মেয়াদে ঋণ দিয়া উপার্জন করিতে ইচ্ছুক। স্বল্পমেয়াদী ঋণের এই আদানপ্রদান লইয়া দেশের টাকার বাজার গঠিত। সুতরাং টাকার বাজার বলিতে স্বল্পমেয়াদী ঋণের আদান-প্রদান বুঝায়। স্বল্পমেয়াদী ঋণগ্রহণকারীরা এই বাজারের চাহিদাকারী। স্বল্পমেয়াদী ঋণদাতারা ইহার যোগানদার। সাধারণত ব্যবসায়িগণ ইহার চাহিদাকারী ও ব্যাঙ্কগুলি ইহার যোগানদার। দেশে উৎপাদন ও ক্রয়বিক্রয় যতই বৃদ্ধি পায় ততই স্বল্পমেয়াদী ঋণের প্রয়োজন বাড়ে। সুতরাং ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে টাকার বাজারের সম্প্রসারণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবিশেষ প্রয়োজন।

ক. ভারতের টাকার বাজারের সদস্যগণ (constituent elements of the Indian Money Market): ভারতের টাকার বাজারের সদস্যগণকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা, ১. ঋণের যোগানদার ও ২. ঋণের চাহিদাকারী।

১. ঋণের যোগানদারগণের মধ্যে রহিয়াছে—ক. ভারতীয় যৌথমূলধনী ব্যাঙ্কগুলি। খ. বিদেশী (বা বিনিময়) ব্যাঙ্কগুলি। গ. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ঘ. স্টেট ব্যাঙ্ক। ঙ. সমবায় ও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি। চ. পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। এবং ছ. দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ। ভারতীয় যৌথমূলধনী ব্যাঙ্কসমূহ, বিদেশী ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্ককে এককথায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

২. ঋণের চাহিদাকারিগণের মধ্যে রহিয়াছে—ক. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি। খ. ট্রেজারী-বিলের কারবারী। গ. শেয়ার ও অন্যান্য লগ্নীপত্রের কারবারী প্রভৃতি।

ভারতের টাকার বাজারে দেশী ও বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি একাধারে ঋণের যোগানদার ও চাহিদাকারী। স্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকা প্রধানত যোগানদারের। ইহা স্বল্পমেয়াদী ঋণছাড়াও বর্তমানে গ্রামীণ ও শিল্পঋণদান কার্যে অংশ লইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা হইতেছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নিকট শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা হিসাবে। টাকার বাজারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ দেয় তাহা নিয়ন্ত্রণের ভার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত। দেশী ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্ক লইয়া ভারতের আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গঠিত।

খ টাকার বাজারের লগ্নীপত্র (papers dealt in money market) : টাকার বাজারে স্বল্পমেয়াদী ঋণের আদান-প্রদান কতকগুলি দলিলকে (papers) ভিত্তি করিয়া ঘটে। ইহাদের ঋণের বাহক বলা যায়। ভারতে এই প্রকার দলিল হইল—১. ট্রেজারী বিল। ২. স্বল্পমেয়াদী সরকারী ঋণপত্র। ৩. বেসরকারী কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্র। ৪. মেয়াদী কৃষিবিল (agricultural usance bills)।

গ. বৈশিষ্ট্য (characteristic features) : ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ : ১. ভারতের টাকার বাজার দ্বিধাবিভক্ত। একটি হইল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্ক প্রভৃতি লইয়া গঠিত আধুনিক টাকার বাজার। অপরটি হইল দেশীয় সাহুকার, পোদ্দার প্রভৃতিগণকে লইয়া গঠিত ভারতের চিরাচরিত প্রাচীন টাকার বাজার। ইহাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। এজন্য ভারতের টাকার বাজার সুসংগঠিত নহে। ২ ভারতের টাকার বাজার কোন একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত নহে। বোম্বাই ও কলিকাতা, ভারতের দুইটি বৃহৎ টাকার বাজার। ইহাদের মধ্যে বোম্বাই প্রধান। ইহা ছাড়া আবার ক্ষুদ্রতর আঞ্চলিক টাকার বাজার রহিয়াছে। ভারতের মত বৃহৎ দেশে যোগাযোগ ও উপযুক্ত অর্থপ্রেরণ ব্যবস্থার অভাবে টাকার বাজার বিকেন্দ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুদের হারের তারতম্য দেখা যায়। ৩. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইলেও ইহা অল্পদিন যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য দেশের মত টাকার বাজারের সকল অংশে ইহার নেতৃত্ব এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ৪. ভারতে বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রভাব টাকার বাজারের অপর একটি দুর্বলতা। ৫. ব্যাঙ্কব্যবস্থা এখনও যথেষ্টরূপে প্রসারিত হয় নাই বলিয়া ইহাদের আর্থিক সম্বল অধিক নহে। ৬. টাকার বাজারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার অভাব রহিয়াছে। ৭. ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় এখানে কোন বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান নাই। ৮. টাকার বাজারের বেচাকেনার জন্য বিল বা উপযুক্ত দলিলের বা লগ্নীপত্রের অভাব রহিয়াছে। অবশ্য ১৯৫২ সাল হইতে বিলবাজার প্রতিষ্ঠার কার্য শুরু হইয়াছে। ভারতের টাকার বাজারের এই ত্রুটিগুলিই ইহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য হয়।

ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য
FEATURES OF THE INDIAN BANKING SYSTEM

সকল স্বল্পোন্নত দেশের মত ভারতেও আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার ও উন্নতি লাভ করে নাই। ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল।

প্রধান বৈশিষ্ট্য (chief features) : ১. **ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা অনুন্নত**. ১৯৬০ সালে ভাবতে মাথাপিছু ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫১ টাকা ৭০ নয়া পয়সা ঐ বৎসব ভাবতে গড়ে ৮৬,৭৭২ জন ব্যক্তিব জন্য একটি কবিয়া ব্যাঙ্কিং কার্যালয় (banking office) ছিল।[২] তুলনায মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রে (১৯৪৭ সালে) ৩,০৫৬ জন, ইংলণ্ডে ৪,৮১৬ জন ও জাপানে ৯,৪৯১ ব্যক্তিব জন্য একটি কবিযা ব্যাঙ্কিং কার্যালয় ছিল। সুতবাং আমানত ও ব্যাঙ্কিং কার্যালযেব দিক হইতে ভাবত অনেক পশ্চাতে বহিয়াছে।

২. **ব্যাঙ্কিং কার্যালয়গুলি দেশের সর্বত্র সমভাবে স্থাপিত নহে :** উহাদেব অধিকাংশই মাদ্রাজ (৭৯৫), কেবল (৬১৩), মহাবাষ্ট্র (৫৮৮), উত্তব প্রদেশ (৪৭৭) ও মহীশূবে (৪৬৫) কেন্দ্রীভূত। ভাবতেব অন্যান্য অংশে তুলনায অল্প ব্যাঙ্কিং কার্যালয দেখা যায। আবার অধিকাংশ ব্যাঙ্কিং কার্যালযগুলি বাজ্যেব বাজধানী ও বড় শহবগুলিতেই অবস্থিত। সুতরাং মফঃস্বলেব বাণিজ্যকেন্দ্রে তো দূবেব কথা, ছোটখাটো শহবগুলিতেও খুব কম ব্যাঙ্কিং কার্যালয়ই বর্তমান।

৩. **অধিকাংশ ব্যাঙ্কই স্থানীয় ব্যাঙ্ক :** সুতবাং ইহাদেব সামর্থ্যও অল্প। অল্প দুই-একটি ব্যাঙ্ক ছাড়া ভাবতেব অধিকাংশ বড ব্যাঙ্কই নিজ নিজ প্রদেশ বা বাজ্যে নিজেদের কার্যাবলী আবদ্ধ বাখিতে পছন্দ কবে। বর্তমানে এই প্রবণতা ধীবে ধীবে দূব হইতেছে।

৪. **ভারতে শাখাসমন্বিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাব (Branch Banking) বিস্তাব ঘটিয়াছে :** এ দেশে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাব যে প্রসাব ঘটিযাছে তাহা প্রধানত ব্যাঙ্কেব শাখা-কার্যালয়ের বৃদ্ধিব দ্বাবাই সম্ভব হইযাছে। নূতন প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কেব সংখ্যা তুলনায অল্প।

৫. **ভারতে ব্যাঙ্কগুলির নিকট মোট আমানতের অধিকাংশই কয়েকটি মুষ্টিমেয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত।** ১৯৬০ সালে মোট ব্যাঙ্ক আমানতেব ৮৩ শতাংশ মাত্র ১৭৮টি ব্যাঙ্কেব নিকট ছিল।

৬. **রাষ্ট্রায়ত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক :** ১৯৪৮ সালে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীযকবণ আইন দ্বাবা ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বাষ্ট্রাযত্ত কবা হয়। ভাবতেব কেন্দ্রীয ব্যাঙ্কের এইরূপ জাতীযকবণ আধুনিক কালেব ব্যাঙ্কিং জগতেব বৈশিষ্ট্যেব সহিত সংগতিপূর্ণ।

৭ **রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক :** ১৯৫৫ সালেব ১লা জুলাই হইতে ভাবতের সর্বপ্রধান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ইম্পিবিযাল ব্যাঙ্কেব ও ভাবতেব কতিপয় ভূতপূর্ব দেশীয় বাজ্যের ব্যাঙ্কের জাতীয়কবণ দ্বাবা স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইহাব ফলে ভাবতেব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কজগতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র সৃষ্ট হইযাছে।

৮. **ব্যাঙ্কসমূহের উপর ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ :** ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ও '৫৬, '৫৯, ও '৬০, '৬১, '৬২ ও '৬৩ সালে উক্ত আইনের বিভিন্ন সংশোধন দ্বাবা এবং বিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনেব ১৯৫৬ সালেব সংশোধন দ্বাবা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের কার্যাবলী নিযন্ত্রণেব জন্য কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক হিসাবে বিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে বিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাবফত ব্যাঙ্কজগতে রাষ্ট্রেব আইনগত নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

১. Trend and Progress of Banking in India, 1960. p. 109.

২. ibid. p. 108.

৯. **রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাঙ্কঋণের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি :** পরিকল্পনাকালে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর প্রসার ও ঘাটতি মুদ্রানীতির ফলে দেশে ঋণের ও মুদ্রার স্ফীতি ঘটিতেছে। ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ যাহাতে অত্যধিক বৃদ্ধি না পায় সেজন্য ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি, উপদেশ দান, ও বিচারমূলক (selective) ঋণনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নানাপ্রকার পদ্ধতির সাহায্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কঋণ নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

১০. **বিলবাজার স্থাপনের কর্মসূচী :** ভারতে ব্যাঙ্কঋণের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের অনুকরণে একটি বিলবাজার (Bill Market) প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করে। ইহাতে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহায়তার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে।

১১. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ :** সাম্প্রতিক কালে দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পে ক্রমবর্ধমান ঋণের চাহিদা মিটাইতে গিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট অধিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির নির্ভরতা বাড়িতেছে।

১২. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আমানত ও প্রদত্ত ঋণের ক্রমাগত বৃদ্ধি :** পরিকল্পনাকালে দেশে মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক কার্যাবলী, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে একদিকে ব্যাঙ্কের নিকট মোট আমানত ও অপর দিকে ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িতেছে।

১৩. **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক শিল্প ঋণদানে ক্রমবর্ধমানে অংশ গ্রহণ :** সম্প্রতিকালে বৃহৎ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে স্বল্প ও মাঝারি মেয়াদে ঋণদান কার্যে অংশগ্রহণের জন্য নানাভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে উৎসাহ দান করা হইতেছে। ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে এজন্য একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে স্টেট ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ৪৯টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক অংশগ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের প্রদত্ত ঋণের জন্য সরকার গ্যারাণ্টি দিয়াছেন। ইহা ছাড়া শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক মারফৎ রি-ফাইন্যান্স কর্মসূচীতে শিল্পে যে মাঝারি মেয়াদে ঋণদান ঘটিতেছে তাহাতেও তফশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ যোগদান করিয়াছে। বাণিজ্যিক-ব্যাঙ্ক কর্তৃক শিল্প ঋণদানে অংশ গ্রহণ সাম্প্রতিক ব্যাঙ্কিং ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৪. **আমানত বীমা করপোরেশন স্থাপন :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তে ভারতে ব্যাঙ্কগুলির আমানতের বীমা করিবার জন্য সম্প্রতি ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারি আমানত বীমা করপোরেশন (Deposit Insurance Corporation) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলেও প্রধানত ক্ষুদ্র আমানতকারীদের আমানত নিরাপদ হইয়াছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কফেলের ভীতি দূর হইবে ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা জনপ্রিয় হইবে। ইহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ভিত্তি মজবুত হইবে।

ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ত্রুটি

DEFECTS OF THE INDIAN BANKING SYSTEM

ভারতে আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা খুব বেশি দিন যাবৎ বিস্তারলাভ করে নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেই বার বার ইহা সংকটে পড়িয়াছে এবং উহার দরুন বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক বিনষ্ট হইয়াছে উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্কসংকটের মধ্যে ১৯১৩-১৫ সালের সংকট, ১৯২২-৩৩ সালের সংকট ও

১৯২৯-৩০ সালের সংকট প্রধান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে শেষোক্ত সংকটে ১৯৪৮ হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ১৮৫টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে এই সময়ে অনেক ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। এই সকল ব্যাঙ্কসংকটে প্রধানত ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্কই বিনষ্ট হয় এবং ক্ষুদ্র আমানতকারীরাই অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ব্যাঙ্কসংকটগুলির দ্বারা ভারতের ব্যাঙ্কগুলির নানাবিধ দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এই দুর্বলতাগুলিই বারংবার ব্যাঙ্ক-সংকটের জন্য এবং ভারতে ব্যাঙ্কব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতির অভাবের জন্য দায়ী। ত্রুটিগুলি সংক্ষেপে এই—

১. পুঁজি ও সম্বলের স্বল্পতা। ২. সঞ্চয় তহবিলের স্বল্পতা। ৩. পুনঃ পুনঃ ঋণের প্রয়োজনীয়তা। ৪. যৌথমূলধনী কোম্পানীর শেয়ার ও লগ্নীপত্রে অধিক বিনিয়োগ এবং শেয়ার বাজারে ক্রয়বিক্রয়ের দর উল্লিখিত হয় না এরূপ শেয়ার ও লগ্নীপত্রে লগ্নী। ৫ ডিরেক্টার-গণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার ও ঋণপত্রে লগ্নী। ৬. সরকারী ঋণপত্রে লগ্নীর স্বল্পতা। ৭. সামান্য সম্পত্তি। ৮. মোট সম্বলের অনুপাতে অত্যধিক ঋণদান। ৯. জামিন ব্যতীত ঋণদান। ১০. স্থাবর সম্পত্তির জামিনে ঋণদান। ১১. অবাঞ্ছিত ও অনাদায়কৃত ঋণদান ১২. অল্পকয়েকজন ঋণ গ্রহণকারীকে অত্যধিক পরিমাণে ঋণদান। ১৩. ডিরেক্টারবর্গ তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ও তাহাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অধিক ঋণদান। ১৪. সুশিক্ষিত কর্মীর অভাব ইত্যাদি।

এই সকল ত্রুটি দূর করিয়া ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য ১৯৪৯ সালে ভারতের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন পাস করিয়া ব্যাঙ্কগুলির উপর নানারূপ বিধিনিষেধ আরোপিত ও উহাদের তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের সংশোধন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা আরও বর্ধিত হইয়াছে।

প্রতিকার (remedies) ঃ এই সকল ত্রুটি দূরীকরণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হইয়া থাকে।

১. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক দোষী ব্যাঙ্কগুলি সম্পর্কে প্রথমাবস্থাতেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ২. ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং আইনের পরিবর্তে নূতন করিয়া অপর একটি ব্যাপকতর ব্যাঙ্কিং আইন প্রণয়ন আবশ্যক। ৩. ব্যাঙ্ককর্মিগণের শিক্ষাদান কার্যের অধিকতর সন্তোষজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ৪. সকল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ প্রয়োজন। শেষোক্ত ব্যবস্থাটি বিতর্কমূলক হইলেও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দ্বারা আংশিকভাবে এক্ষেত্রে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। গতদশকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির দোষত্রুটি সংশোধনে অনেকটা সফল হইয়াছে। কিন্তু উহার তৎপরতা বৃদ্ধির আরও প্রয়োজন রহিয়াছে।

ব্যাঙ্কব্যবস্থার সংস্কার ঃ ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন, ১৯৪৯

BANKING REFORM : THE BANKING COMPANIES ACT, 1949

উদ্দেশ্য (objective) ঃ ব্যাঙ্কব্যবসায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ক্ষেত্র নহে এ ধারণা, অল্পদিন পূর্বেও প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেই কোন কোন দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের একটি জোয়ার আসে। ইহার প্রভাবে ভারতেও ১৯৪৮ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়। সে সময় ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের কথাও ওঠে। সে প্রশ্ন এখন পর্যন্ত আলোচিত হইতেছে। তবে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ সম্বন্ধে মতভেদ

থাকিলেও, এ সম্পর্কে সকলেই একমত যে, ভারতের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে, ব্যাঙ্কব্যবস্থার ত্রুটি দূর করিয়া, কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নীতি ও কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়-সাধন, ও উহার দ্বারা সাধারণভাবে ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার শক্তিবৃদ্ধি দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উপযুক্ত সহায়তার জন্য, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। এই প্রকার উদ্দেশ্য হইতেই ভারতে ১৯৪৯ সালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রথম আইন প্রণীত হয়। পরবর্তীকালে, ১৯৫০, '৫১, '৫৬, '৫৯, '৬০, '৬১, '৬২, '৬৩, '৬৪, সালে এই আইনটি নানাভাবে সংশোধিত হইয়াছে। সংক্ষেপে ১৯৪৯ সালের মূল আইনের প্রধান ধারাগুলি ও পরবর্তী সংশোধনগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটির আলোচনা করা হইল।

১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন: এই আইনের দ্বারা, ক. ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির উপর কতকগুলি বিধি নিষেধ জারী করা হয় এবং খ. উহাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর কতকগুলি ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ক. বিধি নিষেধ: ১. নূতন ও পুরাতন সকল ব্যাঙ্ককেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে অনুমতি পত্র (licence) লইতে হইবে। ২. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত পুরাতন শাখার স্থান পরিবর্তন বা নূতন শাখা স্থাপন চলিবে না। ৩. আইন-নির্দিষ্ট পুঁজি ছাড়া ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় পরিচালনা করা যাইবে না। ৪. আদায়ীকৃত পুঁজির সমপরিমাণ সঞ্চয় তহবিল (reserve fund) না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বৎসর লভ্যাংশ ঘোষণার পূর্বে নীট মুনাফা হইতে ২০ শতাংশ সঞ্চয় তহবিলে জমা করিতে হইবে। ৫. মোট দায়ের (liability) ২০ শতাংশের সমপরিমাণ সম্পত্তি নগদে, স্বর্ণে বা অনুমোদিত শেয়ার ও ঋণপত্রে মজুদ রাখিতে হইবে। ৬. তপশীল-বহির্ভূত (non-scheduled) ব্যাঙ্কগুলিকে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মত চলতি ও স্থায়ী আমানতের নির্দিষ্ট শতাংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে হইবে। ৭. অন্য কোন কোম্পানীর ডিরেক্টার দ্বারা বা কোন ম্যানেজিং এজেন্ট দ্বারা কোন ব্যাঙ্ক পরিচালিত হইবে না। ৮. ডিরেক্টারগণকে তাঁহাদের স্বার্থজড়িত কোন প্রতিষ্ঠানকে এবং ব্যাঙ্কের নিজ শেয়ারের জামিনে কোন ঋণ দেওয়া চলিবে না।

খ. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর আরোপিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব: ১. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপ তদারক ও কাগজপত্র পরীক্ষা করিবে। ২. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দিষ্টকাল পর পর ব্যাঙ্কগুলির কার্যবিবরণ ও অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য তলব করিতে পারিবে। ৩. কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কগুলি ঋণ মঞ্জুর করিবে, সুদের হার কিরূপ হইবে এবং ঋণের জামিনের 'মার্জিন' কিরূপ রাখা হইবে এসকল বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির অনুসরণযোগ্য নীতি স্থির করিতে পারিবে। ৪. বিভিন্ন ব্যাঙ্কের একীকরণের প্রস্তাব পরীক্ষা ও মঞ্জুর করিবার দায়িত্বও রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে। ৫. কোন ব্যাঙ্কের কারবার গুটাইতে হইলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঐ কার্যের ভার গ্রহণের জন্য আবেদন করিলে উহাকে প্রসমাপক (liquidator) রূপে নিয়োগ করা চলিবে।

পরবর্তী সংশোধনসমূহ: ১. ১৯৫০, '৫১ ও '৫৬ সালের সংশোধন দ্বারা ব্যাঙ্কের কারবার গুটাইবার পদ্ধতি সরল করা হয়। ২. কৃষি বিলের মেয়াদ ৯ মাস হইতে ১৫ মাস বর্ধিত করা হয়। ৩. সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও কার্যবিবরণাদি দাখিলের বিষয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে আনা হয়। ৪. ১৯৫৬ সালের সংশোধন দ্বারা ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, ডিরেক্টার, জেনারেল ম্যানেজার ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের নিয়োগ

[illegible] স্বার্থে ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ পরিচালনা বা নীতি [illegible] বিষয়ে নির্দেশ [illegible] [বি]জার্ভ ব্যাঙ্ককে ক্ষমতা দেওয়া হয়। ৫. ১৯৫৯ সালের সংশোধন দ্বারা কোন ব্যা[ঙ্কের] চেয়াবম্যান, ডিবেক্টাব, ম্যানেজাব, প্রধানকর্মকর্তা বা অন্য যে কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে অপ[-] সাবণেব জন্য নির্দেশদানেব ক্ষমতা বিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। ৬. ইহা ছাড়া ১৯৬০ সালের প্রথম সংশোধনী দ্বাবা ব্যাঙ্কগুলিব হিসাবপত্র যাহাতে শ্রমআদালতেব নিকট পেশ কবিতে না হ[য়] সে ব্যবস্থা কবা হয। উক্ত সালেব দ্বিতীয সংশোধনী দ্বাবা ব্যাঙ্কের কাববাব গুটাইবাব পদ্ধতি সম্বন্ধে কযেকটি নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন কবা হয। ১৯৬১ সালেব সংশোধনী দ্বারা ব্যাঙ্কএকীকরণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

১৯৬২ সালেব সংশোধনেব প্রধান ধাবাগুলি এইরূপ : ১. প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে উহাব মোট দায়ের (liability) অর্থাৎ চলতি ও স্থাযী আমানতেব ২৫ শতাংশ নগদ টাকা, স্বর্ণ অথব প্রথম শ্রেণীব ঋণপত্রে মজুদ বাখিতে হইবে ('৪৯ সালেব আইনে ইহা ছিল ২০ শতাংশ) ২. প্রত্যেক ব্যাঙ্ক উহাব চলতি ও স্থাযী উভয প্রকাবেব মোট আমানতেব ন্যূনপক্ষে ৩ শতাংশ বিজার্ভ ব্যাঙ্কেব নিকট গচ্ছিত বাখিতে হইবে। এবং প্রয়োজনবোধে উহাকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো চলিবে। [১৯৫৬ সালেব সংশোধনে চলতি আমানতেব ৫ শতাংশ (প্রযোজনবোধে ২০ শতাংশ) এবং স্থায়ী আমানতেব ২ শতাংশ (প্রযোজনবোধে ৮ শতাংশ) পর্যন্ত বাড়ানে চলিত] ৩. ব্যাঙ্ক সমূহেব সঞ্চয তহবিল (reserve fund) বৃদ্ধি পাইযা নিজ নিজ আদাযীকৃত পুঁজিব (paid up capital) সমান হইলেও ব্যাঙ্কগুলি মুনাফাব ২০ শতাংশ সঞ্চয তহবিলে জমা বাখিতে থাকিবে। ৪. নূতন ব্যাঙ্ক মাত্রেবই (উহাব কার্যক্ষেত্রেব সংখ্যা এক ব একাধিক যাহাই হউক না কেন) আদাযীকৃত পুঁজি হইবে ন্যূনপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা (পূর্বে আইনে ছিল ৫০,০০০ টাকা)।

১৯৬৩ সালেব ব্যাঙ্কিং নিযমাবলী (বিবিধ বিষয) আইন, [Banking Laws (Miscellaneous Provisions) Act, 1963] দ্বাবা দেশেব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক জাতীয আমানত গ্রহণকাবী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেব উপবে বিজার্ভ ব্যাঙ্কেব কর্তৃত্ব ও নিযন্ত্রণক্ষমত আবও সম্প্রসাবিত হইযাছে। উল্লিখিত আইনেব দ্বাবা ১৯৩৪ সালেব বিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে এবং ১৯৪৯ সালেব ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনেব সংশোধন কবা হইযাছে। বিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে সংশোধনেব দ্বাবা বিভিন্ন প্রকাবেব অর্থসববাহকাবী প্রতিষ্ঠানেব (financial institutions নিকট হইতে বাধ্যতামূলক ভাবে সংবাদ সংগ্রহ কবিবাব এবং উহাদিগকে প্রযোজনমত নির্দেশ দিবাব অধিকাব বিজার্ভ ব্যাঙ্ক লাভ কবিয়াছে। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনেব সংশোধন দ্বার ব্যাঙ্কেব সহিত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকাবী (যেমন পবিচালক) ব্যক্তিদেব বা ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান সম্পর্কে বিধিনিষেধ, এবং ব্যাঙ্ক সমূহকে নানাবিধ ব্যাপাবে নির্দেশদানে অধিকাব বিজার্ভ ব্যাঙ্ক লাভ কবিযাছে। ইহা ছাডাও আমানতকাবীদের স্বার্থবক্ষাব প্রয়োজনে বা ব্যাঙ্কেব স্বীয় স্বার্থে, ব্যাঙ্কেব যে কোন পরিচালককে বা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্মচারীকে অপসাবণ করিতে পাবিবে এবং প্রয়োজনবোধে যে কোন ব্যাঙ্কে অতিবিক্ত পবিচালকও নিয়োগ করিতে পাবিবে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজাবদেব কাযকালেব মেযাদও ঐ সংশোধনে স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মন্তব্য : ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন পাস হইবার সময় ইহার প্রব[ল] সমালোচনা হইয়াছিল। সে সময় বলা হইয়াছিল যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে অত্যন্ত অধিক ক্ষমতা

[illegible] রাষ্ট্রায়ত্ত [illegible] বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অভ্যন্তরীণ [illegible] করিয়া উহাদের [illegible] করিবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যাঙ্কজগতের [illegible] [illegible] ও ব্যাঙ্কফেলের ঘটনা উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পাওয়ায় ব্যাঙ্কসমূহের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবর্তিত উক্ত আইনের যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে।

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

RESERVE BANK OF INDIA

গঠন (composition): ১৯৩৪ সালে প্রণীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল ৫ কোটি টাকা পুঁজি লইয়া ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইহার প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ২,২০,০০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করেন। বাকি সমস্ত শেয়ার বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের নিকট বিক্রয় করা হয়। এইরূপে মূলত বেসরকারী শেয়ারহোল্ডারগণের ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহার জাতীয়করণ হয়। ভূতপূর্ব শেয়ারহোল্ডারগণকে ক্ষতিপূরণ দিয়া ভারত-সরকার ইহার সকল শেয়ার কিনিয়া লন। তিনটি কারণে ইহার জাতীয়করণ ঘটে—১. ইহার অধিকাংশ শেয়ার মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হস্তগত হইয়া পড়িতেছিল। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশংকা দেখা দিয়াছিল। ২. ইহার জাতীয়করণের ফলে সরকারের অর্থনীতিক ও অর্থ সংক্রান্ত নীতির অধিকতর সমন্বয় সম্ভব হইবে। ৩. ভারতের পরিকল্পনামূলক অর্থ-নীতির সাফল্যের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর যে অতিরিক্ত দায়িত্ব পড়িবে, তাহা যথাযোগ্য-ভাবে পালনের জন্য উহার জাতীয়করণ অত্যাবশ্যক।

ব্যবস্থাপনা (management): একটি কেন্দ্রীয় এবং চারিটি স্থানীয় বোর্ডের উপর ইহার ব্যবস্থাপনার ভার ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় বোর্ডের সদস্য ১৫ জন। ইহাদের সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত। ইহাদের একজন গভর্ণর ও তিন জন ডেপুটি গভর্ণর। ইহার প্রধান কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত। প্রত্যেক স্থানীয় বোর্ডের পাঁচজন সদস্য। ইহারাও সরকার কর্তৃক মনোনীত। কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় বোর্ডের সকল সদস্যই ৪ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হয়।

কার্যাবলী (functions): ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত কার্যাবলী পরিচালনা করিয়া থাকে।

১. **পত্রমুদ্রা** (notes) **প্রচলন** ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হিসাবে ইহা দেশে পত্রমুদ্রা প্রচার করে। ইহার জন্য পত্রমুদ্রা দপ্তর নামে ইহার একটি পৃথক দপ্তর আছে। ১৯৫৭ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইন অনুযায়ী বর্তমানে ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ ও ৮৫ কোটি টাকার বিদেশী পাওনা, মোট ২০০ কোটি টাকার ন্যূনতম জমার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে।

২. ইহা **কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ব্যাঙ্করূপে** কাজ করে। সরকারের আয় ও উদ্বৃত্ত অর্থ ইহার নিকট জমা থাকে। সরকারের হইয়া ইহা ঐ অর্থ ব্যয় করে ও সরকারী ঋণ পরিশোধ করে। প্রয়োজনমত সরকারকে ঋণ দেয়। সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া সরকারী ঋণ সংগ্রহ করে।

৩. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ব্যাঙ্কার** হিসাবে উহাদের আমানতের নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুসারে ব্যাঙ্কগুলি উহাদের চলতি আমানতের ৫-২০ শতাংশ ও স্থায়ী আমানতের ২-৮ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে।

ইহার পরিবর্তে উহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে নানাভাবে **ঋণ লইবার সুবিধা পায়।** **আপৎকালে** রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদের প্রয়োজনীয় **ঋণ** দেওয়ার **জন্য** প্রস্তুত থাকে।

৪. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ **কর্তৃক** প্রদত্ত **ঋণ নিয়ন্ত্রণ** করে। এই **জন্য** রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট, খোলাবাজারী কারবার, জমার অনুপাত পরিবর্তন, উপদেশ এবং **গুণগত** ও বিচারমূলক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রভৃতি অনুসরণ করে। ইহার উদ্দেশ্য টাকার অভ্যন্তরীণ মূল্য স্থির রাখা।

৫. **টাকার বহির্মূল্য** যাহাতে **স্থির রাখিবার জন্য** রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিদেশী মুদ্রার সহিত টাকার বিনিময় হার বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে সরকার-নির্দিষ্ট দরে **বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়** করে।

৬. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক **অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকাশ গৃহ** (clearing house)-রূপে কাজ করে। ইহার মারফত সহজেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মধ্যে দেনাপাওনা নিষ্পত্তি হইতে পারে।

৭. **কৃষিঋণের বিশেষভার** ইহার উপর প্রথম হইতেই ন্যস্ত হইয়াছিল। এজন্য ইহার একটি কৃষিঋণ দপ্তর আছে। ইহার মারফত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দেয়। সম্প্রতি সারাভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষার পরামর্শে ইহার অধীনে কৃষিঋণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও স্থিরীকরণ—এই দুইটি পৃথক তহবিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের জন্যও ইহা ঋণদান করিতেছে।

৮. সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক **ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পে** দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদে **ঋণদানের** জন্য নানারূপ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করিতেছে।

৯. ইহা ছাড়া মাসিক বুলেটিন, বাৎসরিক রিপোর্ট, বিবিধ সমীক্ষা পরিচালনা, অর্থনীতিক গবেষণাকার্য প্রভৃতির মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক **দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিক তথ্য দেশবাসী ও সরকারের নিকট উপস্থিত** করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করিতেছে ও সরকারী নীতি নির্ধারণে সাহায্য করিতেছে।

১০. পরিশেষে ইহা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানবিশেষের নিকট হইতে **বিনাসুদে আমানত** গ্রহণ **ও ভিন্নরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের** সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া উহাদের নিকট আমানতী হিসাব খুলিয়া এবং উহাদের **প্রতিনিধি** হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

ক্ষমতাসমূহ (powers) : ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ও উহার সংশোধনী এবং ১৯৫৬ ও ১৯৬৩ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনী দ্বারা সম্প্রতিকালে ব্যাঙ্ক-জগতের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিপুল ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। ১. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে অন্যান্য ব্যাঙ্ককে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য অনুমতি দান ও প্রত্যাহার করিতে পারে। ২. ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী তদারক ও ইহাদের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে পারে। ৩. উহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র এবং বিবরণ তলব করিতে পারে। ৪. উহাদের ঋণদান নীতি স্থির করিতে পারে। ৫. উহাদের জমার অনুপাত পরিবর্তন করিতে পারে। ৬. ব্যাঙ্করেট হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। ৭. ঋণের জামিনের 'মার্জিন' নির্ধারণ ও পরিবর্তন করিতে পারে। ৮. বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন্ উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হইবে বা হইবে না, বা কতটা দেওয়া হইবে তাহা স্থির করিতে পারে। ৯. অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারে। ১০. কোন ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইবার আবেদন করিলে তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন আবশ্যক হয়। ১১. ব্যাঙ্কসমূহের একীকরণের প্রস্তাব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন ছাড়া কার্যকর হয় না। ১২. ব্যাঙ্কগুলির

শাখা স্থাপন, কার্যালয়ের স্থান পরিবর্তন, প্রয়োজনীয় পুঁজি প্রভৃতি বিষয়েও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি আবশ্যক হয়। ১৩. বিশেষ ধরনের (ব্যাঙ্ক নহে এমন প্রতিষ্ঠান) বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর জন সাধারণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ ও তদুপরি প্রদত্ত সুদের হার, উহাদের হিসাব পত্র দাখিল করা এবং রেজিষ্ট্রীভুক্ত হওয়া সম্পর্কে নানাবিধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। এইগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যের মূল্যায়ন

EVALUATION OF THE WORKING AND ACHIEVEMENTS OF THE RESERVE BANK

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা খুব বেশি দিনের ঘটনা নহে। গত ৩০ বৎসর যাবৎ ইহার বিভিন্ন কার্যকলাপ বিচার করিলে আমরা ইহার নিম্নোক্ত সাফল্য ও ব্যর্থতার বিষয় জানিতে পারি—

ক. সাফল্য (achievements): ১. ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্কার হিসাবে প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করিয়া ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্রুত ও নামমাত্র ব্যয়ে অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার হ্রাস করিয়াছে (৭ ৮% হইতে ৩-৪ %), সুদের হারের অত্যধিক ওঠানামা বন্ধ করিয়াছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুদের হারের মোটামুটি সমতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ২. সরকারী ঋণ পরিচালনায় ইহা দক্ষতা দেখাইয়াছে। ৩ ব্যাঙ্ক-সমূহের কার্যাবলী ও নীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের বহু ত্রুটি দূর করিয়া ব্যাঙ্কফেলের প্রকোপ কমাইয়াছে ও ব্যাঙ্কব্যবস্থাকে অধিকতর সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী করিয়াছে। ৪. ব্যাঙ্কসমূহের কার্যাবলী ও ব্যাঙ্কঋণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারতের টাকার বাজারে নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ৫. নানাপ্রকার পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে দেয় নাই। ৬. ইহা কৃষিঋণ প্রসারে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে। ৭. সাম্প্রতিককালে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পে দীর্ঘ ও মাঝারি মেয়াদে ঋণদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত নানাপ্রকার সংস্থা ও কর্মসূচীতে উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ করিয়া দেশে শিল্পঋণের কাঠামো সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিয়াছে। ৮. টাকার বহিঃমূল্য বজায় রাখিতে সফল হইয়াছে। ৯. ভারতে বিল বাজার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী বাস্তব রূপায়ণে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ১০. উন্নয়নমূলক অর্থনীতির প্রয়োজন মিটাইতে সফল হইয়াছে। ১১. দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়া ব্যাঙ্কিং ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জনসাধারণ ও সরকারকে ওয়াকিবহাল করিয়াছে। সুতরাং এ সকল বিষয় বিবেচনা করিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছে বলা যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সকল ক্ষেত্রে সফল হইতে পারে নাই তাহা নিম্নোক্ত ঘটনাবলী হইতে বুঝা যায়।

খ. ব্যর্থতা (failures): ১. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, ইহা ভারতের পুরাতন দেশীয় ব্যাঙ্কারগণকে ইহার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনিয়া আধুনিক ও প্রাচীন—এই দুই-প্রকার ব্যাঙ্কব্যবসায়ের সমন্বয় ও সংহতি-সাধন করিতে পারে নাই। ইহার ফলে এখন পর্যন্ত ভারতের টাকার বাজার দুর্বল রহিয়া গিয়াছে। ২. ১৯৫১ সালের পূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণে যে দক্ষতা দেখাইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে। ৩. ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের পর ভারতে বহু ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহা বন্ধ করিতে বিশেষ উদ্যোগ লয় নাই। বরং সে সময় ইহা রক্ষণশীল মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। উহাতে ব্যাঙ্কসংকট আরও

[illegible] হইয়াছে। ৪. এতদিন ধরিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষিঋণদান কার্যে [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৫১-৫২ সালেও সারা ভারত গ্রামীণঋণ সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সমবায় সমিতি, মারফত প্রদত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ কৃষকদের মোট প্রয়োজনের ৩ শতাংশ মাত্র। ৫. ১৯৪৯ সাল হইতে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ও উহার বিভিন্ন সংশোধনী দ্বারা ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণেব জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত অনেক ব্যাঙ্ক ত্রুটিমূলক ভাবে কায পবিচালনা ও ঋণদান করিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ সকল অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বন্ধ করিতে পারিতেছে না। ৬. ঋণনিয়ন্ত্রণেব জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে নানাবিধ ক্ষমতা দেওয়া সত্ত্বেও ইহা মূল্যস্তব স্থির রাখিতে অতীতেও ব্যর্থ হইযাছে, এখনও সম্পূর্ণ সফল হইতেছে না। ৭. ভাবতে অবস্থিত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে (যাহা বিনিময় ব্যাঙ্ক নামে পরিচিত) নিয়ন্ত্রণে আনিলেও ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসাযে আজ পর্যন্ত উহাদের প্রভাব খর্ব করিতে পারে নাই। ৮. ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্কাব হিসাবে উহাদের আপৎকালে প্রযোজনীয় ঋণ সরবরাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতীতে অনিচ্ছা প্রদর্শন কবিয়া অনেক ব্যাঙ্কের সর্বনাশের কারণ হইয়াছে।

মন্তব্য (comments): তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ত্রুটিগুলি অধিকাংশই পবিকল্পনার পূর্ব যুগের। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কসমূহের উন্নয়নের ও সকল প্রকার ঋণেব সম্প্রসারণের সহাযতামূলক মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে অতীতের অনেক ত্রুটি দূরীভূত হইতেছে। বর্তমানে নানাবিধ ক্ষেত্রে ইহার উদ্যোগ ও সাফল্য ভারতেব ব্যাঙ্কব্যবস্থার প্রসার ও ব্যাঙ্কিং কার্যাবলীর মান যথেষ্ট উন্নত কবিযাছে সন্দেহ নাই।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ

RESERVE BANK AND CREDIT CONTROL

স্বল্পমেযাদী ঋণেব অভাবে যাহাতে দেশেব ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ না হয়, অথবা অত্যধিক ঋণের ফলে যাহাতে অযথা মূল্যস্তব বৃদ্ধি না পায়, সেজন্য ব্যাঙ্কঋণের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। কিন্তু অতীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানাকারণে ইহাতে বিশেষ সফল হয় নাই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব পরবর্তীকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীযকরণ ও ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের পর হইতে ধীবে ধীরে ভারতেব ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাব উন্নতি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ঘটিযাছে। ইহার ফলে পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের যুগে, বিশেষত পরিকল্পনার বিগত দশকে ভারতে ব্যাঙ্কিং ঋণ নিয়ন্ত্রণেব ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইযাছে।

ক. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহ (methods of credit control exercised by the Reserve Bank): রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে যে সকল অস্ত্র রহিয়াছে তাহা হইল—১. ব্যাঙ্করেট পদ্ধতি ২. খোলাবাজারী কারবার। ৩. জমার অনুপাতের পরিবর্তন। ৪. অনুরোধ। ৫. বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। ৬. বিলবাজার কর্মসূচীতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক গৃহীত ঋণের সীমা নির্দিষ্টকরণ এবং ৭. নির্দিষ্ট ব্যাঙ্করেটে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির গ্রহণযোগ্য ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্টকরণ। সুতরাং বলা যায় আধুনিক দেশগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সকল পদ্ধতিতে ঋণনিয়ন্ত্রণ করে তাহার সমস্ত উপায়ই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে আছে।

খ. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি (recent credit control policy of the Reserve Bank): পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের দ্বারা যাহাতে

লক্ষ্য অনুযায়ী দেশের অর্থনীতিক কার্যকলাপের বৃদ্ধি ঘটে, সেজন্য দেশের টাকার মোট যোগানও পরিকল্পিতভাবে বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহাতে ব্যাঙ্কসমূহের ঋণের প্রসারে সহায়তা আবশ্যক। তেমনি আবার ঋণের যোগান যাহাতে অতিরিক্ত হইয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি না করে সেজন্যও সতর্ক হইতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতিব্যয নীতি, বিরাট পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ প্রভৃতি কারণে ১৯৫০-৫১ সাল হইতেই দেশে টাকা ও ব্যাঙ্কঋণের যোগান বাড়িতেছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে দেশে টাকার মোট যোগান ১৯৮.৭ কোটি টাকা বাড়ে; ইহার মধ্যে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ ৪৬.৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে টাকার মোট যোগান ৭২২.৪ কোটি টাকা বাড়িয়াছে; ইহার মধ্যে ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ ১৮৮.৬ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাস অবধি প্রায় ১৪ বৎসরে, দেশে টাকার মোট যোগান ১৯৭৫ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৩৮৪২ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। ব্যাঙ্কঋণের পরিমাণ ৬২০ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ১৭১৪ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার আরম্ভে দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমাইবার জন্য ১৯৫১ সালে ব্যাঙ্ক-রেট শতকরা ৩ টাকা হইতে ৩½ টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। ইহাতে ঋণের পরিমাণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার সহিত খোলাবাজারী কারবারও চালিত হয়। অংশত এজন্য, প্রথম পরিকল্পনার শেষ দিকে মূল্যস্তরের নিম্নগতি দেখা যায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অর্থনীতিক কার্যকলাপ যথেষ্ট পরিমাণে প্রসারের লক্ষ্য গৃহীত হয়। এজন্য পূর্বেকার পত্রমুদ্রা প্রচলনের আনুপাতিক জমার পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া ন্যূনতম জমার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় (১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন) ও যাহাতে ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে সেদিকে যত্ন লওয়া হয়। অপর দিকে, যাহাতে ঘাটতিব্যয নীতির দরুন টাকার যোগান অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতির চাপ তীব্র না করিতে পারে সেজন্যও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সতর্কতা গ্রহণ করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনী দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত পরিবর্তনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কগুলির চলতি আমানতের জমার অনুপাত ৫ হইতে ২০ শতাংশ পর্যন্ত ও স্থায়ী আমানতের জমার অনুপাত ২ হইতে ৮ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা পায়। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের '৬২ সালের সংশোধন দ্বারা চলতি ও স্থায়ী উভয় আমানতের উপরে ন্যূনপক্ষে ৩ শতাংশ জমা রাখার আইন করা হয়। প্রয়োজনবোধে ঐ ৩ শতাংশ ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসর হইতেই যখন মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি আরম্ভ হয় তখন হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহা দমন করিবার জন্য একে একে উহার সকল ঋণ নিয়ন্ত্রণ অস্ত্রই প্রয়োগ করে। ১. ১৯৫৭ সালে ব্যাঙ্করেট ৩½% টাকা হইতে বাড়াইয়া ৪% টাকা করা হয়। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারীতে উহাকে ৪½% করা হয়। আবার ১৯৬৪ সালে উহাকে ৫% করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা হিসাবে ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পুনরায় ব্যাঙ্করেট বাড়াইয়া ৬% করা হইয়াছে। ২. খোলাবাজারী কারবার চালনা করা হয়। ১৯৬৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৭২ কোটি টাকার ঋণপত্র ক্রয় করে এবং ৫০ কোটি টাকার ঋণপত্র বিক্রয় করে।

৩. ইহা ছাড়া প্রবলভাবে অনুসৃত হয় বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি। ১৯৫৬ সালের মে মাসে ধান ও চাউলের জামিনে ৫০,০০০ টাকার অধিক ঋণ না দিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

[illegible] ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেয়। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে গম, বজরা, [illegible] ঋণ সংকোচের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে চিনির জামিনে ব্যবসায়ীদের ঋণদানের ক্ষেত্রে 'মার্জিন' রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে মার্জিন বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে ইহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিনাবাদামের ক্ষেত্রে বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হয়। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে ইহা তুলাবীজ বাদে অন্যান্য তৈলবীজের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে শেয়ারের জামিনে যাহাতে অত্যধিক ঋণ না দেওয়া হয় সে জন্য শেয়ারের মার্জিন ৫০ শতাংশ করা হয়। বদ্‌লা কারবারে ঋণদান নিষিদ্ধ হয়। জামিন ছাড়া ঋণের সীমা নির্দিষ্ট হয়। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাটের মূল্যস্তর বৃদ্ধি রোধের জন্য এক্ষেত্রে ঋণদানে 'মার্জিন' প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে পাটজাত দ্রব্যের উপর ঋণের মার্জিন প্রত্যাহার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু কাঁচাপাটের উপর ঋণের মার্জিন বজায় রাখা হইয়াছে। ৪. ইহা ছাড়া ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত পরিবর্তন করে। ইহাই ভারতে জমার অনুপাত পরিবর্তনের প্রথম ঘটনা। সে সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলিকে উহাদের ন্যূনতম জামিনের উপর, অতিরিক্ত আরও এক-চতুর্থাংশ জমা রাখিতে বলে। পরে উহা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে অতিরিক্ত জমার পরিমাণ কমান হয় ও অবশেষে ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে উহা প্রত্যাহার করা হয়। ৫. ১৯৬০ সালের বিলবাজার কর্মসূচীতে ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণদানের সুযোগ খানিক পরিমাণে সংকুচিত করা হয়। ৬. ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে চড়াহারে ঋণ গ্রহণের ফলে ১৯৬০ সালে অক্টোবর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদের প্রাপ্তব্য ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট (quota) করে। ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণের (quota) ঋণ ব্যাঙ্কগুলি প্রচলিত ব্যাঙ্ক রেটেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাইবে। 'কোটা' ছাড়াইয়া গেলে প্রথম ২০০% পর্যন্ত অতিরিক্ত ১% হারে এবং তৎপরবর্তী ঋণের জন্য ২% হারে সুদ আদায় করা হয়। ১৯৬৩ সাল হইতে "দুই-স্তর" সুদের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী তপসিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি নিজ নিজ জমার ৫০% পর্যন্ত ৫% সুদে ও অপর ৫০%, ৬½% সুদে ঋণ লইতে পারে। ইহা ছাড়াও ১৯৬০ সালে ব্যাঙ্কগুলিকে সকল প্রকার দাদনের উপর ৫% হারে সুদ লইতে এবং ঋণের পরিমাণ কমাইতে বলা হয়। ৭. ইহা ছাড়া ঋণ সংকোচনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫৭ সাল হইতে বারংবার ব্যাঙ্কগুলিকে অনুরোধ জানাইতেছে।

সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একদিকে যাহাতে ঋণের যোগান অত্যধিক না হয় সেদিকে যেমন দৃষ্টি রাখিয়াছে এবং নানাবিধ উপায়ে ঋণনিয়ন্ত্রণ কার্যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে যাহাতে ঋণের কঠোর নিয়ন্ত্রণের ফলে আবার ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখিয়াছে। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যেমন কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারি করিয়াছে, তেমনি অবস্থার পরিবর্তনের সহিত তাহা দ্রুত প্রত্যাহারও করিয়াছে। ফলে, বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি যথেষ্ট স্থিতিস্থাপকতা লাভ করিয়াছে। ইহাতে ঋণের অত্যধিক প্রসারে যেমন বাধা দেওয়া হইতেছে, তেমনি উপযুক্ত প্রসারে সাহায্যও করা হইতেছে। সেজন্য উহার বর্তমান ঋণ নীতিকে 'টাকার নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণের' নীতি (policy of controlled monetary expansion) বলা হয়। প্রধানতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই ঋণ নীতি রচিত ও অনুসৃত হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও ঐ নীতিই অনুসৃত হইতেছে। কারণ, যে প্রয়োজনের তাগিদে এই নীতি গৃহীত হইয়াছিল আগামী বহু বৎসর ধরিয়া সেই প্রয়োজন ভারতীয় অর্থনীতিতে থাকিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ

RESERVE BANK AND CONTROL OF THE MONEY MARKET

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্করূপে ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হয়। টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের যে সকল কার্য ক্ষমতা থাকা উচিত বলিয়া তৎকালে মনে করা হইত উহার সকলই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অর্পণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত, ভারতের টাকার বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই বলিলে ভুল হইবে না। অবশ্য ইহার কতকগুলি কারণ ছিল। ১. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখন সবেমাত্র স্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই ইহা অপেক্ষা পুরাতন ও অভিজ্ঞ। সুতরাং উহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নেতৃত্ব পছন্দ করে নাই। ২. ভারতের ব্যাঙ্কজগতে ছিল বিদেশী প্রাধান্যপূর্ণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক। ইহা ভারতের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছিল। ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিত। ৩. তখন টাকার বাজার ছিল দ্বিধাবিভক্ত ও অসংগঠিত। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে টাকার বাজারে নিজের কর্তৃত্ব কায়েম করা সম্ভবপর হয় নাই। ৪. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত নিজেদের নিকট অধিক নগদ টাকা রাখে ও প্রয়োজন হইলে অধিকাংশ সময়ই পরস্পরের নিকট হইতে ঋণ করে। ইহাতে তাহাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে হয় না। ৫. বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অধিকাংশই আকারে ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও স্বল্প সম্বলযুক্ত। ৬. সর্বোপরি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতিও ছিল রক্ষণশীল। টাকার বাজারে ঋণপত্রেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। ইংলণ্ডের মত বাণিজ্যিক বিল এখানে জনপ্রিয় হয় নাই।

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবশ্য ভারতের টাকার বাজারের অপর অংশ যেমন সাহুকার, পোদ্দার প্রভৃতি দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ এখনও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে নাই। কিন্তু এই ত্রুটি বাদে, টাকার বাজারের অপর অংশ অর্থাৎ আধুনিক সংগঠিত টাকার বাজারের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও উহার উদ্যোগে ভারতের আধুনিক সংগঠিত টাকার বাজারের বিস্তার ও দেশীয় টাকার বাজারের সংকোচন ঘটিয়াছে। ইহার কারণ নিম্নরূপ :

১. ১৯৪৮ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ দ্বারা ইহা সরকারের অঙ্গীভূত হইলে, তাহাতে ব্যাঙ্কব্যবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফত সরকারের হস্তক্ষেপ সূচিত হয়। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

২. ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ও তৎপরবর্তী বহু সংশোধন দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বর্ধিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমতি-পত্র দান হইতে আরম্ভ করিয়া উহাদের নীতি নির্ধারণ, কার্যাবলীর তদারক, কাগজপত্র পরীক্ষা, শাখাস্থাপন, স্থানপরিবর্তন, এমনকি একীকরণ ও কারবার গুটান পর্যন্ত—রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত হয়। এই আইনের পরবর্তী সংশোধনীগুলির দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা উহাদের অভ্যন্তরীণ পরিচালনা পর্যন্ত বিস্তার করা হইয়াছে। ফলে ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-গুলি অনেকাংশে ত্রুটিমুক্ত ও শক্তিশালী হইয়াছে।

৩. ১৯৫২ সালে বিলবাজার কর্মসূচী গ্রহণের পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণের পরিমাণ বাড়িতেছে। দেশে বাণিজ্যিক ঋণের প্রসার ঘটিতেছে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

৪. ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দ্বারা স্টেট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পুরাতন ক্ষমতাশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্তর্ধান ও উহার সহায়ক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটায় টাকার বাজারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৫. পরিশেষে ১৯৫১ সাল হইতে ব্যাঙ্করেটের ব্যবহার, বিচারমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ প্রভৃতি ভারতের টাকার বাজার ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালে জমার অনুপাত পরিবর্তনের ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তকে শক্তিশালী করিয়াছে।

৬. পরিশেষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্থিতিস্থাপক ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সফলভাবে ব্যাঙ্কঋণ ও টাকার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে টাকার বাজারের সর্বময় নেতার পদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বিলবাজার কর্মসূচী
THE BILL MARKET SCHEME

'বিল' কথাটির দ্বারা বাণিজ্যিক বিল (Commercial bill) বা বাণিজ্যিক হুণ্ডি বুঝায়। সাধারণত ইয়োরোপীয় দেশে পণ্যসামগ্রীর বাকি বেচাকেনায়, বিক্রেতা একটি কাগজে পণ্যের মূল্যবাবদ প্রাপ্য টাকা ক্রেতা কবে দিবে তাহা লিখিয়া ক্রেতাকে দিয়া সই করাইয়া লয়। ইহাতে উপযুক্ত স্ট্যাম্প লাগাইয়া লইলে, ইহা প্রাপ্য টাকার আইনসম্মত প্রতিশ্রুতি বলিয়া গণ্য হয়। বিক্রেতা ইহা নিজের নিকট রাখিয়া দিয়া নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার নিকট উপস্থিত করিয়া প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে পারে। কিংবা উহার পূর্বেই টাকার প্রয়োজন হইলে বিক্রেতা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট বা বিলের কারবারিগণের নিকট উহা বিক্রয় করিতে (ইহাকে বিল বাট্টা করা বলে) পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ইহা কিনিয়া লইয়া ব্যবসায়িগণকে ঋণ দেয়। পরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের টাকার টান পড়িলে ঐ বিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পুনরায় বিক্রয় (অর্থাৎ পুনর্বাট্টা) করিতে পারে। এইরূপে বাণিজ্যিক বিল পুনর্বাট্টা করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও উহাদের মারফত ব্যবসায়জগৎকে স্বল্পমেয়াদী ঋণ যোগান দেয়। পৃথিবীর মধ্যে লণ্ডনের বিলবাজার সর্বাপেক্ষা উন্নত। ইহা লণ্ডনের টাকার বাজারকে শক্তিশালী করিয়াছে ও ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

প্রয়োজনীয়তা (need): ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এইরূপ বিল ব্যবহৃত হয় না। এদেশে হুণ্ডি নামে যাহা প্রচলিত তাহা বাণিজ্যিক বিল হইতে ভিন্ন। বাণিজ্যিক বিল ও বিলের বাজারের অভাবে ভারতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানে অসুবিধা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকেও বিলের মত ঋণপত্রের অভাবে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণ দিতে পারে না। ফলে ভারতের টাকার বাজার অপরিসর রহিয়াছে। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতে বিলবাজার সৃষ্টি করিবার জন্য একটি কর্মসূচী প্রণয়ন করে এবং ১৯৫২ সাল হইতে তাহা কার্যকর করে। ঐ সময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহার দরুন যাহাতে ব্যবসায়িগণের স্বাভাবিক ঋণের প্রয়োজন মিটাইতে অসুবিধা না হয় সে জন্যও ঐ সময়ে বিল-বাজার কর্মসূচী প্রবর্তিত হয়।

কর্মসূচীর বিবরণ (The Scheme): এই কর্মসূচীতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি উহাদের খাতকদের ঋণ দিতে গিয়া তাহাদের নিকট হইতে যে সকল চাহিবামাত্রদেয় হুণ্ডি (demand promissory notes) লয়, উহারা নিজেরা ঐগুলির ভিত্তিতে সমপরিমাণ টাকার ৯০ দিনের

মেয়াদী হুণ্ডি (usance promissory note) প্রস্তুত করিয়া ঐ [illegible] জামিন হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিয়া স্বল্পমেয়াদী ঋণ লইয়া থাকে। ইহাদের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট অপেক্ষা ½% কম সুদ আদায় কবিবে। চাহিবামাত্রদেয় হুণ্ডিকে এইরূপে মেয়াদী হুণ্ডিতে পরিণত করিতে স্ট্যাম্প খরচ বাবদ ব্যাঙ্কগুলির যে ব্যয় হইত, প্রথম অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার অর্ধেক বহন করে।

বাস্তব রূপায়ণ (implementation) ঃ প্রথমে সীমাবদ্ধভাবে ইহা প্রবর্তিত হয়। যাহাদের আমানত অন্তত ১০ কোটি টাকা সেই ব্যাঙ্কগুলিকে ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া নিয়ম করা হয় যে, ২৫ লক্ষ টাকার কমে কোন ব্যাঙ্ক এইভাবে ঋণ লইতে পারিবে না, এবং বিল প্রতি টাকাব পরিমাণ অন্তত ১ লক্ষ টাকা হওয়া চাই। ১৯৫৪ সালে অবশ্য সকল তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ককেই ইহাতে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় এবং ঋণের ন্যূনতম পরিমাণ কমাইয়া ১০ লক্ষ টাকা ও প্রতি বিলের ন্যূনতম মূল্য কমাইযা ৫০ হাজার টাকা করা হয়। বিলবাজারের জনপ্রিযতা বাড়িলে ১৯৫৬ সাল হইতে স্বল্পতর সুদের হার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্ট্যাম্প খরচের অর্ধেক বহনের সুবিধাগুলি প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৫৮ সালে রপ্তানি প্রসারে সহাযতার জন্য রপ্তানি বিলগুলিকেও বিলবাজার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৬০ সালে এই ব্যবস্থায ১৯৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছে।

সমালোচনা (criticism) ঃ ইহার সমালোচনায বলা হয় যে,—১. ইহা বিলবাজার কর্মসূচী নামে অভিহিত হইলেও আসলে ইহাতে মোটেই বিল পুনর্বাট্টা করা হয় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুধু মেয়াদী হুণ্ডির জামীনে ঋণ দেয মাত্র। ২. দেশীয় ব্যাঙ্কারগণকে ইহার অঙ্গীভূত করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা হয নাই। ইহাতে বাজারটি পঙ্গু হইয়াছে। ৩. বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি ইহার অত্যধিক সুবিধা লইতেছে। তুলনায় ক্ষুদ্র ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি বঞ্চিত হইতেছে। ৪. স্বল্প হাবে সুদ আদায় ও স্ট্যাম্প খরচের অর্ধেক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহন করিয়া যে সুবিধা দিযাছিল তাহা প্রত্যাহার কবা উচিত হয নাই। ৫. বিলবাজার ঋণের সুবিধা দেওয়ার পূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবেদনকারী ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান লয় তাহাতেও আপত্তি করা হইয়াছে। এজন্য বহু ব্যাঙ্ক এই সুবিধা লইতে উৎসুক নয়।

সম্ভাবনা (prospect) ঃ উপরোক্ত ত্রুটিগুলি দূব করা হইলে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি এবং অর্থ স্থানান্তবকরণেব আরও উন্নতি ঘটিলে এবং তৎসহ গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিংব্যবস্থার প্রসার সম্পূর্ণ হইলে বিলবাজার কর্মসূচী পূর্ণাঙ্গরূপে রূপায়িত হইয়া ভারতের টাকার বাজারকে সম্পূর্ণ করিবে সন্দেহ নাই।

আমানত বীমা করপোরেশন
DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা (objectives, aims and necessity) ঃ ১. কোন ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইলে তাহার দরুন আমানতকারিগণ বিশেষত ছোট আমানত-কারিগণ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য ব্যাঙ্ক আমানতের বীমা করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। ২. এই পন্থায় আমানতকারিগণের স্বার্থ রক্ষিত হইলে ব্যাঙ্কের উপর তাহাদের আস্থা বাড়িবে, ব্যাঙ্ক হইতে আতঙ্কিত আমানতকারিগণ দ্বারা অহেতুক গুজবে আতঙ্কিত হইয়া টাকা তোলা বন্ধ হইবে এবং সকল ব্যাঙ্কের সুশৃঙ্খল উন্নতি ঘটিবে। ৩. ইহার ফলে জনসাধারণের ব্যাঙ্কে টাকা রাখিবার অভ্যাস বাড়িবে। ৪. তাহাতে দেশের সর্বত্র ব্যাঙ্কের

...স্থাপন দ্বারা ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর ব্যক্তির সঞ্চয় ব্যাঙ্কগুলির নিকট... ব্যাঙ্কের সম্বল ও শক্তি বাড়িবে। ৫. ফলে ব্যাঙ্কগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবসায় বাণিজ্যের সহায়তা করিতে পারিবে। এই সকল সুবিধার জন্য ব্যাঙ্ক আমানতের বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মন্দার আঘাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপুল সংখ্যক ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আমানতকারিগণের স্বার্থ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে জন্য ১৯৩৪ সালে তথায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আমানত বীমা করপোরেশন স্থাপিত হয়। উহার পর হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতেও বারংবার ব্যাঙ্কবিপর্যয়ের দরুন এই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব বিভিন্ন মহল হইতে উপস্থাপিত হয়। ১৯৫০ সালের গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি নীতিগতভাবে ইহার প্রবর্তন সমর্থন করেন। ১৯৫৪ সালে বেসরকারীক্ষেত্রে ঋণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত শ্রফ কমিটি এইরূপ একটি করপোরেশন স্থাপনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কিন্তু মোটামুটিভাবে ১৯৫৪ সাল হইতে বাঞ্ছনীয় পথে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণ ঘটিতে থাকায় ব্যাঙ্কফেলের ঘটনা হ্রাস পায় ও এই প্রস্তাব আর সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। সরকার ছোটখাটো স্বল্পসম্বল ব্যাঙ্কগুলির একীকরণ দ্বারা বৃহত্তর আয়তনের ব্যাঙ্কগঠনেই উৎসাহ দিতে থাকেন। কিন্তু ১৯৬০ সালে দুইটি ব্যাঙ্ক কারবার গুটাইতে বাধ্য হইলে এবং সাময়িক-ভাবে হইলেও ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ ইহার প্রভাবে হ্রাস পাইলে পুনরায় আমানত বীমার প্রস্তাব ওঠে। এইরূপ বিক্ষিপ্ত দুই-একটি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলেও ইহাতে সামগ্রিকভাবে ব্যাঙ্কের অগ্রগতি ব্যাহত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া অবশেষে সরকার ব্যাঙ্কব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য ভারতে একটি আমানত বীমা করপোরেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

স্থাপনা (formation): ১৯৬১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর লোকসভা আমানত বীমা করপোরেশন আইন পাস করে। ৭ই ডিসেম্বর উহা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী উক্ত আইন অনুযায়ী আমানত বীমা করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে।

বৈশিষ্ট্য (features): ১. পুঁজি ও পরিচালনা (capital and management): ইহার অনুমোদিত পুঁজির পরিমাণ এক কোটি টাকা। ইহার সমস্তই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিয়াছে। ইহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৫ কোটি টাকা ঋণ করিবার ক্ষমতা করপোরেশনকে দেওয়া হইয়াছে। করপোরেশনের পরিচালনার ভার ৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিচালক সভার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ইহার চেয়ারম্যান। উঁহাদের কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দুইজন বেসরকারী সদস্য। বেসরকারী সদস্যদের কার্যকাল ৪ বৎসর। করপোরেশনের দৈনন্দিন কার্যপরিচালনার ভার একটি কার্যকরী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। ইহা পরিচালক সভা কর্তৃক নিযুক্ত হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ করিয়া সরকার যে নীতি স্থির করিবে কার্যক্ষেত্রে করপোরেশন তাহাই অনুসরণ করিবে।

২. **কর্মসূচী (The Scheme):** সংক্ষেপে ভারতের আমানত বীমা করপোরেশনের কার্যসূচীটি এই—

ক. আমানত বীমা করপোরেশনের প্রতিষ্ঠাকালে ভারতে কার্যরত সকল ব্যাঙ্ককেই করপোরেশনে নাম রেজিস্ট্রি করিয়া যোগদান করিতে দেওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে নূতন ব্যাঙ্ক-গুলিকেও একই ভাবে যোগ দিতে দেওয়া হইবে।

[illegible] ব্যাঙ্কের প্রত্যেক আমানতকারীর [illegible] আমানতের দায় করপোরেশন গ্রহণ করিবে। আমানতকারিগণের নিকট ব্যাঙ্কের কোন পাওনা থাকিলে তাহা বাদ দিয়া তাহাদের বীমাযোগ্য আমানতের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে। অবশ্য করপোরেশন প্রয়োজন মনে করিলে বীমাযোগ্য আমানতের সীমা বাড়াইতে পারে।

গ. কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের আমানত, কোন বিদেশী সরকারের আমানত ও ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর আমানত করপোরেশনের নিকট বীমা করা যাইবে না।

ঘ. প্রতি ১০০ টাকার আমানত বীমার জন্য বৎসরে ১৫ পয়সা পর্যন্ত প্রিমিয়াম আদায়ের ক্ষমতা করপোরেশনকে দেওয়া হইলেও, বর্তমানে উহা প্রতি ১০০ টাকার বীমার উপর বৎসরে ৫ পয়সা প্রিমিয়াম ধার্য করিয়াছে। ব্যাঙ্কগুলি বৎসরে চারিটি কিস্তিতে করপোরেশনকে প্রিমিয়াম জমা দিবে। সময় মত জমা না দিলে ব্যাঙ্কগুলির উপর অনধিক ৮% হারে করপোরেশন সুদ আদায় করিবে।

ঙ. কোন ব্যাঙ্কের উপর কারবার গুটাইবার নির্দেশ জারি হইলে বা উহার অবলোপক (liquidator) নিযুক্ত হইলে অনধিক তিন মাসের মধ্যে তাহাকে ঐ ব্যাঙ্কের আমানতকারিগণ ও তাহাদের আমানতের পরিমাণের (উক্ত আমানতকারিগণের নিকট ব্যাঙ্কের কোন পাওনা থাকিলে তাহা বাদে) একটি তালিকা আমানত বীমা করপোরেশনের নিকট পেশ করিতে হইবে। এই তালিকা পেশের অনধিক দুই মাসের মধ্যে আমানত বীমা করপোরেশন আমানতকারিগণকে অনধিক ১৫০০৲ টাকা পর্যন্ত আমানতের টাকা প্রত্যর্পণ করিবে।

৩. আমানত বীমা করপোরেশনের তহবিল ও লগ্নী (funds and investments) : আমানত বীমা করপোরেশনের দুইটি তহবিল থাকিবে। একটি আমানত বীমা তহবিল (Deposit Insurance Fund) এবং অপরটি সাধারণ তহবিল (General Fund)। ইহাদের অর্থের একাংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা থাকিবে। বাকি অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারের হুণ্ডি, স্টক ও শেয়ারে লগ্নী করা হইবে।

৪. আমানত বীমা করপোরেশনের ক্ষমতা (Powers) : ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলীর তদারক ও কাগজপত্রাদি পরীক্ষা করিতে পারে বলিয়া আমানত বীমা করপোরেশনকে আর এই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। তবে করপোরেশনের অনুরোধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বীমাকৃত ব্যাঙ্কগুলি সম্পর্কে সরেজমীনে তদন্ত করিয়া প্রয়োজনীয় রিপোর্ট সরবরাহ করিতে পারে। আমানত বীমা করপোরেশনকে অধীনস্থ ব্যাঙ্ক হইতে যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য দাবি করিবার ক্ষমতা এবং নিজ কার্য-পরিচালনার প্রয়োজনে যে কোন বীমাকৃত ব্যাঙ্কের যে কোন কাগজপত্র পরীক্ষার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া করপোরেশনকে বীমাকৃত ব্যাঙ্কগুলির বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত তথ্যাদি আদান-প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

সম্পাদিত কার্য (working) : বর্তমানে (১৯৬৪ সালে) ২৪২টি ব্যাঙ্ক এই করপোরেশনের আমানত বীমা পরিকল্পনার অন্তর্গত রহিয়াছে। পাঁচটি ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে, পরিকল্পনা অনুযায়ী উহাদের বীমা সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব করপোরেশনকে পালন করিতে হইয়াছে। গোয়া, দমন, দিউ ও পণ্ডিচেরীর ব্যাঙ্কগুলিও বর্তমানে আমানত বীমা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

মন্তব্য (Comments) : আমানত বীমা করপোরেশন প্রতিষ্ঠা ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইহার দ্বারা বহু আলোচিত ও প্রতীক্ষিত একটি কাম্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্যাঙ্কব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে। ইহা ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারিগণের অবিশ্বাস দূর করিয়া জনসাধারণের মধ্যে উহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিবে। ক্ষুদ্র আমানত-

[illegible] করিয়া আমানত বীমা করপোরেশন একাধারে আমানতকারী ও ব্যাঙ্কগুলির মঙ্গল বিধান করিবে। ইহাতে ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী আরও সতর্কভাবে পরীক্ষিত হইবে বলিয়া ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির অবশিষ্ট ত্রুটিগুলিও ইহাতে দূরীভূত হইতে পারিবে। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, আমানত বীমা করপোবেশনের প্রতিষ্ঠা ব্যাঙ্কফেল অথবা ব্যাঙ্কসঙ্কটের মহৌষধ নহে। ইহা ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলী ত্রুটিমুক্ত ও আমানতকারিগণের স্বার্থ-রক্ষা করে মাত্র। ব্যাঙ্কজগতের সংকট অর্থনীতিক তেজীমন্দীর উপর নির্ভরশীল। উহার সমাধান না হইলে ব্যাঙ্কসংকট ও তদ্দরুন ব্যাঙ্কফেল বন্ধ করা করপোবেশনের সাধ্যাতীত। তবে ভারতে ইহার প্রবর্তনের দ্বাবা বর্তমানে প্রতি ৫ জন আমানতকারীর মধ্যে ৪ জনের আমানত ও মোট ব্যাঙ্ক আমানতের ২৪ শতাংশ নিরাপদ করা হইল। ভাবতের মত স্বল্পোন্নত দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ইহা কম লাভ নহে।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

STATE BANK OF INDIA

১৯৫১-৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব কৃষিঋণ দপ্তবেব উদ্যোগে ভাবতের গ্রামীণঋণ ব্যবস্থার অনুসন্ধান ও উহাব উন্নতিব পবামর্শ দেওয়ার জন্য সারা ভাবত গ্রামীণঋণ সমীক্ষা কমিটি নামে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটি গ্রামীণঋণ কাঠামোব পুনর্গঠন করিয়া একটি সুসংবদ্ধ ঋণ কাঠামো প্রতিষ্ঠার সুপারিশ কবে। উহার অঙ্গ হিসাবে ভারতেব গ্রামাঞ্চলে আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসার কবিতে বলা হয় এবং সে কার্যেব ভাব লইবাব জন্য বাষ্ট্রীয মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় একটি বৃহৎ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সুপাবিশ কবা হয়। এজন্য ভারতের সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীযকরণ কবিতে বলা হয়। ইতঃপূর্বে বিভিন্ন সমযে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীযকবণেব প্রস্তাব উত্থিত হইলেও গৃহীত হয নাই। কিন্তু এবাব সরকাব এই প্রস্তাব গ্রহণ কবেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করিযা ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই স্টেট ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।

গঠন (composition) : স্টেট ব্যাঙ্ক আইন অনুযাযী ২০ কোটি টাকা অনুমোদিত পুঁজি ও ৫·৬ কোটি টাকা আদায়ীকৃত পুঁজি লইযা ১৯৫৫ সালেব ১লা জুলাই হইতে স্টেট ব্যাঙ্ক কার্য আবম্ভ কবে। ইহার পরিচালনা ভাব ২০ জন সদস্য লইযা গঠিত একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের উপর ন্যস্ত। তন্মধ্যে বিজার্ভ ব্যাঙ্কেব পরামর্শ লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ইহাব সভাপতি ও সহসভাপতি; কেন্দ্রীয় সবকাবেব অনুমোদনে নিযুক্ত ২ জন ব্যবস্থাপক-পবিচালক (Managing Directors); রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন কবিয়া মোট ২ জন সদস্য; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পবামর্শ লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও অন্যান্য স্বার্থের প্রতিনিধি ৮ জন সদস্য; এবং অন্যান্য শেয়ার-হোল্ডারগণ কর্তৃক নির্বাচিত বাকি ৬ জন সদস্য আছে। ইহা ছাডা বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজে ইহার একটি করিয়া স্থানীয বোর্ড আছে।

কার্যাবলী functions) : সংক্ষেপে স্টেট ব্যাঙ্কেব কার্যাবলী নিম্নরূপ—

১. ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পে ঋণ দান করিযা ভূতপূর্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কার্যধারা অক্ষুণ্ণ রাখা। ২. দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসারে প্রবলভাবে সহাযতা করা। এজন্য ১৯৬০ সালের মধ্যে ইহা স্বয়ং গ্রামাঞ্চলে নূতন ৪০০ শাখা স্থাপনের লক্ষ্য গ্রহণ করে। ৩. গ্রামাঞ্চলের সঞ্চয় সংগ্রহের চেষ্টা করা। ৪. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থাদি স্থানান্তরের জন্য

[illegible] সুবিধা দান করা। ৫. গ্রামাঞ্চলে ঋণব্যবস্থা [illegible] শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে কার্য করা এবং এজন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি ও মজুদকরণ ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ সাহায্য দান করা। ৬. ক্ষুদ্র শিল্পের ঋণদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ৭. যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যালয় নাই তথায় উহার প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করা।

কার্যকলাপ ও সাফল্যের বিবরণ (working & achievements) : বর্তমান-কাল পর্যন্ত ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ ও সাফল্যের আলোচনাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা— ১. ব্যাঙ্কিং কার্যের সম্প্রসারণ। ২. ক্ষুদ্র শিল্পে ঋণদান। ৩. কৃষি ঋণদান।

১. ব্যাঙ্কিং কার্যের সম্প্রসারণ (expansion of banking) : প্রতিষ্ঠাকাল হইতে অদ্যাবধি স্টেট ব্যাঙ্ক ভারতের সর্বত্র এবং বিশেষত গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসারে প্রবলভাবে চেষ্টা করিতেছে এবং ইহাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে। ১৯৬০ সালের মধ্যে ইহার ৪০০টি নূতন শাখা স্থাপনের কথা ছিল। সে স্থলে ৪২৯টি নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া হায়দরাবাদ, বিকানীর, ইন্দোর, জয়পুর, ত্রিবাঙ্কুর, পাতিয়ালা,-মহীশূর ও সৌরাষ্ট্রের স্টেট ব্যাঙ্কগুলিকে ইহার অধীনে আনয়ন করা হইয়াছে। ফলে বর্তমানে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ভারতের সর্ববৃহৎ ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে স্টেট ব্যাঙ্কের মোট কার্যালয় সংখ্যা ছিল ১৭৫৯। উহার ৫০ শতাংশ কার্যালয়ই ছোট শহর ও ব্যবসাকেন্দ্রে অবস্থিত। স্টেট ব্যাঙ্ক ও উহার অধীনস্থ ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানত (৭৮৭ কোটি টাকা—পি. এল ৪৮০—আমানত বাদে) সারা ভারতের সকল তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কের মোট আমানতের এক-তৃতীয়াংশ। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের আরও ৩৫৯টি নূতন কার্যালয় স্থাপন করা হইবে।

২. ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদান (finance to small industries) : স্বল্পোন্নত ভারতের মত পুঁজির অভাবী দেশে স্টেট ব্যাঙ্কের ন্যায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদানে প্রত্যক্ষ সহায়তা একটি অভূতপূর্ব ও বাঞ্ছিত পদক্ষেপ। ১৯৫৬ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক উহার ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদান কার্য আরম্ভ করে। বর্তমানে উহা বিশেষরূপে প্রসারিত হইয়াছে। ক. ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদানের জন্য একটি পথদেশক কর্মসূচী (pilot scheme) গৃহীত হয় ও ১৯৫৯ সালে ইহাকে প্রসারিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত স্টেট ব্যাঙ্ক ও উহার অধীনস্থ ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক মোট ৫৮৩৪টি প্রতিষ্ঠানে ইহা বিস্তৃত হয়। উহাদিগকে প্রদত্ত ঋণের সীমা ৩০.৫৮ কোটি টাকা করা হইয়াছে। খ. সম্প্রতি ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদান কর্মসূচী আরও উদার করিবার জন্য সুদের হার অনধিক শতকরা ৬ টাকা করা হইয়াছে, জামিন হিসাবে গ্রহণযোগ্য সম্পত্তির শর্তও শিথিল করা হইয়াছে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি ও যন্ত্রপাতির রদবদলের জন্য অনধিক ৭ বৎসরের মেয়াদে মাঝারিমেয়াদী ঋণদান ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। গ. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণের প্রসারের জন্য সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্ক অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থানের স্টেট ফিনান্স করপোরেশনের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া যে সকল স্থানে ঐ সকল করপোরেশনের কার্যালয় নাই তথায় উহাদের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেছে। ঘ. শিল্পসমবায়সমিতিকেও সম্প্রতি ইহা ঋণদান আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সকল প্রকারের সমবায় সমিতিগুলিকে প্রদেয় ঋণের সীমা ৬১.৯ কোটি টাকা করা হইয়াছে। ঐ সময়ে উহাদের নিকট বকেয়া পাওনা ছিল ২১.৪ কোটি টাকা। সম্প্রতি ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে গ্যারান্টি দান করিবার জন্য ভারত সরকারের কর্মসূচীতে স্টেট ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্র শিল্পঋণদান কার্য আরও প্রসারিত

কৃষিঋণ সংস্থান (agricultural finance) : গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসারে ও কৃষিঋণ সংস্থান কার্যে স্টেট ব্যাঙ্ক যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। ক. সমবায় সমিতিগুলিকে অধিক পরিমাণ অর্থস্থানান্তরে সাহায্য করিয়াছে। খ. সমবায় সমিতিগুলিকে অধিক পরিমাণে ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। গ. সমবায় সমিতিগুলিকে সরকারী ঋণপত্র, সরকারী গ্যারান্টি, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের ঋণপত্র ও গুদামে রক্ষিত পণ্যের রসিদের (warehousing receipts) জামিনে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে ঋণদান করিতেছে। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুধুমাত্র গুদামরসিদের জামিনেই ২·৭০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে।

সুতরাং কার্যাবলীতে উহার অগ্রগতি বিবেচনা করিলে, ভারতে বাণিজ্যিক, ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষিঋণ ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক ভারতের অর্থনীতিক জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

ভারতে ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণ

NATIONALISATION OF BANKS IN INDIA

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিষয়টি ইদানীংকালে খুব বেশি গুরুত্বসহকারে আলোচিত হইতেছে বটে, তবে ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ইহা একেবারেই নূতন নহে। অনেকদিন পূর্বেই ইহা কংগ্রেসের অর্থনীতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ঠিক পরেই জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন "অর্থনীতিক কার্যক্রম কমিটি" ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনীতিক কার্যক্রম রচনা করে। এই কমিটির অন্যতম সুপারিশ ছিল যে ভারতের ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবস্থার জাতীয়করণ করিতে হইবে। ১৯৪৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (A. I. C. C.) এই সুপারিশ গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তী কালে সুদীর্ঘ ষোল বৎসরেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের এই স্বীকৃত নীতি কার্যকর করা হয় নাই। অধুনা ভারতের জনমতের বিপুলাংশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের জাতীয়করণের স্বপক্ষে প্রবলভাবে আলোড়িত হইতেছে। বিভিন্ন সরকারী রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে যে পরিকল্পনা বাঞ্ছিত পথে অগ্রসর হয় নাই, সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে তীব্র অসাম্য সৃষ্টি হইয়াছে, সর্বত্র অর্থনীতিক সংকটের ছায়া গাঢ়তর হইতেছে। অর্থনীতির এই সংকট মোচনে অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবিও সঙ্গতভাবেই উঠিয়াছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। নিম্নে ঐ সকল যুক্তির আলোচনা করা হইল।

স্বপক্ষে

CASE FOR NATIONALISATION

১. ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক বিপুল পরিমাণ আর্থিক সম্বল সরকারের করায়ত্ত হইবে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায় হইল আর্থিক সম্বলের অভাব। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দ্বারা এই অভাব অনেকাংশে দূর করা যাইবে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক-শিল্পের বিপুল আমানত সাধারণত বেসরকারী ক্ষেত্রের শিল্পসম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের দিক হইতে যে সকল শিল্পের অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত (অথচ যেখানে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা কম) সে সকল শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সমাজের আর্থিক সম্বল যেখানে সীমাবদ্ধ সেখানে সামাজিক অগ্রাধিকার বিবেচনা

দিয়া এরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহের প্রতিষ্ঠা করা [illegible] জাতীয়করণের দ্বারা এই লক্ষ্যই সাধিত হইবে। অর্থের অভাবে উন্নয়নমূলক কার্যেরও ব্যাঘাত ঘটিবে না।

২. ব্যাঙ্ক শিল্পের মধ্যে একচেটিয়া মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিতেছে এবং ইহার ফলে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জাতীয় সম্পদ ও আর্থিক ক্ষমতার ক্ষতিকর কেন্দ্রীভবন ঘটিতেছে। ১৯৫০ সালে ভারতে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৫৮৪ এবং উহাদের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ৮২৮ কোটি টাকা। ১৯৬২ সালে (ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির সংযুক্তিসাধন বা বিলোপ সাধনের ফলে) ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৭৬এ নামিয়া আসে, অথচ উহাদের মোট আমানতের পরিমাণ কয়েকগুণ বাড়িয়া ২৩০০ কোটি টাকায় পৌঁছে। ব্যাঙ্ক শিল্পের অভ্যন্তরেও একচেটিয়া মালিকানা ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে এবং কেন্দ্রীভবনের এই প্রবণতা ক্রমশঃই তীব্র হইতেছে। সরকারী ক্ষেত্রভুক্ত স্টেট ব্যাঙ্ক ও উহার কর্তৃত্বাধীন অন্য ৮টি ব্যাঙ্কের কথা বাদ দিলে দেখা যায় যে ১৯৬২ সালে ভারতে ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৬৭ এবং ইহাদের মোট আমানতের পরিমাণ (১৯৬২ সালে) ১৬৩৯ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সর্ব-বৃহৎ ৫টি ব্যাঙ্কেরই আমানতের পরিমাণ হইল ৭৬৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট আমানতের প্রায় ৪৭%। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাঙ্কব্যবস্থা দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যবস্থায় একচেটিয়া প্রবণতাকে শক্তিশালী করিয়া শিল্পক্ষেত্রের সুস্থ ও কল্যাণকর সম্প্রসারণের পথে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে।

৩. ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের কারসাজির ফলে ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার এক বিপুল অংশের অপচয় ঘটিতেছে। রপ্তানির মূল্য কম করিয়া দেখাইয়া (underinvoicing) এবং আমদানির মূল্য বেশি করিয়া দেখাইয়া (overinvoicing) দেশের অর্থনীতিকে প্রবঞ্চনা করিতে আমদানিকারী ও রপ্তানিকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করিতেছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে এই দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা সম্ভব।

৪. ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দ্বারা সমাজবিরোধী ফটকা ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়। ফটকা কারবারীরা ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া দেশের দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের স্বল্পতায় সুযোগ গ্রহণ করে এবং কৃত্রিমভাবে দাম বাড়াইয়া প্রভূত পরিমাণে মুনাফা লাভ করে। উচ্চহারে সুদ পাইবার লোভে ব্যাঙ্ক এই ঋণ দেয়। সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কথা হইল এই যে ব্যাঙ্কের ঋণ খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির ফটকা কারবারেরও প্রচুর পরিমাণে আগাম হিসাবে প্রদত্ত হয়। (বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপরে কি পরিমাণ আগাম দেওয়া হয় ১৯৬৩ সালের একটি হিসাবে তাহা দেখা যায়: খাদ্যদ্রব্য—১২২ কোটি টাকা; চিনাবাদাম—৮ কোটি টাকা; লঙ্কা ও অন্যান্য মশলা—৫ কোটি টাকা; তুলাজাত দ্রব্য—১২০ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ আগাম ছাড়াও ঐ সময়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকার মত আগাম দেওয়া হয় যাহার উপর কোন প্রকারের "জমা" রাখা হয় নাই।) ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন থাকিলে এই প্রকারের কার্যকলাপ অবশ্যম্ভাবী। একমাত্র জাতীয়করণের দ্বারাই ব্যাঙ্কসমূহের এরূপ কার্য বন্ধ করা সম্ভব।

৫. ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে কর-ফাঁকি দেওয়া অনেক পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব। ভারতে কর-ফাঁকির জন্য একই ব্যক্তি কর্তৃক উপার্জিত অর্থ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যাঙ্কে স্বনামে বা বেনামীতে আমানত রাখে। ইহাতে সঠিক আয় সহজেই গোপন করিয়া কর-ফাঁকি দেওয়া সম্ভব। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হইলে আইনের সাহায্যে ইহা বন্ধ করা যাইবে।

জাতীয়করণের ফলে ব্যাঙ্কবিপর্যয়ের আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে দূর হইবে। বিনিয়োগকারী জনসাধারণের মনে আস্থার সৃষ্টি হইবে, জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে, জনসাধারণের ব্যাঙ্কের মারফতে কাজকারবারের অভ্যাস বাড়িবে, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আসিবে।

৭. ব্যাঙ্কজাতীয়করণের মাধ্যমে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের একান্ত সহযোগিতা ব্যতিরেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন কার্যক্রমই সাফল্য লাভ করিতে পারে না। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকারের কার্যক্রম ও নীতি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পালন করে না। তাই বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এই অসুবিধা দূর করিবে।

৮. অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ করা হইয়াছে ব্যাঙ্কসমূহের ঋণদান নীতি নির্বিচারে প্রয়োগ করা হয়—অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ পায় না; ব্যাঙ্কের মালিকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বার্থপরতাই ইহার কারণ। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে এই অভিযোগের আসল ভিত্তি আছে। সুতরাং এমতাবস্থায় ন্যায়বিচার ও সততার দিক হইতে দেখিলে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবি সমর্থন লাভ করে।

৯. অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ সরকারী ব্যয়ের ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করিযাছে। ব্যাঙ্কসমূহের আমানত ঋণ ও আগাম, বিনিয়োগ—সব কিছুই জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অনেক বেশি হারে বাড়িয়াছে। ফলে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা সরকারী বিনিয়োগ ও ব্যয়ের ফলে সর্বাপেক্ষা উপকৃত ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম। অন্যদিকে এই ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ই নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনীতিক কুফলের সৃষ্টি করিয়াছে। বস্তুত ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের নবলব্ধ সম্বল ও ব্যাপক বিনিয়োগের ফলেই নানাবিধ সমাজবিরোধী ফলাফলের উদ্ভব হইয়াছে। এই কারণেই ব্যাঙ্ক-শিল্পের জাতীয়করণের এত বেশি প্রয়োজনীয়তা।

১০. এতকাল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রের একচেটিয়া শিল্পপতিরাই দেশের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও বিনিয়োগকারীদের সম্বল কাজে লাগাইয়াছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে এই সম্বল সরকারী ক্ষেত্রের প্রয়োজনে লাগান যাইতে পারে।

১১. ভারত সরকারের বিঘোষিত সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের লক্ষ্যকে সফল করিবার জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী মালিকানার ক্রমসম্প্রসারণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ব্যাঙ্ক-শিল্পের জাতীয়করণ ঐ বিঘোষিত লক্ষ্যের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ এবং ঐ লক্ষ্যের সাফল্যের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি
CASE AGAINST NATIONALISATION

১. ভারতের মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) অনুষঙ্গ হিসাবে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। বেসরকারী ক্ষেত্রের শিল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। জাতীয়করণের ফলে বেসরকারী ক্ষেত্রের অর্থ সরবরাহে সংকটের সৃষ্টি হইবে। সমগ্র ব্যাঙ্ক আমানত রাষ্ট্রায়ত্ত হইলে সরকারী ক্ষেত্রের সুবিধা হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই তবে, নানাপ্রকারের সমস্যা-প্রপীড়িত বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের বস্তুতই অসুবিধা হইবে।

২. ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে সঞ্চয়কারী জনসাধারণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে এবং সরকারী মালিকানাধীন ব্যাঙ্কে পূর্বের ন্যায় নিজেদের সঞ্চয় আমানত হিসাব রাখিতে চাহিবে না, কারণ

জনসাধারণ সরকারী ক্ষেত্রের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দক্ষতার উপরে খুব বেশি আস্থাবান নহে।

৩. ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নানাবিধ ত্রুটিবিচ্যুতি ও অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্য ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণ না করিলেও চলে। কেননা এ সম্পর্কে সরকারের হাতে এবং বিশেষ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে সকল ক্ষমতা আছে তাহা দ্বারা ব্যাঙ্কসমূহের আপত্তিকর কার্যাবলী বন্ধ করা যায়।

৪. ব্যাঙ্ক-শিল্পকে জাতীয়করণ করা হইলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করিতে সরকারের পক্ষে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হইবে।

৫. ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের কার্যকলাপ খুবই জটিল। এই জটিল কার্য ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থাতেই নৈপুণ্য সহকারে সম্পাদন করা সম্ভব। জাতীয়করণ করা হইলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কার্যাবলী পূর্বের নৈপুণ্য হারাইবে এবং অন্যান্য অসুবিধার সৃষ্টি করিবে।

৬. গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত ভারত সরকারের পক্ষে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের নীতি সমুচিত কাজ নহে। কারণ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হইলে গণতান্ত্রিক আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া ভারত সরকার পূর্ণ সমাজতন্ত্র (বা সাম্যবাদ) প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইবে এবং অচিরেই সাম্যবাদ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মন্তব্য ঃ উপরের আলোচনা হইতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের স্বপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তি সমূহের গভীর সারবত্তা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কারণ ভারতের অর্থনীতির স্বার্থেই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি জাতীয়করণের বিপক্ষে উপস্থাপিত যুক্তিসমূহের কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথমেই বলা যায় মিশ্র অর্থনীতির ঘোষিত লক্ষ্য হইতে ভারত সরকার বিচ্যুত হয় নাই। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহের সূত্র ইহাতে বিঘ্নিত হইবে না। উপরন্তু বেসরকারীক্ষেত্রের শিল্পোদ্যোগে অর্থ-সরবরাহের জন্য বিগত ষোল বৎসরে নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং মূল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যকে পূর্ণ করিবার জন্য বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে ঐ সকল অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন মেয়াদী পুঁজি সরবরাহ করিয়াছে। দ্বিতীয়ত, জাতীয়করণের ফলে ব্যাঙ্কসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ কমিয়া যাইবে বলিয়া প্রদর্শিত যুক্তিও গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কারণ বীমা-ব্যবসায়ের জাতীয়করণের সময়ও একই যুক্তি প্রদর্শিত হয়। তথাপি বীমা-জাতীয়করণের পরবর্তীকালে বীমাকারীদের সংখ্যা হ্রাস পায় নাই, উপরন্তু সাফল্যের সাথেই বীমাব্যবসায় সম্প্রসারিত হইতেছে। ব্যাঙ্ক শিল্পেও সেরূপ জাতীয়করণের পরে জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধিই পাইবে। তৃতীয়ত ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যৌথ প্রচেষ্টায় বন্ধ করা সম্ভব, সুতরাং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রয়োজনীয় নহে—এমন যুক্তি বর্জনীয়। কারণ বিগত পনেরো বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভৃত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও ব্যাঙ্কসমূহের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ বন্ধ করিতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া ১৯৫৬ সালের পরবর্তীকালে অদ্যাবধি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যর্থই হইয়াছে বলা চলে। উপরন্তু, প্রতি বৎসরই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পরিষদের মারফত পার্লামেন্টের নিকট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ

[illegible]তে ধার ক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিতে হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হয় ব্যাঙ্কব্যবস্থার উপরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব কতটুকু ফলপ্রসূ। চতুর্থত, ক্ষতিপূরণ সম্পর্কেও আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই। কারণ, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারিত হইবে মোট আদায়ীকৃত পুঁজি ও মোট রিজার্ভের পরিমাণ দ্বারা। স্টেট ব্যাঙ্ক ও ইহার কর্তৃত্বাধীন অপর ৮টি প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিলে বেসরকারীক্ষেত্রের ব্যাঙ্কপ্রতিষ্ঠানসমূহের মোট আদায়ীকৃত পুঁজি ও রিজার্ভের পরিমাণ মাত্র ৭৫. কোটি টাকা। সমগ্র ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কোটি কোটি টাকার আমানতের কথা মনে রাখিলে এই ৭৫ কোটি টাকা খুব বেশি নহে। তদুপরি ব্যাঙ্কের বড় বড় অংশীদারদিগকে ঋণপত্রের মাধ্যমে তাহাদের ক্ষতিপূরণজনিত পাওনা শোধ করিলে বাকি টাকা সরাসরি শোধ করিতে বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইবে না। পঞ্চমত, ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার দক্ষ পরিচালনার জন্য নিপুণ কর্মচারীর অভাবের কথা সম্পর্কে বলা যায় যে, ব্যাঙ্কের মালিকেরা কখনই ব্যাঙ্ক পরিচালনা করে না। ব্যাঙ্কের যাবতীয় জটিল কার্য সম্পাদন করেন বেতনভোগী বিপুল সংখ্যক কর্মচারীর দল। সুতরাং এই কর্মচারীর দলই যখন নিপুণতা সহকারে কাজকর্ম চালাইতেছে, তখন জাতীয়করণের পর ইহারা কেন অধিকতর নৈপুণ্য সহকারে কাজ করিবে না তাহা বুঝা দুষ্কর। ষষ্ঠত, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে শঙ্কিত হইয়া বেসরকারী ক্ষেত্রের আশু ধ্বংসের কথা কল্পনা করিয়া যাহারা বিচলিত হইতেছেন এবং ভাবিতেছেন যে ইহাতে ভারত সরকারের গণতন্ত্র পরিত্যাগের নীতি এবং সাম্যবাদ গ্রহণের নীতি সূচিত হইতেছে, তাঁহাদের মনে রাখা দরকার যে ব্যাঙ্কজাতীয়করণ ও পূর্ণ সমাজতন্ত্র পৃথক বস্তু। ইহা সাম্যবাদী সমাজের আবির্ভাব সূচনা করে না। ইহা মূলত ভারতীয় অর্থনীতির বিশেষ একটা অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন একটি ক্ষেত্রের উপরে প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছিত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠা। ইহার বেশি আর কিছুই নহে।

৪

ভারতের বাণিজ্য
Trade of India

অনুন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশেব স্বল্প আয়, স্বল্প চাহিদা, প্রত্যক্ষভোগনির্ভর অর্থনীতি, স্বল্প পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থা উহার উৎপাদনকে যেমন বাড়িতে দেয় না তেমনি উহাব অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের পরিধি সংকুচিত করিয়া রাখে। ইহার ফলে দেশেব বিপুল জনশক্তি, বিপুল আয়তন ও প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহাব ঘটিতে পাবে না। জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদেব অনুপযুক্ত ব্যবহারেব ফলে আবাব দেশেব উৎপাদন এবং ব্যবসায-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। ভারতেও তাহাই ঘটিয়াছে। বর্তমান উন্নয়নমূলক অর্থনীতিক কার্যকলাপের দরুন একদিকে দেশে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রীব উৎপাদন বৃদ্ধিব ব্যবস্থা গৃহীত হইতেছে, অন্যদিকে বিদেশ হইতে পুঁজিদ্রব্যাদি ও কাঁচামাল বিপুল পবিমাণে আনয়নের প্রযোজন ঘটিতেছে। ইহা সহজে সম্ভব করিবার জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যবসায-বাণিজ্যেব প্রসাব দ্বাবা অভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণ এবং দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি প্রয়োজন। এককথায় উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সহিত সংগতি রাখিয়া অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যেব পরিকল্পিত সম্প্রসারণ আবশ্যক। স্বভাবতই প্রথম দিকে এই সামঞ্জস্য বিধানে নানারূপ বাধাবিপত্তি ঘটিবে। কিন্তু সকল শক্তি ও চেষ্টা দ্বারা উহার সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে। কারণ ইহাব উপর জাতীয় অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিশেষরূপেই নির্ভরশীল।

আলোচনার সুবিধার জন্য, ভারতেব বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।

ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
INTERNAL TRADE OF INDIA

ভারতের বিরাট আয়তন, বিপুল জনসংখ্যা, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক সম্পদেব বৈচিত্র্য বিধায় দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, বহির্বাণিজ্যের তুলনায় বহুগুণ অধিক তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়। ১৯৪০ সালেই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ ৭০০০ কোটি টাকা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। তুলনায় ঐ সময়ে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫০০ কোটি টাকা। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্বন্ধে কোনরূপ নির্ভরযোগ্য তথ্য আহৃত না হওয়ায় এ সম্পর্কে বর্তমান অবস্থা সঠিকভাবে জানিবার কোন উপায় নাই। তবে কেহ কেহ মনে করেন উহার পরিমাণ বর্তমানে ২৮,০০০ কোটি টাকার বেশি ছাড়া কম হইবে না। তুলনায় ১৯৬৪ সালে (ডিসেম্বর পর্যন্ত) বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ছিল ১৯২০ কোটি টাকা। বর্তমানে পরিবহণ ও সংসরণ, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, মজুদকরণ ব্যবস্থা, শিল্পায়নের অগ্রগতি, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি, বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি, আয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেকে মনে করেন ভারতের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উপযুক্তরূপে প্রসারিত হইলে, বিদেশী বাজারের উপর

শিল্পসমূহের নির্ভরতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে। অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান ও বাজার দেশের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবে।

ভারতের বহির্বাণিজ্য
FOREIGN TRADE OF INDIA

আলোচনার সুবিধার জন্য কালানুযায়ী আমরা ভারতের বহির্বাণিজ্যকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। যথা, ১. স্বাধীনতাপূর্ব যুগ। ২ বর্তমান যুগ।

স্বাধীনতাপূর্ব যুগে বহির্বাণিজ্য
FOREIGN TRADE IN THE PRE-INDEPENDENCE PERIOD

পরশাসন যুগে ভারতের অর্থনীতির সামগ্রিক চরিত্র ছিল ঔপনিবেশিক। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অর্থনৈতিক চিত্র ভারতের স্বাধীনতাপূর্ব যুগের বহির্বাণিজ্যের প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হইবার প্রথম যুগে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব সম্পূর্ণ হয় নাই। সে সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত হইতে বস্ত্রশিল্পজাত বিবিধ দ্রব্য ইংলণ্ডে রপ্তানি করিতে উৎসাহ দিয়াছে। পরে ইংলণ্ডে যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে ধীরে ধীরে নানা উপায়ে ভারতের কুটিরশিল্পজাত বস্ত্র উৎপাদন বিনষ্ট করিয়া এদেশ হইতে ইংলণ্ডে কাঁচামাল রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ হইতে ধীরে ধীরে ভারতকে সুকৌশলে কৃষিপ্রধান ও কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করা হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের বহির্বাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯২৯ সালের পর আন্তর্জাতিক মন্দার দরুন ভারতের বহির্বাণিজ্য বিপুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতোমধ্যে ১৯০৫ সাল হইতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে ভারতীয় শিল্প স্থাপিত হইতে থাকে। ১৯২২-২৩ সাল হইতে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির প্রসাদে ভারতের নূতন শিল্পগুলি বিদেশী প্রতিযোগিতার সমকক্ষ হইতে সমর্থ হয়। ভারতের বস্ত্রশিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করে এবং নিকট ও দূর প্রাচ্যের বাজারে উহা বস্ত্র রপ্তানি আরম্ভ করে। ১৯৩০-৪০ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে সংকট দেখা দেয়। রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি অধিক হইয়া পড়ে। অভ্যন্তরীণ সংকটে সে সময় দরিদ্র দেশবাসিগণ সঞ্চিত স্বর্ণ বাজারে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করে। সে সময় ভারতের লেনদেনের ঘাটতি মিটাইবার জন্য ঐ স্বর্ণ ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হয়। এইরূপে ১৯৩০ ৩৮ সালের মধ্যে ২৫০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যুগে অবশ্য ভারতের বহির্বাণিজ্যে পরিবর্তন ঘটে। আমদানি সংকুচিত হয়, যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি বাড়ে, দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যস্তর বাড়ে। দেশের বহির্বাণিজ্যের মোট পরিমাণ ও মূল্য বৃদ্ধি পায়। লেনদেনের উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। ইংলণ্ডের নিকট ১৭০০ কোটি টাকার স্টার্লিং পাওনা জমে। এই যুগের বহির্বাণিজ্য বিশ্লেষণ করিলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিতে পাই।

১. আমদানি ও রপ্তানি, বহির্বাণিজ্যের এই দুই ক্ষেত্রেই ইংলণ্ডের স্থান ছিল প্রথম। পরে অবশ্য, জাপান, জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বহির্বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। তবে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানত বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ইংলণ্ড ও আমেরিকার অংশ প্রায় সমান হইয়া পড়ে (১০৭ কোটি ও ৯৫ কোটি টাকা)।

২. ভারতের ঔপনিবেশিক দেশসুলভ রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্যই ঐ সময় ছিল প্রাথমিক উৎপন্ন (primary produce), অর্থাৎ কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল। পাট, তুলা, চা, তৈলবীজ, কাঁচা চামড়া এবং পাটজাত ও তুলাজাত দ্রব্যই ছিল কয়েকটি মুষ্টিমেয় উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্য।

৩ আমদানি দ্রব্যগুলি প্রধানত ছিল ভোগ্য পণ্য। বস্ত্র, চামড়ার দ্রব্য, কাচের জিনিস, ঘড়ি, খেলনা, মোটর গাড়ি, সাইকেল, সেলাইকল, কাগজকলম, পেন্সিল, কালি ইত্যাদি ছিল প্রধান। রপ্তানির তুলনায় আমদানি দ্রব্য সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে ছিল বেশি।

৪. সংকটজনক বৎসর ছাড়া, মোট মুটিভাবে এই যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যে বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ঘটিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীযুগে, দেশবিভাগ, স্বাধীনতালাভ, পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রভৃতির ফলে ভারতের সাম্প্রতিক বহির্বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতিতে গভীর ও বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে, স্বাধীন অর্থনীতিক উন্নয়নের যুগে ভারতের বহির্বাণিজ্যে এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ ঃ সাম্প্রতিক বহির্বাণিজ্য
POST-INDEPENDENCE PERIOD FOREIGN TRADE IN RECENT TIMES

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাল হইতেই ভারতের বহির্বাণিজ্যে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। উহার পরবর্তীকালে ঐ পরিবর্তন স্থায়ীরূপ ধারণ করে। এই পরিবর্তনগুলি বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ, গঠন, গতি ও প্রকৃতির সকল ক্ষেত্রেই এরূপ গভীরভাবে ঘটিয়াছে যে এজন্য ভারতের বহিবাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যগুলির মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলা হয়। এইরূপ পরিবর্তনের কারণগুলির মধ্যে, ১. যুদ্ধকাল হইতে ভারতে বিপুল খাদ্য ঘাটতির আবির্ভাব ; ২. দেশ-বিভাগের দরুন খাদ্যে উদ্বৃত্ত অঞ্চল ও গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদনকারী অঞ্চলের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তি ; ৩ ইংলণ্ডের নিকট স্টার্লিং পাওনার উদ্ভব ; ৪. জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি ; ৫. পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও শিল্পায়নের গতিবেগ বৃদ্ধি এবং ৬. যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ ইত্যাদি প্রধান। ইহা ছাড়া সময়িকভাবে বিভিন্ন সময়ে আরও নানাবিধ সাময়িক কারণ যথা, যুদ্ধ শেষ হইবার অব্যবহিত পরে যুদ্ধকালে নিরুদ্ধ চাহিদা পূরণের জন্য আমদানির অভূতপূর্ব বৃদ্ধি, ১৯৫০-৫১ সালে কোরীয় যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে ক্রয়ের হিড়িকে রপ্তানি বৃদ্ধি, ১৯৫৬ সালে সুয়েজখাল লইয়া ইঙ্গ-মিশরীয় লড়াই, ১৯৫৬-৫৭ সালে পাকিস্তানের সহিত সম্পর্ক অবনতির জন্য ভারতের দেশরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি, প্রভৃতি ভারতের বহির্বাণিজ্যে সাময়িক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কিন্তু মূলগতভাবে পুরাতন ঔপনিবেশিক চরিত্রের বহির্বাণিজ্যের পরিবর্তে সাম্প্রতিক বহির্বাণিজ্যে উন্নয়নমূলক অর্থনীতির স্বাক্ষর প্রতিফলিত হইতেছে।

সাম্প্রতিক বহির্বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Features of the foreign trade in recent times) :

পরিমাণ ও মূল্য (volume & value) : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্বকালের তুলনায় তো বটেই, এমনকি ১৯৪৮-৪৯-৫০ সালের তুলনায় পর্যন্ত বর্তমানে আমদানি ও রপ্তানি মিলিয়া মোট বহির্বাণিজ্য, পরিমাণ ও মূল্যের বিচারে অভূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। (১৯৩৮-৩৯ সালে মোট বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩২১ কোটি টাকা। ১৯০৮-৪৯ সালে ছিল ১১০০

কোটি টাকার সামান্য বেশি। আর ১৯৬৪ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত উহা হইয়াছে [illegible] কোটি টাকা)।

গঠন বা ধাঁচ (**Composition or Pattern**) : ক. বর্তমান আমদানি দ্রব্যের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য (১৯৬৩-৬৪ সালে ১৭৯ কোটি টাকা), কাঁচাতুলা, কাঁচাপাট, পশম অন্যান্য কাঁচামাল (১৯৬৩-৬৪ সালে ১২৩ কোটি টাকা), খনিজ তৈল ও অনুরূপ দ্রব্য (১৯৬৩-৬৪ সালে ১০৫ কোটি টাকা), বাসায়নিক পদার্থ (১৯৬৩-৬৪ সালে ৮৮ কোটি টাকা), ও যন্ত্রপাতি ও পবিবহণেব সাজসবঞ্জাম (১৯৬৩-৬৪ সালে ৪২২ কোটি টাকা) প্রধান। আমদানি বাণিজ্যে খাদ্যদ্রব্যেব প্রাধান্য ভাবতেব খাদ্য ঘাটতিব কাবণে দেখা দিয়াছে।

খ. সাম্প্রতিক বপ্তানি দ্রব্যেব মধ্যে চা, কফি, মবিচ প্রভৃতি খাদ্য-পানীয় জাতীয় দ্রব্য (১৯৬৩-৬৪ সালে ২৪৮ কোটি টাকা, তন্মধ্যে চা ১২২ কোটি টাকাব), বিবিধ কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল (১৯৬৩-৬৪ সালে ১৩১ কোটি টাকা), সুতীবস্ত্র, পাটজাত দ্রব্য, পাকাচামড়া ইত্যাদি বিবিধ যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য (১৯৬৩-৬৪ সালে ৩০০ কোটি টাকা, ইহাব মধ্যে সুতীবস্ত্র ৫০ কোটি টাকার ও পাটজাত দ্রব্য ১৫৩ কোটি টাকাব) প্রধান। ইহা ছাড়া কিছু যন্ত্রপাতি ও পবিবহণেব সাজসবঞ্জাম (১৯৬৩-৬৪ সালে প্রায ৭ কোটি টাকাব) এবং বাসায়নিক দ্রব্যও (১৯৬৩-৬৪ সালে ৬½ কোটি টাকাব) বপ্তানি হইতেছে।

প্রকৃতি (**nature**) : যুদ্ধপূর্বকালেব বা স্বাধীনতাব পূর্বযুগেব আমদানি বপ্তানি দ্রব্যেব সহিত বর্তমান আমদানি বপ্তানি দ্রব্যগুলিব তুলনা কবিলে সহজেই ভাবতেব বহির্বাণিজ্যে মৌলিক পবিবর্তন ধবা পড়ে। পূর্বে আমদানিদ্রব্যেব মধ্যে প্রাধান্য থাকিত বিবিধ ভোগ্য পণ্যেব। আব সাম্প্রতিক আমদানিদ্রব্যেব মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে পবিকল্পনাব জন্য প্রযোজনীয যন্ত্রপাতি ও পবিবহণেব সাজসবঞ্জাম। অন্যদিকে বপ্তানি দ্রব্যেব মধ্যে পূর্বে কাঁচামালই ছিল সর্বপ্রধান। বর্তমানে সে স্থান যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ কবিযাছে। উহাব সহিত যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য বপ্তানিও আবম্ভ হইযাছে। নিঃসন্দেহে এইরূপ বহির্বাণিজ্য ভাবতেব ক্রমবর্ধমান শিল্পায়িত অর্থনীতিব ইঙ্গিত দেয।

দেশগত দিক (**direction**) : বহির্বাণিজ্যেব দিক বলিতে কোন্ কোন্ দেশের সহিত আমদানি-বপ্তানি চলিযা থাকে তাহা বুঝায। যুদ্ধপূর্ব ও স্বাধীনতাব পূর্ব যুগেব তুলনায় বর্তমান বহির্বাণিজ্যেব দিক বিচাবে দেখা যায ভাবতেব সহিত বৃটিশ কমনওয়েলথ বহির্ভূত দেশগুলিব বাণিজ্যেব পবিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমেই অধিকতব সংখ্যক দেশেব সহিত ভাবতেব বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে। সাম্প্রতিক কালের উল্লেখনীয ঘটনা হইল এই যে এশিযাব দেশসমূহেব সহিত ভাবতেব বপ্তানি বাণিজ্য এবং সোবিযেত সহ পূর্ব ইউবোপেব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিব সহিত ভাবতেব আমদানি ও বপ্তানি বাণিজ্য বিপুল পবিমাণে সম্প্রসারিত হইতেছে। দেশ বিচাবে ইংলণ্ডেব সহিত বাণিজ্যেব পবিমাণ যতটা বৃদ্ধি পাইতেছে তদপেক্ষা দ্রুত গতিতে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব সহিত বাণিজ্য বাড়িতেছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মোট আমদানি-বপ্তানি বাণিজ্যেব পবিমাণ (৫১৯ কোটি টাকা, ১৯৬৩-৬৪), ইংলণ্ড অপেক্ষা (৩৩০ কোটি টাকা, ১৯৬৩-৬৪) অধিক। ভারতেব আমদানি বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্র প্রথম (প্রায় ৩০ শতাংশ) এবং ইংলণ্ড দ্বিতীয (প্রায ১৫ শতাংশ)। আর বপ্তানি বাণিজ্যে ইংলণ্ড প্রথম (প্রায় ২১ শতাংশ) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় (প্রায ১৭ শতাংশ)। ইহা ছাড়া এশিয়ার দেশসমূহ (আমদানির ১০ শতাংশ ও রপ্তানির ১৯ শতাংশ), মধ্যএশিয়ার দেশগুলি (আমদানির ১০ শতাংশ ও রপ্তানির ১৯ শতাংশ)

সোভিয়েতসহ পূর্ব ইয়োরোপের দেশগুলি (আমদানির প্রায় [illegible] শতাংশ ও রপ্তানির প্রায় ১৫ শতাংশ) এবং আফ্রিকার দেশগুলির সহিত (আমদানির ২½ শতাংশ ও রপ্তানির ৪ শতাংশ) বহির্বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে।

৲. **বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত** (**Balance of Trade**) : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্যে অপর যে বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে তাহা হইল বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি। পরিকল্পনাকালে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ও দেশভাগের পব স্বাধীনতা-লাভের অল্পকালের মধ্যে ১৯৪৮-৪৯ সালের ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৩ কোটি টাকা। তাহার পর ১৯৫০-৫১ সালে উহা কমিয়া ২২ কোটি টাকায় পরিণত হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে উহা বাড়িয়া ১৬৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। উহার পর ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া ৪০১ কোটি টাকায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৯৬০-৬১ সালে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ হইয়াছে ৩৫৪ কোটি টাকা)। ১৯৬৩-৬৪ সালে ঐ ঘাটতির পরিমাণ ৩৭৬ কোটি টাকায়। সেজন্য বহির্বাণিজ্যেব প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করাই সাম্প্রতিক কালে ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের টাকার বহির্বিনিময় মূল্য হ্রাসের অন্যতম লক্ষ্য ছিল রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর করা। কিন্তু ইহাতে সাময়িকভাবে ঘাটতি কমিলেও উহা দূব হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিরাট পরিমাণে পুঁজিদ্রব্য ও খাদ্য আমদানির জন্য এবং রপ্তানি বৃদ্ধিব অভাবে বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি একই রকম ভাবে চলিতেছে। বর্তমানে এজন্য প্রবলভাবে রপ্তানি বৃদ্ধি ও কঠোরভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলিতেছে। রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা কিঞ্চিৎ ফলবতী হইতেছে। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে রেকর্ড রপ্তানি হইয়াছে। ঐ বৎসর ৮৩৫ কোটি টাকার রপ্তানি হয়।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য
INDIA'S EXPORT TRADE

সাম্প্রতিককালে ভাবতেব রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য উহার বৈশিষ্ট্য, বপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, সমস্যা, সম্ভাবনা, ও সরকারী নীতি এবং গৃহীত ব্যবস্থার বিশদ আলোচনা প্রযোজন।

বৈশিষ্ট্য (**features**) : ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।

পরিমাণ ও মূল্য (**volume and value**) : ক. পরিমাণ বিচারে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, উহার পরবর্তীকাল এবং এমনকি প্রথম পরিকল্পনাকালের তুলনায় বর্তমানে মোট রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে রপ্তানির মোট পরিমাণ প্রয়োজনীয় উচ্চস্তরে পৌঁছিয়াছে বলা যায় না। খ. রপ্তানির মূল্যবিচারে দেখা যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং উহার পরবর্তীকালে মোট রপ্তানির মূল্যের তুলনায় (১৯৪২-৪৩ সালে ১৮৭ কোটি টাকা ও ১৯৪৭-৪৮ সালে ৩৯৫ কোটি টাকা) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মোট রপ্তানি প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে (১৯৫০-৫১ সালে ৭৫০ কোটি টাকা)। কিন্তু পরিকল্পনার গত একদশকে রপ্তানির মোট মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই (১৯৬৪ সালে ৮৩৫ কোটি টাকা)। ভারতে রপ্তানি বাণিজ্যের এই নিশ্চলতা (stagnancy) বর্তমানে ভারতের একটি উদ্বেগজনক সমস্যা। তবে ইদানীং রপ্তানি বৃদ্ধির নানাবিধ প্রচেষ্টার ফলে অবস্থার কথঞ্চিৎ উন্নতি হইতেছে।

[illegible] (composition) : ১৯৬৩-৬৪ সালের রপ্তানি বাণিজ্যের বিশ্লেষণ করিলে [illegible] [illegible] মোটামুটি ৭ শ্রেণীর দ্রব্য ভারত বর্তমানে রপ্তানি করিতেছে। [illegible] হিসাবে ঐগুলি হইল—ক. যন্ত্রশিল্পজাত বিবিধ দ্রব্য (মোট রপ্তানির ৪০ শতাংশ)। খ. খাদ্য পানীয় ([illegible] শতাংশ)। গ. কৃষিজ ও খনিজ কাঁচামাল (১৭ শতাংশ)। ঘ. তৈল ও চর্বি (১ শতাংশ)। ঙ. খনিজ ও জ্বালানি (১ শতাংশ)। চ. যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম (১ শতাংশ)। ছ. রাসায়নিক দ্রব্য (১ শতাংশ)। এবং জ. অন্যান্য (৫ শতাংশ)।

একক দ্রব্য হিসাবে ১৯৬৩-৬৪ সালে পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল (১৫৩ কোটি টাকা)। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল চা (১২২ কোটি টাকা)। তৃতীয় স্থান ছিল তুলাজাত বস্ত্রের (৪৯ কোটি টাকা)। নূতন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রপ্তানির মধ্যে রেশমজাত বস্ত্র (১০ কোটি টাকা), যন্ত্রপাতি ও পরিবহণের সাজসরঞ্জাম (৬ কোটি টাকা) এবং রাসায়নিক দ্রব্যের রপ্তানির (৬২ কোটি টাকা) উল্লেখ করিতে হয়। যন্ত্রশিল্পজাত ভোগ্যপণ্যের এবং উদীয়মান রেশমবস্ত্র যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যের রপ্তানি, বহির্বাণিজ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান শিল্পোন্নয়নের পরিচয় বহন করিতেছে। অবশ্য পূর্বের ন্যায় কাঁচামালের রপ্তানি এখনও বন্ধ হয় নাই তবে, ইহার পরিমাণ কমিতেছে। ইহাদের মধ্যে লৌহ-আকরিক, ম্যাঙ্গানীজ আকরিক, তুলা ও অভ্র প্রধান। খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে রহিয়াছে চা, কফি, কাজু বাদাম প্রভৃতি।

অঞ্চল ও দেশগত দিক (direction) : অঞ্চলগত বিচারে দেখা যায় ভারতের ১৯৬৩-৬৪ সালের রপ্তানি বাণিজ্যে ইংলণ্ড সহ পশ্চিম ইউরোপ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে (৩৬%)। মধ্যপ্রাচ্য সহ এশিয়া দ্বিতীয় (২৫%)। তৃতীয় স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিম গোলার্ধের (২৪%)। চতুর্থস্থান সোবিয়েত সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির (১৫%)।

প্রকৃতি (nature) : রপ্তানি দ্রব্যের চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় ভারতের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য যন্ত্রশিল্পজাত নানাপ্রকার ভোগপণ্যের চাহিদা আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যন্ত পরিবর্তনশীল। তদুপরি উহাদের উৎপাদন ব্যয় অধিক এবং বিদেশী বাজারে প্রতিযোগিতা রহিয়াছে। অন্যদিকে রপ্তানিকৃত কাঁচামালের চাহিদা অপরিবর্তনীয়। ফলে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বেগ পাইতে হইতেছে। ইহার একটি প্রধান সমাধান যন্ত্রপাতি প্রভৃতি পুঁজি দ্রব্যের রপ্তানি। এই প্রকার রপ্তানি আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু, ভারতের মূল ও বুনিয়াদী শিল্প এখনও সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় ইহাতে সময় লাগিবে।

রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা (the need for raising exports) : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগ হইতে ভারতে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। পরিকল্পনার গত দশ বৎসরে এই প্রয়োজনীয়তা আরও তীব্রভাবে অনুভব করা গিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ ভারতের অর্থনীতি ও উহার সাম্প্রতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অধিক পরিমাণে আমদানিনির্ভর হইয়া পড়িয়াছে। অর্থনীতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নিযুক্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলি প্রথমাবস্থায় উন্নয়নের মালমশলা ও যন্ত্রপাতি এবং কারিগরি জ্ঞানের আমদানির উপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে পারে। ইহা নূতন নহে। কিন্তু, ইহার সহিত ভারতে খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি, এই নির্ভরশীলতাকে সংকটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ফলে, যুদ্ধোত্তর যুগের তুলনায় ভারতের আমদানির পরিমাণ ও মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে উহার দ্বিগুণের কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে। (১৯৪৮-৪৯ সালে মোট আমদানি ৬৪২ কোটি টাকা, ১৯৬৩-৬৪ সালে আমদানি ১১৬৯ কোটি টাকা)। ইহার তুলনায় মোট রপ্তানি প্রায় একই স্তরে রহিয়াছে। ১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৩-৬৪ সালে

রপ্তানির উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে বটে, তবে আমদানি-রপ্তানির মোট বিচারে বাড়া সমানে চলিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে গড়ে প্রতি বৎসর ৬০৯ কোটি টাকার এবং দ্বিতী পরিকল্পনাকালে গড়ে প্রতি বৎসর ৬১৪ কোটি টাকার রপ্তানি হইয়াছে। আমদানির দাম রপ্তানির দ্বারাই শোধ করিতে হয়। সুতরাং আমদানির তুলনায় রপ্তানি ঘাটতির ফলে বাণিজ্যের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাণিজ্যের এই প্রতিকূল উদ্বৃত্ত এবং ইহার ফলে বৈদেশিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের দরুন ভারতের বিদেশী মুদ্রা তহবিলে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। ইহাতে ১৯৫৫-৫৬ সালে বিদেশী মুদ্রা তহবিলের পরিমাণ দ্রুতবেগে ৮২৪ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৭৯ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদেশী মুদ্রা তহবিলের ক্ষেত্রে এ প্রবণতা যেন স্থায়ী হইতে চলিয়াছে। ইহাতে বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভরতা বাড়িয়া যায়। কিন্তু ইহা স্থায়ী সমাধান নহে। স্থায়ী সমাধান হইল রপ্তানি বৃদ্ধি। তৃতীয় পরিকল্পনায় আরও প্রচুর পরিমাণে আমদানির প্রয়োজন হইতেছে। অথচ রপ্তানি এই সময়ে যে সবিশেষ বৃদ্ধি পাইবে সে ভরসা বিশেষ করা যায় না। ভারত সরকারের প্রত্যাশা যে এই সময়ে গড়ে প্রতি বৎসর ৭৪০ কোটি টাকা রপ্তানি করা যাইবে। এই প্রত্যাশা পূর্ণ হইলেও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ৩২০০ কোটি টাকার লেনদেনের ঘাটতি দেখা দিবে। ক্রমবর্ধমান আমদানির জন্য বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি দূর করিয়া অনুকূল উদ্বৃত্ত সৃষ্টির জন্যই রপ্তানি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

রপ্তানি বৃদ্ধির সমস্যা ও বাধা (problems and difficulties of raising exports) : যুদ্ধোত্তর কাল এবং বিশেষত পরিকল্পনার গত একদশকে ভারতে রপ্তানি বাণিজ্যের নিশ্চলতার দুই প্রকার কারণ দেখা যায়।

১. **অভ্যন্তরীণ কারণ (internal factors) :** ক. বর্তমানে জনসংখ্যার দ্রুত-বৃদ্ধি, এবং জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির দরুন দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে উৎপাদন যাহা বাড়িতেছে তাহার অধিকাংশই দেশের মধ্যে ব্যবহৃত হওয়ায় রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত বাড়িতেছে না। খ. দেশে মূল্যবৃদ্ধির চাপে উৎপাদন ব্যয় অধিক হওয়ায়, বিদেশে প্রতিযোগিতামূলক দরে পণ্যবিক্রয় করা যাইতেছে না। গ. ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্যগুলি উপযুক্ত আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী উৎপন্ন হয় না এবং উহাদের মোড়ক বাঁধাইও (packing) অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রকারের। ইহাতে ক্রেতারা নিরুৎসাহিত হয়। ঘ. অত্যধিক রেলভাড়া রপ্তানি বৃদ্ধির অপর বাধা।

২. **বাহ্য কারণ (external factors) :** ক. ভারতের তিনটি মাত্র প্রধান রপ্তানি দ্রব্য যথা,—পাটজাত দ্রব্য, চা ও তুলাবস্ত্র। ইহাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তীব্র প্রতিযোগিতা রহিয়াছে। উৎপাদনব্যয় বেশি হওয়ায়, অল্প দামে বিক্রয় করিয়া ইহাদের বাজার বাড়ান কঠিন। খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ভারতের আমদানি সর্বাধিক। অথচ উহার নিকট ভারতের রপ্তানি ইংলণ্ড অপেক্ষা কম। ইহার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুদার আমদানি নীতি দায়ী। ফলে ডলার এলাকার সহিত বাণিজ্যে ঘাটতি পড়িতেছে। ইহাতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে মার্কিন সাহায্য ও ঋণের উপর ভারতের নির্ভরতা বাড়িতেছে। গ. বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে পুঁজিদ্রব্যের চাহিদা প্রবল। কিন্তু ভারত পুঁজিদ্রব্য রপ্তানি আরম্ভ করিলেও (৬ কোটি টাকা, ১৯৬৩-৬৪), এখনও ভারী ও মূল শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ না হওয়ায় ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি সম্ভব নহে। ঘ. বর্তমানে পশ্চিম ইউরোপের বারোয়ারী বাজার (common

market) ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে একটি নূতন সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। ৬. বিদেশী জাহাজ পরিবহণের উপর নির্ভরতা ও তজ্জন্য উচ্চহারে জাহাজ ভাড়া রপ্তানি বৃদ্ধির অপর বাধা।

রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা (**prospects for raising exports**) : রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা আলোচনা করিতে হইলে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সমস্যাগুলির কথা মনে রাখিতে হইবে। গত ১৫ বৎসর ধরিয়া রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু রপ্তানির অচল রথ সচল হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইহার জন্য ভারতের অভ্যন্তরীণ কারণগুলি কিছু পরিমাণে দায়ী হইলেও, প্রধানত দায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে বৃহৎ ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রাধান্য। সম্প্রতি একটি হিসাবে দেখা গিয়াছে যে দুনিয়ার সকল স্বল্পোন্নত দেশের বহির্বাণিজ্যে প্রতি বৎসর গড়ে আমদানি ৬ শতাংশ বাড়িয়াছে অথচ রপ্তানি বাড়িয়াছে ৪ শতাংশ হারে।[১] ইহার কারণ বৃহৎ ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সহজেই অধিক পরিমাণে ইহাদের নিকট পুঁজিদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য রপ্তানি বাড়াইতেছে অথচ, নিজেরা আধুনিক যন্ত্রবিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রসাদে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে আত্মনির্ভরতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে।

এজন্য চতুর্দিক হইতে কথা উঠিয়াছে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি হইতে এই সকল পুঁজি রপ্তানি করিয়া স্বল্পোন্নত দেশে বিবিধ শিল্প স্থাপন করা উচিত। কিন্তু বিদেশী পুঁজির দ্বারা শিল্প স্থাপনে ইহাদের বাণিজ্যের বা আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত দূর হইবে কিনা সন্দেহ। কারণ, বিদেশী পুঁজি আসিলে উহার সুদ ও লভ্যাংশ উহার মালিক-দেশে প্রতি বৎসর পাঠাইতে হইবে। এজন্য আরও বেশি পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিবার প্রয়োজন হইবে। এবং উহার প্রয়োজনে রপ্তানি আরও বাড়াইতে হইবে। নতুবা বিদেশী ঋণের বোঝা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

রপ্তানি বৃদ্ধির নূতন ক্ষেত্র ও পন্থা (**Suggestions for raising exports**) : ১. এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে দ্রব্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ দ্বারা রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে বটে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। ২. বরং দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার স্বল্পোন্নত দেশগুলি ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের দেশগত দিক আরও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ৩. তাহা ছাড়া রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ বিশেষভাবে রহিয়াছে ঐ সকল দেশে পুঁজিদ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে। এই সকল নূতন দিগন্তপানে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারত সরকারের রপ্তানি নীতি ও গৃহীত ব্যবস্থা (**export policies and measures adopted by the Government**) : যুদ্ধোত্তর যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারত সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বহুপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারী নীতিকে এক কথায় রপ্তানি প্রসার নীতি (Export promotion policy) বলা যায়। সংক্ষেপে ইহার বিভিন্ন দিকগুলি বর্ণনা করা গেল।

---

১. The Pattern of Development of Import-Sensitive Economies-Ignac Sachs : The Economic Weekly, Annual Number, February, 1962. p. 181.

রপ্তানি প্রসারের সাংগঠনিক ব্যবস্থাসমূহ ঃ ক. রপ্তানি প্রসারের নানাবিধ প্রচেষ্টার সমন্বয় করিবার জন্য ১৯৬২ সালে ব্যবসায় পর্ষৎ (Board of Trade) স্থাপিত হয়। বর্তমানে ইহার চারিটি বিভাগীয় কার্যালয় রহিয়াছে। খ. বস্ত্রকল, রেশম ও কৃত্রিম রেশম, প্লাস্টিক ও লিনোলিয়াম, কাজুবাদাম ও মরিচ, তামাক, খেলার সরঞ্জাম, রাসায়নিক দ্রব্য, গালা, চামড়া, ইঞ্জিনিয়ারিং, অভ্র ও মসলা প্রভৃতি শিল্পের জন্য একটি করিয়া মোট ১৮টি রপ্তানি প্রসার পরিষদ (Export Promotion Council) স্থাপিত হইয়াছে। গ. রপ্তানি নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য রপ্তানিপ্রসার পরামর্শদাতা পরিষদ (Export Promotion Advisory Council) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঘ. পৃথিবীর বিভিন্নদেশে ভারতীয় দ্রব্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। ঙ. সাধারণ বেসরকারী বীমা কোম্পানী যে সকল ঝুঁকি লয় না, রপ্তানি বাণিজ্যের ঐ সকল ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া রপ্তানিতে উৎসাহদানের জন্য ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রের মালিকানায় রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন (ERIC) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৬৪ সালে ইহার স্থলে রপ্তানি ঋণ ও নিশ্চয়তা করপোরেশন (Export Credit & Guarantee Corporation) স্থাপিত হইয়াছে। চ. রাষ্ট্রায়ত্ত স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের কর্মক্ষেত্রের পরিধি সম্প্রসারিত হইতেছে। ছ. রপ্তানিপণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং উহাদের জাহাজে বোঝাই-এর পূর্বে পরীক্ষা করিবার জন্যে সরকারকে ক্ষমতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালে রপ্তানি (উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন) আইন [The Export (Quality Control and Inspection) Act] পাস হইয়াছে ও একটি রপ্তানি পরিদর্শন পরামর্শদাতা পরিষদ (Export Inspection Advisory Council) গঠিত হইয়াছে। জ. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও স্টেট ব্যাঙ্ক যাহাতে আরও বেশি রপ্তানি-ঋণ দিতে পারে সেজন্য রিজার্ভব্যাঙ্ক আইন ও স্টেটব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করা হইয়াছে। ঝ. বিদেশে ভারতীয় পণ্যের প্রচারের জন্য প্রদর্শনী অধিকার (Directorate of Exhibition) রহিয়াছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারত বুদাপেষ্ট (হাঙ্গেরী), পোজনান (পোল্যাণ্ড), লাইপজিগ (পূর্বজার্মানী), কুওয়াইত ও ১৯৬৪-৬৫ সালে নিউইয়র্কের বিশ্বমেলায় যোগ দিয়াছে। বিদেশে প্রধান শহরগুলিতে ১৫টি ব্যবসায় কেন্দ্র ও প্রদর্শনীকক্ষ (Trade centres and show rooms) খোলা হইয়াছে।

২. **অন্যান্য ব্যবস্থাসমূহ ঃ** ক. রপ্তানি প্রণোদনা কর্মসূচী (incentive scheme) —বিভিন্নশিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানির জন্য প্রযোজনীয় নানাবিধ কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের উপর আমদানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হইয়াছে। খ. করভার হ্রাস (fiscal reliefs)— বিভিন্ন রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে সকল মালমশলা ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যের উপর উৎপাদনকারীগণকে কর দিতে হয় (যেমন—কাস্টমস্ ও কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক ইত্যাদি), উহা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। তেমনি রপ্তানি দ্রব্যগুলিকে রপ্তানি বন্দরে পৌছাইবার পরিবহণ ব্যয়ের অংশ বিশেষ ফেরত দেওয়া হইতেছে এবং চা-বাগানগুলিতে স্বল্পদরে সার সরবরাহ করা হইতেছে। গ. নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ (relaxation of controls)—নানাবিধ রপ্তানি দ্রব্যের উপর নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা হ্রাস করা হইয়াছে। ঘ. বাণিজ্য চুক্তি (trade agreements)—প্রতি বৎসর বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি করা হইতেছে। সাম্প্রতিক কালের বাণিজ্য চুক্তিগুলির মধ্যে জর্ডান, টিউনিসিয়া, মরক্কো, চিলি, পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, ভিয়েতনাম, পাকিস্তান ও নেপালের সহিত চুক্তি উল্লেখযোগ্য। ঙ. ১৯৫৮ সাল হইতে রপ্তানি-বিল (export bills) গুলিকে

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিল বাজার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া রপ্তানি ব্যবসায়ীদের ঋণদান করিয়া উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। চ. ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে রপ্তানিকারিগণকে কর সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত
INDIA'S BALANCE OF PAYMENTS

আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত দেশের সহিত বহির্বিশ্বের বৈষয়িক লেনদেনের প্রতিবিম্ব। দেশের সহিত বহির্বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রীর আদান-প্রদান ছাড়া আরও অন্যান্য লেনদেন চলে। পণ্য আমদানি করিলে যেমন বিদেশের নিকট দেনা দাঁড়ায়, তেমনি, বিদেশী পুঁজির সুদ ও লভ্যাংশ পাঠাইবার কারণে, বিদেশে দূতাবাস ও শিক্ষার্থী প্রেরণে, বিদেশী ঋণ পরিশোধে, বিদেশী জাহাজ ব্যবহারের মাশুল ও বিদেশী বীমা কোম্পানির প্রিমিয়াম এবং বিদেশী পরিবহণ প্রভৃতি ব্যবহারে বহির্বিশ্বের নিকট দেশের দেনা হয়। প্রথম বিষয়টি দৃশ্য, দ্বিতীয় কারণগুলি অদৃশ্য। এই সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য কারণে বহির্বিশ্বের নিকট যেমন দেনা হয়, তেমনি অনুরূপ কারণে বহির্বিশ্বের নিকট দেশের পাওনাও হয়। এই সকল মোট দৃশ্য এবং অদৃশ্য বৈদেশিক দেনা ও পাওনার উদ্বৃত্তকে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত (balance of payments) বলে। মোট বৈদেশিক পাওনা অপেক্ষা দেনা বেশি হইলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি (deficit or adverse balance of payments) এবং দেনা অপেক্ষা পাওনা বেশি হইলে আন্তর্জাতিক লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত (favourable balance of payment) হয়।

আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলে বিদেশের নিকট দেশের পাওনা দাঁড়ায়, বিদেশী মুদ্রা উপার্জিত হয় এবং দেশের বিদেশী মুদ্রাতহবিল বৃদ্ধি পায়। তাহাতে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের ক্রয়শক্তি বাড়ে। ইহা দেশীয় অর্থনীতির সুস্থতার লক্ষণ। অপরপক্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইলে বিদেশের নিকট দেশের দেনা দাঁড়ায়, সে দেনা মিটাইতে দেশের বিদেশী মুদ্রার তহবিল হ্রাস পায়। আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের ক্রয়ক্ষমতা কমে। ইহা সাময়িক হইতে পারে। কিন্তু ক্রমাগত হইতে থাকিলে আন্তজাতিক বাজারের সহিত দেশীয় অর্থনীতির ভারসাম্যের অভাব বুঝায় এবং দেশের দুর্বলতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়।

বহির্বিশ্বের সহিত লেনদেনে ভারতের বর্তমান প্রবল সমস্যা এই যে সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক লেনদেনে ক্রমাগত প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটিতেছে। সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তের আলোচনাকে কালানুযায়ী দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগ হইতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত (১৯৪৬ হইতে ৯৫৫-৫৬)। এবং ২. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকাল হইতে বর্তমানকাল অবধি।

যুদ্ধোত্তর যুগে আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্তঃ ১৯৪৬-৫৬
BALANCE OF PAYMENTS DURING THE POST-WAR PERIOD : 1946-56

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যুগে ভারতের আমদানি সবিশেষ ছিল না, কিন্তু মিত্রশক্তিকে সহায়তার জন্য তাহাদের নিকট যুদ্ধশেষে মোট ১৭০০ কোটি টাকা স্টার্লিং পাওনা দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধকালে আন্তর্জাতিক লেনদেনে অনুকূল উদ্বৃত্তই ছিল। কিন্তু যুদ্ধশেষে দ্রুত এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। ১৯৪৮ হইতে ১৯৪৯ সালে আন্তর্জাতিক লেনদেনে প্রতিকূল উদ্বৃত্তের

পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইহা সে সময় ভারতের আন্তর্জাতিক লেনদেনের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ছিল।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী যুগের আন্তর্জাতিক লেনদেনের এইরূপ ঘাটতির কারণগুলি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—১ ব্যয় বা দেনা বৃদ্ধির কারণ। ২. পাওনা হ্রাসের কারণ।

প্রতিকূল উদ্বৃত্তের কারণসমূহ (Causes of Adverse Balance of Payments) ঃ ১. **বৈদেশিক ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ ঃ** ক যুদ্ধের সময় দেশে একদিকে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি ঘটে ও অন্যদিকে ভোগ্য পণ্যের যোগান কমে। তাহাতে যুদ্ধের শেষে দেশবাসীর হস্তে প্রচুর পরিমাণে ক্রয়শক্তি জমে, নানারূপ ভোগ্য পণ্যের অতৃপ্ত চাহিদা পুঞ্জীভূত হয় ও দেশে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার প্রতিকারের জন্য যুদ্ধশেষে নানাপ্রকার ভোগ্যপণ্য আমদানির উদার নীতি গ্রহণে আমদানি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায। খ. দেশে খাদ্য ঘাটতি মিটাইবার জন্য প্রতি বৎসর ১০০।১২৫ কোটি টাকার খাদ্য আমদানি হইতে থাকে। গ দেশবিভাগের জন্য পাকিস্তান হইতে কাঁচাপাট ও কাঁচাতুলা আমদানি করিতে হয়। ঘ কলকারখানার পুরাতন যন্ত্রপাতি বদবদল ও উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানি হয। ঙ এই সময় বিভিন্নদেশে স্বাধীন ভারতের দূতাবাস স্থাপন ও আন্তর্জাতিক সভাসমিতিতে প্রতিনিধি প্রেরিত হয।

২ **বৈদেশিক পাওনা হ্রাসের কারণসমূহ ঃ** ক. যুদ্ধযুগের প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতির চাপ এই সময়েও চলিতে থাকে। ফলে ভারতীয় পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় উহাদের রপ্তানি কমে। খ দেশবিভাগ জনিত গোলযোগে, কাঁচামাল ও শ্রমিকের অভাবে ও শ্রমসংক্রান্ত গোলযোগের দরুন শিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাইলে রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যও হ্রাস পায়।

গৃহীত ব্যবস্থা (remedies adopted) ঃ ১ **আমদানি নিয়ন্ত্রণ ঃ** ডলার ও স্টার্লিং এলাকার দেশ হইতে আমদানি কঠোরভাবে নিযন্ত্রিত হয় এবং আমদানি সম্পর্কে পরামর্শদানের জন্য একটি আমদানি পরামর্শদাতা পরিষদ (Import Advisory Council) স্থাপিত হয। ২ **রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা ঃ** ১৯৪৯ সালে একটি রপ্তানি প্রসার কমিটি নিযুক্ত হয় (Export Promotion Committee)। উহার পরামর্শ অনুযায়ী পাট ও অন্যান্য দ্রব্যের ফটকা কারবার বন্ধ করা হয। রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয। রপ্তানিশিল্পের জন্য নিযন্ত্রিত কাঁচামাল ও পরিবহণের সুবিধা দেওয়া হয। রপ্তানি পণ্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয। ৩. **খাদ্য, কৃষিজাত কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির** জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয। ৪. **মুদ্রার বহির্বিনিময় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত** হইতে থাকে। ৫. **মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য নানারূপ** মুদ্রাগত (monetary) এবং রাষ্ট্রের আয়-ব্যয গত (fiscal) নিয়ন্ত্রণ **পদ্ধতি** অবলম্বন করা হয। ৬. বিভিন্ন দেশের সহিত আমদানি-রপ্তানি চুক্তি সম্পাদিত হয। ৭ ১৯৪৯ সালে **টাকার বহির্বিনিময় মূল্য** ৩০·৫ শতাংশ **হ্রাস** করা হয।

ফলাফল (effects) ঃ এই সকল ব্যবস্থার ফলে পরবর্তী দুই বৎসরে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হ্রাস পায় (১৯৪৯-৫০ সালে ১৪২ কোটি টাকা ও ১৯৫০-৫১ সালে মাত্র ৩৮ কোটি টাকা)। অবশ্য ইহার সমস্ত কৃতিত্ব সরকারী ব্যবস্থার নহে। সে সময় কোরীয় যুদ্ধের আবহাওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামাল ও পণ্যমজুদের হিড়িকে ভারতের রপ্তানি কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাও অনেকাংশে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু পরের বৎসরই পুনরায় লেনদেনের

প্রতিকূল উদ্বৃত্ত বাড়ে (১৯৫১-৫২ সালে ১৬২ কোটি টাকা)। ইতিমধ্যে প্রথম পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইয়া যায়। এবং ভারত সরকার প্রথম পরিকল্পনায় যে বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করেন তাহাতে অধিকপরিমাণে রপ্তানি, জাতীয় স্বার্থ ও উন্নয়ন সম্পর্কিত দ্রব্য বাদে অন্যান্য আমদানি বন্ধ এবং দেশের বিদেশী মুদ্রার তহবিলের সীমার মধ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি সীমাবদ্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার ফলে প্রথম পরিকল্পনায় পরবর্তী ৪ বৎসর চল্‌তি লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। (১৯৫২-৫৩ সালে ৬০ কোটি টাকা; ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪৭ কোটি টাকা; ১৯৫৪-৫৫ সালে ৬ কোটি টাকা; ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ১২ কোটি টাকা)। সুতরাং লেনদেনের অনুকূল উদ্বৃত্ত লইয়াই প্রথম পরিকল্পনাকাল শেষ হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে, ১৯৪৮ হইতে ১৯৫৬ সালে ভারতে চল্‌তি আন্তর্জাতিক লেনদেনের মোট ঘাটতি হয় ৩৭৩ কোটি টাকা। আর দীর্ঘমেয়াদী লেনদেন (capital accounts) ধরিয়া মোট ঘাটতি হয় ৭৪৫ কোটি টাকা। ইহার সমস্তই ভারতের বিদেশী মুদ্রা তহবিল ও প্রধানত স্টার্লিং তহবিল হইতে শোধ করা হয়।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত : ১৯৫৬-৬১

BALANCE OF PAYMENTS POSITION IN RECENT TIMES : 1956-61

সংকট (The crisis) : ভারতের আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত যুদ্ধোত্তর যুগ হইতেই সন্তোষজনক নহে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহা যত সংকটাপন্ন হইয়াছিল ভারতের অর্থনীতিক ইতিহাসে তাহা তুলনাহীন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নকালে পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করিয়াছিলেন যে এই পাঁচ বৎসরে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি বা প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ১১০০ কোটি টাকার মত হইবে। অর্থাৎ ঐ পরিমাণ অতিরিক্ত বিদেশী মুদ্রা লাগিবে। কিন্তু কার্যত ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত লেনদেনের মোট প্রতিকূল উদ্বৃত্ত হইয়াছে ২১০০ কোটি টাকার মত। প্রকৃতপক্ষে সংকট গভীর হইবার একটি প্রধান কারণ এই যে সরকার যেরূপভাবে পর্যায়ক্রমে আমদানি করিবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহা ঘটে নাই। এবং পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরেই হঠাৎ সর্বাধিক পরিমাণ প্রতিকূল উদ্বৃত্ত ঘটে (১৯৫৬-৫৭ সালের চলতি লেনদেনের ঘাটতি ৪২৭ কোটি টাকা)। পরিকল্পনার শেষ বৎসরেও লেনদেনের পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পায় (১৯৬০-৬১ সালে ৩৬৫ কোটি টাকা)। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচবৎসরে গড়ে প্রতিবৎসর রপ্তানি হইয়াছে ৬১৪ কোটি টাকার দ্রব্য আর আমদানির পরিমাণ গড়ে ১০৭২ কোটি টাকার দ্রব্য। এই সংকটের চাপে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অংশত কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে। দেশের বিদেশী মুদ্রা তহবিল সংকটজনকরূপে হ্রাস পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে বিদেশী মুদ্রার তহবিল ছিল ৮২৪ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে তাহা কমিয়া ৩১৮ কোটি টাকায় পরিণত হয়।

কারণসমূহ (causes) : ভারতের আন্তর্জাতিক লেনদেনের অভূতপূর্ব সাম্প্রতিক প্রতিকূল উদ্বৃত্তের কারণগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১. বৈদেশিক ব্যয় বা দেনা বৃদ্ধি। ২. বৈদেশিক পাওনা বৃদ্ধির অভাব।

১. বৈদেশিক ব্যয় বা দেনা বৃদ্ধি : এই সময়ে প্রধানত যে সকল কারণে ভারতের বৈদেশিক ব্যয় বা দেনা বাড়ে তাহা হইল—ক. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী ও বুনিয়াদী শিল্প স্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পুঁজিদ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানি হয় (১৯০০ কোটি টাকা)। খ. দেশে খাদ্য ঘাটতি মিটাইবার জন্য সরকার যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমদানি

করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাপেক্ষা অনেক অধিক [illegible] আমদানি করিতে হয় (আমদানির লক্ষ্য ছিল ৬০ লক্ষ টন, প্রকৃত আমদানি ২ কোটি টন)। গ. ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত আমদানি নীতি অপেক্ষাকৃত উদার থাকায় অনেক ভোগ্যপণ্য আমদানি হইয়াছে। ঘ. দেশ-রক্ষার জন্য অধিকপরিমাণে সাজসরঞ্জাম আমদানি হয়। ঙ. আন্তর্জাতিক বাজারে তেজীভাবের জন্য আমদানি জিনিসের দর বেশি পড়ে। চ. সুয়েজখালে যুদ্ধের জন্য আমদানিপণ্যের জাহাজমাশুল সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ছ. বস্ত্রশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাঁচাতুলাও অধিক দরে আমদানি করিতে হয়। জ. বিদেশী ঋণের সুদ দিতে হয়। এই সকল কারণে ভারতের মোট আমদানি ও উহার মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

২. **বৈদেশিক পাওনা বৃদ্ধির অভাব :** বৈদেশিক পাওনা বৃদ্ধির (অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের) প্রধান উপায় রপ্তানি বৃদ্ধি। পরিতাপের বিষয় যে বহুবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই বলিলেই চলে। বরং ১৯৫৮-৫৯ সালে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় বিশেষ হ্রাস পায় (৫৭৬ কোটি টাকা)। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৬৪০ কোটি টাকা। তৃতীয় বৎসরে (১৯৫৭-৫৮ সালে) উহা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় (৬৬৮ কোটি টাকা)। পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৬০-৬১ সালে) উহা পুনরায় ৬৩১ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। রপ্তানি বৃদ্ধির এই ব্যর্থতায় লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্তের অন্যতম প্রধান কারণ।

গৃহীত সরকারী ব্যবস্থা (governmental measures adopted) :

১. **আশু ব্যবস্থা :** আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি বৃদ্ধির দরুন বিদেশীমুদ্রার তহবিল দ্রুত কমিতে থাকিলে যখন বিদেশীমুদ্রার সংকট দেখা দেয়, তখন সরকার অবিলম্বে—ক. নিদারুণ কঠোরভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণ জারী করেন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্পের (core projects) প্রয়োজন ব্যতীত অন্য সকলপ্রকার আমদানি বন্ধ করিয়া দেন। খ. বিদেশী ঋণ সংগ্রহের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এজন্য বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, মার্কিন আমদানি-রপ্তানি ব্যাঙ্ক, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, সোভিয়েত, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রায় ২২৬৪ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য পাওয়া যায়। গ. বাকি ও কিস্তিতে বিদেশী পুঁজিদ্রব্যের মূল্য শোধের বন্দোবস্ত করা হয়। ঘ. পত্রমুদ্রা প্রচলনের জমা রাখিবার পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া ন্যূনতম জমার পদ্ধতি গৃহীত হয় (১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংশোধন আইন)। ১৯৫৭ সালের সংশোধনের দ্বারা পত্রমুদ্রার ন্যূনতম বিদেশী পাওনার জমা কমাইয়া মাত্র ৮৫ কোটি টাকা করা হয়। ইহাতে পত্রমুদ্রার জমা হইতে অতিরিক্ত বিদেশী পাওনা, লেনদেনের ঘাটতি মিটাইবার কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়। ঙ. রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় যাহাতে না বাড়ে সেজন্য মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী ব্যবস্থা কিছু পরিমাণে অবলম্বন করা হয়।

২. **রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা :** রপ্তানি বৃদ্ধিই আন্তর্জাতিক লেনদেনের ঘাটতি দূরীকরণের প্রকৃষ্ট উপায়। এজন্য পাঁচ প্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। ক. সাংগঠনিক ও প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা—ইহার মধ্যে আছে স্টেট ট্রেডিং করপোরেশন, রপ্তানি প্রসার পরামর্শদাতা পরিষদ, বিভিন্ন রপ্তানি দ্রব্যে ১২টি রপ্তানি প্রসার পরিষদ, রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন, বৈদেশিক বাণিজ্য বোর্ড ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা ও বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন। খ. রপ্তানি প্রণোদনা কর্মসূচীগ্রহণ দ্বারা রপ্তানিশিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের

আমদানি শিথিলকরণ। গ. রপ্তানিদ্রব্য ও উহার কাঁচামালের উপর করভার হ্রাস। পরিবহণে স্বল্পভাড়ার ব্যবস্থা। ঘ. বপ্তানি নিয়ন্ত্রণেব কঠোরতা হ্রাস। ঙ. রপ্তানি ব্যবসায়ে ঋণের সুবিধা বৃদ্ধিব জন্য বপ্তানিবিলগুলিকে বিজার্ভ ব্যাঙ্কেব বিল বাজাব পবিকল্পনাব অন্তর্ভুক্তিকরণ।

৩. **উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা:** দেশে খাদ্য ও কাঁচামালেব ঘাট্‌তি দূব করিয়া স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জনেব জন্য দ্বিতীয় পবিকল্পনায কৃষিব উৎপাদন লক্ষ্য বর্ধিত কবা হয। তৃতীয় পবিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পেব উন্নয়নকে সমভাবে অগ্রাধিকাব প্রদান কবা হইয়াছে। কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধিব লক্ষ্য দেশেব প্রয়োজন মিটাইযা বপ্তানিব দ্বাবা বিদেশী মুদ্রা অর্জন কবা ও আমদানিব প্রয়োজন হ্রাস কবা।

মন্তব্য (comments): দ্বিতীয় পবিকল্পনাতে প্রধানত বিদেশী সাহায্যেব উপব নির্ভব কবিয়াই লেনদেন ও বিদেশী মুদ্রাব সংকট উত্তীর্ণ হওয়া গিযাছে। কিন্তু প্রতিকূল উদ্বৃত্তেব প্রবণতা বিচাব কবিলে কবে যে অবস্থাব উন্নতি হইবে সে সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যাইতেছে না।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লেনদেন উদ্বৃত্তের অবস্থা: ১৯৬১-৬৬

BALANCE OF PAYMENTS POSITION DURING THIRD PLAN 1961-66

তৃতীয় পবিকল্পনাতে আন্তর্জাতিক লেনদেনেব ঘাট্‌তি ৩২০০ কোটি টাকায পবিণত হইবে বলিয়া পবিকল্পনা কমিশন হিসাব কবিযাছেন। (এই ঘাটতিব হিসাব কমিশন এইভাবে কবিযাছেন: বৎসবে গড়ে ৭৪০ কোটি টাকাব বপ্তানি হইবে এই প্রত্যাশায ৫ বৎসবে মোট রপ্তানিব পবিমাণ ধবা হইযাছে ৩৭০০ কোটি টাকা অর্থাৎ ইহা হইল ভাবতেব মোট আয। আব ব্যযেব খাতে ধবা হইযাছে ক. সংবক্ষণ মূলক আমদানি (maintenance imports) ৩৬৫০ কোটি টাকা + উন্নযন মূলক আমদানি (development imports) ২১০০ কোটি টাকা + খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল ইত্যাদি আমদানি ৬০০ কোটি টাকা + পূর্বেকাব বিদেশী ঋণ শোধ (সুদ ও আসল) ৫৫০ কোটি টাকা। সুতবাং মোট ব্যয ৬৯০০ কোটি টাকা, মোট আয ৩৭০০ কোটি টাকা = ঘাট্‌তি ৩২০০ কোটি টাকা। ইহাব মধ্যে মার্কিন যুক্তবাষ্ট্রেব পি এল. ৪৮০ দ্বাবা ৬০০ কোটি টাকাব সাহায্য পাওয়া যাইবে। অতএব নীট ২৬০০ কোটি টাকাব ঘাট্‌তি মিটাইবাব জন্য ঐ পবিমাণ বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহেব সমস্যা থাকিযা যাইবে। তৃতীয় পবিকল্পনাব প্রথম দুই বৎসবে প্রত্যাশিত বপ্তানি হয নাই। ১৯৬১-৬২ সালে ৬৬০ কোটি টাকা এবং ১৯৬২-৬৩ সালে ৬৮৫ কোটি টাকা। তৃতীয় বৎসবে (১৯৬৩-৬৪) কিঞ্চিৎ উন্নতি পবিলক্ষিত হয় (বপ্তানি ৭৬৬ কোটি টাকা)। ১৯৬৪-৬৫ সালে বপ্তানিব পবিমাণ আশাতিবিক্ত হইবে বলিয়া বলা হইতেছে। কাবণ ১৯৬৪ সালেব ডিসেম্বব অবধি ঐ বৎসবে ৮৩৫ কোটি টাকা বপ্তানি হইযাছে। বপ্তানি বাণিজ্যেব ক্ষেত্রে কোন অঘটন না ঘটিলে তৃতীয় পবিকল্পনাব প্রত্যাশিত ৩৭০০ কোটি টাকাব বপ্তানি লক্ষ্য পূর্ণ হইবাব সম্ভাবনা বহিযাছে।

কিন্তু, ১৯৪৫ সালেব ফেব্রুযাবী মাসে আবাব বিদেশী মুদ্রাব সংকট দেখা দেয। লোকসভায় অর্থমন্ত্রী ঘোষণা কবেন যে বিদেশীমুদ্রা তহবিলেব আইনত ন্যূনতম পবিমাণ ৮৫ কোটি টাকা অপেক্ষা কমিযা গিয়াছে (৭৯ কোটি টাকা)। এজন্য প্রধানত দাযী হইতেছে, ইদানীং অত্যধিক খাদ্য আমদানি, দেশবক্ষা দ্রব্য আমদানি, বিদেশী পুঁজিব মুনাফা ও বিদেশী ঋণেব সুদ বাবদ বিদেশে অর্থ প্রেরণ। ইহা ছাড়া চোবাই আমদানি (smuggling) ও দায়ী। আবেকটি অসুবিধাও এজন্য আংশিক দায়ী। তাহা এই যে, আমাদের যে রপ্তানি বাড়িয়াছে তাহার মূল্যের অধিকাংশই ভারতের টাকায় পাওয়া যাইবে, বিদেশী মুদ্রায় নহে। ইহার প্রতিকারে,

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে আরও সাময়িক ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে রপ্তানিকারিগণকে করসংক্রান্ত সুবিধা দেওয়া হইয়াছে ও অবশ্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি দ্রব্য ছাড়া যাবতীয় আমদানির উপর ১০% অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক আরোপ করা হইয়াছে। ইহার ফলে রপ্তানি বাড়িবে ও আমদানি কমিবে আশা করা যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য গৃহীত সরকারী ব্যবস্থা

GOVERNMENTAL MEASURES ADOPTED DURING THIRD PLAN:

রপ্তানি প্রসার কল্পে ১৯৬২ সালের মে মাসে ব্যবসায় পর্ষৎ (Board of Trade) গঠিত হয়। ইহা শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতিনিধিদের সহিত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে রপ্তানি প্রসারের নীতি গ্রহণ করে। আরও ৬টি নূতন রপ্তানি প্রসার পরিষদ গঠিত হইয়াছে, এইগুলি লইয়া সর্বসমেত ১৮টি পরিষদ গঠিত হইল। ১৯৬৩ সালে একটি আইনের দ্বারা [The Export (Quality control & Inspection) Act] রপ্তানি দ্রব্যের গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন করিবার জন্য সরকারের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। রপ্তানিকারীদের সুবিধাজনক শর্তে ঋণ সরবরাহ করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন ও ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক আইন দুইটিকে সংশোধন করা হইয়াছে। পুরাতন রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশনের (Export Risks Insurance Corporation) বিলোপসাধন করিয়া তৎস্থলে, রপ্তানি ঋণ এবং নিশ্চয়তা করপোরেশন (Export credit and Guarantee corporation) স্থাপিত হইয়াছে। এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানটি পুরাতন রপ্তানি বীমা করপোরেশনের (ERIC) বীমার দায়দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও রপ্তানি প্রসারের জন্য অতিরিক্ত ঋণ সরবরাহ করিবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে রপ্তানিদ্রব্যের উপরে করভার হ্রাস করা হয়। রপ্তানি প্রসারের সম্ভাবনাপূর্ণ কয়েকটি দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাছাড়া পৃথিবীর বহু দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিল্পমেলায় ১৯৬৩-৬৫ সালে ভারত অংশ গ্রহণ করে। লেনদেনের ক্ষেত্রে অসাম্য হ্রাসের জন্য এবং রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর ৩১টি দেশের সহিত ১৯৬৩ সালে ভারত বাণিজ্য চুক্তি (Trade Agreements) করে।

মন্তব্য (Comments): বর্তমানে ভারতের আন্তর্জাতিক লেনদেনের যে ঘাটতি দেখা যাইতেছে তাহা সাময়িকও নহে, আকস্মিকও নহে। ইহা ভারতের আকাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম দিকে এই ঘাটতি বিদেশী সাহায্যের দ্বারাই মিটাইতে হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন। তবে ইহাকে ধীরে ধীরে কমাইয়া যথাশীঘ্র সম্ভব নির্মূল করিতে হইবে। এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করিতে হয়। বিদেশ হইতে যে পুঁজি আমদানি করা হয় তাহার ব্যবহারের সময় সর্বদা এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিত যে, আমরা ঐ পুঁজিকে এমন ভাবে ব্যবহার (বিনিয়োগ) করিব যাহাতে ভবিষ্যতে আমাদের বিদেশী মুদ্রা সঞ্চিত হইতে থাকিবে। এই বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ভারত যে কর্মনীতি অনুসৃত হইতেছে তাহা হইল স্বদেশে ঠিক সেই সকল দ্রব্য উৎপাদন করা যেগুলি আমরা বিদেশ হইতে এখনও আমদানি করিতেছি। ইহাতে স্বদেশজাত দ্রব্য দ্বারা দেশের চাহিদা মিটান যাইবে; ফলে বিদেশী আমদানি ক্রমশঃ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে। কিন্তু বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ের যে আরও একটি পথ আছে—এবং এই পথটি নিঃসন্দেহে অধিকতর ফলপ্রসূ এবং দেশের অর্থনীতির দিক হইতে ইহার অনুকূল প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী—সেই পথ গুরুত্বসহকারে কমিশন বিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পথটি হইল এই বিদেশী পুঁজির দ্বারা এমন শিল্প গড়িয়া তোলা যাদের উৎপন্নদ্রব্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচুর রপ্তানি

বিদেশী মুদ্রা (অর্জন) সঞ্চয় করা সম্ভব হইবে। ইহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রমসারিত শ্রমবিভাগের ব্যাপকতর সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়। হয়ত যুক্তি দেখান হইবে যে, ভারতের নবনির্মিত শিল্পগুলি তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যের উপযুক্ত রপ্তানি বাজার খুঁজিয়া পাইতে অসুবিধা বোধ করিতেছে। উত্তরে এ কথা বলা যায় যে, ভারতীয় শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য শিল্পজাত দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়মাবলী
GOLD CONTROL RULES

কঠোর সরকারী হুঁশিয়ারী সত্ত্বেও ভারতে স্বর্ণের অত্যুচ্চ মূল্যের যখন কোন নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইল না এবং নানাবিধ সরকারী উদ্যোগের পরেও স্বর্ণ-ঋণপত্রে (Gold bond) জনসাধারণের বিনিয়োগের পরিমাণ হইল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক তখন ভারতরক্ষা আইনের বলে স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ নিয়মাবলী জারী করা হয়। ১৯৬৩ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখ হইতে উহা বলবৎ হইয়াছে।

স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য : ১. স্বর্ণের চোরাই চালান বন্ধ করিয়া স্বর্ণের অভ্যন্তরীণ মূল্য হ্রাস করা; ২. স্বর্ণের অভ্যন্তরীণ চাহিদা নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা; ৩. লুক্কায়িত ও গোপনভাবে মজুদ স্বর্ণ যাহাতে বাহির হইয়া আসে তাহার ব্যবস্থা করা। এই আইন অনুসারে প্রত্যেককে নিজ নিজ মালিকানায় কি পরিমাণ স্বর্ণ আছে সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা করিতে হইবে। কেবলমাত্র অলংকার হিসাবে, অথবা অন্যভাবে রক্ষিত স্বল্প পরিমাণ স্বর্ণ সম্পর্কে ঘোষণা করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। ইহা ছাড়া ঘোষণা ব্যতিরেকে স্বর্ণ নিজের কাছে রাখা বেআইনী। স্বর্ণব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নূতন করিয়া লাইসেন্স লইতে হইবে। বিশুদ্ধতার দিক হইতে ১৪ ক্যারাট হইতে অধিক ক্যারাটের স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ বা ব্যবহার বেআইনী। ১৯৬৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের অধীনে যাবতীয় স্বর্ণের পরিমাণ সরকারকে জানাইতে হইবে। অবশ্য অপ্রাপ্তবয়স্করা প্রত্যেকে ২০ গ্রাম এবং প্রাপ্তবয়স্করা প্রত্যেকে ৫০ গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণ বিনা অনুমতিতে রাখিতে পারিবে। একবার সরকারকে জানাইবার পর স্বর্ণের মালিকানা পরিবর্তনের সময় আবার সরকারকে ঐ বিষয়ে জানাইতে হইবে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত স্বর্ণব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অতিরিক্ত অলংকার-বহির্ভূত স্বর্ণসংগ্রহ বেআইনী হইবে। অবশ্য উত্তরাধিকার হিসাবে এবং বিশেষ অনুমতি লইয়া স্বর্ণসংগ্রহের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না। বিশেষ অনুমতি ছাড়া—অলংকার ছাড়া অন্য যে কোন স্বর্ণদ্রব্য নির্মাণ বেআইনী হইবে। ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এমন স্বর্ণবন্ধক রাখিয়া কোন প্রকারের ঋণ দেওয়া বেআইনী (অবশ্য স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রাখিয়া ঋণ দেওয়া চলিবে)।

এই নিয়মাবলী উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কতটুকু কার্যকর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। স্বর্ণালঙ্কার সম্বন্ধে কোন ঘোষণা করিতে হইবে না—সরকারের এই নীতি নিঃসন্দেহে একটি ত্রুটি, কারণ ইহা স্বর্ণনিয়ন্ত্রণের কার্যক্ষেত্রকে অনেকখানি সঙ্কুচিত করিবে। অথচ ভারতে বিপুল পরিমাণ অলঙ্কাররূপী স্বর্ণ রহিয়াছে। এই ত্রুটির পূর্ণসুযোগ সমাজ বিরোধী স্বার্থান্বেষীরা গ্রহণ করিয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর কয়েকদিন ধরিয়া অলংকারের জন্য স্বর্ণ ১২৫৲-১৩০৲ টাকায় প্রতি তোলা বিপুল পরিমাণে বিক্রয় হইয়াছে। উপরন্তু, স্বর্ণমজুদ সম্পর্কে ঘোষণার এক মাস সময় দেওয়াতে সমাজবিরোধীরা সাধারণ স্বর্ণকে অলঙ্কারে রূপান্তরিত করিয়া আইনকে ফাঁকি দিবার সুযোগ পাইয়াছে।

স্বর্ণনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ঃ—ভারতে স্বর্ণনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা নানাদিক হইতে অনুভূত হয়। ১. ভারতে স্বর্ণের প্রচলিত মূল্য অত্যধিক বেশী। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন স্বর্ণের মূল্য তোলা প্রতি ৬২½ টাকা, তখন ভারতের বাজারে প্রতি তোলা স্বর্ণের মূল্য ১৩০ টাকা হইতে ১৪০ টাকার মধ্যে ওঠা নামা করে। পৃথিবীর নানাদেশ হইতে প্রতি বৎসর ৫০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ চোরাই চালান হইয়া ভারতে আসিতেছে। অর্থাৎ প্রতি বৎসর ভারতের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় ৫০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটিতেছে। অর্থাৎ ঐ পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা যেখানে ভাবতের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত হইতে পাবিত, সেখানে উহা কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। ইহাকে সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য যে কোন সরকারী ব্যবস্থাই সকলের সমর্থন লাভ করিবে।

২. স্বর্ণনিযন্ত্রণ কার্যকরী করিতে পারিলে আন্তর্জাতিক বেসরকারী বিনিময় বাজারে ভারতীয় মুদ্রার (অর্থাৎ টাকার) মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। ইহাতে সরকারী বিনিময়-মূল্যের সাথে বেসরকারী বিনিময়-মূল্যের সমতা ফিরাইয়া আনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তিত হওযার পর বেসরকারী বিনিমযবাজাবে ভারতীয় টাকার বিনিময় হার ১৮ টাকা = ১ পাউণ্ড-এব স্থলে, ১৬ টাকা = ১ পাউণ্ড-এ দাঁড়াইয়াছে।

৩. ভারতে সচরাচর ব্যাপক আকারে ও বিপুল পরিমাণে কর ফাঁকি দেওয়া হয়, ব্যবসাযীরা ও অন্যান্য অসাধু ব্যক্তিরা তাহাদের অসৎ-উপাযে-লব্ধ আর কর ফাঁকি দিবার নিমিত্ত স্বর্ণে রূপান্তবিত করিয়া ফেলে। এ পদ্ধতিতে কর ফাঁকি দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয। স্বর্ণ নিযন্ত্রণ নিয়মাবলীর মাধ্যমে কর ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হইবে।

৪. পৃথিবীর প্রায সকল দেশেই স্বর্ণ একটি অতীব মূল্যবান জাতীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। এই কারণে অধিকাংশ দেশেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণ মজুদ করার উপবে আইনগত বাধা নিষেধ আছে। মার্কিনদেশে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান স্বর্ণ মজুদ করিতে পাবে না। মার্কিন নাগরিকদের উপরে এই বিষয়ে নানাপ্রকার বাধা নিষেধ আছে। গ্রেট বৃটেনেও ব্যক্তিগত স্বর্ণমজুদের পরিমাণ অতিশয় নগণ্য। একটা বেসরকারী হিসাবে দেখা যায যে ভারতে ব্যক্তিগত স্বর্ণমজুদের পরিমাণ (অলংকার সহ) যেখানে ১৮০০ কোটি টাকার মত, সেখানে সবকারী মজুদের পরিমাণ মাত্র ১৩০ কোটি টাকার মত হইবে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এই পরিমাণ স্বর্ণ উন্নযনমূলক কাজে ব্যবহৃত হইলে অর্থনীতির বুনিযাদ আরো বহুগুণ শক্তিশালী হইত। তদুপবি, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (I.M F.) হইতে বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা এই স্বর্ণের বিনিময়ে সংগ্রহ করা খুবই সহজ হইত।

৫. ভারতে নানা কারণে স্বর্ণের চাহিদা অত্যধিক। কিন্তু আধুনিককালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাহারও পক্ষে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ধরিয়া রাখা অপরাধ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। এই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহাবের জন্য স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই প্রযোজনীয়।

সমালোচনা (criticism) ঃ ১. ভারতে স্বর্ণের প্রতি আকর্ষণ সহস্র সহস্র বৎসরের। ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সুনিপুণ প্রচারের দ্বারা স্বর্ণের প্রতি লোকের মনোভাব পরিবর্তন করিবার ব্যবস্থা না করিয়া অকস্মাৎ আইন প্রণয়ন করিলে সুফল হইতে পারে না। ২. ভারতে স্বর্ণ দুর্দিনের নির্ভরযোগ্য সহায় ও সম্বল হিসাবে অপরিমেয় উপকার করিয়াছে। সুতরাং স্বর্ণের প্রতি আকর্ষণকে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে একান্তভাবে যুক্তিহীন মোহ বলিয়া মনে

কমুয়ার কারণ নাই। ৩. আইন প্রণয়নের দীর্ঘকাল পরেও স্বর্ণমূল্য বিশেষ হ্রাস পায় নাই। ৪. পূর্ব হইতে সুচিন্তিত ও ব্যাপক প্রস্তুতি না করিয়া এই আইন চালু করার ফলে অসংখ্য স্বর্ণশিল্পী সপরিবারে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। ইহাদের পুনর্বাসনের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ৫. যে মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই আইন চালু করা হইল সে উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না—কারণ স্বর্ণের চোরাই চালান বন্ধ হইয়া গিয়াছে এমন দাবি কেহই করিতেছেন না। এই আইন সত্ত্বেও স্বর্ণপিণ্ড হিসাবে না আসিয়া অলঙ্কার হিসাবেও স্বর্ণের চোরাই আমদানি চলিতে পারে। এমনকি চোরাই আমদানির স্বর্ণকে ১৪ ক্যারাট অলঙ্কারে রূপান্তরিত করিয়া বিক্রয় করাও সম্ভব।

১৯৬৪ সালে কৃষ্ণমাচারি স্বর্ণ আইনের কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন। পুরাতন স্বর্ণালঙ্কার পরিবর্তন করিয়া স্বর্ণশিল্পীরা নূতন অলঙ্কার নির্মাণ করিলে ১৪ ক্যারাটের বিশুদ্ধতার শর্ত মানিতে হইবে না। সম্পূর্ণ নূতন অলঙ্কার তৈয়ারী করিতে ১৪ ক্যাঃ বিশুদ্ধতাই রাখিতে হইবে। ইহাতে স্বর্ণশিল্পীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কথঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে বটে, তবে ব্যাপক কর্মহীনতার সমাধান হয় নাই।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন (প্রাঃ) লিমিটেড
STATE TRADING CORPORATION (PRIVATE) LIMITED

১. **গঠন (formation)**: ১৯৫৬ সালে মে মাসে ভারত সরকার কর্তৃক ভারতীয় কোম্পানি আইনের (১৯৫৬) অধীনে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন স্থাপিত হয়। প্রথমে ইহার অনুমোদিত পুঁজি ছিল ১ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত পুঁজি ছিল ৫ লক্ষ টাকা। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে অনুমোদিত পুঁজি বাড়াইয়া ৫ কোটি এবং আদায়ীকৃত পুঁজি বাড়াইয়া ১ কোটি টাকা করা হয়। সম্পূর্ণ পুঁজি ভারত সরকার দিয়াছেন। ইহার পরিচালনার ভার সরকার মনোনীত সদস্যগণ লইয়া গঠিত একটি পরিচালক মণ্ডলীর উপর ন্যস্ত।

২. **উদ্দেশ্য (Aims)**: ভারতের বহির্বাণিজ্যে নানারূপ দুর্বলতা রহিয়াছে। উহার মধ্যে একটি হইল বহির্বাণিজ্য পরিচালনার উপযুক্ত সংগঠনের। এ পর্যন্ত বেসরকারী উদ্যোগের দ্বারাই ভারতের বহির্বাণিজ্য চালিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক কালে ভারতের আমদানির তুলনায় রপ্তানির স্বল্পতা, বহির্বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত এবং বিদেশী মুদ্রার সংকট সৃষ্টি করিয়াছে। নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও বেসরকারী উদ্যোগনির্ভর বহির্বাণিজ্যে উন্নতি ঘটিতেছে না। তাহা ছাড়া ভারতের সহিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইতেছে। এই সকল দেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা বহির্বাণিজ্য চালিত হয়। অতএব ইহাদের সহিত বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান অধিকতর উপযোগী। এই সকল কারণে ভারতের বহির্বাণিজ্যের কাঠামো শক্তিশালী করিবার জন্য, আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশন স্থাপিত হয়। বহির্বাণিজ্যে নিযুক্ত বর্তমান বেসরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির স্থান গ্রহণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। বরং উহাদের পাশাপাশি বহির্বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিয়া সামগ্রিকভাবে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধিই ইহার লক্ষ্য। এ জন্য ইহার প্রতিষ্ঠাকে ভারতের বহির্বাণিজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগত উন্নতি (Institutional development) বলিয়া গণ্য করা হয়।

৩. ইহার প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ও পক্ষে যুক্তি (Arguments against and for its formation) :

বিপক্ষে যুক্তি : ইহার স্থাপনাকালে বেসরকারী উদ্যোগের সমর্থকগণ ইহার প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহাদের বিরোধিতার চিরাচরিত যুক্তি হইল—ক. ইহাতে বহির্বাণিজ্যে আমলাতান্ত্রিকতা ; খ. সরকারী দক্ষতা ও তৎপরতার অভাব গ. বাণিজ্যের অবনতি ; ঘ. সরকারী একচেটিয়া কারবারের কুফল ; ঙ. বাণিজ্যে ক্ষতি প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব ; এবং চ. বেসরকারী উদ্যোগের সংকোচন প্রভৃতি, ঘটিবে।

পক্ষে যুক্তি : কিন্তু ইহার সমর্থকগণের মতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় ভারতীয় সংবিধান ও সরকারী নীতিসম্মত। ইহাতে, ক. জাতীয় স্বার্থরক্ষার্থ সরকার কর্তৃক আমদানি নিয়ন্ত্রণ ; খ. অসুস্থ বেসরকারী প্রতিযোগিতার বিলোপ ; গ. মধ্যবর্তী কারবারিগণের বিলোপের দ্বারা রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ; ঘ. আমদানি ব্যয় সংকোচ ; ঙ. আমদানি পণ্যের সুষম বণ্টন ; চ. বহির্বাণিজ্যে অনুকূল শর্ত আদায় ; ছ. আমদানিপণ্যের মূল্যের স্থিতি বজায় ; জ. ভারতীয় পণ্যের নূতন বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানি বৃদ্ধি ; ঝ. বিদেশী মুদ্রা তহবিলের উপর চাপ কমাইবার জন্য বিভিন্ন দেশের সহিত সরাসরি পণ্যবিনিময় চুক্তি (barter agreements) দ্বারা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি প্রভৃতি কারণে, ইহার প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য। ঞ. ইহা ছাড়া ইহার মারফত দেশে খাদ্যশস্যের ক্রয়বিক্রয় ও বণ্টন হইলে মজুদদারী ও ফট্‌কাবাজী বন্ধ হইবে বলিয়া সরকার এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

৪. কার্য (Functions) : করপোরেশন নিম্নোক্ত কার্যাবলী পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। ক. রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নূতন বাজার সৃষ্টি। খ. অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানির নূতন নূতন উৎস আবিষ্কার। গ. আমদানির ব্যয় সংকোচ সাধন। ঘ. বাণিজ্যের অনুকূল শর্ত আদায়। ঙ. স্থিত মূল্যে (Stable price) দ্রব্য আমদানি ও দেশের মধ্যে উহাদের যথাযথ বণ্টন।

৫. সম্পাদিত কার্যাবলী (Achievements) : ক. স্থাপনাকাল হইতেই করপোরেশন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত এরূপভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছে যেন উহাদের নিকট ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা তৎপরিবর্তে ইস্পাত, সিমেণ্ট এবং যন্ত্রপাতি আমদানি করা যায়। ফলে বিদেশী মুদ্রা তহবিলের উপর চাপ পড়িতেছে না। খ. ইহা ভারতের বহির্বাণিজ্যের বৈচিত্র্য সাধনে চেষ্টা করিতেছে এবং দেশের বিবিধ চিরাচরিত ও নূতন দ্রব্যসামগ্রীর বাজার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে। গ. কস্টিক সোডা, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, পারদ, কর্পূর, রং ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল বেশি পরিমাণে আমদানি ও দেশের মধ্যে উহাদের বণ্টনে এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছে যাহাতে উহাদের দর যুক্তি সঙ্গত স্তরে নামিয়া আসে। শুধু তাহাই নহে ইহাদের আমদানির পরিমাণ ও সময় এমনভাবে স্থির করিয়াছে যেন বিভিন্ন শিল্পে উহাদের যোগানে বিভ্রাট না ঘটে এবং দেশের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিতেছে যাহাতে দেশের মধ্যে এই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে। ঘ. আমদানি ও রপ্তানির কার্য যাহাতে দ্রুত ও সুদক্ষভাবে সম্পাদিত হয় সেজন্য করপোরেশন বন্দর, খনিসমূহ এবং পরিবহণের উন্নতির জন্যও যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে।

খনিজ আকরিক, জুতা, কুটির শিল্পজাত দ্রব্য, লবণ, চা, কফি, তামাক এবং পশমী দ্রব্য ইহার রপ্তানির মধ্যে প্রধান। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে সিমেণ্ট, সোডা এ্যাস, কস্টিক সোডা,

[illegible] কাগজ, গুঁড়াদুগ্ধ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২ [illegible] সালে [illegible]
মোট ৮৭ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করিয়াছে। ১৯৬২-৬৩ সালে [illegible] কোটি টাকার
সরাসরি পণ্য বিনিময় চুক্তি করপোরেশনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

৬. **মন্তব্য (Comments) :** এপর্যন্ত বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে করপোরেশন উহার প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিলেও, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইহার কার্যাবলীর সমালোচনার কারণ ঘটিয়াছে। ইহার সিমেন্ট বণ্টন পদ্ধতিতে ছোট ব্যবসায়িগণ অপেক্ষা বড় ব্যবসায়িগণ উপকৃত হইয়াছে এবং সিমেন্টের দর বৃদ্ধি ঘটিযাছে।

খনিজ ও ধাতু বাণিজ্য করপোরেশন

MINERALS AND METALS TRADING CORPORATION OF INDIA Ltd.

১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনকে বিভক্ত করিয়া খনিজ ও ধাতু বাণিজ্য করপোরেশন গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোরেশনের নিকট হইতে খনিজ ও ধাতু সংক্রান্ত সকলপ্রকার কাজ সরাইয়া লইয়া নবগঠিত করপোবেশনের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এই করপোরেশন সম্পূর্ণভাবে সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানী হিসাবে কাজ করিবে। ইহার অনুমোদিত ও আদায়ীকৃত পুঁজির পবিমাণ যথাক্রমে ৫ কোটি ও ২ কোটি টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য: ক. খনিজ আকরিকের রপ্তানি ধাতুদ্রব্যের আমদানি সংগঠিত করা ও উহাদের দায়িত্ব গ্রহণ করা। খ. খনিজ দ্রব্য, আকরিক ইত্যাদির নূতন রপ্তানি বাজার বাহির করা ও ঐ সকল বাজাবে বিক্রয় সুংগঠন করা। ১৯৭০ সালের মধ্যে এই করপোরেশনের মাধ্যমে বৎসরে ২৫০ কোটি টাকাব আমদানিবপ্তানির কাজ নিষ্পন্ন হইবে বলিয়া আশা কবা হইতেছে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করপোবেশন ও এই নবনির্মিত করপোবেশনেব মধ্যে যোগাযোগ সাধনের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

রপ্তানি ঋণ ও নিশ্চয়তা বীমা করপোরেশন

EXPORT CREDIT AND GUARANTEE CORPORATION

১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ৫ কোটি টাকা অনুমোদিত পুঁজি ও ২॥ কোটি টাকা আদায়ীকৃত পুঁজি লইয়া ভারতীয় কোম্পানি আইন অনুযায়ী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশন গঠিত হইয়াছিল। ইহার সমস্ত পুঁজি ছিল ভারত সরকারের। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণেব জন্য ভারত সরকার যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তন্মধ্যে রপ্তানি ঝুঁকি বীমা করপোরেশনের প্রতিষ্ঠা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইহা দ্বারা ভারতের বহির্বাণিজ্যে আর একটি প্রতিষ্ঠানগত উন্নতি (institutional development) হয়। আমদানিকারিগণ দেউলিয়া হইলে বা নির্ধারিত সময়ের ৬ মাসের মধ্যে মূল্য শোধ না করিলে রপ্তানিকারীর ক্ষতির (বাণিজ্যিক ঝুঁকির ৮০% ভাগ এবং অন্যান্য কারণজনিত ক্ষতির রাষ্ট্রনৈতিক ঝুঁকির ৮৫% ভাগ) একাংশ করপোরেশন বহন করিত। বাকি অংশ রপ্তানিকারীকে বহন করিতে হইত। ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত করপোরেশন ৫৯ কোটি টাকার বীমাপত্রের ঝুঁকি লইয়াছিল।

কিন্তু ১৯৬৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বিলোপ করিয়া তৎস্থলে **রপ্তানি ঋণ ও নিশ্চয়তা করপোরেশন** (Export credit and guarantee corporation) প্রতিষ্ঠা

[illegible]

(E R I C) সকলপ্রকার বীমাসংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিবে। উপরন্তু উহা রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে অতিরিক্ত ঋণ সরবরাহের সুবিধাদান করিবে। ইহার অনুমোদিত পুঁজি ৫ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত পুঁজি ২ কোটি টাকা। রপ্তানি ঋণের বিষয়ে ইহা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হইয়া প্রধানত উহাদের মধ্যে সংযোগ সাধনের কাজ করিবে। রপ্তানি যোগ্য পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিদেশী কাঁচামাল ও অর্ধপ্রস্তুত দ্রব্য আমদানির জন্য ইহা বিদেশীমুদ্রায় ঋণ ও নিশ্চয়তা দান করিবে।

ইয়োরোপের বারোয়ারি বাজার

EUROPEAN COMMON MARKET

১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে রোম চুক্তির দ্বারা (Treaty of Rome) ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ইটালি, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ, ইয়োরোপের এই ছয়টি দেশ ধাপে ধাপে নিজেদের রাজনীতিক, সামাজিক ও অর্থনীতিক ঐক্য সাধনের সংকল্প গ্রহণ করে। চুক্তিবদ্ধ এই ছয়টি দেশকে ইয়োরোপীয় অর্থনীতিক সমাজ (European Economic Community or EEC) বলা হয়। প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ১৪ বৎসরের মধ্যে ইহারা পরস্পরের সহিত শুল্কবিহীন অবাধ বাণিজ্য ও চুক্তিবহির্ভূত অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যে শুল্ক-প্রাচীর (Tariff barrier) স্থাপনের সিদ্ধান্ত লইয়াছে। উহাদের অভ্যন্তরে শুল্কবিহীন বাজারকে ইয়োরোপীয় বারোয়ারি বাজার (European Common Market or ECM) বলা হয়। ইহা ইয়োরোপীয় অর্থনীতিক সমাজের অঙ্গ বিশেষ। ছয়টি সদস্য দেশকে চলতি কথায় "ভিতরের ছয়" (The inner six) বলা হয়। উহারা বারোয়ারি বাজার পরিচালনার জন্য একটি কমিশন বসাইয়াছে (Common Market Commission)। ইহা ছাড়া ছয়টি দেশের আইনসভায় সদস্যগণকে লইয়া একটি পার্লামেন্টিয় সদস্য সমিতি (Assembly of Parliamentarians) এবং একটি যুক্ত মন্ত্রিপরিষদ (Council of Ministers) ও একটি যুক্ত আদালত (Court of justice) ইত্যাদি গঠিত হইয়াছে।

১৯৫৯ সালের শেষ দিকে বৃটেন, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া, পর্তুগাল ও সুইজারল্যাণ্ড এই ৭টি দেশ স্টকহল্‌ম্ শহরে নিজেদের মধ্যে ধাপে ধাপে, ইয়োরোপীয় বারোয়ারি বাজারের দেশগুলির সহিত সমতালে শুল্ক হ্রাস করিয়া শুল্কবিহীন অবাধ বাণিজ্য স্থাপনের চুক্তি করে। এই ৭টি দেশকে বাহিরের সাত (The outer seven) বলা হয়। এই দেশগুলিকে ইয়োরোপীয় অবাধ বাণিজ্য সমিতি (The European Free Trade Association or EFTA) বলা হয়।

এই দুই প্রকার চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির মধ্যে প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির ঐক্য অধিক নিবিড় ও লক্ষ্য অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী। শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপীয় অর্থনীতিক সমাজকে একটি সম্মিলিত রাষ্ট্রের রূপ দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা ইহার উদ্যোক্তাদের রহিয়াছে। দ্বিতীয় চুক্তিবদ্ধ দেশগুলির লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা তত ব্যাপক নহে।

প্রথমদিকে বৃটেন ইয়োরোপীয় বারোয়ারি বাজারের পরিকল্পনা সম্পর্কে গুরুত্ব দেয় নাই। কিন্তু পরে উহার সাফল্য দেখিয়া এবং "ভিতরের ছয়" দেশগুলি বৃটেনকে বারোয়ারি বাজারে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাইলে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে বৃটেন ইয়োরোপীয় বারোয়ারি বাজারের সদস্যবাদের আবেদন করে ও পরে উহা নাকচ হয়।

ইয়োরোপীয় বারোয়ারি বাজার ও ভারত
ECM AND INDIA

বৃটেন ইয়োরোপীয় বারোয়ারি বাজারে যোগদানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ফলে বৃটেনের সহিত কমনওয়েল্থভুক্ত দেশগুলি এবং বিশেষত ভারতের বাণিজ্যসম্পর্কে গভীর পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে সংকটের আশংকা দেখা দেয়।

ইংলণ্ডের দিক হইতে ইহাতে যোগদানের যুক্তি এই যে ১৯৫৫ সাল হইতে কমন্‌ওয়েল্থ-ভুক্ত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের তুলনায় "ভিতরের ছয়" দেশগুলির সহিত উহার বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। বারোয়ারি বাজারের বাহিরে থাকিলে "ভিতরের ছয়" দেশগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় বৃটেনের রপ্তানি বাণিজ্য আরও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য বৃটেন একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত এবং আর একদিকে ইয়োরোপীয় বারোয়ারি বাজারের সহিত প্রতিযোগিতায় অপারগ হইবে বুঝিতে পারিয়া শেষ পর্যন্ত বারোয়ারি বাজারে যোগদানের সিদ্ধান্ত লইয়াছিল।

যদিও ইয়োরোপীয় বারোয়ারি বাজারের সদস্যপদের জন্য আবেদন করিবার সময় বৃটেন শর্ত আরোপ করিয়াছিল যে বারোয়ারি বাজারের তরফ হইতে কমনওয়েল্থ্‌ভুক্ত দেশগুলির স্বার্থ, উহার নিজের কৃষিস্বার্থ এবং স্টকহলমচুক্তির অন্যান্য দেশগুলির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, তথাপি বাস্তবে অন্তত কমনওয়েল্থ্‌ভুক্ত দেশগুলির স্বার্থ ইহাতে যে ক্ষুণ্ণ হইবেই তাহা একরূপ নিশ্চিত। বিশেষত ভারতের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হইবে। কারণ—এতদিন ভারত ইংলণ্ডের নিকট অন্যান্য কমন্‌ওয়েলথ্‌ভুক্ত দেশগুলির মত বৃটেনে শুল্কবিহীন ও অবাধ রপ্তানির বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়াছে। ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে ইংলণ্ড প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতের চা, তুলা, বস্ত্র, ও পাটজাত দ্রব্যাদি ইংলণ্ড সর্বাধিক পরিমাণে ক্রয় করে। বর্তমানে ইয়োরোপীয় বারোয়ারি বাজারে ইহাদের আমদানির উপর যথাক্রমে ১৮%, ১৭%, ও ২৩% শুল্ক ধার্য আছে। বৃটেন বারোয়ারি বাজারে যোগ দিলে উহার নিকট ঐ সকল দ্রব্য রপ্তানির উপর উপরোক্ত হারে কর বসিত। সুতরাং ইংলণ্ডের নিকট ভারতের রপ্তানি বিশেষভাবে কমিত। তাহাতে ভারতের বিদেশী মুদ্রাসংকট আরও বৃদ্ধি পাইত।

১৯৬৩ সালের জানুয়ারীতে বারোয়ারি বাজারের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের এক সভায় ইংলণ্ডের সদস্য পদের আবেদন নাকচ হইয়া যায়। সুতরাং ভারত-ইংলণ্ড বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। তবে ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের সদস্য পদ লাভের সম্ভাবনা একেবারেই নাই এমন কথা বলা যায় না। তেমন অবস্থায় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অশুভ ও শুভ দুই প্রকারের ফললাভের সম্ভাবনা আছে। অশুভ ফলের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, শুভ ফল সম্পর্কে বলা যায় যে, ইংলণ্ডে ভারতীয় পণ্যের সংরক্ষিত বাজার আংশিকভাবে হাত ছাড়া হইলেও ভারতের সম্মুখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে (যেমন আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা) বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ বাজার সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব দেখা দিবে। ইংলণ্ডের বাজারের উপরে একান্ত নির্ভরশীলতার মনোভাব হইতে ভারত (স্বেচ্ছায় না হইলেও) বাধ্য হইয়া মুক্ত হইবে। পৃথিবীর অন্যত্র নূতন বাজারের সন্ধান করিতে ভারতের দীর্ঘকালীন উদ্যোগহীন মনোভাব বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তিত হইবে। ইহাই শুভ দিক।

৫

মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্তরের প্রবণতা
Inflation & The Recent Price Trends

গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের জন্য হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলেও সামগ্রিকভাবে ভারতে মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে মুদ্রাস্ফীতিজনিত চাপের ফলে ইহার সূত্রপাত হয়। যুদ্ধোত্তর যুগে দেশবিভাগ, উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদির দরুন মূল্যস্তরের স্বাভাবিক স্তরে প্রত্যাবর্তন রুদ্ধ হয়। উহার অল্পকাল পরেই টাকার বহির্বিনিময় মূল্য হ্রাস এবং কোরীয় যুদ্ধের চাপে আন্তর্জাতিক তেজীবাজারের প্রভাবে আবার মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়। পরে সরকারী মুদ্রা সংকোচন নীতির দরুন ও প্রথম পরিকল্পনার শেষ দিকে উৎপাদন সবিশেষ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যস্তর নীচে নামে। কিন্তু স্বল্পকাল পরেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর হইতে মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

সুবিধার জন্য কালানুযায়ী আমরা মূল্যস্তরের আলোচনাকে চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করিতে পারি। যথা, ক. যুদ্ধযুগ। খ. যুদ্ধোত্তর যুগ। গ. প্রথম পরিকল্পনাকাল। ঘ. দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত।

ক. যুদ্ধযুগে মূল্যস্তরের গতি : ১৯৩৯-১৯৪৫
WARTIME PRICE TREND

১. **প্রবণতা (trend) :** ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতে দ্রব্যমূল্যের স্তর ভয়াবহরূপে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৩৯ সালের দ্রব্যসামগ্রীর পাইকারী মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যা ১০০ হইতে বাড়িয়া ১৯৪৫-৪৬ সালে ২৪৪ ৯-এ পরিণত হয়।

২. **কারণ (causes) :** ক. মুদ্রাস্ফীতি—সরকার কোটি কোটি টাকার পত্রমুদ্রা মুদ্রণ করিয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করে। তাহাতে বাজারে দ্রব্যের তুলনায় টাকার পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়। খ. দ্রব্যসামগ্রীর স্বল্পতা—আমদানি বন্ধ, খাদ্যের স্বল্পতা ও যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্যের অধিকাংশ যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ায় বেসামরিক অধিবাসীদের ভোগ্য ও ব্যবহার্য দ্রব্যের পরিমাণ বিলক্ষণ হ্রাস পায়। গ. গোপন মজুদ ও ফট্‌কা মুনাফালোভী ব্যবসায়িগণ অতিরিক্ত মুনাফার আশায় প্রয়োজনীয় সামগ্রী গোপনে মজুদ করে ও নানাবিধ দ্রব্য ও শেয়ার বাজারে ফট্‌কাকারবার বৃদ্ধি পায়। ঘ. পরিবহণ বিভ্রাট—দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দ্রুত আনয়নে ও প্রেরণে পরিবহণজনিত অসুবিধা মূল্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ঙ. মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্রের দক্ষতার অভাবও ইহার জন্য অংশত দায়ী।

৩. **প্রতিক্রিয়া (effects) :** অত্যন্ত উচ্চ মূল্যের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য জনসাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অবনত হয়। খ. কৃষিজাতদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামাঞ্চলের ধনী কৃষকগণের আয় বৃদ্ধি

ঊর্ধ্বগামী হইতে থাকে। ১৯৫২-৫৩ সালের মূল্যস্তরকে ১০০ ধরিয়া ভারত সরকার মূল্যস্তরের যে নূতন সূচকসংখ্যার হিসাব প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পাইকারী মূল্যস্তরের সূচক সংখ্যা ৯৮'১ ছিল। ১৯৬০-৬১ সালে উহা ১২৪'৯-এ পৌছায়। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সাধারণ মূল্যস্তর ৩০% বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর ২৭% শিল্পের কাঁচামালের মূল্যস্তর ৪৫% ও যন্ত্রশিল্পজাত পণ্যের মূল্যস্তর ২৫% বৃদ্ধি পায়।[১]

২. **কারণ (causes):** সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির কারণগুলির বিশ্লেষণে দেখা যায় চাহিদা ও যোগান দুই প্রকার শক্তিই এজন্য দায়ী। **ক. চাহিদা বৃদ্ধি:** এই সময়ে নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য দেশের অভ্যন্তরে যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা অভূতপূর্ব পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ২. বিপুল পরিমাণ ঘাট্তি ব্যয় দ্বারা পরিকল্পনা রূপায়িত করায় দেশে ব্যাঙ্ক আমানত, ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট ঋণ, কর্মসংস্থান ও দেশবাসীর হস্তে ক্রয়-ক্ষমতা (আয়) বৃদ্ধি পায়। ইহাতে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের মোট চাহিদা অভূতপূর্ব বৃদ্ধি হয়। ইহাকে মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া গণ্য করা যায়। **খ. যোগান হ্রাস:** নিম্নলিখিত কারণে দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের যোগান হ্রাস পায়। ১. ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৯-৬০ সালে প্রাকৃতিক কারণে কৃষিজ উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস পাওয়ায় খাদ্যশস্য ও তুলা তৈলবীজ প্রভৃতি কাঁচামালের যোগান হ্রাস। ২. রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টার দরুন দেশাভ্যন্তরে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান হ্রাস। ৩. ব্যাঙ্কঋণের সাহায্যে খাদ্যশস্যের গোপন মজুদ বৃদ্ধি। ৪. আমদানির কঠোর নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশাভ্যন্তরে ভোগ্যপণ্যের যোগান হ্রাস। **গ. অন্যান্য কারণ:** ১. অভ্যন্তরীণ উৎপাদন খরচের আধিক্য। ২. আমদানি দ্রব্যের বর্ধিত মূল্য। ৩. পরোক্ষ করসমূহের বৃদ্ধি। ৪. সাময়িক ভাবে আমদানি খরচের বৃদ্ধি (সুয়েজ সংকট) ইত্যাদি।

৩. **ফলাফল (effects):** ক. সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি দেশে উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎপাদকদের উৎসাহিত করিয়াছে। বর্তমান উৎপাদন-তথ্য ইহা প্রমাণিত করে। পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের কার্যক্রমে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে ঊর্ধ্বগামী মূল্যস্তরকে সহায়ক বলিয়া মনে করা হয়। খ. কিন্তু ইহার ফলে জীবনযাত্রার মান অবনত হয়। কারণ শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী-সমূহের আয় সাধারণত স্থির থাকায় তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে। শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার ব্যয় ১৯৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে ২৪% বাড়ে। ভোগ্যপণ্যাদির মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে সাধারণের ভোগের পরিমাণ সংকুচিত হয়। শ্রমিকগণের প্রকৃত আয়ের সূচকসংখ্যা ১৯৫৬ সালে ১৩৫ হইতে কমিয়া ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ১২৬-এ পৌছায়। গ. ক্রম-বর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয় শ্রমিক ও চাকুরিজীবী শ্রেণীর অসন্তোষ বৃদ্ধি করে। ইদানীংকালে ক্রমবর্ধমান শ্রমিক বিরোধ ও কর্মচারী ও শিক্ষক প্রভৃতি শ্রেণীর ধর্মঘট ও আন্দোলন ইহার সাক্ষ্য দেয়। ইহার ফলে দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ঘ. দেশের মধ্যে মজুতদারী প্রভৃতির ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। ঙ. অভ্যন্তরীণ মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা সার্থক হয় না। চ. মূল্যস্তরের অত্যধিক বৃদ্ধির দরুন দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রম অসম্পূর্ণ থাকে।

৪. **গৃহীত ব্যবস্থা (measures adopted):** সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা-গুলিকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

ক. স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা: ১. আমদানি বৃদ্ধি—খাদ্যঘাট্তি পূরণের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পুনরায় অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করা হয়। এই পাঁচ বৎসরে

১. Third Five Year Plan, p. 121,

মোট ২ কোটি টন খাদ্যশস্য আমদানি হয়। ২. খাদ্যরপ্তানি বন্ধ—প্রথম পরিকল্পনার শেষে খানিক পরিমাণে খাদ্যরপ্তানি ঘটে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্য সংকট ও খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির জন্য খাদ্যরপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয়। ৩. অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য আইনের প্রয়োগ—১৯৫৭ সালে এই আইনের সংশোধন দ্বারা খাদ্যশস্যের মজুদ দখল করিতে ও উপযুক্ত দরে উহা বিক্রয় করিবার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। ৪. সংকটাপন্ন অঞ্চলে ন্যায্যমূল্যের দোকান খুলিয়া উহার মাধ্যমে ন্যায্য দরে খাদ্যশস্যের বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ৫. অপেক্ষাকৃত অল্পদরে আমদানি খাদ্যশস্য দেশে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয়। ৬. খাদ্যে আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের জন্য একাধিক রাজ্য লইয়া এক-একটি খাদ্যাঞ্চল (যথা গম অঞ্চল, চাউল অঞ্চল ইত্যাদি) গঠিত হয়। ৭. খাদ্যশস্যের মজুদ বন্ধ ও যথাযথ বণ্টনের জন্য ধীরে ধীরে খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উহাব ভার স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনকে দেওয়া হয়। ৮. মুদ্রাগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা—দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্তর বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য নানাবিধ নূতন ও পুরাতন মুদ্রাগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। যথা,—ক. ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত ব্যাঙ্কগুলির আইনগত জমার (legal reserve) অনুপাত পরিবর্তনের ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওযা হয়। ১৯৫৭ সালে ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি করা হয় (৪%)। গ. নানাবিধ বিচারমূলক ঋণ নিযন্ত্রণনীতি অনুসৃত হইতে থাকে। খাদ্যশস্যেব ও কাঁচামালের জামিনে প্রদত্ত ব্যাঙ্কঋণের সীমা নির্দেশ, ঋণপত্রের জামিনে ঋণের মার্জিন সম্পর্কে নির্দেশ প্রভৃতি ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাহা ছাড়া খোলাবাজারী কারবারও চালিত হয়। ১৯৬১ সালে পরিবর্তনীয় জমাব পদ্ধতি প্রথম ব্যবহৃত হয়। ৯. সবকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী নীতি—প্রত্যক্ষ ও পবোক্ষ কবভার এবং সরকারী ঋণবৃদ্ধি এই প্রকার নীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ক্যালডর প্রস্তাবিত চারিটি নূতন কর প্রবর্তিত হয় (অবশ্য ১৯৬২ সালের বাজেটে ব্যয় কর প্রত্যাহৃত হয়)।

খ. দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা: ১. মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্তর বৃদ্ধিব স্থায়ী প্রতিকার হইল দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি। সেজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উৎপাদন লক্ষ্য পরে বর্ধিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে এই কারণে কৃষি ও শিল্পের উপর সমগুরুত্ব আরোপিত হইযাছে। ২. জনসংখ্যা নিযন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিকল্পনার উপর অধিক গুরুত্ব দান করা হইয়াছে।

মন্তব্য (Comments): নানাবিধ ব্যবস্থা সত্ত্বেও মূল্যবৃদ্ধি সম্পূর্ণ রোধ কবা যায় নাই। এই সকল ব্যবস্থা আংশিকভাবে সফল হইয়াছে মাত্র। এজন্য বিভিন্ন মহল হইতে পুনরায় রেশনিং ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তনের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের জটিলতার জন্য এই পরামর্শ গৃহীত হয় নাই। আর তাহা ছাড়া, মূল্যবৃদ্ধি সম্পূর্ণ দমন করাও সরকারের উদ্দেশ্য ছিল কিনা সন্দেহ। কারণ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর বিরাট ব্যয়ের পটভূমিকায় দেশে অর্থের প্রসার ও মূল্যস্তর বৃদ্ধি খানিক পরিমাণে ঘটিবেই। সুতবাং সরকারের নীতিও যতটা 'পরিমাণে নিযন্ত্রিত আর্থিক সম্প্রসারণে'র (Controlled monetary expansion) দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিল, ততটা পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে চাহে নাই।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর : ১৯৬১-৬৬
PRICE TREND DURING THE THIRD PLAN PERIOD : 1961-66

১. **প্রবণতা (trend)**: তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে (১৯৬১-৬২) পাইকারী মূল্যস্তর ১২৫.১ পৌছায় (১৯৫২-৫৩=১০০)। ইহা পূর্ববর্তী তি[illegible] বৎসরের তুলনায় মোটামুটিভাবে

স্থিরতার সূচনা করে। ইহা পববর্তী বৎসরে ('৬২-'৬৩) ১২৭'৯ পয়েন্টে উঠে। ইহাও শঙ্কাজনক বলিয়া মনে করা হয় নাই। কিন্তু পববর্তী বৎসরে ('৬৩-'৬৪) সালে মূল্যস্তর ১৩৫'৩এ পৌঁছায়। ঐ সময় হইতে ইহা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে ইহা ১৫৬'৮ অবধি বৃদ্ধি পায়। খাদ্য দ্রব্যেব সূচক সংখ্যা ১৯৬১-৬২ সালের ১২০ হইতে বৃদ্ধি পাইযা ১৯৬৪ সালেব নভেম্বরে ১৬৬'৩এ আসিয়া দাঁড়ায়। শ্রমিকশ্রেণীব ভোগ্যপণ্যের মূল্যস্তব (জীবনযাত্রাব ব্যয়) ১৯৬১-৬২ সালেব ১২৭ হইতে বাড়িয়া ১৯৬৪ সালেব অক্টোবরে ১৬৩এ আসিযা দাঁড়ায়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে তৃতীয় পবিকল্পনাকালে মূল্যস্তর আশঙ্কাজনক রূপে বাড়িযা চলিযাছে। মূল্যস্তবকে ধবিযা বাখিবাব (holding the price line) যাবতীয় নীতিই যেন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

২. **কারণ (causes)** : দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে যে সকল কাবণ মূল্যস্তব বৃদ্ধিব জন্য দায়ী বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে তৃতীয় পবিকল্পনাকালেও মূল্যস্তব বৃদ্ধিতে সেই কাবণসমূহ প্রবলভাবে বিদ্যমান। ইহা ছাড়াও কিছু নূতন কাবণ তৃতীয় পবিকল্পনাকালে সংযোজিত হইয়াছে। যথা : ক. ১৯৬২ সালেব জরুবী অবস্থা ঘোষিত হওযাব পব হইতে প্রতিবক্ষা খাতে বিপুল পবিমাণ ব্যয বৃদ্ধি। তুলনামূলক ভাবে দেখা যায় ১৯৫১-৫২ সালে এই খাতে যেখানে ব্যয় ছিল ১৭০ কোটি টাকা ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা ৬৯৩ কোটি টাকা এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে ৭১৮ কোটি টাকায় আসিযা পৌঁছায। খ. পবিকল্পনা-বহির্ভূত সবকাবী ব্যয়েব প্রভূত বৃদ্ধি। কেন্দ্রীয ও বাজ্য সবকারসমূহেব মোট ব্যয ১৯৬০-৬১ সালে ২০০০ কোটি টাকা সেখানে ঐ ব্যয ১৯৬৪-৬৫ সালে ৩৪০০ কোটি টাকাবও বেশি হয়। এত অধিক ব্যয় সমাজেব আর্থিক-আয় (money-income) প্রভূর্ত পবিমাণে বৃদ্ধি কবিযাছে। গ. বিপুল পবিমাণ কালো টাকাব (black money) সৃষ্টি। তৃতীয় পবিকল্পনাকালে এই কালো টাকাব উপদ্রব ক্রমশই মুদ্রাস্ফীতিব প্রবণতাকে তীব্র কবিতেছে। চোবাকাববাব, মজুদদাবী, বিদেশ হইতে চোবাই আমদানি (smuggling), কব ফাঁকি, বেআইনী ফট্‌কা ইত্যাদি, নানাপ্রকাব আইনবিরুদ্ধ কাজেব দ্বাবা বিপুল পবিমাণ অর্থ সমাজেব এক শ্রেণীব লোকেব হস্তে কেন্দ্রীভূত হইযাছে। এই কালো টাকাব পবিমাণ ১০০০-৩০০০ কোটি টাকা পযন্ত হইতে পাবে বলিযা অনেকে অনুমান কবেন। ঘ প্রচলিত মুদ্রাব পবিমাণও সাম্প্রতিক কালে খুব বেশি বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬১-৬২ সালে মোট মুদ্রাব যোগান ছিল ৩০৪৫ কোটি টাকা। ১৯৬৪ সালে উহা ৩৮৪২ কোটি টাকায় পৌঁছায়। ঙ. ব্যবসাযী, উৎপাদক ইত্যাদি শ্রেণীব মধ্যে মজুদ কবিযা মুনাফা অর্জনেব ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান প্রবণতা।

৩. **ফলাফল (effects)** : ১. সমাজেব বেশিব ভাগ মানুষেব জীবনযাত্রার মান দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীব লোকেদেব মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছে। বিভিন্ন শ্রেণীব লোক নানাভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ কবিতেছে ও শিল্পে শান্তি বিঘ্নিত হইতেছে। ২. চোবাকাববাবী ও মজুদদাবী পূর্বাপেক্ষা তীব্র হইতেছে। ৩ মুদ্রাস্ফীতিব জন্য পবিকল্পনাব ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে প্রযোজনীয় অর্থসংস্থান কবিতে না পাবিয়া পবিকল্পনাব লক্ষ্যকে কাটছাঁট কবিতে হইতেছে।

৪ **গৃহীত ব্যবস্থা (measures adopted)** : ১. ভাবতেব বিভিন্ন স্থানে ৮০,০০০ ন্যায্য মূল্যেব দোকান খোলা হইযাছে। ইহাছাড়া, ২. বিভিন্ন শহবে বিভিন্ন পর্যাযেব রেশনিং প্রবর্তন করা ; ৩. খাদ্যশস্যেব উচ্চতম ও ন্যূনতম ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য নির্ধাবণ করিয়া দেওয়া ; ৪. নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির খুচরা বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া যেমন পশ্চিমবঙ্গে

চাউল, মাছ, তেল, গম ইত্যাদি। ৫. চিনির সর্বভারতীয় দাম নির্ধারণ করা ; ৬. মজুদদাব ও চোরাকারবারীদের শাস্তি বিধানের জন্য অর্ডিন্যান্স জারি (১৯৬৪)। ৭. ব্যাঙ্ক বেটকে ৪½% হইতে ৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি। ৮. বিদেশ হইতে প্রচুরপবিমাণে খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করা ; ৯. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক কঠোবভাবে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ (ধান, চাউল ও চীনাবাদামেব উপর ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক ঋণ) অনুসবণ ও ১০. ১৯৬৫-৬৬ সালেব বাজেটে কযেকটি দ্রব্যেব উপব হইতে আবগাবি শুল্ক প্রত্যাহাব প্রভৃতি গৃহীত ব্যবস্থাগুলিব অন্যতম।

মন্তব্য (comments) : সবকাবী মূল্যনীতি মূল্যস্তবকে সংযত কবিতে পাবিতেছে না, ইহাই বিভিন্ন মহলের অভিমত মূল্যস্তবের অস্থিবতা পবিকল্পনাব ভিত্তিকেই আঘাত কবে, ইহা সকলেব বুঝা উচিত। কাবণ পবিকল্পনাব ব্যয় বৃদ্ধি হইতে থাকিলে হয উন্নয়নেব লক্ষ্য ক্ষুদ্রাকার কবিতে, নতুবা অতিবিক্ত ব্যয নির্বাহেব জন্য অতিবিক্ত অর্থ সংগ্রহেব প্রচেষ্টা চালাইতে হয়। এই দুইটির কোনটাই সুখকব নহে। ইহা ছাড়াও মুদ্রামূল্য ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকিলে মুদ্রাব উপবেই জনসাধাবণেব আস্থা হ্রাস পাইতে থাকে। এই আস্থা হ্রাস পাইতে থাকিলে যে সকল প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি হইতে পাবে সেগুলি কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। অর্থনীতিক উন্নয়নেব সাথে সাথে অর্থনীতিব স্থিতি (stability) সুনিশ্চিত করা যায কিনা এ প্রশ্ন ক্রমশঃ জোবে উঠিতেছে। আবাব এই প্রশ্নও উঠিতেছে অর্থনীতিক উন্নয়নেব জন্য অর্থনীতিক স্থিবত্ব বিসর্জন দেওয়া উচিত কিনা। অন্যভাবে বলা যায, ববং অর্থনীতিক স্থিতি অর্জন কবি, উন্নযন পবিকল্পনা অপেক্ষা করুক। বলা বাহুল্য এ জাতীয় মনোভাব কোনক্রমেই সুস্থ নহে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি এমন তীব্রভাবে প্রসাবিত হইতে থাকিলে জনসাধাবণ উন্নয়ন পবিকল্পনাব (তৎসহ স্থিতিব অভাব) জন্য উহা কতখানি সমর্থন কবিবে তাহা চিন্তার বিষয। সম্প্রতি বাষ্ট্রপতি পর্যন্ত এদিকে সকলেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবিযা সাবধান বাণী উচ্চাবণ কবিয়াছেন।

তৃতীয় পরিকল্পনা ও মূল্যনীতি
THIRD PLAN AND PRICE POLICY

দেশেব ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তব দেখিযা সবকাবেব মূল্যনীতি সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠিয়াছে। অভিযোগও কবা হইযাছে যে ভাবত সবকাবেব কোন সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত মূল্যনীতি নাই। মূল্যনীতিব আলোচনা প্রসঙ্গে তৃতীয পবিকল্পনায পবিকল্পনা কমিশন যাহা বলিযাছেন তাহাব সাবাংশ এই :

মূল্যনীতিকে সামগ্রিক অর্থনীতিক নীতিব অঙ্গ হিসাবে গণ্য কবিতে হইবে। ইহা শুধু বিশেষ বিশেষ প্রকাবেব মূল্যস্তব নিয়ন্ত্রণেব নীতি নহে। ভারতে সবকাবী ও বেসবকাবী, উভয প্রকাব উদ্যোগ বর্তমান। সুবিস্তৃত বেসবকারী উদ্যোগেব ক্ষেত্রে ভোগকাবিগণ সকলে নিজ নিজ লাভেব সম্ভাবনা দ্বাবা পবিচালিত হইযা কর্তব্য স্থিব কবে। এ অবস্থায় সবকাব শুধু অর্থনীতিক পবিকল্পনাব দ্বাবা ইহাদেব বিক্ষিপ্ত ও পবস্পববিচ্ছিন্ন সিদ্ধান্তগুলিকে নির্দিষ্ট পথে চালনাব চেষ্টা করিতে পাবেন। কিন্তু বেসবকাবী উদ্যোগেব অবস্থান হেতু সবকাবেব নিযন্ত্রণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। অতএব মূল্যনীতিব প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হইবে।

পবিকল্পনা কমিশন বলিযাছেন যে, উন্নযনমূলক কার্যেব দরুন মূল্যের উপব ঊর্ধ্বমুখী চাপ অবশ্যম্ভাবী। ইহা স্বাভাবিক বলিযা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে আবাব দেশে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক ও মানবিক উপাদান থাকায় এবং পূর্বেকার তেমনি প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হওয়ায় উহাদের

দ্বারা উৎপাদন আরম্ভ হইবার দরুন মূল্যের ঊর্ধ্বগতির বিরোধী চাপও খানিক পরিমাণে কার্যকর হইবে। এই দুই পরস্পর বিরোধীশক্তির চূড়ান্ত ফলাফল কি হইবে তাহা অনিশ্চিত ও পরিবর্তনশীল। তবে যেহেতু আর্থিক লাভের লোভ দেখাইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে, সেজন্য কিছু পরিমাণে মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

এমতাবস্থায় দেশে কিয়ৎপরিমাণ মূল্যবৃদ্ধির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও, যাহাতে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে না যায় সে জন্য মূল্যনীতি তিনপ্রকার ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিবে: ১. রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় নীতি (fiscal policy)। ইহার লক্ষ্য থাকিবে পরিকল্পনার লক্ষ্যানুযায়ী ভোগের মাত্রা সীমিত ও সঞ্চয় সম্ভব করিবার জন্য সাধারণের হাত হইতে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা (আয়) অতিরিক্ত কর বসাইয়া অপসারণ করা। ২. মুদ্রাগত নীতি (monetary policy)। বেসরকারী ক্ষেত্রে উন্নয়ন লক্ষ্য সাধনের জন্য আরও ঋণের প্রয়োজন হইবে। সেজন্য ব্যাঙ্কঋণের সম্প্রসারণের দিকে লক্ষ্য রাখা হইলেও মুদ্রাগত নীতির লক্ষ্য থাকিবে যেন ঋণ সৃষ্টির পরিমাণ ও সৃষ্ট ঋণের ব্যবহার পরিকল্পনার লক্ষ্যাতিরিক্ত না হয়। সেজন্য বিচারমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি ব্যবহারের প্রয়োজন হইবে। ৩. প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ (direct control)। প্রথম দুইটি নীতি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর না হইবার আশংকা আছে। সেজন্য উহাদের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৃতীয়টিও ব্যবহৃত হইবে। ইহার লক্ষ্য হইবে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির মূল্য উপযুক্ত স্তরে স্থিতিশীল রাখা। বিলাস-দ্রব্যের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না। সুতরাং দ্রব্য অনুযায়ী এই নিয়ন্ত্রণনীতির তারতম্য অনুসৃত হইবে। তাহা ছাড়া খাদ্যশস্য সম্বন্ধে নীতির দুইটি দিক আছে। প্রথমত, কৃষকরা যাহাতে উপযুক্ত দর পায় তাহা দেখিতে হইবে। এজন্য উহাদের দর নামিবার সম্ভাবনা দেখিলে সরকার খোলাবাজার হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া দরের নিম্নগতি রোধ করিবেন। দ্বিতীয়ত, ভোগকারিগণের নিকট যাহাতে খাদ্যশস্যের দর অহেতুক বৃদ্ধি না পায় সেজন্য সরকার হাতে খাদ্যশস্যের মজুদ ভাণ্ডার রাখিবেন (buffer stock)। এবং নায্য দরে যাহাতে ইহা বিক্রয় হয় সেজন্য বেসরকারী ব্যবসায়িগণের স্থলে সারাদেশে সমবায় বিপণি এবং স্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের উপর ইহার বিক্রয়ভার অর্পণ করা হইবে। এইরূপে একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ব্যবসায়ে রাষ্ট্রের প্রভাবিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত নূতন প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন সম্পন্ন করিয়া উন্নয়নের পক্ষে একটি অপরিহার্য বিষয় সৃষ্টি করা হইবে। সংক্ষেপে, তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারের পরিবর্তনীয় মূল্যনীতির (flexible price policy) ইহাই সংক্ষিপ্ত রূপরেখা। কিন্তু কার্যত, ইদানীং অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, বাস্তবে এই নীতি সরকার সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করিতে পারেন নাই।

প্রশ্নপত্র ও উত্তর সংকেত

১ : পরিবহণ

1. **Write a short note on rail-road coordination.** [Ans. ৩৪২ পৃঃ]
2. **Point out the importance of the transport system under planned economic development.** [Ans. ৩৩৫-৩৬ পৃঃ]

২ : মুদ্রা ও মুদ্রাবিনিময়

1. **Explain the origin of India's Sterling Balances. Indicate the process of their release and utilisation by India.**
[C. U., B. Com. 1946, '47. '63 C. U. B. A. 1948, '49, '52] [Ans. ৩৪৯-৫০ পৃঃ]

2. Explain the circumstances that led to the Devaluation of the Indian Rupee in September, 1949. What have been the effects of Devaluation? Is there any case for further devaluation? [C. U. B. A. 1952]
[Ans. ৩৫১-৫৩ পৃ:]

Explain the circumstances that led to the devaluation of the Indian Rupee in September, 1949. What have been the effects of the devaluation upon India's balance of payments? [C. U.B. Com. 1952]
[Ans. ৩৫১-৩৫৩ পৃ:]

Narrate Briefly the circumstances under which it was decided to devalue the Rupee in September, 1949. Did subsequent happenings justify this step? [C. U. B. A. 1962] [Ans. ৩৫১-৫৩ পৃ:]

Discuss the objectives of the I. M. F. and indicate how far its membership has been beneficial or otherwise to India. [C. U. B. A. 1955]
[Ans. ৩৫৬-৫৭ পৃ:]

6. Analyse the main feature of the present currency system of India. What changes have been recently introduced in the law relating to the paper currency reserve? [C. U. B. A. 1958. '63. C. U. B. Com. 1957'64]
[Ans. ৩৪৮-৪৯ পৃ:]

7. Indicate the factors which led to the development of a foreign exchange crisis in India during the Second Plan period. [C. U. B. Com. (Old) 1963]
[Ans. ৩৫৩-৫৬ পৃ:]

৩ঃ ভারতের টাকার বাজার ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা

1. Indicate the characteristics of the Indian Money Market and point out its defects and deficiencies. [C. U. B A. 1948 ; C. U B. Com. 1945, '47]
[Ans. ৩৫৮-৫৯ পৃ:]

2. What are the principal constituents of the Indian Money Market? Briefly describe their functions. [C. U. B. Com. 1951] [Ans. ৩৫৯-৬১ পৃ:]

3. What are the main defects of the Joint Stock Banking in India? How far have they been sought to be removed by legislation in recent years? [C U. B. A. 1950 , C. U. B. Com. 1951] [Ans. ৩৬১-৬৫ পৃ:]

4. Account for the large number of bank failures in India in recent years. What measures have been adopted for preventing such failures in future? [C. U. B. Com. (Old) 1963] [Ans. ৩৬১-৬২ পৃ:]

5. Discuss how far the Reserve Bank of India controls the Indian Money Market and Commercial Banks in the country.
[C. U. B Com. 1953, '55, '59 ; C. U , B. A. 1954, '56]
Ans ৩৬৩-৬৫, ৩৭১-৭২ পৃ:]

6. Describe the position of the Reserve Bank of India in the Banking system of the country. [B. U. B. A. 1962 (3yrs' modified course)] [Ans. ৩৭১-৭২ পৃ:]

7. Give a critical estimate of the monetary and credit policy of the Reserve Bank of India during the Second Plan period. [C. U. B. A. (old) 1963]
[Ans. ৩৬৮-৭০ পৃ:]

8. Write a short note on the Bill Market Scheme. [C. U. B. Com. (Old) 1964]
[Ans. ৩৭২-৭৩ পৃঃ]

9. Describe tho principal measures taken by the Reserve Bank of India in dealing with the problem of rising prices during the plan period.
[B. U. B. A. (Part III) 1963] [Ans. ৩৬৮-৭০ পৃঃ]

10. Carefully examine the powers and responsibilities of the Reserve Bank of India with respect to the commercial banks of this Country.
[C. U. B. Com. (old) 1964] [Ans. ৩৬৩-৬৫, ৩৭১-৭২ পৃঃ]

11. Discuss the relative importance of the principal instruments of credit control at the disposal of the Reserve Bank of India.
[C. U. B. Com. (Part 1964] [Ans, ৩৬৮-৭০ পৃঃ]

12. Write a short note on the credit policy of the Reserve Bank of India, with particular reference to the control of inflation.
[C. U., B. Com 1960 ; B. U. B. Com. 1961, '62, '64] [৩৬৮-৭০ পৃঃ]

13. Describe the various measure adopted by the Reserve Bank of India for controlling the credit situation during the plan-period.
[C. U. B. A. 1961 ; B. U. B. A. 1962-Second Plan period] [Ans. ৩৬৮-৭০ পৃঃ]

14. Discuss the Principal instruments of credit control at the disposal of the Reserve Bank of India. [C. U. B. Com. 1961] [Ans. ৩৬৮-৭০ পৃঃ]

15. "The Reserve Bank of India's monetary policy has been a policy of controlled expansion during the plan period." Explain the main features of this policy. [C. U. B. A. 1962 ; B. U. B. Com. (Mod) 1963]
[Ans. ৩৬৮ ৭০ পৃঃ]

16. Discuss how far the Reserve Bank of India has succeeded in exercising the functions of true Central Bank of India. [C. U. B. Com. 1962]
[Ans. ৩৬৫-৬৮ পৃঃ]

17. Give a critical estimate of recent experiments made by the Reserve Bank of India on the field of the selective credit control. [B. U. B. A. 1962]
[Ans. ৩৬৮-৭০ পৃঃ]

18. Give an account of the activities of the State Bank of India with reference to the financing of small industries and provisions for agricultural credit.
[C. U. B. A. 1961 '63 (Part II) '64] [Ans. ৩৭৬-৭৮ পৃঃ]

19. Indicate the main features of the scheme of insurance of bank deposits recently adopted in India. What are the aims and purposes of this scheme ? [C. U. B. A. 1952. C. U. B. Com. (Banking), '62 C. U. B. Com (New) '64 ; B. U. B. Com, '62 B. U. B.A.'61] [Ans. ৩৭৩-৭৬ পৃঃ]

20. Discuss the functions of the Reserve Bank of India.
[B. U. B. Com. (Mod.) 1964] [Ans. ৩৬৫-৬৬ পৃঃ]

21. Explain the various ways in which the commercial banking system is regulated by the Reserve Bank of India. [B. U. B. Com. (New) 1964]
[Ans ৩৬৩-৬৫, ৩৬৬-৬৭, ৩৭১-৭২ পৃঃ]

22. Comment on the adequacy of the present institutional arrangements for agricultural credit in India. Discuss, in this connection, the role of the State Bank in providing agricultural credit.
[N. B. U. B. A. (Old) 1963, B. U. B. A. (Mod) '63] [Ans. ৩৭৬-৭৮ পৃঃ]

23. Discuss the part played by the Reserve Bank of India and the State Bank of India in the provision of agricultural finance. [B. U. B. A. 1964]
[Ans. ১৩৫-৩৭ পৃঃ]

24. Examine the case for nationalisation of commercial Bank in India.
[B U B. Com. (Mod) 1964] [Ans. ৩৭৮-৮২ পৃঃ]

৪ ঃ ভারতের বাণিজ্য

1. Discuss the important changes that have taken place in the nature, volume and direction of India's foreign trade since World War II, Partition and Independence
[C U. B A 1949 '60, B. Com. 1949, '51, '53, '54] [Ans ৩৮৫ ৮৭ পৃঃ]

2 Discuss the main features of India's export trade and examine the prospect of increasing our export earnings in the near future and State the measures adopted by the Government. [C. U. B. Com. 1958, '60, '62]
[Ans ৩৮৭ ৯১ পৃঃ]

3 Discuss the effects of the Participation of Great Britain in the European Common Market on India's foreign trade [B U 1962] [Ans. ৪০৪পৃঃ]

4. Examine the causes of India's adverse balance of payment after the World War II What measures have been adopted to correct the adverse balance ? [C U B A 1951, '59 , C U B Com 1951, '56] [Ans ৩৯২ ৯৪পৃঃ]

5 Explain the causes of India's adverse balance of payments during the Second plan period [C U B. A. 1958 , C U B Com 1959, '61. B. U. B. A (Modified) B U B Com (Mod) '63 (B U. B A (Mod) '64] [Ans. ৩৯৪ ৯৬ পৃঃ]

6 Give a short account of India's adverse balance of payment difficulties in recent years How is it possible to improve the balance of payments ?
[B U B. A 1962, C U., B Com. (Part I) '63, C U B Com (old) '64]
[Ans. ৩৯৪ ৯৭ পৃঃ]

7 Describe the main features of India's foreign trade since the initiation of the First Five Year Plan. What measures would you suggest to improve India's export earnings ? [B. U B. Com. 1962 (Old course)]
[Ans ৩৮৪-৮৭, ৩৯০ পৃঃ]

8 State the arguments for and against State Trading in India.
[C. U. B. Com 1962] [Ans ৪০০-২ পৃঃ]

9. What obstacles have stood in the way of promoting India's export's in recent years ? Examine the various proposals that have been made to stimulate country's exports. [C. U. B A. (Old) 1963] [Ans. ৩৮৯ ৯২ পৃঃ]

10. Examine the causes of recent stagnation in Indian exports, what measures would you suggest for dealing with the problem ? [B U. B. A (3 yr) 1963]
[Ans ৩৮৯-৯২ পৃঃ]

11. Examine the need for increasing the volume of exports from India, what steps have recently been taken by the Government to stimulate the growth of the export trade of India ? [C. U. B. A. (P. II) 1964]
[Ans. ৩৮৮-৯২ পৃঃ]

12. Estimate the short term and long term prospects for Indian exports. Examine the suitability of export promotion measures adopted by the Government. [B. U. B. Com. (Mod) 1964] [Ans. ৩৯০-৯২ পৃঃ]
13. What are the economic reasons for a programme of export expansion ? Explain, in this connection, the future prospects of India's exports. [B. U. B. Com. (New,1964] [Ans. ৩৮৮-৯২ পৃঃ]
14. Discuss the impact of Five Year Plans on the nature and direction of India's foreign trade. [B. U. B. A. (New) 1964] [Ans. ৩৮৭-৮৮ পৃঃ]

৫ ঃ মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্তরের প্রবণতা

1. Examine the main causes explaining the continuous rise in prices in India. What steps would you suggest for checking this rise. [B U. B. A. 1962, '63] [Ans. ৪০৯-১১ পৃঃ]
2. What are the causes of the recent increases in the volume of note-issue in India ? What measures would you suggest to control any inflationary effect the increase may have on the price level ? [C. U. B. A. '61] [Ans. ৪০৭-৯ পৃঃ]
3. Give a critical survey of the measures adopted by the Government of India for checking the rise in prices. [C. U. B. Com. (P. I) 1963] [Ans. ৪০৯-১১ পৃঃ]
4. Suggest some measures to stabilise food prices in India. Give reasons in each case. [B. U. B. Com. (New) 1964] [Ans. ১৮০-৮৪ পৃঃ]
5. Examine the causes of recent rise in food grains prices in the country and suggest measures for stabilising them. [B. U. B. A. 1964] [Ans. ১৮০-৮৪ পৃঃ]

পঞ্চম খণ্ড

ভারতের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা

" ·ইহা সুস্পষ্ট যে অর্থনীতিব যে পবিবর্তন প্রয়োজন তাহাতে বাষ্ট্রকে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কবিতে হইবে। ·· ····· "

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পবিকল্পনাব বিবরণ

১

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
Economic Planning

অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা কাহাকে বলে ?
WHAT IS MEANT BY PLANNING FOR ECONOMIC DEVELOPMENT ?

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের অধিবাসীদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের জন্য সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করিয়া সামাজিক সম্পদের যথোপযুক্ত বণ্টন (allocation) ও ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত সুনির্দিষ্ট সংস্থা দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ব্যাপকতম সমীক্ষা, এবং উপযুক্ত চিন্তা ও বিবেচনার পর গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বুঝায়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তাই নানাদিকে উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের চেষ্টা করে। পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে কি কি জিনিসের উৎপাদন হইবে এবং তাহার পরিমাণ কত হইবে, উৎপাদনের উপাদানসমূহের বণ্টন কোথায়, কি ভাবে এবং কত পরিমাণ করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ের যথাযথ ব্যবস্থা করাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজ।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলিতে শুধুমাত্র রাষ্ট্রকর্তৃক অর্থনৈতিক কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ বা উহাতে বাধা নিষেধ আরোপ বুঝায় না। দেশের আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নতি সাধনই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
AIMS AND OBJECTIVES OF PLANNING

গণতন্ত্রে নাগরিকের সুস্থ জীবনের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য পাইবার অধিকারকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং নির্বিঘ্নে এই অধিকার ভোগ সুনিশ্চিত করিতে হইবে। ন্যূনতম মানের বাসস্থান ও বেশভূষার নিশ্চয়তা দিতে হইবে। শিক্ষালাভের পূর্ণ ও সমান সুযোগ তাহার চাই। আর চাই অবসর এবং তাহা বিনোদনের ব্যবস্থা। কর্মহীনতার বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষার ব্যবস্থা চাই, বার্ধক্য, রুগ্ন অবস্থা ও কর্মহীনতার বিরুদ্ধে চাই নিরাপত্তা। এই সাধারণ উদ্দেশ্যগুলিকে রূপদানের জন্য চাই সুনিশ্চিত পরিকল্পনা।

এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিকল্পনার সম্মুখে কয়েকটি লক্ষ্য রাখা হয়। যাহাতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই জনসাধারণের বৃহত্তম অংশের অভাব পূরণের ব্যবস্থা করা যায় সেজন্য প্রয়োজন সমাজের বর্তমান উপকরণসমূহের উপযুক্ত অর্থনৈতিক কার্যে সুষ্ঠু বণ্টন। ন্যূনতম ব্যয়ে সামগ্রীর উৎপাদন এবং চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করিয়া অত্যুৎপাদন ও স্বল্পোৎপাদন এই উভয় প্রকারের অবাঞ্ছিত অবস্থাকে এড়াইবার চেষ্টা করাই পরিকল্পনার লক্ষ্য।

এই প্রসঙ্গে উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশগুলির পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য বুঝিতে হইবে। শিল্পে অগ্রসর উন্নত দেশগুলিতে প্রবর্তিত পরিকল্পনার উদ্দেশ্য থাকে, প্রধানত, বাণিজ্যচক্রের আবির্ভাবের ফলে যে অর্থনৈতিক তেজীমন্দীর অবস্থা ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের বৈশিষ্ট্য, সেই তেজীমন্দীর অস্থিরতাকে যথাসাধ্য প্রশমিত করা, আয়ত্তবহির্ভূত অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যে বিপর্যয় বারংবার দেখা দেয় তাহা প্রতিরোধ করা,

ব্যাপক কর্মহীনতার সমস্যা সমাধান করা। স্বল্পোন্নত দেশগুলির ...... যাহাতে দ্রুতগতিতে অর্থনীতিক উন্নয়ন ও বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত মানবিক ও সম্পদের উপযুক্ত ও সার্থক ব্যবহার, যাহাতে তীব্র দারিদ্র্যপ্রপীড়িত জনসাধারণের উচ্চতর জীবনযাত্রার মান সুনিশ্চিত করা যায়। কৃষিনির্ভর পশ্চাৎপদ অর্থনীতি যাহাতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শিল্পায়নের দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে—ইহাও স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। ন্যূনতম পুষ্টিযুক্ত খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদির যোগান নিশ্চিত করাই এই সকল দেশের পরিকল্পনার লক্ষ্য থাকে। স্বল্পতম সময়ে বিপুলসংখ্যক কর্মহীনের কর্মসংস্থানের কার্যসূচীও স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য।

অর্থনীতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

NEED OR IMPORTANCE OF DEVELOPMENTAL PLANNING

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে বর্তমানযুগ পরিকল্পনার যুগ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ (বিশেষতঃ অনুন্নত এবং স্বল্পোন্নত দেশ) আধুনিক কালে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতিক উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে। আজকাল পরিকল্পনার বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করে এমন লোকের সংখ্যা অতীব নগণ্য। লুইসের কথায় বলা যায় মুষ্টিমেয় উন্মাদ প্রকৃতির লোক (অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী, পরিকল্পনাবিহীন-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমর্থক) ছাড়া আজ আর কেহই পরিকল্পনার বিরোধী নহে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, যাহার অর্থনীতিক রূপ হইল নিয়ন্ত্রণমুক্ত ধনতন্ত্র মতবাদ হিসাবে তাহা আজ প্রায় অস্তমিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রধান ভাবধারা ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ। ইহার প্রধান বক্তব্য ছিল, যেমন শিল্পে তেমনি ব্যবসায় বাণিজ্যে, অর্থাৎ সর্ব-প্রকারের অর্থনীতিক কার্যে রাষ্ট্র কোন রকমেই নিয়ন্ত্রণ করিবে না, সমাজের সর্বত্রই চলিবে অবাধ প্রতিযোগিতা। সর্বপ্রকার বাধানিষেধ হইতে মুক্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগই অর্থনীতিক জীবনের নিয়ামক হইবে, চাহিদা ও যোগানের শক্তি পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতে সমস্ত কিছুকে এমন একটি আদর্শ এবং স্থায়ী ভারসাম্যের অবস্থায় লইয়া আসিবে, যে অবস্থায় সমাজের বৃহত্তম জন-সংখ্যার মহত্তম কল্যাণ সাধিত হইবে, সামাজিক ভাবে কাম্য সর্বাধিক ফললাভ হইবে, বাঞ্ছিত কল্যাণময় সমাজের উদ্ভব হইবে। সুতরাং (ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ অনুসারে), সমাজের সম্পদের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানাই একমাত্র আদর্শ ব্যবস্থা। এই ব্যক্তিগত মালিকানার নিরঙ্কুশ প্রসারে এবং ব্যবস্থাপনায় একদিকে যেমন ব্যক্তির কল্যাণ অপর দিকে তেমনি সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। সুতরাং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হইল উৎপাদন ব্যবস্থার উপরে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগের এবং আহরণের সীমাহীন অধিকার।

একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, ব্যক্তিগত মালিকানার দ্বারা সমাজের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয় নাই। কারণ, ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনই এই ব্যবস্থার মুখ্য কথা এবং প্রধান উদ্দীপক ও চালক শক্তি। এ ব্যবস্থায় সমাজকল্যাণ গৌণ অথবা অনুপস্থিত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুষঙ্গ হইল সামাজিক সম্পদের অপচয়, অপব্যবহার অথবা অব্যবহার এবং উৎপাদনক্ষেত্রে তুমুল বিশৃংখলা। কোথাও অত্যুৎপাদন, কোথাও বা স্বল্পোৎপাদন। একদিকে বিলাসসামগ্রীর উৎপাদনের প্রাধান্য, অন্যদিকে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির উৎপাদনে অবহেলা ও বিভিন্ন শ্রেণীর আয়ের তীব্র বৈষম্য। একদিকে মুষ্টিমেয় জনসংখ্যার হস্তে বিপুল ধনসম্পদের কেন্দ্রীভবন, অন্যদিকে বিপুল সংখ্যক মানুষের গভীর দারিদ্র্য।

[illegible]চক্রের আবর্তনে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বারংবার বিপর্যয় এবং বিনিয়োগ ও আর্থিক-নীতির বিবেচনাহীন প্রয়োগ। সংক্ষেপে ইহাই হইল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিব বাস্তব চিত্র।

বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে ক্রমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধাবণেব মোহমুক্তি ঘটিতে লাগিল। ফলে প্রায় সকল দেশেবই অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বাষ্ট্রীয নিয়ন্ত্রণ ও পবিচালনার উদ্ভব ও প্রসার ঘটিতে লাগিল। ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে ১৯২৯-৩৩ সালের বিশ্বমন্দাব সুদূরপ্রসাবী প্রতিক্রিয়াব ফলেই পবিকল্পিত অর্থনীতিব প্রযোজনীযতা গভীবভাবে অনুভূত হয।

ভারতের ন্যায় দেশে অর্থনীতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব

IMPORTANCE OF PLANNING IN A COUNTRY LIKE INDIA

ভাবতেব মত স্বল্পোন্নত দেশে পবিকল্পনাব প্রযোজনীযতা অপবিসীম। এ দেশেব অর্থনীতিক জীবন প্রায গতিহীন, জাতীয ও মাথাপিছু আযেব স্তব অবিশ্বাস্য রকমেব নীচু, উৎপাদনশীলতা হতাশাব্যঞ্জক, জনসাধাবণেব অধিকাংশেবই দাবিদ্র গভীব, অব্যবহৃত সম্পদেব পবিমাণও বিপুল, কর্মপ্রার্থী অসংখ্য মানুষেব শ্রমেব সার্থক ব্যবহাব অল্প, তীব্র আয-বৈষম্য, অনুপার্জিত আয ভোগেব চিবন্তন কাযেমী ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রতিকূল উদ্বৃত্তেব জন্য বিদেশেব উপব নির্ভবতা, একদিকে ক্রমাগত জনসংখ্যাব বৃদ্ধি, অন্য দিকে ঐ বর্ধিত জনসংখ্যাকে আকর্ষণ কবিবাব মত শিল্পোন্নযনেব অসামর্থ্য, কৃষিব উপবে জনসংখ্যাব তীব্র চাপেব ফলে প্রচ্ছন্ন কর্মহীনতা, দাবিদ্র ও অনুন্নতিব পাপচক্রেব ব্যাপক অবস্থিতি, খাদ্য বাসস্থান ও জনস্বাস্থ্যেব শোচনীয অবস্থা,—এক কথায স্বল্পোন্নত অর্থনীতিক যাবতীয বৈশিষ্ট্য ভাবতীয অর্থনীতিতে তীব্রভাবে প্রকট। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগেব দ্বাবা এমন পশ্চাৎপদ দেশেব কাম্য গতিতে উন্নয়ন সম্ভব হইবে—এ কথা কেহই স্বীকাব কবেন না। এমন সমস্যাপীডিত দেশেব দ্রুত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নযন একমাত্র অর্থনীতিক পবিকল্পনা দ্বারাই সম্ভব।

ইদানীংকালে স্বল্পোন্নত দেশগুলিব উন্নযনেব প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলিও অন্যান্য দেশেব উদাহবণ হইতে দ্রুত উন্নয়নেব সম্ভাবনা সম্পর্কে আস্থাবান হইযা উঠিতেছে। সোবিযেত ইউনিযনেব অতুলনীয অগ্রগতি এ আস্থা আবও দৃঢ় করিয়াছে। সোবিয়েত ইউনিয়নেব জনসাধাবণেব দাবিদ্র ভাবতেব জনসাধাবণেব দাবিদ্রের মতই ছিল। কিন্তু মাত্র ৪৫ বৎসবেব মধ্যে যে গতিতে অর্থনীতিক উন্নয়ন সোবিযেত সম্ভব করিয়াছে, তাহাতেই স্বল্পোন্নত দেশগুলি আশান্বিত হইযা উঠিতেছে। সোবিয়েত দেশ এই অগ্রগতি সম্ভব করিয়াছে সমাজতন্ত্র ও অর্থনীতিক পবিকল্পনাব সাহায্যে, ব্যক্তিগত মালিকানা ও উদ্যোগেব দ্বাবা নহে। ইদানীংকালে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেব অর্থনীতিক অগ্রগতির দৃষ্টান্ত সোবিয়েত দেশ হইতে লব্ধ শিক্ষাকেই আবও সত্য ও গ্রহণযোগ্য কবিয়াছে। সোবিয়েত দেশ ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশ যাহা কবিতে সক্ষম, ভাবতের মত স্বল্পোন্নত দেশ তাহা করিতে অক্ষম হইবে কেন? প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে বিদেশী পুঁজিব নিয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিদেশী পুঁজি এই সকল অঞ্চলে সাধারণত তীব্র শোষণ ও বাজনৈতিক—অর্থনীতিক পবাধীনতাবই প্রতীক। বস্তুতই বিশ্বের ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশগুলির উন্নয়নেব পথে বিরাট বাধা। এই শোষণ ও পরাধীনতার অবসানকল্পে ভারত তথা অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশগুলিব উন্নয়ন অপবিহার্য। গণতান্ত্রিক-সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ব্যতীত এই সকল দেশের উন্নয়ন অসম্ভব।

ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথে বাধা

OBSTACLES TO ECONOMIC PLANNING IN AN UNDERDEVELOPED COUNTRY LIKE INDIA

১. স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বিদেশী ঋণের দ্বারা অর্থ সংগ্রহের কথা বলা হয়। কিন্তু বিনাশর্তে অথবা সুবিধা-জনক শর্তে বিদেশী ঋণ পাওয়ার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। অভ্যন্তরীণ ঋণের কথাও সূত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি না হইলে এই সূত্র কার্যকর হয় না। ভারতের মত দেশে জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বল্প। অধিকন্তু সঞ্চয় সৃষ্টির জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। দারিদ্রের জন্য ভারতে ভোগের স্তর খুবই নীচু, তদুপরি আরও বেশি ত্যাগস্বীকারে জনসাধারণের বৃহত্তম অংশকে উদ্বুদ্ধ করা শক্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জনসাধারণকে আরও বেশি ত্যাগস্বীকারে উদ্বুদ্ধ করা যায় যদি তাহারা নিশ্চিত ভাবে বুঝিতে পারে যে অর্থনৈতিক তাহারাও উপকৃত হইবে, পরিকল্পিত অগ্রগতির দ্বারা সৃষ্ট নূতন সম্পদের ন্যায্য অংশ হইতে উন্নয়নের ফলে তাহারা বঞ্চিত হইবে না। স্বভাবতই জাতীয় সম্পদের বণ্টন ব্যবস্থা এজন্য সামাজিক ন্যায় ও নীতিবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তবেই অধিক মাত্রায় ত্যাগ-স্বীকারের আহ্বানে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। ভারতে সংগত কারণেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, কারণ পরিকল্পনার দশ বৎসরে অর্থনৈতিক উন্নয়নে যতটুকু ফললাভ ঘটিয়াছে তাহার অধিকাংশই সমাজের মুষ্টিমেয় অংশের হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। অর্থসংগ্রহে বর্তমানযুগে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় সূত্র হইতে লব্ধ ঋণের উপরও নির্ভর করা হয়। ভারতেও এক পদ্ধতিই অনুসৃত হইতেছে।

২. সুদৃঢ়, দক্ষ ও দুর্নীতির কলুষমুক্ত শাসনতান্ত্রিক সংগঠন ব্যতীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করা যায় না। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে এই প্রকারের কর্মকুশল প্রশাসন-যন্ত্রের একান্ত অভাব। তাই পরিকল্পনার সফল পরিণতির জন্য এই পরিচালন যন্ত্র গঠন অপরিহার্য। এবং পরিকল্পনার পরিমাণ ও আকৃতি এই পরিচালন যন্ত্রের কর্মক্ষমতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

৩. ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থার অসুবিধা পরিকল্পনার সাফল্যের পথে বাধাস্বরূপ। উৎপাদনের উপাদানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সমস্যা দেখা দেয় উহাদের সুষ্ঠু ও অপচয়হীন ব্যবহারের ক্ষেত্রে, তদুপরি পরিকল্পনার গতিও অনেকাংশে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৪. ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কৃষি ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠন গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চাৎপদ কৃষির পুনর্গঠন বস্তুতই একটি সমস্যা। খণ্ডীকৃত ও বিক্ষিপ্ত জমির সমস্যা, উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সমস্যা, পণ্য বিক্রয় সমস্যা, জলসেচের সমস্যা,—এক কথায়, পশ্চাৎপদ কৃষির যাবতীয় সমস্যাই হইল আসলে কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সমস্যা। স্বল্পোন্নত দেশে, নানাবিধ সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে এই সমস্যাগুলি তীব্র আকারে বর্তমান থাকে বলিয়া পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে নানাবিধ বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

৫. স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনাকে সফল করিবার জন্য আপামর জনসাধারণের দ্বিধাহীন ও সক্রিয় সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। ইহার জন্য প্রয়োজন গণচিত্তে তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি। দেশের নেতৃবর্গ যদি এই উৎসাহ সৃষ্টিতে অক্ষম হয় তবে পরিকল্পনাকে নির্ভর করিতে হয় আমলাতন্ত্র ও ঠিকাদারদের উপর। এই অবস্থায় পরিকল্পনাকে সফল করা সম্ভব নহে।

[illegible] সৃষ্টি করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ফলে, জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশ পরিকল্পনার কার্যে অংশগ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে না। এইখানেই ভারতের পরিকল্পনার একটি প্রধান দুর্বলতা।

৬. মূল্যস্তরকে মোটামুটিভাবে স্থির রাখা অর্থনীতিক পরিকল্পনার মূল সমস্যা। পরিকল্পনার লক্ষ্য পূর্ণ করিবার জন্য ব্যয় যতই বাড়িতে থাকিবে, দ্রব্যসামগ্রীর বিশেষ করিয়া খাদ্যশস্যের উৎপাদন, প্রথমত, সেই অনুপাতে সাধারণত বৃদ্ধি পাইবে না। ফলে, সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতিজনিত কারণে ক্রমাগত-উর্ধ্বগামী মূল্যস্তরের কবলে পড়িবে। পরিকল্পনার ব্যয়ও সেই অনুপাতে বাড়িবে। অথচ, মনে রাখিতে হইবে স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

ইহাতে একদিকে পরিকল্পনার জন্য বিপুল পরিমাণ ব্যয়ে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইবে, অপরদিকে উৎপাদন বৃদ্ধি আনুপাতিকভাবে না ঘটিলে মুদ্রাস্ফীতির দরুন আর্থিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে। স্বল্পোন্নত দেশে ইহার উপরে অপর একটি অসুবিধা দেখা দেয়। শাসনতান্ত্রিক অব্যবস্থার ফলে এবং যোগানের অপ্রচুরতার জন্য খাদ্যশস্য ইত্যাদির ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া চোরাকারবার, মুনাফাখোরি ইত্যাদি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, মূল্যবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে এবং স্বল্পোন্নত দেশের খাদ্যদ্রব্যের জন্য জনসাধারণের মোট আয়ের বৃহত্তম অংশ ব্যয় হয় বলিয়া এই সকল দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে।

সুতরাং এ অবস্থায় সক্রিয়, সচেতন ও সুনির্দিষ্ট নীতি দ্বারা মূল্যস্তরকে স্থির রাখিবার চেষ্টা না করিলে উর্ধ্বগামী মূল্যস্তর পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে। তাই মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যস্তর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন অপরিহার্য হইয়া উঠে। ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তরবৃদ্ধি হিসাবের বাহিরে চলিয়া যাওয়াতে গভীর সংকটের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় এবং লক্ষ্যের ছাঁট-কাট করিয়া সংকটের হাত হইতে অব্যাহতির চেষ্টা করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায়ও অনুরূপ ঘটনা ঘটিতেছে।

৭. স্বল্পোন্নত দেশের পরিকল্পনার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ক্ষেত্রের সৃষ্টি অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ক্ষেত্রের সম্পর্ক কি হইবে, শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে কোন্ ক্ষেত্র কি প্রকারের শিল্পগঠনের দায়িত্ব পালন করিবে,—এই সকল বিষয় সম্পর্কে সুচিন্তিত নীতি নির্ধারিত না হইলে অগ্রগতি ব্যাহত হইতে পারে। এই দুই ক্ষেত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ, উভয়ের সম্প্রসারণের ক্ষেত্র নির্বাচন—এই সকল সমস্যা ও অসুবিধা সাধারণত পরিলক্ষিত হয়।

আলোচিত সমস্যাসমূহের কয়েকটি গুরুতর, একথা ঠিক। তবে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা-রচনার নৈপুণ্য, দূরদৃষ্টি, এবং সুদূরপ্রসারী সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী—এইগুলি যথোপযুক্ত-ভাবে থাকিলে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া কোন অর্থনীতিক পরিকল্পনাকেই সফল করা যায় না। কারণ, ত্যাগস্বীকারের উপরে যেখানে অনেক কিছু নির্ভর করে, সেখানে আপামর জনসাধারণকে ত্যাগস্বীকারে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন এবং তাহার জন্য অনুকূল মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করাও অপরিহার্য। ন্যায়তই, নিজেদের ত্যাগস্বীকারের দ্বারা পথপ্রদর্শন করা, দেশের সর্বপ্রকারের নেতৃত্বেরও প্রধান নৈতিক কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। ভারতের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি তেমন দৃষ্টান্ত বিতর্কাতীতভাবে স্থাপিত হয় নাই। ইহা নিঃসন্দেহে আমাদের পরিকল্পনার সাফল্যের পথে অন্তরায়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্যের শর্তাবলী
CONDITIONS FOR THE SUCCESS OF DEVELOPMENTAL PLANNING

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য কয়েকটি শর্ত পূরণ করিতে হয়। এই সকল শর্ত পূরণ হইলে পরিকল্পনার সাফল্যের পথে নানাবিধ বাধা দূর করা যায়। এই শর্তগুলি হইল :

১. **পরিকল্পনার প্রত্যেকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিক ও সুনির্দিষ্ট ভাবে স্থির করিতে হইবে।** ইহাতে কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকিলে পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বহুবিধ কাজের প্রয়োজন হয়। যদিও ঐ কাজের সবগুলিই অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে অতীব জরুরী এবং অবিলম্বেই সম্পাদন করা বাঞ্ছনীয়, তবুও সকল ক্ষেত্রের উন্নয়নের কাজ একই সময়ে শুরু করা যায় না। তাহার কারণ পর্যাপ্ত পুঁজি, উপকরণ ও উচ্চস্তরের নৈপুণ্য ইত্যাদির অভাব। এই কারণে কোন্ ক্ষেত্রের উন্নয়ন, বা কোন্ দ্রব্যের উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন কৃষির উন্নয়ন অথবা ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের বিকাশ, কোন্‌টি অগ্রাধিকার পাইবে? খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে অধিক বিনিয়োগ করা হইবে, অথবা যানবাহন সংসরণের উন্নতি অগ্রাধিকার পাইবে? কৃষির উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায় তুলা উৎপাদনে বেশি বিনিয়োগ করা হইবে অথবা পাট কিংবা তৈলবীজ উৎপাদনে? বেশি মাখন উৎপাদন হইবে না অধিক সংখ্যক বন্দুক? একই সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বেশি মাখন ও অধিক বন্দুক উৎপাদন করিতে পারিলে অর্থনৈতিক জীবনে বহু সমস্যারই সমাধান হইয়া যাইত। প্রশ্নটি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, অধিক পরিমাণ মাখন উৎপাদনে উপকরণসমূহকে ব্যবহার করিলে অধিক বন্দুক উৎপাদনে সেই উপকরণসমূহকে পাওয়া যায় না। এই কারণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত হইল অগ্রাধিকার সম্পর্কে বাস্তবানুগ নীতি নির্ধারণ। উৎপাদনের লক্ষ্য ও বিশেষ বিবেচনা ও যত্ন সহকারে স্থির করা দরকার। লক্ষ্য অতি উচ্চে রাখিলে পূরণ করা অসম্ভব হইতে পারে, আবার লক্ষ্য অতি নিম্নে রাখিয়া পরিকল্পনাকে সফল দেখানও যুক্তিযুক্ত নয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পনার লক্ষ্যকে খুব বেশি ছাড়াইয়া যাইতে পারা অথবা লক্ষ্য পূরণ করিতে না পারা—এই দুই অবস্থাই উত্তম পরিকল্পনার পরিচায়ক নহে।

২. উপযুক্ত বিবেচনার পর **একবার লক্ষ্য স্থির হইয়া গেলে বিনা দ্বিধায় ঐ লক্ষ্যকে পূরণ করিবার জন্য উদ্যোগী হইতে হইবে।** কারণ সাফল্যের জন্য পরিকল্পনাটি যেমন উত্তমরূপে রচিত হওয়া উচিত তেমনি, উহার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি কার্যসূচী ব্যাপকতম প্রচেষ্টা, দৃঢ়তা ও উদ্যোগের দ্বারা রূপায়িত করিতে হয়।

৩. **পরিকল্পনাকে এমন ভাবে রচনা করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজন অনুযায়ী উহাকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনা করিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে।** কারণ, আজ যে পরিকল্পনা শুরু করা হইল তাহা মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া চলিবে। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এই সময়ে ঘটিতে পারে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল উভয়বিধ শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। এমন অবস্থায় পরিকল্পনার কাঠামোর বা লক্ষ্যের পরিবর্তন, বা নূতনভাবে পর্যায় বিভাগ অপরিহার্য হইয়া উঠিতে পারে।

৪. পরিকল্পনার বিভিন্ন লক্ষ্য পূরণের জন্য বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করিতে হয়। পরিকল্পনার কাজ শুরু হইলে জাতীয় আয় বাড়িতে থাকে, জনসাধারণের ক্রয় শক্তি বাড়ে। এই

[illegible] দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে থাকে। যে দেশের জনসাধারণের বিপুল অংশ তীব্র দারিদ্র্যপীড়িত, সেখানে এই প্রবণতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। জাতীয় আয়ের যে অংশ পরিকল্পনার ফলে নূতন সৃষ্ট হয় তাহার সবটাই বর্তমান ভোগে ব্যয় করিয়া ফেলিলে সঞ্চয় করার কিছুই থাকে না। সঞ্চয় না হইলে পুঁজি গঠন (capital formation) হয় না। পুঁজি গঠন না হইলে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সম্ভব হয় না। দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সৃষ্টি করিয়া বিনিয়োগ করিয়া যাইতে পারিলে স্বয়ংচল ও আত্মনির্ভর অর্থনীতির বুনিয়াদ গঠন করা যায়। **প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে বর্তমান ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়।** ইহা দুইভাবে করা যায়: জনসাধারণকে স্বেচ্ছামূলক ভাবে ভোগ নিবৃত্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া অথবা কর বসাইয়া। এইভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরিকল্পনার অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করিতে ও অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

৫. **মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতিকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ** না করিলে পরিকল্পনা সংকটের সম্মুখীন হয়। পরিকল্পনার প্রথম দিকে যে হারে অর্থব্যয় হয় সেই হারে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে না। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি আরম্ভ হইয়া যায়। মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়িলে পরিকল্পনার ব্যয় বাড়িয়া যায়। গোড়ায় যে হিসাব করিয়া পরিকল্পনা শুরু করা হইয়াছে এবং লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য যে ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে মুদ্রাস্ফীতির ফলে সেসব হিসাব বানচাল হইয়া যায়।

৬. কেবলমাত্র সুষ্ঠুভাবে রচিত হইলেই একটি পরিকল্পনা সফল হইবে এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পরিকল্পনাকে চালনা ও বাস্তব রূপদানের জন্য **দুর্নীতিমুক্ত ও উদ্যোগী কর্মী লইয়া গঠিত শাসনযন্ত্র প্রয়োজন।** কারণ এই প্রকার শাসনযন্ত্রের উপরে পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। পরিচালনযন্ত্র যদি দুর্বল ও অক্ষম হয়, তবে পরিকল্পনার সাফল্য অনিশ্চিত হইতে বাধ্য। তবে এই পরিচালনযন্ত্র যেন আপনভারে ভারাক্রান্ত না হইয়া পড়ে। ইহাতে পরিকল্পনার ব্যয় অহেতুক বৃদ্ধি পাইবে। পরিচালনযন্ত্র যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রীকৃত করিয়া এই লক্ষ্য পূরণ করা উচিত।

৭. পরিশেষে **সক্রিয় জনসহযোগিতা** ব্যতীত পরিকল্পনাকে সফল করা যায় না। এতদুদ্দেশ্যে পরিকল্পনার রচনা ও কার্যে রূপদান এমন ভাবে করিতে হইবে যাহাতে গণউদ্দীপনা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়।

পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংস্থান

FINANCING THE PLAN

গতানুগতিক মন্থর ধারায় চলিলে স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যসূচী রূপায়িত করিতে অতি দীর্ঘ কাল লাগিবে। যথাসাধ্য স্বল্পকালের মধ্যে উন্নয়ন সফল করিতে, অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে ও কৃষি শিল্প ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের গতি ত্বরান্বিত করিতে, পরিকল্পনার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করিতে হয়। পরিকল্পনার লক্ষ্য যত বড়, উন্নয়নের কার্যসূচী যত ব্যাপক হইবে, প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয়ের পরিমাণও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে। পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ কোন্ কোন্ সূত্র হইতে সংগৃহীত হয় তাহা নিম্নে আলোচিত হইল:

১. কররাজস্ব। ২. জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ ও স্বল্পসঞ্চয়। ৩. দেশের

অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য সূত্র। ৪. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ক্ষেত্রের প্রাক্তনলব্ধ উদ্বৃত্ত। ৫. বৈদেশিক সূত্র। ৬. ঘাটতি ব্যয়।

১. **কররাজস্ব**ঃ নানাবিধ তত্ত্বের দিক হইতে ইহা সত্য যে, কর বসাইয়া সরকার দেশের অভ্যন্তর হইতে অর্থ সংগ্রহ করে। এই সূত্রে যত অধিক অর্থ সংগ্রহ করা যায় পরিকল্পনার পক্ষে ততই ভাল, কারণ ইহাতে অন্যান্য সূত্রের উপরে কম নির্ভর করা চলে। অন্যান্য সূত্রের উপরে নির্ভরতা কমিয়া গেলে পরিকল্পনার অনেক সমস্যা দূর হয়। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের মুষ্টিমেয় বিত্তশালী ছাড়া জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মান এত নিম্নস্তরের এবং দারিদ্র এত প্রকট যে, করের মাধ্যমে প্রযোজনীয় পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। প্রত্যক্ষ করের হার অধিকতর গতিশীল করিলে ধনবানের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু করের হার খুব বেশি গতিশীল করা হইলে সাধারণত করপ্রবঞ্চনার প্রবণতা বাড়ে। এই করপ্রবঞ্চনাকে প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি ও নৈপুণ্যসম্পন্ন করআদায়কারী বিভাগ না থাকিলে প্রত্যক্ষ করের হার অধিকতর গতিশীল করিয়া ফল লাভ হয় না, উপরন্তু, ইহা বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদিগকে নিরুৎসাহিত করে। অন্যদিকে, পরোক্ষ করের আওতায় দরিদ্রতম জনসাধারণকে আনিলে, করলব্ধ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বটে, তবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমাগত বাড়িতে থাকে ও তাহার ফলে জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাইতে থাকে। তাহা ছাড়া পরোক্ষ কর বাড়িলে উৎপাদন ব্যয় ও মূল্যস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়। ইহাতে করভার করপ্রদানের ক্ষমতার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করে না, জনসাধারণের উপরে অন্যায় চাপ পড়ে।

ভারতের **প্রথম পরিকল্পনায়** এই সূত্রে ৬৩৭ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছি।। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** এই সূত্রে প্রকৃত সংগ্রহের পরিমাণ ১৩৫২ কোটি টাকা। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** (চলতি রাজস্ব হইতে ৫৫০ কোটি + করলব্ধ ১৭১০ কোটি) মোট ২২৬০ কোটি টাকা এই সূত্র হইতে সংগৃহীত হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

২. **ঋণ ও স্বল্পসঞ্চয়**ঃ জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ এবং স্বল্পসঞ্চয় সংগ্রহের দ্বারা পরিকল্পনার ব্যয় যতবেশি নির্বাহ করা যায় ততই মুদ্রাস্ফীতির হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। দেশের অভ্যন্তর হইতে যে পরিমাণ ঋণ ও স্বল্পসঞ্চয় সংগৃহীত হইবে, মোটামুটিভাবে দেশের জনসাধারণের ব্যয় প্রায় সেই পরিমাণ কমিবে। দেশের সীমাবদ্ধ দ্রব্যসামগ্রীর উপরে সেই পরিমাণ অর্থের চাপ আর পড়িবে না। মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা ততখানিই দূর হইবে। শুধু তাহাই নহে, যে অর্থ জনসাধারণের নিকট মজুদ বা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত, ঋণের আকারে সরকারের হাতে ঐ অর্থ আসিলে উন্নয়নমূলক কার্যে সে অর্থ ব্যবহৃত হইতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশের স্বল্পপুঁজিজনিত অনগ্রসরতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সূত্রে লব্ধ সামান্যতম অর্থও উন্নয়নের কাযে অনেকখানি সহায়তা করিতে পারে।

প্রথম পরিকল্পনায় এই সূত্র হইতে ৫০৯ (২০৫ কোটি টাকা + ৩০৪ কোটি টাকা বাজার হইতে ঋণ ও স্বল্পসঞ্চয়) কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** ৭৮০ কোটি টাকার ঋণ ও ৪০০ কোটি টাকার স্বল্পসঞ্চয়, মোট ১১৮০ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** ৮০০ কোটি টাকা ঋণের মাধ্যমে ও ৬০০ কোটি টাকা স্বল্পসঞ্চয়ের মাধ্যমে সংগ্রহের কথা বলা হইয়াছে। ঋণের পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকায় থাকিবে এই হিসাব সঠিক হয় নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন। দেশের ব্যাঙ্কসমূহের নিকট স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী আমানতের পরিমাণ বিপুল ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে এই আশা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে ইহার অধিক এই সূত্র হইতে সংগৃহীত হইবে।

৩. অভ্যন্তরীণ অন্যান্য সূত্র : দেশের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য সূত্র হইতে পরিকল্পনায় অর্থ সংগ্রহ করা যায়। এই সূত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইল : বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, উন্নয়নকর এবং ফাণ্ড এবং অন্যান্য মূলধনীখাতে প্রাপ্তি। **প্রথম পরিকল্পনায়** এই সূত্র হইতে ১৭৮ কোটি টাকা ও **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** ২৩০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** এই সূত্র হইতে ৫৪০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা একটি অন্যতম ক্রমবর্ধমান সূত্র।

৪. **রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত :** রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত হইতে অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। পরিকল্পনার আরম্ভে যে সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইতেছিল উহাদের উৎপাদনের কাজ শুরু হইবার পর উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া যে উদ্বৃত্ত রাজস্ব পাওয়া যায় তাহা সরকারী বিনিয়োগের কাজে ব্যবহার করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ ভাগ হইতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণভাবে ফলপ্রসূ হইতে আরম্ভ করে। এই সূত্রে **তৃতীয় পরিকল্পনাকালে** ৪৫০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে আশা করা হইয়াছে।

৫ **বৈদেশিক সূত্র :** স্বল্পোন্নত দেশের পুঁজি এবং অন্যান্য উপকরণের অভাবহেতু উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ হারে হয় না। উপরে আলোচিত বিভিন্ন সূত্র হইতে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইত তবে বৈদেশিক সূত্রের উপরে নির্ভরতা অনেকখানি হ্রাস করা যাইত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হইলেও পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য বৈদেশিক সূত্রের উপরে নির্ভরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করা যাইত না। কারণ পরিকল্পনার ব্যয়ের জন্য অর্থ যদিও অপরিহার্য কিন্তু ইহাই সব নয়। এবং স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের সমস্যা কেবলমাত্র অর্থসংগ্রহের সমস্যাই নহে। কৃষির উন্নয়নের জন্য যন্ত্রপাতি, শিল্পসম্প্রসারণের জন্য মূল্যবান পুঁজিদ্রব্য, শিল্পজ্ঞান, দুর্লভ কাঁচামাল ইত্যাদি স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নমূলক কাজের অপরিহার্য উপকরণ। কোন স্বল্পোন্নত দেশ শুধুমাত্র অর্থ সংগ্রহ বা সৃষ্টি করিয়া এই অতি প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের সমস্যা সমাধান করিতে পারে না। বিদেশের উপরে নির্ভরতা এই কারণে সম্পূর্ণভাবে দূর করা কঠিন। তবে একথাও মনে রাখিতে হইবে যে বৈদেশিক সাহায্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হইয়া পরিকল্পনা রচনা করিলে সংকট সৃষ্টি হইতে পারে। কেননা, বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবেই এমন নিশ্চয়তা কোন দেশের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নহে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানাবিধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা বৈদেশিক সাহায্যের প্রশ্নকে প্রভাবিত করিতে পারে। যে দেশ সাহায্য করিবে বলিয়া আজ আশ্বাস দিয়াছে, আগামীকাল সেই আশ্বাস সে প্রত্যাহার করিতে পারে।

প্রথম পরিকল্পনায় বৈদেশিক সূত্র হইতে মাত্র ১৮৮ কোটি টাকা পাওয়া যায়। ইহা অপেক্ষা আরও বেশি টাকা পাওয়া যাইবে আশা করা গিয়াছিল কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় নাই। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** ১০৯০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। **তৃতীয় পরিকল্পনাতে** এই সূত্রে ২২০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে ধরা হইয়াছে। এত বেশি পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। মোট ৭৫০০ কোটি টাকার পরিকল্পিত ব্যয়ের জন্য একমাত্র বৈদেশিক সূত্র হইতে ২২০০ কোটি সংগ্রহ করিবার পরিকল্পনা কতখানি বাস্তবানুগ এবং দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব ও ভবিষ্যৎ সমাজের কল্যাণের উপযোগী সে সম্পর্কে অনেকেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন।

৬. ঘাট্‌তি ব্যয়: উপরে আলোচিত অর্থসংগ্রহের সূত্রগুলিকে চিরাচরিত (traditional) সূত্র বলা হয়। সরকার পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রধানত এই সূত্রগুলির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের সর্বাত্মক চেষ্টা করিয়া থাকে। এই সকল সূত্র হইতে সংগৃহীত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয়কেই ঘাট্‌তি ব্যয় বলা হয়। ঘাট্‌তি ব্যয়ের টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ অথবা সরকারী সঞ্চয় হইতে সংগ্রহ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত পত্রমুদ্রা (note) ছাপাইয়া সরকারকে ঋণ দিয়া থাকে। ঘাটৃতি ব্যয়ের পরিমাণ অত্যধিক হইলে উহাতে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় ঘাট্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ ৩৩৩ কোটি টাকা ও **দ্বিতীয় পরিকল্পনায়** ৯৪৮ কোটি টাকা হইয়াছিল। **তৃতীয় পরিকল্পনায়** এই বাবদ ৫৫০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। কিন্তু ইতোমধ্যেই এ পর্যন্ত প্রকৃত ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৬০০ কোটি টাকা অতিক্রম করিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ঘাট্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হওয়ায় দেশের মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়। এই কারণে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঘাট্‌তি ব্যয়ের পরিমাণ স্বল্প রাখিয়া অন্যান্য সূত্র হইতে অর্থ সংগ্রহের উপর অধিক নির্ভর করা হইয়াছে।

ঘাটৃতি ব্যয় কাহাকে বলে ?
WHAT IS DEFICIT FINANCING ?

কর রাজস্ব, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত, জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ, বিভিন্ন আমানত ও তহবিল অথবা বৈদেশিক সূত্র হইতে প্রাপ্ত এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত মোট সরকারী আয় অপেক্ষা সরকার কর্তৃক বেশি ব্যয় করাকে ঘাট্‌তি ব্যয় বলে। সরকার নিজস্ব সঞ্চিত অর্থ উঠাইয়া লইয়া অথবা দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইয়া ঐ ঘাটতি পূরণ করে। এই কারণে সরকারী নগদ জমার পরিমাণ হ্রাস পাইলে অথবা স্বল্পকালীন সরকারী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে প্রচলিত অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং ইহাকেও ঘাট্‌তি ব্যয়ের অঙ্গ বলা হয়। কিন্তু যে পরিমাণ সরকারী নগদ জমা হ্রাস পাইবে অথবা যে পরিমাণ স্বল্পকালীন সরকারী ঋণ গ্রহণ করা হইবে, ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ যদি পাওনা বিদেশী মুদ্রা তহবিল (reserve) হইতে উঠাইয়া লওয়া হয় তবে অর্থের মোট যোগান বৃদ্ধি পায় না।

সাধারণত যুদ্ধ অথবা জরুরী অবস্থায় এই নূতন অর্থ সৃষ্টি (অর্থাৎ ঘাট্‌তি ব্যয়) করিয়া বাজেটের ঘাট্‌তি পূরণ করার চেষ্টা হয়। সাধারণ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ইহা বিপদজনক ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হইতে পারে। কীনস্‌ বলেন বাণিজ্যচক্রজনিত অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধের জন্য এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ঘাট্‌তি ব্যয়ের পন্থা স্থায়িভাবে অবলম্বন করা উচিত।

ঘাট্‌তি ব্যয়ের পক্ষে যুক্তি
CASE FOR DEFICIT FINANCING

১. সমাজে পূর্ণ-নিয়োগ (full-employment) নিশ্চিত করিবার জন্য সমাজের মোট ব্যয়কে যতখানি উচ্চস্তরে ধরিয়া রাখা দরকার একমাত্র ঘাটৃতি ব্যয়ের মাধ্যমেই তাহা সফলভাবে করা যায়। ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীরা সরকার আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতার (balanced budget) নীতিতে গভীরভাবে বিশ্বাস করিতেন। ঘাটৃতি বাজেটের তাঁহারা ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। সরকার আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিলে মুদ্রাস্ফীতির ভিত্তি রচিত হয়। ইহাই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস। আধুনিককালে বাজেটের সমতার (balanced budget) নীতিকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না। কীন্‌স যে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা মূলত

এই যে, সমাজে পূর্ণনিয়োগ সৃষ্টি করিতে দ্রব্যসামগ্রীর যে পরিমাণ সামগ্রিক চাহিদা দরকার, সাধারণ অবস্থায় সেই পরিমাণ চাহিদা সমাজে সৃষ্টি হয় না। এইরূপ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে সমাজের আয় সৃষ্টি করিয়া সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু সরকারী ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় আয় চিরাচরিত সূত্র হইতে অর্জন করা সম্ভব হয় না। সেই ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে (অর্থাৎ নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া) সরকারী ব্যয় নির্বাহ করিলে পূর্ণ নিয়োগের অবস্থা সৃষ্টির উপযোগী সমাজের সামগ্রিক চাহিদাকে প্রয়োজনীয় স্তরে লইয়া আসা যায়।

২. সমাজের অব্যবহৃত উপকরণসমূহের যথোপযুক্ত ও সুষ্ঠু ব্যবহার সুনিশ্চিত করিবার জন্য ঘাটতি ব্যয়ের পন্থা উপযোগী। ইহাতে উৎপাদন কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে, মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যস্তর বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না।

৩. স্বল্পোন্নত এবং অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য এই পন্থা বিশেষভাবে কার্যকরী। এই সকল দেশের পক্ষে কেবলমাত্র করধার্য এবং ঋণ সংগ্রহের দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যসূচীকে সফল করা সম্ভব নহে। তাই ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এই সকল দেশের সম্মুখে অন্যতম পথ।

৪. বাণিজ্যচক্রজনিত অর্থনৈতিক মন্দার ফলে সমাজে যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপর্যয় দেখা দেয়, ব্যক্তিগত বিনিয়োগও নিম্নস্তরে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিনিয়োগের দ্বারা মন্দার কবল হইতে অর্থনীতিকে টানিয়া তোলা যায় না। এই অবস্থায় ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারী ব্যয় প্রয়োজনীয় উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করে।

ঘাটতি ব্যয়ের বিপক্ষে যুক্তি
CASE AGAINST DEFICIT FINANCING

১. ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলে সরকারের বেহিসাবী ব্যয়ের ঝোঁক দেখা দিতে পারে। সুবিবেচনাপূর্ণ মিতব্যয়িতার নীতি হইতে সরকার বিচ্যুত হইতে পারে।

২. ঘাটতি ব্যয়ের নীতি একবার গ্রহণ করিলে উহাকে যুক্তিপূর্ণ সীমার মধ্যে ধরিয়া রাখা সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে। কারণ, কোন্ পর্যায় পর্যন্ত ঘাটতি ব্যয় করা হইবে সে সম্বন্ধে সুচিন্তিত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে নানা অসুবিধা দেখা দিতে পারে। একটা সীমার পরেও ঘাটতি ব্যয় করিতে থাকিলে কুফল দেখা দিবেই, সুতরাং সীমা নির্ধারণের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ।

৩. ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগ হইতে থাকিলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিনিয়োগ ব্যাহত হইতে পারে।

৪. স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় (bottlenecks) বহুবিধ। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিদ্রব্য, শিল্পজ্ঞান ও নৈপুণ্যের অভাব এই দেশগুলির অন্যতম সমস্যা। এই অবস্থায় ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে সরকারী ব্যয় মূল্যস্তরকেই কেবল বৃদ্ধি করিবে।

ভারতে ঘাটতি ব্যয়ের পক্ষে যুক্তি
CASE FOR DEFICIT FINANCING IN INDIA

প্রথম পরিকল্পনার আয়তন খুব বড় ছিল না বলিয়া অর্থসংস্থানের প্রশ্নে ঘাটতি ব্যয়ের সমস্যা বিরাট আকারে দেখা দেয় নাই। তবুও ২৯০ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় করা হইবে বলিয়া

মোটামুটি হিসাব করা হইয়াছিল। এই পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় করিলে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতেও অর্থের প্রকৃত যোগান বৃদ্ধি পাইত না, কারণ ইংলণ্ডের নিকট ভারতের ২৯০ কোটি টাকার স্টার্লিং পাওনা উঠাইয়া লইয়া উভয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করা যাইত। বৈদেশিক সাহায্য যে পরিমাণ পাওয়া যাইবে বলিয়া হিসাবে ধরা হইয়াছিল তদনুরূপ না পাওয়াতে, অর্থ সংস্থানের জন্য ৩৩৩ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় করিতে হয়। ভারতীয় অর্থনীতিতে এই ঘাটতি ব্যয়ের কুফল নানা কারণে গভীর সংকটের সৃষ্টি করে নাই।

কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ঘাটতি ব্যয়ের প্রশ্ন বড় হইয়া দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আয়তন বড় হওয়াতে ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থসংস্থানের চিরাচরিত উৎসগুলিকে যথাসাধ্য ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়। তৎসত্ত্বেও সরকারী ক্ষেত্রের পরিকল্পিত মোট ৪৮০০ কোটি টাকার ব্যয় নির্বাহের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সূত্রে মাত্র ৩৬০০ কোটি টাকার সংস্থান হিসাবের মধ্যে আসে। অনিবার্য কারণে তাই অবশিষ্ট ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই সংগৃহীত হইবে ইহাই ধার্য হয়। প্রকৃত পক্ষে ঘাটতি ব্যয় হয় ৯৪৮ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় অনুমিত ঘাটতি ব্যয় ৫৫০ কোটি টাকা।

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘাটতি ব্যয়ের যুক্তিগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

১. পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য চিরাচরিত উৎসগুলির মাধ্যমে যে অর্থ সংগৃহীত হইবে বলিয়া অনুমিত হয় তাহা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নহে। সুতরাং ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই অবশিষ্ট অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হয়।

২. ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে অধিকতর বিনিয়োগের দ্বারা অব্যবহৃত উপকরণসমূহকে পূর্ণতর ব্যবহার করিয়া নূতন কর্ম সৃষ্টি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে ঘাটতি ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

৩. ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে বিরাট অর্থবহির্ভূত ক্ষেত্র (non-monetised sector) রহিয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে অর্থঅন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্র (monetised sector) সম্প্রসারিত হইতে থাকিবে এবং অর্থবহির্ভূত ক্ষেত্র ক্রমশঃই সংকুচিত হইতে থাকিবে। সম্প্রসারণশীল অর্থঅন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান অর্থের চাহিদা মিটাইতে নূতন অর্থ সৃষ্টির প্রয়োজন হইবে। ইহা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটিতে থাকিলে ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থের চাহিদা সৃষ্টি হইতে থাকিবে। ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে নূতন অর্থ সৃষ্টি হইয়া সেই চাহিদা মিটাইতে সাহায্য করে।

৪. পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় টাকা ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা সংগ্রহ না করিলে অবশিষ্ট উৎসগুলি হইতে তাহা করিতে হইত। অবশিষ্ট উৎসগুলি হইল কর, জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ ও বৈদেশিক সাহায্য। প্রতিটি পরিকল্পনাকালে এই তিনটি সূত্র হইতে যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইবে এই ভিত্তিতেই হিসাব করা হয়। এই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচলিত করের উপরেও অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হইতেছে। ইহার একটা সীমা আছে। প্রয়োজনীয় যাবতীয় অর্থ শুধু কর হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব। কারণ ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের অধিক কর প্রদানের ক্ষমতা নাই। নানাবিধ করে ভারাক্রান্ত জনসাধারণ কর প্রদান ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমায় আসিয়া পৌছাইয়াছে। অর্থসংগ্রহের অপর সূত্র হইল জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ। ভারতের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র হইতে এই সূত্রে খুব বেশি অর্থ সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন। ঘাটতি ব্যয়ের পথ পরিহার করিলে এই সূত্রে আরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা অসম্ভব। অর্থসংগ্রহের অবশিষ্ট সূত্র

হইল বৈদেশিক ঋণ। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কত, হইবে তাহা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ঘটনাব দ্বারা অনেক পরিমাণে নির্ধারিত হয়। সুতরাং সূত্র হিসাবে ইহা অনিশ্চিত।

সুতরাং এই পরিস্থিতিতে ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা অপরিহার্য পন্থা হিসাবেই গৃহীত হইয়াছে।

ভারতের বিপুল পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি

CASE AGAINST HUGE DEFICIT SPENDING IN INDIA

ভারতে অধিক ঘাটতি ব্যয়ের, বিশেষত, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয়ের সিদ্ধান্তকে অনেকেই সমালোচনা করিয়াছেন। অধ্যাপক ক্যালডর (Kaldor)-এর মতে ভারতীয় অর্থনীতিতে ৮০০ কোটি টাকার অধিক ঘাটতি ব্যয় করা উচিত নহে। অন্যান্য অর্থনীতিবিদগণও ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ আরও হ্রাস করার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতীয় অর্থনীতিতে ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয়ের নীতিকে নিম্নলিখিত কারণে বিরোধিতা করা হইয়াছিল।

১. এই ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যস্তর তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাইবে। শুধু তাহাই নহে। নূতন অর্থ সৃষ্টির ফলে দেশের ব্যাঙ্কসমূহের আমানত বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে ব্যাঙ্কসমূহ বিপুল পরিমাণ ঋণ সৃষ্টি করিতে থাকিবে। ফলে মূল্যস্তর আরও ঊর্ধ্বগতি লাভ করিবে। ইহাতে পরিকল্পনার বিপুল বাধা সৃষ্টি হইবে।

২. কীন্‌স্ প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের মতে দেশে অব্যবহৃত বা স্বল্পব্যবহৃত উপকরণ থাকিলে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটে, মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যস্তর বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু ভারতে কারিগরিবিজ্ঞান সম্পন্ন কুশলী শ্রমিক, পুঁজিদ্রব্য ও বিশেষ ধরনের অত্যাবশ্যক কাঁচামালের অভাব রহিয়াছে। ফলে ঘাটতি ব্যয় করিলেও ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন স্বল্পকালের মধ্যে আশানুরূপ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে না। এদিকে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উহারা বর্ধিত আয় ব্যয় করিতে উন্মুখ হইবে। অতিরিক্ত চাহিদা ও স্বল্প যোগানের ফলে একমাত্র মূল্যস্তরই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। উপরন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের উন্নয়নের বিশেষ উপযুক্ত কার্যক্রম রাখা হয় নাই। এই ধরনের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের মধ্যে বহুসময় চলিয়া যায়। ফলে বিনিয়োগ ব্যয় একদিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, জনসাধারণের আয়ও বাড়িতে থাকে কিন্তু উৎপাদন-বিলম্বের জন্য মুদ্রাস্ফীতিই ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষের দুই বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার চারি বৎসর ধরিয়া দেশের পাইকারী ও খুচরা মূল্যস্তর যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে তাহাতে ভারতীয় অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা নহে, বাস্তব ও প্রত্যক্ষ কুফল অর্থনীতির ভিত্তিকেই সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিতেছে। উপরন্তু, ঘাটতি ব্যয়কে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৫৫০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাবও কার্যকরী হইল না। তৃতীয় পরিকল্পনার তিন বৎসরের মধ্যেই ৬১৬ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় অপরিহার্য হইয়া পড়িল। এই ভাবে অন্তহীন বিষচক্রের মধ্যে দেশের অর্থনীতি অসহায় ভাবে আবর্তিত হইতেছে। ইহাই বোধ হয় ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহের অশুভ পরিণাম।



ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ
India's Five Year Plans

প্রথম পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা
THE FIRST FIVE YEAR PLAN

গোড়ার কথা

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত। এই পরিকল্পনার প্রারম্ভকালে ভারতের অর্থনীতিক জীবন নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। খাদ্য ও কাঁচামালের তীব্র অভাব, শিল্পের উৎপাদনক্ষমতাকে পূর্ণব্যবহারে লাগাইবার অক্ষমতা, পরিবহণ ও সংসরণের বিপর্যস্ত অবস্থা, দেশবিভাগের ফলে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর পুনর্বাসনের সামাজিক মানসিক ও অর্থনীতিক সমস্যা, মুদ্রাস্ফীতির চাপ, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের প্রতিকূল উদ্বৃত্ত, যুদ্ধ পরবর্তীকালে আবদ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়ের অভাব এবং উহাদের আর্থিক সংকট, এবং নবগঠিত বহুরাজ্যের শাসনযন্ত্রের দুর্বলতা—এরূপ পটভূমিকায় প্রথম পরিকল্পনা রচিত হইয়া যাত্রা শুরু করে। তাই প্রথম পরিকল্পনা ভারতের অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাপ্তব্য উৎপাদন সম্পর্কে একটি সুসমঞ্জস ও সুসমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত করে। সুশৃংখল অগ্রগতির ভিত্তিস্থাপনের জন্য এবং অর্থনীতির ভারসাম্যের পুনরুদ্ধারের জন্য উন্নয়নকার্যের অগ্রাধিকার নির্দেশ করিয়া এই পরিকল্পনা ছক তৈয়ারী করিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (Objectives) : প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য প্রধানত দুইটি : ১. যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে অর্থনীতির যে ভারসাম্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এবং, ২. একই সঙ্গে জাতীয় আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মানের ধারাবাহিক উন্নতি নিশ্চিত করিবার জন্য সুষম ও সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন কর্ম-প্রক্রিয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।

পরিকল্পনার ব্যয় (Outlay of The Plan) : প্রথমে এই পরিকল্পনায় ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ধরা হইয়াছিল। পরে সংশোধিত হিসাবে ২৩৭৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনায় প্রকৃত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৬০ কোটি টাকা। সংশোধিত হিসাবের ২৩৭৮ কোটি নিম্নলিখিত খাতে বণ্টিত হয় :

	মোট ব্যয় কোটি টাকা	মোটব্যয়ের শতকরা ভাগ	প্রকৃত ব্যয় কোটি টাকা
কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৩৫৪	১৪.৯	২৯১
সেচ ও শক্তি	৬৪৭	২৭.২	৫৭০
শিল্প ও খনিজ	১৮৮	৭.৯	১১৭
পরিবহণ ও সংসরণ	৫৭১	২৪.০	৫২৩
সমাজসেবা	৫৩২	২২.৪	৪৫৯ (সমাজসেবা ও বিবিধ)
বিবিধ	৮৬	৩.৬	
	২৩৭৮	১০০.০	১৯৬০

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ এবং শক্তি উৎপাদনের উপরে সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়।

পরিবহণ ও সংসরণের পুনর্বাসনের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইগুলির উপরে অধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে স্বভাবতই শিল্পের জন্য অধিক বিনিয়োগ সম্ভব হয় নাই। ফলে শিল্প সম্প্রসারণের ভার প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

[illegible] অর্থসংগ্রহের [illegible] ([illegible]) : প্রথম পরিকল্পনার হিসাবে [illegible]৩১ কোটি টাকার ব্যয় হইবে বলিয়া দেখান হইলেও প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৬০ কোটি টাকা। এই টাকা কিভাবে সংগৃহীত হয় তাহা নিম্নে দেখান হইল :

	কোটি টাকা	শতকরা
কর রাজস্ব ও রেলপথ হইতে উদ্বৃত্ত	৭৫২	৩৮
বাজার হইতে ঋণ	২০৫	১১
স্বল্প সঞ্চয়	৩০৪	১৬
মূলধনখাতে অন্যান্য প্রাপ্তি	১৭৮	৯
বিদেশ হইতে সাহায্য	১৮৮	১০
ঘাটতি ব্যয়	৩৩৩	১৬
	১৯৬০	১০০

প্রথম পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষ কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় নাই। ভারতের স্টার্লিং পাওনা ২৯০ কোটি টাকার অধিক ঘাটতি ব্যয় করা হইবে না বলিয়া স্থির করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ৩৩৩ কোটি টাকার মত ঘাটতি ব্যয় করিতে হয়। তাহার কারণ আশানুরূপে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য (Targets of Production):
ক. কৃষির কার্যক্রম : পরিমার্জিত হিসাবের ২৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে ১০০১ কোটি টাকা (৪২%) কৃষি, সমাজোন্নয়ন, সেচ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যয়ের কথা বলা হয়। ইহাতেই কৃষি ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের উপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য এইভাবে নির্দিষ্ট হয় : খাদ্যশস্য ১৪%, পাট ৬৪%, তুলা ১৪%, ইক্ষু ১৩% এবং তৈলবীজ ৮%। কৃষির নানাবিধ সংস্কারের মাধ্যমে এই সকল লক্ষ্য পূরণ করা স্থির হয়। সংস্কারগুলি এইরূপ : সমবায় পদ্ধতিতে চাষ, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি, মৃত্তিকা সংরক্ষণ, বনভূমি রচনা, আবাদযোগ্য জমির পুনরুদ্ধার, বিক্ষিপ্ত জমির সংবদ্ধকরণ, সমবায় গ্রাম-ব্যবস্থা, ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থার সংস্কার, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা, এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ইত্যাদি। মোট ৬ কোটি একর জমি সেচকার্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং প্রথম পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত ১৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হইবে বলিয়া লক্ষ্য স্থির করা হয়। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এই কারণে যে ইহাদের মধ্য দিয়া গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী-দিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে সাহায্য করা যাইবে, জনমানসে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া পরিকল্পনার স্থানীয় কার্যক্রমকে সফল রূপদানে গণসহযোগিতা লাভ করা যাইবে।
খ. শিল্পসংক্রান্ত কার্যক্রম : প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি কার্যক্রমের জন্য বিপুল ব্যয়বরাদ্দের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রয়োজন মিটাইয়া শিল্পপ্রসারের জন্য বিনিয়োগ করিবার মত অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। তাই প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে শিল্পায়নের কার্যক্রমের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা যায় নাই। সরকারী উদ্যোগে শুধুমাত্র কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। শিল্পায়নের কার্যক্রমের জন্য প্রধানত বেসরকারী উদ্যোগের উপরেই নির্ভর করা হয়। পরিকল্পনার পরিমার্জিত ২৩৭৮ কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ১৮৮ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্পায়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে ১৫৭ কোটি টাকা বৃহদায়তন এবং মাঝারি আয়তনের শিল্পে, ১ কোটি টাকা খনি শিল্প এবং ৩০ কোটি টাকা কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৪২টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের কার্যক্রম রচনা করেন।

বেসরকারী ক্ষেত্রের শিল্পায়নের লক্ষ্য পূরণের জন্য [illegible] হিসাব করা হয়। কিন্তু কি ভাবে এই অর্থ সংগৃহীত হইবে সে বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন বিশেষ কোন উল্লেখ করেন নাই। **গ. পরিবহণ ও সংসরণ:** এই ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য ৫৭১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে রেলপথের জন্য ২৬৭ কোটি টাকা ও রাজপথ ও পথ পরিবহণের জন্য ১৪৭ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করা হয়। বিপর্যস্ত পরিবহণ ও সংসরণের পুনর্বাসনের উপরেই প্রথম পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইহার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের কাজে গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। **ঘ. সমাজকল্যাণ:** এই ক্ষেত্রের বরাদ্দ ব্যয়ের পরিমাণ ৫৩২ কোটি টাকা। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতিব দ্বারা দেশের মানবিক উপাদানের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা কবা হইবে। **ঙ. কর্মসংস্থান:** ভারতের প্রথম পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে প্রায় ৫৭.৫ লক্ষ লোকের জন্য অতিরিক্ত কর্মসংস্থান এবং কুটিব শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায় ৩৬ লক্ষ লোকের পূর্ণতর নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া ধবা হয।

প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতি (Achievements of The First Plan): পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে প্রথম পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতিব আলোচনা নিম্নে করা হইল।

১. মোট ব্যয়: প্রথম পরিকল্পনায় ২০৬৯ কোটি টাকার ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। পরিমার্জিত হিসাবে উহা ২৩৭৮ কোটি টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। এই পরিকল্পনায় প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৬০ কোটি টাকা। ইহা হইতে দেখা যায় যে সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে পরিকল্পনা সফল হয় নাই।

২. জাতীয় আয়: পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয এবং মাথাপিছু আয় (১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যস্তব হিসাবে) যথাক্রমে ১৮%এবং ১০.৮% বৃদ্ধি পায়। সবকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসবে ৩৫০০-৩৬০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইলেও দুইক্ষেত্রে মোট প্রকৃত পক্ষে ৩১০০ কোটি টাকার মত বিনিয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য পূবণ হইলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্য পূবণ হয নাই।

৩. কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদন: খাদ্যশস্যের উৎপাদনে পাঁচ বৎসরে ১৮% বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্যিক শস্যের মধ্যে তৈলবীজ ও তুলার উৎপাদন লক্ষ্য ছাড়াইয়া গেলেও পাট ও ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারে নাই।

৪. সেচ ও শক্তি: পরিকল্পনাকালে মোট ১ কোটি ৬৩ লক্ষ একর জমি সেচের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট বৃদ্ধি পায়।

৫. শিল্পোৎপাদন: মিলজাত বস্ত্রোৎপাদন লক্ষ্য ছাড়াইয়া যায়, চিনি, সেলাইকল, কাগজ, কাগজের বোর্ড, সাইকেল ইত্যাদির উৎপাদন লক্ষ্য পূরণ করে। কয়েকটি দ্রব্যের উৎপাদন লক্ষ্য অতিক্রম করে; যেমন সিমেন্ট, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পজাত দ্রব্য ইত্যাদি। ইস্পাত শিল্প সম্প্রসারণের কার্যসূচী রূপায়ণে বিলম্ব হয়।

৬. রেলপথ: পরিকল্পনাকালে ৩৮০ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপন করা হয়। উপরন্তু যুদ্ধকালে যে ৪৩০ মাইল রেলপথ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা পুনরায় স্থাপিত হয়।

৭. সামাজিক সেবা: এই ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম পরিকল্পনার মূল্যায়ন (An Appraisal of The First Plan): প্রথম পরিকল্পনায় দ্বারা কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে। অর্থনীতিতে [illegible] গঠন ও প্রতিষ্ঠানগত পবিবর্তন সাধিত হয়। পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে পরিকল্পনা জনমনে প্রচুর উদ্দীপনা ও আগ্রহের সৃষ্টি করে। পবিকল্পনায় ৩৩৩ কোটি টাকা পবিমাণের ঘাটতি ব্যয় কবা হইলেও মূল্যস্তব বৃদ্ধি পায় নাই, ববং উহা পবিকল্পনাব প্রাবম্ভকাল অপেক্ষা ১৩% হ্রাস পায়। লেনদেনেব উদ্বৃত্তেব ক্ষেত্রে (balance of payments) অবস্থা অনুকূল ছিল। এই সকল উজ্জ্বল দিক সত্ত্বেও প্রথম পবিকল্পনাকালে নানাদিকে গুরুতব ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

যথা: ১. ২৩৭৮ কোটি টাকাব অনুমিত ব্যযেব মধ্যে মাত্র ১৯৬০ কোটি টাকা প্রকৃত-পক্ষে ব্যয় হইযাছে। ইহা নিঃসন্দেহে পবিকল্পনাব বচনা ও রূপায়ণ সংক্রান্ত ত্রুটি। ২. কৃষি উন্নয়নেব উপবে বিশেষ গুরুত্ব দেওযাব ফলে বৃহদাযতন শিল্প উন্নয়ন অবহেলিত থাকে। যে স্বল্প অর্থ বৃহদায়তন শিল্পেব উন্নযনেব জন্য ববাদ্দ কবা হইযাছিল তাহাও ব্যয় কবা হয় নাই। ইহাতে শিল্পপ্রসবেব ভিত্তি বচিত হইতে পাবে নাই এবং কর্মসংস্থানও প্রযোজনানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ৩. পবিকল্পনায কৃষি উন্নযনেব জন্য দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ প্রকল্পেব উপবেই অধিকতর গুরুত্ব আবোপিত হইবাব ফলে স্বল্পসময়সাপেক্ষ প্রকল্পগুলি অবহেলিত হয়। ইহাতে কৃষি-উৎপাদন আশানুরূপ হইতে পাবে নাই। ৪. পবিকল্পনা কমিশন দেশেব বস্তুগত (physical) এবং মানবিক (human) সম্পদেব নির্ভুল হিসাব কবিয়া পবিকল্পনা বচনার দিকে নজব দেন নাই। পবন্তু অর্থগত উপকবণেব (financial resources) উপবে প্রধানত নির্ভব করিয়াছেন। ফলে বিবিধ উপকবণেব অভাবে পবিকল্পনাব অনেক লক্ষ্যই পূর্ণ হয় নাই। এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে প্রথম পবিকল্পনা ভারতের অর্থনীতিক অগ্রগতিব প্রাথমিক সোপান। গতিহীন অর্থনীতিতে গতিশীলতা সঞ্চাব কবিয়াছে এই পবিকল্পনা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
THE SECOND FIVE YEAR PLAN

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims & Objectives): দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল ১৯৫৬ সালেব ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৬১ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে প্রথম পবিকল্পনারই সম্প্রসাবিত রূপ। গ্রামীণ ভাবতেব পুনর্গঠন, শিল্পের অগ্রগতিব ভিত্তি স্থাপন, দেশেব জনসাধারণেব সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ এবং বঞ্চিত অংশের ব্যাপকতম সুযোগ-সুবিধাব ব্যবস্থা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন, মোটামুটি-ভাবে এইগুলিই ছিল দ্বিতীয় পবিকল্পনাব সাধাবণ লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচেব সমাজ গঠনই এই পবিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। ইহাব অর্থ এই যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি ব্যক্তিগত মুনাফা নয়, সামাজিক ফলশ্রুতি। কেবলমাত্র জাতীয় আয়ের এবং কর্মসংস্থানের সম্যক বৃদ্ধি নহে, পরন্তু আয় ও সম্পদ বণ্টনে অধিকতর সাম্য প্রতিষ্ঠাই অর্থনীতিক উন্নয়নেব লক্ষ্য। এই সকল লক্ষ্যসাধনের জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নির্দিষ্ট হয়: ১. দেশে জীবনধারণের মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয়েব উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। ২. শিল্পায়নের দ্রুততর গতি অর্জন, বিশেষ করিয়া বুনিয়াদী ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের উপবে প্রধান গুরুত্ব আরোপ। ৩. কর্মসংস্থানের অধিকতব সুযোগ সৃষ্টি। ৪. আয় এবং সম্পদ ভোগে অসাম্য হ্রাস এবং অর্থনীতিক ক্ষমতার অধিকতর সুষম বণ্টন।

বিশ্লেষণে দেখা যায় উপরের লক্ষ্যগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন

[illegible] আয় বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন [illegible]
বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অর্থনীতিক ও সামাজিক [illegible] করিতে [illegible]
খনিজ শিল্প, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, পরিবহণ ও সংসরণ, বিদ্যুৎ [illegible]
ইত্যাদির উৎপাদনের সম্প্রসারণ করিতে হয়। 'বিভিন্ন দিকে একই সময়ে অগ্রগতি [illegible] সমস্ত মানবিক ও প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। যে দেশে পুঁজি দ্রব্যের তুলনায় মানবিক সম্পদ সুপ্রচুর সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগবৃদ্ধি স্বভাবতই অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

বরাদ্দ ব্যয় (Outlay) : দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয়। সরকারী ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা চলতি ব্যয়ের জন্য এবং বাকী ৩৮০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত হয়। ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের হিসাব নিম্নরূপ :

	কোটি টাকা	মোট ব্যয়েব শতাংশ
কৃষি	৫৬৮	১২
সেচ ও শক্তি	৯১৩	১৮
শিল্প ও খনিজ	৮৯০	১৯
পরিবহণ ও সংসরণ	১৩৮৫	২৯
সামাজিক সেবা	৯৪৫	২০
বিবিধ	৯৯	২
	৪৮০০	১০০

উৎপাদন লক্ষ্য
TARGETS OF PRODUCTION

১. কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন : খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৬২ কোটি টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭২ কোটি টনে (অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি) পরিণত হইবে ; ইহাতে দৈনিক মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ ১৭.২ আউন্স হইতে ১৮.৩ আউন্সে আসিয়া দাঁড়াইবে ; তুলা ৩১%, ইক্ষু ২২%, তৈলবীজ ২৭% বৃদ্ধি পাইবে ; ইক্ষুব উৎপাদনের লক্ষ্য পূর্ণ হইলে প্রাপ্তবয়স্কের চিনি ও গুড়ের দৈনিক মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ ১.৪ আউন্স হইতে ১.৭ অউন্সে আসিয়া দাঁড়াইবে বলিয়া লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল। অতিবিক্ত ২ কোটি ১০ লক্ষ একর জমিতে সেচের সম্প্রসারণ এবং ৩৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য ঘোষিত হইয়াছিল।

২. শিল্প ও খনিজ : কারখানা প্রতিষ্ঠানসমূহের নীট উৎপাদন ৬৪% এবং পুঁজি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পসমূহের নীট উৎপাদন ১৫% বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। ইস্পাতের উৎপাদন ১৩ লক্ষ টন হইতে ৪৩ লক্ষ টনে এবং সিমেন্টের উৎপাদন প্রায় ৪৩ লক্ষ টন হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টনে, এলুমিনিয়াম, ফেরো-ম্যাঙ্গানীজ এবং লৌহ মাক্ষিকের উৎপাদন বৃদ্ধি ; খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ৫৮% বৃদ্ধি পাইবে ; সরকাবী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্র মিলাইয়া কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ২ কোটি ২০ লক্ষ টন হইবে ; কুটির এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২০০ কোটি বরাদ্দ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

৩. পরিবহণ ও সংসরণ : নূতন রেলপথ স্থাপন, পুরাতন রেলপথের সংস্কার সাধন, পাকা রাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রসারণ, যাত্রী ও পণ্যবাহী গাড়ি ইত্যাদির নির্মাণে দ্বিতীয় পরিকল্পনা-কালে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করা হয়।

৪. সামাজিক সেবা : অধিক সংখ্যক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনের লক্ষ্য সম্মুখে রাখা হয়। জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে চিকিৎসক ও সেবিকার

[illegible] ৬৬ লক্ষ [illegible] নির্মাণের লক্ষ্য করা হয়। [illegible] কার্যক্রম রূপায়িত করিবার জন্য ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

৫. **জাতীয় আয়, সঞ্চয়, ভোগ এবং কর্মসংস্থান :** জাতীয় আয় ২৫%, সঞ্চয় (১৯৫৫-৫৬ সালের) ৭% হইতে (১৯৬০-৬১ সালে) ১০% এবং ভোগ ২১% বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। পরিকল্পনার পূর্ণরূপায়ণ হইলে ৮০ লক্ষ নূতন কর্ম সৃষ্টি হইবে এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতির ফলে স্বল্পনিযুক্তি বহুলাংশে হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা হয়।

অর্থসংস্থান

SCHEME OF FINANCING

সরকারী ক্ষেত্রের পরিকল্পিত ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ নিম্নলিখিত সূত্র হইতে সংগৃহীত হইবে বলিয়া স্থির করা হয় :

	কোটি টাকা	কোটি টাকা
১. চলতি রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত (Surplus from current Revenues)		৮০০
(ক) ১৯৫৫-৫৬ সালের করের হারে	৩৫০	
(খ) অতিরিক্ত কর স্থাপন	৪৫০	
২. জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ (Borrowing from the public)		১২০০
(ক) বাজার হইতে ঋণ	৭০০	
(খ) স্বল্প সঞ্চয়	৫০০	
৩. বাজেটের অন্যান্য সূত্র (Other budgetary sources)		৪০০
(ক) উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর জন্য রেলপথের অর্থদান	১৫০	
(খ) প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য জমা	২৫০	
৪. বিদেশ হইতে অর্থসংগ্রহ (Resources to be raised externally)		৮০০
৫. ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing)		১২০০
৬. বাকী অভ্যন্তরীণ অর্থসংগ্রহের অন্যান্য উপায়ের সাহায্যে পূরণ করা হইবে (Gap—to be covered by additional measures to raise domestic resources)		৪০০
	মোট	৪,৮০০

উপরের হিসাব হইতে দেখা যায় যে চলতি রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত, জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ এবং বাজেটের অন্যান্য সূত্র,—এই তিন সূত্র হইতে ২৪০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছিলেন।

অবশিষ্ট ২৪০০ কোটি টাকা সংগ্রহের জন্য ৮০০ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্য এবং ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের উপর নির্ভর করা হইবে। [illegible] সত্ত্বেও আরও ৪০০ কোটি টাকা

সংগ্রহের সমস্যা থাকিয়া যায় এবং ইহা সংগ্রহের নিমিত্ত অজ্ঞাত [illegible] করা হইয়াছিল।

১. চলতি রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত : এই সূত্রে ৩৫০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে বলিয়া স্থির হয়। পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য-সরকারের মোট রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ ৫০০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। ঐ সময়ে উন্নয়ন সংক্রান্ত নহে এরূপ ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ৪৬৫০ কোটি টাকা। এইভাবে ৩৫০ কোটি টাকা এই সূত্র হইতে সংগৃহীত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়।

২. অতিরিক্ত কর স্থাপনের দ্বারা ৪৫০ কোটি টাকা সংগ্রহের হিসাব করা হয়। ইহা ছাড়াও ৪০০ কোটি টাকার ফাঁক (gap) পূরণের জন্য অতিরিক্ত করধার্যের দ্বারা সংগ্রহ করা যাইবে কিনা সে বিষয়ে মতভেদ ছিল। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে বহুবিধ করভারে পিষ্ট দরিদ্র ভারতবাসীর পরোক্ষ করদানের আর ক্ষমতা নাই। অপরপক্ষে প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিলেও উহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই অবস্থায় কর ধার্য করিয়া অর্থ সংগ্রহের সম্ভাবনা খুবই কম। আবার কেহ কেহ মনে করিতেন এই অর্থ সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। এইরূপ ধারণার সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত হয় :

ক. ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ক্রমাগত বাড়িতেছে। ফলে সমাজের কর প্রদানের ক্ষমতাও বাড়িতেছে।

খ. ভারতে করলব্ধ অর্থ জাতীয় আয়ের মাত্র ৭%। এই অনুপাত পৃথিবীর অন্য দেশগুলির তুলনায় সর্বাপেক্ষা কম। কর অনুসন্ধান কমিশন (Taxation Enquiry Commission) এই অনুপাত বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

গ. অধ্যাপক ক্যালডর মনে করেন যে ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০ কোটি টাকার কর ফাঁকি দেওয়া হয়। তাঁহার মতে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা প্রত্যক্ষ কর হইতে আরও বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে এবং কর-ফাঁকি বহুলাংশে বন্ধ করা যাইতে পারে।

৩. বিদেশ হইতে ৮০০ কোটি টাকার সাহায্যের উপরে নির্ভর করিতে হইবে বলিয়া হিসাবে ধরা হয়। সোবিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, পশ্চিম জার্মানী এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তিনটি ইস্পাত কারখানা এবং শক্তি উৎপাদন এবং রেলপথের উন্নয়নের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া আরও ৬০০ কোটি টাকা সংগ্রহের প্রয়োজন রহিয়াছে কিন্তু এই সাহায্য পাওয়া যাইবে কিনা সে বিষয়ে নানা মহল হইতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। কারণ পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহ হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া বা না পাওয়া বহুলাংশে নির্ভর করে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতের উপর। ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রের ক্রমসম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ ভারতের বৈদেশিক সাহায্য-প্রাপ্তির পথে অন্তরায় হইতে পারে।

ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে ১২০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে বলা হইয়াছিল। অবশ্য ভারতের স্টার্লিং পাওনা হইতে ২০০ কোটি উঠাইয়া লইবার প্রস্তাব কার্যকরী হইলে প্রকৃতি ঘাটতি ব্যয়ের মোট পরিমাণ হইবে ১০০০ কোটি টাকা। অনেকের মতে (যেমন কে. সি. নিয়োগী, ক্যালডর) এত অধিক পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় করা হইলে অর্থনীতিতে যে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হইবে তাহাতে পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে (এ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ঘাটতি ব্যয়ের

প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে; তবে ইহার পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিতে না পারিলে নানাবিধ কুফলের সৃষ্টি হয়)।

অর্থ সংগ্রহের আলোচনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের অবস্থার কথা উল্লেখ করিতে হয়। শিল্পায়নের প্রয়োজনে ভারী যন্ত্রপাতি, কলকবজা ও সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল এবং যাবতীয় মধ্যবর্তী পর্যায়ের দ্রব্যাদির (Intermediate goods) আমদানির পরিমাণ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিপুল আকার ধারণ করিবে বলিয়া বুঝা গিয়াছিল। তৎসঙ্গে দেশের মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতাকে প্রশমিত করার জন্যও বিদেশ হইতে ভোগ্যপণ্য আমদানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। আমদানির এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানির দ্বারা সমস্ত দেনা মিটানো যাইবে না ইহাই ছিল পরিকল্পনা কমিশনের মত। পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে চলতি হিসাবে প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ প্রায় ১১০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১০০ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রের জন্য। অবশিষ্ট ১০০০ কোটি টাকার মধ্যে ২০০ কোটি টাকা স্টার্লিং ব্যালান্স হইতে পাওয়া যাইবে এই হিসাবের ভিত্তিতেই ৮০০ কোটি টাকা বিদেশী সাহায্যের কথা বলা হইয়াছিল।

যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাতেই কিছু পরিমাণ চাপ অপরিহার্য। কারণ উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্যই হইল স্বাভাবিক হার অপেক্ষা অধিকতর হারে বিনিয়োগ করা। এই কারণেই প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালাইতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেশের উপকরণের উপরে যে যথেষ্ট চাপ পড়িবে ইহা অতি সহজেই বোধগম্য। তথাপি অভ্যন্তরীণ সূত্রসমূহ হইতে যথাসাধ্য অর্থ সংগ্রহ করিবার নীতি গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা •

CRITICISMS OF THE SECOND PLAN

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছিল। সমালোচনার প্রধান বিষয়গুলি নিম্নে আলোচিত হইল:

১ ডঃ জন মাথাইয়ের মতে জনসাধারণের প্রয়োজনের দিক হইতে বিচার করিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নহে, তবে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং পরিকল্পিত সময়-নির্ঘণ্টের দিক হইতে ইহা অতিরিক্ত উচ্চাশারই পরিচায়ক।

২. উন্নয়নমূলক কার্যসূচী অবাস্তব এবং এই কারণে ইহার সফল রূপায়ণ অসম্ভব।

৩. এই কার্যসূচীকে সফল করিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের বিষয়ে অসুবিধা দেখা দিবে। পরিচালন এবং কারিগরিবিজ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ শ্রমিকের অভাবে কার্যসূচী ব্যাহত হইবে।

৪. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হইতে অনুমিত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইবে কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা বিদ্যমান।

৫. বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের জন্য বিদেশী সাহায্য ও ঘাটতি ব্যয়ের উপর নির্ভর করা বিজ্ঞতাপ্রসূত নীতির পরিচায়ক নহে। কারণ উহা অনিশ্চিত অবস্থার উপরে নির্ভর করে। ঘাটতি ব্যয়ের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা নিহিত। মাত্রাতিরিক্ত হইলে ইহা হিতকর না হইয়া বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিতে পারে।

৬. দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়নকার্যের ফলে পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার উপরে বিপুল কার্যভার আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তদনুযায়ী পরিবহণ ও সংসরণের উন্নয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় নাই।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের উদ্বৃত্তের অবস্থা [illegible] রপ্তানি বৃদ্ধির নীতিও সুষ্ঠুভাবে রচিত হয় নাই। এমন অবস্থায় পরিকল্পনার কার্যসূচীর রূপায়ণে যে বিপুল পরিমাণ আমদানি করিতে হইবে তাহার মূল্যশোধ কেবলমাত্র রপ্তানির দ্বারা সম্ভব হইবে না।

৮. কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা কবিবার জন্য বৃহদায়তন ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ আরোপ কবা যুক্তিযুক্ত হইযাছে কিনা সে বিষয়েও সমালোচনা করা হয়। আশানুরূপ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হইলেও কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প দেশের চাহিদা মিটাইবার মত ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ কবা হয়। উপরন্তু এই সকল বৃহদায়তন শিল্পেব উন্নযন ও সম্প্রসারণ অবরুদ্ধ হইলে যন্ত্রপাতি, কলকবজা এবং ইস্পাতেব চাহিদা হ্রাস পাইবে। ফলে এই শেষোক্ত দ্রব্য নির্মাণকারী শিল্পগুলির নানাবিধ সমস্যা দেখা দিবে বলিযা আশঙ্কা প্রকাশিত হয়।

৯. পবিকল্পনায় বৈদেশিক ব্যক্তিগত বিনিয়োগেব পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা হইবে ধরা হইয়াছিল। ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত শিল্পনীতিব পবিপ্রেক্ষিতে এই বিনিযোগের ভিত্তিতে হিসাব করা সঠিক কাজ হয নাই।

১০. পরিকল্পনাকালে দেশেব সাধাবণ মূল্যস্তবকে মেটামুটিভাবে স্থিব বাখাব কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে পরিকল্পনার বিপদ সূচিত হয়। বিশ্বব্যাঙ্কেব প্রতিনিধিবা বলিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাব আকাব বৃহত্তব হওয়ায় মূল্যস্তব উর্ধ্বগামী হইতে পারে, কিন্তু মূল্যস্তরকে আযত্তেব মধ্যে রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল।

মন্তব্য (**Comments**)**:** উপরে বর্ণিত সমালোচনাগুলির মধ্যে কযেকটি যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয পরিকল্পনাকালে কয়েকটি সমালোচনাব সত্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবে কযেকটি ক্ষেত্রে যে ভুল ছিল তাহাই কার্যকালে প্রমাণিত হইয়াছে। যে কোন পরিকল্পনাতেই কিছু পরিমাণ ভুলভ্রান্তি হওয়া সম্ভব। তাহাতে মূল পরিকল্পনার বিশেষ কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু ভাবতের দ্বিতীয় পবিকল্পনায় হিসাবে ভুল ও অনুমানে ভ্রান্তি এমন ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল যে পরিকল্পনার দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পবেই অর্থাৎ ১৯৫৮ সালেব মে মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) এবং প্ল্যানিং কমিশন সমগ্র দ্বিতীয় পরিকল্পনাব সকলদিকেরই পুনর্বিচার কবিতে বাধ্য হন। প্রারম্ভকাল হইতেই দ্বিতীয় পবিকল্পনা নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছিল। এই অসুবিধাগুলিই ক্রমশ গভীর ও ব্যাপক হইতে থাকে। হিসাব করিয়া দেখা যায় যে ৪৮০০ কোটি টাকার উৎপাদন লক্ষ্য পূর্ণ করা ৫৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ের কমে সম্ভব নহে। সুতরাং দুইটি বিকল্প সমাধানের পথ উন্মুক্ত থাকে : ১. নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করা (অর্থাৎ ৫৪০০ কোটি টাকা)। ২. অর্থ-সংগ্রহের বাস্তবানুগ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নূতনভাবে পূর্বতর লক্ষ্য ও বরাদ্দব্যয়কে কাঁটছাঁট করা এবং তদনুযায়ী পরিকল্পনাকে পুনর্বিন্যাস করা। পবিশেষে অবস্থা সংকটের রূপ ধারণ করে। এই সংকটের হাত হইতে পরিকল্পনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য ও বরাদ্দব্যয়ে কথঞ্চিৎ রদবদল করা হয়। এই রদবদল ও কাঁটছাঁটকেই পুনর্বিচার (reappraisal) বলা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচারের কারণ
CAUSES OF REAPPRAISAL

ক. খাদ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য পুর্ণ হয় নাই। ফলে খাদ্যঘাট্‌তি সৃষ্টি হয়। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানিব পবিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপর্যাপ্ত বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়েব উপব ক্রমাগত চাপবৃদ্ধি হইতে থাকে। উপরন্তু কৃষিব অন্যান্য উৎপাদনও লক্ষ্য অনুযায়ী বৃদ্ধি পায় নাই।

খ. বিপুল পরিমাণ ঘাট্‌তিব্যয়ের ফলে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। মূল্যস্তব ১৪% বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত সময়েব মধ্যে পাইকাবী মূল্যস্তব ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি লাভ করিতে থাকে। পবিকল্পনাব ব্যয় ইহাব সঙ্গে সমতালে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অন্যদিকে বিদেশ হইতে আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর দব কযেকটি কারণে বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার যে লক্ষ্য ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যযে পূর্ণ হইবে বলিয়া ধবা হইয়াছিল, সেই লক্ষ্যই মুদ্রাস্ফীতিব ফলে ৫৪০০ কোটি টাকাব কমে পুর্ণ কবা যাইবে না বলিয়া দেখা যায়।

গ. অভ্যন্তরীণসূত্রে প্রাপ্ত অর্থের ক্ষেত্রে আশা পুর্ণ হয় নাই। অভ্যন্তবীণ সঞ্চয় অনুমান অনুযায়ী সংগৃহীত হয় নাই। বৎসবে গড়ে ২৫০ কোটি টাকা করিয়া সঞ্চয়ের হিসাব ধবিয়া প্রথম দুই বৎসবে ৫০০ কোটি টাকা সঞ্চয় সংগ্রহেব হিসাব করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পবিকল্পনাব প্রথম দুই বৎসবে মাত্র ৩২৭ কোটি টাকাব সঞ্চয় সংগৃহীত হইযাছিল। এতদ্ব্যতীত প্রতিরক্ষামূলক কাজেব জন্য অনুৎপাদনশীল ব্যয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং পবিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যযও অনুমান ছাড়াইয়া যায়। ফলে অভ্যন্তবীণসূত্রে উপকরণ সংগ্রহেব আশা সুদূবপবাহত হয।* আর্থিক সম্বল (financial resources) সংগ্রহের ক্ষেত্রে চিত্র মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। পরিকল্পনাব দুই বৎসবে প্রচুব ঘাট্‌তিব্যয় করা হইয়াছিল (ইহাব পবিমাণ ছিল ৭০২ কোটি টাকা)। সুতবাং এই সূত্র হইতে অধিক অর্থ সংগ্রহেব প্রচেষ্টা কবা অর্থনীতিব পক্ষে হানিকাবক। সামগ্রিক করভারও বহুল পরিমাণে বর্ধিত করা হইয়াছিল। লেনদেনের উদ্বৃত্ত ঘাট্‌তি মিটাইতে তখনও আবও ৫০০ কোটি টাকাব বিদেশী সাহায্যেব অত্যধিক প্রয়োজনীয়তা বর্তমান ছিল। উপরন্তু পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসবে ২৩৪৪ কোটি টাকার মত উপকবণ (ইহা মোট বরাদ্দব্যয়ের প্রায় অর্ধাংশ) সংগ্রহ কবিতে পারিলে তবে মূল পরিকল্পনার ববাদ্দ ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের লক্ষ্য পূর্ণ কবা যাইত। এত অধিক উপকবণ মাত্র দুই বৎসবে সংগ্রহ করা অতিশয় কঠিন ছিল।

ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের অবস্থা অস্বাভাবিকরূপে শোচনীয় হইয়া পড়ে। শিল্পোন্নয়নেব কার্যসূচীকে রূপায়িত করিতে প্রচুব পরিমাণ যন্ত্রপাতি, কলকবজা, শিল্পসরঞ্জাম ও রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করিতে হয়। অন্যদিকে রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভে অসমর্থ হয়। ফলে আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিকূল উদ্বৃত্তেব পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের মোট পরিমাণ ১১০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম দুই বৎসরেই সামগ্রিক ঘাট্‌তি ৯৪৯ কোটি টাকাতে আসিয়া দাঁড়ায়। প্রাপ্য স্টার্লিং সঞ্চয় ও অন্যান্য দেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সংকট মোচনের চেষ্টা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরের কার্য সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্ক [illegible] মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। মিশন বলিয়াছিলেন যে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংগঠনে গুরুতর ত্রুটি ও দুর্বলতা ধরা পড়ে। বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়েব উপরে উপযুক্ত পরিদর্শন ও তদারক করা হয় নাই, কেন্দ্রেব অর্থনীতিক সিদ্ধান্তসমূহ রাজ্যসমূহ কর্তৃক অন্যায়ভাবে বহু ক্ষেত্রে প্রভাবিত হইয়াছে।

এই সকল কাবণে ১৯৫৮ সালেব মে মাসে মূল দ্বিতীয় পবিকল্পনাব কাটছাঁট ও রদবদল কবিতে হয়। রদবদলেব ফলে বিভিন্ন খাতে ববাদ্দ ব্যয়ের কিছু কিছু হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু মোট অর্থ ব্যয়েব উর্ধ্বতম সীমা ৪৮০০ কোটি টাকাতেই বাখা হয়। পবিকল্পনার ববাদ্দব্যযকে 'ক এবং খ'-এই দুইটি অংশে ভাগ কবা হয়, 'ক' অংশেব বরাদ্দব্যযেব পবিমাণ রাখা হয ৪৫০০ কোটি টাকা। এই অংশের অন্তর্ভুক্ত হইল :—১. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিব সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প-সমূহ (projects). ২. কেন্দ্রস্থল অধিকাবী গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প (ইস্পাত কাবখানা, কযেকটি কয়লা খনি, রেলপথেব উন্নযন ইত্যাদি) ৩. যে সকল প্রকল্পের কাজ অনেকদূর অগ্রসব হইযা গিয়াছে।

এইগুলি ছাডা অত্যাবশ্যক ও অপবিহার্য নহে এমন কার্যক্রমগুলিকে 'খ' অংশেব অন্তর্ভুক্ত কবা হইয়াছিল। এই অংশেব জন্য ববাদ্দব্যযেব পবিমাণ অবশিষ্ট ৩০০ কোটি টাকা। তবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে দ্বিতীয় পবিকল্পনাব মোট ব্যয কোনক্রমেই ৪৫০০ কোটি টাকাব নীচে নামিবে না। প্রথমে 'ক' অংশেব কার্যক্রমেব রূপদানেব চেষ্টা কবা হইবে। অতঃপব প্রযোজনীয উপকবণ সংগৃহীত হইলে 'খ' অংশেব কার্যক্রম সফল কবিবাব চেষ্টা হইবে।

নানাবিধ পর্যালোচনাব পব সর্বশেষে দ্বিতীয পবিকল্পনাব ববাদ্দব্যযেব পবিমাণ ৪৫০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি কবিযা ৪৬০০ টাকা লইযা আসা হয়। নিম্নে ৪৬০০ টাকাব ববাদ্দ বিভিন্ন খাতে কিভাবে বণ্টিত হইযাছিল তাহা দেখান হইল।

কোটি টাকায

	মূল ববাদ্দেব সংশোধিত রূপ	পুনর্বিচাবেব পব চূডান্ত রূপ
১. কৃষি ও সমাজোন্নযন	৫৬৮	৫৩০
২ সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৮৬০	৮৬৫
৩ গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প	২০০	১৭৫
৪. শিল্প ও খনিজ	৮৮০	৯০০
৫. পবিবহণ ও সংসবণ	১৩৪৫	১৩০০
৬. সমাজসেবা	৮৬৩	৮৩০
৭. বিবিধ	৮৪	
মোট	৪৮০০	৪৬০০

পরিকল্পনার দশ বৎসর : অগ্রগতি
TEN YEARS OF PLANNING · PROGRESS

১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম পরিকল্পনার শুরু হইতে ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমাপ্তির সাথে সাথে পরিকল্পনার দশ বৎসব পূর্ণ হইয়াছে। এই দশ বৎসরে ভারতের অর্থনীতিক ও সামাজিক কাঠামোর কিরূপ পরিবর্তন ঘটিল, বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের ফলে অর্থনীতিক উন্নয়নের কোন্ কোন্ লক্ষ্য পূর্ণ হইল অথবা অপূর্ণ রহিল তাহা জানার প্রয়োজন

হইয়াছে। কারণ এই বিশ্লেষণের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার পথের সম্ভাব্য সমস্যা ও বিঘ্ন-সমূহকে বুঝা যাইবে এবং তদনুযায়ী সাফল্যকে নিশ্চিত করা যাইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় জোর দেওয়া হইয়াছিল কৃষি, সেচ, শক্তি, পারবহণ ও সংসরণের উপরে। কারণ, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে দ্রুততর গতিতে শিল্পায়ন ও অর্থনীতিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হইবে। পুরাতন ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে সমগ্র দেশব্যাপী কৃষি সম্প্রসারণ সেবার প্রতিষ্ঠা, সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন, বৃহদায়তনে সেচ ও শক্তি আহরণের ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের উন্নতি সাধন, কৃষি ও শিল্পে ঋণ সরবরাহের জন্য বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি, কুটির এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সমস্যার সমাধানের জন্য এবং অনুন্নত জনসাধারণকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন—এই সমস্ত বিষয় হইল প্রথম পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। প্রথম পরিকল্পনা শুধু যে দ্রুততর গতিতে অর্থনীতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার দিকেই জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহাই নহে, এই লক্ষ্যকে সফল করিবার জন্য যাবতীয় উপায়ও জাতির সম্মুখে রাখিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনাকালে গৃহীত নীতিসমূহকেই আরও অগ্রসর করিয়াছে। ভারতের বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার করিয়া আগামী ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য মূল এবং ভারী শিল্পের সম্প্রসারণের উপরে গভীর গুরুত্ব আরোপ করা দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারী ক্ষেত্র ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নে কি ভূমিকা গ্রহণ করিবে সে বিষয় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের লক্ষ্যও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই ঘোষণা করা হইয়াছে।* অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস ও অর্থনীতিক ক্ষমতার অধিকতর সুষম ভোগ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যও এই পরিকল্পনাকালেই করা হইয়াছে। তাই, সঙ্গতভাবেই লক্ষ্যগুলিকে পূর্ণ করিবার জন্য বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে বাৎসরিক ৫০০ কোটি টাকা হইতে পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ৮৫০ কোটি টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ১৬০০ কোটি টাকায় গিয়া পৌছায়। বর্তমান মূল্যস্তরের হিসাবে দেখা যায় দুই পরিকল্পনার দশ বৎসরে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হইয়াছে ১০,১১০ কোটি টাকা এবং ইহার মধ্যে ৫২১০ কোটি টাকা হইল সরকারী ক্ষেত্রে এবং ৪৯০০ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রে। নিম্নের হিসাব হইতে ইহা বুঝা যাইবে :

(হিসাব কোটি টাকায়)

	প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	মোট (১৯৫১-৬১)
সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয়	১৯৬০	৪৬০০	৬৫৬০
(ক) বিনিয়োগ	১৫৬০	৩৬৫০	৫২১০
(খ) চলতি ব্যয়	৪০০	৯৫০	১৩৫০
বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ	১৮০০	৩১০০	৪৯০০
দুই ক্ষেত্রের মোট বিনিয়োগ	৩৩৬০	৬৭৫০	১০১১০

[illegible] বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে দুই [illegible] ক্ষেত্রের [illegible] ব্যয় [illegible] হইয়াছে তাহা নিম্নের হিসাব হইতে জানা যাইবে।

(হিসাব কোটি টাকায়)

উন্নয়ন খাত	প্রথম পবিকল্পনা	দ্বিতীয় পবিকল্পনা	মোট
কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	২৯১	৫৩০	৮২১
সেচ	৩১০	৪২০	৭৩০
শক্তি	২৬০	৪৪৫	৭০৫
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪৩	১৭৫	২১৮
শিল্প ও খনিজ	৭৪	৯০০	৯৭৪
পরিবহণ সংসবণ	৫২৩	১৩০০	১৮২৩
সমাজসেবা ও বিবিধ	৪৫৯	৮৩০	১২৮৯
মোট	১৯৬০	৪৬০০	৬৫৬০

ব্যয় বণ্টনেব উপবোক্ত হিসাব হইতে দুই পবিকল্পনাব কোন্ কোন্ ক্ষেত্রেব উপবে কি প্রকাবেব গুরুত্ব আরোপ কবা হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম পবিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নেব উপরে অধিকতব গুরুত্ব আবোপ করা হইযাছে, ফলে কৃষি ও সেচের জন্য মোট ব্যয়ের শতকরা ৩১ ভাগ বরাদ্দ কবা হইযাছে। দ্বিতীয় পবিকল্পনায শিল্পোন্নয়নেব উপবে অধিকতব গুরুত্ব আবোপ কবাব ফলে শিল্প ও খনিজেব জন্য মোট ব্যয়েব শতকবা ২০ ভাগ ববাদ্দ কবা হইয়াছে (প্রথম পবিকল্পনায ছিল শতকবা ৪ ভাগ)। দুই পরিকল্পনাতেই পবিবহণ ও সংসবণেব উন্নয়ন অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে। সমাজসেবা ও বিবিধ খাতে প্রথম পবিকল্পনাতে মোট ব্যয়ের শতকবা ২৩ ভাগ ও দ্বিতীয পবিকল্পনাতে ১৮ ভাগ ববাদ্দ কবা হইয়াছে।

সবকাবী ক্ষেত্রেব ব্যয় নির্বাহেব জন্য অর্থ কোন কোন্ সূত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল :

(হিসাব কোটি টাকায়)

	প্রথম পবিকল্পনা	শতকবা হিসাব	দ্বিতীয় পবিকল্পনা	শতকবা হিসাব
পবিকল্পনাব ব্যয়	১৯৬০	১০০	৪৬০০	১০০
অভ্যন্তবীণসূত্র	১৭৭২	৯০	৩৫১০	৭৬
বৈদেশিক সূত্র	১৮৮	১০	১০৯০	২৪

দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে কয়েকটি নূতন প্রত্যক্ষ এবং পবোক্ষ কর বসান হয়। ইহা সত্ত্বেও যে ঘাটতি থাকে তাহা পূরণ করিবার জন্য একদিকে 'ঘাটতি ব্যয়' ও অপর দিকে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়ার বৎসবগুলিতে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ খুব বেশিই ছিল। শেষের বৎসরগুলিতে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ হ্রাসের চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের 'ঘাটতি ব্যয়ের' মোট পরিমাণ হইল ৯৮৪ কোটি টাকা। প্রথম

[illegible]
পরিমাণ ছিল ৩১৮ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্য হইতে [illegible] টাকা এবং বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় (Foreign Exchange Reserves) হইতে ১২২ কোটি টাকা [illegible] লেন-দেনের ঘাটতি মিটান হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ভারতের লেনদেন-উদ্বৃত্তের অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। শিল্পায়নের উপব বেশি জোব দেওযাব ফলে আমদানিব পরিমাণ বাড়িয়া যায়। ফলে খুব বেশি পবিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের প্রযোজনীয়তা দেখা দেয়। হিসাব কবা হইয়াছিল যে দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে মোট ১১০০ কোটি টাকা প্রতিকূল লেনদেন-উদ্বৃত্ত হইবে। এবং বৈদেশিক সাহায্যেব মাধ্যমে ৮০০ কোটি টাকা পাওনা মিটান হইবে। কিন্তু প্রথম বৎসব হইতেই দ্বিতীয় পবিকল্পনা লেনদেন উদ্বৃত্তেব ব্যাপাবে সংকটের সম্মুখীন হইতে থাকে। ইহাবই ফলে ১৯৫৮ সালে দ্বিতীয় পবিকল্পনাব পুনর্বিচাব (reappraisal) কবিতে হয়। অত্যাবশ্যকীয় নহে এমন সমস্ত দ্রব্যেব আমদানিব উপবে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ কবা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় হইতে ৬০০ কোটি টাকা তুলিয়া বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত ৮৭২ কোটি টাকা সবকারী ও বেসবকাবী উভয় ক্ষেত্রে ব্যয় করিয়া লেনদেনেব সমস্যাকে মিটাইবাব চেষ্টা কবা হয। ইহা ছাড়াও পি. এল. ৪৮০ খাতে ৫৩৪ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী সাহায্য হিসাবে মার্কিন দেশ হইতে আমদানি কবিয়া এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে ৫৫ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ কবিয়া সংকটকে প্রতিবোধেব চেষ্টা করা হয়।

সামগ্রিক ভাবে পবিকল্পনাব একদশকে উন্নতি হইয়াছে, ইহা ঠিক। তবে দশ বৎসরের অগ্রগতি সকল বৎসবেই সমান ভাবে হয় নাই। কখনও প্রাকৃতিক কারণে কখনো বা আন্তর্জাতিক ঘটনাব ফলে, আবাব কখনো পবিকল্পনাকে পূর্ণ রূপদানে ব্যর্থতাব ফলে, নানা উত্থান ও পতনেব মধ্য দিয়া ভাবতেব অর্থনীতিকে চলিতে হইযাছে। তবুও মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পবিমাণ অগ্রগতি হইযাছে নিম্নে তাহাদেব তথ্য সংযোজিত হইল।

ক. জাতীয় আয়: প্রথম পবিকল্পনাব লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয়েব শতকবা ১২ ভাগ বৃদ্ধি। কিন্তু কৃষি উৎপাদনেব আশাতীত বৃদ্ধিব ফলে জাতীয় আয় শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আযেব শতকবা ২৫ ভাগ বৃদ্ধিব লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই, শতকরা ২০ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। দশ বৎসবে জাতীয় আয ১৯৬০-৬১ সালেব মূল্যস্তবে মোট শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পাইলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু মাথাপিছু আয় শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

খ কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন: কৃষিজ উৎপাদন শতকরা ৪১ ভাগ, খাদ্যশস্যেব উৎপাদন শতকবা ৪৬ ভাগ, সেচেব অন্তর্ভুক্ত জমিব পরিমাণ শতকবা ৩৬ ভাগ, সমবায়েব মাধ্যমে কৃষক-দিগকে প্রদত্ত ঋণেব পবিমাণ শতকরা ৭৭৩ ভাগ, বাসায়নিক সারের ব্যবহার শতকরা ৩১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এই দশ বৎসবে সমষ্টি উন্নয়ন পবিকল্পনা ও সমাজসেবার ব্যাপক সম্প্রসারণ হইয়াছে ৩৭০,০০০ গ্রাম সমাজোন্নযন পবিকল্পনাব অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, এবং সমাজসেবার কাজে ৬০,০০০ গ্রামাঞ্চলেব কর্মী ও অফিসারকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই সময়ে সমবায় আন্দোলনের বিস্তৃতিও উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা হইয়াছে ২,১০,০০০ (অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালের সমিতির সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ)। ইহা ছাড়া ১৮৭০টি সমবায় বিক্রয়করণ সমিতি এবং ৪১টি সমবায় চিনি কাবখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষিক ঠামোর পুর্ন-পুনর্গঠনের জন্যও বিগত দশকে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। জমিদার ও জায়গীর-দারদের মধ্য-মধ্যস্বত্ব ভোগীদের বিলোপ সাধন, ভূমিস্বত্বের অধিকারের (tenancy right) সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, কৃষিজোতের উর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণ এবং কয়েকটি রাজ্যে জোতের সংহতিসাধন, কৃষি

[illegible] অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য শক্তি [illegible] এবং [illegible] গ্রহণ এবং উহাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ—এই সকল ব্যবস্থা পরিকল্পনার দশ বৎসরে কৃষি কাঠামোর পুনর্গঠনের পথে অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে।

গ. শক্তি উৎপাদন ঃ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে গিয়া পৌছায়, যদিও পরিকল্পনার দশ বৎসরের লক্ষ্য ছিল ৬৯ লক্ষ কিলোওয়াট। এই ত্রুটির কারণ হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত অসুবিধার কথাই বলা হইয়াছে।

ঘ. গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প ঃ বিগত দশকে এই প্রকারের শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক মোট ২১৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। শিল্প সম্প্রসারণ সেবার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্প সেবা সংস্থা (Small Industries Service Institutes) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং মোট ৫৩টি সম্প্রসারণ কেন্দ্র (Extension Centres) সমগ্র দেশে স্থাপিত হয়। ১০০০ ক্ষুদ্র কারখানা লইয়া ৬০টি শিল্প উপনিবেশের (industrial estates) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সকল শিল্পের প্রয়োজনে ঋণ, প্রযুক্তিবিদ্যাসংক্রান্ত জ্ঞান, কাঁচামাল এবং কিস্তিবন্দী শর্তে ক্রয় (hire-purchase) পদ্ধতি অনুসারে বিদেশ হইতে আনিত এবং স্বদেশজাত যন্ত্রপাতি সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের উৎপাদন ৭৪ কোটি গজ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০ কোটি গজে এবং খাদি ৭৩ লক্ষ গজ হইতে ৭০ কোটি ৪০ লক্ষ গজে এবং কাঁচা রেশম ২৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৩৬ লক্ষ পাউণ্ডে গিয়ে দাঁড়ায়।

ঙ. শিল্প ও খনিজ (মূল এবং ভারি শিল্প) ঃ দশ বৎসরে এই খাতে মোট ৯৭৪ কোটি টাকা সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হইয়াছে (ইহার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেই এই বাবদে ৮৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইয়াছে)। সরকারী ক্ষেত্রের শিল্পসমূহ বেশির ভাগই মূল এবং ভারী ধরনের। ইহার ফলে শুধুমাত্র সরকারী ক্ষেত্রই যে শক্তিশালী হইয়াছে তাহা নহে, বেসরকারী ক্ষেত্রের মাঝারি এবং হাল্কা ধরনের শিল্পের প্রসারেরও প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। সংগঠিত শিল্পের উৎপাদন এই দশ বৎসরে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ মূল শিল্পের (যথা ইস্পাত, কয়লা, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য) উৎপাদনও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইস্পাত পিণ্ডের উৎপাদন ১৪ লক্ষ টন হইতে ৩৫ লক্ষ টনে, কয়লার উৎপাদন ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টন হইতে ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টন এবং সালফিউরিক এ্যাসিডের উৎপাদন ৯৯ হাজার টন হইতে ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টনে গিয়ে দাঁড়াইয়াছে।

চ. পরিবহণ ও সংসরণ : বিগত দশ বৎসরে পরিবহণ ও সংসরণের জন্য সরকারী ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮২৩ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে রেলগাড়ি ইঞ্জিন ও রেলপথের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল কৃষি ও শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য নূতন রেললাইন স্থাপন ও নূতন রেলগাড়ি নির্মাণ করা। এই দশ বৎসরে প্রায় ১২০০ মাইল নূতন রেলপথ স্থাপন, ১৩০০ মাইল রেলপথে একটির স্থানে দুইটি করিয়া লাইন বসান এবং ৮০০ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিকরণের কাজ সমাপ্ত হয়।

প্রায় ৪৬০০০ মাইল নূতন উচ্চ রাস্তা, এবং ২৯,০০০ নূতন বাণিজ্যিক যান নির্মাণের ফলে পরিবহণ ও সংসরণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সূচিত হয়। উপরন্তু বৃহদায়তন বন্দরগুলির কার্যক্ষমতার প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়, পোতাশ্রয়গুলিরও উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ হয়।

ছ. সমাজসেবা ও বিবিধ শিক্ষা : এই ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি দেখা যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২১০,০০০

হইতে ৩৫২,০০০, উচ্চ [illegible] বিদ্যালয়ের সংখ্যা [illegible] হইতে [illegible] কলেজের সংখ্যা ৫৪২ হইতে ১০৫০ এবং বিদ্যালয়ে পাঠরত ৬-১১ বৎসর বয়স্ক ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৪২ ভাগ হইতে শতকরা ৬১তে গিয়ে দাঁড়ায়। উপরন্তু কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য।

বহুসংখ্যক হাসপাতাল, ঔষধালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন, শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার ফলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। ফলে ভারতের লোকেব গড আয়ু প্রায় দশ বৎসব বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত মোট ৮৯ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের জন্য দশ বৎসবে মোট ১৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

বিগত দশ বৎসবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ এবং কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রে ৬৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট ৯০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে বলিযা হিসাব কবা হইযাছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অপর্যাপ্ত।

মন্তব্য ঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য প্রদর্শিত হইলেও কযেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনেব বিষয়ে দ্বিতীয় পরিকল্পনা নিজস্ব লক্ষ্য পূর্ণ করিতে পারে নাই। যেমন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য যেখানে ছিল ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টন সেখানে প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন। কয়লাব উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৬ কোটি টন, প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছে ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টন। ইস্পাত পিণ্ডেব ক্ষেত্রেও লক্ষ্য পূর্ণ হয নাই। বাসস্থানেব সমস্যাও এই সমযে তীব্রই বহিযা গিযাছে। কর্মসংস্থান বিষযে তৃতীয় পবিকল্পনা ৯০ লক্ষ কর্মপ্রার্থীব বোঝা লইয়া যাত্রা শুরু করিযাছে। মূল্যস্তবকে মোটামুটি ভাবে স্থিব রাখা যে কোন পবিকল্পনারই সাফল্যেব একটি অন্যতম শর্ত। প্রথম পবিকল্পনাকালে মূল্যস্তব সাধাবণভাবে স্থিতিশীল থাকাতে বিশেষ কোন সমস্যাব সৃষ্টি হয নাই। কিন্তু দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে ঊর্ধ্বগামী মূল্যস্তব বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি কবে। ফলে পবিকল্পনার পুনর্বিচাব ও কাঁটছাঁট কবিতে হয়। আর যাহাই হউক ইহা পরিকল্পনার সাফল্যেব সূচক নহে। উপরন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিব ফলে মজুব শ্রেণী এবং অন্যান্য স্বল্পআয়-বিশিষ্ট লোকেব জীবনযাত্রার মান অনেকখানি নামিয়া যায়। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য গণউদ্দীপনা সৃষ্টির পক্ষে ইহা মোটেই আশার কথা নহে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

THIRD PLAN

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দশ বৎসবে ভারতে দ্রুত সম্প্রসারণেব সম্ভাবনাময় অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দশ বৎসরের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন প্রচেষ্টা ভারতে আত্মনির্ভর ও স্বয়ংচল (self-generating) অর্থনীতিব ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় অনেকখানি সহায়তা করিয়াছে। কর্মপরিধি যত বিস্তৃত হইতেছে বিভিন্ন দিক হইতে ততই নানাবিধ চাহিদা মিটাইবারও প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতেছে। বহু প্রকারের প্রকল্প পরিকল্পনা ও কার্যসূচীকে রূপদানের জন্য বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগও অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য

OBJECTIVES

১. জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ হারে বাৎসরিক বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের এই হার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও যাহাতে বজায় থাকে সেই ভাবে বিনিয়োগ করা। ২. খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্প ও রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার মত কৃষিজ উৎপাদনের বৃদ্ধিসাধন। ৩. যাহাতে আগামী দশ বৎসর বা ঐ প্রকারের সময়ের মধ্যে দেশের নিজস্ব

[illegible] ... উৎপাদনকারী মূল শিল্পের সম্প্রসারণ ... [illegible]

মানবিক সম্পদের যথাসম্ভব পূর্ণতম ব্যবহার এবং কর্মসংস্থানের অধিকতর [illegible]

৫. সুযোগসুবিধা ভোগের ব্যাপারে অধিকতর সাম্য আনয়ন এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্যের হ্রাস ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সুষম বণ্টন।

তৃতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য
FEATURES OF THE THIRD PLAN

১. উন্নয়নের এই কার্যসূচীতে কৃষিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। দুইটি পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে কৃষিজ উৎপাদনের হার কম বলিয়াই ভারতের অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হয় নাই। তাই কৃষির লক্ষ্য পূরণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিতে হইবে। গ্রামীণ অর্থনীতির বৈচিত্র্য আনিতে হইবে। কৃষির উপরে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত কমাইতে হইবে। এই ভাবেই গ্রামীণ জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করা এবং জীবন-যাত্রার মানের উন্নতি ঘটান যাইবে।

২. গ্রামাঞ্চলের এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনে জিলা পরিষদ, গ্রামপঞ্চায়েত এবং সমবায় সমিতি ইত্যাদি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করিবে। এই উদ্দেশ্যে সমবায় সেবা সমিতি, সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা ইত্যাদির সম্প্রসারণ করিতে হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির উন্নয়নে গ্রামাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ কৃষি-শ্রমিক পরিবারের অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। সেচ, ভূমি সংরক্ষণ, শুষ্ক কৃষি, বনভূমি রচনা (afforestation) এবং উন্নয়ন ইত্যাদি কাজে গ্রামের জনশক্তির পূর্ণতর স্থানীয় সার-সম্পদের ব্যবহার তাই অপরিহার্য হইয়া উঠিবে।

৩. অর্থনীতিকে আত্মনির্ভরশীল (self-reliant) এবং স্বয়ংচল (self-generating) করিবার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার ন্যায় তৃতীয় পরিকল্পনাতেও ইস্পাত, জ্বালানী, শক্তি, রাসায়নিক দ্রব্য এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্পের ন্যায় ভারী বুনিয়াদী শিল্পের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ক্ষুদ্রশিল্পের ব্যাপক উন্নয়নের গুরুত্ব তৃতীয় পরিকল্পনায় স্বীকৃতি লাভ করে। শিল্পোন্নয়নের কার্যসূচী প্রণয়নের ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনীয়তা সমগ্র অর্থনীতির দিক হইতে বিচার করিয়াই নির্ধারণ করা হয়। এ বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত —উভয় ক্ষেত্রকেই হিসাবের মধ্যে রাখা হইয়াছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া লইয়াও ঘোষণা করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব লইতে হইবে।

৪. তৃতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক সেবামূলক কার্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান হইল জনসাধারণের অকুণ্ঠ ও সক্রিয় সহযোগিতা ও স্বার্থত্যাগ। সমাজসেবামূলক কাজের উপরে এই কারণেই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

৫. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমতা আনয়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে এমনভাবে রচনা করা হইবে যাহাতে পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলি অগ্রগতি লাভ করিতে পারে। উপরন্তু পরিকল্পনার ফল যাহাতে দেশের সকল শ্রেণীর লোকই (বিশেষ করিয়া গ্রামবাসীরা) ভোগ করিতে পারে তজ্জন্য শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে তীব্র অসাম্য দূর করার চেষ্টা কার্যসূচীর অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে

সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয়-বরাদ্দ ও ব্যয়-বণ্টন
PUBLIC SECTOR OUTLAY

(হিসাব কোটি টাকায়)

	তৃতীয় পরিকল্পনা	
	মোট ব্যয়	শতকরা হিঃ
কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	১০৬৮	১৪%
সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	১৬৬২	২২%
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৪	৪%
সংগঠিত শিল্প ও খনিজ	১৫২০	২০%
পরিবহণ ও সংরক্ষণ	১৪৮৬	২০%
সমাজসেবা ও বিবিধ	১৩০০	১৭%
অন্যান্য	২০০	৩%
মোট ব্যয়	৭৫০০	১০০

মোট ব্যয় ৭৫০০ কোটি টাকার মধ্যে বিনিয়োগ ব্যয় (investment) ৬৩০০ কোটি ও চলতি ব্যয় (current outlay) ১২০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ ও ব্যয় বণ্টন
PRIVATE SECTOR OUTLAY

(হিসাব কোটি টাকায়)

১.	কৃষি (সেচ সহ)	৮৫০
২.	শক্তি	৫০
৩.	পরিবহণ ও সংরক্ষণ	২৫০
৪.	গ্রামীণ ও কুটির শিল্প	৩২৫
৫	বৃহৎ, মাঝারি আয়তন শিল্প ও খনিজ	১১০০
৬.	গৃহনির্মাণ ইত্যাদি	১১২৫
৭.	মজুদ দ্রব্য	৬০০
	মোট	৪৩০০

সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় : অর্থসংস্থানের ধাঁচ
PUBLIC SECTOR OUTLAY : FINANCING PATTERN

সরকারী ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর জন্য ৮০০০ কোটিরও অধিক টাকা লাগিবে। অথচ আর্থিক সম্বলের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৭৫০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার কার্য চলাকালে উৎপাদন ও সঞ্চয়ের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণও আরও বাড়ান যাইবে। এবং ৮০০০ কোটি টাকা মূল্যের **উৎপাদনভিত্তিক কার্যসূচী (Physical programmes)** সফল করিবার জন্য ৭৫০০ কোটি টাকারও অধিক অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব হইবে। জাতির সম্পদ একটি স্থির ভাণ্ডার নহে। উৎপাদনের পরিমাণের উপরে ইহা নির্ভর করে। উৎপাদন কমিলে ভাণ্ডার কমিবে এবং উৎপাদন বাড়িলে ভাণ্ডারও বাড়িবে; তখন এই বর্ধিত ভাণ্ডার হইতে পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ পাওয়া যাইবে। সরকারী

ক্ষেত্রের পরিকল্পনার ব্যয়ের ধাঁচ হইতে দেখা যায় রাজস্ব সংক্রান্ত সূ[illegible] দ্বারা ৭%, এবং বৈদেশিক সাহায্য দ্বারা বাকী ৩০% অর্থ সংগ্রহ করা হইবে।

১. চলতি রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত—৫৫০ কোটি টাকা

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসবকারসমূহের রাজস্বখাতে মোট আয় হইবে ৯২৫০ কোটি টাকা। উন্নয়নমূলক ও উন্নয়নেব সহিত সম্পর্ক নাই এমন অন্যান্য ব্যয়ের জন্য ৮৭০০ কোটি টাকা লাগিবে। সুতরাং এইভাবে ৫৫০ কোটি টাকাব মত উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই অনুমান অযৌক্তিক বলিয়া পবিকল্পনা কমিশন মনে কবেন না। কারণ এই কয় বৎসবে সম্পদের অবস্থার অনেক উন্নতি হইযাছে, এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রবর্তিত বিভিন্ন রাজস্ব বৃদ্ধিব পন্থা দ্বাবা এই সময়ে ভাল ফল আশা কবা যায়।

২. কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় কারবারগুলির উদ্বৃত্ত আয়—৪৫০ কোটি টাকা

বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন লৌহ, ইস্পাত, সাবেব কাবখানা, তৈল নিষ্কাশন ও শোধনাগাব, ডাক ও তাব বিভাগ ইত্যাদি) হইতে প্রাপ্তব্য উদ্বৃত্তেব পবিমাণ ধবা হইয়াছে ৩০০ কোটি টাকা এবং বাজ্যসরকার-সমূহেব উদ্যোগাধীন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহেব নিকট হইতে প্রাপ্তব্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পবিকল্পনাকালে এই সকল প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই নির্মিত হইতেছিল, তাই ঐ সময়ে বিশেষ কোন উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইবে বলিয়া আশাও কবা হয় নাই। তৃতীয় পবিকল্পনাকালে ঐ সকল প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের কাজ শুরু কবিবে। উল্লিখিত ৪৫০ কোটি টাকার হিসাব নিতান্তই আনুমানিক।

৩. অভ্যন্তরীণ বাজার হইতে সংগৃহীত ঋণ—৮০০ কোটি টাকা

অভ্যন্তবীণ বাজার হইতে অনুমান ৮০০ কোটি টাকাব ঋণ সংগ্রহ করা যাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই সূত্রে ৭৮০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইযাছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পূর্বনির্দিষ্ট চুক্তি মত ৯৪০ কোটি টাকার মত অভ্যন্তবীণ ঋণ শোধ করিবার প্রয়োজন দেখা দিবে।

৪. স্বল্প সঞ্চয়—৬০০ কোটি টাকা

স্বল্প সঞ্চয় খাতে ৬০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে অনুমান কবা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের স্বল্প সঞ্চযেব লক্ষ্য ছিল ৫০০ কোটি টাকা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংগৃহীত হইয়াছে ৪০০ কোটি টাকা (প্রথম পরিকল্পনায় সংগৃহীত হইযাছে ২৩৭ কোটি টাকা)। স্বল্পসঞ্চয় সংগ্রহের সংগঠনের কিছু কিছু উন্নযনের ফলে স্বল্পসঞ্চয়েব আদায়ের ব্যাপারে আশাব সঞ্চার হইয়াছে। ইহাতে পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করে গ্রামাঞ্চলেব স্বল্পসঞ্চয় সংগ্রহের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণের উপরে এবং স্বল্প সঞ্চযের আন্দোলন কতটা ব্যাপক আকাবে গড়িয়া ওঠে তাহার উপর।

৫. সরকারী ক্ষেত্রের জন্য প্রাপ্তব্য বিদেশী ঋণ—২২০০ কোটি টাকা

পরিকল্পনাকালে মোট ৩২০০ কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। ইহার মধ্যে ৩০০ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রের। এই ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে ব্যক্তিগত বিদেশী পুঁজি (যাহা ভারতবর্ষে বিনিয়োগের জন্য আসিবে), বিশ্বব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক অর্থ করপোরেশন (International Finance Corporation), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি-আমদানি ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্তব্য ঋণ ধরা হইয়াছে। আবার ঋণশোধের বাবদ প্রাপ্তব্য ৪৫০-৫০০ কোটি টাকা সরকারী ক্ষেত্রে পাওয়া যাইবে না। 'পি. এল. ৪৮০'র মারফত যে ৬০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে তাহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকার

মত খাদ্যশস্য মজুদ হিসাবে রাখিতে হইবে অর্থাৎ এই ২০০ কোটি টাকা পরিকল্পনার কাজে ব্যবহারযোগ্য সম্পদ হিসাবে পাওয়া যাইবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে অনুমিত ৩২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যের মধ্য হইতে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা (৩০০+৫০০ +২০০) বাদ দিয়া অবশিষ্ট ২২০০ কোটি টাকা কার্যত সরকারী ক্ষেত্রের জন্য পাওয়া যাইবে।

৬ ঘাটতি ব্যয়—৫৫০ কোটি টাকা

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৫৫০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের মতে এই পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হইবে না (non-inflationary)। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয়ের লক্ষ্য থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে ৯৪৮ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করা হয়। ঘাটতি ব্যয়ের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে (অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সরকারী ক্ষেত্রকে ঋণ) তদনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৮৬৩ কোটি টাকা হয়, ৯৪৮ কোটি টাকা নহে।[১]

৭ অতিরিক্ত কর—১৭১০ কোটি টাকা

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে হিসাব করা হইয়াছিল অতিরিক্ত করের মাধ্যমে ৮৫০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে। প্রকৃতপক্ষে ১০৫২ কোটি টাকা ঐ সূত্রে গৃহীত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে কর-রাজস্বের অনুপাত ছিল জাতীয় আয়ের ৭.৭%। ১৯৬০-৬১ সালে উহা ৮.৯% গিয়া দাঁড়ায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় অনুমিত অতিরিক্ত কর ১৭১০ কোটি টাকা এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত কর রাজস্ব হইবে—এই সকল মিলাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে কর-রাজস্বের অনুপাত হইবে জাতীয় আয়ের শতকরা ১১.৪%।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয় সম্পর্কে মন্তব্য

DEFICIT FINANCING IN THE THIRD PLAN COMMENTS

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাইকারী মূল্যস্তর ৩০% বৃদ্ধি পায়। খাদ্যশস্য ও কৃষিজ কাঁচামালের অপ্রচুর যোগান এবং দেশের মধ্যে আর্থিক আয় বৃদ্ধির জন্য চাহিদার বৃদ্ধি এই দুইটিই ইহার প্রধান কারণ।

পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি হইবে না বলিয়া যে আশা করিয়াছেন তাহা দুইটি কারণে কার্যকর হইবে না বলিয়া মনে হয়: ক. দেশের অভ্যন্তরে সাধারণ মূল্যস্তর বেশ কিছুকাল ধরিয়াই বৃদ্ধি পাইতেছে; খ. বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয়ও এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে নাই যাহা ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করিয়া ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। তাই ঘাটতি ব্যয়ের কোন্ পরিমাণ অবধি মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা নাই সে বিষয়ে পুনরায় বিচার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন সময়ে এই ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা আবশ্যক। প্রকৃত উৎপাদন (real output), বিশেষ করিয়া খাদ্যোৎপাদন কি পরিমাণ হইবে, তাহার উপর এ বিষয় অনেকখানি নির্ভর করে।

১. Reserve Bank's credit to the Government sector minus the estimated decline in the RB's foreign exchange assets attributable to the Government sector.

[illegible]কল্পনায় উৎপাদন লক্ষ্য
TARGETS OF PRODUCTION IN THE THIRD PLAN

১. তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের ৩০% এবং মাথাপিছু আয়ের ১৭% বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। অর্থাৎ জাতীয় আয় ১৪,৫০০ কোটি টাকা (১৯৬০-৬১ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী) হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০০০ কোটি টাকায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হিসাবের ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় ৩৩০ টাকা হইতে ৩৮৫ টাকায় দাঁড়াইবে।

২. কৃষি ক্ষেত্রের ৩৫ লক্ষ ও কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রের ১ কোটি ৫ লক্ষ লইয়া মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকেব নূতন কর্মসংস্থানের লক্ষ্য সম্মুখে রাখা হইযাছে।

৩. কৃষির সামগ্রিক উৎপাদন ৩০% বৃদ্ধি করা হইবে। বিশেষ বিশেষ কৃষিজ পণ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির লক্ষ্য নিম্নরূপ :

		১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	% বৃদ্ধি
খাদ্যশস্য	(লক্ষ টন)	৭৬০	১০০০	৩২
তৈলবীজ	(,,)	৭১	৯৮	৩৮
ইক্ষু	(,,)	৮০	১০০	২৫
তুলা	(লক্ষ গাঁইট)	৫১	৭০	৩৭
পাট	(,,)	৪০	৬২	৫৫

উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ পূর্ণ হইলে খাদ্যশস্যে অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে এবং মাথাপিছু দৈনিক ভোগেব পরিমাণ ১৬ আউন্স (১৯৬০-৬১) হইতে ১৭·৫ আউন্সে (১৯৬৫-৬৬) দাঁড়াইবে। সেচের অন্তর্ভুক্ত জমিব পরিমাণ ৭ কোটি একর হইতে ৯ কোটি একবে (২৯% বৃদ্ধি) লইয়া যাওয়া হইবে। সমবায় সমিতিব মাধ্যমে কৃষকদিগকে দেয় ঋণেব পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা (১৯৬০-৬১) হইতে ৫৩০ কোটি টাকাতে (১৯৬৫-৬৬) লইয়া যাওয়া হইবে।

৪. শিল্পেব সামগ্রিক উৎপাদন ৭০% বৃদ্ধিব লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য নিম্নরূপ :

		১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	% বৃদ্ধি
ইস্পাত পিণ্ড	(লক্ষ টন)	৩৫	৯২	১৬৩
লৌহ মাক্ষিক	(")	১০৭	৩০০	১৮০
চিনি	(")	৩০	৩৫	১৭
কয়লা	(")	৫৪৬	৯৭০	৭৬
সিমেণ্ট	(")	৮৫	১৩০	৫০
মিলজাত বস্ত্র	(লক্ষ গজ)	৫১২৭০	৫৮০০০	১৩
হস্ত-তাঁত জাত বস্ত্র	(")	২৩৪৯০	৩৫০০০	৪৯
বিদ্যুৎ	(লক্ষ কিলোওয়াট)	--	...	...

বস্ত্রোৎপাদনের লক্ষ্য পূর্ণ হইলে মাথাপিছু বস্ত্র ব্যবহারের পরিমাণ ১৫½ গজ (১৯৬০-৬১) হইতে ১৭·২ গজে (১৯৬৫-৬৬) দাঁড়াইবে।

[illegible] কর্তৃক [illegible] ক্ষমতা ২১% বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

৬. সমাজসেবার ক্ষেত্রে ৬–১১ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদিগের অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হইবে। চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ২১% এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ৫০% বৃদ্ধির লক্ষ্য ঘোষণা করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা
CRITICISMS OF THE THIRD PLAN

ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনাকে বিভিন্ন দিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। সমালোচনাগুলি নিম্নে আলোচিত হইল :

১. তৃতীয় পরিকল্পনার সরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগের অনুমতি পরিমাণ (৭৫০০ কোটি টাকা) প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ (৬৫৬০ কোটি টাকা) হইতেও বেশি। পরিকল্পনার উন্নয়নের লক্ষ্য অতিশয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে। ভারতের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের কার্যসূচীর রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিচার করিলে এই লক্ষ্যকে খুব বেশি উচ্চাশাসম্পন্ন বলিয়া মনে করা যায় না। তবে নানাবিধ অসুবিধা ও উপকরণগত স্বল্পতার জন্য লক্ষ্য পূর্ণ করা যাইবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

২. বিভিন্ন কার্যক্রমকে রূপায়িত করিতে বিদেশ হইতে যে বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি করিতে হইবে তাহার জন্য প্রচুর পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন দেখা দিবে। বিদেশী মুদ্রা কি পরিমাণ পাওয়া যাইবে তাহা নির্ভর করে দুইটি জিনিসের উপরে : ক. বৈদেশিক সাহায্য খ. রপ্তানির পরিমাণ। বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে পূর্বেই কিছু বলা যায় না। আর রপ্তানি বৃদ্ধির পথে বাধাগুলিও কম নয়। বিদেশের বাজারে ভারতীয় রপ্তানি দ্রব্য তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে। তদুপরি ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ইংলণ্ডের যোগদানের প্রস্তাব কার্যকরী হইলে ইংলণ্ডের বাজারে ভারতীয় রপ্তানি হ্রাস পাইবে।

৩. অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্য অবাস্তব এবং উহা পূরণ করা ভারতের ক্ষমতার বাহিরে বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে। ইতোমধ্যেই করভার তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছে। ইহার উপরে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৭১০ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করা সম্ভব কিনা তাহা বিবেচ্য। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট যে উদ্বৃত্ত রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে এত অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে না বলিয়াই অনেকে মনে করেন। 'না-ক্ষতি-না-মুনাফা' নীতি গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ এই পরিমাণ উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে পারিবে না বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

৪. তৃতীয় পরিকল্পনায় রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটিবে। এই ক্ষেত্রের যাবতীয় কার্যক্রমের সফল রূপায়ণের জন্য পরিচালনা কার্যে দক্ষ বহুসংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন। ভারতে এই প্রকারের কর্মচারীর সংখ্যা অপর্যাপ্ত। সুতরাং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সম্মুখে গুরুতর সমস্যা দেখা দিবে।

৫. তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তরের স্থিরতা আনয়ন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে কোন নীতি নির্ধারিত হয় নাই। ইহাতে ভবিষ্যতে পরিকল্পনার সম্মুখে সমস্যা দেখা দিবে। কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকায় [illegible]পরিকল্পনার ব্যয় বিশেষ ভাবে

বৃদ্ধি পায়। ফলে উহার সকলদিক পুনর্বিচারের পর বরাদ্দব্যয়ের কাটছাঁট করিয়া সংকটের সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

৬. দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে যেমন, তৃতীয় পরিকল্পনাতেও তেমনি ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের উন্নয়নের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। ফলে দেশের জনসাধারণের ভোগ্যপণ্যের অভাবে পূর্বের ন্যায় কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। ইহা অনেকের মতে সমর্থনযোগ্য নহে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সম্বল ও লেনদেনের উদ্বৃত্ত
EXTERNAL RESOURCES & BALANCE OF PAYMENTS IN THE THIRD PLAN

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা সঞ্চিত থাকার ফলে পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় আমদানির একটা অংশের দাম শোধ করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রয়োজনমত ভারতের বৈদেশিক পাওনা হইতে টাকা উঠাইয়া কাজ চালান গিয়াছিল। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনা এমন একটা সময়ে শুরু হইয়াছে যখন অতিরিক্ত কোন অর্থ বৈদেশিক পাওনা হইতে উঠান আর সম্ভব নহে। তদুপরি ভারতের স্টার্লিং জমার পরিমাণ ভীষণভাবে কমিয়া যাওয়াতে সুদ হিসাবে যে পাওনা জমা হইত তাহাও আর পাওয়া যাইবে না। উপরন্তু, বিদেশী ঋণের উপরে দেয় সুদের পরিমাণও ক্রমাগতই বাড়িতে থাকিবে। ইহা ছাড়াও তৃতীয় পরিকল্পনাকালেই বিদেশী মুদ্রায় প্রচুর বিদেশী ঋণ শোধ করিতে হইবে। প্রধানত এই বাবদেই তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের রপ্তানির তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনাকালে রপ্তানির পরিমাণ ⅕ অংশ বেশি হইবে এই হিসাবের ভিত্তিতে পরিকল্পনাকালে যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাতে কেবলমাত্র 'অর্থনীতির জন্য সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, আনুষঙ্গিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতির রদবদলের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ (components replacement machinery) ইত্যাদির ন্যায় বর্তমান যন্ত্রপাতির সংরক্ষণজনিত আমদানিই করা চলিবে (maintenance imports), অন্য কোন দেনা শোধ করা সম্ভব হইবে না। উহার পরিমাণ ৩৬৫০ কোটি ধরা হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমদানির পরিমাণ ৩৮০০ কোটি টাকা বলিয়া ধরা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে উন্নয়নমূলক কার্য, খাদ্য, যন্ত্রপাতির সংরক্ষণজনিত আমদানি—ইত্যাদির জন্য এবং ৫৫০ কোটি টাকার ঋণ পরিশোধের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। খাদ্য আমদানির জন্য 'পি. এল. ৪৮০-র মাধ্যমে ৬০০ কোটি টাকার মত ঋণের ব্যবস্থা অবশ্য করা হইয়াছে।

উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য আমদানির পরিমাণ হইবে ২১০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে অবশ্য যন্ত্রপাতির অংশ আমদানির জন্য যে ২০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে তাহা বাদ দিলে শুধুমাত্র উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য ১৯০০ কোটি টাকার আমদানির প্রয়োজন হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। 'পি. এল. ৪৮০' বাবদ প্রাপ্তব্য ৬০০ কোটি টাকা বাদ দিলে ২৬০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। [দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৯২৭ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং আরও ৫৯৮ কোটি টাকা বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয় হইতে উঠান হইয়াছে—অর্থাৎ মোট বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন হইয়াছে (৯২৭+৫৯৮=) ১৫২৫ কোটি টাকার।]

এই অর্থ যে ভাবে সংগৃহীত হইবে : 'পি. এল. ৪৮০' সূত্রে ৬০০ কোটি টাকার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে সংগঠিত ভারত-সাহায্য সমিতি (Aid

India Consortium) ১০৮৯ কোটি টাকার আশ্বাস দিয়াছে। ইহার মধ্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হইল ৪৯৭ কোটি টাকা)। সোবিয়েত ইউনিয়নের নিকট হইতে ২৩৮ কোটি টাকার ঋণের ব্যবস্থা আগেই করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরের অগ্রগতির পর্যালোচনা
REVIEW OF THE FIRST THREE YEARS OF THE THIRD PLAN

তিন বৎসরেব অগ্রগতি সম্বলিত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি মধ্যকালীন মূল্যায়ন পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অগ্রগতির হিসাব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইল।

১. **জাতীয় আয়ঃ** লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয় গড়ে বৎসরে ৬% বাড়িবে এবং মাথাপিছু আয় পাঁচ বৎসরে ১৬% বাড়িবে। কিন্তু জাতীয় আয় প্রথম দুই বৎসরে গড়ে ২.৫% হারে এবং তৃতীয় বৎসবে ৪.৩% হাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাথাপিছু আয় প্রথম দুই বৎসরে কিছুমাত্র বাড়ে নাই, কারণ ঐ দুই বৎসর জনসংখ্যাও গড়ে ২.৫% হারে বাড়িয়াছে। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় ও মাথাপিছু আযের পরিমাণ কোন ক্রমেই লক্ষ্য পূর্ণ করিতে পারিবে না।

২. **কৃষিঃ** পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে কৃষির ক্ষেত্রে কোন উন্নতিই পরিলক্ষিত হয় নাই। ববং দ্বিতীয় বৎসবে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। এই প্রকাবের ব্যর্থতা পরিকল্পনা-কালে পূর্বে কথনো হয নাই বলিয়া মনে হয়। এই ব্যর্থতাব প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইতেছে এবং গভীর সংকটের সৃষ্টি করিতেছে।

৩. **শিল্প ও খনিজঃ** প্রথম দুই বৎসরে শিল্পোৎপাদন গড়ে ৭% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনটি সরকারী ইস্পাত কারখানাতেই প্রকৃত উৎপাদন নির্ধারিত উৎপাদন ক্ষমতা অতিক্রম করিযাছে। কয়লার ক্ষেত্রে সবিশেষ উন্নতি ঘটিযাছে। পুঁজিদ্রব্য ও মধ্যবর্তী দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে অগ্রগতিও উল্লেখযোগ্য। তবে লৌহপিণ্ড ইস্পাত ছাঁচে ঢালাই ও রাসাযনিক সাবের ক্ষেত্রে অগ্রগতি আশানুরূপ হয় নাই।

৪ **শক্তিঃ** শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে ৪৫%।

৫. **পরিবহণ ও সংসরণঃ** রেলপথ উন্নয়নের জন্য মোট বরাদ্দের ৪৫% (৪১৩ কোটি) দুই বৎসরের মধ্যেই ব্যয় করা হইযাছে। ওয়াগন নির্মাণ বাৎসরিক ১২ হাজার হইতে ২৫ হাজারে পৌছিয়াছে, এই সময়ে সড়ক ও সড়ক পরিবহণের উন্নতিও উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুই বৎসরে এই জন্য ১৮৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

৬. **স্বাস্থ্যঃ** তৃতীয় পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ৩৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ ব্যয়ের মধ্যে প্রথম দুই বৎসরের মধ্যেই ১৩৩ কোটি টাকা ব্যয করা হইয়াছে।

৭. **কর্মসংস্থানঃ** তিন বৎসরে কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে মোট ৪০ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে লক্ষ্য ছিল কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে ১ কোটি ৫ লক্ষ এবং কৃষিক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হইবে। কৃষিক্ষেত্রে আশানুরূপ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং কর্মহীনতার সমস্যার সমাধান তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সুদূর পরাহত।

৮. **জনকল্যাণঃ** জরুরী অবস্থা ও কতকগুলি ক্ষেত্রে কার্যারম্ভে বিলম্বের জন্য অনুন্নত শ্রেণীগুলির কল্যাণমূলক বিশেষত, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ হ্রাস করা হইয়াছে।

৯. **মূল্যস্তরঃ** ১৯৬০-৬১ সালে পাইকারী মূল্যস্তর ছিল ১২৪ (১৯৫২-৫৩=১০০)। পরিকল্পনার প্রথম বৎসর (১৯৬১-৬২) মূল্যস্তরে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু

[illegible] হইতে মূল্যস্তরের ঊর্ধ্বগতি শুরু হয়। এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে তাহা [illegible] পৌঁছায়। তৎপরবর্তীকালেও ইহা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং মূল্যস্ফীতির সংকটের [illegible] তৃতীয় পরিকল্পনা পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

১০. **পরিকল্পনার ব্যয়ঃ** তিন বৎসরে সরকারী ক্ষেত্রে মোট ব্যয় ৪১৭৮ কোটি টাকা। চতুর্থ বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ ১৬৫৪ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

১১. **অর্থসংস্থানঃ** তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার ১১০০ কোটি টাকা ও রাজ্য সরকারগুলির ৬১০ কোটি টাকা মোট ১৭১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর আদায়ের কথা হইয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা দ্বারা পাঁচ বৎসরে প্রায় ২৪০০ কোটি টাকা আদায় হইবে বলিয়া মনে হয়। সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত ৪৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ প্রথম দুই বৎসরে ঐ সূত্র হইতে মাত্র (২০+২৮=) ৪৮ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে ; এবং তৃতীয় বৎসরে ৬৪ কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারে। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ প্রথম দুই বৎসরে ২৫০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং তৃতীয় বৎসরে ২০৩ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্র হইতে প্রত্যাশিত অর্থ (৮০০ কোটি টাকা) পাওয়া হয়ত সম্ভব হইবে। কিন্তু স্বল্প সঞ্চয় প্রত্যাশিত পরিমাণে (মোট ৬০০ কোটি টাকা) পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ প্রথম দুই বৎসরে এই সূত্র হইতে যে পরিমাণ সংগ্রহ হইয়াছে তা হতাশাব্যঞ্জক। ঘাটতি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও নির্ধারিত ৫৫০ কোটি টাকা পরিকল্পনার তিন বৎসরেই অতিক্রান্ত হইয়াছে—এই তিন বৎসরে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ৬১৬ কোটি টাকা। বৈদেশিক সূত্র হইতে অর্থ আশাতিরিক্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তিন বৎসরের সাফল্য ও ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করিলে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয় না।

তিনটি পরিকল্পনার তুলনামূলক বিচার
COMPARATIVE STUDY OF THE THREE PLANS

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
AIMS & OBJECTIVES

১ **প্রথম পরিকল্পনাঃ** ক. যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে অর্থনীতিতে যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় তাহার সংশোধন। খ. অর্থনীতির সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের ভিত্তি তৈয়ারি করা যাহাতে জাতীয় আয়ের এবং জীবনযাত্রার মানের ধারাবাহিক উন্নতি সাধিত হয়।

প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল।

২. **দ্বিতীয় পরিকল্পনাঃ** ক. জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। খ. দ্রুততর গতিতে শিল্পোন্নয়ন বিশেষ করিয়া ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের দ্রুত উন্নয়ন। গ. কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি। ঘ. আয় ও সম্পদবণ্টনে অসাম্য হ্রাস এবং অর্থনীতিক শক্তির অধিকতর সুষম বণ্টন। এই সকল লক্ষ্যগুলির পূর্ণতা সাধনের জন্য সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতে বৃহত্তর ও সুদূরপ্রসারী।

৩. **তৃতীয় পরিকল্পনাঃ** ক. জাতীয় আয়ের শতকরা ৫% হার বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের এই হার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে বজায় রাখা। খ. খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

এবং শিল্প ও রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার মত কৃষিজ উৎপাদনের বৃদ্ধিসাধন।
গ. শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভিত্তি রচনার জন্য ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ।
ঘ. দেশের সম্পদের যথাসম্ভব পূর্ণতর ব্যবহার এবং অধিকতর সংখ্যায় নূতন কর্ম সৃষ্টি।
ঙ. অধিকতব সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগেব ব্যাপারে সাম্য আনয়ন এবং সমাজের আয়, সম্পদ ও অর্থনীতিক ক্ষমতাব সুষম বণ্টন। তৃতীয় পবিকল্পনাব লক্ষ্য আবও সুদূরপ্রসারী, কার্যসূচী ব্যাপকতর এবং আত্মনির্ভবশীলতা অর্জনেব সুস্পষ্ট ঘোষণা।

খ. অগ্রাধিকার
PRIORITY

প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্য ও কাঁচামাল উৎপাদনই প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। যুদ্ধের বিপর্যস্ত পবিবহণ সংসবণেব পুনর্বাসন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। সুতবাং কৃষিব উন্নয়নকেই অগ্রাধিকাব দান কবিযা পবিবহণেব পুনর্বাসনেব ব্যবস্থাকে পববর্তী অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নেব কার্যসূচীকে অগ্রাধিকাব দেওযা হয। বিশেষ কবিয়া ভাবী বুনিযাদী শিল্পগঠনে অধিক গুরুত্ব আবোপ কবা হয। ইহাবই সহিত সঙ্গতি বাখিযা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পেব উন্নয়নেব কার্যসূচী বচিত হয। কৃষি অগ্রাধিকাব না পাইলেও অবহেলিত হয় নাই। ববং প্রথম পবিকল্পনায কৃষিসংক্রান্ত খাতে মোট যত অর্থ ববাদ্দ হইযাছিল, দ্বিতীয় পবিকল্পনায তদপেক্ষা অধিক পবিমাণ অর্থ ঐ খাতে ববাদ্দ হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি এবং শিল্প উভয়কেই প্রায একই রকমেব অগ্রাধিকাব দেওয়া হইয়াছে।

গ. বিভিন্ন পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ
TOTAL OUTLAY (PLANWISE)

সবকাবী ক্ষেত্রে মোট বিনিযোগ প্রথম পবিকল্পনায ১৯৬০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পবিকল্পনায় ৪৬০০ কোটি টাকা এবং তৃতীয পবিকল্পনায় (অনুমিত) ৭৫০০ কোটি টাকা। বেসবকাবী ক্ষেত্রে প্রথম পবিকল্পনায় ১৮০০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পবিকল্পনায ৩১০০ কোটি টাকা বিনিযোজিত এবং তৃতীয পবিকল্পনায় ৪১০০ কোটি টাকা বিনিযোগ ববাদ্দ হইয়াছে।

ঘ. বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের শতকরা হিসাব
PROPORTION OF OUTLAYS UNDER DIFFERENT HEADS

প্রথম, দ্বিতীয ও তৃতীয় পবিকল্পনায (১) কৃষি ও সমাজোন্নযন খাতে যথাক্রমে ১৫, ১১ ও ১৪ শতাংশ, (২) সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি খাতে যথাক্রমে ২৯, ১৯ ও ২২ শতাংশ, (৩) গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতে যথাক্রমে ২, ৪ ও ৪ শতাংশ, (৪) শিল্প ও খনিজ খাতে যথাক্রমে ৪, ২০ ও ২০ শতাংশ, (৫) পবিবহণ ও সংসবণ খাতে যথাক্রমে ২৭, ২৮ এবং ২০ শতাংশ, (৬) সমাজ সেবা ও বিবিধ খাতে যথাক্রমে ২৩, ১৮ ও ১৭ শতাংশ বিনিয়োগ কবা হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায়—

ঙ. সরকারী ও বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের বিনিয়োগের আনুপাতিক হিসাব
PROPORTION OF OUTLAYS IN THE PUBLIC & PRIVATE SECTORS

প্রথম পরিকল্পনায় সবকারী ও বেসবকাবী শিল্পক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫০% ও ৫০%, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে ৫৬% ও ৪৪%, তৃতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে ৫৯% ও ৪১% হাবে বিনিয়োগ

হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যায় যে বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় সরকারী ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইতেছে।

চ. অর্থসংস্থানের সূত্র

SOURCES OF FINANCE

১. **রাজস্বের উদ্বৃত্ত** (অর্থাৎ বিভিন্ন কর হইতে লব্ধ সরকারী আয়) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় যথাক্রমে ৬৩৭ কোটি, ১০০২ কোটি, ২২৬০ কোটি টাকা। ইহারা মোট ব্যয়ের যথাক্রমে ৩২%, ২২% ও ৩০%। ২. **রেলওয়ে ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত** অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ১১৫ কোটি (৬%), ১৫০ কোটি (৩%) এবং ৫৫০ কোটি টাকা (৭%)। ৩. **ঋণ ও স্বল্প সঞ্চয়** হইতে যথাক্রমে ৪৪২ কোটি (২৩%), ১১৮০ কোটি (২৬%) এবং ১৪০০ (১৯%)। ৪ **অন্যান্য মূলধন খাতে প্রাপ্ত** যথাক্রমে ২৪৫ কোটি (১২%), ২৩০ কোটি (৫%) এবং ৫৪০ কোটি টাকা (৭%)। ৫. **ঘাটতি ব্যয়** হইতে প্রাপ্ত যথাক্রমে ৩৩৩ কোটি (১৭%), ৯৪৮ কোটি (২০%) এবং ৫৫০ কোটি টাকা (৭%)। উপরে উল্লিখিত ১নং হইতে ৫নং পর্যন্ত সূত্রগুলি **মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ** (internal resources) এবং ইহার পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনায় ১৭৭২ কোটি (৯০%), দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩৫১০ কোটি (৭৬%) এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৩০০ কোটি টাকা (৭০%), ৬নং সূত্র বৈদেশিক সাহায্য বাবদ যথাক্রমে ১৮৮ কোটি (১০%), ১০৯০ কোটি (২৪%) এবং ২২০০ কোটি টাকা (৩০%) পাওয়া গিয়াছে ও যাইবে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে পরিকল্পনার মোট ব্যয় যত বৃদ্ধি পাইতেছে (অর্থাৎ আয়তনে বড় হইতেছে), ততই অভ্যন্তরীণ সূত্রের অনুপাত হ্রাস পাইয়া বৈদেশিক সাহায্যের উপরে নির্ভরতা বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেকের মতে এই প্রবণতা ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে সুলক্ষণ নহে। কারণ অভ্যন্তরীণ সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া আত্মনির্ভরতা অর্জন না করিয়া ক্রমাগত বৈদেশিক সূত্রের উপর নির্ভর করিলে ভবিষ্যতে সুদসমেত ঋণ শোধের সময় অর্থনীতির উপর ও বিদেশীমুদ্রা তহবিলের উপর কঠিন চাপ পড়িতে থাকিবে এবং লেনদেনের ঘাটতির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে।

ছ. অগ্রগতি

ACHIEVEMENTS

১. **জাতীয় ও মাথাপিছু আয় (national & per capita income):** (১৯৬০-৬১ সালের মূল্য স্তরের ভিত্তিতে) প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় ১০২৪০ কোটি টাকা (১৯৫০-৫১) হইতে ১৮% বৃদ্ধি পাইয়া ১২১৩০ কোটি টাকায় (১৯৫৫-৫৬) পৌছায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উহা ১২১৩০ কোটি টাকা (১৯৫৫-৫৬) হইতে ২০% বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৫০০ কোটি টাকায় (১৯৬০-৬১) পরিণত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উহা ১৪৫০০ কোটি টাকা (১৯৬০-৬১) হইতে ৩০% বৃদ্ধি পাইয়া ১৯০০০ কোটি টাকায় (১৯৬৫-৬৬) পরিণত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি প্রথম পরিকল্পনাকালে ২৮৪ টাকা হইতে ৮% বৃদ্ধি পাইয়া ৩০৬ টাকায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৮% বৃদ্ধি পাইয়া উহা ৩৩০ টাকায় পৌছায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উহা ৩৮৫ টাকায় (১৬% বৃদ্ধি) পৌছাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

২. **কর্মসংস্থান (employment):** প্রথম পরিকল্পনায় ৪৫ লক্ষ এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ১ কোটি ৪০ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থান।

৩. **সঞ্চয় (savings) :** প্রথম পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয়ের ৮·১%, পরিকল্পনার শেষে ৮·৫% সঞ্চয়ের হার ছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আশা উহা ১১·৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। (বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের মত দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ১৫-২০% সঞ্চয় সৃষ্টি করা আবশ্যক।)

৪. **বিনিয়োগ (investment) :** প্রথম পরিকল্পনার শেষে (জাতীয় আয়ের) ৭% এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১১% ছিল বিনিয়োগের হার। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ১৪% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে।

৫. **কৃষির উৎপাদন (agricultural production) :** (উৎপাদনের সূচক সংখ্যা : ১৯৪৯-৫০ = ১০০) প্রথম পরিকল্পনার শেষে কৃষির উৎপাদনের সূচকসংখ্যা ১১৭, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৩৫-এ পরিণত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ১৭৬-এ পৌঁছাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে (অর্থাৎ বৎসরে গড়ে ৬% হারে বৃদ্ধি)।

৬. **শিল্পের উৎপাদন (industrial production) :** (উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৯৫০-৫১ = ১০) প্রথম পবিকল্পনার শেষে শিল্পের উৎপাদনের সূচকসংখ্যা ১৫৯ এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাব শেষে উহা .৯৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা ৩২৯ পর্যন্ত পৌঁছাইবে বলিযা আশা করা হইযাছে (অর্থাৎ বৎসরে গড়ে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি)।

ভারতীয় পরিকল্পনা : অতীত অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ
INDIAN PLANNING : RETROSPECT & PROSPECT

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকাল চতুর্দশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিযাছে। দুইটি পরিকল্পনা রূপায়নের পর বর্তমানে তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের কার্যক্রম সমাপ্তিব মুখে। চতুর্থ পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্য প্রায় সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে, অনতিবিলম্বেই উহার রূপায়ণ আরম্ভ হইবে। সুতরাং পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ কার্যের অতীত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা এবং উহার আলোকে চতুর্থ পরিকল্পনার রচনা ও রূপায়ণের বিচার্য বিষয়েব আলোচনার সময় ও প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। অতীতের ত্রুটি পরিহার ও বাঞ্ছিত পথে পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ ও অগ্রগতির জন্য ইহা অপরিহার্য।

যে উৎসাহ উদ্যম ও আশা লইয়া প্রথম পরিকল্পনা শুরু হয়, উহার সফল রূপায়ণে ও লক্ষ্য লাভেব ফলে তাহা সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। স্বভাবতই ইহাতে প্রবল আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব লইয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচিত ও রূপায়ণেব কার্য আরম্ভ হয়। কিন্তু অচিরেই কৃষির ফসল হ্রাস, মূল্যস্তর বৃদ্ধি ও বিদেশীমুদ্রা সংকটের আবর্তে দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হয় এবং উহার অংশবিশেষ কাটছাঁটের পর দ্বিতীয় পরিকল্পনার খণ্ডিত রূপায়ণ ঘটে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সত্ত্বেও কৃষির উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্য পূরণে এবং মূল্যস্তবের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যকে সীমিত করে ও সকলের চিন্তার কারণ হইয়া দেখা দেয়। এই অবস্থায় কৃষির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া রচিত তৃতীয় পরিকল্পনা শুরু হয়। ইহাতে দৃঢ় মূল্যস্তর নীতি ও সবিশেষ পরিমাণে খাদ্যোৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হয়। দেশে আয়বণ্টনে বৈষম্য হ্রাসের যে লক্ষ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গৃহীত হইয়াছিল তাহাও তৃতীয় পরিকল্পনাকে অনুসরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়নে প্রকাশ পায় যে, কৃষি কর্মসংস্থান, উন্নয়নহার ইত্যাদি নানা

আলাদারূপ

ান ঊর্ধগতি সর্ব মহলে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি

আয়বণ্টনে বৈষম্য হ্রাসের পরিবর্তে উহার অধিক্য।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বলাবাহুল্য অগ্রগতি অসন্তোষজনক।

সুতরাং পরিকল্পিত অর্থনীতিক প্রচেষ্টার এরূপ ফলাফল সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন জাগিয়া পরিকল্পনা রচনায় ত্রুটি ঘটিতেছে কিনা, উহাদের রূপায়ণে ত্রুটি ঘটিতেছে কি না, সফল লক্ষ্য অধিক কিনা ইত্যাদি। ত্রুটি কোথায় এবং তাহা কি সে সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশনে, জাতীয় উন্নয়ন পর্ষতে, সরকারী মহলে ও সর্বত্রই আলোচনা চলিতেছে এবং উহার আলোকে চতুর্থ পরিকল্পনা রচনার কথা বলা হইতেছে। অতীত ব্যর্থতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ এবং ভবিষ্যত কার্যক্রমে উহার প্রয়োগই প্রকৃষ্ট পথ। অতীত ত্রুটি পরিহার করিতে হইলে, চতুর্থ পরিকল্পনাকে সার্থক করিতে হইলে এই পথেই অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণ সম্পর্কে যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহা এই:

প্রথমত, এ পর্যন্ত আমাদের পরিকল্পনাগুলিতে, সুযোগের সমতা, আয় ও ধন বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস ও অর্থনীতিক শক্তির অধিকতর সমবণ্টন, কর্মসংস্থানের সুযোগের যথোপযুক্ত বৃদ্ধি, দেশের মানবিক শক্তির সদ্ব্যবহার, ও অধিকাংশ জনসমষ্টির ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ প্রভৃতি উন্নয়নের সামাজিক লক্ষ্যগুলি অস্পষ্টভাবে সম্মুখে রাখা হইয়াছে; কিন্তু এই সকল লাভের কোন সময়কাল নির্দিষ্ট করা হয় নাই, কি উপায়ে এই সকল লক্ষ্য পূরণ করা হইবে তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই অথবা উহা লাভ করিবার জন্য কোন কার্যকর উপায় ও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। সুতরাং পূর্বাপর, গৃহীত সামাজিক লক্ষ্য ও তাঁহা লাভের বাস্তব ক্ষমতার মধ্যে একটি ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং অতঃপর পরবর্তী পরিকল্পনা রচনার সময় আমাদের সামাজিক লক্ষ্যগুলি সুস্পষ্ট ও বাস্তবভাবে বর্ণিত হওয়া আবশ্যক এবং তাহা কার্যে পরিণত করিবার উপায় ও ব্যবস্থাগুলিও পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাগুলিতে গৃহীত উদ্দেশ্য ও নীতির সহিত বাস্তবে অনুসৃত চলতি নীতির প্রায়শই অসঙ্গতি ও ব্যবধান দেখা দেয়। খাদ্যবণ্টন, শিল্পজাত ও কৃষিজাত পণ্যের মূল্যনির্ধারণ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার নীতির রূপায়ণ, বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ প্রভৃতি ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। অনভিজ্ঞতার দরুন কার্যক্ষেত্রে পরিকল্পনায় গৃহীত নীতির সহিত বাস্তবে অনুসৃত নীতির বিরোধিতা দেখা দেওয়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু ইহার ফলে একদিকে যেমন পরিকল্পনার কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হয় তেমনি বাস্তব সমস্যাগুলিও মেটে না। সুতরাং ভবিষ্যতে যাহাতে বাস্তবে অনুসৃত নীতি পরিকল্পনায় গৃহীত উদ্দেশ্য ও নীতির সহিত সঙ্গতি পূর্ণ হয় এবং পরিকল্পনায় গৃহীত উদ্দেশ্য ও নীতিগুলি যেন যথাসম্ভব আশু বাস্তব প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া রচিত হয় তাহা দেখা আবশ্যক।

তৃতীয়ত, রাজ্যসরকারগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পনায় নির্ধারিত অগ্রাধিকার মান্য করে নাই এবং যে সকল সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার উহাদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করিয়াছে তাহা যথাযথ ব্যবহার করে নাই অথবা অপরাপর উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়াছে। ইহাতে পরিকল্পনার লক্ষ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। রাজ্যসরকারগুলি যাহাতে এরূপ অবাঞ্ছিত পন্থা গ্রহণ না করিতে পারে তাহার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা প্রয়োজন।

চতুর্থত, অনেক সময় ভালমত ভাবিয়া চিন্তিয়া লক্ষ্য নির্ধারিত হয় না, ফলে কর্মসম্পাদনের পর দেখা যায় যে লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে ইহার ফলে অত্যধিক উচ্চ লক্ষ্য ধার্য

[illegible] আর্থিক ব্যয়ের [illegible] সম্পাদনযোগ্য কার্যের বস্তুগত লক্ষ্য (physical target) [illegible] আবশ্যক।

পঞ্চমত, পরিকল্পনার অন্তর্গত প্রকল্পগুলি রূপ দিতে গিয়া তজ্জন্য লোকবল ও অন্যান্য উপকরণগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনার উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ইহাতে প্রকল্পগুলির রূপ দিতে অধিক ব্যয় হয় ও অধিক সময় লাগে এবং লক্ষ্য পূরণ হয় না। ব্যবস্থাপনা সংগঠনের এই দুর্বলতা অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, জনসাধারণ যাহাতে অবিচ্ছিন্নভাবে সুবিধা ভোগ করিতে পারে সেজন্য পরিকল্পনা কমিশন তত্ত্বগতভাবে এই সঠিক সিদ্ধান্ত লইয়াছেন যে, প্রকল্পগুলি এরূপ ভাবে নির্বাচন করিতে হইবে যে, যেন তাহাতে স্বল্পকালীন ফলপ্রসূ (short-gestation period) এবং দীর্ঘকালীন ফলপ্রসূ (long-gestation period) প্রকল্পগুলির মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু অতীতে কার্যত এই ভারসাম্য বজায় থাকে নাই। এই বিষয়টি অবহেলাই করা হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বিবিধ প্রকল্পগুলি গৃহীত হওয়ার পূর্বে, উহাদের ব্যয় ও সুফল এবং বিকল্প প্রকল্প সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান ও হিসাব করা হয় নাই। চতুর্থ পরিকল্পনায় ইহার পুনারাবৃত্তি বন্ধ করিতে হইবে।

সপ্তমত, পরিকল্পিত ব্যয়ের দ্বারা উন্নয়নের কতকগুলি সম্ভাব্য শক্তির সৃষ্টি হয়। এই সম্ভাবনা বাস্তবে কাজে লাগাইতে গেলে ও বাড়াইতে গেলে মানবিকশক্তি, প্রশাসনিক ও কারিগরি শক্তির যথাযথ প্রয়োগ ও তজ্জন্য উহাদের সংযোজন (coordination) প্রয়োজন। অর্থাৎ বিভিন্ন উন্নয়নক্ষেত্রগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কৃষি ও সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষিসংস্কার ও কৃষির ফলন বৃদ্ধি প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু তত্ত্বগত-ভাবে পরিকল্পনাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সংযোজিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব স্বীকৃত হইলেও, বাস্তবে এই উপলব্ধির যথেষ্ট প্রকাশ পায় নাই। সে কারণে বিভিন্নক্ষেত্রে উন্নয়নব্যয় যেরূপ হইয়াছে, সম্ভাবনা যেরূপ সৃষ্টি হইয়াছে তদনুরূপ অগ্রগতি ঘটে নাই, উপকার লাভ করা যায় নাই। চতুর্থ পরিকল্পনায় এবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

পরিকল্পনা কালে এপর্যন্ত যে নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যপদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে সে সম্পর্কেও নানারূপ অভিযোগ উঠিয়াছে এবং ঐগুলি সবিশেষ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। নিচে ইহা সংক্ষেপে আলোচিত হইল:

প্রথমত, গ্রামীণ অর্থনীতিকে সক্রিয় করিতে হইলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন এমন একটি উপযুক্ত স্তরে কৃষিজাত দ্রব্য-মূল্যের স্থিরতা যাহাতে উৎপাদকগণ যুক্তি সঙ্গত দরের সুনিশ্চয়তা পাইতে পারে। গত দশকের শেষে এবং বর্তমান দশকের প্রথমদিকে কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত অল্পদরে ফসল বেচিতে বাধ্য হইয়াছে। বর্তমানে কৃষির মোট উৎপাদন যে বৃদ্ধি পাইতেছে না, ইহার প্রধান কারণ দেশে কৃষকগণ ফসলের ন্যায্য দর পায় না। সুতরাং আগামী দিনে দেশে কৃষকের প্রণোদনা সঞ্চার করিতে পারে এরূপ উপযুক্ত স্তরে কৃষিজাত দ্রব্যমূল্যের স্থিতি প্রয়োজন ইহার সহিত ভূমিসংস্কার, নিয়ন্ত্রিত বাজার, যোগাযোগ পরিবহণ ব্যবস্থার বিস্তার, কারিগরি শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যের উন্নতি, কৃষিপ্রণালীর উন্নতি, প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় জড়িত মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

এসকল ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা দ্বারা উপযুক্ত প্রকল্প রচনা করা সম্ভব নহে একথা তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত হইলেও ইহা বাস্তবে অনুসৃত হয় না।

দ্বিতীয়ত, অঞ্চলগুলিব স্থানীয় প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচনা করা হয় না। সরকাবী প্রশাসনিক যন্ত্র এরূপ যে তাহাতে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগ সর্বত্রই এবং সর্বদাই নিবস্ত হয়। সবকারের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপন্থাও কৃষির ফলন বৃদ্ধির ব্যর্থতার জন্য কম দাযী নহে। ভারতে পবিকল্পনা রচনার যে কাঠামো গডিয়া উঠিয়াছে তাহা বোধ করি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক কেন্দ্রীভূত কাঠামো এবং সর্বাধিক পবিমাণে আমলাতন্ত্রের করায়ত্ত। পঞ্চায়েতীবাজ আইন প্রবর্তন সত্ত্বেও ইহাব কোন পবিবর্তন ঘটে নাই। বিবিধ প্রকল্প প্রভৃতি সম্পর্কে কেন্দ্রে কিছু কিছু বেসবকাবী ব্যক্তিবর্গেব মতামত জানিবাব চেষ্টা কবা হইলেও, রাজ্য স্তবে পবিকল্পনাব কাজটি সম্পূর্ণই সবকাবী আমলাদেব নিজস্ব ব্যাপাবে পবিণত হইয়াছে। পবিকল্পনাব পশ্চাতে জনসমর্থনেব প্রযোজনেব কথা বলা হইলেও কার্যত যেন সযত্নে উহাব পরিহাবেব চেষ্টাই দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতিব আমূল পবিবর্তন আবশ্যক।

তৃতীয়ত, ভূমিসম্পদেব অবহেলা পবিকল্পনাব অন্যতম প্রধান ত্রুটি। কর্ষণেব অযোগ্য ভূমি ভাবতেব সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ভূমি সম্পদ। অথচ ইহাতে বাঁশ, ঘাস, নানারূপ কাষ্ঠ প্রভৃতি উৎপাদনেব দ্বাবা যেমন গ্রামীণ অর্থনীতিকে সবল কবা যায তেমনি শিল্পেব ভিত্তিকেও প্রশস্ত কবা যায়। এজন্য বিস্তব অনুসন্ধান, গবেষণা প্রভৃতি প্রযোজন। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সবল কবিতে হইলে যেমন কৃষিব উৎপাদন বাডাইতে হইবে, তেমনি গ্রামীণ উপকবণেব দ্বাবা নানা শিল্প স্থাপনেব ব্যবস্থা কবিতে হইবে। কৃষিব মতই এই সকল শিল্পেব উন্নযনকে প্রধান গুরুত্ব দিতে হইবে। তবেই গ্রামীণ অর্থনীতি সচল হইবে।

চতুর্থত, দ্বিতীয় পরিকল্পনা বচনাব সময় স্থিব হইযাছিল যে, প্রধানত ভাবী ও বুনিয়াদী শিল্পেই বিনিযোগ কবা হইবে এবং ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলিব উৎপাদনশক্তিব পবিপূর্ণ ব্যবহাব ও ক্ষুদ্র এবং কুটিব শিল্পগুলিব উন্নয়ন দ্বাবা ভোগ্যপণ্যেব উৎপাদন বাডান হইবে। ইহাও স্থিব হইয়াছিল যে, প্রযুক্তিবিদ্যাজনিত কর্মহীনতা (technological unemployment) এডাইবাব উপযোগী কাবিগবি রূপান্তব চিবাচবিত ক্ষুদ্র ও কুটিব শিল্পগুলিতে ঘটিবে এবং দেশেব বহুবিস্তৃত অঞ্চলে কুটিব ও ক্ষুদ্র শিল্পে বিকেন্দ্রীত উন্নযনেব দ্বাবা ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকাবীশিল্পেব প্রসাব ঘটিবে। এই চিন্তাধাবাব অনুসবণে বিস্তাবিত পবিকল্পনা ও উহার সবল রূপাযণেব প্রযোজন ছিল। কিন্তু এই দুইযেব কোনটিই কবা হয নাই। অতএব, ঐ দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধাবা ব্যর্থ হইয়াছে। অথচ বর্তমানেও শিল্পাযনেব গতিপথ (route) অথবা উহাব কৌশল (strategy) সম্পর্কে কোন সামগ্রিক সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট চিন্তাধাবা আমাদেব নাই।

পঞ্চমত, বিদেশী সাহায্য সম্পর্কে আমাদেব ভাবিবাব বিযয এই যে উহাব অব্যাহত প্রাপ্তিব নিশ্চয়তা কতখানি, উহাব পবিশোধেব কতটা ভাব আমাদেব অর্থনীতি বহন কবিতে সক্ষম এবং কতটা পবিমাণে আমাদেব দেশীয় মুদ্রা (P. L. 480) আমবা একটি বিদেশী সবকাবেব হস্তে তুলিয়া দিতে পারি। আব দেশীবিদেশী যুক্তপ্রচেষ্টাব (foreign collaboration) সম্পর্কে আমাদের ভাবিবার বিষয় এই যে, উহাতে দেশেব প্রকৃত পুঁজিব খবচ (real capital cost) কিরূপ হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা বজায় বাখিবাব প্রকৃত অব্যাহত খবচ (real continuous costs of maintaining) কিরূপ হইবে, এইরূপ প্রচেষ্টার ফলে ভবিষ্যতে কি পবিমাণ বিদেশীমুদ্রায় বিদেশী দায় মিটাইবার প্রয়োজন দেখা দিবে, এই প্রকাব প্রচেষ্টার ফলে আমাদেব বিজ্ঞানী ও কারিগবগণের উপর কতটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিতে পাবে এবং আমাদের দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক নীতির উপর এইপ্রকার চুক্তিপ্রসূত দায় দায়িত্বের কি প্রকার ও কতটা প্রভাব পড়িতে পারে ইত্যাদি। এই দুইটি বিষয়ে সুচিন্তিত ও সুস্পষ্ট নীতির প্রয়োজন রহিয়াছে।

ষষ্ঠত, পরিকল্পনাকালে সরকারী শিল্প ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বিমান পরিবহণে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির সহিত অর্থনীতির উপর সরকারী প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পাইতেছে। নূতন শিল্প স্থাপন ও আমদানির ক্ষেত্রে এই নিয়ন্ত্রণ সর্বাধিক। তথাপি, এই সকল ক্ষেত্রের বাহিরে সরকারী কার্যকর নিয়ন্ত্রণ সামান্যই বলিতে হইবে; জাতীয় আয়েব মাত্র ১৫ শতাংশ রাষ্ট্রেব কোষাগাব দিয়া প্রবাহিত হয়। এবং সামগ্রিক ভাবে বলিতে গেলে সামগ্রিক অর্থনীতিব উপর নিয়ন্ত্রণ কার্যকব করিবাব জন্য এদেশে কোন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে রাষ্ট্রেব কোন চেষ্টা আছে বলিয়াও মনে হয় না। এমন কি রাষ্ট্রীয় কর্মক্ষেত্রেব অভ্যন্তবেও দীর্ঘকালীন লক্ষ্যেব বিবেচনায় কোনরূপ উদ্দেশ্যপূর্ণ সংযোজন (purposive coordination) দেখা যায় না। প্রায়শই, বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তব, আপনাপন কর্মসূচী পৃথক পৃথক ভাবে রূপায়ণেব চেষ্টা কবিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাব অবসান প্রয়োজন।

সপ্তমত, পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পর্যন্ত দেশেব বিভিন্ন শ্রেণী ও কর্মেব মধ্যে আয় বণ্টনেব যে কাঠামো বহিয়াছে, ভাবতে তাহাও অনুপস্থিত। কৃষিজাত দ্রব্যেব মূল্য স্থিতিকবণের কর্মসূচীগ্রহণে ও রূপায়ণে যেন একটা অনিচ্ছাই রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, এবং ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ইহাতে সবকাবী নীতিব দ্বাবা গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহাজনেব প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়েছে। অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীগুলিব অবস্থাব উন্নতিতে সক্ষম কোন সামাজিক নিরাপত্তাব ব্যবস্থাই একরূপ নাই। কর্মহীনতাব সমস্যাটি বিবাট বলিয়া যেন উহা ক্রমাগত এড়াইয়া যাওয়া হইয়েছে। ন্যূনতম মজুবি ও যৌথদবকষাকষিব ব্যবস্থা, যাহা ইউবোপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবিয়াছে, তাহাও এদেশে শ্রমিকদেব সর্বাধিক অসুবিধাগ্রস্ত অংশকে স্পর্শ কবিতে পাবে নাই। দিন মজুব ও কৃষি শ্রমিকগণকে বক্ষাব কোন কার্যকব ব্যবস্থাই একরূপ নাই। অন্যদিকে পবিকল্পনাগুলি এমন ভাবে রূপান্তবিত হইতেছে যে তাহাতে কাববাবী ও উদ্যোক্তগণই অধিক উপকৃত হইয়েছে। বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীব প্রতি পুঁজি মঞ্জুব। আমদানিব অনুমতি, বপ্তানিব বিশেষ প্রণোদনা, ঋণমঞ্জুব, বিদেশী পুঁজির সহিত যুক্ত প্রচেষ্টাব চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন কবা হইয়েছে।

অষ্টমত, শিল্পপবিকল্পনা ও উহাব রূপায়ণ কবিতে গিয়া স্বভাবতই কতকগুলি স্থান নির্বাচন কবিতে হয়। ইহাব ফলে বৃহৎ শহবাঞ্চলেব দ্রুত সম্প্রসাবণ ঘটে। বৃহৎশহবাঞ্চলেব এই দ্রুত প্রসাব সামাজিক-অর্থনৈতিক নানাবিষয়ে (socio-economic overheads) বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটায়। ইহাতে দেশেব বাকি অঞ্চল বঞ্চিত হইতে থাকে ও শহব এবং গ্রামাঞ্চলেব মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শহবাঞ্চলেব অধিবাসী উদ্যোক্তা ও শিল্পপতিগণ, যাহাদেব পক্ষে সুবিধাজনকরূপে পুঁজিব বণ্টন ও অন্যান্য সুবিধা পবিকল্পনায় দেওয়া হইতেছে, দেশেব সঞ্চয় ও কবনীতি তাহাদেব আবও উদ্বৃত্ত কবায়ত্ত কবিবাব সুযোগ দিতেছে। কার্যত, কর্মসংস্থানেব বিষয়টিতে বিশেষ নজব দেওয়া হয় না বলিয়া, অদক্ষ শ্রমিক সংখ্যা বাড়িতেছে ও ফলে তাহাদেব মজুবি কমিয়েছে। অপবদিকে সবকাবী ও বেসবকাবী উভয় ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদেব চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, সেসব ক্ষেত্রে ঐরূপ কর্মীদেব অত্যন্ত উচ্চ, আন্তর্জাতিক মানে বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হইতেছে। ইহাব নিয়ন্ত্রণ বা যুক্তিসম্মত সংস্কাবেব কোন সবকাবী চেষ্টাই নাই। এই সকলেব ফল হিসাবে, দেশের উৎপাদন কাঠামোতে বিকৃতি ঘটিয়েছে। মুষ্টিমেয়, উচ্চবিত্তশালী ও আয়সম্পন্ন ব্যক্তিগণেব প্রয়োজনে অধিকতর পরিমাণে বিলাস দ্রব্য উৎপাদনের প্রবণতা বাড়িতেছে। বিলাস হোটেল নির্মাণে,

...উৎসাহদানে ও ক ... দ্রব্য, ... রহিয়াছে।

অতীত ব্যর্থতার প্রধান কারণ এই যে, ভারতের মত বিপুল জনসমৃদ্ধিপূর্ণ বিরাট দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ত্বরান্বিত করিবার জন্য যেরূপ সুসংযোজিত সামগ্রিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ ও সুস্পষ্ট অর্থনীতিক নীতি প্রয়োজন ছিল, তাহার গুরুত্ব পরিকল্পনাকারিগণ উপলব্ধি করেন নাই। দেশে আয় ও ধনবৈষম্য বৃদ্ধি, খাদ্যসংকটের আবির্ভাব, কর্মহীনতা বৃদ্ধি মূল্যস্তর বৃদ্ধি ইত্যাদি ইহার ফল।

বর্তমানে পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের নূতন করিয়া চিন্তা করিতে হইবে। আগামী পরিকল্পনার অপরিহার্য কর্তব্য হইবে: ক. গ্রামীণ অর্থনীতির শক্তি সঞ্চার; খ. একটি ন্যূনতম জাতীয় জীবনমান প্রতিষ্ঠা; এবং শিল্পায়নের গতিপথ ও কৌশল নির্ধারণ। দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া পরিকল্পনার প্রয়োজনে সামাজিক ও জনকল্যাণের উদ্দেশ্য মান্য করিয়া বেসরকারী ক্ষেত্রকে চালাতে হইবে। কর্মসংস্থানের কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। ভারী ও বুনিয়াদি শিল্পের উন্নয়নের এবং জাতীয় পরিবহণ, শক্তি ও সংসরণ প্রভৃতি পরিকল্পনার সহিত আঞ্চলিক শিল্পায়নের পরিকল্পনার সামঞ্জস্য পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

এ পর্যন্ত অব্যবহৃত ও অবহেলিত সম্পদের ব্যবহারের উপর ও শ্রমশক্তি তথা মানবিক-শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং ইহার জন্য পরিকল্পনা রচনার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক ও পরিকল্পনা রূপায়ণে ভিন্নতর ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন। এজন্য স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান অপরিহার্য।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা
FOURTH PLAN

১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শুরু হইবে। ইতোমধ্যেই ঐ পরিকল্পনার আয়তন বিনিয়োগ লক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা চলিতেছে। এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছান যায় নাই। তাই নিম্নে ঐ পরিকল্পনার রূপরেখার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি উল্লিখিত হইল।

লক্ষ্য
OBJECTIVES

১. কৃষিতে বাৎসরিক অন্যূন ৫% হারে উন্নয়ন; গ্রামীণ জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি, খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি;
২. উচ্চতর হারে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের সরবরাহ সুনিশ্চিত করা;
৩. অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি;
৪. গৃহনির্মাণের উপাদানসমূহের সরবরাহ বৃদ্ধি;
৫. ধাতু, রাসায়নিক দ্রব্য, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, খনিজদ্রব্য, বিদ্যুৎশক্তি এবং পরিবহণের ক্রমাগত বৃদ্ধি;
৬. মানবিক শক্তির উন্নয়নের দ্বারা উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি;
৭. অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টি এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের ব্যাপকতর প্রয়োগ।

চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যক্রমের রূপায়ণের জন্য সর্বসাকুল্যে ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ২১,০০০—২২,৫০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রের ব্যয়ের পরিমাণ ১৪,৫০০—১৫,৫০০ কোটি টাকার মধ্যে এবং অবশিষ্ট ৭০০০ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনার শেষার্ধে অতিরিক্ত সম্বল সংগ্রহ সম্ভব হইলে কয়েকটি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এই প্রকল্পগুলির বাবদে মোট ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হইয়াছে। প্রথমার্ধে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করিবার সকল প্রকার চেষ্টা করা হইবে যাহাতে ঐ অতিরিক্ত সম্বল সংগ্রহ করা যায়।

বণ্টন

ALLOCATIONS

সরকারী ক্ষেত্রের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৫,৬২০ কোটি টাকা ধরিয়া লইয়া বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমের জন্য ৭৫২৫ কোটি টাকা, রাজ্য সরকারসমূহের কার্যক্রমের জন্য ৭৬৬০ কোটি টাকা এবং কেন্দ্র শাসিত রাজ্যসমূহের কার্যক্রমের জন্য ৪৩৫ কোটি টাকা।

নিম্নে তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয় বণ্টনের হিসাব পাশাপাশি রাখা হইল।

	তৃতীয় পরিকল্পনা (আনুমানিক)	চতুর্থ পরিকল্পনা
কৃষি	১০৯০	২৪০০
সেচ	৬৪৮	১০০০
সংগঠিত শিল্প	১৬৬২	৩২০০
ক্ষুদ্রশিল্প	২৩৩	৪৫০
শক্তি	১১৮৭	১৯৫০
পরিবহণ ও সংসরণ	১৯৪০	৩০০০
শিক্ষা	৫৫৭	১৪০০
বৈজ্ঞানিক গবেষণা	৭২	১৪৫
স্বাস্থ্য	৩৪৫	১০৯০
গৃহনির্মাণ	১১২	৪০০
অনুন্নত সম্প্রদায়	১০৪	২০৫
অন্যান্য	২৫০	২৭৫
	৮২০০	১৫,৬২০

তিনটি প্রধান খাতের মধ্যে মোট ব্যয়-বণ্টনের হিসাব এইরূপ: কৃষি-খাতে ৩৪০০ কোটি টাকা, শিল্প ও পরিবহণ-সংসরণ ৮৬০০ কোটি টাকা এবং জনকল্যাণ খাতে ৩৬২০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই তিনটি খাতে ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭৩৮, ৫০২২ এবং ১৪৪০ কোটি টাকা।

সরকারী ক্ষেত্রের মোট ব্যয় ১৫,৬২০ কোটি টাকার মধ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ১২,৯৯৫ কোটি টাকা এবং অবশিষ্ট ২৬২৫ কোটি টাকা চলতি ব্যয় হিসাবে ধরা হইয়াছে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হইবে ৬৯৮০ কোটি টাকা। সুতরাং সরকারী ও বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ১৯,৯৭৫ কোটি টাকা।

[illegible]ক্ষেত্রে বিনিয়োগের [illegible]

(কোটি টাকায়)

কৃষি	৭০০	শিক্ষা	১০০
শক্তি	৫০	গৃহনির্মাণ	১৪৭০
ক্ষুদ্রশিল্প	৪০০	সমাজ কল্যাণ	১০
সংগঠিত শিল্প	২৪০০	মজুদ মাল	১২০০
পরিবহণ ও সংসরণ	৬৫০	মোট	৬৯৮০

উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য

TARGETS

কয়েকটি বিশেষ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের লক্ষ্য নিম্নরূপ :

	তৃতীয় পরিকল্পনা	চতুর্থ পরিকল্পনা
খাদ্যশস্য	৯২০ লক্ষ টন	১২০০ লক্ষ টন
পাট (গাঁইট)	৬২ লক্ষ টন	৮০ লক্ষ টন
শক্তি (কিঃ ওঃ)	১ কোটি ১৭ লক্ষ	২ কোটি ২০ লক্ষ
কয়লা (টন)	৭ কোটি ৬০ লক্ষ	১২ কোটি ৫০ লক্ষ
লৌহ (টন)	২ কোটি ৬০ লক্ষ	৫ কোটি ৪০ লক্ষ
(মিলের) তুলা বস্ত্র (গজ)	৫৫০ কোটি	৬০০ কোটি
চিনি (টন)	৩২ লক্ষ	৪৫ লক্ষ
ইস্পাত পিণ্ড (টন)	৭৪ লক্ষ	১ কোটি ৬৫ লক্ষ
এ্যালুমিনিয়ম (টন)	৬৮ হাজার	২ লক্ষ ৪০ হাজার
ট্রাক্টর	৮০০০	২৫০০০
রেলইঞ্জিন	৩৪০	৪৫০
সিমেন্ট (টন)	১ কোটি ২০ লক্ষ	৩ কোটি

কর্মসংস্থান

EMPLOYMENT

১৯৬৬ সালের এপ্রিলে যখন চতুর্থ পরিকল্পনা শুরু হইবে তখন কর্মহীনের সংখ্যা হইবে ১ কোটি ২০ লক্ষ। চতুর্থ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে (১৯৬৬-৭১) অতিরিক্ত ২ কোটি ৩০ লক্ষ কর্মহীনের উদ্ভব হইবে। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মোট ৩ কোটি ৫০ লক্ষ কর্মহীনের কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু যে কার্যক্রমের রূপদান সম্ভব তাহাতে মাত্র ২ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হইবে। ফলে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষেও বিপুল সংখ্যক কর্মহীন (১ কোটি ২০ লক্ষ) থাকিয়া যাইবে।

৩

মিশ্র অর্থনীতি
Mixed Economy

মিশ্র অর্থনীতি কাহাকে বলে ?

WHAT IS MIXED ECONOMY ?

উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সহ-অবস্থানকেই মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলা হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যথা শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, পরিবহণ, সংসরণ, সমাজ সেবা ইত্যাদি) একদিকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ অংশ গ্রহণ করিবে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে কাজ করিবে। এইভাবে যে অর্থব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে তাহাকেই মিশ্র অর্থব্যবস্থা বা মিশ্র অর্থনীতি বলে।

এমন দিন ছিল যখন অর্থনীতির প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করিত। অর্থনৈতিক কার্যাবলীর সম্পাদনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা বাধানিষেধ (অতিশয় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া) অনুপস্থিত থাকিত। চাহিদা ও যোগানের অন্তর্নিহিত চিরন্তন শক্তিসমূহ পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে আপনআপন ক্রিয়া করিয়া যাইবে—ফলে স্থায়ী ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। উৎপাদন ও বণ্টন, সমাজ-কল্যাণ ও ব্যক্তি-কল্যাণ চূড়ান্ত স্তরে পৌছাইবে, আদর্শ ব্যবস্থার জন্ম হইবে—এই মতবাদ ছিল তৎকালীন যুগসত্য এবং (নগণ্য শতাংশ ব্যতিরেকে) সর্বজনগৃহীত। এই মতবাদই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (Laissez-Faire) নামে পরিচিত। এই মতবাদের অন্যতম সূত্র : অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত কারণ ইহা সামাজিক অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

আধুনিককালে এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে। মিশ্র অর্থব্যবস্থার মূল কথা হইল—অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয় না, কারণ অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বহুক্ষেত্রেই উপযুক্তভাবে সংগঠন গড়িয়া তুলিতে অসমর্থ। এই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ অবশ্যই অগ্রসর হইয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগের উৎখাত বুঝায় না। বরং ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা কার্য সম্পাদিত হইতে পারে এমন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবস্থিতিকে মানিয়া লওয়া হয়।

নিরঙ্কুশ, বাধানিষেধহীন ব্যক্তিগত উদ্যোগ আধুনিককালে অচল। তাই সকলক্ষেত্রেই সর্বাঙ্গীণ জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপরে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হইবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ সেই নিয়ন্ত্রণের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইয়া আপন ক্ষেত্রের কার্য সম্পাদন করিবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারিত অথবা সংকুচিত হইবে। তবে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পূরণের তাগিদে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ক্রমসম্প্রসারণশীল এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ ক্রমসংকোচনশীল হইবে।

...স্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন ব্যক্তিগত উদ্যোগের [illegible] তেমনি উহার অবসানের লক্ষ্যে বিশ্বাসী। মিশ্র অর্থব্যবস্থা বস্তুত এই দুইটি [illegible] অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যবর্তী পন্থা। ইহা পূর্ণ সমাজতন্ত্র ও নিরঙ্কুশ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা (অর্থাৎ পূর্ণ ধনতন্ত্র)—উভয়কেই পরিহার করিয়া, উভয়েরই গ্রহণযোগ্য দিকগুলি অবলম্বন করিয়া বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রের পথে চলিতে চাহে। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এইরূপ মিশ্র অর্থব্যবস্থার পরীক্ষা চলিতেছে। বিশেষ করিয়া নরওয়ে-সুইডেন ইত্যাদি দেশ এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্রগতি লাভে সমর্থ হইতেছে বলিয়া দাবি করিতেছে।

ভারতে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে মিশ্র অর্থব্যবস্থার প্রথম সূচনা হয়। ইহার পূর্বে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অধীন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ডাক এবং তার বিভাগ, রেলপথ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, অস্ত্র উৎপাদন কারখানা ব্যতীত আর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ছিল না। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে সুস্পষ্টভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ভূমিকার উল্লেখ করা হয়। রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন্ কোন্ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করিয়া সুস্পষ্টভাবে শিল্পক্ষেত্রকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। মাত্র ৯টি শিল্প একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবশিষ্ট শিল্পকে ব্যক্তিগত উদ্যোগের নিকট রাখিয়া দেওয়া হয়। তবে রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকিয়াই ব্যক্তিগত উদ্যোগকে অগ্রসর হইতে হইবে এই নীতিও ঘোষিত হয়।

১৯৫৬ সালের শিল্প নীতিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের অধিকতর সম্প্রসারণের নীতি গৃহীত হয়। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠনের অপরিহার্য শর্ত হিসাবে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের সংকোচন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ক্রমসম্প্রসারণ ঐ শিল্পনীতিতে প্রতিফলিত হয়। মিশ্র অর্থব্যবস্থার অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে ঘোষিত হইলেও অদ্যাবধি কেবলমাত্র জীবনবীমা করপোরেশন ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের বিষয়েই এই নীতি অনুসৃত হয়।

।ক্ষেত্রের গুরুত্ব
IMPORTANCE OF THE PUBLIC SECTOR

ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। স্বল্পোন্নত অর্থনীতির রূপান্তরসাধনে রাষ্ট্র কর্তৃক চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। পুঁজি গঠন অথবা নূতন উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন, সমাজ সেবার সম্প্রসারণ বা সমাজের উৎপাদনের শক্তিসমূহের পুনর্বিন্যাস অথবা শ্রেণীগত সম্পর্কের নূতনভাবে সংস্থাপন—এই সকল সমস্যার অনুধাবন করিলে একটিমাত্র সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে অর্থনৈতিক সামাজিক দায়িত্ব অধিকতর পরিমাণে গ্রহণ করিয়াই রাষ্ট্র জনসাধারণের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করিতে পারে। ইহার দ্বারা উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ জাতীয়করণ অথবা কৃষি, ব্যবসা এবং শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগের অপসারণ বুঝায় না। বরং ইহার দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের ক্রমসম্প্রসারণ এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রয়োজনে সমগ্র অর্থনীতির সহিত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের সামঞ্জস্যবিধান বুঝায়।[১]

ভারতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন ক্ষেত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়: ১. রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যতীত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কার্যসূচীর রূপায়ণ সম্ভব নহে

১. **First Five Year Plan : pp. 31—32.**

উন্নয়নের বিপুল কার্যসূচীকে রূপায়ণের মত আর্থিক সম্বল বা ইচ্ছা—কোনটাই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের নাই।

২. ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রধান উদ্দীপক হইল মুনাফার আশা, সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধির ইচ্ছা নহে। যে ক্ষেত্রে মুনাফার আশা নাই কিংবা স্বল্প অথবা সুদীর্ঘ সময়সাপেক্ষ সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ আকৃষ্ট হয় না। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনীতিক জীবনে বিভিন্ন দিকে নানাপ্রকারের স্বল্প মুনাফার আশাহীন কার্যসূচী একমাত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই গ্রহণ করা সম্ভব।

৩. সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠন ভারতের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের প্রধান শর্তগুলি হইল উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায্য বন্টন, সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে অসাম্য এবং অর্থনীতিক শক্তির কেন্দ্রীভবনের সম্ভাবনা দূরীকরণ, সামাজিক কল্যাণের বৃদ্ধিসাধন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ব্যতীত এই সকল নীতি কার্যকর করা অসম্ভব।

৪. ব্যক্তিতগ ক্ষেত্রের অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।

৫. অর্থনীতিক পরিকল্পনার অন্যতম কার্যপ্রক্রিয়া হইল অগ্রাধিকার বিচার পূর্বক অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নসাধন। (অর্থনীতিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন অর্থনীতিক ক্ষেত্রের উন্নয়নে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নের সমাধান প্রাথমিক কাজ।) অতঃপর অগ্রাধিকার অনুযায়ী কার্যসূচী রচনা করিয়া দ্বিধাহীন চিত্তে তাহাকে রূপায়িত করিতে হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগাধীন ক্ষেত্রে এই প্রকারের অগ্রাধিকার সংবলিত কার্যসূচীর রচনা ও রূপায়ণ অসম্ভব।

৬. ভারতের শিল্পায়নের অন্যতম দুইটি ত্রুটি হইল সামঞ্জস্যহীন বিকাশ এবং বিশেষস্থানে শিল্পের অত্যধিক কেন্দ্রীভবন। এই দুইটিই অতীতের সরকার কর্তৃক অনুসৃত স্বাচ্ছন্দ্যনীতি (laissez-faire) এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবাধ কাযের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল। তাই বর্তমানে পুরাতন নীতি পরিহার করিয়া এই ত্রুটি দূর করার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপরে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের নীতি গৃহীত হইয়াছে। মিশ্র অর্থব্যবস্থা এই দুইটি দিক হইতেই গুরুত্বপূর্ণ।

৭. ভারতে আধুনিককালের উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সরকারের সহিত অর্থনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ঐ সকল দেশ হইতে ঋণ, কাঁচামাল ইত্যাদি আমদানির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা একমাত্র সরকারের পক্ষেই করা সম্ভব। উপরন্তু বিভিন্ন দেশ হইতে শিল্পজ্ঞান, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই করা সম্ভব।

উপরে উল্লিখিত যুক্তি হইতে ভারতের অর্থনীতিকক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কর্তৃক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কার্যে অংশগ্রহণের ও মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের কারণ বুঝা যায়।

৪

রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়
Public Finance

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের গুরুত্ব
IMPORTANCE OF PUBLIC FINANCE

আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় সকল দেশেই অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীদের ধারণায় রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের বিশেষ কোন গুরুত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তাঁহাদের মতে সমাজজীবন রক্ষার খাতিরে ন্যূনতম কার্য সম্পাদনে যতটুকু আয় ও ব্যয়ের প্রয়োজন ততটুকুর মধ্যেই রাষ্ট্র নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিবে। তৎকালীন ভাবধারায় রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়কে যথাসাধ্য ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে রাখিয়া এবং উভয়ের মধ্যে সমতা আনয়ন করাই ছিল সর্বজনস্বীকৃত নীতি। কিন্তু বর্তমানযুগে এই ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। সমাজের বহুমুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যে রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অর্থনীতিক দিক হইতে অগ্রসর অথবা অনগ্রসর এই উভয় প্রকার দেশেই নানাপ্রকার সামাজিক ও অর্থনীতিক লক্ষ্যসাধনে রাষ্ট্রীয় আয় ব্যয়ের নীতি সার্থকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। অগ্রসর দেশসমূহে বাণিজ্যিক চক্রের প্রতিরোধে, বেকার সমস্যার সমাধানে, মুদ্রাস্ফীতির নিরোধে এবং স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার লক্ষ্য সাধনে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য দূরীকরণে, ও অর্থনীতিক শক্তির কেন্দ্রীভবন হ্রাসে, রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয় ফলপ্রদ কার্যক্রম হিসাবে আদৃত ও অনুসৃত হইতেছে।

ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা
THE SYSTEM OF FEDERAL FINANCE IN INDIA

বর্তমান পৃথিবীতে এককেন্দ্রিক ও যুক্ত রাষ্ট্রীয়—এই দুই প্রকারের রাষ্ট্র দেখিতে পাওয়া যায়। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় একটি কেন্দ্রের দ্বারাই পরিচালিত হয়। ঐ সকল রাষ্ট্রের সমস্যা প্রধানত আয়বৃদ্ধি এবং ব্যয়ের অগ্রাধিকার ও বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে দুই প্রকারের সরকার বর্তমান থাকে বলিয়া, উহাদের আয়-ব্যয়ের স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দেশ এক, সরকার দুইশ্রেণীর, রাজস্ব সংগ্রহের উৎসগুলি মোটামুটিভাবে সীমাবদ্ধ এবং ব্যয় বহুমুখী—এমন অবস্থায় এই যুক্তরাষ্ট্রে এক বিশেষ সমস্যার উদ্ভব হয়। তাহা হইল রাজস্বসংগ্রহের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে রাজস্বের উৎসসমূহের বণ্টন অথবা কোন বিশেষ সূত্র হইতে সংগৃহীত রাজস্বের কেন্দ্র এবং অঞ্চলের মধ্যে বণ্টন।

কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক বা রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে রাজস্বের উৎস ও বিবিধ উৎস হইতে লব্ধ রাজস্বের বণ্টন একটি অতি কঠিন কার্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের বণ্টন সম্পর্কে দুইটি সর্বজনস্বীকৃত নীতি আছে। তাহা হইল ১. প্রশাসনিক সুবিধা (administrative convenience) কেন্দ্র এবং ২. রাজ্যে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্য (fiscal independence)। রাজস্বের উৎসগুলি উভয় সরকারের মধ্যে বণ্টনের ক্ষেত্রে সুবিধা, ব্যয়সংকোচ ও দক্ষতা— এই তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তেমনি ঐগুলি এইরূপভাবে বণ্টন করা উচিত যেন উহা হইতে আদায়ীকৃত রাজস্বের দ্বারা উভয় প্রকার সরকারই নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন মিটাইতে পারে এবং একের অপরের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে না হয়। তবেই

উভয়ের আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। সেইরূপ রাজস্ব সংগ্রহের উৎসগুলি উভয় সরকারের মধ্যে এইরূপভাবে বণ্টন করা উচিত যেন প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ে সমর্থ হয়। তবে বাস্তবক্ষেত্রে সর্বত্র এই নীতিগুলি পরিপূর্ণ ভাবে অনুসরণ করা কঠিন। এবং অনেকক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রে আয়-ব্যয় বণ্টন ব্যবস্থা কমবেশি পরিমাণে ঐতিহাসিক কারণ ও বাস্তবসুবিধা—এই দুইটি বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের আয়-ব্যয় ব্যবস্থাও ইহার ব্যতিক্রম নহে।

ভারত যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রচলিত সরকারী আয় ব্যয় ব্যবস্থা এবং বিশেষত কেন্দ্র এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে রাজস্বের উৎস ও সংগৃহীত রাজস্বের বণ্টন ১৯৫০ সালের ভারতীয় সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত। সংবিধানের এতদসংক্রান্ত ধারাটি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের রাজস্ব সংক্রান্ত ধারার প্রায় অনুরূপ। বর্তমান ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১ **রাজস্বের উৎস বণ্টন :** ভারতের সংবিধানে রাজস্বের উৎসগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটি তালিকা প্রণীত হইয়াছে। যথা ক কেন্দ্রীয় তালিকা (Union list) খ. রাজ্যতালিকা (State list) গ. যুগ্মতালিকা (Concurrent list)। সাধারণত একাধিক রাজ্যসংশ্লিষ্ট উৎসগুলি কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং স্থানীয় উৎসগুলি রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও কতিপয় বিষয়কে যুগ্ম তালিকায় রাখা হইয়াছে।

বাণিজ্য শুল্ক, কৃষিবহির্ভূত আয়কর, কোম্পানীকর, গাঁজা, অহিফেন ইত্যাদির উপর অন্তঃশুল্ক, কৃষিবহির্ভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকার কর, পরিবাহিত দ্রব্য ও যাত্রিগণের উপর সীমাকর, স্ট্যাম্পকর ইত্যাদি কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত।

ভূমিরাজস্ব, কৃষি-আয়কর, কৃষিসম্পত্তির উত্তরাধিকার কর, জমি ও বাসস্থান কর রাজ্যে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের উপর অন্তঃশুল্ক, পথকর ও যানবাহনকর, প্রমোদকর, বৃত্তি ব্যবসায় ও পেশার উপর ধার্য কর প্রভৃতি রাজ্যতালিকার অন্তর্গত।

২ **রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্বের বণ্টন :** রাজস্বের বিভিন্ন উৎসের উপর কর ধার্য করিবার অধিকার উপরোক্ত তিনটি তালিকা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকারের মধ্যে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু রাজ্যসমূহের রাজস্বের উৎসগুলি উহাদের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের উৎসগুলি সম্প্রসারণশীল। এই জন্য রাজ্যসরকারগুলির আর্থিক প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি কেন্দ্রীয় রাজস্বের নিম্নরূপ বণ্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :

ক. স্ট্যাম্পকর, ভেষজ ও প্রসাধন দ্রব্য প্রভৃতির উপর ধার্য কর, ইত্যাদি কয়েকটি কর কেন্দ্র কর্তৃক ধার্য হয় কিন্তু ঐগুলি রাজ্যসরকার আদায় ও ভোগ করে।

খ. অকৃষি সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর, পরিবহণের সীমাকর, রেলমাশুলের উপর ধার্য রাজ্যকর ইত্যাদি কয়েকটি কর কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও আদায় করে কিন্তু উহাদের রাজস্ব সংশ্লিষ্ট সরকার লাভ করে।

গ. অকৃষি আয় কর প্রভৃতি কয়েকটি কর কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও আদায় করে কিন্তু সংগৃহীত রাজস্ব কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত হিসাব অনুসারে বণ্টিত হয়।

ঘ. তামাক, দিয়াশলাই প্রভৃতি কতকগুলি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই ধার্য, সংগ্রহ এবং ভোগ করিতে পারে অথবা প্রয়োজনবোধে উহাদের রাজস্বের একাংশ কিংবা সমস্তই রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিতে পারেন।

৩. **কেন্দ্রীয় অনুদান (Grants-in-aid) :** রাজ্যসরকারগুলির বাজেটের ঘাটতি পূরণেব জন্য সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকারগুলিকে প্রতি বৎসর আর্থিক সাহায্য প্রদানেব কথা বলা হইয়াছে।

৪. **ফিনান্স কমিশন নিয়োগ :** উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি ছাড়া সংবিধানেব ২৮০ (১) ধাবায বলা হইয়াছে যে সংবিধান প্রবর্তিত হইবাব দুই বৎসবেব মধ্যে এবং উহার পববর্তীকালে প্রতি ৫ বৎসব অন্তব ভাবতেব রাষ্ট্রপতি একটি কবিযা ফিনান্স কমিশন নিয়োগ কবিবেন। ঐ কমিশনেব কার্যাবলী নিম্নরূপ :—

ক কেন্দ্রকর্তৃক পবিচালিত কব সমূহ হইতে সংগৃহীত বাজস্বেব বাজ্যগুলিব প্রাপ্য অংশ নির্ধাবণ কবা। খ. কেন্দ্রীয অনুদানেব জন্য বাজ্যসবকাবগুলিব আবেদন-পত্র বিবেচনা কবা। গ. বাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য বিষয় বিবেচনা ও সেই সম্পর্কে সুপাবিশ কবা।

কমিশনের রিপোর্ট বাষ্ট্রপতি সম্পূর্ণ বা অংশত গ্রহণ, পবিবর্তন বা বর্জন কবিতে পাবেন।

তৃতীয় ফিনান্স কমিশন
THIRD FINANCE COMMISSION

১৯৬০ সালেব ২বা ডিসেম্বব শ্রীএ. কে. চন্দকে সভাপতি কবিযা বাষ্ট্রপতি তৃতীয ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত কবেন। উহা ১৫ই ডিসেম্বর কার্য আবম্ভ কবে এবং ১৯৬১ সালেব ১৪ই ডিসেম্বব বিববণ পেশ কবে। চন্দ কমিশনেব পূর্বে ১৯৫১ সালেব নভেম্বব মাসে শ্রীকে. সি. নিয়োগীর সভাপতিত্বে প্রথম ফিনান্স কমিশন এবং ১৯৫৬ সালেব জুন মাসে শ্রীকে. শান্তনম্-এব সভাপতিত্বে দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন নিযুক্ত হইযাছিল। ভাবতসবকাব এই কমিশনেব সুপাবিশগুলি গ্রহণ কবিযাছেন। কমিশনেব সুপাবিশগুলি (বেল-মাশুলেব কব-রাজস্বেব পবিবর্তে প্রদেয় অনুদান সংক্রান্ত সুপাবিশ ছাডা) ১৯৬৬ সালেব ৩১শে মার্চ পযন্ত চাবি বৎসবেব জন্য কাযকব বহিবে।

কমিশনের সুপারিশ (Recommendations of the Commission) :

১. **আয়কব (Income Tax) :** কোম্পানী-কব ব্যতীত ব্যক্তিগত আয়কব-বাজস্বেব ৬৬২/৩% বাজ্যগুলি ও ২১/৩% কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি পাইবে (দ্বিতীয কমিশনেব সুপাবিশ ছিল যথাক্রমে ৬০% ও ১%)। রাজ্যসবকারগুলিব প্রাপ্য অংশেব ২০% সংগ্রহস্থলেব ভিত্তিতে ও ৮০% জনসংখ্যাব ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে (দ্বিতীয় কমিশনেব সুপাবিশ ছিল যথাক্রমে ১০% ও ৯০%)।

২. **কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক (Union Excise) :** কেন্দ্রীয অন্তঃশুল্ক বাজস্বের মধ্যে রাজ্যগুলিব প্রাপ্য অংশ তৃতীয় কমিশন ২০% কবিবাব সুপাবিশ কবিয়াছেন। (দ্বিতীয় কমিশনেব সুপাবিশ ছিল ২৫%)। তবে ইহাব জন্য অন্তঃশুল্কেব অধীনস্থ দ্রব্যেব সংখ্যা ৩৫টি কব হইযাছে। (দ্বিতীয কমিশনেব সুপারিশে ৮টি ছিল।) ইহাতে রাজ্যগুলিব প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ বাড়িবে। রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ নির্ধাবণে তৃতীয় কমিশন পূর্বেব মতই বাজ্যের জনসংখ্যাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন বটে তবে রাজ্যবিশেষেব আর্থিক দুর্বলতা, উন্নয়নের পশ্চাৎপদ অবস্থা এবং উহাদের আদিবাসী পশ্চাৎপদ শ্রেণী ও তপশীলভুক্ত জনসংখ্যাব কথা বিবেচনা কবিয়াছেন।

৩. **অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক (Additional Excise Duties) :** রাজ্য বিক্রয়করের

ভারতবর্ষে মিলজাত বস্ত্র, চিনি এবং তামাকের উপর ধার্য আভ্যন্তরিক অন্তঃশুল্ক বাবদ রাজস্বের রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

৪. সম্পত্তি কর (Estate Duty): সম্পত্তিকরের রাজস্বের মধ্যে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ সম্বন্ধেও তৃতীয় ফিনান্স কমিশন নূতন কোন সুপারিশ করেন নাই। দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশ ছিল যে সম্পত্তিকর রাজস্বের ১% কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল পাইবে, বাকি ৯৯% রাজ্যগুলির মধ্যে উহাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বণ্টন করিতে হইবে। অস্থাবর সম্পত্তির অংশ জনসংখ্যার অনুপাতে বণ্টিত হইবে। এবং স্থাবর সম্পত্তির অংশ প্রতি রাজ্যের নিজ স্থাবর সম্পত্তির অনুপাতে বিভক্ত হইবে। তৃতীয় কমিশন এই সুপারিশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, তবে অস্থাবর সম্পত্তির কররাজস্ব বণ্টনে ১৯৬১ সালের লোক-গণনার পরিসংখ্যান ব্যবহার করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

৫. রেলের যাত্রী-মাশুলের উপর ধার্য কর (Tax on Railway fare): ইহা হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের পরিবর্তে তৃতীয় ফিনান্স কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে এইজন্য রাজ্যগুলিকে ১২½ কোটি টাকার নির্দিষ্ট বাৎসরিক অনুদান (Ad hoc grant) প্রদত্ত হউক।

৬. সরকারী অনুদান (Grants-in-aid): এ সম্পর্কে তৃতীয় কমিশনের সুপারিশ সরকার অংশত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফলে এই বাবদে মোট ৫২ কোটি টকা ১০টি রাজ্যের মধ্যে (পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য ব্যতীত) উহাদের চলতি রাজস্বের ঘাটতি মিটাইবার জন্য বণ্টিত হইবে (দ্বিতীয় কমিশনের গৃহীত সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গসহ ১১টি রাজ্য পূর্বে ৩৯½ কোটি অনুদান হিসাবে পাইত)।

৭ সড়ক উন্নয়নের জন্য অনুদান: পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য ব্যতীত ১০টি রাজ্যকে সড়ক উন্নয়নের জন্য ৯ কোটি টাকা বাৎসরিক অনুদান প্রদানের জন্য তৃতীয় কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন।

সুপারিশের ফলাফল (Net Effect): কেন্দ্রীয় আয়কর রাজস্বে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশের সম্প্রসারণে এবং অন্তঃশুল্কের অধীন দ্রব্যের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ১৯৬২-৬৩ সালেই পূর্ব বৎসরের তুলনায় রাজ্যগুলি পূর্বাপেক্ষা ৩৫ কোটি টাকা অধিক পাইবে। পরবর্তী ৩ বৎসরে ইহা আরও বাড়িবে। রাজ্যগুলির পক্ষে ইহা সুসংবাদ।

সমালোচনা (Critical Estimate): ১. ভারতের সংবিধানে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে যেভাবে রাজস্বের উৎসগুলি বণ্টন করা হইয়াছে তাহাতে রাজস্বের অপেক্ষাকৃত সম্প্রসারণহীন উৎসগুলিই রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অথচ প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক ব্যয়ের দরুন রাজ্যগুলির ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে সাংবিধানিক ব্যবস্থার দরুন রাজ্যগুলি ক্রমেই অধিক পরিমাণে উহাদের সাধারণ ব্যয় নির্বাহের জন্যও কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। প্রতিবার ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের মধ্যে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তৃতীয় কমিশনের বিবরণ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। অবশ্য রাজ্যগুলি নিজেরাও কম দায়ী নহে। কারণ, কমিশন বলিয়াছে যে, উহারা নূতন নূতন ক্ষেত্রে (যেমন গ্রামীণ উৎস) কর নির্ধারণে যেমন অনিচ্ছুক অন্যান্য উৎস-গুলির সর্বাধিক ব্যবহারেও তেমনি উদ্যোগহীন।

২. কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রদান সম্পর্কে কমিশন যে নীতি অনুসরণ করিয়াছে তাহা এইরূপ—ক. চলতি বাজেটের ঘাটতি যথাসম্ভব কর হস্তান্তরের দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। খ. বাজেট ঘাটতির অবশিষ্টাংশ পূরণের জন্যই শুধু অনুদান প্রদত্ত হইবে। কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশগুলির মধ্যে এই নীতির প্রতিফলন দেখা যায়।

৩. কমিশন আয়কর রাজস্বের রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ ৬০% হইতে বাড়াইয়া ৬৬⅔% করিয়াছেন। রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধির পশ্চাতে দুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমত, উপরে বর্ণিত নীতি ইহার জন্য দায়ী। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫৯ সালের ফিনান্স আইনের দ্বারা আয়কর রাজস্বের মধ্যে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ হইতে কোম্পানী কর-রাজস্বকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশ বজায় রাখিলে রাজ্যগুলির অংশ হ্রাস পাইত।

৪. রাজ্যগুলির প্রাপ্য কর-রাজস্বের ২০% জনসংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টনের যে সুপারিশ তৃতীয় কমিশন করিয়াছেন তাহা প্রথম কমিশনের সুপারিশের অনুরূপ। তৃতীয় কমিশনের এই সুপারিশের কারণ হইল রাজ্যগুলির প্রাপ্য আয়কর রাজস্ব হইতে কোম্পানী-কর রাজস্ব বাদ চলিয়া গিয়াছে। ফলে রাজ্যগুলির প্রাপ্য আয়কর-রাজস্বের সমগ্র অংশই ব্যক্তিগত আয়কর এবং এই করদাতারা অধিকাংশই শহরবাসী। রাজ্যসরকারগুলিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সম্পন্ন শহরগুলির প্রশাসনিক ও কল্যাণমূলক কার্যে অধিক ব্যয় করিতে হইতেছে।

৫. কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বাবদ রাজস্ব হইতে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ ২৫% হইতে কমাইয়া ২০% করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ফলে রাজ্যগুলির ক্ষতি হয় নাই বরং সুবিধাই হইয়াছে। কারণ—ক. অন্তঃশুল্কের অধীন দ্রব্যের সংখ্যা ৮টি হইতে বাড়াইয়া ৩৫টি করা হইয়াছে। খ. ঐ সকল দ্রব্যের উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থের পরিমাণও বাড়িবে। গ. রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের অনিশ্চয়তা হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং এক কথায় তৃতীয় কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক হইতে রাজ্য-গুলির প্রাপ্য অংশ শুধু যে বাড়িয়াছে তাহাই নহে উহা সম্প্রসারণশীল এবং সুনিশ্চিত হইয়াছে।

৬. রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তঃশুল্ক হইতে সংগৃহীত রাজস্ব বণ্টনে তৃতীয় কমিশন উহাদের পশ্চাৎপদ অবস্থা, আর্থিক দুর্বলতা, জনসংখ্যা ও উহাদের অনুন্নত শ্রেণী প্রভৃতির কথা বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিরূপভাবে ইহাদের ভিত্তিতে প্রতি রাজ্যের প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না।

৭. বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষম্য দূর করিবার জন্য তৃতীয় কমিশন উহাদের মধ্যে অন্তঃশুল্ক হইতে সংগৃহীত রাজস্ব বণ্টনের বিষয়টি উপায় হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। সমালোচকগণের মতে ইহার পরিবর্তে অনুদানকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করা উচিত ছিল।

৮. তৃতীয় কমিশন কতকগুলি রাজ্যকে সড়ক উন্নয়নের জন্য পৃথক অনুদান দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার ফলে উক্ত রাজ্যগুলি অতিরিক্ত সড়ক উন্নয়নকার্য সম্পাদন করিবে কিনা তাহার নিশ্চয়তা নাই।

ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজস্ব-বণ্টনে রাজ্যসমূহের আনুপাতিক অংশ

(রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন. এপ্রিল ১৯৬২)

	আয়করের অংশ	কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অংশ	সাহায্যস্বরূপ অনুদান	যানবাহনের উন্নয়নকল্পে বিশেষ অনুদান	সম্পত্তিকরের অংশ	রেলমা শুলের উপর করের পরিবর্তে অনুদান	অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক: নিশ্চিত আয়ের পরিমাণ	অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক: অবশিষ্টাংশের বণ্টন
রাজ্যসমূহের অংশ	৬৬$\frac{২}{৩}$%	২০%			৯৯%			৯৭·৫০%
বণ্টন	%	%	কোটি টাকা	কোটি টাকা	%	কোটি টাকা	কোটি টাকা	%
অন্ধ্র প্রদেশ	৭·৭১	৮·২৩	৯	·৫০	৮·৩৪	১ ১১	২·৩৫২৪	৭·৭৫
আসাম	২·৪৪	৪·৭৩	৫·২৫	·৭৫	২·৭৫	·৩৪	·৮৫০৮	২·৫০
বিহার	৯·৩৩	১১·৫৬	—	·৭৫	১০·৭৮	১·১৭	১·৩০১৬	১০
গুজরাট	৪·৭৮	৬·৪৫	৪·২৫	১	৪·৭৮	·৬৮	৩ ২৩৪৫	৫·৪০
জম্মু ও কাশ্মীর	০·৭০	২·০২	১·৫০	·৫০	০·৮৩	—	——	* * *
কেরালা	৩·৫৫	৫ ৪৬	৫·৫০	·৭৫	৩ ৯২	·২৩	·৯৫০৮	৪·২৫
মধ্যপ্রদেশ	৬·৪১	৮·৪৬	১·২৫	১·৭৫	৭·৫১	১·০৪	১·৫৫১৭	৭
মাদ্রাজ	৮·১৩	৬·০৮	৩	—	৭·৮০	·৮১	২·৮৫৩৪	৯
মহারাষ্ট্র	১৩·৪১	৫·৭৩	—	—	৯·১৬	১·৩৫	৬·৩৭৭৭	১০·৬০
মহীশূর	৫·১৩	৫·৮২	৬·২৫	·৫০	৫·৪৬	·৫৬	১·০০১০	৫·২৫
উড়িষ্যা	৩·৪৪	৭·০৭	১১·৫০	১·৭৫	৪·০৮	·২২	·৮৫১০	৪·৫০
পাঞ্জাব	৪·৪৯	৬·৭১	—	—	৪·৭১	১·০১	১·৭৫১৯	৫·২৫
রাজস্থান	৩·৯৭	৫·৯৩	৪·৫০	·৭৫	৪·৬৭	·৮৫	·৯০১০	৪
উত্তরপ্রদেশ	১৪·৪২	১০·৬৮	—	—	১৭·১০	২·৩৪	৫·৭৫৮১	১৫·৫০
পশ্চিম বঙ্গ	১২·০৮	৫·০৭	—	—	৮·১১	·৭৯	২·৮০৪১	৯
মোট			৫২·০০	৯·০০		১২·৫০	৩২·৫৪০০	

*** জম্মু ও কাশ্মীর কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না, তবে নীট সংগ্রহের ১$\frac{১}{২}$% পাইবে।

ভারতের কর-ব্যবস্থার গঠন
INDIA'S TAX STRUCTURE

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ—উভয় প্রকারের বহু কর লইয়া ভারতের কর ব্যবস্থা গঠিত। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত বলিয়া সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য—এই দুই প্রকার সরকারই কর ধার্য এবং উহা হইতে রাজস্ব সংগ্রহ, বণ্টন ও ভোগ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত করসমূহ হইল: আয় কর, সম্পত্তিকর, মূলধনলাভ কর, সম্পদ কর, ব্যয়কর, দানকর, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, বাণিজ্যশুল্ক। রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রবর্তিত করসমূহ হইল: কৃষি আয়কর, বৃত্তির উপর কর, রাজ্য বিক্রয় কর, স্ট্যাম্পকর ও রেজিস্ট্রেশন, নগরাঞ্চলের স্থাবর সম্পত্তির উপর কর, রাজ্য অন্তঃশুল্ক, মোটর তৈলের উপর বিক্রয়-কর, প্রমোদ কর, বিদ্যুৎশুল্ক, মোটর যানের উপর কর এবং ভূমি-রাজস্ব।

বৈশিষ্ট্য
FEATURES

ভারতের কর-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়:

১. ইহা সাধারণভাবে গতানুগতিক এবং রক্ষণশীল। এই প্রকার মন্তব্যের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলা হয় যে বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও ভূমি-রাজস্ব ও অন্তঃশুল্ক অদ্যাবধি এই কর-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

২. প্রত্যক্ষ কর সমগ্র কর-ব্যবস্থায় গৌণস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পরোক্ষ করই এই দেশের কর-ব্যবস্থার প্রধান অবলম্বন। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট কর-রাজস্বের ২৪% প্রত্যক্ষকর হইতে সংগৃহীত হয়। তুলনায় ইংলণ্ডে ৫৫%, অষ্ট্রেলিয়ায় ৭০%, জাপানে ৭০%, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮০%।

৩. শহরাঞ্চলে করভার (incidence of taxation) গ্রামাঞ্চলের করভার হইতে সামগ্রিক হিসাবে বেশি। কিন্তু মোট সংগ্রহের দিক হইতে গ্রামাঞ্চলের অবদান শহরাঞ্চল হইতে বেশি।

৪. এই কর-ব্যবস্থা একদিক হইতে অনিশ্চিত ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া থাকে। মৌসুমী বায়ুর উপরে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন একান্তভাবে নির্ভর করে। এই মৌসুমী বায়ুর অনিশ্চয়তা কর-ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে অনিশ্চিত করিয়া তুলে।

৫. প্রধানত রাষ্ট্রীয় আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা আনয়নের উদ্দেশ্যেই ভারতের কর-ব্যবস্থা মূলত রচিত ও প্রবর্তিত হইয়াছে। তাই ইহাতে বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুসৃত হয় নাই। গতিশীল অর্থনীতির চাহিদা মিটাইবার উপযোগী রাজস্ব সংগ্রহের হাতিয়ার হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করার কথা কখনই চিন্তা করা হয় নাই। উৎপাদন ও বণ্টনের উপরে করভারের প্রতিক্রিয়া কি হইত সে বিষয়ে বিশেষ কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই।

৬ ভারতের কর-ব্যবস্থায় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ বহু কর প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পরিমাণ কর সংগৃহীত হয় না। ক্যালডরের হিসাবে জাতীয় আয়ের মাত্র ৭% কর-রাজস্ব হিসাবে সংগৃহীত হয় (তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ইহা ১১·৪% গিয়া দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে)।

৭. ভারতের কর-ব্যবস্থা এমন ভাবে রচিত যে, উহার ফলে কর-রাজস্ব অনতিপরিবর্তনশীল হইয়া পড়িয়াছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে কর-রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় ইহাই স্বাভাবিক।

ব্যবস্থার আয়ত্তে আনিবার প্রবণতা অবশ্য অহরহই হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ইহার বিপরীত প্রবণতাই পরিলক্ষিত হয়।

ভারতের কর-ব্যবস্থার ত্রুটি
DEFECTS OF THE INDIAN TAX STRUCTURE

পৃথিবীর কোন দেশেই ত্রুটিমুক্ত কর-ব্যবস্থা নাই। ভারতের কর-ব্যবস্থা বিভিন্ন দিক হইতে বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। নিম্নে ঐগুলি আলোচিত হইল :

১. ক্যালডরের মতে ভারতের কর-ব্যবস্থা একদিকে যেমন দক্ষতাহীন অন্যদিকে তেমনি অন্যায্য। ইহা দক্ষতাহীন, কারণ ভারতে পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য কর-প্রবঞ্চনার পরিমাণ বিপুল। ইহা অন্যায্য, কারণ প্রত্যক্ষ করের আকৃতি অতিরিক্ত গতিশীল বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা কর-প্রবঞ্চনা-কারীদেরই সুবিধা করিয়া দেয়। কারণ কর ধার্য করার ব্যাপারে আয়ের (income) যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে আয়করের ভিত্তি সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ আয়ের বিপুলাংশ হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। ইহা নিঃসন্দেহে অন্যায্য।

২. পরিচালনাগত ত্রুটির জন্য কর-প্রবঞ্চনার পরিমাণ অত্যধিক। ক্যালডর মনে করেন আয়কর প্রবঞ্চনার পরিমাণ বাৎসরিক প্রায় ১০০ কোটি টাকা। ধনী ব্যক্তিরা কর-প্রবঞ্চনা করিলেও দরিদ্র ব্যক্তিদের করভার বহন করিতেই হয়। ইহাতে কর-ব্যবস্থা আরো বেশি অধোগতিশীল হইয়া পড়ে।

৩. ভারতে করের ভিত্তি (tax base) খুবই সংকীর্ণ। অর্থাৎ কর-প্রদানকারী লোকের সংখ্যা দেশের সমগ্র জনসংখ্যার অতি নগণ্য অংশ। একটি হিসাবে দেখা যায় ভারতের ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ ব্যক্তি আয়কর প্রদান করে। এবং জনসংখ্যার মাত্র ½% সকল প্রকার প্রত্যক্ষ করের আয়ত্তে আসে।

৪. ভারতের কর-ব্যবস্থা অধোগতিশীল। বিভিন্ন করদাতার মধ্যে ত্যাগ-স্বীকারের সমতা যে কর-ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে তাহাই উত্তম কর-ব্যবস্থা (a good tax system) বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতে প্রবর্তিত বহু কর এই নীতির একান্তভাবে বিরোধী। আমদানিকৃত অত্যাবশ্যক দ্রব্যের উপরে শুল্ক, জনসাধারণের ভোগ্য দ্রব্যের উপরে অন্তঃশুল্ক, বিক্রয়-কর ইত্যাদি দরিদ্র জনসাধারণকেই আঘাত করে। কর অনুসন্ধান কমিশনের হিসাবে দেখা যায় যে ভোগ্যপণ্যের উপরে নির্ধারিত কর হইতে মোট রাজস্বের ৪৫% সংগৃহীত হয়।

৫. কর-ব্যবস্থার বিচারে বিভিন্ন করের আলোচনার সহিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দিকের আলোচনা যেমন আবশ্যক, তেমনি সংগৃহীত কর-রাজস্ব কি উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় তাহার আলোচনাও প্রয়োজনীয়। কারণ একটি বিশেষ করের ভার অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইলেও যদি দেখা যায় যে ঐ করলব্ধ অর্থ সামাজিক গুরুত্ব-সম্পন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, তবে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা অনুভব করিয়া করভারের তীব্রতার আংশিক উপশম করা যায়। এই প্রসঙ্গেই সরকারী ব্যয়ের কথা উত্থাপিত হয়। ভারতের সরকারী ব্যয়ের ধাঁচ অতিশয় অসন্তোষজনক। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে যে অর্থ ব্যয় হয় তদপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় হয় উন্নয়নবহির্ভূত কাজে, যথা, দেশরক্ষা, শাসন পরিচালনা ইত্যাদি। ইহাতে পরোক্ষভাবে হইলেও, কর ব্যবস্থার প্রকৃতি প্রভাবিত হয়।

৪৪৯

কর-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সুপারিশ
SUGGESTIONS FOR IMPROVEMENTS

ভারতের কর-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রধানত তিনটি লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ইহার সংস্কার সাধন করিতে হইবে। লক্ষ্যগুলি হইল: ক. কর-ব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মত ও গতিশীল করা। খ. উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার কার্যসূচীর রূপায়ণের জন্য অধিক পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করা। গ. গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক লক্ষ্যসমূহের পূরণ সুনিশ্চিত করা।

১. কর ব্যবস্থার ভিত্তি আরও প্রশস্ত করিতে হইবে যাহাতে জনসংখ্যার আরও বেশি অংশ কর প্রদান করিতে বাধ্য হয়। ২. কর-প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা ও পরিমাণ হ্রাস করিবার জন্য কর পরিচালনা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া দক্ষতাবৃদ্ধি করিতে হইবে। ৩. কর-ব্যবস্থা যাহাতে ধনবণ্টনের অসাম্য হ্রাস করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে পরোক্ষ করের সংখ্যা হ্রাস করিয়া প্রত্যক্ষ করের সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। ৪. কর-অনুসন্ধান কমিশনের মতে উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থায় গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক হইতে বৈচিত্র্য আনয়ন করিতে হইবে। এই কারণে একদিকে যেমন বিলাস-দ্রব্যাদির উপরে উচ্চহারে কর বসাইতে হইবে অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের অধিকতর সংখ্যক ভোগ্যদ্রব্যের উপরে তুলনামূলকভাবে স্বল্পহারে কর বসাইতে হইবে। ৫. কর-ব্যবস্থার এমন পুনর্গঠন করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদনের কার্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়। এতদুদ্দেশ্যে সরকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন অবপূর্তিজনিত বিনির্দিষ্ট অর্থের উপরে কর রেহাই, নির্দিষ্ট শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কর রেহাই, বিশেষ সময়ের জন্য কর-মুক্তি (tax-holiday) ঘোষণা ইত্যাদি। ৬. মৃত্যুকরের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত কর-অব্যাহতির সীমা (tax-exemption limit) অতি উচ্চে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই সীমা আরও নীচে নামাইয়া আনিতে হইবে। ফলে আরও অনেক ব্যক্তিকে এই করের আওতায় আনা যাইবে। ৭. বিক্রয় করকে আরও বেশি গতিশীল করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিলাস দ্রব্যের উপরে উচ্চতর হারে বিক্রয়-কর ধার্য করিতে হইবে।

কর-অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশ
RECOMMENDATIONS OF THE TAXATION ENQUIRY COMMISSION

ভারতের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার আশু প্রয়োজনে ভারতের সমগ্র কর-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ভারত সরকার এই প্রয়োজনের তাগিদে ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে কর-অনুসন্ধান কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের কার্যক্রম ছিল নিম্নরূপ :

১. বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপরে কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় করের ভার পরীক্ষা করা। ২. দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং আয় ও ধনবণ্টনে বৈষম্য হ্রাস—এই দুইটি লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয় করব্যবস্থার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা। ৩. পুঁজিগঠন ও উৎপাদনশীল উদ্যোগের উপরে প্রচলিত করের ফলাফল পরীক্ষা করা। ৪. মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচনজনিত কুফল প্রতিরোধে ফিসক্যাল ব্যবস্থা (fiscal instrument) হিসাবে কর-ব্যবস্থাকে কি পরিমাণ কার্যকরী করা যায় তাহা পরীক্ষা করা। ৫. প্রচলিত করব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন ও নূতন করস্থাপনের পন্থা উদ্ভাবন সম্পর্কে সুপারিশ করা।

কমিশনের রিপোর্ট ১৯৫৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয়। কমিশনের সুপারিশে

প্রধানত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের ভিত্তিকে প্রশস্ততর এবং করের পরিধিকে ব্যাপকতর করায় উপরেই জোর দেওয়া হয়। উপরন্তু উহাতে করের হারের পুনর্বিন্যাসের কথাও আলোচিত হয়। রিপোর্টে ভারতের কর-ব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এবং সরকারী রাজস্বের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের সংগৃহীত রাজস্বে রাজ্যসরকারসমূহের অংশ লাভ এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যসরকারসমূহকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ অনুদান—এই দুই ব্যবস্থার ফলে রাজ্যসরকারসমূহের রাজস্ব সংগ্রহের উৎসে অধিক পরিমাণ স্থিতিস্থাপকতা আনয়ন করিয়াছে।

ক. বিবিধ সুপারিশ

RECOMMENDATIONS

১ করভার (incidence of taxation) সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য ঐ রিপোর্টে করা হইয়াছে। যেমন, কমিশনের মতে ভূমি-রাজস্বের ভার বর্তমানে আর গুরুতর নহে এবং উচ্চতর ধাপের কৃষি-আয়ের উপর বর্ধিত হারে কর ধার্য করার প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা রহিয়াছে।

২. রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে করের হার বৃদ্ধি এবং ঘাট্‌তি ব্যয়ের আশ্রয় না লইয়া ঋণগ্রহণের সাহায্যে ব্যয় নির্বাহ করিতে হইবে।

৩. সামাজিক উপকরণসমূহ ব্যক্তিগত ভোগে ব্যবহার না করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিনিয়োগের কাজে যাহাতে সরাইয়া আনা যায় তজ্জন্য সকলশ্রেণীর মানুষের ভোগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে ; তবে ধনিকশ্রেণীকেই ভোগের পরিমাণ অধিকতর মাত্রায় হ্রাস করিতে হইবে। এই কারণে কমিশনের সুপারিশ হইল গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক হইতে কর-ব্যবস্থায় উপযুক্ত বৈচিত্র্য আনয়ন। কমিশনের মতে তাই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপরে করধার্য করিতে হইবে।

এই কারণেই প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। উচ্চতর হারে কর ধার্য করিলে কর্মোদ্যোগ ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পাইবে বলিয়া যে অভিযোগ করা হয়, কমিশনের মতে তাহা অতিরঞ্জিত। তবে আয়কর-ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ-সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সরকারী ব্যয় সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য হইল এই যে যদিও ইহা ক্রমশই কল্যাণমূলক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতেছে, তথাপি পরিচালনাগত নৈপুণ্য ও মিতব্যয়িতার ব্যাপারে অধিক দৃষ্টি দিতে হইবে।

নীতি হিসাবে কমিশন শিল্পক্ষেত্রের একটি অংশের সুবিধার্থে অপর একটি অংশের উপরে কর ধার্য করার পক্ষপাতী নহেন। তবে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের উপরে অন্তঃশুল্ক বসাইবার ব্যাপারে শিল্পক্ষেত্রকে সংগঠিত ও অসংগঠিত অংশে বিভক্ত করিয়া লওয়া কমিশনের মতে যুক্তিযুক্ত।

ইহা ছাড়াও বিশেষ বিশেষ কর সম্পর্কে কমিশন বিভিন্ন প্রকারের সুপারিশ করিয়াছেন। পরবর্তীকালে ঐ সুপারিশের অধিকাংশই কার্যে রূপায়িত হইয়াছে।

ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিক উন্নয়নের জন্য উপকরণসমূহের পরিমাণ নির্ধারণ এবং জাতীয় আয় ও সম্পদের ন্যায্য ও সুষম বণ্টনের জন্য ফিসক্যাল নীতি কি পরিমাণ সাহায্য করিতে পারে —এই দুই বিষয়ের অনুসন্ধানকার্যে ভারতের কর অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট প্রকৃতপক্ষে প্রথম সুসংবদ্ধ এবং সর্বাঙ্গীণ প্রয়াস। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান সহজ কাজ নহে। কমিশন ভারতের অর্থনীতিক সমস্যার বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ করিয়া এই লক্ষ্য সাধনের উপযোগী সুপারিশ করিয়াছে।

খ. কর নীতি

TAX POLICY

কমিশনের মতে উত্তম **কর-ব্যবস্থার লক্ষ্য নিম্নরূপ : ক. সমাজের বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নয়ন, খ. রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে সহায়তা করা, গ. ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উৎপাদনের** কাজে সহায়তা করা ঘ. **অর্থনীতির ভিত্তিতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব আনয়ন।**

ক. সমাজের বণ্টন-ব্যবস্থার উন্নয়ন—করের মাধ্যমে অর্থনীতিক সাম্য আনয়ন এবং বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও উৎপাদনের প্রবাহে কোন প্রকারের বাধা সৃষ্টি না করা—এই দ্বিবিধ লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন পূর্বক কর-নীতি নির্ধারণ করা কর্তব্য। ভারতের মত দেশে অর্থনীতিক সাম্য সাধারণ নীতি হিসাবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হইলেও বর্তমানে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যই প্রধান গুরুত্ব লাভ করিবে। ঊর্ধ্বতম স্তরের আয়ের উপর অধিকতর হারে কর বসাইতে হইবে, তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উদ্যোগ ব্যাহত না হয়। ইহার পাশাপাশি সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য খাতে সমাজসেবামূলক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। করপ্রদানক্ষমতা অনুযায়ী করনির্ধারণ করা নীতি হিসাবে অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু ভারতের মত দেশে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণের জন্য সকল-ক্ষেত্রেই এই নীতি নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হইবে না। কোথাও কোথাও এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটিবে।

খ. রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে সহায়তা করা—ভারতের মত দেশে আয়বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়—ইহাই স্বাভাবিক প্রবণতা। এই প্রবণতাকে প্রতিরোধ করিতে কর-ব্যবস্থাকে আরও বেশি গভীর ও ব্যাপক করিয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিলাসের উপকরণ, জনসাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদির উপরে কর বসাইতে হইবে অনেকের মতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের জন্য অর্থসংগ্রহ করের মাধ্যমে না করিয়া ঋণের মাধ্যমেই করা উচিত। কমিশন মনে করেন যে বাজেট-উদ্বৃত্ত সৃষ্টির মাধ্যমে এই সকল কার্যক্রমকে রূপায়ণ করা স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি। অন্য পদ্ধতি হইল ঘাটতি ব্যয়। কমিশনের মতে কর-ব্যবস্থাকে এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে ঘাটতি ব্যয়-জনিত বিপদ দূর করিতে ইহা সমর্থ হয়।

গ. ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উৎপাদনের কাজে সহায়তা করা—এই উদ্দেশ্যে কর-ব্যবস্থাকে এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রের উৎপাদনের কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা যায়। ভারতের সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থার অন্যতম প্রয়োজন হইল অধিক পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা। ইহার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকারের করের সংখ্যা ও হার বৃদ্ধি করিতে হয়। দ্রব্যসামগ্রীর উপরে কর বৃদ্ধি করিলে ভোগ হ্রাস পায়। অপরদিকে প্রত্যক্ষকরের হার অধিকতর গতিশীল করা হইলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। এই অবস্থায় ভারতে এমন কর বসাইতে হইবে যাহাতে অধিক আয়বিশিষ্ট শ্রেণীর ভোগ হ্রাস পায় কিন্তু এই কর বসাইবার ব্যাপারে সকল প্রকার আতিশয্য বর্জন করিতে হইবে। অন্যথায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত হইবে। শুধু তাহাই নহে। শিল্পবিকাশে উৎসাহদানের জন্য কর রেহাই (tax concessions)-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ কর এবং পরোক্ষ করের মধ্যে অনুপাত কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে সঠিক কোন হিসাব করা সম্ভব নহে। তবে কমিশন মনে করেন যে, যতই বেশি রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজন হইবে, ততই প্রত্যক্ষ করের উপরে বেশি

পরিমাণে নির্ভর করিতে হইবে। ইহা ছাড়া, কর-বহির্ভূত রাজস্ব (non-tax revenue) বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে—এই কথাও কমিশন বলিয়াছেন।

ঘ. অর্থনীতির ভিত্তিতে দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব আনয়ন—ইহার জন্য কর-ব্যবস্থাকে এমন ভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে উহার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতিজনিত বা মুদ্রাসংকোচনজনিত—এই দুই অবস্থাতেই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। মুদ্রাস্ফীতিজনিত অবস্থায় সমাজের মোট ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাসের চেষ্টা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি উদ্বৃত্ত-বাজেট নীতি গ্রহণ, রপ্তানিকর আরোপ, অতিরিক্ত লাভকর ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। মুদ্রা-সংকোচনজনিত অবস্থায় রপ্তানি করের বিলোপসাধন, অন্তঃশুল্কের ভার হ্রাস, সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি—ইত্যাদি ব্যবস্থা গৃহীত হইতে পারে।

ভারতীয় কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্যালডর

KALDOR & THE INDIAN TAX SYSTEM

ভারতীয় কর-ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যাপক ক্যালডর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন এবং ইহার সংস্কারের জন্য কতকগুলি সুপারিশ করেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য পরিকল্পনা কমিশন এই প্রকারের হিসাব করিয়াছিলেন: অতিরিক্ত কর বসাইয়া ৪৫০ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে ১২০০ কোটি টাকা এবং ৪০০ কোটি টাকার ফাঁক (যাহা অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে)। অধ্যাপক ক্যালডরের মতে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বৎসরে গড়ে ১৫০ কোটি টাকার (পরিকল্পনার ৫ বৎসরে সর্বমোট ৮০০ কোটি টাকার) অধিক ঘাটতি ব্যয়ের চাপ সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং তাঁহার হিসাবে, পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে অতিরিক্ত করের মাধ্যমে মোট ১২৫০ কোটি টাকা (গড়ে বৎসরে ২৫০ কোটি টাকা) সংগ্রহ করিতে হইবে। এই ১২৫০ কোটি টাকার হিসাব এইরূপ: মূল হিসাবের ৪৫০ কোটি টাকা + পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২০০ কোটি টাকার স্থলে ৮০০ কোটি টাকা (ক্যালডরের সুপারিশ অনুযায়ী) ঘাটতি ব্যয় করা হইলে ইহার দরুন ৪০০ কোটি টাকা + মূল হিসাবের ৪০০ কোটি টাকার ফাঁক অর্থাৎ ৪৫০ + ৪০০ + ৪০০ = ১২৫০ কোটি টাকা। করের মাধ্যমে ইহা সংগ্রহ করিলে প্রধানত জনসাধারণের উপরেই ইহার ভার আসিয়া পড়িবে। সুতরাং এই অবস্থায় কর-ব্যবস্থাকে যতদূর সম্ভব গতিশীল করিতে হইবে যাহাতে করভার সমাজে সুষমভাবে বণ্টিত হয়। ভারতের বর্তমান প্রত্যক্ষ কর-ব্যবস্থা একদিকে যেমন দক্ষতাহীন অন্যদিকে তেমনই অন্যায্য। ইহা দক্ষতাহীন, কারণ প্রচলিত ব্যবস্থায় করদাতারা তাহাদের আয়ের অসম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করিতে পারে। উপরন্তু সম্পত্তি বেচাকেনা এবং সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য সংবাদ সংগ্রহের কোন ব্যবস্থাই বর্তমানে নাই। ইহাতে কর-প্রবঞ্চনা সহজ হইয়া পড়ে এবং ইহাকে প্রতিরোধ করা প্রায় অসম্ভব। ইহা অন্যায্য, কারণ প্রচলিত আইনে কর ধার্য করার জন্য আয়ের যে ভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর করদাতা হিসাবের কারচুপি করিয়া প্রকৃত আয় গোপন রাখিতে পারে। ফলে, কর প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে স্বল্প কর প্রদান করিয়া তাহারা করভার এড়াইয়া যাইতে পারে। প্রচলিত কর-ব্যবস্থায় এই সুযোগ বিশেষভাবে বর্তমান বলিয়া ইহা অন্যায্য, কারণ জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশ পরোক্ষ-করকে এইভাবে এড়াইতে পারে না।

ক্যালডরের অন্যতম সুপারিশ হইল করভিত্তিকে সম্প্রসারিত করা। ইহার জন্য তিনি নূতন ৪টি কর প্রবর্তনের পরামর্শ দেন: করগুলি হইল: ক. মূলধনীলাভের উপরে কর (Tax on

Capital Gains), খ. ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপরে কর (Tax on Personal Expenditure) গ. সাধারণ দানের উপরে কর (Tax on General Gift), ঘ. সম্পদের উপরে বাৎসরিক কর (Annual Tax on Wealth)। প্রচলিত আয়কর ও এই চারিটি কর—অর্থাৎ এই পাঁচটি কর একই সঙ্গে আরোপ করিয়া দেয় করের পরিমাণ হিসাব করিতে হইবে। ইহাতে আয় গোপন করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। কারণ এই ৫টি কর সামগ্রিকভাবে এমন একটি ত্রুটিহীন ব্যবস্থার সৃষ্টি করিবে যাহাতে প্রত্যেকটি কর অপরটির হিসাবের সত্যতা যাচাই করিয়া দিবে।

ব্যক্তিগত আয়ের উপর অত্যধিক উচ্চহারে কর ধার্য করার ফলে সঞ্চয়েচ্ছা, কর্মোদ্যোগ এবং বিনিয়োগের প্রবৃত্তির উপরে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, ব্যক্তিগত ব্যয়কর এবং সম্পদ কর প্রবর্তন করিলে ঐ ক্ষতিকর প্রভাব বহুলাংশে হ্রাস করা যায়।

ক্যালডরের মতে ত্রুটিশূন্য নিম্নহারের কর-ব্যবস্থা (যে ব্যবস্থায় কর-প্রবঞ্চনা বন্ধ করা যায়) বরং ভাল, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অতিরিক্ত গতিশীল বলিয়া মনে হয় অথচ সাফল্যের সহিত কার্যকর করা যায় না এমন কর-ব্যবস্থার সংস্কার সাধনই প্রধান কর্তব্য। তাই তিনি উচ্চতম ধাপের আয়করের হারকে (৯২%) হ্রাস করিয়া ৪৫%-এর অধিক না করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। সম্পদের উপরে করের সর্বোচ্চ হার ১½% (১৫ লক্ষ টাকা অধিক মূল্যের সম্পদের উপরে ১,৫০,০০০ টাকার অধিক ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপরে সর্বোচ্চ ৩০০% ব্যয়কর, ৪০ লক্ষ টাকার অধিক দানের ক্ষেত্রে করের সর্বোচ্চ হার ৮০% দানকর প্রবর্তনের সুপারিশও এই সঙ্গে ক্যালডর করেন। তবে সকল প্রকার মূলধনীলাভের উপরেই আয়করের হারে কর ধার্য করিতে হইবে। কর-ব্যবস্থাকে অধিকতর ন্যায্য এবং করভার যাহাতে নির্বিচারে জনসাধারণকে নিষ্পিষ্ট না করিতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা অন্যতম কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে সমহারে টাকায় সাত আনা হিসাবে কোম্পানীর সমগ্র আয়ের উপরে কর ধার্য করিতে হইবে।

কর-প্রবঞ্চনাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা আয় হইলে বাধ্যতামূলক হিসাব পরীক্ষার সুপারিশও ক্যালডর করিয়াছেন।

এই সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইলে বৎসরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মত রাজস্ব সংগ্রহ করা যাইবে (অর্থাৎ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ৫০০ কোটি টাকা)। ক্যালডরের মতে অবশিষ্ট ৭৫০ কোটি টাকা ভূমি-রাজস্ব এবং অন্তঃশুল্ক হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

ক্যালডর আয়ের ঊর্ধ্বতম ধাপগুলিতে অত্যধিক হারে কর ধার্য করার বিরোধী। তাঁহার মতে গতিশীল কর-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিক হইতে পশ্চিমী দেশগুলির ন্যায় ভারতও একটি পাপ-চক্রের মধ্যে আবর্তিত হইতেছে।

পাপচক্রটি এইরূপ : উচ্চহারে কর ধার্য করার ফলে কর-প্রবঞ্চনা অধিক হয়। কর-প্রবঞ্চনা যত অধিক হয় ততই সরকারের রাজস্ব-আয় কমিয়া যায়—রাজস্ব আয় যত কমিতে থাকে ততই আয় বৃদ্ধির জন্য আরও বেশি হারে কর ধার্য করিতে হয়,—ইহাতে কর-প্রবঞ্চনার পরিমাণ আরো বাড়িয়া যায়—এইভাবে পাপচক্রটি আবর্তিত হইতে থাকে।

ব্যক্তির উপরে করধার্য করার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল করভার বণ্টনে সাম্য ও ন্যায্যতা আনয়ন। ভারতের মত উন্নয়নমূলক অর্থনীতিবিশিষ্ট দেশে ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ক্রমাগতই বাড়িতেছে এবং সম্পদবণ্টনে অসাম্য সৃষ্টি হইতেছে। এই অবস্থায় বিপুল পরিমাণ সম্পদের অধিকারী স্বল্পসংখ্যক বিত্তশালীর উপরে দক্ষতাসহকারে পরিচালিত গতিশীল কর-ব্যবস্থা

আরোপিত না হইলে দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রতি সুবিচার করা হয় না। কিন্তু বেশির ভাগ দেশেই দেখা যায় গতিশীল করনীতি অর্থনীতিক ও সামাজিক অসাম্য দূরীকরণে সফল হয় নাই। বরং বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী এবং সমাজের বিভিন্ন পেশাভুক্ত লোকের উপবে অন্যায় রকমের করভার চাপাইয়া গতিশীল কর প্রকৃতপক্ষে অধোগতিশীলতারই সাক্ষ্য বহন করে।

গতিশীল কর অসাম্য হ্রাসে কেন ব্যর্থ হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত কারণগুলির উল্লেখ করা যায়:

১. কর ধার্যের জন্য 'আয়' বলিতে কি বুঝায় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব।
২. আয় এবং সম্পত্তি সম্পর্কে পূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ কবা যায় এমন ব্যবস্থার অভাব।
৩. বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তির মালিক সম্পত্তি হইতে কেবলমাত্র আয় লাভ করে তাহাই নহে, উপরন্তু অন্যান্য সুবিধাও লাভ করে—এই সত্য উপলব্ধি করার অক্ষমতা।

কর-ব্যবস্থাকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করিতে হইলে তিনটি প্রধান বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ক. ন্যায্যতা, খ. অর্থনীতিক ফলাফল, গ. পবিচালনার দক্ষতা।

ন্যায্যতার দিক হইতে যে কোন কর-ব্যবস্থাকে সকল সময়েই বিশেষ বিশেষ করদাতা শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে হয়। অর্থনীতিক ফলাফলের দিক হইতে কর-ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাহাতে বিনিয়োগ ও কর্মোদ্যোগের উপরে ক্ষতিকারক প্রভাব না পড়ে। দক্ষতার দিক হইতে কর-ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাহাতে কর-প্রবঞ্চনার সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করা যায়। এই সকল লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই ক্যালডর ফুলপ্রসূ কর-ব্যবস্থার জন্য ৫টি করকে একই সঙ্গে আরোপ করিয়া হিসাব করার কথা বলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয়ের উৎস: ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট হিসাব

HEADS OF REVENUE OF THE UNION GOVT : 1965-66 BUDGET ESTIMATES

ভারতের কেন্দ্রীয় সবকাবের রাজস্বকে উৎস হিসাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা কর-রাজস্ব ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব। কর-রাজস্ব প্রধানত তিনটি সূত্র হইতে সংগৃহীত হয়, যথা, ক. আয় এবং সম্পদের উপরে কর, খ. কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, গ. বাণিজ্য শুল্ক,। ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটের মোট রাজস্বের শতকরা ৮৩% কর-রাজস্ব হইতে সংগৃহীত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। কর-বহির্ভূত রাজস্ব যে উৎস হইতে সংগৃহীত হয় তাহা হইল ক. রেলপথ, খ. ডাক ও তার, গ. বেতার, ঘ. মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রাঙ্কন, ঙ. অন্যান্য সূত্র। ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটের ১৭% কর বহির্ভূত রাজস্ব হইতে সংগৃহীত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। নিম্নে ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট হিসাব অনুসারে কয়েকটি প্রধান উৎস হইতে রাজস্ব সংগ্রহের আনুমানিক হিসাবে দেখান হইল:

১. কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক (Central Excise): সংগ্রহের পরিমাণের দিক হইতে এই উৎস বর্তমানে প্রথম স্থান অধিকার করে। সংগ্রহের পরিমাণ ৮২৭·১৭ কোটি টাকা।

২. বাণিজ্যশুল্ক (Customs): ইহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সংগ্রহের পরিমাণ ৪০৫ কোটি টাকা।

৩. আয়কর (Income Tax): ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। (রাজ্যসমূহের অংশ বাদে) ব্যক্তিগত এবং কোম্পানী আয়করের মোট পরিমাণ ৬৮০ কোটি টাকা।

৪. ব্যয় কর (Expenditure Tax): সংগ্রহের পরিমাণ ১·৫৫ কোটি টাকা।

৫. দান কর (Gift Tax) : সংগ্রহের পরিমাণ ৩'১০ কোটি টাকা।

৬. সম্পদ কর (Wealth Tax) : সংগ্রহের পরিমাণ ১২ কোটি টাকা।

৭. সম্পত্তি কর (Estate Duty) : (রাজ্যসমূহের অংশ বাদে) সংগ্রহের পরিমাণ ৭'৪০ কোটি টাকা।

৮. পূর্ত : পূর্তকার্য হইতে সংগ্রহের পরিমাণ ৩'৯৪ কোটি টাকা।

৯. সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কার্যাদি : সংগ্রহের পরিমাণ ২৩'৫৭ টাকা।

১০. মুদ্রাপ্রচলন ও মুদ্রাঙ্কন : সংগ্রহের পরিমাণ ৬১'৬৯ কোটি টাকা।

১১. বিবিধ কর : সংগ্রহের পরিমাণ ২৩'৮৭ কোটি টাকা।

১২. বিবিধ সূত্র : সংগ্রহের পরিমাণ ২৫'৪৭ কোটি টাকা।

১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে বিভিন্ন সূত্র হইতে মোট রাজস্বের পরিমাণ ২৩৫৩'০৯ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় রাজস্বের কয়েকটি প্রধান উৎস

PRINCIPAL HEADS OF REVENUE OF THE UNION GOVERNMENT

আয়কর

INCOME TAX

ভারতে আয়কর ১৮৬০ সনে প্রবর্তিত হইলেও ১৮৮৬ সালেই এই বিষয়ে সুসংবদ্ধভাবে আইন প্রণীত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে এই আইনের প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন হয়। ১৯০৩ সালে ন্যূনতম করের যোগ্যযোগী আয়ের সীমা ৫০০ টাকা হইতে ২০০০ টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। ১৯১৬ সালে ঐ করে গতিশীলতা আনয়ন করা হয়। ১৯৩১ সালে কর অব্যাহতির সীমা ১০০০ টাকায় নামাইয়া আনা হয়। আবার ঐ সীমা ১৯৩৫ সালে পুনরায় ২০০০ হাজার টাকায় লইয়া যাওয়া হয়। পরবর্তীকালে ১৯৪৮ সালে ৩০০০ টাকা, এবং ১৯৫০ সালে ৩৬০০ টাকায় এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ৪২০০ টাকায় ঐ সীমা লইয়া যাওয়া হয় (ইহা ব্যক্তিগত আয় সম্পর্কেই প্রযোজ্য)। কর অনুসন্ধান কমিশন (১৯৫৩-৫৫) এই সীমাকে ৩০০০ টাকায় নামাইয়া আনার সুপারিশ করিয়াছিলেন। বর্তমান বাজেটে ইহার পরিবর্তন করিয়া, ব্যক্তির মোট আয়ের উপর কর হিসাব করিয়া উহা হইতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিগত ভাতা বাবদ ছাড় বাদ দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সাল হইতে আয়করের উপরে সারচার্জ (Surcharge) পুনরায় বসান হইয়াছে।

১৯৩৫ সালে ভারতের আয়কর ব্যবস্থার ব্যাপক অনুসন্ধানের নিমিত্ত ভারত সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩৯ সালের আয়কর আইনের মাধ্যমে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হয়। পূর্বের ধাপ প্রথার ("Step" system) পরিবর্তে স্ল্যাব প্রথার ("Slab" system) প্রবর্তন করা হয়। ধাপ প্রথা অনুযায়ী সমগ্র আয়ের উপরে একই হারে কর ধার্য করা হইত। কিন্তু স্ল্যাব প্রথা অনুযায়ী উচ্চতর স্ল্যাবগুলিতে উচ্চতর হারে কর ধার্য করা হইয়া থাকে। এই প্রথায় আয়কর হইতে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সংখ্যাল্প বিত্তবানদের নিকট হইতে অধিক অর্থ আদায় করা যায় এবং দরিদ্রদের কথঞ্চিৎ ত্রাণের ব্যবস্থা করা যায়।

১৯৪৫-৪৬ সালে আয়কর আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। ইহাতে

উপার্জিত ও অনুপার্জিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। উপার্জিত আয়ের এক-পঞ্চমাংশের রেহাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই রেহাইয়ের পরিমাণ ৪০০০ টাকার অধিক হইবে না। যুক্তির দিক হইতে ইহা খুবই সংগত। কারণ স্বীয় পরিশ্রমে উপার্জন এবং কোন প্রকার পরিশ্রম ছাড়াই উপার্জন,—এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিক উদারতার সহিত কর ধার্য করা উচিত।

একটি দিক হইতে আয়কর ত্রুটিপূর্ণ ছিল। কারণ ইহা করধার্যের ব্যাপারে নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা হিসাবের মধ্যে ধরিত না। প্রকৃতপক্ষে একক হিসাবে ব্যক্তিকে না ধরিয়া পরিবারকেই ধরা উচিত। সাম্যের দিক হইতে সমআয়সম্পন্ন দুই ব্যক্তির মধ্যে যাহার পরিবারের আয়তন বৃহৎ তাহার করের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে স্বল্প হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে এই প্রকার পার্থক্য হিসাবের মধ্যে ধরা হয়।

কর অনুসন্ধানকমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যুদ্ধকালে ৩০,০০০ টাকার অধিক মুনাফার উপরে ৫০% হারে অতিরিক্ত মুনাফাকর ধার্য করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে ইহা ৬৬⅔% করা হইয়াছিল। আয়করের উপবে প্রথমে ২৫%, পরে ৩৩⅓% হারে সারচার্জ (Surcharge) ধার্য করা হইয়াছিল। ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ অতিরিক্ত লাভ কর রদ করা হয়। কিন্তু ১৯৪৭-৪৮ সালে ব্যবসায়লাভ কর প্রবর্তিত হয়। বিনিয়োগের উৎসাহ নষ্ট কবিযা শিল্পাযনেব পথে বাধা সৃষ্টি করিবে বলিয়া এই করের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ী শ্রেণী প্রতিবাদ করে। ১৯৪৯ সালে ইহা রদ করা হয়। বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়ের উৎসাহ দানের জন্য কর অনুসন্ধান কমিটি সারচার্জ এবং বাধ্যতামূলক আমানত পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ কবে। ১৯৫৭ সালে ইহা কার্যকর হয়।

বাণিজ্যশুল্ক
CUSTOMS

বাণিজ্যশুল্ক বলিতে আমদানি শুল্ক ও রপ্তানিশুল্ক এই দুইটিকেই বুঝায়। মোট বাণিজ্য-শুল্কের মধ্যে আমদানি শুল্ক গুরুত্বপূর্ণস্থান দখল করে। ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক হইতে ৪০৫ কোটি টাকা আদায় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। রপ্তানিশুল্ক যুদ্ধ-পরবর্তীক'লেই (বিশেষ করিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাসের পরবর্তী কালে) গুরুত্ব লাভ করে। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে আমদানি শুল্ক ৫% ছিল। তৎপরবর্তী কালে ১০% করা হয়। কিন্তু ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের ও অবাধ বাণিজ্যের সমর্থকদের আন্দোলনের ফলে ১৮৮২ সালে এই শুল্ক সম্পূর্ণ রদ করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু বিনিময় সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য ১৮৯৪ সালে পুনরায় ৫% শুল্ক বসান হয়। ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পপতিদের তুষ্টিবিধানের জন্য ২০ বা ততোধিক কাউণ্টের সুতার উপরে ৫% অন্তঃশুল্ক বসান হয়। ইহাতেও তুষ্টি বিধান করা যাইতেছে না দেখিয়া তুলাজাত খণ্ড-দ্রব্যের আমদানি শুল্ক ৩½% এ নামাইয়া আনা হয়। ভারতে প্রস্তুত তুলাজাত খণ্ড-দ্রব্যের উপরে ৩½% অন্তঃশুল্ক বসান হয়। ইহাকে সংগতকারণেই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার বলিয়া তীব্র সমালোচনা করা হয়। কারণ, এই ব্যবস্থা ছিল ভারতের বস্ত্রশিল্পের পক্ষে ক্ষতিকারক। ভারতের মোটা বস্ত্রের পক্ষে ম্যানচেস্টারের মিহিবস্ত্রের সহিত কোন প্রকারেই প্রতিযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু ইহাতে মিহিবস্ত্র ব্যবহারকারী ধনবানদের পক্ষেই সুবিধা হয় কিন্তু মোটা বস্ত্রের ক্রেতা ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমদানি শুল্ককে অর্থনীতিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বর্ধিত করিতে হয় কিন্তু ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ৩½% অন্তঃশুল্ক অপরিবর্তিতই থাকে এবং ঐ সালেই ইহা রদ করা হয়।

১৯৪৮ সালে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়: শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কলকবজার আমদানিশুল্ক ১০% হইতে ৫%-এ নামাইয়া আনা হয়। কোরিয়া যুদ্ধের পর ১৯৫১ সালে সারচার্জের পরিমাণ ⅟₂ অংশ হইতে ⅟₁₀ অংশে বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৫৩ সালে কয়েকটি ভোগ্যপণ্যের উপরে আরোপিত আমদানি শুল্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। শিশু ও রোগীদের খাদ্য আমদানির উপরে কিছু রেহাইয়ের বন্দোবস্ত করা হয়। এই সকল দ্রব্যের আমদানি কোটার qutoa) পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

আধুনিক কালে ভারতের সরকারী আয়-ব্যয়ে রপ্তানিশুল্কের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৪ সালে একমাত্র চাউল রপ্তানির উপরেই রপ্তানিশুল্ক ছিল। ১৯১৬ সালে পাটের উপর রপ্তানিশুল্ক বসানো হয়। এই শুল্ক অদ্যাবধি চলিতেছে। চা-এর উপর রপ্তানি শুল্ক রাজস্ব সংগ্রহের অন্যতম সূত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সুতা ও তুলাজাত বস্ত্রের উপরে ৩% হারে রপ্তানিশুল্ক বসান হয়। ১৯৪৬ সালের পর হইতে রপ্তানিশুল্ক নূতন গুরুত্ব লাভ করে। নূতন নূতন দ্রব্যের উপরে শুল্ক বসানো হয় এবং পুরাতন শুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয়।

রাজস্বের সূত্র হিসাবে রপ্তানিশুল্ক অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সংরক্ষণমূলক উদ্দেশ্যেও এই শুল্ককে ব্যবহার করা হয়।

বাণিজ্য শুল্কের ফলে সাধারণত ধনী অপেক্ষা দরিদ্রদের অসুবিধা বেশি হয়,—এই কারণে ইহা ন্যায়নীতির বিরোধী। ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার মতে আমদানিশুল্ক সাধারণত ব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্যের উপরে অত্যধিক, বিলাসদ্রব্যের উপরে তুলনামূলক ভাবে কম এবং পুঁজিদ্রব্য ও কাঁচামালের উপরে সর্বাপেক্ষা কম চাপ সৃষ্টি করে।

ভারতসরকারের রাজস্ব সংগ্রহের অন্যতম সূত্র হইল বাণিজ্যশুল্ক। বিভিন্ন সময়ে সরকার যখনই আর্থিক অসুবিধায় পড়িয়াছে, বাণিজ্যশুল্ক সরকারকে ঐ অসুবিধা দূর করিতে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু ভারত যতই শিল্পোন্নত হইতে থাকিবে রাজস্বের প্রধান সূত্র হিসাবে বাণিজ্য-শুল্কের উপরে নির্ভরশীলতা ততই কমিয়া আসিবে। তখন অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইবে অন্তঃশুল্কের উপরে।

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক
UNION EXCISE DUTIES

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রধানতম সূত্র হইল কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক। এই সূত্র হইতে সংগ্রহের পরিমাণ ১৯২১-২১ সালের ৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১৯৬৫-৬৬ সালে রাজ্যসরকারের অংশ সহ ৮২৭·১৭ কোটি টাকা। ১৮৯৪ সালে তুলাজাত বস্ত্রের উপরে প্রথম অন্তঃশুল্ক বসানো হইলেও ১৯৩৪ সালে চিনি, দিয়াশলাই এবং ইস্পাতপিণ্ডের উপরে ইহা বসানো হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৪ সালকে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর হিসাবে উল্লেখ করা যায়। উপরে উল্লিখিত শিল্পগুলি সংরক্ষণের যাবতীয় সুবিধা লাভ করিয়া উন্নতি করিয়াছে। এই সকল শিল্প গড়িয়া উঠিবার ফলে বিদেশ হইতে আমদানি কমিয়া গিয়াছে। ফলে আমদানিশুল্ক হ্রাস পাইয়া রাজস্ব কমিয়াছে। এই সকল দ্রব্যের উপরে অন্তঃশুল্ক বসাইয়া আমদানি শুল্কজাত রাজস্বের ঘাটতি মিটাইবার চেষ্টা করা দরকার। বর্তমানে আরও বহু দ্রব্য অন্তঃশুল্কের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অন্তঃশুল্ক সরকারী রাজস্ব সংগ্রহের একটি স্থায়ী নির্ভরযোগ্য এবং ক্রমবর্ধমান সূত্র হিসাবে আপন স্থান করিয়া লইয়াছে।

বাজেটের সমতা আনয়ন করিবার জন্য অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাই ভারত সরকারকে অন্তঃশুল্ক প্রবর্তন করিতে বাধ্য করিয়াছে।

অন্তঃশুল্কের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা আধুনিক ভারতের অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যশুল্ক হইতে ক্রমহ্রাসমান হারে রাজস্ব সংগ্রহ হইবে। ইহা ছাড়াও বাণিজ্য শুল্ক হইতে লভ্য রাজস্ব বাণিজ্যনীতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিদেশী মুদ্রা অর্জনের প্রশ্নের সহিতও ইহা জড়িত। অতীতে সংরক্ষণের সুবিধা ভোগ করিয়া শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তখন ক্রেতারা অতিরিক্ত মূল্যদানের মাধ্যমে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে। সুতরাং এখন এই শিল্পগুলির কর্তব্য সরকারের তহবিলে ন্যায্য পরিমাণ অর্থ শুল্কের মাধ্যমে প্রদান করা। দেশের করব্যবস্থাকে স্থায়ী করিতে হইলে অন্তঃশুল্কের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে। ইহার জন্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে একদিকে যেমন অন্তঃশুল্কের অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলির আর্থিক অবস্থাকে দুর্বল করা না হয়, তেমনি ক্রেতারা যেন অন্যায় করভারে প্রপীড়িত না হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে ১৩টি দ্রব্যের উপরে অন্তঃশুল্কের হার বাড়ানো হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে কয়েকটি দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইযাছে। ইহাতে ২৯·৫ কোটির টাকার পরিমাণ রাজস্ব কমিবে।

মূলধনীলাভ কর
CAPITAL GAINS TAX

১৯৪৭ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খান কর্তৃক মূলধনীলাভ কর প্রথম প্রবর্তিত হয়। ব্যবসায়ী মহল তীব্রভাবে এই করের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার ফলে ১৯৪৯ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী জন মাথাই এই কর রদ করেন। ১৯৫৬ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে অর্থমন্ত্রী ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী ইহার পুনঃপ্রবর্তন করেন। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ক্যালডরও ১৯৫৬ সালের জুন মাসের রিপোর্টে এই কর প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।

মূলধনী লাভ (Capital gains) : দ্রব্যসামগ্রীর দৈনন্দিন নিয়মিত ক্রয়বিক্রয়ের দ্বারা যে মুনাফা হয় তাহা সাধারণ লাভ। ইহা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয় এবং নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে ইহার উপরে আয়কর দিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এই রূপ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি থাকিতে পারে যাহা উহাদের দৈনন্দিন ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়বস্তু নহে, অথচ, ঐ সকল সম্পত্তির বাজার-দর বৃদ্ধির দরুন কখনও উহা বিক্রয় করিলে উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ উহার ক্রয়মূল্য অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। সম্পত্তি বিক্রয়ের দরুন মালিক এইরূপ যে আকস্মিক মুনাফা উপার্জন করে তাহাই মূলধনীলাভ। সাধারণ লাভ হইতে ইহা পৃথক, কারণ, ইহা অনিয়মিত। এইরূপ আকস্মিক বা অনিয়মিত লাভের উপরে করকে মূলধনীলাভ কর বলা হয়।

মূলধনীলাভ করের **স্বপক্ষে যুক্তি** (Arguments for C.G.T.) : ভারতে মূলধনীলাভ করের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শিত হয় :

১. অন্যান্য আয়ের মত মূলধনীলাভ ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহাতে তাহার করপ্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মূলধনীলাভকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া ন্যায়ের দিক হইতে সমর্থনযোগ্য নহে।

২. মূলধনীলাভকে কর-বহির্ভূত রাখিলে করদাতারা তাহাদের আয়কে ঐ প্রকারের কর-বহির্ভূত আয় হিসাবে দেখাইতে পারে। ইহাতে কর-সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের অসুবিধা হইতে পারে এবং কর-প্রবঞ্চনাকে উৎসাহ দেওয়া হয়।

৩. উন্নয়নমূলক কাজে সরকারের বিপুল পরিমাণ ব্যয় নির্বাহের [illegible] সূত্র হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। মূলধনীলাভের উপরে কর ধার্য করা এইদিক হইতে অপরিহার্য কাজ।

৪. ক্যালডরের মতে ভারতে যে হারে অর্থনীতিক উন্নয়ন সংঘটিত হইতেছে তাহাতে বিপুল পরিমাণে মূলধনীলাভ হইতে থাকিবে। শেয়ার মূলধনের লাভ এই ক্ষেত্রে সর্বাধিক হইবে বলিয়াই তিনি মনে করেন। এমতাবস্থায় মূলধনীলাভকে কর-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৫. কর-অনুসন্ধান কমিশনের মতে মূলধনীলাভের উপরে কর ধার্য করিলে কর-প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা অধিক থাকে। ক্যালডর এই অভিমত গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। তিনি মনে করেন মূলধনীলাভকে কর-বহির্ভূত রাখিলেই বরং কর-প্রবঞ্চনাকে উৎসাহ দেওয়া হইবে।

৬. একমাত্র স্বল্পকালীন রাজস্বের দৃষ্টিভঙ্গীতেই এই করকে দেখা ঠিক হইবে না বলিয়া ক্যালডর মনে করেন। দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলেই তবে এই করের সামগ্রিক আগমের (yield) সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব।

মূলধনীলাভকরের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments Against C.G.T.): ১. এই কর প্রবর্তনের ফলে কর-ব্যবস্থায় নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি হয়, অথচ এই কর হইতে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ স্বল্প।

২. এই কর ব্যক্তিগতক্ষেত্রে বিনিয়োগের উৎসাহ হ্রাস করে।

৩. শিল্পোন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত হইল মূলধনের বাজারে ঋণপত্রের বাধাহীন গতিশীলতা। এই কর এই গতিশীলতাকে ব্যাহত করিয়া শিল্পোন্নয়নের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

৪. কর অনুসন্ধান কমিশন মনে করেন যে, মূলধনীলাভ কর কর-প্রবঞ্চনাকে উৎসাহিত করে। কারণ করদাতারা কর-ধার্যোপযোগী আয়কে (taxable income) মূলধনীলাভের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিবে।

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মূলধনীলাভ করের বিপক্ষে যুক্তি অপেক্ষা সপক্ষে যুক্তিসমূহ অধিকতর প্রবল। এই কারণে মূলধনীলাভ কর প্রবর্তন করা সকল দিক হইতেই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত মূলধনীলাভ করের বৈশিষ্ট্য (features of C G.T. as introduced in 1956): ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিলের পরবর্তীকালের মূলধনীলাভের উপরে এই কর ধার্য হইবে। কর অব্যাহতির সীমা ৫০০০ টাকা। মূলধনীলাভ সহ মোট আয় ১০,০০০ টাকার অধিক না হইলে কর ধার্য হইবে না। কর নির্ধারণের হিসাব হইবে এইরূপ:

কোন বিশেষ বৎসরে যত মূলধনীলাভ হইবে তাহার ⅓ অংশ কর-ধার্যোপযোগী আয়ের সহিত যুক্ত হইলে প্রচলিত আয়করের যে হারে ঐ আয়ের উপর কর ধার্য করা হয়, মূলধনীলাভের উপর করের হার তাহাই হইবে। উদাহরণ, কোন ব্যক্তির এক বৎসরের মোট আয় ২০,০০০ টাকা এবং সেই বৎসরের মূলধনীলাভ ১৫০০০ টাকা, এই ক্ষেত্রে ১৫০০০ টাকার মূলধনীলাভের উপরে ধার্য করের হার হইবে ২৫০০০ টাকার {২০০০০ + (১৫০০০ ÷ ৩)} উপরে প্রচলিত আয়করের হারের অনুরূপ।

১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে এই করের কিছু পরিবর্তন করা হয়। তদনুসারে স্বল্পকালীন মূলধনীলাভ (অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে যে মূলধনীলাভ হইয়াছে) আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে

এবং অনুপার্জিত আয়ের মত ইহার উপরেও সারচার্জ (surcharge) ধার্য হইবে। দীর্ঘকালীন মূলধনীলাভের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল হারে কর ধার্য হইবে। (বর্তমানের যে ২৫% উচ্চতম সীমা নির্ধারিত আছে তাহা আর থাকিবে না)। ব্যক্তির মোট আয়ের উপরে যে হারে কর ধার্য হয় তাহার গড়ের ৭৫% হিসাবে জমি ও বাড়ি হইতে প্রাপ্ত দীর্ঘকালীন মূলধনীলাভের উপরে কর দিবে। আর অন্যান্য মূলধনী লাভের ক্ষেত্রে উক্ত গড়ের ৫০% হিসাবে কর ধার্য হইবে। বর্তমানে প্রচলিত ২৫% হারেই কোম্পানীসমূহের দীর্ঘকালীন মূলধনীলাভের উপরে কর ধার্য হইবে। কিন্তু কোম্পানীর জমি ও বাড়ি হইতে লব্ধ মূলধনীলাভের উপর অতিরিক্ত কর (super-tax) ৫% হইতে বাড়িয়া ১৫% করা হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কর ৫% থাকিবে। কোম্পানীর অংশীদারদের শেয়ারের উপরে প্রদত্ত বোনাসকে মূলধনীলাভ করের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ব্যয় কর
EXPENDITURE TAX

পৃথিবীর অন্য কোন দেশে ব্যয়-কর প্রবর্তিত হয় নাই। একমাত্র ভারতেই ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল ইহা প্রবর্তিত হয়। ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে এই কর রদ করা হইয়াছিল কিন্তু আবার ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে ইহা পুনরায় প্রবর্তিত হইয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই কর হইতে প্রাপ্তির পরিমাণ (অনুমিত) ১.৫ কোটি টাকা। ক্যালডর এই কর প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। **ব্যয়করের পক্ষে যুক্তিসমূহ** নিম্নে আলোচিত হইল :—

১. ব্যয় কর আয়কর অপেক্ষা অনেক বেশি উন্নত। কারণ, কর ধার্য করিবার ব্যাপারে 'আয়' অপেক্ষা 'ব্যয়'কে অপেক্ষাকৃত সহজে সঠিক ভাবে নিরূপণ করা যায়। উপরন্তু ব্যক্তির কর প্রদানের ক্ষমতা পরিমাপ করিবার সূচক হিসাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক নির্ভরযোগ্য। অসাম্য পরিমাপ করিতে ব্যয়কে মানদণ্ড ধরিলে তাহাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত হয়।

২ একদিকে আয় এবং সম্পদের উপর কর বসাইয়া অন্যদিকে ব্যয়কে কর-বহির্ভূত রাখিলে ইহাতে ধনী ব্যক্তিদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার মাধ্যমে বিপুল অর্থের অপচয়মূলক ব্যয়কেই উৎসাহ দেওয়া হয় এবং তাহাদের চরম বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাত্রার মানকে নীচে নামাইয়া আনিতে সাহায্য করা হয় না।

৩. ভারতের কর-ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে ক্যালডরের অন্যতম সুপারিশ ছিল আয়ের সর্বোচ্চ ধাপে করের হার হ্রাস করা, কারণ ঐ ধাপে এত অধিক হারে কর ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ব্যাহত করে এবং কর-প্রবঞ্চনাকে উৎসাহিত করে। সর্বোচ্চ ধাপের আয়করের হার হ্রাস করিলে সরকারী রাজস্বের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগে উৎসাহদানের জন্য ব্যয় কর প্রবর্তন করা উচিত—ইহাই সংক্ষেপে ক্যালডরের বক্তব্য।

৪. উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য উচ্চতর হারে পুঁজি-গঠন প্রয়োজন। ব্যয় করের মাধ্যমে ধনী ব্যক্তিদের ভোগের পরিমাণকে সীমাবদ্ধ করিয়া উহাদের সম্পদ সঞ্চয়ের খাতে প্রবাহিত করা যায়। তাহাতে পুঁজি গঠনের সাহায্য হয়।

৫. আয়করের নির্ধারণ, পরিচালনা ও রাজস্বসংগ্রহ সার্থক ও কার্যকর করিতে হইলে ব্যয় করকে অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কারণ ইহাতে বহুবিধ প্রবঞ্চনামূলক অসত্যভাষণের পথ রুদ্ধ করা সম্ভব।

ব্যয় করের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against E. T.): ব্যয়করের বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ নিম্নে আলোচিত হইল :—

১. ভারতের মত বহুবিধ করভার প্রপীড়িত দেশের করপ্রদান ক্ষমতা চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। এই অবস্থায় ব্যয় কর প্রবর্তন করিলে জনসাধারণের উপরে তীব্র চাপ পড়িবে।

২. আয়কর অপেক্ষা ব্যয় করের পরিচালনাগত অসুবিধা অনেক বেশি। কারণ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সহজে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

৩ ব্যয় কর প্রবর্তিত হইলে কর বিভাগের অসৎ এবং স্বার্থান্বেষী কর্মচারীরা করদাতাদের বিব্রত করিতে পারে এবং এই উপলক্ষে তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

৪. ব্যয়কর ন্যায় নীতির দিক হইতে ততক্ষণই সমর্থনযোগ্য যতক্ষণ মূল্যস্তরে স্থায়িত্ব থাকে। কিন্তু মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে ভোগকারী 'প্রকৃত হিসাবে' ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, একদিকে তাহার যেমন প্রকৃত আয় কমিয়া যায় অপরদিকে তাহাকে ব্যয় করের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ কর দিতে হয়।

৫. ব্যয় করের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি সহজেই কর-প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, কারণ অন্য লোকের দ্বারা নিজের কোন ব্যয় নির্বাহ করাইয়া লইলে তাহা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৬. কৃষি হইতে উপার্জিত আয় ব্যয় করিলে যেহেতু ব্যয়করের অন্তর্ভুক্ত হইবে না সেই জন্য সকলেই বেশির ভাগ ব্যয়ই এই সূত্রে উপার্জিত আয় হইতে করা হইয়াছে বলিয়া হিসাবে দেখাইবে। ইহাতে কর প্রবঞ্চনাকে উৎসাহ দান করা হইবে।

৭. যে সকল পরিবারে লোকসংখ্যা বেশী তাহাদের ক্ষেত্রে ব্যয়কর অধোগতিশীল। কারণ ব্যয় কর ধার্যের বিষয়ে নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা হিসাবে আনিবে না এবং তদনুযায়ী উপযুক্ত রেহাইয়ের ব্যবস্থা করিবে না।

১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে ব্যয়করের কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে। বর্তমানে ৩৬০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয়ের উপরে কোন ব্যয়কর দিতে হইবে না। ইহার উপরে প্রতি ১২০০০ টাকার স্ল্যাবে (Slab) প্রগতিশীল হারে কর বসিবে। ঐ করের হার ৫% হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত হইবে।

সম্পদ কর
WEALTH TAX

ক্যালডরের সুপারিশক্রমে ১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় সম্পদ কর অন্তর্ভুক্ত হয়। পৃথিবীর বহু দেশেই সম্পদ কর প্রচলিত আছে। ব্যক্তি, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার (Hindu Undivided Families) এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নীট সম্পদের উপর এই কর ধার্য করা হয়। ক্যালডরের মূল সুপারিশে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদের উপরে এই কর ধার্য করার কোন কথা ছিল না। কর-অব্যাহতির সীমা হইল এই রূপ : ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা, অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা। করের হার হইল এইরূপ : ব্যক্তি ও অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির সীমার পরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১%, তৎপরবর্তী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ১½% এবং তৎপরবর্তী সমগ্র অংশের জন্য ২%। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর অব্যাহতির সীমার পরবর্তী সমগ্র অংশের উপরে ½% হারে। ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পদ

কর রদ করা হইয়াছে। ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে এই করের কিছু রদবদল হয়। কর অব্যাহতির সীমা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা হইতে ১ লক্ষ টাকায় এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা হইতে ২ লক্ষ টাকা কমাইয়া আনা হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকার এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ টাকার প্রথম স্ল্যাবের উপরে •'৫% হিসাবে কর বসিবে। ক্রমে প্রগতিশীল হারে ইহাকে সর্বোচ্চ ২'৫% পর্যন্ত বাড়ানো হইবে।

১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে শহরাঞ্চলের সম্পত্তির উপর স্ল্যাব অনুসারে ১% হইতে ৪% পর্যন্ত অতিরিক্ত সম্পদ কর ধার্য হইয়াছে।

সম্পদ করের বিরুদ্ধে যুক্তি (Arguments against Wealth Tax) সম্পদ করের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হয় তাহা নিম্নে আলোচিত হইল :

১. সম্পদ কর সঞ্চয় এবং পুঁজিগঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। ইহাতে শিল্পায়নের গতি ব্যাহত হয়।

২. সম্পদ কর নির্ধারণের ব্যাপারে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল সম্পদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না বলিয়া ইহা ন্যায্য নহে। কারণ উৎপাদনশীল সম্পদ হইতে আয় হয় কিন্তু অনুৎপাদনশীল সম্পদ হইতে কোন আয় হয় না। এই ক্ষেত্রে দুই প্রকারের সম্পদকেই একই হারে করের অন্তর্ভুক্ত করিলে তাহা ন্যায়নীতির বিরোধী।

৩. সম্পদ করের ক্ষেত্রে পরিচালনাগত নানা অসুবিধা দেখা দেয় ; যেমন ক. বিশেষ কোন সম্পদের প্রকৃত মালিক কে তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা, ও খ. সম্পদের অর্থ মূল্য নিরূপণ করা।

৪. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সম্পদ কর প্রবর্তিত হইলে উহাতে দুইবার কর প্রদানের (double taxation) আশঙ্কা থাকে, প্রথমত, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজের সম্পদের বাবদে কর প্রদান করিবে, দ্বিতীয়ত, অংশীদাররা তাহাদের অংশের (share) উপরে ধার্য কর প্রদান করিবে।

৫. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পদ কর ধার্য করা হইলে ঐ করভার অনেক ক্ষেত্রেই ক্রেতাদের স্কন্ধে সঞ্চালিত করিয়া দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং এই সঞ্চালন ক্রিয়া নির্ভর করিবে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার ক্ষমতার উপর। কোন কোন প্রতিষ্ঠান এই কার্যে সফল হইবে, কোন কোন প্রতিষ্ঠান হয় ত হইবে না। ইহা অনুচিত।

সম্পদকরের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Wealth Tax) ক্যালডর সম্পদ করের পক্ষে তিনদিক হইতে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন :- ক. ন্যায় (equity), খ. অর্থনৈতিক ফলাফল (economic effect), ও গ. পরিচালনাগত দক্ষতা (administrative efficiency)। নিম্নে ঐ যুক্তিগুলির আলোচনা করা হইল :

১. করপ্রদান ক্ষমতার (taxable capacity) পরিমাপ করিতে কেবল-মাত্র আয়কে মাপকাঠি ধরিলে তাহা ন্যায়ের দিক হইতে সমর্থনযোগ্য হয় না বরং যথার্থ মাপকাঠি হইবে বিভিন্ন সূত্রে উপার্জিত আয় এবং বিভিন্নপ্রকার সম্পদের মালিকানা। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহাকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। একজন ভিক্ষুকের আয় অথবা সম্পদ—কিছুই নাই ; অপর এক ব্যক্তির কোন আয় নাই বটে কিন্তু ৫ লক্ষ টাকার স্বর্ণ বা অলংকার রহিয়াছে। এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আয়কে করপ্রদান ক্ষমতার মাপকাঠি ধরিলে উভয়ক্ষেত্রেই আয় শূন্য বলিয়া করপ্রদান ক্ষমতাও শূন্য ধরিতে হয়। এই হিসাবে উভয়কেই কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিলে ন্যায়নীতির

দিক হইতে অনুচিত কাজ হইবে। কারণ কোনক্রমেই [illegible] সহিত [illegible] সম্পদের মালিকের অর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

২. আয়করের তুলনায় সম্পদকরের এমন একটি সুবিধা আছে যাহাতে অর্থনীতিক ফলাফলের দিক হইতে ইহা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। আয়কর যেখানে বিনিয়োগকারীর ঝুঁকি-গ্রহণের মনোবৃত্তি ও উৎসাহ দুর্বল ও স্তিমিত করে, সম্পদকর সেখানে এই প্রকারের ফলাফল হইতে মুক্ত থাকে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহাকে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এক ব্যক্তি তাহার সঞ্চয় (সম্পদ) (ঝুঁকি-বিহীন) সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ করিয়া ৩ টাকা সুদ পাইতে পারে অথবা ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদনমূলক কাজে বিনিয়োগ করিয়া ১০ টাকা উপায় করিতে পারে। এক্ষণে ঝুঁকিবিহীন ৩ টাকা এবং ঝুঁকিপূর্ণ ১০ টাকার মধ্যে কোন তারতম্য না করিয়া একই হারে আয়কর নির্ধারিত হইবে। এমতাবস্থায় স্বভাবতই ঝুঁকি গ্রহণের উৎসাহ স্তিমিত হয়। কিন্তু সম্পদ কর এই সকল ক্ষেত্রে কোন তারতম্য না করিয়া সম্পদের মূল্যের উপরেই কেবলমাত্র নির্ধারিত হইবে।

৩. আয়কর এবং সম্পদ কর—এই দুইটি একই সঙ্গে প্রবর্তিত হইলে পরিচালনাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। কারণ কোন করপ্রদানকারীর মালিকানাভুক্ত সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিলে যেমন তাহার অপ্রকাশিত আয়ের সূত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তেমনি তাহার বিভিন্ন সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিলে অপ্রকাশিত সম্পদের কথাও জানা যাইবে। এইভাবে যুগ্মভাবে প্রবর্তিত কর করপ্রদানকারীর করপ্রদানক্ষমতার সঠিক নির্দেশ দিবে এবং কর-প্রবঞ্চনাও কঠিনতর হইয়া পড়িবে।

৪. যে সম্পদ হইতে কোন আয় হয় না সেই সম্পদের উপরে কর ধার্য করিলে, করপ্রদানকারীর উপর অন্যায় করা হয় বলিয়া যে যুক্তি দেখান হইয়াছে, তাহার উত্তরে ক্যালডর বলেন যে, কোন বিশেষ সম্পদ হইতে "আর্থিক-আয়" (money income) না হইলেও অন্য প্রকারের আয় নিশ্চিতভাবেই হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে আয়ের সংজ্ঞা সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণার পরিবর্তন করিতে হইবে। তিনি বলেন "আর্থিক আয়" না হইলেও "মানসিক-আয়" (অনুভূতি অথবা মর্যাদা ইত্যাদির দিক হইতে কিছু আশা) যে কোন সম্পদ হইতেই প্রবাহিত হয়। সুতরাং কেবলমাত্র আর্থিক আয় সৃষ্টিকারী সম্পদের উপরেই কর বসাইয়া, আর্থিক আয় সৃষ্টি করে না এমন সম্পদকে কর-বহির্ভূত রাখিলে, ন্যায় ও নীতির দিক হইতে তাহা যুক্তিপূর্ণ হইতে পারে না।

দান কর
GIFT TAX

১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে ক্যালডরের সুপারিশক্রমে দান কর ভারতীয় কর ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সম্পত্তি দান করিয়া সম্পত্তি কর (মৃত্যু কর) এড়াইবার সুপরিচিত পথ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে এই কর প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

এই দান করের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :—১. দাতব্য প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের আইনের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ৬ অথবা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত দানের উপরে দান কর বসিবে।

২. যে কোন এক বৎসরে ১০০০০ টাকা পর্যন্ত দানের উপরে কর দিতে হয় না। সর্বদাই পূর্ববর্তী বৎসরের দানের উপর দেয় করের হিসাব করা হয়।

৩. স্ল্যাব পদ্ধতিতে এই করের হিসাব করা হয়। প্রথম ৫০,০০০ টাকার দানের উপর দেয় করের হার ৪%। পরবর্তী স্ল্যাবগুলিতে করের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৫০ লক্ষ টাকার অধিক অংশের উপর ৪০% হারে কর আদায় করা হয়।

৪. ভূদান, সম্পত্তিদান, সন্তানদের শিক্ষার জন্য দান, শ্রমিক-কর্মচারীদিগকে বোনাস, অবসর ভাতা ইত্যাদি দান, পেশা, বৃত্তি ও ব্যবসার পরিচালনার জন্য দান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে দান, নির্ভরশীল মহিলাদের বিবাহের জন্য ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত দান ইত্যাদির উপরে দান কর প্রযোজ্য হইবে না।

৫. স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক দানের ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা অবধি কোন কর দিতে হইবে না।

দান করের স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments for Gift Tax): ১. ক্যালডরের মতে সম্পত্তি কর (মৃত্যু কর) ও সম্পদ কর দেশের কর ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হইলে দান করের অন্তর্ভুক্তিও অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সম্পত্তি দান করিয়া যাহাতে এই কর দুইটি ফাঁকি দিতে না পারে সেই জন্য ক্যালডর একই সঙ্গে দান কর প্রবর্তনের সুপারিশ করেন।

২. সম্পত্তি কর বা উত্তরাধিকার কর (মৃত্যু কর) যে যুক্তিতে প্রবর্তিত হয় ঠিক একই যুক্তিতে দান করও প্রবর্তন করা উচিত। অর্থাৎ মালিকের মৃত্যুতে উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যদি কর দিতে হয় তবে দানের মাধ্যমে সম্পত্তির যে হস্তান্তর ঘটে উহাকে কর হইতে অব্যাহতি দেওয়ার কোন কারণ নাই।

৩. এই কর প্রবর্তিত হইলে কেহ তাহার উপার্জিত আয়কে দান হিসাবে প্রাপ্ত বলিয়া হিসাবে দেখাইয়া আয়কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিলে দান করের সাহায্যে তাহা বন্ধ করা যায়।

১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে এই করের কিছু পরিবর্তন করা হয়। ক. স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক দানের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির সীমা ১ লক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া ৫০,০০০ টাকা করা হইতেছে। খ. সাধারণভাবে কর অব্যাহতির সীমা পূর্বতন ১০,০০০ টাকা হইতে ৫০০০ টাকা করা হইয়াছে। গ. (পূর্বে ন্যূনতম ৪% হইতে উচ্চতম ৪০% পর্যন্ত প্রগতিশীল হারে স্ল্যাব পদ্ধতি অনুযায়ী কর বসিত।) ৩,৪৫,০০০ টাকার উপরে স্ল্যাবে সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত কর দিতে হইবে।

১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে এই কর হইতে ৩·১০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

সম্পত্তি কর
ESTATE DUTY

১৯৫৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতের পার্লামেন্টে সম্পত্তি কর আইন (Estate Duty Act) পাস হয় এবং ঐ বৎসরেরই অক্টোবর মাস হইতে উহা প্রবর্তিত হয়।

উদ্দেশ্য (objects): ১. সম্পদ বণ্টনের অসাম্য দূরীকরণ; ২. মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের হাতে বিপুল পরিমাণ সম্পদের কেন্দ্রীভবন নিবারণ ৩. রাজ্যসমূহের আর্থিক ভিত্তিতে দৃঢ়তা আনয়ন এবং ৪. রাজ্যগুলির উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক কার্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংস্থান।

প্রয়োগক্ষেত্র (scope): ১. জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য বাদে ভারতের সর্বত্র ইহা কার্যকর ২. মৃত ব্যক্তির যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর এই কর প্রযোজ্য। কর নির্ধারণের জন্য সম্পত্তির মূল্য হইতে মৃত ব্যক্তির কোন দেনা থাকিলে তাহা বাদ দিতে হইবে

৩. মূল আইনে হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৫০,০০০ টাকা এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা অবধি কর দিতে হইত না। পরে ১৯৫৮ সালে সংশোধনের দ্বারা ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির সীমা ১ লক্ষ টাকা হইতে ৫০,০০০ টাকায় লইয়া আসা হয়। ইহার অতিরিক্ত সম্পত্তির উপর স্ল্যাব পদ্ধতিতে কর আরোপ করা হয়। ৪. পূর্বে পঞ্চাশ হাজার টাকার পরবর্তী স্ল্যাবের উপর করের হার ছিল ৬% এবং তৎপরবর্তী স্ল্যাবের উপর দেয় করের হার ছিল ৮%। ১৯৫৮ সালের সংশোধনের দ্বারা ঐ হার কমাইয়া যথাক্রমে ৪% ও ৬% করা হইয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে এই করের হার আরও বেশি প্রগতিশীল করা হয়। পঞ্চাশ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে একলক্ষ টাকা পর্যন্ত ৪% হারে শুরু করিয়া ২০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে করের হার ৮৫% পর্যন্ত ধার্য হইবে। (পূর্বে ৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে সর্বোচ্চ ৪০% কর বসিত)।

রেহাই (exemption): নিম্নলিখিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে এই কর প্রযোজ্য নহে। ১. মালিকের মৃত্যুর পূর্বে ৬ মাস কালের মধ্যে প্রদত্ত জনসাধারণের সেবার্থে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত দান। ২. মৃত্যুর পূর্বে পাঁচ বৎসরকালের মধ্যে প্রদত্ত অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে দান। ৩. ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জীবনবীমা। ৪. সম্পত্তি কর প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারের নিকট গচ্ছিত অনধিক ৫০,০০০ টাকা। ৫. নির্ভরশীলা প্রত্যেক আত্মীয়ার বিবাহের জন্য ৫০০০ টাকা।

সংগ্রহ ও বণ্টন (collection & distribution): কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর দপ্তরের মারফত সম্পত্তি কর সংগ্রহ করে। কিন্তু সংগৃহীত অর্থের সমগ্র অংশই কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল ও রাজ্যগুলির মধ্যে ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বণ্টিত হয়। বর্তমানে ইহার মোট আদায়ের ৯৯% রাজ্যগুলি পায় এবং ইহা উহাদের মধ্যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ভিত্তিতে বণ্টিত হয়। বাকি ১% কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি পাইয়া থাকে। ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে ইহার আদায়ের পরিমাণ আনুমানিক ৭.৪০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭.২২ কোটি টাকা রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হইবে।

বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা
ANNUITY DEPOSIT SCHEME

১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা প্রবর্তিত হইয়াছিল। উহাতে বাৎসরিক ১৫০০ টাকা এবং তদূর্ধ্ব আয় সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা রদ করা হয়। তাহার স্থলে বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়। বাৎসরিক ১৫০০০ টাকার অধিক আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রগতিশীল হারে এই আমানতের পরিমাণ ধার্য করা হইয়াছে। উহার হার নিম্নরূপ: ১৫০০১ টাকা হইতে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৫%, ২০০০১ টাকা—৪০০০০ টাকা পর্যন্ত ৭.৫%, ৪০,০০১ টাকা—৭০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১০%, এবং ৭০,০০০ টাকার ঊর্ধ্বে ১২.৫%। কোন ব্যক্তি তাহার গ্র্যাচুইটি (gratuity) বাবদ প্রাপ্ত আয়ের ৫০% অবধি অতিরিক্ত আমানত হিসাবে স্বেচ্ছায় জমা রাখিতে পারে। সঙ্গীতজ্ঞ, লেখক, শিল্পী এবং নাট্যকারেরা তাঁহাদের দেয় আমানতের উপরে ইচ্ছা করিলে আরও ১৫% অতিরিক্ত আমানত হিসাবে জমা রাখিতে পারিবেন। কোন বৎসরে ব্যক্তির আয়করের পরিমাণ ধার্য করার সময় ঐ বৎসরে যে পরিমাণ আমানত জমা দেওয়া হইয়াছে তাহা মোট আয় হইতে বাদ দিয়া হিসাব করা হইবে। দশটি সমান কিস্তিতে আমানতের আসল ও সুদ মিলাইয়া মোট প্রাপ্য টাকা ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়া হইবে। যে বৎসরে ব্যক্তি ঐ টাকা ফেরত পাইবে সেই বৎসরের মোট আয়ের সঙ্গে উহা যুক্ত হইবে এবং তদনুযায়ী আয়কর ধার্য হইবে।

১৯৬৪-৬৫ সালের আমানতের উপরে কিঞ্চিদধিক ৪% হারে সুদ দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনা হইতে বাৎসরিক ৬৭ কোটি টাকা আদায় হইবে।

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা পূর্বেকার বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা অপেক্ষা অনেকদিক হইতে ভাল। কারণ ইহাদ্বারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চয়ের আকারে পাওয়া যায়। আর দরিদ্র ব্যক্তিরা উহাদের অপ্রচুর আয়ের একটা অংশকে সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয় না। বস্তুতপক্ষে বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনা দেশের জনসাধারণের এক বিরাট অংশের বিরাগভাজন হইয়াছিল। এবং ঐ বিরক্তি ও বিক্ষোভের ফলেই উহার বিলোপ সাধন করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় : ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটের হিসাব

MAJOR HEADS OF EXPENDITURE OF THE UNION GOVT :
1965-66 BUDGET ESTIMATES

১.	প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় :	৭৪৮'৭৪ কোটি টাকা	৩৫ %
২.	বেসামরিক শাসন পরিচালনা :	৯১'৩৬	৪
৩.	ঋণ সংক্রান্ত ব্যয় :	৩৫৬'১১	১৭
৪.	সামাজিক ও উন্নয়নমূলক ব্যয় :	১৮৪'৬৬	৮'৭
৫.	বিবিধ ব্যয় :	২৩৮ ৭৮	১১
৬.	রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্যয় :	২৮'৮৮	১'৩
৭.	রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত অনুদান ও কেন্দ্রীয় শুল্কাংশ :	৪৬৭'৯৫	২২

১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে মোট ব্যয় ২,১৬'৪৮ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ইহাতে াজেটে ১৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতের মোট ব্যয়ের গতি হইতে দেখা যায় যে ইহা ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে ১৯৫০-৫১ সালে মোট ব্যয় ৩৪৬ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে ২১১৬'৪৮ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। প্রত্যেক খাতেই ব্যয় বৃদ্ধি লক্ষণীয়। প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি বিগত ১৪ বৎসর কি ভাবে এবং কি কারণে হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল।

মোট ব্যয় (রাজস্বখাতে) (কোটি টাকা)	১৯৫০-৫১ (প্রকৃত) ৩৪৬ ৬৪ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের %	১৯৬৫-৬৬ (অনুমিত) ২১১৬'৪৮ (কোটি টাকা)	মোট ব্যয়ের %
১. বেসামরিক শাসন	২১'২৯	৬	৯১'৩৬	৪
২. প্রতিরক্ষা	১৬৪'১৩	৪৭	৭৪৮'৭৪	৩৫
৩. ঋণসংক্রান্ত ব্যয়	৩৭'৩৬	১০'৭	৩৫৬ ১১	১৭
৪. সামাজিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয়	৩৯'৫০	১১	১৮৪'৬৬	৮'৭
৫. কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যসমূহকে প্রদত্ত অনুদান ইত্যাদি	১৫'৫৯	৪'৩	৪৬৭'৯৫	২২

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় বৃদ্ধির কারণ
CAUSES OF INCREASE IN PUBLIC EXPENDITURE IN INDIA

১. বেসামরিক শাসন : এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হইল : নূতন নূতন মন্ত্রিদপ্তর ও অফিস স্থাপন, বেসরকারী কর্মচারিগণের মাহিনা ও দুর্মূল্য ভাতা বৃদ্ধি, বিদেশে দূতাবাস স্থাপন ও প্রতিনিধি প্রেরণ ইত্যাদি।

২. প্রতিরক্ষা : এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হইল : ভারতীয় দেশরক্ষা বাহিনীর সাজসজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ, সীমান্ত সংক্রান্ত অশান্তি বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি। বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ করিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইবার পর হইতে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট ব্যয়ের অনুপাত হিসাবে যদিও ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় বর্তমানে ইহা কম কিন্তু মোট পরিমাণের দিক হইতে ইদানীং কালের ব্যয় খুব বেশি। ফলে সামাজিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয় পরিমাণের দিক হইতে বিগত ১৪ বৎসরে প্রায় অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে এবং অনুপাতের দিক হইতে হ্রাস পাইয়াছে। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের পক্ষে ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয় না।

৩. ঋণজনিত ব্যয় : উন্নয়নমূলক কার্যে ব্যয় নির্বাহের জন্য বিপুল পরিমাণ সরকারী ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই ঋণ বাবদ প্রদেয় সুদ ঋণজনিত ব্যয়ের অন্যতম উপাদান. ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রদেয় সুদের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইতেছে।

৪. সামাজিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যয় : শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা খনিজ সমীক্ষা, পশ্চাৎপদ বর্ণ ও শ্রেণীর ও জাতিসমূহের উন্নয়ন, সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা প্রভৃতি খাতে সামাজিক উন্নয়নমূলক উদ্দেশ্যে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

৫. কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত অনুদান ইত্যাদি : পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলির উন্নয়নের দ্বারা বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের জন্য ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে এই ব্যবস্থা ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিতেছে।

ভারতের সরকারী ঋণ
INDIA'S PUBLIC DEBT

প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমভাগ হইতেই ভারতে সরকারী ঋণের সৃষ্টি হয়। নূতন নূতন অঞ্চল জয় এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকারের যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঋণগ্রহণ করে। ইহা ছাড়া বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্যও ঋণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ১৭৯২ সালে ঐ প্রকার ঋণের পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে উহা ৩ কোটি পাউণ্ডে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ বিদ্রোহ দমনের জন্য ঋণের পরিমাণ ১৮৬০ সালে ১০ কোটি পাউণ্ডে পরিণত হয়। কোম্পানীর নিকট হইতে শাসনক্ষমতা ইংলণ্ডের রাজার নিকট হস্তান্তরিত হইবার সাথে সাথে সমগ্র ঋণ ভারত সরকারের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে। প্রথম দিকের সরকারী ঋণের সমগ্র অংশই অনুৎপাদনশীল ছিল। ১৮৬৭-৬৮ সালে উৎপাদনশীল কার্যে প্রথম ঋণ গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে রেলপথ নির্মাণ ও সেচকার্যের মত উৎপাদনশীল কর্মে সরকার অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করে। ১৮৯২ সালে ভারতের উৎপাদনশীল ঋণের পরিমাণ অনুৎপাদনশীল ঋণের পরিমাণকে ছাড়াইয়া যায়।

[illegible] সংগৃহীত হইলেও ভারতে [illegible] সরকার। [illegible]
ই ঋণ [illegible]। [illegible] লণ্ডনের বাজার হইতে (স্টার্লিং) ঋণ সংগৃহীত হইতে
[illegible] প্রথম মহাযুদ্ধকালে ঋণের [illegible] ভারত সরকার প্রধানত ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারের
[illegible] নির্ভর করিতে বাধ্য হয়। ইহার অন্যতম কারণ হইল এই যে ব্রিটিশ সরকারের
[illegible] প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের দায়িত্ব লণ্ডনের টাকার বাজারকেই লইতে হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে (১৯১৯ সালের মার্চ) ভারতের টাকা ঋণ (rupee debt) এবং স্টার্লিং ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৫৮.৭৮ কোটি টাকা এবং ৩০৪.০৮ কোটি টাকা। এত বিপুল পরিমাণ ঋণের অন্যতম কারণ হইল প্রথম মহাযুদ্ধে ভারত সরকার কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধকার্য পরিচালনার জন্য ১০ কোটি পাউণ্ড দান এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালের ভারত সরকারের ক্রমাগত ঘাটতি বাজেট।

১৯৩৯ সালের মার্চের শেষে ভারতের টাকা-ঋণের পরিমাণ ছিল ৭০৯.৯৬ কোটি টাকা এবং স্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৬৯ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারতের সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারতের স্টার্লিং ঋণের অধিকাংশ যুদ্ধের কয়েক বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা হয়। ফলে ১৯৪৪ সালের মার্চের শেষে স্টার্লিং ঋণের পরিমাণ মাত্র ৩৮ কোটি টাকায় দাঁড়ায় কিন্তু অন্যদিকে টাকা ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ঐ সময়ে ১৩৩৪ কোটি টাকাতে পৌঁছায়।

১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ ভারত সরকারের মোট সুদপ্রদেয় দায় (interest bearing obligation)-এর পরিমাণ ছিল ৮৫৯৭ কোটি টাকা। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে (আনুমানিক) ৯৬৫৯.কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ভারতে অভ্যন্তরীণ দায়ের পরিমাণ ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে ছিল ৪৭৮১ কোটি টাকা এবং ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে উহা (আনুমানিক) ৫০৬৯ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। ইহা ছাড়া বিদেশী ঋণের পরিমাণ ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে ছিল ১৮০৭ কোটি টাকা এবং ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে (আনুমানিক) ২৪৩৯ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে।

সরকারী ঋণের বিভাগ (classification of debt): ভারতের সরকারী ঋণকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা হয়। যথা:

১. উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল। রেলপথ নির্মাণ, সেচকার্য, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য যে ঋণ সংগৃহীত হয় তাহাকে উৎপাদনশীল ঋণ বলে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষের সময় খয়রাতি ইত্যাদি কার্যের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ঋণকে অনুৎপাদনশীল ঋণ বলে। ভারত সরকারের সমগ্র ঋণের প্রায় ৮৩% উৎপাদনশীল ঋণ।

২. অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী ঋণ: দেশের অভ্যন্তর হইতে সংগৃহীত ঋণকে অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং বিদেশ হইতে সংগৃহীত ঋণকে বিদেশী ঋণ বলা হয়। ভারতের সমগ্র সরকারী ঋণের ৬৭% অভ্যন্তরীণ।

৩. দীর্ঘমেয়াদী (Funded) ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ। যে ঋণ পরিশোধের জন্য কোন বিশেষ সময় নির্দিষ্ট থাকে না তাহাকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ বলে। আর যে ঋণ স্বল্পকালের মধ্যেই পরিশোধ করিতে হয় তাহা স্বল্পমেয়াদী ঋণ। ভারত সরকারের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সমগ্র ঋণের ৬০%।

ভারতের সরকারী ঋণের অবস্থা (the position of public debt): কোন দেশের সরকারী ঋণের অবস্থা বুঝিতে হইলে প্রধানত দুইটি জিনিস বিচার করিতে হয়। ১. উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ঋণের অনুপাত। ২. অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী ঋণের অনুপাত

১. সমগ্র সরকারী ঋণের প্রায় ৮৩% উৎপাদন[illegible]বের হস্তে কোন জমা বা সম্পত্তি নাই (অর্থাৎ অনুৎপাদনশীল)।

২. সমগ্র ঋণের ৬৭% অভ্যন্তরীণ বলিয়া ইহার [illegible] তত বেশি নহে। [illegible] বিদেশী ঋণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে স্বল্প (৩৩%) বলিয়া সুদ হিসাবে খুব বেশি অর্থ ভারত হইতে বিদেশীদের হাতে চলিয়া যায় না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে কয়েক বৎসর ধরিয়া অভ্যন্তরীণ ঋণের অনুপাত ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং বিদেশী ঋণের অনুপাত বাড়িয়া চলিতেছে।

এই দুই দিক হইতেই দেখা যায় যে ভারতের সরকারী ঋণের অবস্থা সন্তোষজনক।

প্রশ্নপত্র ও উত্তর সংকেত

১ঃ অর্থনীতিক পরিকল্পনা

1. What is meant by developmental planning ? Briefly discuss the aims and objectives of economic planning. [Ans. ৪১৯ পৃঃ]
2. Write a short note on the importance of planning in a country like India. [Ans. ৪২০-২১ পৃঃ]
3. What are the obstacles to economic planning in an under-developed country like India ? [Ans. ৪২২-২৩ পৃঃ]
4. Indicate the conditions for the success of developmental planning ? [Ans. ৪২৪-২৫ পৃঃ]
5. Discuss the requisites (or essentials) of developmental planning. [Ans. ৪২৪-২৫]
6. What are the different sources of finance for developmental plans? Briefly discuss these sources in the context of India's Five Year Plans [Ans, ৪২৫-২৮ পৃঃ]
7. Evaluate the different sources of finance for India's Five Year Plans. [Ans. ৪২৫-২৮ পৃঃ]
8. What do you mean by 'Deficit Finance' ? Discuss the arguments for and against deficit finance. [Ans. ৪২৮-২৯ পৃঃ]
9. "Deficit finance in underdeveloped countries tends to be inflationary finance." —Discuss the statement in the present Indian context. [C. U. B. A. 1959] [Ans. ৪২৮-৩১ পৃঃ]
10. "Deficit financing is an effective instrument for financing the country's economic development". Discuss the statement in the present Indian context. [C. U. B. A. 1961] [Ans. ৪২৮-৩১ পৃঃ]

২ঃ ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ

1. "The Indian economy has made remarkable progress under the First Five Year Plan"—Examine this statement noting the progress of the First Five Year Plan. [C. U. B. Com. '56 : B. A. '57] [Ans. ৪৩৪-৩৫ পৃঃ]
2. Discuss the main features of India's Second Five Year Plan. In what important respects does the Second Plan differ from the First Plan ? [C. U, B. A, '58] [Ans. প্রথমাংশ ৪৩৫-৩৭ পৃঃ ও দ্বিতীয়াংশ ৪৪৬-৫৮ পৃঃ]
3. Discuss the scheme of financing the investment in the public sector under the Second Five Year Plan and Give your views on the adequacy of the steps taken uptill now. [C. U. B. Com. '58] [Ans. ৪৩৭-৪০ পৃঃ]
4. Write a note on the critique of the Second Five Year Pan. [Ans. ৪৩৯-৪০ পৃঃ]
5. What are the causes of reappraisal of India's Second Plan ? [Ans. ৪৪১-৪২ পৃঃ

as the strains and stresses to which the Second Plan has been subjected ever since its commencement. [C. U. B. A. '60] [Ans. ৪৪১-৪২ পৃঃ]

7. Give a critical estimate of the achievements of India's First and Second Five Year Plans. [C. U. B. A. '61 ; C. U. B. Com. (3 Yr. 1964] [Ans. ৪৪২-৪৭ পৃঃ]

8. Give a review of the progress of India's ten years of planning. [Ans. ৪৪২-৪৭ পৃঃ]

9. Indicate the main features and objectives of India's Third Five Year Plan. [C. U. B. A. '62 ; N. B. U. B. A (Old) 1963] [Ans. ৪৪৭-৪৪৯ পৃঃ]

10. In what respects, if any, does the Third Plan differ from the two previous plans ? [C. U. B. A. '62] [Ans. ৪৫৬-৫৮ পৃঃ]

11. Critically discuss the scheme of financing the investment in the public sector under the Third Five Year Plan. In what respect does it differ from that of the Second Five Year Plan ? [B. U. B. A. (p. III) 1964] [Ans. ৪৪৯-৫১, ৪৩৭-৩৯ পৃঃ]

12. Discuss the points of criticism of the Third Five Year Plan. [Ans. ৪৫৩-৫৪ পৃঃ]

13. Give a critical estimate of the external resources and balance of payments position in the Third Five Year Plan. [Ans. ৪৫৪-৫৫ পৃঃ]

14. Make a comparative study of India's three Five Year Plans. [Ans. ৪৫৬-৫৮ পৃঃ]

15. Discuss the main objectives of the Third Five Year Plan of India. In what respects do these objectives differ from those of the Second Plan ? [C.U. B. Com. (P.I.) 1963 ; B.U. B. Com. (Mod) 1963]. [Ans. ৪৪৮, ৪৩১-৩৬ পৃঃ]

16. Give a brief outline of the programme of economic development as envisaged in India's Third Five Year Plan. [B.U. B.A- (Old) 1963]. [Ans. ৪৫২-৫৩ পৃঃ]

17. Examine the position regarding the internal and external sources of finance in India's Third Five Year Plan. [B.U., B A. (Mod) 1963]. [Ans.৪৪৯-৫১ পৃঃ]

18. Give an outline of the Third Five Year Plan and examine how far it is adopted to India's needs and resources. [B.U., B.A. (P. III) 1963] [Ans. ৪৪৭-৪৯, ৪৫৩-৫৫ পৃঃ]

19. "The general pattern of development followed in the Third Plan necessarily flows, in large part, from the basic approach and experience of the Second Plan. [B. U. B. A. (Mod) B. Com. (3 yr.) 1964] [Ans. ৪৪৭-৫৩]

৩ঃ মিশ্র অর্থনীতি

1. What is meant by 'Mixed economy' ? Write a short note on the nature of Mixed economy in India. [Ans. ৪৬৭ পৃঃ]

2. Discuss the importance of the Public Sector in Indian economy. [Ans. ৪৬৮-৬৯ পৃঃ]

৪ঃ রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়

1. Critically examine the present system of allocation of tax resources between the centre and the States in India. [C. U. B. Com. (3 Yr.) 1964] [Ans. ৪৭০-৭২ পৃঃ]

2. Critically discuss the recommendations of India's Third Finance Commission. In what respects do they differ from those of the Second Finance Commission. [C. U. B, A. (Old) 1963] [Ans. ৪৭২-৭৪]

3. Give a short description of

4. Point out the defects of India's tax-structure and [illegible] its improvement. [Ans. [illegible] পৃ:]
5. Give an account of the main observations of the Taxation Enquiry Commission in regard to India's tax-structure. [Ans. ৪৭৮-৮১ পৃ:]
6. Discuss the essentials of a sound tax policy in the light of Taxation Enquiry Commission's report. [Ans. ৪৮০-৮১ পৃ:]
7. Comment on the main features of Kaldor's proposals for India's tax-reform; to what extent have these proposals been implementory.
[B. U., B. A. (Old) 1963 ; N. B. U. B A. (Old) 1963] [Ans. ৪৮১-৮৩, ৪৮৭-৯৪ পৃ:]
8. Indicate the scope and importance of the Indian Income Tax.
[C. U. B. Com '56 ; B. A. '59] [Ans. ৪৮৪-৮৫ পৃ:]
9. Examine the case for and against the imposition of the Capital Gains Tax in India. Discuss the main features of this tax as introduced in India.
[C. U. B. A. '61 C. U. B Com. (P I) 1963]
[Ans. ৪৮৭-৮৯ পৃ:
10. Examine the case for and against the imposition of the Expenditure Tax and Wealth Tax in India. Discuss the main features of the two taxes.
[C. U. B. Com, '58 '61, C. U. B. Com (P. I) 1963, B. A. '59 '61, B. U B. Com (Mod) 1963 [Ans. ৪৮৯-৯২ পৃ:
11. Discuss the main features of the Estate Duty as levied in India
[C. U. B Com '53, '54 . B. A. '52, ' 3, '54] [Ans. ৪৯৩-৯৪ পৃ:]
12. Examine the causes of increase in India's Public Expenditure in recent times.
[Ans. ৪৯৫-৯৬ পৃ:]
13. Describe the size and composition of India's Public Debt. Comment on it.
[Ans. ৪৯৬-৯৮ পৃ:]
14. Write a short note on Public Debts in India and give reasons for their increase since independence. [C.U.B. Com (Part I,)'63 ; B.U.B.A.(P III) 1964]
[Ans. ৪৯৬-৯৮ পৃ:]
15. "In a developing economy, taxation is one of the main instruments of economic policy." Justify this with reference to the Indian context.
[C U. B. Com. (Old) 1963]. [Ans. ৪৭৮-৮১ পৃ:]
16. Indicate the main features of the Indian income-Tax and consider the desirability of supplementing it by other direct taxes. [B. U. B. A. (Old) 1963]
[Ans. ৪৮৪-৮৫, ৪৮৭-৯৩, ৪৮১-৮৩ পৃ:]
17. Discuss the role of direct and indirect taxation in the provision of development finance in India. [B. U. B.A. (Mod) 1963] [Ans ৪৭৮-৮১, ৪৮৪-৮৭ পৃ:]
18. Comment on the changes that have been introduced in India's tax structure in order to mobilise resources for planned development. [B. U. B. A. (P. III) 1963 ; [B.U., B.Com. (P. I.) 1963], B.U. BA.. (Mod) 1964
[Ans. ৪৮১-৯৪ পৃ:]
19. Examine the role played by Central Excise duties in the Central and state budget. [C.U. B.A. (P. II) 1964]. [Ans. ৪৮৬-৮৭ পৃ:]
20. How far is the present tax structure in India effective in encouraging rapid economic development ? [B. U. B. Com. (3 yr.) 1964]
[Ans. ৪৭৭-৮১, ৪৮৭-৯৪ পৃ:]

পরিশিষ্ট 'ক'

মহলানবিশ কমিটি রিপোর্ট (সংক্ষিপ্তসার)

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশে যে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দেশে রূপে বণ্টিত হইয়াছে উহা অনুসন্ধান করিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন ডঃ পি. সি. মহলা-বিশের সভাপতিত্বে, ১৯৬০ সালের অক্টোবর মাসে 'Distribution of Income and evels of Living Committee' নামে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। দেশের অর্থনৈতিক বস্থার কার্যকলাপের দ্বারা সম্পদ ও উৎপাদন-উপায় সমূহের কতদূর পরিমাণ কেন্দ্রীকরণ রিয়াছে, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশের জীবনমানের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে ং ইদানীংকালে দেশে আরও সম্পদের বণ্টন-প্রবণতা কিরূপ, ইত্যাদি অনুসন্ধানের ভার মিটিকে দেওয়া হয়। কমিটির রিপোর্টের প্রথম খণ্ড ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে কসভায় পেশ করা হয়। কমিটির প্রথম রিপোর্টে প্রকাশিত প্রধান বক্তব্যগুলি নিম্নরূপ :

১. পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে আয় ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণের অনুপাত সম্পর্কে কোন র্দিষ্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণ প্রবণতা পরিসংখ্যানের দ্বারা সমর্থিত হয় না।

২. তবে, বিভিন্ন তথ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আয়, সম্পত্তি ও বিশেষত বেসরকারী উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে দেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ রহিয়াছে ও ১৯৫১-৫৮ সালের ধ্যে ইহা সবিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম দশকের শেষে, দেশে র্থিক সম্পদের বণ্টনে যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে এবং সে কারণে, জনসমষ্টির একটি মুষ্টিমেয় ংশের হস্তে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়াছে। তবে, অন্য কয়েকটি উন্নত এবং ন্নোন্নত দেশের তুলনায় এই বৈষম্য বেশী নহে।

৩. জমি অথবা গৃহসম্পত্তির মালিকানার তুলনায় কোম্পানীর শেয়ারের মালিকানার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বিধিবদ্ধ বেসরকারী ক্ষেত্রেই (corporate private sector) ব্যক্তিগত সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণ অধিক হইয়াছে এবং আয় বণ্টনে বৈষম্য অপেক্ষা সম্পদ বণ্টনে বৈষম্যই অধিক।

৪. অধিকসংখ্যক ক্ষুদ্রায়তন কোম্পানীর পরিবর্তে অল্পসংখ্যক বৃহদায়তন কোম্পানীর প্রবণতা দেখা যাইতেছে। এবং কিছু কোম্পানীর আয়তন বৃদ্ধি দ্বারা যদিও কোম্পানীগুলির মালিকানার কেন্দ্রীকরণ সূচিত হয় না, তথাপি ইহা যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ও কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণে সহায়তা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, কোম্পানীসমূহের শেয়ার মালিকানার কিছু কিছু বিকেন্দ্রীকরণের প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

৫. পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দ্বারা বৃহদায়তন কোম্পানী ও উহাদের সংরক্ষিত বাজার সৃষ্টি হইয়াছে ; বিদ্যুৎশক্তির যোগান, পরিবহণের সম্প্রসারণ প্রভৃতির দ্বারা, মৃদু মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা বজায় রাখিয়া এবং বিস্তারিত কর-প্রণোদনা (tax incentives) প্রভৃতি দ্বারা দেশে বেসরকারী শিল্পক্ষেত্রের প্রসারের উপযোগী পরিবেশ রচিত হইয়াছে।

৬. দেশের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিক কেন্দ্রীকরণের অপর দৃষ্টান্ত। ১৯৫৯ সালে, ভারতের ৩৬৩টি ব্যাঙ্কের মোট আমানতের ৭৮% ছিল ২৫ কোটি টাকার অধিক আমানত বিশিষ্ট ১৫টি ব্যাঙ্কের করায়ত্ত। দেশের বৃহৎ ও মধ্যায়তন কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রধানত ব্যাঙ্কঋণের দ্বারা উপকৃত হইয়াছে।

৭. শিল্প অর্থ কবপোরেশন (I. F. C.), জাতীয় শিল্পোন্নয়ন করপোরেশনের (N. I D. C.), জীবনবীমা করপোরেশনের (L. I. C.) ন্যায় সরকারী অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানেব কার্যাবলী শিল্পের বেসরকারী ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ এবং বিশেষত, বৃহদায়তন কোম্পানীগুলির উদ্ভবেব অনুকূল হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, বর্তমান অর্থনৈতিক কাজকারবারের চিবাচবিত পদ্ধতি অনুযায়ী ঋণপ্রদানের বিষয়ে খাতকের ঋণযোগ্যতা (creditworthiness) এবং উপযুক্ত জামিন প্রদানের ক্ষমতাই ঋণমঞ্জুবির মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায়, পুবাতন ও বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলিই সর্বত্র নানারূপ ঋণের সুবিধা পাইতেছে, এবং ক্ষুদ্রায়তন ও বাঁচিবাব সংগ্রামে লিপ্ত নবস্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি ইহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

৮. বৃহদাযতন কোম্পানীগুলিব মালিকগোষ্ঠীব হস্তে বিপুল অর্থনৈতিক শক্তিব কেন্দ্রীকরণের আবেকটি সাম্প্রতিক কাবণ হইয়েছে দেশীবিদেশীযুক্ত প্রতিষ্ঠানেব মাধ্যমে দেশে বিদেশী পুঁজি ও শিল্পকৌশলেব আগমন।

৯. ভাবতেব বর্তমান পটভূমিকায়, দুই একটি শিল্পক্ষেত্রেব পবিবতে, সমগ্র শিল্পক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বেব একপ কেন্দ্রীকবণ আশঙ্কাব কাবণ হইযা পডিযাছে।

১০. ইহাব বিরুদ্ধে সবকাবী ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া সত্বেও, যাহা উচিত ছিল, তদপেক্ষা অধিকতব পবিমাণে অর্থনৈতিক ক্ষমতাব কেন্দ্রীকবণ ঘটিযাছে।

১১. বৃহদায়তন শিল্পগোষ্ঠীব উদ্ভব ঘটিযাছে বলিযা উহা দ্বাবা সমাজবিবোধী নীতি গৃহীত হইয়াছে বুঝায় না। খাঁটি অর্থনৈতিক নিযম অনুযায়ী বৃহদাযতন উৎপাদনেব সুফলগুলিই বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানেব উন্নতিতে সাহায্য কবিযাছে।

কমিটি মত প্রকাশ কবেন যে, বেসবকাবী ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতাব নিয়ন্ত্রণ-জাল কিরূপ বিস্তৃত হইযাছে তাহাব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও সামগ্রিক চিত্র পাইবাব জন্য উপযুক্ত আইনগত ক্ষমতাবিশিষ্ট একটি সাবাসময়ী অনুসন্ধানকাবী কমিটি বা কমিশন নিযোগেব প্রয়োজন আছে। কমিটি আবো বলেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতাব এই কেন্দ্রীকবণেব বিবোধী, অথচ অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্যেব সহিত সংগতিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ কবা প্রযোজন।

পরিশিষ্ট 'খ'

একচেটিয়া কার্যকলাপ অনুসন্ধানী কমিশন

Monopolies Commission

মহলানবিশ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া অর্থনীতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি শ্রী কে. সি. দাশগুপ্তকে সভাপতি করিয়া পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে কমিশনকে রিপোর্ট পেশ করিতে বলা হইয়াছিল।

কমিশনের অনুসন্ধানের ক্ষেত্র অত্যন্ত প্রশস্ত রাখা হইয়াছে। ইহার কার্যধারা নিম্নরূপ হইবে বলিয়া নির্দেশ ছিল:

১. বেসরকারী হস্তে অর্থনীতিক শক্তির কেন্দ্রীকরণের এবং কৃষিব্যতীত অর্থনীতির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একচেটিয়ামূলক ও প্রতিযোগিতানিরোধক আচরণের জন্য দায়ী কারণসমূহ এবং উহাদের সামাজিক ও অর্থনীতিক ফলাফলসহ, এইরূপ কেন্দ্রীকরণের ও আচরণের প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া অনুসন্ধান করা, এবং

২. এইরূপ অনুসন্ধানের আলোকে জনস্বার্থ রক্ষার জন্য যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় মনে হইবে সেরূপ, আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করা এবং সুপারিশ-কৃত আইনগত ব্যবস্থা কার্যকর করিবার পদ্ধতি ও উপায় নির্দেশ করা।

ইহা ছাড়া, উপরোক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া কমিশন, জাতীয় অর্থনীতির যে কোন দিক অথবা বেসরকারী ক্ষেত্রের ও অর্থ সংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যধারার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন বিষয়ে, সুপারিশ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছিল।
